
বিভা
ভূত ভুতুম
উৎসব সংখ্যা
১৪২৮
₹ ২৫৫
BIVA

বিভা ভূত-ভুতুম উৎসব সংখ্যা ১৪২৮



-: সম্পাদক মণ্ডলী :-

সুমঙ্গল পণ্ডিত
ত্রিজিৎ কর
রুদ্র চ্যাটার্জী
ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ চ্যাটার্জী
রোহিলা পণ্ডিত (কচিভুতুমের পাতা)

-: সহায়ক :-

বিভা পাবলিকেশন

-: প্রচ্ছদ :-

কৃষ্ণেন্দু মন্ডল

মূল্য : ২৫৫ টাকা
Price : 255.00

-: গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ :-

বিভা পাবলিকেশন

-: পরিবেশক :-

BIVA Publication
1K, Uday, Rajarhat Residency,
Hatiara, New Town, Kol-700157
Phone: +91 9434343446

Website
www.bivapublication.com



অশরীরী সম্পাদকীয়...

দেখতে দেখতে এইবার আমাদের উৎসব সংখ্যা তার চতুর্থ বর্ষে পা দিল। এখনও মনে পড়ে কলেজ স্কোয়ারের এক কোণে হাতে গোনা কিছু মানুষ নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ভূত ভুতুম উৎসব সংখ্যা। ভূত ভুতুম গ্রুপ এখন আকারে আয়তনে বিশাল বপু, সদস্য সংখ্যা প্রায় দুই লাখ ছুঁইছুঁই। গ্রুপের কর্মকাণ্ডও এখন আগের থেকে অনেক সুবিস্তৃত। শুধু গ্রুপ লেখালেখিতে তা আর সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ইভেন্টে সাধারণ পাঠকদের জন্যও থাকে প্রচুর বই পুরস্কার হিসেবে জিতে নেওয়ার সুযোগ। এছাড়া বছরে বিভিন্ন সময় বহু প্রতিশ্রুতিবান লেখকের বই ভূত ভুতুমের তত্ত্বাবধানে বিভা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়। তাতে যেমন থাকে ভূত ভুতুমের নিজস্ব লেখক লেখিকারা, তেমনই সুযোগ পান একেবারে নতুন প্রতিভারাও।

এছাড়াও বেশ কিছুদিন হল গ্রুপের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কচি ভুতুমরাও। ভূত যে আসলে বড়দের থেকেও অনেক অনেক বেশি ছোটদের, সেই ভাবনা থেকেই আমরা গত বছর থেকে ভূত ভুতুম উৎসব সংখ্যার সঙ্গে প্রকাশ করছি 'কচি ভুতুমের পাতা'। এতে রয়েছে বহু খুদে শিল্পীদের আঁকা মিষ্টি মিষ্টি ছবি আর তাও সম্পূর্ণ রঙিন আকারে। ছোটদের কথা ভেবেই এইবার 'কচি ভুতুমের পাতা'য় শুরু হয়েছে নতুন দুটি বিভাগ 'ভুতুম বুড়োর আসর' ও 'ভৌতিক শব্দছক'। সঙ্গে কচি ভুতুমদের জন্য চারপাতার রঙিন 'হাঁচিবুলু' কমিক্স।

এ তো গেল খুদে ভুতুমদের জন্য সরঞ্জাম। দেখা যাক বড়দের পাতে কি কি থাকছে! থাকছে কালিগুণীনের একটি অপ্রকাশিত উপন্যাস, সঙ্গে আরও চারটি হাড় হিম করা সুবৃহৎ উপন্যাস। এ ছাড়াও তিনটি বড় গল্প এবং কুড়িটিরও বেশি ছোট গল্প রয়েছে এই পূজাবার্ষিকীতে। এবারের ছোট গল্পগুলির নির্বাচন ও সম্পাদনার সময় বিষয় বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। আশা করি পাঠকরা পড়তে গিয়েই তা টের পাবেন। এর সঙ্গে থাকছে অনুবাদ কাহিনী ও ভৌতিক প্রবন্ধও। এবং প্রতিবারের মতো শেষ পাতে থাকছে 'ভৌতিক অনুগল্প' ও 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে'।

ভূত ভুতুমের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভূত ভুতুমের প্রতিটি বইয়ের গুণমান ধরে রাখার বিষয়ে আমাদের সম্পাদকমণ্ডলী এবং প্রকাশনা সংস্থা সদা সচেষ্ট ছিল, আছে এবং থাকবে। এই বইয়ের ক্ষেত্রেও সেই গুণমান সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের তরফ থেকে রন্ধন আপাতত সমাপ্ত। এইবার পাঠকদের স্বাদগ্রহণের পালা। রান্নাটি কেমন হল তা পাঠকদের থেকেই জানার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম।

আরও একটি কথা, কোনওরকম কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসকে ভূতভুতুম বা বিভা পাবলিকেশন কোনওভাবেই সমর্থন করে না। তাই বইটিকে পাঠককুল নিছক সাহিত্যসুলভ মনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসেবেই দেখবেন বলে আশা রাখি।

ভূত ভুতুম উৎসব সংখ্যা ১৪২৮

সূচিপত্র

ভূত ভুতুম উৎসব সংখ্যা ১৪২৮

সূচিপত্র





উপন্যাস



বাঁকুড়া পুরুলিয়ার জেলার সীমান্ত এলাকায় হুরা নামের একটি গ্রাম। গ্রামেরই প্রত্যন্ত নির্জন একটি এলাকায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি অনাথ আশ্রম। সেই আশ্রমেই চাকরি নিয়ে হাজির হয় কৃষ্ণনগরের মেয়ে আলোলিকা। কিন্তু এসেই তাকে অবাক করে অনাথআশ্রমের আবাসিক শিশুদের রহস্যময় ব্যবহার। শুধু তাই, নয়। একই সঙ্গে এই অনাথ আশ্রম জুড়ে ঘটতে থাকে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। আলোলিকা কী পারবে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার রহস্যভেদ করতে, নাকি নিজেই হয়ে যাবে এক ভয়ঙ্করের বলি?

একজন শিল্পী... যার তুলির আঁচড়ে ইতিহাস রচিত হয়। একজন নবীশ ডাক্তার... যাকে তার কাজে যোগদানের প্রথম দিনেই সাক্ষী থাকতে হয় গায়ে কাঁটা দেওয়া এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার!

আর কয়েকটি বীভৎস মৃত্যু! যা আপামর জনসাধারণ, শিল্পী মহল এবং গোয়েন্দাদের বুদ্ধির ভিত নাড়িয়ে দেয়।

সাতটি অমীমাংসিত মৃত্যু রহস্য। যা ছাইচাপা পড়েছে বিগত কয়েক বছরে। অথচ সেই ছাইয়ের তলে ধিকি ধিকি জ্বলছে আজও সেই জিঘাংসা! কে? কারা? বা কী রয়েছে তাদের নেপথ্যে?

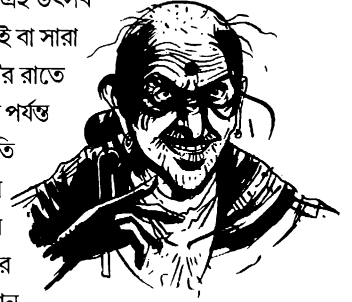


মহাদেব নিজের গবেষণার পুঁথিপত্র গুটিয়ে বিদেশ থেকে ফিরে এলো নিজের গাঁয়ে। নিজের বাড়ির একখানা বিরাট কক্ষে তৈরি করল গবেষণাগার। কি সর্বনাশা আবিষ্কার সে করে ফেলল নিজের অজান্তেই! সেই মারণ আবিষ্কার কেমন করে গিয়ে পড়ল এক নরঘাতক কাপালিকের হাতে? ঠিক কোন পথে গাঁয়ের ঘরে ঘরে নেমে আসে মরণছোবল? কালীগুণীন কি পারবে সেই অতি ধূর্ত নরহন্তাকে তারই ফাঁদে বন্দি করতে?



কালাজাদুর এক খেলার মাধ্যমে শয়তানকে পৃথিবীর বুকে ডেকে আনার কী ভয়ানক পরিণতি হতে পারে? জানতে হলে পড়ুন Friday, the 13th.

হিজরিয়া গ্রামে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে হিজড়েদের এক গোপন উৎসব 'ডিঙ্গিরি'! কী হয় 'ডিঙ্গিরি' উৎসবে? কেন কোনও সাধারণ মানুষ এই উৎসব দেখতে পারে না! কেনই বা সারা গ্রামের লোক 'ডিঙ্গিরি'র রাতে বাড়ির বাইরে পা রাখতে পর্যন্ত সাহস করে না! কাইতি আসলে কে? কেন তার নাম মুখে নিতেও ভয় পায় হিজরিয়া গ্রামের সাধারণ মানুষ? কোন ভয়ঙ্কর ভবিতব্য অপেক্ষা করে আছে অরিত্রদের জন্য! কী হবে যখন ওরা হাজির হবে বহু প্রাচীন এই গোপন উৎসবে?



ছোট গল্প

অনুবাদ

প্রবন্ধ

অণুগল্প (৩৩১ - ৩৬২)

সত্য ঘটনা অবলম্বনে (৩৬৩ - ৩৬৮)

আবীর রায়

অ্যাসাইলাম





শিলিগুড়ির উত্তরের শেষ প্রান্তে যেখান থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়ো দেখা যায়, সেখানে রোজারিও অ্যাসাইলাম স্বাধীনতার সময় থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষের সেবা করে চলেছে। হাসপাতালটি আকারে যে বিরাট বা অনেকখানি জমি নিয়ে তৈরি এমনটা নয়। তবে এখানে চিকিৎসা পেতে আশপাশের জেলা থেকেও পরিবাররা তাঁদের অসুস্থ স্বজনদের নিয়ে আসে। শহরের এইদিকটা অপেক্ষাকৃতভাবে নির্জন। বেশি গাড়িঘোড়ার চলাচল নেই। জনবসতিও সে অর্থে তেমন নেই। দূরে একটা বন্ধ হয়ে-যাওয়া পাইপ ফ্যাক্টরির পুরোনো একটা চালা। হাইওয়ের দু-ধারে ঢেউ-খেলানো ঘাসজমি, তাতে বড়ো বড়ো কোমরসমান ঘাস হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে পাথুরে পথ এঁকেবেঁকে সোজা

গিয়ে মিশেছে অ্যাসাইলামের ফটকের সামনে।

আমি যেদিন এখানে বদলি হয়ে আসি, সেদিন আকাশে মেঘ ছিল। থমথমে পরিবেশে শেষ বিকেলে এসে এখানকার চার্জ বুঝে নেওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, এত প্রাণহীন আর বিষণ্ণ চেহারার হাসপাতাল এর আগে দেখিনি। এখানে ঢুকলে আমাদের ডাক্তারদেরই মন হতোদ্যম হয়ে যায়, আর রুগিদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। গোটা চত্বর জুড়ে মরা গাছে ভরতি। এসেই এখানকার মেনটেনেন্সের এক ভদ্রলোককে বলেছিলাম মরা গাছগুলো কাটিয়ে ফেলতে, কারণ তা পেশেন্টদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে। আজ সাড়ে তিন মাস কেটে গেলেও গাছ যেমন ছিল তেমনই রয়েছে।

আমার বারবারই মনে হয়েছে হাসপাতালটার পরিবেশ এমন নীরস থাকার প্রধান কারণ এখানকার স্টাফ। এরা নিতান্তই কুঁড়ে, একবগ্‌গা আর অসভ্য। কেউ কারও সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে না। কেউ একবারে কোনো কাজ করে না। কারও সঙ্গে বসে দু-দণ্ড কথা বলা যায় না। ডাক্তার হিসেবে আমি চিরকালই কর্তব্যপরায়ণ আর নিষ্ঠাবান। চব্বিশ ঘণ্টা রুগিদের মাঝখানে থাকতে পারলে আমার ভালো লাগে। তাই আমার থাকার জায়গাটা যখন বাইরে কোনো কোয়ার্টারে না দিয়ে হাসপাতাল চত্বরেই দিল, তখন আমি খুশিই হলাম। এখানকার আবাসিক রুগিদের একেকজনের একেক কাহিনি, নানান রঙের সমস্ত অতীত, নানান খেয়াল, নানান স্বপ্ন। কেউ একটু উগ্র, কেউ বা শান্ত। কেউ খুব দুঃখী, কেউ আবার সারাক্ষণ উৎফুল্ল। এদের জগৎটা বড়ো মধুর। তথাকথিত সুস্থ মানুষদের থেকে আলাদা কিন্তু মধুর। এরা নিজেদের খেয়ালের জাল বুনে বেড়ায়। কেউ আবার প্রতিনিয়ত আঘাতের সঙ্গে জুঝতে জুঝতে নিজেদের কল্পনার জগৎ বানিয়ে ফেলে তাতেই খুশি থাকে।

আমার বেশ কাটছিল। বাড়ির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়লেও সেখানে যাওয়ার তাগিদ খুব একটা অনুভব করতাম না। মা চলে যাওয়ার পর থেকে আমি দাদার সংসারেই থাকতাম। কিন্তু আমার বউদি সুবিধের মানুষ নন, অত্যন্ত সুবিধেবাদী স্বার্থপর মহিলা। আমি চিরকালই শিশু ভালোবাসি। কিন্তু একরত্তি ভাইঝিটার ধারেকাছে আমায় ঘেঁষতে দিত না। তার ওপর নিত্য দুর্ব্যবহার, বিয়ে করে অন্য বাসায় উঠে যাওয়ার হুড়ো। আর্থিকভাবে আমি দাদার ওপর কোনোদিনই নির্ভরশীল ছিলাম না। তাতেই এই। রোজগার না থাকলে কী হত কে জানে। কাজেই বাড়ির প্রতি তেমন টান আমার নেই।

এখানে 'গণেশ' বলে একজন অল্পবয়সি কর্মচারী আমার দেখাশুনো করে, মাঝেমধ্যে তার সঙ্গে আমার টুকটাক গল্প জমে ওঠে। বাকি স্টাফদের থেকে সে অনেকটা চটপটে আর হাসিখুশি। বিকেলের দিকে একেকদিন একটু ফুরসত পাওয়া যেত। তখন আমি আর গণেশ চায়ের কাপ নিয়ে দোতলার উত্তরের ব্যালকনিটায় গিয়ে দাঁড়াই। ও নিজের বাড়ির অনেক কথা বলে। খড়্গপুরে ওদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে আসতে হয় ওর কাকার অত্যাচারে। বিধবা মা-কে নিয়ে শেষে শিলিগুড়িতে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় এসে ওঠে। তারপর এক কামরার বাসায় থেকে পড়াশুনো, তারপর চাকরি। তাকে দেখেই বোঝা যায় সে বুদ্ধিমান আর শিক্ষিত ছেলে। তার জামাকাপড়ের পারিপাট্য আর কথার ঝকঝকে বাচনভঙ্গি হাসপাতালের অন্য স্টাফদের থেকে তাকে অনেকটা আলাদা করে দেয়।

হাসপাতালের সুপার ড. রাখহরি অধিকারী দাম্ভিক লোক। তার ব্যবহারও বাকি স্টাফদের মতনই, হয়তো তাদের থেকেও খারাপ। এরা কেন এই সামান্য বিষয়টা বোঝে না যে অর্ধেক মানসিক রোগ শুধুমাত্র ভালোবাসাতে সেরে যায়। একটু হেসে কথা বলা, একটু মন দিয়ে রুগির কথা শোনা, একটু বন্ধুত্ব, একাত্মতা... এইসব মিলিয়ে মনের অর্ধেক ফাটল বুজিয়ে দেয়। বাকিটা করে মেডিসিন। কেউ সারতে ছ-মাস সময় নেন, কেউ বা ছ-বছর...

সেদিন ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা। সন্ধের পর ঘরের জানলাটায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখি, মেঘের ফাঁক দিয়ে আবছায়া গোল চাঁদের টুকরো দেখা যাচ্ছে। গণেশের মুখে জানতে পারি, একজন নতুন আবাসিক এসেছে। রুগি। তবে উগ্র নয়। কিন্তু একটু অদ্ভুত। আজ সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি পড়েছে। দোতলার বারান্দাটার পেছনদিকের পাল্লাগুলো ভাঙা। সেখান দিয়ে জল আসায় উত্তরের বারান্দাটা স্যাঁতসেঁতে ভেজা। দেয়ালেও বহুদিন রং পড়েনি তাই চুনকাম উঠে নোনা ধরে পলেস্তারায় ফাটল ধরেছে। অন্ধকার হওয়ার পর সেদিকের জানলাটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পাহাড়ের দিক থেকে হিমেল হাওয়া দিচ্ছিল। এমন সময় গণেশ এসে খবরটা দিল।

সেলের ভেতরটা আধো অন্ধকার। গণেশ আমায় দুয়ার অবধি এগিয়ে দিয়ে নীচে চলে গেল। ভেতরে একটা বেঞ্চির ওপর বসানো হয়েছে লোকটাকে। মাথার ওপর একটা চল্লিশ পাওয়ারের ডুম জ্বলায় চোখের তলায় গাঢ় ছায়া পড়েছে লোকটার। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম তার দিকে। লোকটা ধবলরোগগ্রস্ত। গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে গোলাপি, মাথার চুল আর ভুরু উজ্জ্বল চকচকে সোনালি, গাল ভাঙা, হাত-পা

রোগা রোগা। ধবলরুগি বা 'অ্যালবিনো'দের বয়স আন্দাজ করা কঠিন হয়, তাই বুঝতে পারলাম না। আমি ঘরে ঢুকতে সে মুখ তুলে তাকাল। লোকটার চোখ দুটো দেখে দু-হাত পিছিয়ে গেলাম আমি। সাদাটে ধূসর চোখ। ওপরের দিকে চাইতেই সে চোখ কুঁচকে নিল। যেন বাল্‌বের আলো চোখে পড়তেও তার কষ্ট হচ্ছে।

আমি একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসলাম।

"কী নাম আপনার?" মোলায়েমভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

লোকটা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। সে কি কানে খাটো? আমি প্রশ্নটা আবার করলাম। এবার একটু জোরে।

সে উত্তর দিল না। কিন্তু পালটা এমন একটা প্রশ্ন করল, যা শুনে আমি বুকের ভেতরে একটা হালকা ধাক্কা খেলাম।

"তুই গত মাসে কিষণগঞ্জে লাইনে গলা দিয়েছিলিস না?"

মাথার ওপরের বাল্‌বটা দপদপ করে উঠল। বোধহয় ঝড় আসবে।

আমি থমকে গেলাম। অবাক হলাম... কিন্তু দমে গেলাম না। এমন অর্থহীন কথা বলা মানসিক রুগিদের পক্ষে অসম্ভব কিছু না। তাদের জগৎটা আর পাঁচটা মানুষের জগতের থেকে আলাদা হয়। তারা দুনিয়াটাকে অন্য আঙ্গিকে, অন্য ভাবনায় দেখে। তাদের কাছে তাদের বাস্তবটাই ধ্রুবসত্য।

আমি হেসে বললাম, "কে বলল আপনাকে যে আমি এমন কাজ করেছিলাম?"

লোকটা আধবোজা চোখে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল। কোনো উত্তর দিল না।

আমি তাকে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। যতক্ষণ না তার কেস ফাইল আমার নামে বরাদ্দ হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে কোনোরকমভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা নীতিবিরুদ্ধ।

"আপনার কোনোরকম অসুবিধে হলে আমায় বলতে পারেন। এরপর আপনার অ্যাটেন্ডেন্ট বরাদ্দ হবে, আপনার দেখাশুনোর ভার কেউ না কেউ নেবে। তবুও আমি এখানেই থাকি। আশা করি, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।" আমি হাসিমুখে তাকে কথাগুলো বলে বেরিয়ে এলাম তার ঘর থেকে। এই কথাগুলো যে-কোনো নতুন রুগির সঙ্গে পরিচয় হলে আমি বলে থাকি। সে আমার তত্ত্বাবধানে থাকুক বা না-ই থাকুক, আমি মনে করি ডাক্তার হিসেবে প্রতিটি রুগিকে নিরুদ্‌বেগ বোধ করানোটা আমার কর্তব্য। তাতে সে পরবর্তীকালে অনেক দ্রুত চিকিৎসায় সাড়া দেয়।

রাতে একবার শোবার আগে লোকটার ঘরে উঁকি মেরেছিলাম। তার সেলে দুটো শয্যা। একটায় সে শুয়ে রয়েছে, অন্যটা খালি। কম্বল মুড়ি দিয়ে নড়াচড়া করছে না দেখে বুঝলাম, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের ডুমটার টিমটিমে হলদে আলো ঘরের কোনায় কোনায় পৌঁছোয় না। শয্যার কোনাটায় আবছায়া অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মিশে লোকটা স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরের দেয়ালগুলো ফাটল-ধরা। অন্য শয্যাটায় গদি পাতা নেই। সেটা খালি পড়ে রয়েছে আধো অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের গায়ে... থমথমে করিডোরের কোনো ফাটল থেকে একটা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। একটা কটু গন্ধ নাকে আসছে। লোকটা কি ঘরের মধ্যেই প্রস্রাব করেছে? এমন ঘটনা মানসিক রুগিদের ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। আমি এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। কয়েক মিনিট... তারপরই উবে গেল গন্ধটা। নাহ্‌... বোধহয় আমার মনের ভুল। করিডোরের শেষে বাথরুম। হয়তো ঠিকঠাক সাফাই হয়নি আজ।

আমি চলে এলাম নিজের ঘরে। অন্যদিন বালিশে মাথা ঠেকাতেই আমার ঘুম চলে আসে। আজ কেন যেন ঘুম আসতে বেশ রাত হল। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে করতে শেষে প্রায় মাঝরাতে ঘুমোলাম। যেই কারণে সকালে উঠতেও দেরি হল।

কাল বোধহয় শেষরাতে বৃষ্টি হয়েছিল। আজ সকাল থেকে আকাশ ঝলমলে নীল। তুঁতে-আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো পাহাড়ের পাঁচিল আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেলা বাড়লে আমি আগের রাতের নতুন রুগিটির কাছে গেলাম।

গণেশের থেকে জানতে পারলাম, আমার সঙ্গে সে বরাদ্দ হয়নি। অন্য কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় থাকবে সে।

"কেমন আছেন আজ?"

আমি তার ওয়ার্ডের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলাম। আমার গলার আওয়াজে অল্প মাথা তুলে দেখল আমায়। তারপর মাথা নুইয়ে নিল। তারপর আবার তুলল। কিন্তু এবার তাকিয়েই থাকল... টানা বেশ কিছুক্ষণ। তারপর যে কাজটা করল, সেটা অপ্রত্যাশিত!

পেছন দিয়ে যাওয়া এক ওয়ার্ডবয়কে হঠাৎ সে গলা উঁচিয়ে ডাকল। এই ছেলেটির নাম সম্ভবত 'শম্ভু'। সাদাসিধে গোবেচারা ছেলে। লোকটার ডাক শুনে সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা আবার একবার আমায় আড়চোখে দেখে নিয়ে শম্ভুর দিকে ফিরে বলল, "তোমার পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ?"

প্রশ্নটা শুনে কেন যেন গা শিরশির করে উঠল আমার।

শম্ভু একঝলক আমায় দেখে বলল, ''কেন পাব না?''

''কেমন দেখতে তাকে?''

''লম্বা, ফরসা, চোখে চশমা...''

লোকটা মাথা নিচু করল। আমি হাতের ইশারায় শম্ভুকে যেতে বললাম। শম্ভু চলে যেতে আমি ওয়ার্ডের ভেতর ঢুকলাম। রুগির সামনে বসে বললাম, ''আপনার মনে কী চলছে, আমায় বলতে পারেন...''

লোকটা তার ফ্যাকাশে চোখের পাতাগুলো মেঝের দিক থেকে না সরিয়েই বলল, ''আসলে ঠিক বুঝতে পারি না... কে রয়েছে আর কে নেই।''

''মানে?''

লোকটা তার সাদাটে চোখ দুটো তুলে আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল, ''আমি যাদের দেখি, তাদের সবাই দেখতে পায় না।''

আমি তাকিয়ে রইলাম তার চোখের দিকে। কাচের মতো ফ্যাকাশে ধূসর চোখ...

''কাদের দেখেন?''

লোকটা এপাশ-ওপাশ দেখে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, ''যারা ওপারে চলে গেছে...''

''ওপারে চলে গেছে?''

''বা যারা যেতে গিয়েও আটকে রয়েছে—''

আমি তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। ঘরটা ছোটো... পেছনদিকে উঁচুতে একটামাত্র খুপরি জানলা, দিনের বেলাতেও ভালো আলো ঢোকে না।

''মৃত মানুষ?''

''গত মাসে আমার বেড়ালটাকে কুকুরে কামড়ে টুকরো করে দিয়েছিল। সে রোজ আসে... রাতে আমার মাথার কাছে বসে থাকে। তার সবুজ চোখ মেলে সারারাত তাকিয়ে থাকে আমার দিকে!''

''আর মানুষ?''

''বুঝতে পারি না...''

''কী?''

''কে আছে আর কে নেই... কাতারে কাতারে ঘুরে বেড়ায় ওরা। কেউ কষ্ট নিয়ে... কেউ আকাঙ্ক্ষা... কেউ ভয়... কেউ বা প্রতিশোধের আশায়...''

''তাই আমায় দেখে মনে হয়েছিল, আমি কিষণগঞ্জে মারা গিয়েছি?''

''আপনার মতোই যেন...''

বলতে বলতে মাথার দু-দিক চেপে ধরে ঘাড় নিচু করল লোকটা।

আমি থেমে গেলাম। মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার যেন লাভা ফুটে চলেছে আমার। এমন কেস আমি প্রথমবার দেখছি তা নয়। অবসাদে, স্বপ্নে বা নেশার ঘোরে বা ভয়ে অনেকে নিজেদের মৃত আত্মীয়দের দেখেন, কিন্তু সজ্ঞানে এতটা খোয়াব দেখা...

''কী থেকে এমনটা শুরু হল? কোনো ঘটনা, কোনো শক?''

উত্তরটা এল কিছুটা সময় নিয়ে; ''যখন শুরু হয়, তখন বোঝা যায় না। সব সত্যি মনে হয়। সব পরিপাটি... পরিপূর্ণ... তারপর দম আটকে আসতে থাকে। মনে হয় নিজেকে শেষ করে দেওয়া এর চেয়ে সহজ।''

সুইসাইডাল! এই তথ্যগুলি এর অ্যাটেন্ডিং মেডিককে দিতে হবে। হাসপাতালে নজরদারি বেশ ভালো। তাই হয়তো ওয়ার্ডবয়দের চোখ এড়িয়ে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তবুও একটু কড়া নজর রাখতে বলতে হবে।

''নেশা-টেশা কিছু?''

রুগি না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল। অনেক সময় অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লিভার নষ্ট হয়ে টক্সিন রক্তে মিশে ভয়ংকর ইলিউশন সৃষ্টি করে। মনে হয়, বাবা, মা, ভাই, বোন, সকলকে কেউ মেরে ফেলতে চাইছে। বা সকলে মিলে গণ-আত্মহনন করে ফেলছে। বা কেউ সর্বক্ষণ নজর রাখছে, আড়ি পাতছে, আক্রমণ করতে চাইছে...

সেদিন বিকেলে জানতে পারলাম লোকটার ব্যাপারে বাকি তথ্য। নাম 'বলরাম বর্মা', বয়স বেয়াল্লিশ, সেবকে বাড়ি। পরিবারের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। তবে খুব পরিষ্কার মানুষ নয়; দুবার জেল-খাটা। কিষণগঞ্জের ত্রাস ললিত যাদবের দলের সঙ্গে মেলামেশা ছিল। তারপর মনোবিকার হয়ে এখানে...।

ড. জয়দেব ভাণ্ডারী বলরাম বর্মার দায়িত্ব পেয়েছেন। ড. ভাণ্ডারীর সঙ্গে আমারও প্রায়ই কথা হয়। উনি নিজেই মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারেন। আমার থেকে অনেক সিনিয়র ডাক্তার হলেও মেলামেশায় সিনিয়রিটি কখনোই দেখান না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা বলরামের ব্যাপারে ওঁকে বলতে গেলেই ওঁর ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলাম। বলরাম আমায় যা যা বলেছে, আমি তাঁকে বললাম, সঙ্গেই নিজেরও কিছু মতামত ওঁকে জানালাম, যাতে ওঁর চিকিৎসা করতে সুবিধে হয়। উনি যেন আমার

কথাগুলি শুনেও শুনলেন না। ঘাড় নাড়লেন বটে, সময় দিলেন বটে, কিন্তু ভেতরে নিলেন না। যেন আমার পর্যবেক্ষণগুলি ওঁর কোনো কাজে লাগবে না। বা বলরাম এর সম্পর্কে কোনো তথ্য আদৌ কোনো গুরুত্ব রাখে না...!

বিকেলে বলরামের সঙ্গে আরেকবার দেখা হয়েছিল। তাকে তখন চা দেওয়া হয়েছিল। সে চুপচাপ বসে চা খাচ্ছিল। আমি তার ঘরে ঢুকিনি। বাইরে থেকে হেসে চলে এসেছি। কিন্তু সমস্যাটা শুরু হল পরদিন রাত থেকে।

তখন প্রায় রাত দুটো। আমার ঘরে আমি ঘুমে ডুবে। এমন সময় কানে ফিসফিসে শব্দ শুনলাম। চোখ মেলতেই দেখি, কাঁচুমাচু মুখে গণেশ এসে জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ডাকছে আমায়। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

"কী ব্যাপার?"

"দরজাটা একবার খুলবেন? নতুন পেশেন্টকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।"

তাড়াহুড়ো করে খুললাম দরজা। যা ভেবেছিলাম তা-ই; 'নতুন পেশেন্ট' বলতে বলরামের কথাই বলছে গণেশ।

"কী হয়েছে তার?"

"করিডোরের আলোগুলো নিভিয়ে শুতে যাব আমি, এমন সময় দেখি, সে মেঝেতে শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে। ঘরের ভেতর গিয়ে তাকে ডাকতেই বিকট চিৎকার করে চোখ উলটে গেল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা আগুন! প্রেশারও ওপরেরটা প্রায় একশো সত্তর!"

"সর্বনাশ!"

কথা না বাড়িয়ে সোজা গণেশের পেছন পেছন দৌড়োলাম বলরামের ঘরের দিকে। ড. ভাণ্ডারী সন্ধ্যাবেলা ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরে যান। যেহেতু আমি আবাসিক হয়ে রয়েছি তাই গণেশ প্রথমেই আমাকেই খবর দেওয়া শ্রেয় মনে করেছে।

আমি ঢুকতেই দেখি, জনা দুয়েক ওয়ার্ডবয় পৌঁছে গেছে বলরামের ঘরে। তারা বলরামের মুখে-চোখে জল দিয়ে তাকে তুলে খাটে শুইয়েছে। আমি গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালাম। নাম ধরে ডাকলাম তার। সে চোখ খুলল। ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর বাকিদের দিকে... তারপর হঠাৎ তার গোলাপি মুখটা বেঁকে বিকৃত হয়ে গেল। গলার রগ ফুলিয়ে প্রচণ্ড ত্রাসে চিৎকার করে উঠল সে! তারপর নিজের দু-হাত দিয়ে চোখ ঢেকে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওকে সরিয়ে নাও! ওকে সরিয়ে নাও!"

মেট্রন দৌড়ে এসে ঢুকলেন ঘরে। আর ঢুকতেই এমন ব্যবহার করলেন, যা আমি আশা করিনি।

"আপনি দয়া করে নিজের ঘরে ফিরে যান!" উনি বেশ ঝাঁজের সুরেই আমায় বললেন।

কথার টোন শুনে আমার মাথা থেকে পা অব্দি জ্বলে গেল।

"ওঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন হওয়ার পথে। প্রেশারও আকাশ-ছোঁয়া। ড. ভাণ্ডারী নেই তাই—"

"সে স্যার কাল সকালে এলে যা ভালো বুঝবেন করবেন। আপনি ঘরে যান। ওঁর পেশেন্টের কিছু হলে স্যার আমাদের ছেড়ে কথা বলবেন না।"

"আর যদি আজ রাতে পেশেন্টের কিছু হয়ে যায়, তার দায়ও কিন্তু আপনার। আপনারা সকলে সাক্ষী রইলেন।" মহিলার মুখের সামনে আঙুল তুলে কথাগুলো বলে রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। একজন মেট্রনের এত বড়ো স্পর্ধা কীভাবে হয়? ড. ভাণ্ডারীকে তো ভালোমানুষ বলেই মনে হয়। তাঁর আশকারাতেই এদের এত সাহস বেড়েছে? নাকি সুপারের কাছে খুঁটি ধরা এদের? এরা কেন সবাই একজোট হয়ে দুর্ব্যবহার করে? এরা কি কোনো ষড়যন্ত্রের অঙ্গ? রোজারিও অ্যাসাইলামে কি কোনো রহস্য রয়েছে, যা এরা সকলে মিলে গোপন রাখে? তাই নতুন মানুষের সঙ্গে প্ল্যান করে এই দুর্ব্যবহার?

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। সেই রাতে ঘুম হল না। অনেকগুলো চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। কেন আমাকে দেখতে দিল না বলরামকে? আমাকে ডেকে গণেশ তো কোনো ভুল কাজ করেনি...। মেট্রনের কী স্বার্থ থাকতে পারে? তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন—বলরাম আমায় দেখে অমন ভয় কেন পেল? সে কি এখনও বিশ্বাস করে, আমি কিষণগঞ্জের রেললাইনে গলা দিয়েছিলাম? কতটা আতঙ্কের হতে পারে একজনের জন্য, যে জীবিত আর মৃত মানুষের তফাত বুঝতে পারে না! এটা কি রোগ? নাকি কোনো অভিশাপ!

নিজের মৃত আত্মীয়স্বজনকে দেখতে-পাওয়া মানুষ আমি দেখেছি। মহাপুরুষ, গুরু বা মৃত পুষ্যিকেও দেখতে পায় এমন মানুষ পেয়েছি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবিত মানুষের ভিড়ে ঘুরে-বেড়ানো গত-হওয়া মানুষদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া... আর তা এতটাই জলজ্যান্ত আর স্বাভাবিকভাবে, যে আসল-নকলের তফাত না করতে পারা... এমন উদাহরণ আগে পাইনি। এ কি সত্যিই কোনো ব্যারাম? বলরামের মস্তিষ্কের ত্রুটি? নাকি, তারা সত্যিই আসে? সত্যিই তারা ঘুরে বেড়ায় ওর আশপাশে? এমনটাও কি সম্ভব? একজন

মনোরোগের ডাক্তার হয়ে আমি সত্যিই এসব ভাবছি? নিজেকে সামলে নিলাম... না না। এ হয় নাকি? বলরাম একজন অসুস্থ মানুষ। তাকে সুস্থ করে তোলা এই হাসপাতালের কর্তব্য। কিচ্ছু নেই। পঞ্চভূতের শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলে আর কেউ সেই অবয়বে ফিরে আসতে পারে না। এ অসম্ভব! সবটাই তার হ্যালুসিনেশন! সবটাই খোয়াব...

পরের তিন দিনে বলরামের অবস্থা আরও খারাপ হল। মেট্রনের ওরকম ব্যবহারের পর আমি আর বলরামের কাছে যাইনি। ড. ভাণ্ডারীকে বলায় উনিও দেখলাম, ব্যাপারটা নিয়ে মেট্রনকে কথা শোনালেন না। উলটে আমার সঙ্গে ছেলে ভুলোনোর মতো ব্যবহার করলেন, তা আমি ভালোই বুঝলাম। এতদিনে আমার এটাও খেয়াল হল যে আমায় এখানে নিতান্তই আরএমও গোছের বানিয়ে রেখে দিয়েছে, অর্থাৎ কোনো পেশেন্টেরই পুরোপুরি দায়িত্ব আমায় দেয়নি। আমার মনে খটকার পাহাড় জমা হতে লাগল। কী করে এরা রুগিদের সঙ্গে? এমন ঝিমঝিমে শ্যাওলা-ধরা হাসপাতালে, শহর থেকে দূরে, একগুচ্ছ অসুস্থ মানুষকে পুরে দিয়ে এরা কি কোনো অসামাজিক বা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? সুপার সাহেব, ড. ভাণ্ডারী, ওয়ার্ডবয়রা, মেট্রন... সকলে কি এই ষড়যন্ত্রের অঙ্গ? আজ অব্দি তো এখান থেকে কাউকে ঠিক হয়ে বেরোতে দেখিনি। কেন? এরা কি পাগল পুষে রাখে? অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর জন্য, নাকি... আরও ভয়ংকর, আরও নির্মম কোনো খেলা চলে রোজারিও অ্যাসাইলামের স্যাঁতসেঁতে চার দেয়ালের ভেতর।

এদের মধ্যে শুধু গণেশ একটু আলাদা, সে মনের কথা বলে, ভালো ব্যবহার করে, দু-দণ্ড পাশে এসে বসে... কিন্তু বুঝি, সে-ও আতঙ্কে থাকে। তার চোখ-মুখ বলে দেয়। কিছু একটা ঘটে চলেছে এখানে প্রতিনিয়ত। আমি গন্ধ পাই... প্রতি রন্ধ্র দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার চোখের সামনে পর্দা ফেলা রয়েছে... তার অন্তরালে যা ঘটছে তা আমায় জানতেই হবে। জানি না কীভাবে। কিন্তু এই চার দেয়ালের মধ্যে সবকিছু স্বাভাবিক আছে, তা হতেই পারে না।

শনিবার দুপুর থেকে মেঘ করল। ক্যান্টিনে একটা পুরোনো টেলিভিশন সেট আছে। সকাল থেকে সেখানে ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছিল। ঠিক সাড়ে চারটে নাগাদ মাথার ওপরের আকাশ রাতের মতো অন্ধকারে ছেয়ে দিয়ে উঠল তুমুল ঝড়! আমি তাড়াহুড়ো করে আমার ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করলাম। আজ রাজবংশিদের কী একটা পরব থাকায় বেশ কয়েকজন বাড়ি চলে গিয়েছে। হাসপাতালে স্টাফ এমনিতেই কম। আজ সকাল থেকেই হাসপাতাল ছিল আরও বেশি ফাঁকা।

ঝড় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামনের জমির লম্বা লম্বা ঘাস দুলে উঠে প্রচণ্ড হাওয়ায় শুয়ে পড়ল মাটির সঙ্গে। সামনের ব্যালকনিটা থেকে দূরের হাইওয়েটা দেখা যায়। হাওয়ার দমকে এমন ধুলো উড়ল যে ঘাসজমির পর সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকিদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে আমি দরজা-জানলাগুলি বন্ধ করে দোতলায় এসে দাঁড়াতেই থমকে গেলাম। প্যাসেজের শেষ মাথায় বলরামের ঘর। সেখান থেকে একটা অস্ফুট শব্দ আসছে। কান পাতলাম... ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে অন্য শব্দ কানে ঢোকা দুষ্কর, কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনতেই বুঝলাম সেটা ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। হল কী বলরামের? পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে... গিয়ে দাঁড়ালাম চৌকাঠের বাইরে। মেঝেতে বসে রয়েছে বলরাম। হাঁটু মুড়ে। তার মাথার ওপরে ঘরের বাল্‌বটা হাওয়ার দাপটে ডানদিক থেকে বাঁদিকে দুলে চলেছে। সেই সঙ্গে মেঝেতে বসা বলরামের ছায়াটাও ঘরের এই দেয়াল থেকে ওই দেয়াল নড়ে চলেছে।

''বলরাম...''

মৃদুস্বরে ডাকলাম আমি। সেই বিদঘুটে ক্রন্দনধ্বনি থামল। মুখ তুলল বলরাম। দেখি, তার দগদগে গোলাপি মুখ রক্তরাঙা হয়ে গেছে! গলার শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছে! তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু মুখে একটা অদ্ভুত ঠান্ডা পৈশাচিক শান্তির অভিব্যক্তি। যেন কোনো পাঁজর-ভাঙা যন্ত্রণা তাকে ভেতর থেকে নিংড়ে নিচ্ছে অথচ তার মুখ অব্দি সেই কষ্টের অভিব্যক্তি পৌঁছোচ্ছে না!

গলা শুকিয়ে গেল আমার! বলরাম তার ফ্যাকাশে ধূসর চোখ দুটো মেলে আমার দিকে চেয়ে আছে। যেন কেউ তার মেরুদণ্ডে এক অদৃশ্য ছুরি ঢুকিয়ে মোচড়াচ্ছে! চোখ দিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে জল, কিন্তু তার ঠোঁট দুবার কেঁপে থেমে গেল। যেন কথা বলতে গিয়েও শব্দ ভুলে গেল সে!

''এ কী! এ কী করেছ!?''

নীচের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম আমি। বলরামের দু-হাতের বুড়ো আঙুল বাদ দিয়ে বাকি আটটা আঙুলেরই নখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে থকথকে রক্ত জমে রয়েছে! আমি তুলে ধরলাম আঙুলগুলো... হাত দুটো কাঁপছে তার। কিন্তু তার কাচের মতো চোখ দুটো সে একবারও আমার মুখের থেকে সরায়নি। লাল হয়ে গিয়েছে তার চোখের সাদা অংশগুলি। গলার রগে যেন রক্ত উঠে এসেছে তার! ওপরে তাকিয়ে

দেখি. সেই দোদুল্যমান আলোয় সে ঘরের দেয়ালে নখ দিয়ে আঁচড় মেরে কিছু লিখতে চেয়েছে... নাকি আঁকতে চেয়েছে? নখের আঁচড় দেয়ালে এতটাই গভীর যে রক্ত-চামড়া পর্যন্ত উপড়ে দেয়ালে লেপটে রয়েছে।

"মেট্রন!" চিৎকার করলাম আমি। "বিনয়! বাসুদেব! শম্ভু!"

আমার চিৎকার করিডরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল আমার কাছে! কী হল? কেউ সাড়া দিল না কেন? সবাই গেল কই?

বেরিয়ে এলাম করিডরে... অন্ধকারে ঝিমঝিম করছে নিঝুম নির্জন করিডর... কেউ কোথাও নেই! দৌড়ে গিয়ে উকি মারলাম পাশের সেলগুলোয়... শূন্য... শূন্য... সব শূন্য! কোথায় গেল বাকি পেশেন্টরা? কোথায় সব ওয়ার্ডবয়? মেট্রন? সাফাইকর্মী... সবাই কি হঠাৎ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? করিডর, সিঁড়ির ল্যান্ডিং, বাথরুম, সেল... সব নিস্তব্ধ ফাঁকা! এই বিরাট ভুতুড়ে রোজারিও অ্যাসাইলামে শুধু আমি আর বলরাম!

অন্ধকার করিডরে তুফানের বাতাস যেন বুকফাটা কান্নার শব্দে গুমরে উঠল! আতঙ্কে বুকের ভেতরটা বরফ হয়ে গেল! আমি কোথায়? কোন মরণ-মায়াজাল আমায় বন্দি করে এই নারকীয় খোয়াবের নাগপাশে জড়িয়ে ফেলছে একটু একটু করে?

"গণেশ!" চিৎকার করলাম আমি।

হঠাৎ কান-ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। পলকে অন্ধকারে ডুবে গেল গোটা করিডর। থমকে গেলাম আমি! সেই গন্ধটা! উৎকট নাক জ্বালিয়ে-দেওয়া মানুষের প্রস্রাবের গন্ধ! কী ঘটছে অন্ধকারের ভেতরে ঘরের মধ্যে? কেউ একটা রয়েছে আমি আর বলরাম ছাড়াও!

"বলরাম!"

একটু থমকে আবার সেই দম-আটকানো কান্নার শব্দ কানে এল। হঠাৎ সেই মিশকালো অন্ধকারে কেউ আমার পা জড়িয়ে ধরল! ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি। জানলার জাফরি দিয়ে আসা বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, বলরাম আমার পা জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে! আমি নিচু হওয়ার আগেই বিদ্যুৎগতিতে কিছু একটা যেন বলরামের শরীরটাকে এক ঝটকায় অন্ধকারে টেনে নিল! আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম!

মুখ তুলতেই দেহ অবশ হয়ে গেল। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, শূন্যে প্রথমে বলরামের শরীরটা ধনুকের মতো উল্টোদিকে বেঁকে মুচড়ে গেল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে তার হাড় টুকরো হওয়ার শব্দ আর ককিয়ে ওঠার শব্দ কানে এল। তারপর পুরো শরীরটা যেন কেউ ধোপার কাপড় কাচার মতো আছাড় মারল কংক্রিটের দেয়ালে। মাথাটা ধাক্কা খেয়ে ঘাড় থেকে পেছনদিকে তুবড়ে গেল! তারপর, পেছনদিকে টেনে আবার আছাড়! খুলির হাড়গুলোর টুকরো হওয়ার শব্দ কানে যেতেই গড়িয়ে পড়লাম মেঝেতে... চোখে ছেয়ে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার...!

জ্ঞান ফিরতে কতক্ষণ সময় লাগল জানি না। চোখ খুলতেই বুঝলাম গায়ে নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। নাকে অক্সিজেনের নল, হাতে স্যালাইনের চ্যানেল। চোখ এদিক-ওদিকে ঘোরাতেই বুঝলাম এটা আমারই ঘর। আমি রোজারিওতেই রয়েছি। পরক্ষণেই আতঙ্কে বুক হিম হয়ে গেল! আমার শয্যার পাশে পর্দা টাঙানো। আর তার ওপারে... গলার স্বর। চেনা গলার স্বর! মেট্রন! নাহ্, তাহলে আমি একা নই রোজারিও অ্যাসাইলামে। পুরোটাই হয়তো দুঃস্বপ্ন ছিল। আমার দোতলার করিডরের শেষ ঘরটায় গেলেই হয়তো বলরামকে—

আমার ভাবনা থমকে গেল। কারণ পর্দার ওপারে বলরামের নাম আমার কানে এসেছে! তার সঙ্গে দুটো শব্দ 'অটোপ্সি' আর 'মার্ডার'! কান খাড়া করলাম। মেট্রনের কণ্ঠস্বর চেনা হলেও অপর কণ্ঠস্বরটা অচেনা। মেট্রন বলছেন, "...কাল রাতে স্টাফ এমনিতেই কম ছিল। লোডশেডিং হয়ে গেলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। আমরা আলো নিয়ে দোতলায় এসে দেখি এই কাণ্ড! আশপাশের পেশেন্টরা বলরাম বর্মার ঘর থেকে চিৎকার শুনে অন্ধকারে ভয়ে পেয়ে গিয়েছিল। আমরা এসে লণ্ঠনের আলোয় প্রথমে জয়ন্তকে পড়ে থাকতে দেখি, তারপর ঘরে ঢুকতেই দেখি, বলরাম ওরকম মাথা-থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।"

দ্বিতীয় পুরুষকণ্ঠ কানে এল এবার, সম্ভবত উনি ডাক্তার, তবে এই হাসপাতালের নয়। হয়তো আমার জন্য বিশেষভাবে কাউকে কল দেওয়া হয়েছে। "ভাগ্য ভালো, জয়ন্তবাবুর চোট গুরুতর নয়। শরীরের থেকেও আঘাতটা মনে বেশি। আমি ডক্টর ভাণ্ডারীর সঙ্গে কথা বলে নেব, উনি যদি রেগুলার কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে বলরামের মৃত্যুটা সত্যিই প্যাথেটিক অ্যান্ড ব্রুটাল!"

"এবং কাকতালীয়..." মেট্রন বললেন।

"আজ্ঞে?"

"স্যার, বলরাম বর্মা এখানে কোর্টের নির্দেশে এসেছিল। এর আগে স্পেশাল সংশোধনাগারে ছিল। সেখান থেকে

মনোবিকার। তারপর আইনের দ্বারস্থ... শেষে এখানে।"

"বলরাম জেলে ছিল? কী করেছিল সে?"

"খুন। একটা পুরোনো বাড়ি প্রোমোটিং সংক্রান্ত কারণে তার সঙ্গে সেই বাড়ির মালিকের দূর সম্পর্কের এক ভাগনের বচসা হয়। বলরাম তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছেলেটাকে কংক্রিটের চাঙড়ে মাথা থেঁতলে মারে। ওদের পাণ্ডা ললিত যাদব টাকার জোরে বেঁচে গেলেও জেলে যায় বলরাম। কাকতালীয়ভাবে যে ছেলেটিকে তারা মারে, সে এই হাসপাতালেরই স্টাফ ছিল। খুব ভালো ছেলে ছিল। সবসময় হাসিখুশি, মিশুকে... নাম গণপতি বিষয়ী। আমরা 'গণেশ' বলে ডাকতাম।"

নাকের নলটা দিয়ে যেন হঠাৎ অক্সিজেন আসা বন্ধ হয়ে গেছে! বুকের ভেতরটা যেন পলকে বরফ হয়ে গেল আমার! না না... এ নিশ্চয়ই অন্য কোনো গণেশ... নিশ্চয়ই... মাথা ঘুরতে লাগল আমার! বলরামের মরা মানুষ দেখতে পাওয়া! জ্যান্ত আর মরার তফাত না-বোঝা! সেদিন রাতে সে আমায় নয়, আমার পেছনে দাঁড়ানো গণেশকে দেখে ভয় পেয়েছিল! বলরাম কি তাহলে গণেশের হাতে—ওই গণেশ কি এইভাবে তার জিঘাংসা মেটাল?...

কিন্তু...

কিন্তু... বলরাম না হয় মৃতদের দেখতে পেত...

আমি কীভাবে গণেশকে...?

"এই কারণেই আমি জয়ন্তকে দূরে রাখতাম বলরামের থেকে।" মেট্রনের গলা শুনতে পেলাম আবার।

"কী কারণে?"

"দুজনেরই সিমিলার ট্রিগার! তফাত শুধু এইটুকুই যে জয়ন্ত ঘোষাল শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ছেলে। সাইকোলজির ছাত্র। কিন্তু তারপর হায়ার স্টাডিজ করতে করতে মাদকের নেশা... সেই থেকে কেমিক্যাল ইমব্যালেন্স... ম্যানিয়া... ডিলিউশন... ভুল দেখা, ভুল শোনা, সকলকে শত্রু মনে করা। নিজের দেড় বছরের ভাইঝিকে কুয়োয় ফেলে মেরে ফেলেছিল সে! তার বাড়ির লোক তাকে জেলে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু এখানে দিয়ে যায়। সে নিজেকে ডাক্তার ভাবে, বারবার রুগিদের ঘরে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করতে চায়! এখানে এসেই চারদিকে সে মরা গাছ দেখতে পেত, অথচ গোটা ক্যাম্পাসে একটাও মরা গাছ নেই! দুজনকেই ডক্টর ভাণ্ডারী দেখছিলেন। উনিই বলেছিলেন যেন এরা একে অপরের সঙ্গে না মেশে। বলরামের সঙ্গে তার সখ্য হতে শুরু হতেই আমি তাদের আলাদা করার চেষ্টা করি, কারণ একে অপরের সংস্পর্শে থাকলে দুজনের রোগ মাথাচাড়া দেবে। একে অপরের প্রতি ভায়োলেন্টও হতে যেতে পারত। আমার আশঙ্কা... কাল হয়তো তা-ই হয়েছিল! বলরাম হয়তো জয়ন্তরই হাতে—!"

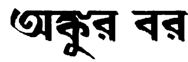
আমি নড়লাম না। পড়ে রইলাম একইভাবে। মাথার ওপরের পাখাটা কেমন যেন গতি হারাচ্ছে ধীরে ধীরে। আমি জানি, বাইরের ডাক্তার দেখে মেট্রন সব মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। এরা সবাই একে অপরের সঙ্গে মিলে রয়েছে। হয়তো আমায় কোনো ওষুধ খাইয়ে অবশ করে শুইয়ে রেখেছে এখানে। আর তলায় তলায় গোপনে করে চলেছে কোনো মারাত্মক ষড়যন্ত্র! এইসব আমায় আর বাইরের জগতের লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা! আমি জানি, কাল রাতে আমি যা দেখেছি তা আমার দুঃস্বপ্নমাত্র... সব খোয়াব... সব আমার মনগড়া... কারও কিচ্ছু হয়নি...

ওই তো জানলার বাইরে অন্ধকারে বলরাম দাঁড়িয়ে রয়েছে...

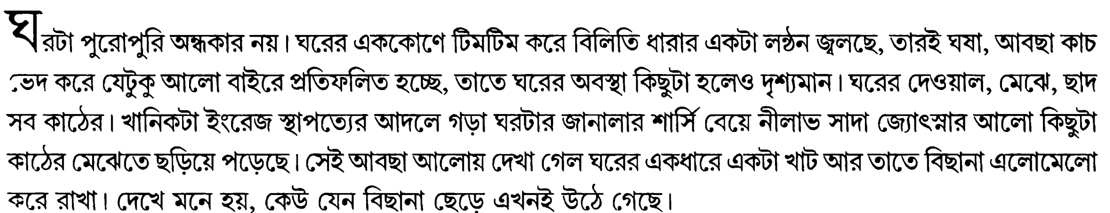




ঝাঁপ্পা







ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়। ঘরের এককোণে টিমটিম করে বিলিতি ধারার একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তারই ঘষা, আবছা কাচ ভেদ করে যেটুকু আলো বাইরে প্রতিফলিত হচ্ছে, তাতে ঘরের অবস্থা কিছুটা হলেও দৃশ্যমান। ঘরের দেওয়াল, মেঝে, ছাদ সব কাঠের। খানিকটা ইংরেজ স্থাপত্যের আদলে গড়া ঘরটার জানালার শার্সি বেয়ে নীলাভ সাদা জ্যোৎস্নার আলো কিছুটা কাঠের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আবছা আলোয় দেখা গেল ঘরের একধারে একটা খাট আর তাতে বিছানা এলোমেলো করে রাখা। দেখে মনে হয়, কেউ যেন বিছানা ছেড়ে এখনই উঠে গেছে।

এমন সময় ঘরের বাইরের কোথাও একটা ঘড়িতে ঢংঢং করে দুটোর ঘণ্টা বেজে উঠতেই হুড়মুড় করে ঘরের দরজা খুলে কেউ একজন ঘরের মধ্যে ঢুকল। তারপর সশব্দে দরজাটা লাগিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে প্রবলভাবে হাঁপাতে লাগল। আবছা আলোয় বোঝা গেল, যিনি ঢুকলেন, তিনি মহিলা। পরনের পোশাক সম্পূর্ণ এলোমেলো। চেহারায় বিধ্বস্ত ভাব। ঘামে ভিজে সপসপ করছে সারা শরীর। দেখে মনে হচ্ছে, কোনো কিছু দেখে এই মহিলা ভীষণ ভয় পেয়েছেন। সারা মুখের আতঙ্ক সেই কথাই প্রমাণ করছে। কিন্তু কী দেখে এত ভয় পেলেন এই মহিলা?

মহিলা একটু দম নিয়ে খুব ধীরে ধীরে প্রায় শব্দ না করে দরজার কাছ থেকে সরে এলেন। তারপর প্রায় আরও ধীরে ধীরে একপাশে রাখা পড়ার টেবিল থেকে লণ্ঠনটা তুলে দরজার সামনের কাঠের মেঝেতে নামিয়ে বিপরীতদিকের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে উবু হয়ে বসলেন। দু-হাত দিয়ে মুখটা এমনভাবে চেপে ধরলেন, যাতে হাঁপানির শব্দটুকুও ঘরের বাইরে না যায়। মুখের সামনে জ্বলতে-থাকা লণ্ঠনের আবছা আলো মেয়েটির ভয়-পাওয়া মুখের ওপর পড়ছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে,

মেয়েটি বিস্ফারিত নয়নে সেই বন্ধ দরজার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"খিকখিক..."

আচমকা বন্ধ দরজার বাইরে কারও হাসির শব্দ আর তারপরেই কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে কারও দৌড়ে পালানোর শব্দ। মেয়েটা আতঙ্কে আরও শিউরে উঠল। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে কেউ একজন হাসছে। কে হাসছে এত রাত্রে? মেয়েটাই বা এত ভয় পাচ্ছে কেন?

ক্যাঁচ!

ঘরের ভেতরে কেঠো আওয়াজটা ছড়িয়ে পড়তেই প্রবল আতঙ্কে ছিটকে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। বিস্ফারিত নয়নে সে দেখল, যে দরজাটা সে একটু আগে নিজের হাতে বন্ধ করেছিল, সেটা একটা বিশ্রী কলকবজার আওয়াজ করতে করতে আপনা থেকেই মুখের সামনে খুলে যাচ্ছে। দরজাটা পুরোপুরি খুলে গিয়ে একটা শীতল হাওয়ার স্রোত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই লণ্ঠনের জ্বলতে-থাকা ক্ষীণ বাতিটা ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল।

দরজার বাইরে একটা সরু করিডর। একটু আগেও দেওয়ালের গায়ে লণ্ঠনের আলো জ্বলছিল, কিন্তু সেখানে এখন ঘন অন্ধকার। আলোগুলো যেন নিভে গিয়েছে অদৃশ্য মন্ত্রবলে। ভেতর থেকে ভালো বোঝা যাচ্ছে না কে আছে দরজার বাইরে। ঠিক এমন সময় দরজার বাইরের অন্ধকার করিডরে আবার সেই খিলখিলে হাসি। আর তারপরেই অন্ধকারে কারও একটা দৌড়ে পালানোর শব্দ।

মেয়েটার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। সে এই মুহূর্তে এই ঘর ছেড়ে পালাতে চায়। কিন্তু কীভাবে পালাবে? ঘরের বাইরেই তো হাসিটা ওঁত পেতে আছে...

এসবই ভাবছে আর ঠিক তখনই অন্ধকার করিডোরের মধ্য দিয়ে কেউ যেন কিছু একটা ছুড়ে দিল মেয়েটির পায়ের কাছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় মেয়েটি অবাক চোখে দেখল, একটা কাগজের বল তার পায়ের কাছে পড়ে আছে আলগোছে।

মেয়েটি ভয়ার্ত চোখে আবার তাকাল অন্ধকারের দিকে। তারপর কোনরকমে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁপতে-থাকা হাতে লণ্ঠনের আলোয় কাগজের বলটা খুলে মেলে ধরতেই ঘাড়ের এক-একটা লোম আপনা থেকেই খাড়া হয়ে গেল শীতল আতঙ্কে।

ক্ষীণ হলদেটে আলোয় মেয়েটি দেখল, কেউ খুব কাঁচা হাতে লিখেছে তিনটে শব্দ—'দেখতে পেয়ে গিয়েছি!'

আর তারপরেই ঘরের ভেতর জ্বলতে-থাকা একমাত্র লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটাও দপ করে নিভে গেল। আতঙ্কিত মেয়েটা এক মুহূর্ত দেরি না করে পড়িমরি করে ছুটে গেল খোলা দরজার দিকে। এই দরজাটা এক্ষুনি বন্ধ করা দরকার। কিন্তু সে যেই ডান হাতটা বাড়িয়ে দরজাটা লাগাতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে কে যেন আটকে দিল দরজার পাল্লাটা। অন্ধকারেই আঁতকে উঠল মেয়েটা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানির মতো একটা আওয়াজ। কারণ আবছা আলোয় মেয়েটা ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে, দরজা আর চৌকাঠের অবশিষ্ট ফাঁক থেকে একটা কালো হাত ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে দরজার অবশিষ্ট ফাঁকটুকু বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে কই? কোনো এক আসুরিক শক্তি উলটোদিক থেকে কিছুতেই দরজাটা বন্ধ হতে দিচ্ছে না। ঠিক এমন সময়ই দরজার সেই অল্প ফাঁক থেকে সাপের মতো শীতল হিসহিসে স্বরে কেউ একজন বলে উঠল, 'ধা...প্পা!'

আর তারপরেই সেই বুকের রক্ত-জল-করা খিলখিলে হাসি। ব্যাস! তারপরেই মেয়েটির আর কিছুই মনে রইল না।

* * * * * * * *

আলোলিকা যেখানে বসে আছে এই মুহূর্তে, সেখান থেকে জানালার বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিগন্তবিস্তৃত ঢেউখেলানো উঁচুনিচু রুক্ষ ভূমি। রুক্ষ ভূমির মাঝেমধ্যেই নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে-থাকা পাথুরে শিলার। দু-একটা পলাশ গাছ সেই ঢেউখেলানো রুক্ষ ভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, তবে তার ছায়া প্রায় না-থাকার মতোই। বেশির ভাগই গুল্মজাতীয় ঝোপঝাড়। তাদের পাতাও শুকিয়ে রুক্ষ খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছে। সময়টা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাই জানালার বাইরের রোদের ওমটা এখন বোঝা যাচ্ছে না, তবে গরমকালে যে বেশ ঝক্কি পোহাতে হবে এখানে, সেটা সে বেশ বুঝতে পেরেছে। খাতায়-কলমে জায়গাটার নাম হুরা। একেবারে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে। দিগন্তরেখার ওপারে দূরের একটা নীলচে উঁচু পাহাড়ের রেখা চোখে পড়ছে এখানে বসেই, ওটাই কি সাগেন পাহাড়? কে জানে?

আচমকা জানালার বাইরে কী একটা চোখে পড়তেই সোজা হয়ে বসল আলোলিকা।

রুক্ষ জমির বুক চিরে ক্রমশ দিগন্তে মিশে গিয়েছে একটা লাল মোরামের রাস্তা। এখন সেই রাস্তার লাল মোরামের ধুলো উড়িয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে একখানা গাড়ি। এই গাড়িই একটু আগে তাকে এখানে নামিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে

প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল, এখানেই সে অপেক্ষা করছে। মাঝে একজন লোক, দেখে স্থানীয় বলেই মনে হল, এসে এক কাপ চা রেখে গিয়েছে বটে, কিন্তু তারপর থেকে সে একলাই বসে রয়েছে এখানে। আবার কেউ আসছে নাকি?

আলোলিকা চোখ সরিয়ে ঘরের চারপাশে তাকাল। আপাদমস্তক কাঠের তৈরি এই কামরাটি, খানিকটা অফিস কেবিনের গোছে সাজানো। ভারী ভারী কাঠের তৈরি চেয়ার-টেবিল, কাচ-লাগানো আলমারি গৃহকর্তার আভিজাত্যের নিদর্শন বহন করলেও সামনের টেবিলের একপাশে ডাঁই হয়ে-থাকা কাগজপত্র ও বইয়ের তাকে ঈষৎ ধুলোর আস্তরণ অযত্নের সাক্ষ্যও বহন করে একই সঙ্গে। আলোলিকা গায়ের শালটা ভালো করে জড়াতেই দেখল, এই কামরারই মেঝের ওপর একপাশে একটা টিনের রংচটা তোরঙ আর একটা কাপড়ের ব্যাগ রাখা আছে। এই দুটো তার সামগ্রী। কাপড়ের ব্যাগে তার পরিধানের পোশাক রয়েছে কিছু। আর টিনের তোরঙে তার বইপত্রসহ আরও টুকটাক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস। গাড়োয়ান কখন যে এগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে এখানে রেখে গিয়েছিল, সে খেয়াল করেনি।

আলোলিকার পুরো নাম আলোলিকা রায়। দেশের বাড়ি কৃষ্ণনগর। ছোটোবেলা থেকেই পিতৃহীনা আলোলিকা কষ্টে মানুষ। মা কোনোরকমে সেলাইয়ের কাজ করে সংসার আর আলোলিকার পড়া—দুটোই টিকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু বছরখানেক আগে আচমকা রাতে বুকের ব্যথায় তিনিও গত হন। তারপর থেকে অনাথ আলোলিকা পড়ে অকূল পাথারে। অনেক চেষ্টা করে দু-একটা টিউশনি জোগাড় করে কোনোরকমে জোড়াতাপ্পি মেরে জীবন অতিবাহিত হলেও সে খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারে, বেঁচে থাকতে গেলে তাকে একটা কাজ যেনতেনপ্রকারেণ জোগাড় করতে হবে। কিন্তু বললেই তো আর কাজ জোগাড় হয় না। একেই কৃষ্ণনগরে এসবের সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া এই বয়সি মেয়ে বিয়ে না করে কাজ খুঁজছে হন্যে হয়ে, সেটা যে অনেকেই ভালো চোখে দেখছে না, সেটা একাধিকবার টের পেয়েছে আলোলিকা।

আসলে মাথার ওপর যতদিন মা ছিল, ততদিন মা-ই পুরো ব্যাপারটা সামলাত, কিন্তু আচমকা সেই ছাতাটা সরে যাওয়ায় বাস্তবতার চড়া রোদ যেন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে চাইছে। তারপরেও কয়েকদিন সে চেষ্টা করেছে কিছু বাড়িতে আয়ার কাজ করতে, কিন্তু সেখানেও খুব একটা যে সফল হতে পেরেছে তা নয়। ঠিক এমনই এক অর্থকষ্ট আর মানসিক বিচলতায় সে যখন জর্জরিত, ঠিক সেই সময় তার চোখে পড়ে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন।

'পুরুলিয়া জেলার হুরা হইতে আরও পূর্বদিকে ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে প্রায় বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সীমান্তের কাছাকাছি মনোরম, নির্জন পরিবেশে একটি অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের দেখভাল আর পড়াশুনার দায়িত্ব নিতে পারবে এমন একজন পিছুটানহীন শিক্ষিকা কাম কেয়ারটেকার আশু প্রয়োজন। যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল, আন্তরিকতার সঙ্গে অনাথ বাচ্চাদের দেখাশোনা করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার প্রাপ্য। বেতন আকর্ষণীয় না হলেও খারাপ নয়। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে।'

বিজ্ঞাপন দেখে কালব্যয় করেনি আলোলিকা। সঙ্গে সঙ্গে চাকরির আবেদন করে চিঠি দিয়েছিল উক্ত ঠিকানায়। উত্তরও পেয়েছিল মাসখানেকের মধ্যেই। চাকরিটা তার হয়েছে। আলোলিকা খুব একটা আশাবাদী ছিল না চাকরিটা পাওয়া নিয়ে। রেজাল্ট যে তার খুব একটা ভালো তা-ও নয়। তার ওপর সে খুব একটা বাচ্চাদের পছন্দও করে না। সামান্য কয়েকটা টিউশনিতেই তার বিরক্তি চরমে উঠত। সেখানে এই ধরনের একটা জায়গায়, দিনরাত অতগুলো বাচ্চার সঙ্গে থাকতে হবে ভেবেই যে তার অনীহা জন্মায়নি তা কিন্তু নয়। কিন্তু ওই যে কথায় আছে না, পেটের দায় বড়ো দায়।

এক বছর আগে হলে সে এই চাকরিতে আবেদনটুকু করত কি না তা-ও বড়ো প্রশ্ন ছিল। কিন্তু এই এক বছরে খিদে, অভাব আর সমাজের ক্লেদ-মাখা সবচেয়ে ঘৃণ্যতম নগ্নরূপ সে দেখে ফেলেছে। তাই আবেদনের সময় সে বাচ্চাদের প্রতি কতটা সহনশীল, স্নেহশীল আর বাচ্চা প্রতিপালনে যে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে তা বাড়িয়ে, রং চড়িয়ে লিখতে ভোলেনি। সে বুঝেছিল, এই চাকরিটা তাকে যে-কোনো মূল্যেই হোক পেতেই হবে। কৃষ্ণনগরে এমনিতেও তার জন্য অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। তাই শিকড়ের টান কাটাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

চিঠিতেই তার হুরা আসার টিকিট পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলা ছিল, আদ্রা স্টেশনের বাইরে তার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করবে। আদ্রা থেকে হুরা প্রায় বাইশ কিলোমিটার পথ, তারপর হুরা ছাড়িয়ে আরও পনেরো কিলোমিটার। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আলোলিকা যথেষ্ট বিধ্বস্ত, কিন্তু সেটা জাহির করা চলবে না। বরং ঠোঁটের কোলে একটা মেকি হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে এখানে আসা থেকেই। এখন এই জনমানবহীন কক্ষেও সেই মেকি প্রসন্ন ভাব ধরে রেখেছে সে।

একটা ভারী পায়ের শব্দে চমক ভাঙল আলোলিকার। ঘরের

দরজায় দেখা গেল একজন মহিলাকে। লম্বা রোগা শীর্ণ চেহারার বৃদ্ধার মুখটা বেশ লম্বা। তীক্ষ্ণ নাকের পাশে একটা বড়ো কালো আঁচিল। চোখে বাদামি ফ্রেমের মোটা চশমা। পরনে হালকা রঙের সুতির শাড়ির ওপর সাদা রঙের ফুলহাতা সোয়েটার। মাথায় কান-ঢাকা একটা সাদা-কালো ছাপের রুমালের আড়াল থেকে বেরিয়ে-আসা কাঁচাপাকা চুল জানান দিচ্ছে মহিলার যৌবন বিগতপ্রায়।

"আলোলিকা রায়?"

মহিলার্টির চেহারা ক্ষয়িষ্ণু হলেও হাবেভাবে বেশ একটা নেতৃত্বের ব্যাপার রয়েছে।

আলোলিকা নমস্কার করে উঠে দাঁড়ানোর সময় খেয়াল করল মহিলার স্বরটা একটু অন্যরকম। খানিকটা কাঠের ওপর শিরীষ কাগজ ঘষলে যেমন শব্দ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই। মহিলা হাতের ইশারায় তাকে বসতে বললেন।

"আমার নাম মালা সাঁতরা। আপাতত এই সারদামণি অনাথ আশ্রমের কাজকর্ম আমিই দেখি। তা, নিশ্চয়ই ক্লান্ত আছেন এতটা পথ জার্নি করে?" মহিলার প্রশ্নের উত্তরে আলোলিকা কিছু বলতে যাবে, তার আগেই মহিলা ফের বলে উঠলেন, "হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতটা পথ। আপনাকে বেশিক্ষণ বসাব না, তবে কিছু দরকারি কথা বলে দিই।"

মহিলা চশমার ওপর থেকে তাকালেন আলোলিকার মুখের দিকে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বলে উঠলেন, "আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন এরকম প্রত্যন্ত এলাকায় হঠাৎ জেগে-ওঠা এই পেল্লায় সাইজের বাড়ি দেখে। আসলে এই বাড়িটা আগে ছিল এক ব্রিটিশ অফিসারের। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও কিছু অফিসার এ দেশেই থেকে যান এ দেশকে ভালোবেসে। এ সাহেব ছিলেন তাঁদেরই মতো একজন। গরমকালে এসব অঞ্চলে থাকা যায় না, কিন্তু শীত আর বসন্তকালে প্রকৃতি এখানে বেশ মনোরম। ভদ্রলোক মূলত ছুটি কাটানোর জন্য বাড়িটা বানালেও, পরের দিকে সস্ত্রীক তাঁরা এখানেই বসবাস করতে শুরু করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে সাহেব একটা সময় পরে মারা গেলে, সাহেবের স্ত্রী তার পরেও দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন।

"একটা সময় তিনি টের পেলেন, এই অঞ্চলে সন্তান হতে গিয়ে বহু মহিলা মারা যেত সঠিক চিকিৎসার অভাবে। তখন তাদের পরিবার সেই বাচ্চাটিকে অপয়া বলে গ্রহণ করত না, বাচ্চা হয়ে যেত অনাথ। এসব দেখেই আর সময় কাটানোর জন্য তিনি এই বিরাট বাড়িটাকে অনাথ আশ্রম হিসেবে গড়ে তোলেন। মহিলা খ্রিস্টান হলেও শেষ বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখনও ওঁর তৈরি ট্রাস্ট থেকেই অনাথ আশ্রমের খরচ মেটানো হয়। আপনার কিছু জানবার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।" শেষের কথাটা আলোলিকাকে উদ্দেশ করে।

"এখন কজন বাচ্চা আছে এখানে?"

"ছয়জন। দুজন ছেলে, চারজন মেয়ে। ওই সাত থেকে বারোর মধ্যেই সকলের বয়স। সবার দেখাশোনার দায়িত্ব কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে।"

"এখানে আর কে থাকে?"

"কেউ না।"

চমকে অবাক চোখে তাকাল আলোলিকা। "কেউ না?"

"না, কেউ থাকে না। পাশের গ্রাম থেকে একটা ছেলে আসে। নাম রাজেন মান্ডি। সারাদিন সে-ই থাকে। বাগান কোপানো, চারিদিক পরিষ্কার রাখা, ঘর গোছানো, রান্না—সব সে-ই দেখে। তবে সে সারাদিন থাকলেও রাতের বেলা থাকে না।"

কথাটা বলে কয়েক মুহূর্ত থামলেন মহিলা, তারপর অদ্ভুত স্বরটা আরও রহস্যময় করে বলে উঠলেন, "আসুন আমার সঙ্গে।" কথাটা বলেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, আর আলোলিকা তার পিছু নিল।

"দেখুন, আপনাকে কিছুই লুকোব না। আমাদের বাচ্চারা যথেষ্ট বুঝদার, আর ভীষণ সাহসীও। ওদের দেখাশোনার জন্য সত্যি আমাদের কাউকে নিয়োগ করার দরকার ছিল না। সারাদিন রাজেন থাকে। আর রাতের বেলা দরজা বাইরে থেকে লাগিয়ে রাজেন চলে যায়। আমি কোনো দরকার পড়লে বা সপ্তাহে একদিন আসি। তাতেই কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, দিনকাল যা পড়েছে, তাতে ওই ট্রাস্টের টাকায় খরচ কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আমরা সরকারের কাছে অনুদানের আবেদন করি। ওরা জানায়, এই আবেদনের ফলে ওরা ইন্সপেকশনে আসবে। অনাথ আশ্রমের পরিকাঠামো ঠিকঠাক আছে কি না খতিয়ে দেখবে। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তবেই আমাদের অনুদান মঞ্জুর হবে।

"এবার এমন একটা অনাথ আশ্রমকে সরকার কেন দেখবে, যাতে বাচ্চাদের সারাদিন, সারারাত দেখাশোনার কেউ নেই। বরং এটা জানতে পারলে আমাদের অনাথ আশ্রম সিল হয়ে পারে। তাই তড়িঘড়ি আপনাকে নিয়োগ করা হল। এবার দেখুন, আমারও বয়স হচ্ছে। আর আশ্রমের মেয়েরাও ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। অনেকদিন ধরে আমার ভাবনাতেই ছিল যে কাউকে রিক্রুট করতেই হবে। কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি

করতে হবে ভাবিনি। এর আগেও একজন এসেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে উনি কাজটা ছেড়ে দেন। আপনি আপনার কাজটা ঠিকঠাক পালন করলে রয়ে যাবেন এখানেই। আশা করি, পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছেন।"

অফিস থেকে বেরিয়ে ডানদিকে এগোতেই একটা বড়ো ড্রয়িং রুম। চামড়ার গদি-দেওয়া সোফা, মাথার ওপর ঝাড়বাতি, সুন্দর আসবাব সব ব্রিটিশ আমলের নিদর্শন বহন করছে। ড্রয়িং রুমের একপাশের একটা কাঠের রেলিং-দেওয়া সাহেবি কায়দার চওড়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গিয়েছে।

আলোলিকা মহিলার পিছুপিছু দোতলায় উঠে আসতেই দেখতে পেল, প্যাঁচানো সিঁড়িটা এসে মিশেছে একটা চওড়া বারান্দার মুখে। বারান্দার একপাশে কাঠের রেলিং দেওয়া। রেলিং-এর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেই একতলার ড্রয়িং রুমটা ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। রেলিং-এর উলটোদিকে দোতলার সেই বারান্দার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একাধিক ঘর।

"বাচ্চাদের সঙ্গে আপনার পরিচয়টা হয়ে যাওয়া দরকার।"

কথাটা বলেই মালাদেবী দেওয়ালে ঝুলতে-থাকা একটা ছোটো ঘণ্টি ধরে নাড়া দিতেই দোতলার বারান্দা জুড়ে টুংটাং করে একটা মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে পড়ল।

"রাতের বেলা কোনো দরকার পড়লে অনেক সময় ওরা এই ঘণ্টিটা বাজায়। এটা খেয়াল রাখবেন।" কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। আর তারপরেই শোনা গেল দরজা খোলার শব্দ। পরপর তিনটে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ছয়জন ছেলেমেয়ে। তারা মহিলাকে দেখতে পেয়েই কোনো শব্দ না করে বারান্দার একপাশে পরপর লাইন দিয়ে দাঁড়াল।

মহিলাটি গলা খাঁকরিয়ে বাচ্চাদের উদ্দেশে বলে উঠলেন, "এই হল তোমাদের নতুনদিদি। উনি আজ থেকে তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। কেমন?"

"রাতেও?" দলের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে বড়ো, সে অবাক গলায় প্রশ্নটা করতেই মালাদেবী মাথা নাড়ালেন।

"হ্যাঁ, রাতেও। সবসময় উনি যা বলবেন তা-ই করবে। সবসময় দিদির কথা মেনে চলবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিদিকে বিরক্ত করবে না।"

আলোলিকা বুঝতে পারল না মহিলা বাচ্চাদেরকে তার পরিচয় দিলেন নাকি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ দিলেন।

"ও হল মিলি, ওর পাশে রত্না, আর ও হল শ্যামা।" মালাদেবী তিনটে মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, "ওরা এক ঘরে থাকে। ওদের পাশে সঞ্জয় আর বিমল। ওরা এক ঘরে থাকে।" কথাটা শেষ করেই তিনি একটি বাচ্চা মেয়ের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ও হল রিমি। ও ওই ডানদিকের ছোটো ঘরে থাকে।"

"একলা?"

"হ্যাঁ।"

আলো এগিয়ে এল সব থেকে ছোটো মেয়েটির একেবারে কাছে।

"বাহ্, তুমি তো খুব সাহসী। একলা একলা থাকো?" কথা বলতে বলতেই আলোলিকার হঠাৎ করে মনে পড়ল, ভ্যানিটি ব্যাগে একটা না-খাওয়া চিপসের প্যাকেট পড়ে আছে। ট্রেনে কিনেছিল খাবে বলে, তারপর আর খাওয়া হয়নি।

আলোলিকা ব্যাগ হাতড়ে চিপসের প্যাকেটটা মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে বলল, "এই নাও। এটা তোমার। তুমি ভীষণ সাহসী। এটা তোমার সাহসিকতার পুরস্কা..."

কথাটা শেষ করবার আগেই আলোলিকা টের পেল, রিমি বলে মেয়েটি আচমকা তার মুখের থেকে চোখ সরিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তারই মাথার পেছনে তাকিয়ে আছে। আলোলিকা অবাক।

"রিমি...?" মেয়েটি একবার আলোলিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার তার মাথার পেছনদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কী দেখছে মেয়েটা আলোলিকার পেছনে? কী দেখে এত ভয় পাচ্ছে...? আলোলিকা কৌতূহলে ভর করে পেছনদিকে তাকাতেই দেখতে পেল, ওর পেছনদিকটা একটু আবছা অন্ধকার মতো, আর সেখানেই রয়েছে একটা কালো কাঠের দরজা। এতক্ষণ সে দরজাটা খেয়ালই করেনি। কিন্তু এ কী? দরজার বাইরে তালা ঝুলছে কেন? আর মেয়েটিই বা দরজার দিকে তাকিয়ে কী দেখে ভয় পাচ্ছে?

"কী হয়েছে, রিমি? নাও..."

আলোলিকা আবার বলল, কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই চোখ সরাচ্ছে না পেছনের দরজা থেকে। চোখে-মুখে সেই অদ্ভুত আতঙ্ক।

"মিস রায়, ওটা আপনি রেখে দিন। এই অনাথ আশ্রমে এইভাবে একজনকে কিছু দেওয়া উচিত নয়। তাতে বাকি বাচ্চাদের মনে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। আপনি বরং পরে সকলের জন্য কিছু নিয়ে আসবেন।" মহিলা কথাটা আলোলিকাকে বলেই বাচ্চাদের দিকে ফিরলেন, "যাও, তোমরা ঘরে যাও।"

তার নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে ফের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

"আপনি আসুন। আপনাকে নীচের তলায় আপনার রুমটা

দেখিয়ে দিই। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন। বেলা একটায় বাচ্চাদের খাবার দেওয়া হয়। আপনি আজ ওদের সঙ্গেই বসে খাবেন।” কথাটা বলেই মালাদেবী সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

“ম্যাডাম, ওই দরজাটা বন্ধ কেন?”

আলোলিকার প্রশ্ন শুনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন মালাদেবী। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, “এমনিই।”

* * * * * * * *

রাত বাড়লে পাথুরে জায়গায় ঠান্ডা বাড়ে, সেটা আলোলিকা জানে, কিন্তু তা-ই বলে এত? জানালা-দরজা বন্ধ, এতগুলো বিলিতি লণ্ঠনের আগুনের আলো, আর সোয়েটার পরেও সে ঠকঠক করে কাঁপছে।

ঘড়িতে একটু আগেই দশটার ঘণ্টা পড়েছে। বাচ্চাদের খাওয়া ন-টার আগেই শেষ হয়েছে। তারা সব খাওয়াদাওয়া সেরে যে যার ঘরে চলে গিয়েছে। আলোলিকা খাওয়ার টেবিলটা পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে গুটিশুটি মেরে মাত্র বসেছে ড্রয়িং রুমের সোফায়। চারিদিক বড়োই নিস্তব্ধ, শুধু মাঠের বয়ে-চলা হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস জানালার কাচের শার্সিগুলো নাড়িয়ে দিচ্ছে ঠকঠক শব্দে।

রাজেন মান্ডি খাবারটা আহামরি না বানালেও মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায়। হয়তো ভালো বানাতে পারত, যদি সময় দিত। কিন্তু সূর্য ডুবলেই যা তড়িঘড়ি করে লোকটা। যেন জায়গাটা ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচে।

লোকটা কথাও বলে ভীষণ কম। শুধু কি লোকটা? গাড়োয়ান থেকে শুরু করে বাচ্চাগুলো পর্যন্ত এত কম কথা বলে যে কয়েক ঘণ্টাতেই হাঁপিয়ে উঠছে আলোলিকা। আজ পর্যন্ত এতগুলো বাচ্চাকে সে কখনও দেখেনি এরকম চুপচাপ থাকতে। কে জানে এদের কী ব্যাপার। অবশ্য তার এত কিছু না ভাবলেও চলবে। মোটামুটি এই চাকরিটাকে তাকে পাকা করতেই হবে। যে করেই হোক...

শুধু বাচ্চাদের একটু দেখাশোনা করে যদি এমন আয়েশের জীবন যাপন করা যায় তাহলে সে কেন এই সুযোগ ছাড়বে?

ঠিক এমন সময় একটু হাই উঠতেই আলোলিকা ঘাড় ঘুরিয়ে ডানদিকের সরু করিডোরের দিকে তাকাল। ওই করিডোরের শেষ মাথায় তার রুমখানা। সে এখান থেকে দেখল, দরজাটা আধভেজা হয়ে আছে। নরম তুলতুলে গদিখানা আর গরম কম্বলের কথা মনে হতেই তার দু-চোখের পাতায় তন্দ্রা যেন আরও গভীরভাবে নেমে এল।

টি টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সোফাতে বসেও সেই লণ্ঠনের আগুনের ওম টের পাচ্ছে আলোলিকা। আর দেরি না করে আলোলিকা উঠে দাঁড়াল। শহরে বিদ্যুৎবাতি চলে এলেও এই প্রত্যন্ত জায়গায় কবে আসবে, তার ঠিক নেই। এখানে সূর্য ডুবলে এই কেরোসিনের বাতি, আগুনের আলোই ভরসা। ঠিক আছে। নিজের মনকে প্রবোধ দিল আলোলিকা। টাকা রোজগারের জন্য এইগুলো ও নির্দ্বিধায় মানিয়ে নিতে পারবে।

পরনের শালটা গায়ে ভালো করে পেঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল আলোলিকা। মালা ম্যাডাম যাওয়ার বলে গেছেন, রাত্রে ঘুমোনোর আগে সে যেন বাচ্চাদের একবার গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দোতলাটা আবছা অন্ধকার। বাঁদিকে বাচ্চাদের পরপর ঘরগুলো। ডানদিকে সেই তালাবন্ধ কামরাটা। কিন্তু দোতলায় উঠে ডানদিকে নজর পড়তেই এক মুহূর্তে তার মনে হল তালাবন্ধ দরজাটা হাট করে খোলা। আর ঘরের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ কচলে আরেকবার দেখল। নাহ্! ওই তো তালা ঝুলছে দরজার হাতলে। তাহলে? চোখের ভুল? হতেও পারে। যা ঘুম এসেছে...

বাকি দুটো ঘর দেখে আলোলিকা এগিয়ে গেল রিমির ঘরের দিকে। দরজার নীচ থেকে আগুনের আভার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা জেগে আছে তার মানে? তারপরই কী একটা শুনে চমকে উঠল আলোলিকা। এ কী? জোড়া গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না ভেতর থেকে? সকলে তো ঘুমোচ্ছে? কে আছে রিমির ঘরে?

দরজায় কান পাতল আলোলিকা।

রিমির গলা, “নাহ্... আমি তো নিইনি। তুমি তো দেখলে...”

তারপরেই কেমন একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ। ঠিক গলায় কফ জমলে আমরা যেভাবে ঝেড়ে ফেলি।

আবার রিমির গলা, “আমার ঘুম পাচ্ছে। আজ খেলব না।”

আবার সেই ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। কী বলছে, কিছুই বুঝতে পারছে না আলোলিকা।

“ওরা খেলুক। আমি... আমি খেলব না।”

আলোলিকা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দরজা ধাক্কা দিল। ঘরের মধ্যে আচমকা তাকে ঢুকতে দেখেই চমকে উঠল বাচ্চা মেয়েটা। ঘরটা ছোটো। আসবাবও খুব একটা বেশি নেই। একটা ছোটো খাট। একদিকে একটা টেবিল-চেয়ার। তার ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে খুব মৃদুভাবে। আর পায়ের দিকে একটা

পাল্লা-ভাঙা আলমারি। কিন্তু এ কী? ঘরের মধ্যে তো আর কেউ নেই? রিমি কার সঙ্গে কথা বলছিল তাহলে? জিজ্ঞেস করবে মেয়েটাকে? আলোলিকা মেয়েটার গলায় স্পষ্ট ভয় টের পেয়েছে। প্রশ্ন করা কি ঠিক হবে? এখন প্রশ্ন করলে যদি আরও ভয় পেয়ে যায়? না থাক!

"এখনও জেগে আছ রিমি?"

মেয়েটা একটা ঢোঁক গিলে বলল, "ঘুম আসছে না।"

"জল খাবে?" আলোলিকার প্রশ্নে মেয়েটা মাথা নাড়াল। নাহ্। খাবে না।

"আলোটা নিভিয়ে দিই।"

"আমি অন্ধকারে ঘুমোতে পারি না।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে। তাহলে দরজাটা খোলা থাক অল্প। ঘুমিয়ে পড়ো। কোনো দরকার পড়লে আমায় ডেকো। আমি নীচে থাকব!"

"দিদি..."

"কিছু বলবে?" ঘুরে দাঁড়াল আলোলিকা।

"তুমি না খুব ভালো।"

"তা-ই?" মেয়েটার মিষ্টি কথায় আলোলিকার মুখে হাসি ফুটল।

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তো নতুন, তাই জানো না। এখানে কেউ রাতে আমরা রুমের বাইরে বের হই না। তুমিও বেরিয়ো না।"

"এরকম বলছ কেন?" কথাটা জিজ্ঞেস করতে করতে রিমির বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল আলোলিকা।

রিমি ঢোঁক গিলে খুব ফিসফিস করে বলে উঠল, "ও তাহলে তোমায় খেলতে নিয়ে নেবে..."

"ও?" আলোলিকা টের পাচ্ছে, রিমি কথা বলতে গিয়ে ভয় পাচ্ছে, "ও কে?"

"ওই যে।" আরও সরু হয়ে উঠল রিমির গলার আওয়াজ, "তোমার পেছনে যে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখছে... ও।"

চমকে সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরল আলোলিকা। কই? কেউ নেই তো। উফ। এই মেয়েটা না। আলোলিকা বুঝল, রিমি তাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে।

"ঠিক আছে। বেরোব না ঘর থেকে। এবার ঘুমোও।"

আলোলিকা মুচকি হেসে ঘরের বাইরে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে যেই পিছন ঘুরেছে, অমনি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার চমকে উঠল আলোলিকা। ভারী অদ্ভুত তো মেয়েটা।

* * * * * * * *

রাত্রি ক-টা হবে?

বোধ করি একটা। আচমকা কাঠের মেঝেতে মচমচ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আলোলিকার।

ঘরটা অন্ধকার। এককোণে কোনোরকমে নিবুনিবু হয়ে জ্বলছে লণ্ঠনটা। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরোপুরি হয়তো নিভে যাবে।

আবার সেই মচমচ শব্দ। কেউ পা টিপে টিপে কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়, এ-ও তেমনই। বিছানায় উঠে বসল সে। এমনিতেও নতুন জায়গা, নতুন বিছানা। সারাদিনের ক্লান্তি থাকলেও ঘুম আসতে খানিকটা দেরিই হচ্ছিল আলোলিকার। অনেক পরে যদিও ঘুম ধরল, কিন্তু এই মচমচ শব্দে আবার ঘুমটা ভেঙে গেল।

শব্দটা আসছে দোতলার কাঠের মেঝে থেকে। মাথার ওপরে কেউ হাঁটছে। কিন্তু কে?

ঠিক এমন সময় দুমদুম করে একটা আওয়াজ ডানদিক থেকে বামদিক বরাবর মিলিয়ে গেল। মনে হল, কেউ যেন ছুটে গেল। এত রাত্রে কে এমন ছোটাছুটি করছে?

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল আলোলিকা। বাচ্চারা ঘুমোয়নি এখনও। আর এত রাত্রে ছোটাছুটিই বা করছে কেন?

গায়ে শালটা জড়িয়ে লণ্ঠনটা তুলে নিতেই এবার নীচের তলায় কারও ছোটাছুটির আওয়াজ পাওয়া গেল। আশ্চর্য! এত রাতে... এসব কী?

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলতেই একটা ঠান্ডা হাওয়া ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল আলোলিকাকে। দরজার বাইরেই একটা সরু করিডোর ড্রয়িং রুমে গিয়ে শেষ হয়েছে। সন্ধে থেকে ড্রয়িং রুম আর করিডোরে আলো জ্বলে। কিন্তু সেই আলো নিভে এখন জায়গাটা পুরোটাই অন্ধকার। আলোলিকার হাতের লণ্ঠনের আলো কিছুটা পড়েছে করিডোরের মধ্যে। ঠিক এমন সময় আলোলিকার মনে হল, অন্ধকার ড্রয়িং রুমে কেউ যেন ছুটে চলে গেল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু একটা অবয়ব সরে গেল যেন।

"কে? কে আছ?"

কোনো সাড়া নেই। বদলে কেউ একজন খিলখিলে হাসি হাসল অন্ধকারেই।

ভারী বিরক্ত হল আলোলিকা। ছেলেমেয়েরা এত রাত্রে এই অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে? কোথায় একটু রাত্রিবেলা শান্তিতে ঘুমোবে তা নয়।

অন্ধকার ড্রয়িং রুমে দাঁড়াতেই বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁত করে উঠল। এখানে দাঁড়ালে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে বাইরে শনশন

করে বয়ে-চলা হাওয়ার শব্দ। আলোলিকা লণ্ঠনটা বাড়িয়ে ড্রয়িং রুমের চারিদিকটা ভালো করে দেখল। অন্ধকার ড্রয়িং রুমে কেউ নেই সে ছাড়া। কিন্তু সে স্পষ্ট শুনেছে কাউকে ছোটাছুটি করতে। আলোলিকা পুরো ড্রয়িং রুমটা আবার ভালো করে খুঁজল। ওরা কি আলোলিকার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে? উফ! দেখে তো মালুম হয়নি এরা এত দুষ্টু। সোফার পেছন, পর্দার আড়াল—সব খুঁজল। নাহ্। কোথাও কেউ নেই। তবে? তবে কি ও ভুল দেখল? এতটা ভুল?

"খিকখিক!"

আচমকা হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠল আলোলিকা। কিন্তু ভাবনার সময় পেল না। কেউ একজন অন্ধকার সিঁড়ির উঁচু ধাপগুলো দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ওপরে উঠে গেল। সে যা ভেবেছিল তা-ই। এরা রাতের আঁধারে তার সঙ্গে মজা করছে।

এক হাতে লণ্ঠন ধরে দ্রুতপায়ে ওপরে উঠতে লাগল আলোলিকা। রাতবিরেতে এসব মজা তার একদম পছন্দ নয়। এমনিতেই এসব বাচ্চার ঝামেলা তার একদম ভালো লাগে না। নেহাত পেটের দায় তাই এই চাকরি করা। ভেবেছিল, খুব দরকার না পড়লে কাউকে বকাবকি করবে না। এখন দেখছে, এসব না করলেই চলবে না। এসবই ভাবতে ভাবতে দ্রুতপায়ে ওপরে উঠছিল আলোলিকা। কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপে কী একটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। লণ্ঠন-ধরা হাতটা সামনের দিকে মেলে ধরতেই যা দেখল, তাতে অবাক যতটা না হল, তার চেয়ে বেশি অস্বস্তি হল।

বারান্দার যেদিকটা দেওয়াল, সেখানে ছ-টা ছেলেমেয়েই পরপর দাঁড়িয়ে। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, সবাই আলোলিকার দিকে পিঠ করে দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। ঠুক...ঠুক...ঠুক...

খুব আসতে আসতে একটা কেঠো আওয়াজ বারান্দার ঠান্ডা হওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আলোলিকা টের পাচ্ছে, সেই আওয়াজ বেরোচ্ছে একই লয়ে, একই তালে, একই ছন্দে।

ঠুক...ঠুক...ঠুক...

"এ কী?" আলোলিকা চিৎকার করে উঠল, "তোমরা কী করছ এখানে? এত রাত্রে?"

কিন্তু মনে হল না ওরা কেউ আলোলিকার কথা শুনতে পাচ্ছে। "এই মিলি, এই রত্না... শুনতে পাচ্ছ?" আবার চিৎকার করল আলোলিকা। না, একইভাবে নিরুত্তাপ ওরা। আলোলিকা ভেবে পেল না কী করবে? এদের কি ঘুমের ঘোরে চলা অভ্যেস নাকি?

ঠিক এমন সময়ই আচমকা ওরা সকলেই একসঙ্গে থেমে গেল। তারপরই সকলে একসঙ্গে ডান হাত তুলে ডানদিকের সেই বন্ধ দরজার দিকে নির্দেশ করল সেদিকে না তাকিয়ে। সকলের আচরণ এতটাই যান্ত্রিক, এতটাই নিক্তি-মাপা নিখুঁত, দেখলে মনে হয় যেন ওরা কারও বশীভূত।

আলোলিকা ওদের নির্দেশ মেনে ধীরে ধীরে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু একটা জিনিস চোখে পড়তেই আচমকাই মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তালাবন্ধ দরজার তালাটা একপাশে খুলে ঝুলছে, আর ঘরের দরজা আলতো ভেজানো।

কে খুলল এই বন্ধ ঘরের তালা? একটু আগেও তো এটা বন্ধ ছিল।

"এটা কে খুলেছে তোমাদের মধ্যে?" বাচ্চাদের উদ্দেশে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করতেই আরেক প্রস্থ অবাক হওয়ার পালা। কেউ নেই। হ্যাঁ, একজন বাচ্চাও সেখানে উপস্থিত নেই। এই তো ছিল সকলে? এরই মধ্যে কোথায় গেল...। একটা ভয়ংকর অস্বস্তি হচ্ছে এদের অদ্ভুত আচরণে। কী হচ্ছে তার সঙ্গে এসব?

ভাবতে পারল না বেশিক্ষণ। ভেজানো দরজাটা হাট হয়ে খুলে যাচ্ছে নিজে নিজেই। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কী আছে, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

ভয় পেয়ে দু-পা পিছিয়ে আসতে চাইলেও আলোলিকা কিন্তু পারল না। কে যেন পা-জোড়া টেনে কাঠের মেঝেতে গেঁথে দিয়েছে অজান্তেই। ঠিক এমন সময় অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে একটা কাগজের বল গড়িয়ে এসে তার পায়ে ধাক্কা মারতেই আঁতকে উঠল আলোলিকা। অন্ধকার ঘরের ভেতরে কেউ আছে। কিন্তু কে?

কোনোরকমে কাঁপা-কাঁপা হাতে কাগজটা তুলে লণ্ঠনের আলোয় মেলে ধরল আলোলিকা। আর তার মধ্যে যা দেখল, আতঙ্কের একটা শীতল শিহরন বয়ে গেল যেন মেরুদণ্ড দিয়ে।

কেউ কাগজের মধ্যে কাঁচা হাতে লিখেছে—"দেখতে পেয়ে গিয়েছি..."

কাগজের কথাটা মনে মনে যেই উচ্চারণ করল আলোলিকা, সঙ্গে সঙ্গেই কানের পেছনে কেউ একজন সাপের মতো হিসহিসে স্বরে বলে উঠল, "ধা...প্পা!"

আর তারপরেই লণ্ঠনের আলোটা নিভে গিয়ে পুরো জায়গাটা ঢেকে গেল ঘন কালো অন্ধকারে। আলোলিকার তারপর আর কিছুই মনে রইল না।

* * * * * * * *

সামনে গেটের বাইরে একটা কাঠের রেলিং-ঘেরা চওড়া বারান্দা। ঠিক তার মাঝবরাবর চার-পাঁচটা ধাপের একখানা সিঁড়ি নেমে নীচের মাঠে গিয়ে মিশেছে। আজকের সকালটা রৌদ্রোজ্জ্বল। আলোলিকা দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখল, বাচ্চারা এই শীতে, সকালের রোদ গায়ে মেখে খেলাধুলা করছে।

আলোলিকা একপাশের রাখা আরামকেদারায় গিয়ে বসতেই দেখা গেল, বারান্দা-লাগোয়া সামনের জমিটা কোদাল দিয়ে কোপাচ্ছে রাজেন মান্ডি। বোধহয় শাকের বীজ ছড়াবে। রাজেনকে দেখেই সকালের স্মৃতিটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল আলোলিকার।

ঘুমের মধ্যেই আলোলিকা টের পায়, কেউ তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু পাতাজোড়া এমনভাবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে যে সে কিছুতেই যেন চোখ খুলতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ এই ঠেলাঠেলির পর অনেক কষ্টে চোখ খুলে সে দেখতে পায়, রাজেন মান্ডির উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টি তার মুখের ওপর ঝুলছে। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটতে তার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই সে ধাতস্থ হয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে। আর ঠিক তখনই আলোলিকা আবিষ্কার করে যে সে দোতলার মেঝের ওপরেই শুয়ে রয়েছে।

"দিদি, আপনি এখানটোতে..." রাজেন মান্ডির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না আলোলিকা, সঙ্গে সঙ্গে পূর্বরাতের স্মৃতি মনে পড়তেই মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। একপ্রকার তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই দ্যাখে সামনের দরজাটা আগের দিনের মতোই তালাবন্ধ। তাহলে কাল রাতে এই দরজাটা কে খুলেছিল।

"রাজেন, এই দরজার তালার চাবি কার কাছে আছে?"

রাজেন মাথা চুলকে বলল, "উ তো বড়োদিদিমণিটোর কাছে থাকে।"

"এখানে কারও কাছে থাকে না?"

"তা তো ঠিক জানি না। ইখানে কার কাছে থাকবে? থাকি তো আমি আর বাচ্চাগুলান...। কেন? কিছু কি হইঞ্ছে?"

আলোলিকা কী একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল। তারপর দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে সঙ্গে সঙ্গে নিজের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মাথাটা ভার হয়ে আছে। আরেকটু ঘুম দেওয়া দরকার।

রাজেন একমনে মাটি কোপাচ্ছে। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কি?

"রাজেন?"

"জি, দিদিমণি?" মাটি কোপাতে কোপাতেই জবাব দিল রাজেন।

"তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ?"

"তা মাস সাতেক তো হবেই।"

"তার আগে কেউ কাজ করত?"

"বলতে পারব না, দিদি।"

"আমার আগে যিনি ছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন, কিছু জানো?"

"সঠিকটো জানি না, তবে তিনি নাকি তিন দিনের মতো ছিলেন ইখানটোতে। তারপর নাকি বেদম ভয় পেয়ে চাকরি ছেড়ে পালায় গেচেন। অবশ্য তাঁকে দোষটো দিই কেমন করে। ই বিরান জায়গাটোই এমন। বাচ্চাগুলান রাতের বেলা একা থাকে কী করে কে জানে?"

"তুমি রাত্রিবেলা এখানে থাকো না কেন?"

আলোলিকার প্রশ্নে এক মুহূর্ত থমকে তাকাল রাজেন, "বাড়িতে বউ-বাচ্চা আছে তাই। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া..."

"মোদের গাঁয়ের লোকটো এ বাড়িটোকে ডরায়। উরা বলে এ বাড়িটো ভালো লয়।"

"কেন?" আলোলিকা অবাক, "ভয় পায় কেন?"

"জানি লাই। তবে অনেক বছর আগে কিছু একটা ঘটেছিল। থানাপুলিশ পর্যন্ত গড়াইঞ্ছিল।" আলোলিকার কপালের ভাঁজ দৃঢ় হল।

"এই এলাকায় কী ঘটনা নিয়ে থানাপুলিশ হল, তুমি জানো?"

আলোলিকার প্রশ্নে রাজেন কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইল। তারপর বিড়বিড় করতে করতে বলল, "তখন আমি সদরের সিসা কারখানায় কামটো করতাম কিনে। তাই খুব একটা পস্টো করে জানতাম না। তবে সেই ঘটনার বছরখানেক পরে আবার একটা ঘটনাটো ঘটে। যার ফলে লোকজন বাড়িটোকে ভয় পেতে শুরু করে।"

কথাটা বলে আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে যায় রাজেন, তারপর আলোলিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে, "পাশের গেরাম 'ধুন্ধনি' থেকে উর্মিলি নামের একটা ছুঁড়ি নাকি কাম করতে এসেছিল এই বাড়িতে। তিন দিন পরে তাকে নাকি আর খুঁজেটো পাওয়া যায়নি পরে। বেশির ভাগ লোকজনটো বলে, মিয়াটোর নাকি চরিত্রের দোষ ছিল। সে নাকি কোন মরদের সঙ্গে পালাই গিয়েছিল কলকেতায়। তবে মিয়াটোর বাড়ির লোকজন বুলেছিল, এ বাড়িতে অভিশাপটো আছে। সেই নাকি মেয়েটিকে গিলে খাইঞ্ছে।"

"তারপরেও এখানে কাজ করছ?"

"সিসা কারখানায় কাজ কইরতে কইরতে ভারী অসুখটো বান্ধে গো। মরণের মুখটা হন্তে ফিরেটো আসি। তারপর থিকে ভারী কাজ করতে লারে। এদিকে পেটে বিদ্যাটো লাই। ভালো কাজ কে দেবে। সংসার করছি। খেতে, পরতেটো হবেক। আর গাঁয়ে কাজ কুথা? এক বন্ধুকে ধরে এ চাকরিটো বাগাইছি। তা ছাড়া, দিনের আলোয় তো কুনো ডরটো নাই।"

আলোলিকা চুপ করে রইল। সে সকালেই বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেছে কাল রাতের ব্যাপারে। কিন্তু কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। এখন রাজেনের মুখে আরেকটা গল্প শোনা গেল। এত রহস্য কেন এই বাড়ি ঘিরে? কথা বলতে বলতেই আলোলিকা মাঠের মধ্যে খেলতে-থাকা বাচ্চাদের দিকে তাকাল। আর এই ছেলেমেয়েরাই বা এত অদ্ভুত কেন? এই বয়সের ছেলেমেয়েরা হইহুল্লোড় করে, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে, মারপিট করে, খিদে পেলে খাওয়ার জন্য ঘ্যানঘ্যান করে, কিন্তু এরা কিছুই করে না। ওই যে খেলছে ওরা নিজেদের মধ্যে, কারও মুখে কোনো শব্দ আছে? নেই। কী অদ্ভুত! যেন শব্দহীন পুতুল ওরা। যেন নিক্তিতে মেপে কথা বলার বাইরে ওরা কথা বলতে শেখেইনি। আর ঠিক তখনই একটা দৃশ্য ছবির মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কাল দুপুরে আলোলিকা খাওয়াদাওয়া সেরে ড্রয়িং রুমে বসে ছিল। ভাতঘুমের অভ্যাস তার কখনোই ছিল না। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পথের ট্রেন জার্নিতে সে সত্যিই ক্লান্ত ছিল। সোফায় বসে বসেই কখন যে তার দু-চোখের পাতা লেগে গিয়েছিল, সে টেরই পায়নি। আচমকা পেছনের সিঁড়ির দিক থেকে ধপ করে আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে কাচের কিছু পড়ে ভেঙে যাওয়ার শব্দ হতেই তন্দ্রা ছিন্ন হল তার। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। দেখা গেল, রত্না বলে মেয়েটা হুমড়ি খেয়ে সিঁড়ির নীচের ধাপে পড়ে রয়েছে। আর তার সামনেই একটা কাচের জগ টুকরো টুকরো হয়ে কাঠের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে। আলোলিকা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল মেয়েটার কাছে।

"এ কী? কী হল?"

"হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছি।"

"ইশ্! কী অবস্থা হল দ্যাখো। না ঘুমিয়ে কী করছ এই দুপুরে?"

আলোলিকা ইতিমধ্যেই শুনেছে, মেয়েটা এক ধরনের যান্ত্রিক ভঙ্গিতে কথা বলে। এখনও সেই ভঙ্গির অন্যথা হয়নি। কিন্তু আজ সেই যান্ত্রিক কণ্ঠে যন্ত্রণার ছোঁয়া স্পষ্ট। আলোলিকা দেখল, কাঠের সিঁড়ির ওপর ঘষা লেগে মেয়েটির কনুইয়ের চামড়া বেশ কিছুটা ছড়ে গিয়েছে। অথচ মেয়েটি মুখে কান্নার ভঙ্গি বা যন্ত্রণার বিলাপ বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু যন্ত্রণা যে হচ্ছে না তা তো নয়। চোখ দিয়ে টপটপ করে পড়তে-থাকা জলের ফোঁটা সেই যন্ত্রণার চিহ্নই তো বহন করছে। অথচ মুখখানা কী অদ্ভুত নির্বিকার। এই বয়সের কারও এইভাবে হাত ছড়ে গেলে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে পাড়া মাথায় করত। অথচ...

"জগে জল শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটাই আনতে এসেছিলাম।" মাপা উত্তর বাচ্চাটির কণ্ঠে।

"রাজেন...!" রান্নাঘরের উদ্দেশে হাঁক দিল আলোলিকা। ক্ষণিকেই হাজির হল রাজেন মান্ডি।

"এখানে ওষুধের কিছু বাক্স আছে? এই ধরো তুলো, ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিসেপ্টিক।"

রাজেন সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়াল।

"ওটা এনে দাও। আর তারপর এই জায়গাটা পরিষ্কার করে দাও। এখানে কাচের টুকরো পড়ে রয়েছে..."

কথাটা বলতেই বলতেই আচমকা রত্নার মুখের দিকে তাকাতেই থেমে গেল আলোলিকা। রত্না চোখ বড়ো বড়ো করে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সিঁড়ির ওঠার মুখের রেলিং-এর দিকে। ঠিক রিমি যেমনভাবে ভয় পেয়েছিল দোতলার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে, সেই এক ভয় রত্নার চোখে-মুখেও।

আচমকা আলোলিকাকে অবাক করে দিয়ে ওই অবস্থাতেও রত্না পড়ি-মরি করে ছুট লাগাল দোতলার নিজের ঘরের দিকে। যেন কিছু দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

"রত্না? রত্না কোথায় যাচ্ছ? ওষুধ লাগাতে হবে তো। রত্না...?" নীচ থেকে চিৎকার করে উঠেছিল আলোলিকা। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বাঘের মুখ ফসকে হরিণ কোনোরকমে ছাড় পেলে প্রাণভয়ে যেমন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালায়, রত্নার অবস্থাও যেন তা-ই। তারই কিছু মুহূর্ত পরে দোতলায় দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেছিল আলো। তখনও সে বুঝতে পারেনি এই অদ্ভুত আচরণের কারণ। এখনও যে পরিষ্কার করে সবকিছু বুঝতে পারছে তা নয়। কিন্তু সে নিশ্চিত, এই বাড়ি ঘিরে কিছু একটা জট তো আছেই। আর এই জটটাই তাকে ছাড়াতে হবে।

"তোমায় না বারণ করেছিলাম...। তারপরেও কেন রাতে বেরিয়েছিলে?"

কথাটা শুনতে পেয়েই চমকে পেছনদিকে তাকাল আলোলিকা। রিমি। কখন বাকিদের ছেড়ে যে তার পেছনে

এসে দাঁড়িয়েছে, একদম খেয়াল করেনি আলোলিকা।

"কী হল, রিমি? তুমি এখানে? ওদের সঙ্গে খেলবে না?"

"খেলব তো।" তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "একটা কথা বলতে এসেছি তোমায়।"

"আমায়?" আলোলিকা অবাক, "কী বলবে আমায়?"

রিমি গলার স্বর নামিয়ে আলোলিকার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "ও তোমার সঙ্গে খেলতে চায়। কাল তুমি খ্যালোনি ওর সঙ্গে, ও রেগে আছে। ও খুব রাগি।"

আলোলিকা যথেষ্ট অবাক হল, কিন্তু অবাক হওয়ার ভাব লুকিয়ে মুখে হাসি এনে বলল, "তা-ই? খুব রাগি? তা কী খেলতে চায় সে?"

"লুকোচুরি। ওর পছন্দের খেলা।"

আলোলিকা টের পাচ্ছে, গত রাত্রের সেই চোরা অস্বস্তিটা আবার ফিরে আসছে ধীরে ধীরে।

"তা ও যে আমার ওপর রেগে আছে, সেটা কখন জানাল তোমায়?"

রিমি আলোলিকার পেছনে এক পলক তাকিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে একেবারে ফিসফিস করে বলল, "এইমাত্র। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

আলোলিকা আচমকা টের পাচ্ছে, এই আলোকোজ্জ্বল দিনের আলোতেও রিমির হিসহিসে স্বরটা তার সারা শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে।

* * * * * * * *

আবছা অন্ধকার ঘরের বিছানায় পাথরের মতো বসে ছিল আলোলিকা। পড়ার টেবিলের ওপর রাখা জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো তার মুখের একাংশে এসে পড়ছে। বড়ো রহস্যময় দেখতে লাগছে আলোলিকার বরফশীতল অভিব্যক্তিহীন মুখটা।

আজ ঠান্ডার প্রকোপ অন্যদিনের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। ঘরের ভেতর রোজকার মতো শব্দহীন। শব্দ বলতে শুধু বাইরের খোলা প্রান্তরের শীতল হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ। আলোলিকা এভাবে কতক্ষণ বসে আছে, সেসবের হিসেব একটু একটু করে যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তার। মাথাটায় অসহ্য যন্ত্রণা। গত দু-রাত ঠিক করে ঘুম হয়নি। পরশু রাতের মতোই অদ্ভুত সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি কাল রাতেও হয়েছে।

ঘুমটা ধরে আসার পরেই ঠিক মাথার ওপর দোতলায় কারও পদচারণা শুনে একইভাবে ঘুম ভেঙে যায় তার। তবে কালকে নতুন সংযুক্তি ছিল একটা অদ্ভুত খিলখিলে হাসি। সে হাসি আচমকা শুনলে বুকের রক্ত আপনা থেকেই যেন জল হয়ে যায়। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল সে। কিছুতেই, কিছুতেই এই ডাক শুনবে না এই ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল সে। ক্ষণিক পরেই টের পেয়েছিল, দোতলার পদচারণা আচমকা হাজির হয়েছে তার দরজার বাইরের করিডোরে। চুপটি করে মড়ার মতো পড়ে ছিল আলোলিকা। ঘুমের ভান করে। কিন্তু অকস্মাৎ তার সমস্ত অনুভূতি যেন ভোঁতা হয়ে যায় একটা সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে। ধড়ফড় করে নিজের বিছানায় উঠে বসে সে। কে চিৎকার করছে বাইরে? রিমির গলা বলে মনে হচ্ছে না? কী হল ওর? চিৎকার করছে কেন এইভাবে? দেরি না করে পড়ি-মরি করে কোনোরকমে আলো নিয়ে দৌড়ে যায় ড্রয়িং রুমের দিকে।

সে নিশ্চিত ছিল, আওয়াজটা ড্রয়িং রুমের দিক থেকেই আসছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে কাউকেই দেখতে পায় না সে। ঠিক এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে কী একটা গড়াতে গড়াতে তার পায়ের কাছে এসে থেমে যেতেই শিউরে ওঠে আলোলিকা। আগের দিনের মতোই একটা কাগজের বল। সারা শরীর এক শীতল আতঙ্কে কেঁপে ওঠে, যখন দ্যাখে, কাগজের মধ্যে লেখা আছে একটাই কথা—"আমায় খোঁজো।"

সেটা দেখেই চিৎকার করে ওঠে আলোলিকা, "নাহ্! আমি খুঁজব না। শুনতে পেলে তুমি? আমি তোমায় খুঁজব না। আমি খেলতে চাই না তোমার সঙ্গে। কে আছো, সামনে আসো। কী হল? এসো বলছি।" পুরো কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই মাথার ওপর একটা বিশ্রী খিলখিলে হাসি। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন-ধরা হাতটা ওপরদিকে উঁচিয়ে ধরতেই যা দেখল, তাতে সারা শরীরের রোমকূপ আপনা থেকেই খাড়া হয়ে গেল।

দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে কেউ একটা মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখছে। কিন্তু সে মুখে নাক নেই, কান নেই, দাঁত নেই, ঠোঁট নেই। রয়েছে কেবল একজোড়া চোখ। সেটাও এত দূর থেকে বাইরে ঠিকরে বেরিয়ে-আসা একজোড়া সাদা মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই লাগছে না। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে আলোলিকার মনে হল, মাথার ভেতরটা যেন ধীরে ধীরে সাদা হয়ে যাচ্ছে। কেউ ভেতরকার সমস্ত বোধ, চেতনা, অনুভূতিকে যেন শুষে খাচ্ছে।

ঠিক এমন সময়ই কে যেন কানের পেছনে খুব শীতল স্বরে বলে উঠেছিল, "ধা...প্পা!"

ব্যাস, তারপর আর কিছুই মনে নেই। সকালে একইভাবে ঘুম ভেঙেছিল রাজেনের ডাকে, সেই একই মাথা ভার অবস্থায়।

"দিদিমণি, আপনার কি ঘুমের ঘোরে চলার রোগটো আছে? কাল দোতলার বারান্দায়, আজ এই বসার ঘরেটোর মেঝায়..." উত্তর দিতে পারেনি আলো। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে নিয়েছিল সে।

বিছানায় বসে বসে এইসবই আকাশ-পাতাল ভাবছিল আলোলিকা। এমন সময় রাত্রির নিস্তব্ধতাকে নস্যাৎ করে বারোটার ঘণ্টার ধ্বনি পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়তেই আলোলিকার ভাবনা ছিন্ন হল। তারপর কী একটা মনে পড়তেই বালিশের তলা হাতড়ে বের করে আনল দুটো খবরের কাগজের কাটিং। দুটোতেই যে ছবি আছে তা ঝাপসা হলেও ছবির পাশে বড়ো বড়ো হেডলাইনের লেখা পরিষ্কার—"অনাথ আশ্রমে নৃশংসতা, অভিযুক্ত আশ্রমের মালকিন ও তার কন্যা"। খবরের ভেতরের অংশে যে তথ্য দেওয়া আছে, তার সারাংশ খানিকটা এরকম—পুরুলিয়ার হুরা এলাকায় একটি অনাথ আশ্রমে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় অনাথ বাচ্চাদের প্রতিপালনের নামে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হচ্ছিল। শুধু তা-ই নয়, আবাসিকদের ওপর নৃশংসতা চালাচ্ছিলেন অনাথ আশ্রমের মালকিন ওই খ্রিস্টান মহিলা। খাবার না-দেওয়া, মানসিক নির্যাতন করা থেকে শুরু করে শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত। এখানেই ব্যাপারটা থেমে নেই, মহিলাটির একটি বিকৃত মানসিকতার কন্যাও এই নিগ্রহে সমান পারদর্শী। নিপীড়িতদের বয়ানে সেই মেয়েটি নাকি সবসময় আবাসিকদের তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার জন্য উত্যক্ত করত। আর তাতে তারা নিমরাজি হলেই মায়ের সাহায্যে চলত উৎপীড়ন। পুলিশ অনাথ আশ্রমটি সিল করে, মহিলাটিকে আর তার মেয়েটির ওপর মামলা দায়ের করে পুলিশি হেপাজতে নিয়েছে।

দ্বিতীয় কাটিং-এ লেখাটা আরও মারাত্মক। সিল হয়ে-যাওয়া অনাথ আশ্রমটির বিকৃতমনস্ক মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু। প্রসঙ্গত, যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবে অনাথ আশ্রমকাণ্ডে মাসকয়েক আগেই মা-মেয়ে বেকসুর খালাস।

এই দুটো পেপার কাটিংই আলোলিকা খুঁজে পেয়েছে মালাদেবীর কেবিনে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর। গতকাল রাত্রের ঘটনার পর সে সকালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর নয়। এই রহস্যের সমাধান হয় সে করবে, নতুবা এই চাকরি ছেড়ে দেবে। সকালে সব বাচ্চাকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব জিজ্ঞাসা করেছিল আলোলিকা। কিন্তু তারা আগের মতোই নিরুত্তর থেকেছে এই ব্যাপারে। বাধ্য হয়ে মালাদেবীর কেবিনে ঢুকেছিল আলোলিকা।

রহস্যের সমাধানের জন্য কোথাও না কোথাও থেকে তাকে শুরু করতেই হত, কিন্তু এই কেবিনে ঢুকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুরোনো ফাইলের ভেতর থেকে যে দুটো তথ্য সে হাতে পেল, তাতে তার ভুরুর ভাঁজ আরও আরও গভীর হল। সে বুঝতে পারল, পেপারের কাটিং-এ যে অনাথ আশ্রমের কথা বলা হয়েছে, সেই অনাথ আশ্রমেই আলোলিকা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মালাদেবী যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে আসল ঘটনার এত পার্থক্য কেন? মালাদেবীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। সে যখন পেপার কাটিং দুটো নিয়ে মালাদেবীর কেবিনে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অফিসের দরজায় একজনের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে ওঠে আলোলিকা।

অফিসের দরজায় মালাদেবী স্বয়ং দাঁড়িয়ে। সে ভুলে গিয়েছিল আজ রবিবার। মালাদেবীর আশ্রমে আসার দিন। অবশ্য তাতে লাভে বরই হল আলোলিকার।

"আপনি এই কেবিনে কী করছিলেন? আপনি জানেন না, এই কেবিনে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ?" মালাদেবী বরফশীতল দৃষ্টিতে তাকালেন আলোলিকার দিকে। আগের বারে এই ধরনের স্বরে তাঁকে কথা বলতে শোনেনি আলো। একটু যে ভয় পায়নি সে তা নয়, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে যতটা সম্ভব স্থির গলায় বলে উঠল, "কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম।"

"প্রশ্ন?" ভ্রূ কুঁচকে উঠল মালাদেবীর, "কী প্রশ্ন?"

দেরি না করে সে আসার দিন রাতে বেলা থেকে শুরু করে কাল রাত্রি পর্যন্ত যা যা হয়েছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করে মালাদেবীর কাছে। তারপর পেপার কাটিং দুটো তার মুখের সামনে টেবিলের ওপর রেখে কৈফিয়ত নেওয়ার সুরে বলে ওঠে, "কোনটা সত্যি আর কোনটা গল্প, ম্যাডাম? যেটা আপনি বলেছিলেন নাকি যেটা এখানে লেখা আছে?"

আলোলিকার প্রশ্নে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন মালাদেবী। যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন। তারপর অবসন্ন শরীরটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মিস রায়। আমি প্রথম দিন আপনাকে সত্যিটা বলিনি। কারণ আমার মনে হয়েছিল, নেপথ্যের ঘটনাটা জানলে আপনি ভয় পেয়ে যাবেন। পেপারের কাটিং-এ যে কথাগুলো লেখা আছে, সেটা সত্যি হলেও পুরোপুরি সত্যি নয়।"

"তাহলে পুরো সত্যিটা কী?" আলোলিকা খরস্বরে প্রশ্নটা করতেই, মহিলা টেবিলের ওপরে রাখা জল ভরতি কাচের গেলাস টেনে তাতে একটা চুমুক দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে

বলতে শুরু করলেন, "মহিলা খ্রিস্টান ছিলেন। আপনার নিজেরও হয়তো অভিজ্ঞতা রয়েছে, পুরুষরা কখনোই নারীদের হাতে ক্ষমতা দেখতে পছন্দ করে না। এক্ষেত্রেও সেই বিষয়ের অন্যথা হয়নি। একজন একাকী মহিলা, তায় বিধবা একটা বিরাট বড়ো সম্পত্তি আগলাচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, নিজের বাড়িকে অনাথ আশ্রম গড়ে সেইসব বাচ্চাকে আশ্রয় দিচ্ছে, যাদেরকে এলাকার মাথারা অপয়া আর বিপজ্জনক বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। এ তো পুরুষতন্ত্রের অবমাননা। সমাজের সিংহাসনে বসে-থাকা সমাজপতিরা একজন নারীর এই ঔদ্ধত্য মেনে নেবেই বা কেন?

"তাদেরই নির্দেশে গুটিকয়েক লোক এইসব অঞ্চলে প্রচার করতে লাগল যে মহিলা বাচ্চাদের আশ্রয় দেওয়ার নাম করে ধর্মান্তরিত করছেন। আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ধর্মের নামে লোকজন চিরকাল স্পর্শকাতর। ধর্মের নাম নিয়ে নরহত্যা করা যায়, ধর্মরক্ষার অজুহাতে দেশ দখল করা যায়। ধর্ম হল পৃথিবীর সবচেয়ে মুখরোচক অথচ বিষাক্ত খাবার। স্বভাবতই এইসব গুজবে পার্শ্ববর্তী এলাকায় লোকেদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। তারই ফল ছিল মহিলার বিরুদ্ধে আনা মিথ্যে অভিযোগটা। অভিযোগে এই বলা হয়, মহিলা আর তার মেয়ে নাকি আবাসিকদের ওপরে মানসিক নির্যাতন চালাতেন। খেতে দিতেন না, মারতেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"অভিযোগটা মিথ্যে ছিল?"

"মিথ্যে না হলে মহিলা কয়েকদিনের মধ্যে আদালত হতে বেকসুর খালাস হলেন কী করে?"

"আর দ্বিতীয় পেপার কাটিং-এ যা লেখা আছে...?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে জানালার বাইরের দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে তাকালেন মালাদেবী, "মেয়েটি রোগে ভুগে সত্যি সত্যিই মারা যায়। দোতলার যে তালাবন্ধ ঘরটি দেখেছেন, ওটা ওই মেয়েটিরই ঘর। মেয়েটি মারা যাওয়ার পর আশ্রমের মালকিন ঘরটা তালাবন্ধ করে রাখেন।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল আলোলিকা। কী যেন ভাবল, তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "আমার সঙ্গে গত দু-দিন যা হয়েছে..." কথাটা বলেই আলোলিকা আবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুরু করে গত দুই রাতের ভৌতিক বর্ণন।

পুরোটা শোনার পরেই মহিলার ঠোঁটের কোলে এক ব্যঙ্গাত্মক হাসি খেলে যায়।

"আপনি হাসছেন?" আলোলিকা অবাক চোখে মালাদেবীর দিকে তাকাতেই মালাদেবী চোখ তুলে তাকালেন—"আপনাকে বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম, মিস রায়, কিন্তু এখন সেই ধারণা বদলাতে হচ্ছে।"

"মানে?"

"মানে আপনি ধরতেই পারেননি যে সবটাই বাচ্চারা করেছে।"

"বাচ্চারা?"

"হ্যাঁ, গত বছর ইন্সপেকশনের সময় যিনি এসেছিলেন, তিনি ভয় পেয়েই এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। পরে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এসবের পেছনে বাচ্চারাই ছিল। ওঁকে ভয় দেখিয়ে বাচ্চারাই তাড়িয়েছিল। আপনার ক্ষেত্রেও তা-ই হচ্ছে।"

"কিন্তু বাচ্চারা এসব কেন করবে? মানে ওদের কী লাভ?" আলোলিকা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে এগুলো সব বাচ্চাদের কাজ।

"একটা কথা বলুন তো, যেখানে ওদের কেউ শাসন করার নেই, কারও নজরদারিতে থাকতে হয় না, সেখানে হঠাৎ করে কেউ এসে নজরদারি আর শাসন শুরু করলে ওদের কি এসব পছন্দ হবে? যেখানে বাচ্চারা নিজেরাই নিজের মর্জির মালিক, সেখানে হঠাৎ করে হাজির হয়ে ওদের ওপর নজরদারি শুরু করলে ওরা সেটা কেন মেনে নেবে? বরং বিরোধিতাই তো করবে। যাদেরকে আপনি নিষ্পাপ শিশু ভাবছেন, বলতে দ্বিধা নেই, তারা কিন্তু এক-একটা বিচ্ছু। এবার একটু ভেবে বলুন তো... এখনও পর্যন্ত যা দেখেছেন বা শুনেছেন, তার বেশির ভাগটাই বাচ্চাদের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত কি না?"

কথাটা শোনার পরই আলোলিকার মাথায় এল, সত্যি তো! গত দু-দিনে যা যা হয়েছে, সবই রিমির কথা শুনেই। সে বারবার একজন ভ্রান্ত কারও অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, যাকে কখনোই চোখে দেখেনি আলোলিকা। শুধু কাল রাতে সে দোতলার রেলিং বরাবর অদ্ভুত একটা জীবকে ঝুলতে দেখেছিল। আচ্ছা, সেটাও তো বাচ্চাদের তৈরি কোনো চাতুরী হতে পারে? মহিলার কথা যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে যারা তাকে প্ল্যানমাফিক এইভাবে ভয় দেখাতে পারে, তারা সবকিছুই করতে পারে। কিন্তু তারপরেও তো কিছু প্রশ্ন...। ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল আলোলিকা।

"আপনি বলেছিলেন, দোতলার দরজাটা সবসময় বন্ধ থাকে, সেটা পরশু রাত্রে আমি খোলা দেখেছি। শুধু খোলা ছিল না, কেউ ছিলও ওই ঘরে।"

"এই আশ্রমের সবচেয়ে বড়ো আবাসিক হওয়ার জন্য

মিলির কাছে এই বাড়ির সব ক-টি দরজার ডুপ্লিকেট চাবি রয়েছে। অতএব বুঝতেই পারছেন...।" কথাটা শেষ করে শরীরটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিলেন মালাদেবী।

"এরপরে আমি আর আপনাকে জোর করব না। আপনি রিজাইন দিতে চাইলে এখনই দিতে পারেন। কেউ আপনাকে আটকাবে না।"

বাচ্চাগুলো এত বিচ্ছু তা আলোলিকার জানাই ছিল না। বিশেষ করে ওই রিমি বলে মেয়েটা। বাকিরা বড়ো, ওরা বদমাশি করতেই পারে, তা-ই বলে অতটুকু পুঁচকে মেয়েটাও? ওকে বড়ো নিষ্পাপ মনে করেছিল আলো। অবশ্য বাচ্চারা তো সেটাই শেখে, যা বড়োদের করতে দ্যাখে। রিমিরই আর দোষ কী?

নাহ্, আলোলিকা রিজাইন দেয়নি। এই ন্যূনতম কারণের জন্য এই চাকরি থেকে রিজাইন দেওয়ার মানে হয় না। পুরো ঘটনায় প্রাথমিকভাবে মানসিক ধাক্কা পেলেও এখন সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। কাল থেকেই এই বদমাশ বাচ্চারা তার অন্য রূপ দেখতে পাবে। বাচ্চা তার পছন্দের কখনোই নয়, কিন্তু তারপরেও ভেবেছিল, বাচ্চাদের সঙ্গে ও রূঢ় আচরণ করবে না, কিন্তু এখন এ ছাড়া তো আর উপায় দেখছে না সে।

আলোলিকা বালিশের তলায় পেপার কাটিং দুটো চালান করে লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিল। তারপর কম্বলের ভেতরে শরীরটা ঢুকিয়ে দিতেই একটা অপার্থিব শান্তি ছড়িয়ে পড়ল পুরো শরীর জুড়ে। ওহ্ কী আরাম! শরীরটা তার ক্লান্ত ভীষণ। গত দু-রাত্রি তার ঘুম হয়নি ঠিক করে। আজ সে একটু শান্তিতে ঘুমোবে। বাচ্চাদেরকে সে বুঝতে দেয়নি যে ওদের জারিজুরি আলোলিকা ধরতে পেরে গিয়েছে। রিমি আজকেও খাওয়ার পর কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছে, "আজকে কিন্তু ভুলেও বেরোবে না ঘর থেকে। কেমন?"

এসব ভাবতে ভাবতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আলোলিকা। ঠিক এমন সময় আচমকা তার খেয়াল হল, কোথাও একটা খুব মিষ্টি কিছু আওয়াজ হচ্ছে। কারও পায়ে হাঁটা বা খিলখিলে হাসির মতো বেখাপ্পা নয়, বরং একটা রিনরিনে সুর যেন বেজে চলছে আচমকা।

"কীসের আওয়াজ এটা?" ঘুমের মধ্যেই টের পাচ্ছে, আওয়াজটা তার সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন। সে এর আগেও কোথাও যেন শুনেছে এই আওয়াজটা, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না কোথায় শুনেছে।

কয়েক মুহূর্তমাত্র তারপরেই বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো আলোলিকার মাথার ভেতরে ধাক্কা মারল একটা দৃশ্য। মালাদেবী দোতলার ঘণ্টাটা বাজিয়ে বলছেন, "রাতের বেলা কোনো দরকার পড়লে অনেক সময় ওরা এই ঘণ্টিটা বাজায়। খেয়াল রাখবেন।"

ধ্যাত্তেরিকা! বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল আলোলিকা। বাজাক গে যাক। এখন আর কী দরকার পড়বে এমন? এরা যা এক-একটা পিস, তাতে ছোটোখাটো দরকার এরা নিজেরাই সামলে নেবে।

কিন্তু ঘণ্টার আওয়াজটা একনাগাড়ে বেজেই চলল। থামবার কোনো লক্ষণই টের পাওয়া গেল না।

আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না আলোলিকা। আচ্ছা, কারও কোনো শরীর খারাপ হল না তো? না হলে ঘণ্টা বাজাবে কেন? সর্বনাশ! সে হলে তো মুশকিল।

নাইটির ওপর শালটা জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে এল আলোলিকা। উফ! গরম কম্বল থেকে বেরোনোমাত্র আবার ঠান্ডাটা যেন প্রবল বিক্রমে জড়িয়ে ধরল তাকে।

ঘরের দরজাটা খুলেই দেখল, ড্রয়িং রুমটা অন্ধকার হলেও করিডোরের লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। আলোলিকা অশান্তির ভাবখানা মুখে যেন চেপে রাখতে পারল না। যদি সত্যি কোনো জরুরি কারণ না হয়ে এটা শুধুমাত্র মজা হয়, তাহলে সত্যি সত্যি এই ধরনের দুষ্টুমির শাস্তি ও দেবে ওদের।

ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়াতেই ঘণ্টার আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"আসছি।" নীচের থেকেই সাড়া দিল আলোলিকা। নাহ্! তারপরেও ঘণ্টা থামল না।

ড্রয়িং রুমটা অন্ধকার হলেও দোতলার বারান্দায় লণ্ঠনের আলো টের পাওয়া যাচ্ছে।

"কী হয়েছেটা কী?" বিরক্তিটা কোনোভাবেই আর লুকোতে পারছে না আলোলিকা। পায়ে দুমদাম শব্দ করেই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। কিন্তু সিঁড়ির উঁচু ধাপে উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। লণ্ঠনের আলোর ঈষৎ হলদেটে আভা দেওয়ালে টাঙানো ঘণ্টার ওপরে পড়ছে, আর তাতেই দেখা যাচ্ছে ঘণ্টাখানার নীচে কেউই নেই। হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। কেউ ছিল না সেখানে। ঘণ্টাটা নিজে নিজেই টুংটাং শব্দে বাজছিল।

বিস্ময়ে চোখজোড়া বড়ো বড়ো হয়ে গেল আলোলিকার। এ কী করে সম্ভব? ঘণ্টাটা নিজে নিজেই বাজছে কী করে?

ঠিক সেই মুহূর্তেই তার চোখ পড়ল কাঠের মেঝের ওপর পড়ে-থাকা এক টুকরো সাদা কাগজের ওপরে। বিহ্বল আলোলিকা কাগজটা তুলে জ্বলতে-থাকা লণ্ঠনের কাছে সরে এসে যেই খুলে দেখল কাগজটা, নিমেষে ওর বিহ্বল ভাব

উধাও হয়ে গিয়ে মাথায় ধক করে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

কাগজে সেই একই হাতের লেখায় কেউ লিখে রেখেছে—"টুকি!"

"রাতবিরেতে ইয়ারকি হচ্ছে..."

আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল আলোলিকা। সে ভেবেছিল, কোনো দরকারে হয়তো কেউ তাকে ডাকছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, সবটাই তাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই না।

"কী ভেবেছ? আমি কিছু বুঝতে পারিনি...? সব আমাকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্য তা-ই না? কিন্তু কান খুলে সবাই শুনে রাখো, আমি এখান থেকে যাব না। বুঝেছ তোমরা, আমি এখান থেকে যাব না। দেখি, এরপরও আমার সঙ্গে কত রসিকতা করতে পারো তোমরা..."

বাচ্চাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কথাটা বলে উঠল আলোলিকা, "শুনতে পাচ্ছ তোমরা?", গলার মাত্রাটা আরও উঁচুতে তুলল আলোলিকা। বিরাট বড়ো বাড়ির নিশ্চুপ প্রকৃতিতে কথাগুলো গমগম করে উঠল।

"এরপর আর যদি কোনো রকমের অসভ্যতা দেখি..."

ক্যাঁ...চ!

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই সেই পেছনদিকের বন্ধ দরজা থেকে একটা বিশ্রী কেঠো শব্দ বেরিয়ে আসতেই চমকে পেছনদিকে ঘুরে তাকাল আলোলিকা। সেই বন্ধ দরজাটা খুব আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে আপনা থেকেই। আলোলিকা দেখল খোলা দরজার ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। বারান্দার লণ্ঠনের মৃদু আলো দরজার মুখের কিছুটা অংশ আলোকিত করে দম হারিয়েছে যেন।

দরজাটা পুরোপুরি খুলে যেতেই কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শব্দ বলতে বাইরে বয়ে-চলা শনশন হাওয়ার শব্দ। আলোলিকা প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে খোলা দরজার ভেতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দু-চোখ অন্ধকারের ভেতরে প্রবলভাবে কারও অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু কই? কিছু তো টের পাচ্ছে না সে। কয়েক মুহূর্ত সময় এইভাবে কেটে যাওয়ার পর আচমকা অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে আবার একটা কাগজের বল গড়িয়ে এল আলোলিকার পায়ের আছে। আর তারপরেই অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে খিলখিলে হাসি। আলোলিকা কাগজটা খুলে দেখল, তাতে লেখা আছে—"লুকোবে না?"

অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল আলোলিকার। আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে সে। দেওয়ালের হুক থেকে লণ্ঠনটা নামিয়ে দ্রুতপায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল আলোলিকা। আর ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একটা বিশ্রী সোঁদা গন্ধ তার নাকে ধাক্কা মারল।

এই ঘরটা খুব বড়ো নয়, কিন্তু আসবাবপত্রে ঠাসা। ধুলো থেকে বাঁচানোর জন্য বড়ো বড়ো সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আসবাবগুলি। একদম উপযুক্ত একটা পরিবেশ লুকোচুরি খেলার জন্য।

"কে আছ ভেতরে? রিমি? নাকি মিলি? নাকি শ্যামা? নাকি ছেলেরা?"

কোনো উত্তর এল না, তার বদলে কেউ একজন খিলখিল করে হাসতে হাসতে অন্ধকারে দৌড়ে চলে গেল একদিক থেকে আরেক দিকে।

"আমি ধরতে পারলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে..." চিৎকার করে উঠল আলোলিকা, রাগে তার মাথা জ্বলছে।

আবার খিলখিলে হাসি। যেন ভারী মজা পেয়েছে ওরা।

আলোলিকা দেরি না করে এক হাতে লণ্ঠন ধরে অন্য হাত দিয়ে জিনিসপত্রগুলো থেকে সাদা চাদর টেনে সরাতে লাগল। নিশ্চয়ই এগুলোর আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে। কালকের সকালের খাবার যদি না বন্ধ করে রেখেছি, তো আমার নামও আলোলিকা নয়। মনে মনে গজগজ করে উঠল সে। ঠিক এমন সময় টেবিলের নীচে কেউ লুকিয়ে আছে কি না, সেটা দেখার জন্য টেবিলের ওপরের আস্তরণ যেই টেনে সরিয়েছে, অমনি লণ্ঠনের আলো পড়ে টেবিলের ওপর রাখা একটা জিনিসে চোখ আটকে গেল আলোলিকার।

একটা ফোটো ফ্রেম।

ফোটো ফ্রেমের ছবিতে একজন মহিলা আর মহিলার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বাচ্চা মেয়ে। দুজনেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে আলোলিকার মুখের দিকে। ফোটো ফ্রেমটা হাতে নিয়ে আলোলিকার যেন সব গুলিয়ে যেতে লাগল একটু একটু করে।

বাচ্চা মেয়েটিকে সে আগেই দেখেছে। পেপারের যে কাটিং-এ অনাথ আশ্রমের মালকিনের মেয়েটির মারা যাওয়ার খবর বেরিয়েছিল, সেখানে এই মেয়েটির ছবিই সে দেখেছে। তার মানে এ মালকিনেরই মেয়ে। কিন্তু এই মেয়েটির সঙ্গে এই মহিলা কী করছেন?

ঠিক তখনই ফোটো ফ্রেমের নীচের দিকে একটা লেখা দেখতে পেয়ে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল আলোলিকা।

"Mina Santra Gomes with her beloved mother Mala Santra Gomes"

মালা সাঁতরা... গোমস! তার মানে?

"এই মেয়েটির মা মালাদেবী? তার মানে মালাদেবীই এই আশ্রমের সেই মালকিন?"

"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।"

আচমকা দরজার কাছ থেকে সেই অতি পরিচিত অদ্ভুত স্বরটা শুনে চমকে উঠল আলোলিকা। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরতেই লণ্ঠনের আবছা আলোয় দেখা গেল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মালা সাঁতরা ওরফে মালা সাঁতরা গোমস। এই অনাথ আশ্রমের মালকিন। কিন্তু এই মুহূর্তে মহিলার চোখ-মুখ কেমন একটা অন্যরকম লাগছে। ঠিক যেন মৃত মানুষের মতো, ফ্যাকাশে আর নিষ্প্রাণ।

এই সময়, এখানে তাঁকে দেখে যতটা না অবাক হল আলোলিকা, তার চেয়েও অসহায় বোধ করল এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে।

"আপনি আমায় মিথ্যে বলেছিলেন?" লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে আলোলিকা পা-পা করে এগিয়ে এল মালা সাঁতরার দিকে। কিন্তু মালা সাঁতরা নির্বিকার।

"চুপ করে থাকবেন না, বলুন, আপনি আমায় মিথ্যে বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ। বলেছি।"

"কিন্তু কেন? কীসের জন্য এতগুলো মিথ্যা বলেছিলেন আমায়?" প্রবল উত্তেজনায় আলোলিকার সারা শরীর কাঁপছে।

"মিথ্যে না বললে তুমি এখানে থাকতে না। আর তুমি না থাকলে..."

"না থাকলে?" আলোলিকা মেঝেতে লণ্ঠনটা রেখে অবাক গলায় তাকাল মহিলার শীতল মুখের দিকে, "না থাকলে কী বলুন? চুপ করে গেলেন কেন? বলুন, না থাকলে কী?"

"না থাকলে, আমার মেয়ে খেলবে কার সঙ্গে?"

কথাটা শুনেই প্রচণ্ড রাগে আলোলিকার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির গলা দু-হাতে শক্ত করে টিপে ধরল সে।

"শয়তান বুড়ি, ঠগ, জোচ্চুরি করার জায়গা পাওনি?" প্রবল রাগে দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠল আলোলিকা। আর সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তার আঙুলের চাপ। "আমায় চেনো না তুমি, তোমায় আমি শেষ করে দেব। শেষ করে দেব...।" কথাটা শেষ করতে পারল না আলোলিকা, তার আগেই মালা গোমস হাতের আড়ালে লুকিয়ে-রাখা একটা পাথরের মূর্তি সজোরে বসিয়ে দিল আলোলিকার মাথায়। এক মুহূর্ত সময় ব্যয় হল না, সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ল আলোলিকা। শুধু জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে আলো টের পেল, মালা সাঁতরার নিষ্প্রাণ মুখটা ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছে তার মুখের ওপরে।

* * * * * * * *

"ধা...প্পা...!"

চারিদিকে প্রবল অন্ধকার, আর মাথার ডানদিকে অসহ্য টনটনে ব্যথা নিয়েই আলোলিকা চোখ খুলল। অন্ধকারে প্রথমে কিছু ঠাওর হয় না। কিন্তু তারপরেই কী একটা মনে পড়তেই ধড়ফড় করে উঠে বসতে গেল আলোলিকা। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ডানদিকটা যন্ত্রণায় ঝনঝন করে উঠল।

"আহ্!" যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল আলোলিকা। কোনোরকমে খাটের পায়ায় পিঠটা ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে বসতেই সে দেখতে পেল, লণ্ঠনটা একটা চেয়ারের ওপরে ইতিমধ্যেই তুলে রাখা হয়েছে। তারই কিছুটা আলো ঘরের দূরের কোণগুলোতে অদ্ভুত ভূতুড়ে আবহের সৃষ্টি করেছে।

"কী? খুব ব্যথা?"

ঘরের এককোণ থেকে পরিচিত অদ্ভুত স্বরটা ভেসে আসতেই, চমকে সেই দিকে তাকাল আলোলিকা। দেখা গেল, টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের আর মেয়ের ফোটো ফ্রেমটা হাতে দিয়ে একদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছেন মালা সাঁতরা।

মালাকে দেখেই আবার পুরোনো রাগটা ফিরে আসে আলোলিকার। এই মহিলা একজন সাইকিক ক্রিমিন্যাল। মিথ্যে কথা বলে চাকরির টোপ নিয়ে এখানে আলোলিকাকে টেনে এনেছে। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। আচ্ছা, এমনটা নয় তো যে ইনিই নিজের মেয়েকে খুন করেছেন? কথাটা ভাবতে ভাবতেই একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল আলোলিকার মেরুদণ্ড দিয়ে। পালাতে হবে... পালাতে হবে এই ঘর ছেড়ে। কিন্তু কীভাবে? সে কিছু করার মতো অবস্থায় নেই। সামান্য নড়তে গেলেও মাথাটা টলছে। আঘাতটা জোরেই লেগেছে বেশ। একটু বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম না নিলে সে এখান থেকে পালাতে পারবে না। আর সে এটা পারবে, যদি একে কোনোরকমে কথায় ভুলিয়ে রাখা যায়।

আলোলিকা ক্ষয়িষ্ণু স্বরে বলে উঠল, "সে নিয়ে আপনায় ভাবতে হবে না। আগে বলুন, আমায় এখানে এভাবে আনার মানেটা কী?"

"তোমায় তো আগেই বললাম, তোমায় আনা হয়েছে, যাতে আমার মেয়ে খেলতে পারে। খেলার সঙ্গী পায়।"

"চুপ করুন! এখনও বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছেন?"

"গল্প বলছি?"

"হ্যাঁ, গল্প বলছেন। মিথ্যা বলছেন। শুনুন, আমি আপনার সব জারিজুরি বুঝে গিয়েছি। আপনি একজন মিথ্যেবাদী মহিলা। মিথ্যে বলে পুরো গল্পটা বানিয়েছেন। আর এখনও বানাচ্ছেন।"

মালাদেবী নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন আলোলিকার দিকে। কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

"দেখুন, আমি জানি না আপনার কী উদ্দেশ্য। আপনি কেন আমায় এখানে ডেকে এনেছেন? আর কেনই বা এখানে আটকে রেখেছেন?" কথাটা বলতে বলতেই একটা গলা-ভেজা কান্নার ঢেউ বেরিয়ে এল আলোলিকার গলা ঠেলে—"আমার একটাই অনুরোধ, আপনি আমায় সত্যিটা এবার অন্তত বলুন। প্লিজ!"

মালা সাঁতরা ফোটো ফ্রেমটা যথাস্থানে রেখে আলোলিকার দিকে ফিরলেন।

"সত্যি শুনবে? শুনতে চাও?"

"হ্যাঁ, আমি সত্যিটা শুনতে চাই। পুরোটা। আজ কোনো মিথ্যা নয়। আজ কোনো লুকোনো কথা নয়।"

আলোলিকা লক্ষ করল মালাদেবীর ঠোঁটের কোলে একটা মুচকি হাসি। তিনি ধীরপায়ে ঘরের একপাশে রাখা একটা কাঠের চেয়ারে বসলেন। লন্ঠনের হালকা আলো তার মুখের একপাশ আলোকিত করছে। অদ্ভুত ভয়ংকর দেখতে লাগছে ওঁকে।

"আমি কাউকে আমার কাজের কৈফিয়ত দিই না। কারণ জানানো তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু মিস রায়, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তাই তোমায় জানাব সবটা। অবশ্য তাতে তোমার খুব একটা লাভ হবে না। কারণ এই কথাগুলোর কিছুই আর তোমার মনেও থাকবে না।"

কথাটা বলে ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে তাকালেন মালাদেবী, তারপর আবার হিসহিসে স্বরটা পুরো ঘরে ছড়িয়ে বলে উঠলেন নিজের কথা—"আজ থেকে বছর তেরো আগে আমার স্বামী মারা যান। তার আগে চোরাচালান আর অবৈধ ব্যাবসা করে লোকটা প্রচুর টাকা উপার্জন করে। আমার সেইসব ব্যাবসা নিয়ে কোনোকালেই খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। গরিব ঘরের মেয়ে ছিলাম আমি। দিনের শেষে আমি ভালো খেতে, পরতে পারতাম। আর কী চাই?

"তবে এইসব খাওয়া-পরার বিনিময়ে আমায় মুখ বুজে সহ্য করতে হত মার। এইসব মারের সবসময় কারণ যে থাকত তা নয়। কারও ওপরে রাগ হয়েছে, আমায় মারত। ব্যাবসায় কেউ ক্ষতি করেছে, বাড়ি ফিরে আমায় মারত। কেউ ঠকিয়েছে, আমায় মারত। আসলে মারতে ইচ্ছে হত; মারত। মারার আবার কারণ লাগে নাকি পুরুষদের? লোকটাকে খুব ভয় পেতাম। ওর চোখজোড়ার দিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসত আমার। মনে হত, এই বুঝি পায়ের জুতো খুলে আমায় মারলো, এই বুঝি চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিল, এই বুঝি হাতটা চেপে ধরল গরম কড়ায়ের উপর। সবসময় একটা আতঙ্ক চেপে ধরে রেখেছিল আমায়। কিন্তু যতই হোক, আমার স্বামী তো, দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে কোথাও গিয়ে আমি তার এই মারগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

"আমার মেয়ে আমাদের অনেক বয়সের সন্তান। অনেক সাধ্যসাধনা করে অনেকটা বয়সে এসে আমার বাচ্চা হয়। পরের দিকে এসে স্বামীর মারের পরিমাণ কমে গেলেও তার প্রতি আমার ভয়টা খানিকটা আতঙ্কের আকারেই আমার মনের গহিনে চেপে বসে থাকল। তাই চেয়েও কখনো সহজ হতে পারিনি লোকটার কাছে। আমার সবটাই জুড়ে ছিল আমাদের মেয়ে। আমার স্বামী ওর ব্যাবসা নিয়ে থাকত আর আমি থাকতাম আমার সংসার আর মেয়ে নিয়ে।

"বেশি বয়সের সন্তান বলেই হোক বা মাতৃত্ব থেকেই; মেয়েকে আমি কাছছাড়া করতাম না প্রায়। মোটামুটি এরকম করে দিন কাটছিল আমাদের, ঠিক এমন সময় একবার খুব বড়ো কোনো একটা কেসে ফেঁসে গিয়ে আমার স্বামী বেশ কিছু জমানো টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। গা-ঢাকা দিতে দিতে যখন এখানে-ওখানে ঘুরছে, ঠিক সেই সময় কারও মারফত আমার স্বামী খবর পেয়ে এখানে, এই হুরাতে আমাদের নিয়ে চলে আসে। তারপর এক ব্রিটিশ অফিসারের পুরোনো বাড়ি কিনে সারাই করে আমরা নতুন করে জীবন শুরু করি। এর মাঝে অবশ্যই আমরা পুরো পরিবার মিলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করি, যাতে আমাদের নামগুলো আগে-পরে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায়। তুমি এটাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার কৌশলও বলতে পারো।

"মোটামুটি নিশ্চিন্তেই কাটছিল দিনগুলি, কিন্তু কথায় বলে, সুখ বেশি দিন সহ্য হয় না। একদিন সদরে গিয়ে লোকটা আর ফেরে না। লোকটা কাছাকাছি না থাকলে ভালোই লাগত। মনে হত না যে ভয়ংকর চোখজোড়া আমায় নিরীক্ষণ করছে। এরকম আগে ও মাঝে মাঝে ফিরত না কয়েক দিনের জন্য। কিন্তু এখানে এসে এই প্রথমবার লোকটা ফিরল না। একটু হলেও দুশ্চিন্তা যে হয়নি তা নয়। পরের দিন জানা যায়, পূর্বশত্রুর হাতে গুমখুন হয়েছে সে। পুলিশ

লাশ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের খোঁজ শুরু করে, কিন্তু আমি সচেতনভাবে নিজেকে আড়ালে রাখি। কে বলতে পারত, পরিচয় প্রকাশ করলে পূর্বশত্রুর হাতে আমরাও গুমখুন হতাম কি না?

''মেয়ে তখন তিন বছরের। নিজেকে এই আড়াল রাখার প্রক্রিয়া ভালোই চলছিল, কারণ মেয়ের বাবার দৌলতে আমাদের টাকাপয়সার অভাব ছিল না। আমার সমস্ত মনোযোগ থাকত আমার মেয়ের ভালো থাকাকে কেন্দ্র করে। মেয়ে ধীরে ধীরে বড়ো হতে শুরু করল। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সারাদিন একলা থাকতে থাকতে বাচ্চা মেয়েটা কেমন একটা হয়ে যাচ্ছিল। এই নির্জন প্রান্তরে সে আর তার মা। আর সপ্তাহে একদিন এসে সবজি আর মশলা বাজার করে দেবে এমন এক আদিবাসী বুড়ি।

''মেয়েটার হাসিকান্নার, আনন্দের, দুঃখের সব সময়ের সঙ্গী বলতে ছিলাম আমি। কিন্তু এত বড়ো বাড়ির কাজ সামলানোর হাড়ভাঙা খাটুনির পর আমারও আর কতটা সময় হত মেয়েটাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। বুঝতে পারি, মেয়েটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। জেদি, একগুঁয়ে, একরোখা। সঙ্গীহীনতায় মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। কী করি, কী করি? কী করলে মেয়েটা ভালো থাকবে? কী করলে মেয়েটা সুন্দর স্বাভাবিক জীবন আর বন্ধু পাবে খেলার, গল্প করার, পড়ার—এসব ভাবতে ভাবতে যখন আমার প্রায় পাগলপারা অবস্থা, ঠিক তখনই আমার মাথায় এই অনাথ আশ্রম খোলার প্ল্যানটা চলে আসে।

''আমি বুঝতে পারি, অনাথ আশ্রম খুললে মেয়ের খেলার সঙ্গীর অভাবও হবে না, আর আমায় বাড়ির কাজ সামলানোর ঝক্কিও পোহাতে হবে না। বাচ্চাদের দিয়েই বাড়ির কাজটা সামলে নেওয়া যাবে। কিন্তু যা ভাবা হয় আর যা হয়, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। যত সময় যায়, মেয়ের বয়স বাড়তে থাকে। আর আমি বুঝতে পারি আমার মেয়ে ঠিক ওর বাবার প্রতিরূপ। কারণে-অকারণেই বাচ্চাদের মারধর করত। ঠিক ওর বাবা যেমন আমায় মারত। ওই সময় আমার মেয়েকে যে কী ভয়ংকর হিংস্র লাগত, কী বলব! আমি যেন ওই সময় ওকে নয়, ওর বাবাকে টের পেতাম। হয়তো আমার মনের ভুল, কিন্তু বিশ্বাস করো, টের পেতাম। আর টের পেতাম বলেই আমি আমার মেয়েকে ভয় পেতাম।"

''ভয় পেতেন?" আলোলিকা ভয় পেয়ে ঢোঁক গিলে ফেলল।

''হ্যাঁ, আমি আমার মেয়েকে ভয় পেতাম। কী? বিশ্বাস হচ্ছে না তো? জানি হবে না। যে শুনবে, সে-ই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এটা সত্যি, আমি আমার মেয়েকে ভয় পেতাম। আজ পর্যন্ত কখনও কোনো মা-কে বলতে শুনেছ এই কথা? শোনোনি... শোনোনি। অথচ আমি এখন একবর্ণও মিথ্যে বলছি না। আমি সত্যি আমার মেয়েকে ভয় পেতাম। ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে, যাকে আমি নিজের গর্ভে ধরেছি, দশ মাস ধারণ করেছি, যাকে বুকের দুধ খাইয়ে বড়ো করেছি, তাকে আমি ভয় পাচ্ছি। ভয় পাচ্ছি, কারণ ওর চোখজোড়া অবিকল ওর বাবার মতো দেখতে ছিল। আকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু না পেলেই ও এমনভাবে আমার দিকে তাকাত যে আমার বুকের জল ভয়ে শুকিয়ে আসত। মনে হত, ওর বাবা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর আগেই বলেছি, আমি ওর বাবার চাহনিকে ভয় পেতাম।

''তাই সবসময় আমি চেষ্টা করতাম, ও যা চাইছে তা-ই এনে দিতে। সবসময় একটা ভয় কাজ করত, এই বুঝি মেয়েটা রেগে ওঠে, এই বুঝি ওর ভেতরে আমি ওর বাবার ছায়া দেখতে পাই। রেগে গেলে আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। এত ভয় পেতে থাকি যে ও রেগে গেলে আমি ওর কাছে যেতে ভয় পেতাম। ভাবতে পারো, আমার নাড়ি-ছেঁড়া ধন, যাকে আমি কোলেপিঠে মানুষ করেছি, তাকে আমি ভয় পাচ্ছি?

''পৃথিবীর সব মা চায় তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ঘুমোতে, কাছছাড়া না করতে, কিন্তু আমার কপাল দ্যাখো। যখনই মেরের কাছে যেতে চাইতাম, ঠিক তখনই দু-জোড়া চোখ আমার সারা শরীর যেন পাথর করে দিত। আমার মেয়েকে আদর করতে দিত না। কাছে ঘেঁষতে দিত না। চেয়েও আমি কিছু করতে পারতাম না। নিজের সন্তানের থেকে এই দূরত্ব পৃথিবীর যে-কোনো মায়ের জন্য অভিশাপ। তা-ই না?" কথাটা বলতে বলতেই মালাদেবী ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

''তারপর?" কান্নার বেগ কিছুটা কমতেই আলোলিকা প্রশ্নটা করে উঠল।

''তারপর আর কী, আমি নির্দ্বিধায় তা-ই করতাম যা আমার মেয়ে চাইত। সত্যি কথা বলতে, এই করে যাওয়ার মধ্যে মাতৃস্নেহ আর সন্তানের প্রতি ভালোবাসা যতটা ছিল, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ভয় ছিল। এমনি করেই দিন কাটছিল। আমি চাইছিলাম, এইরকম করেই যেন দিন কাটতে থাকে। কিন্তু আমরা যা চাই তা তো সবসময় তা হয় না। বাচ্চাগুলো এত বদমাশ ছিল যে কী বলব। কিছুতেই আমার মেয়ের সঙ্গে খেলতে চাইত না। বলত নাকি আমার মেয়ের কাছে যেতে ভয় লাগে ওদের। কিন্তু তা বললে চলবে কেন? ওদের তো ভয় পেয়ে আমার মেয়ের থেকে দূরে থাকার জন্য

এখানে আনা হয়নি।”

“কত মারতাম, ধমকাতাম, একবেলা না খাইয়ে দিয়ে রাখতাম ওদের, কিন্তু তারপরেও ওরা শোধরাত না। মানছি, মানছি, আমার মেয়েটা বদরাগি আর একটু অন্যরকম ছিল। মাঝে মাঝে নানারকম উৎপীড়ন করত, যেমন সাঁড়াশি দিয়ে নখ উপড়ে নেওয়া, রান্নাঘর থেকে খুন্তি পুড়িয়ে এনে বাচ্চাদের খালি পিঠে চেপে ধরা, বা সুচ ফোটাতে চাওয়া, খেলতে খেলতে পাথর মেরে আঙুল থেঁতলে দেওয়া, সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া। কিন্তু বিশ্বাস করো, লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসত। লুকোচুরি খেলতে চাইলে আর কিছু লাগত না ওর। কিন্তু বাচ্চাগুলো এত বদমাশ ছিল যে কী বলব। মোটেও আসতে চাইত না ওর কাছে। আর তাতে মিনা আরও রেগে যেত।

“আরে তোরা খাচ্ছিস, পরছিস আমার, এদিকে আমার মেয়ের সঙ্গে খেলবি না? উলটে ওকে রাগিয়ে দিবি? খেললে ওর মন ভালো থাকে। তো তোদের পোষা হয়েছিলই বা কীসের জন্য? কিন্তু না, ওদেরকে কিছুতেই যদি রাজি করানো যায়। আচমকা এরকমই একটা সময়ে, একদিন অনাথ আশ্রমেরই একটি ছেলে খেলতে নিমরাজি হওয়ায় ছুঁচ ফোটাচ্ছিল আমার মেয়ে। আচমকা ভয় পেয়ে আমার মেয়েকে ঠেলে ফেলে দিতেই মেয়েটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। জানো, আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু মেয়ের কান্না সহ্য করতে পারতাম না। কী যে হল, আচমকা ধক করে আমার মাথায় আগুন ধরে যায় যেন। মেয়েকে ভয় পাই ঠিকই, কিন্তু ভালোও তো বাসি, বলো। আমারই আশ্রমের একটি বাচ্চা আমারই মেয়েকে ঠেলে দেবে—এটা সহ্য হয় বলো?

“তো তাকে এমন মারি, এমন মারি যে সে প্রায় মরেই যেতে বসেছিল। পরে ছেলেটি কোনোক্রমে বেঁচে গেলেও খবরটা বাইরে চাউর হয়ে যায়। যে আদিবাসী বুড়ি এখানে সপ্তাহের একদিন বাজার দিতে আসত, সেদিন সে সবটা দেখে চারিদিকে রটিয়ে দেয়। এমনিতেই এখানকার লোকেদের আমার ওপর রাগ ছিল। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই যেন চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। তারপরেই থানাপুলিশ হয়। অনেক টাকা খরচ করতে হয় এই কেসটা বন্ধ করার জন্য। তারপর একটা সময় কেস ক্লোজ হয় ঠিকই, কিন্তু অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চাদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

“বাচ্চাদের সরিয়ে দেওয়ার পর আমার মেয়ে খেলার সঙ্গী না পেয়ে মনমরা হয়ে যেতে থাকে। সবসময় খেলার সঙ্গী হাতড়ে বেড়াতে থাকে নিঃসঙ্গ বাড়ির আনাচকানাচে। আমি চেষ্টা করি ওকে লুকোচুরি খেলায় সংগত দিতে, কিন্তু একলা আমি কত পারি। তারপর এত বড়ো বাড়ির এত কাজ। নিঃসঙ্গতায় আর একাকিত্বে দেখতেই দেখতে মেয়ের শরীর ভাঙতে শুরু করে। জানো, তারপর মাত্র তিন দিনের জ্বরে মেয়েটা আমায় ছেড়ে চলে যায়। এই তিন দিন জ্বরে বেহুঁশ থাকতে সে শুধু অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের খুঁজত। আর লুকোচুরি খেলতে চাইত। তারপর তার সাত বছরের জন্মদিনের দিন মেয়েটা হঠাৎ আমার কোল শূন্য করে চলে যায়।”

“এরপর...?”

“এরপর... আমি আর এই বাড়িতে থাকতে পারি না। না থেকে সদরের দিকে একটা বাড়ি কিনে থাকতে শুরু করি। মাঝে মাঝে আসতাম, কিছুক্ষণ থাকতাম, তারপর চলে যেতাম। কিন্তু যখনই আসতাম, বুঝতাম আমার মেয়ে ভালো নেই। মারা যাওয়ার পরেও ও একা। ওর বন্ধু দরকার। ও বন্ধু চায়। বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চায়। তাই ঠিক করলাম, আবার এই অনাথ আশ্রম চালু করব। কিন্তু পূর্বের অভিজ্ঞতায় কেউ আর বাচ্চা রাখতে চাইল না এখানে। ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা আমায় পুরো ঘটনাগুলোকে নতুন করে ভাবতে শেখায়।”

“কী ঘটনা?”

“সম্ভবত মেয়ের জন্মদিনের আগে, অনেক কষ্টে পাশের গ্রামের একটা মেয়েকে রাজি করিয়ে এই বাড়িতে নিয়ে আসি। উদ্দেশ্য ছিল, জন্মদিনের আগে ঘরদোর একটু পরিষ্কার করা। আর তেমন পছন্দ হলে ওকে কাজের লোক হিসেবে রেখে দেওয়া। কিন্তু বাড়িতে মেয়েটিকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝতে পারি, আমার মিনা যেন মেয়েটির আগমনে খুশিই হয়েছে। সে আকারে-ইঙ্গিতে মেয়েটিকে খেলার সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দিতে থাকে, কিন্তু মেয়েটি রাজি না হয়ে ঠিক তোমার মতো ভয় পেয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবে। আমি বুঝতে পারি, আমার মেয়ে রেগে যাচ্ছে এই প্রত্যাখ্যানে। কিন্তু আমার কী-ই বা করার ছিল?

“এরপর ঠিক তার তিন দিনের দিন গভীর রাত্রে আমি বুঝে যাই যে আর যা-ই হোক, আমার মেয়ের খেলার সঙ্গীর অভাব হবে না। আমার মেয়ে যে মৃত্যুর দরজা পেরিয়েও আবার ফিরে এসেছে শুধু তার প্রিয় লুকোচুরি খেলা খেলবার জন্য; সে ঠিক নিজের মতো করে নিজের খেলার সঙ্গী জোগাড় করে নেবে। তার শুধু দরকার একটু সাহায্য, তার মায়ের থেকে...। আর মা এটুকু করবেই।

“জীবিত অবস্থায় তার মা তাকে খেলার সঙ্গী এনে দিতে

পারেনি, কিন্তু মরণের পরে ঠিক পারবে, পারতেই হবে... সে তার খেলার সঙ্গী পেয়ে গিয়েছে। সে ভালো আছে। কিন্তু একজন সঙ্গী পেয়ে কি তার মন ভরে? মানুষের রক্ত মুখে লাগলে যেমন বাঘের অন্য কিছু রোচে না, তেমন যার একাধিক খেলার সঙ্গীতে অভ্যাস, সে কি একটা সঙ্গী পেয়ে ক্ষান্ত থাকবে?

"স্বভাবতই সে আমায় দাবি জানাতে লাগল আরও খেলার সঙ্গী জোগাড় করে দেওয়ার। কিন্তু বললেই তো আর খেলার সঙ্গী জোগাড় হয় না। কিন্তু ওই যে, মায়ের মুখ থেকে না-শোনার অভ্যাস তার নেই। সময় যত গড়াতে লাগল, ততই তার রাগ বাড়তে লাগল আমার ওপর। আমি কেন এনে দিতে পারছি না তার খেলার সঙ্গী, এ যেন আমার অপরাধ। ঠিক তখনই আমার মাথায় একটা ভয় জাঁকিয়ে বসে, সঙ্গীর অভাব পূরণ করতে গিয়ে ওই কাজের মেয়েটির মতো আমাকে যদি আমার মেয়ে খেলার সঙ্গী বানিয়ে নেয় চিরদিনের জন্য তাহলে? এইরকম ভয়ে বিপর্যয়ে যখন আমার প্রায় নাস্তানাবুদ অবস্থা, ঠিক সেই সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। যার ফলে না আমায় আমার মেয়ের খেলার সঙ্গী হতে হবে, আর না আমার মেয়ের খেলার সঙ্গীর কোনো অভাব থাকবে।"

"বুদ্ধি? কী বুদ্ধি...?"

বিস্ময়ে আলোলিকার মুখ থেকে কথা সরছে না।

"কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে চাকরির টোপ দেখিয়ে লোক আনানোর..." কথাটা বলেই একটা কুটিল চোরা হাসি খেলে গেল মালা সাঁতরার ঠোঁটের কোলে। একটু আগের সেই মাতৃস্নেহে কাতর মহিলার সঙ্গে এই মহিলার মুখের ভাবের কী ভয়ানক আকাশ-পাতাল পার্থক্য!

আলোলিকার মনে হল, কে যেন তার পা-জোড়া টেনে মাটির মধ্যে গেঁথে দিয়েছে।

কোনোরকমে ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করে উঠল, "মানে?"

"মিনা তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই রাজি হয়নি। মেয়ে আমার এমনিতে ভালোই, কিন্তু রেগে গেলে সামলানো মুশকিল। মারা যাওয়ার আগে তিন দিন জ্বরের ঘোরে শুধু বলত, 'লুকোচুরি খেলবে?', 'দেখতে পেয়ে গেছি', 'টুকি' তাই এখনও সে তিন দিনের অপেক্ষা করে। খেলতে চাইলে ভালো, না চাইলে মেয়ে তাকে নিজের পছন্দমতো গড়েপিটে নেয়...।"

"চুপ করুন।" প্রবল রাগে চিৎকার করে থরথর করে উঠে দাঁড়াল আলোলিকা, "মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ মহিলা কোথাকার! ইয়ারকি পেয়েছেন? সাইকো মেয়ের গল্প শোনাচ্ছেন? আপনাকে আমি আবার জেলে দেব। মিথ্যে চাকরির টোপ দিয়ে আপনি লোক ঠকান। তারপর তার ওপরে আশ্রমের বাচ্চাদের মানসিক নির্যাতন করেন। এখন বুঝতে পেরেছি, ইন্সপেকশনে কোনো সরকারি অফিসার আসে না। হাজারটা মিথ্যের মতো এটাও একটা মিথ্যে। আসলে... আসলে আপনি একজন ক্রিমিন্যাল মাইন্ডেড সাইকো মহিলা। আপনি আর আপনার মেয়ে দুজনেই বদ্ধপাগল। আমি এক্ষুনি এই বাড়ি ছেড়ে..."

আলোলিকার কথা শেষ হল না, তার আগেই একটা বিশ্রী খিকখিকে হাসি বেরিয়ে এল মহিলার গলার ভেতর থেকে। চমকে উঠল আলোলিকা, অবিকল সেই হাসি। যে হাসি তিন দিন তাকে বিভীষিকার মতো তাড়া করে বেরোচ্ছে।

"কোথায় যাবে?" মালা সাঁতরার লম্বা মুখে সেই বিশ্রী হাসিটা ঝুলছে। কী বীভৎস লম্বা লাগছে ওই রোগা শরীরটা। যেন মাথাখানা ছাদে ঠেকে যাবে।

"কোথাও যেতে পারবে না। না এর আগে কেউ পেরেছিল। না তুমি পারবে। প্রত্যেক বছর আমি আমার মেয়ের জন্মদিনে তোমার মতো একজনকে আনি। বিগত অনেক বছর ধরে তা-ই করে আসছি তো। আমি আনতে বাধ্য। যদি আমি প্রত্যেক বছর ওর জন্মদিনে নতুন খেলার সঙ্গী না জোগাড় করি, তাহলে ও আমায় নিজের খেলার সঙ্গী বানিয়ে নেবে। আমার মেয়ের খেলার সঙ্গী চাই, বুঝলে...। খেলতে হবে তো। লুকোচুরি খেলবে না আমার মেয়ের সঙ্গে? তোমরা লুকোবে। আমার মেয়ে খুঁজবে। তোমরা বলবে টু...কি। আমার মেয়ে বলবে..."

"ধা...প্পা!"

আচমকা কানের পেছনে একটা শীতল স্বরে আপাদমস্তক শিউরে উঠল আলোলিকা। চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে যা দেখল আলোলিকা, তাতে প্রবল আতঙ্কে পেটের ভেতরটা আচমকা খালি হয়ে গেল। গলার ভেতর থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল একটা গোঙানির আওয়াজ।

একটা কালো শরীর ঠিক তার মুখের সামনেই ঝুলছে। ছাদের কার্নিশ থেকে বাদুড় যেমন উলটো হয়ে ঝোলে, এ-ও ঠিক তেমনই। সেদিন দোতলার বারান্দার রেলিং থেকে ঝুলতে এই মুখ এর আগেও দেখেছে আলোলিকা। সেই দোতলার রেলিং থেকে যে মুখটা কাল রাতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল, এই সেই মুখ। একতাল মাংসপিণ্ড যেন। সেই মাংসপিণ্ডে মুখ, নাক, কান কিছুই নেই। চোখের বদলে রয়েছে দুটো সাদা মাংসপিণ্ড আর তার ওপর গোলমরিচের

নার মতো দুটো কালো বিন্দু। উফ! কী ভয়ংকর এই মুখ! কী ভয়ংকর এই চোখজোড়া।

আলোলিকার সারা শরীর ভয়ে-আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। এ কী দেখছে সে? এ কাকে দেখছে চোখের সামনে?

পলকের মধ্যেই ঝুলতে-থাকা শরীরটা হাওয়ায় একটা ভল্ট দিয়েই আলোলিকার মুখোমুখি দাঁড়াল। পেছন থেকে মালা সাঁতরার ওই অদ্ভুত হাসি তখনও ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। কিন্তু আলোলিকার চোখ সামনের থেকে সরছেই না। দুটো সাদা মাংসপিণ্ডে যেন অদ্ভুতভাবে বশীভূত হয়েছে আলোলিকা। তার নড়ার ক্ষমতা নেই, তার সরার ক্ষমতা নেই, তার যেন কিছুই করার ক্ষমতা নাই। আলোলিকা দেখছে, ওই ভয়ংকর জিনিসটা মালা সাঁতরার হাসির তালে তাল মিলিয়ে সামনে-পিছনে ঝুঁকে একটু দুলছে যেন। তারপর আচমকাই সোজা দাঁড়িয়ে দুটো কালো কালো হাত দিয়ে সাদা মাংসপিণ্ডটা এইভাবে আড়াল করল যেন চোখ দুটো ঢাকা দিয়েছে সে। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড়টা একদিকে কাত করে সেই অবস্থায় বলে উঠল, ''টু...কি!''

সঙ্গে সঙ্গে মালা সাঁতরা চিৎকার করে উঠল, ''লুকিয়ে পড়ো আলোলিকা। লুকিয়ে পড়ো... মেয়ে যেন না খুঁজে পায়। কিছুতেই না খুঁজে পায়...''

আলোলিকার মাথা কাজ করছে না। বোধবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে যেন। সে কী করবে? কী করা উচিত তার? কী করা উচিত? নাহ্, পালাতে হবে এখান থেকে। পালাতে হবে। আলোলিকা এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে ছুট লাগাল সিঁড়ি দিয়ে। এই ঘর, এই বাড়ি, এই তল্লাট ছেড়ে পালাতেই হবে। যে করেই হোক পালাতেই হবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আলোলিকা ছুটল মেন দরজার দিকে... আঁতকে উঠল আলোলিকা। এ কী! মেন দরজা খুলছে না কেন? কে যেন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

সিঁড়ির ওপর থেকে চিৎকার করে উঠলেন মালা সাঁতরা, ''পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না আলোলিকা। তার চেয়ে লুকিয়ে পড়ো... লুকিয়ে পড়ো। আমার মেয়ে আজকে খেলবে তোমার সঙ্গে। খেলবে। আর এই খেলাতে তোমায় জিততেই হবে। না হলে... খিক খিক খিক!'' তারপরেই সেই বিশ্রী খিলখিলে হাসিটা। কী করবে? কী করবে আলোলিকা এখন? ঠিক তখনই তার দৃষ্টি গেল তার রুমে যাওয়ার করিডোরের মুখে। করিডোরের মুখে এখনও লণ্ঠনের আলোগুলো জ্বলছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে আলোলিকা ছুটল সেইদিকে...

কিন্তু করিডোরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই একটা একটা করে আলো যেন আপনা থেকেই নিভে যেতে লাগল... আলোলিকার মনে হচ্ছে, সে যেন মাথা ঘুরে এখুনি পড়ে যাবে। কিন্তু তার তো পড়লে চলবে না। তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচতেই হবে। পেছন থেকে ভেসে আসছে মা-মেয়ের রক্ত-জল-করা খিলখিলে হাসিটা। আলোলিকা দেখতে পাচ্ছে, শেষ লণ্ঠনের আলোটা নিভে যাচ্ছে। তার আগে কোনোরকমে শরীরটাকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে তাকে। ঘরে ঢুকলে যদি বাঁচা যায়... কিন্তু বোকা মেয়েটা জানে না, এই লুকোচুরি খেলা থেকে তার আর মুক্তি নেই। কিছুতেই নেই। তাকে রোজ রাতে ধরা পড়তেই হবে এর হাতে। আর রোজ রাতে শুনতে হবে, ''ধা...প্পা!''

* * * * * * * *

দোতলার দেওয়ালে ঘণ্টাটা ধরে নাড়াতেই টুংটাং করে মিষ্টি শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল সারা বারান্দা জুড়ে। পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের নানান দিকে চোখ ফেরাচ্ছিল।

মালা সাঁতরা মুচকি হেসে বললেন, ''মিস দাস, রাতের বেলা কোনো দরকার পড়লে অনেক সময় ওরা এই ঘন্টিটা বাজায়। খেয়াল রাখবেন।''

পাশে দাঁড়ানো মেয়েটা মাথা নাড়াল। ঠিক এমন সময় দোতলার ঘরের দরজাগুলো খুলে একে একে বাইরে বেরিয়ে এল জনা সাতেক ছেলেমেয়ে। তারা সবাই বারান্দার একপাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াল।

''ও হল মিলি, ওর পাশে রত্না, আর ও হল শ্যামা।'' মালাদেবী তিনটে মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, ''ওরা এক ঘরে থাকে। ওদের পাশে সঞ্জয় আর বিমল। ওরা এক ঘরে থাকে।'' কথাটা শেষ করেই তিনি দুটি বাচ্চা মেয়ের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ''ও হল রিমি। ও ওই ডানদিকের ছোটো ঘরে থাকে। আর ও হল এখানকার সব চেয়ে ছোটো মেয়ে। ও রিমির সঙ্গে এক ঘরেই থাকে।''

মিস দাস ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বাচ্চা মেয়েটির কাছে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে, মুচকি হেসে সে প্রশ্ন ছুড়ল মেয়েটির দিকে, ''কী নাম তোমার?''

উত্তরে ছোট মেয়েটি কিছু বলতে যাবে তার আগেই পেছন থেকে মালা গোমস বলে উঠলেন, ''ওর ভালো নাম আলোলিকা। তবে আমরা ওকে ভালোবেসে আলো বলে ডাকি। আপনিও ওকে ওই নামেই ডাকবেন কেমন?''





বিভা পাবলিকেশন ও ভূত-ভুতুম সাহিত্য গ্রুপ বরাবরই পাঠকদের সঙ্গে জুড়ে থেকে পথ চলতে পছন্দ করে আর আমাদের এই পথ চলায় যুক্ত হয়েছেন এমন অগুণতি পাঠক, যাঁরা ছাড়া আমাদের পক্ষে এতটা পথ এত দ্রুত অতিক্রম করা সম্ভব হত না। ভূত-ভুতুম এখন একটি পরিবারের মতো, আমরা যত এগোচ্ছি পরিবারও বর্ধিত হচ্ছে কলেবরে। এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত সকল সদস্যবৃন্দদের জানাই আমাদের তরফ থেকে প্রাণ-ভরা ভালোবাসা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।



তবে কিছু পাঠক-বন্ধু যাঁরা এই পূজাবার্ষিকী প্রকাশে সরাসরি সাহায্য করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের নাম না নিলেই নয়—

শুচিস্মিতা ধর, জয়া রায়, পৃথা পন্ডিত রায়চৌধুরী, নীলাঞ্জনা ব্যানার্জি, রাজীব কুমার দত্ত, সুনন্দা বিশ্বাস, সুতপা মন্ডল, মধুমিতা সেনগুপ্ত, প্রতীক্ষা ভৌমিক, তনিমা সিংহ রায়, উর্মি মুখার্জি, অরিজিৎ ভট্টাচার্য্য, দেবদূত দে, সোমা রায়, সায়নী সরকার, সাথী রায়, সন্দীপ রায়, নিলয় দে, দীপান্বিতা গোস্বামী মিশ্র, দেবাশিস বিশ্বাস, কাকলী পাল বিশ্বাস, সুমনা মুখার্জি, চিল্কা বিশ্বাস, গৌরব গোস্বামী, প্রিয়া চক্রবর্তী, বিমল মন্ডল, নবনিতা মন্ডল,

বিভা-ভূতভুতুম এর পক্ষ থেকে সকলকে

অনেক অনেক ধন্যবাদ

শুচিস্মিতা ধর

ডাক



(প্রথম পর্ব)

ঠং...ঠকাৎ... ঠং...ঠকাৎ... ঠং...ঠকাৎ... ঠং...

অপটু হাতে প্রাণপণে মাটি কেটে চলেছে সে। পাথুরে জমিতে কোদালের এবড়োখেবড়ো খোঁচায় একটা আধা-ধাতব আওয়াজ উঠছে— ঠং...ঠকাৎ... ঠং...ঠকাৎ... ঠং...ঠকাৎ... ঠং...

জনমানবহীন এলাকাটার থেকে একটু এগোলেই বাঁ হাতে পড়বে একটা সাহেবি আমলের পুরোনো কবরখানা। সেইখানে গর্তটা খুঁড়লেই ভালো হত। ওদিকে খুব একটা যায় না কেউ... ওখানেই পুঁতলে ঠিক ছিল। তবে কিনা, সত্যি বলতে ওইখানে যেতে সাহসে কুলোয়নি।

নিঝুম, নিঃশব্দ রাতে ঝিঁঝিও ডাকছে না। প্রকৃতি যেন নিদারুণ আতঙ্কে নিশ্চুপ হয়ে প্রহর গুনে চলেছে কোনো আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে। আলো বলতে রাস্তার ধারের একটা গ্যাসলাইট আর তার নিজের টর্চটা। যেখানে খোঁড়া হচ্ছে গর্তটি, তার পাশে, অদূরেই পড়ে রয়েছে একটা কালো কাপড়ে জড়ানো চারকোনা ছোটোখাটো জিনিস। দেখে বই মনে হয়। হার্ড কভার।

ঠং...ঠকাৎ... ঠং...ঠকাৎ... ঠং...ঠকাৎ... ঠং...

প্রায় এক-মানুষ সমান গর্ত হলে আগে নিজের হাতটা কনুই অবধি নামিয়ে গভীরতা মাপার চেষ্টা করে সে। হ্যাঁ, বেশ গভীর বলেই মনে হল। তারপর অনতিদূরে পড়ে-থাকা কালো কাপড়ে মোড়ানো জিনিসটি নিয়ে এসে গর্তের পাশে রাখল। উত্তেজনায়, পরিশ্রমে এই হালকা শীতেও ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে তার শরীর। যে করেই হোক, এই জিনিস থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে। কারও হাতে এ জিনিস পড়লে কী হতে পারে, তার আশঙ্কায় নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল সে। অপরাধ হয়ে গেছে, মস্তো বড়ো পাপ। এ জিনিস আর জনসমক্ষে আসতে দেওয়া চলে না।

গর্তটা আর-একবার পরীক্ষা করে নিলে হত না? সাত-পাঁচ ভেবে এবার মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা। মাথাটা ঢুকিয়ে দিল খানিক... আরও একটু... আরও... নাহ্! বেশ গভীর হয়েছে গর্তটা। এর ভেতর পুঁতে ফেললে আর কেউ খুঁজে পাবে না। হাতের ভরে এবার ভেতর থেকে মাথাটা বের করতে থাকে সে। সন্তর্পণে। একটু... আরও একটু...

হঠাৎই গর্তের ভেতরটা নড়ে উঠল কি?

অন্ধকারে বুঝতে না পেরে গর্তের ভেতরটাকে ঠাহর করে দেখতে চেষ্টা করে সে। নাহ্, মনের ভুলই হবে। আবার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই গর্তের মেঝে থেকে বেরিয়ে আসে দুটো কালো, দীর্ঘ নখরযুক্ত হাত! আধগলা, পূতিগন্ধময় সেই হাত দুটি খপ করে তার মাথাটা ধরে ফ্যালে। তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে থাকে মাটির ভেতরে... ভেতরে... আরও ভেতরে। রাতের নিস্তব্ধতা শুষে নেয় তার আর্ত চিৎকার। মাটি ভরে উঠে বুজে যেতে থাকে গর্তটা।

কিছুক্ষণ পর জায়গাটা আবার আগের মতো হয়ে যায়। বোঝাই যায় না ওখানে কোনো গর্ত খোঁড়ার চেষ্টা আদৌ করা হয়েছিল একটু আগেই। কবরখানাটার পেছনের জঙ্গল থেকে রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে ডেকে ওঠে একপাল শৃগাল। বীভৎস, ভয়াবহ ঘটনাটির সাক্ষী হয়ে পড়ে থাকে শুধু কালো কাপড়ে মোড়া জিনিসটা।

ছোটোখাটো, চৌকো... ঠিক যেন একটা বই।

* * * * * * * * *

(এই ঘটনারই দিন, দুপুরে)

এই কলেজের বিশেষত্ব এখানেই, যে এরা অনেকটা আধুনিক স্কুলগুলির মতো এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বা ইসিএ-র নামে কয়েকটা পুরোপুরি ঐচ্ছিক বিষয়ের ক্লাসের ব্যবস্থা করে রেখেছে। বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে গেলে কলেজে ছাত্রদের ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি থাকা আবশ্যক। তবে, প্রধানত সারা সেশন ধরে প্রাত্যহিক ক্লাসগুলিতে অনুপস্থিতির বা ইরেগুলার অ্যাটেন্ডেন্সের কারণে 'ডিসকলেজিয়েট' হয়ে পরীক্ষায় বসা নিয়ে টানাটানি হয় যে সকল স্টুডেন্টের, তাদের 'তরি পার' করে সেই যাত্রা পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়াই হচ্ছে এই ঐচ্ছিক ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করার পেছনে কলেজের মূল উদ্দেশ্যগুলির প্রথমটা।

মানে ধরা যাক, কোনো ছাত্র বা ছাত্রী, যে সারা বছর কলেজে বিশেষ মুখ দেখায়নি, তা সে প্রেমের জন্য হোক বা সদ্যপাওয়া কোনো টিউশন বা ফাইফরমাশ-খাটা গোছের অস্থায়ী চাকরি বাঁচাতেই হোক... তারা যদি কষ্ট করে যে-কোনো একটি ইসিএ ক্লাস অ্যাটেন্ড করে সেখান থেকে কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেটটি বাগাতে পারে, তাহলে ৭৫ শতাংশ অ্যাটেন্ডেন্স না থাকলেও একশো টাকা পেনাল্টি ঠেকিয়ে সে বছর পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে।

আগে এইসব নিয়ম ছিল না, শুধু ফাইনাল পরীক্ষার একটি মাস বাকি থাকতে থাকতে মা, বাবা... (তা সে আসল হোন বা সাজানো) বা লোকাল গার্জেন নিয়ে প্রিন্সিপালের ঘরে দাঁড়িয়ে দুটি কড়া কথা শুনে, মিথ্যা অনুতাপদগ্ধ মুখ-চোখ করে, একশো টাকাটা ফেললেই হত। কিন্তু যেহেতু পাতি গ্র্যাজুয়েশন করে এই বাজারে খেয়ে-পরে বাঁচার সংস্থান আজকাল আর তেমন হয় না, তাই বলতে গেলে স্টুডেন্টদের কল্যাণচিন্তাতেই কলেজের এই পদক্ষেপ। এটাই এই ক্লাসগুলি চালনা করার পেছনে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

নানা বিষয় শেখানো হয় এই ক্লাসগুলিতে। যে যার পছন্দমাফিক সাবজেক্ট চয়ন করতে পারে। গান, কম্পিউটার, ফ্যাশন ডিজাইনিং, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট যেমন আছে, জ্যোতিষশাস্ত্র ও অকাল্ট বিষয়টিও রয়েছে একই সঙ্গে। এই বিদ্যাগুলির প্রত্যেকটিকেই ভাঙিয়ে খাওয়া যায়। তাই ছাত্রছাত্রীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে কলেজের এই প্রয়াস।

পড়াশোনায় নিতান্তই অনিচ্ছুক, ভীষণ রকমের অমনোযোগী, উচ্ছৃঙ্খল গোছের ছেলেমেয়েদের আড্ডা হল এই জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অকাল্ট বা গুপ্ত অতিপ্রাকৃত বিদ্যাচর্চার ক্লাস। সপ্তাহে দু-দিন জিরো পিরিয়ডে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষণ হয়, আর দু-দিন (মঙ্গল ও শনিবার বাদে) অকাল্ট থিয়োরি।

আজকাল আধা দিন স্যার আসেন না, এলেও এরা তাঁর লেকচার মন দিয়ে শোনে না। লক্ষ্য হল কোর্স কমপ্লিশন শংসাপত্রটি। ওইটি পেলেই আর রোজ রোজ কলেজ ঠ্যাঙাতে হবে না।

আজকের ক্লাসটি অকাল্ট থিয়োরির ক্লাস। টি এস স্যার, মানে তাপস শিকদার আজ এসেছেন যদিও, তা-ও ক্লাসে উপস্থিত জনা ছয়েকের মধ্যে ফিসফাস, চাপা হাসি অব্যাহত। একটা কালো কাপড়ে মোড়ানো চারকোনা জিনিস এনেছেন স্যার সঙ্গে করে। দেখে আপাতদৃষ্টিতে বই মনে হয়, হার্ড কভার।

"আজ একটি ইনটারেস্টিং ব্যাপারে তোমাদের বলতে চলেছি... আচ্ছা, পুজো বা ধরো, ঠাকুরকে কোনো আর্জি জানাতে গেলে তোমরা সব সময় সকলের মঙ্গলকামনা করো কি?"

উপস্থিত সকলের চোখ-মুখে সংশয় দেখে তিনি মুখে আলগা একটা হাসি এনে বলে চললেন, "ঠাকুর, আমি যেন পরীক্ষায় অমুকের থেকে বেশি পাই, বা তমুকের ওই কাজটা যেন ঠিকঠাকভাবে সমাধা না হয়, বা... আরও খারাপ কিছু, কখনও বলোনি কেউ? বি অনেস্ট!"

শিক্ষকদের এমন মিশুকে ব্যবহারে প্রায়ই আকৃষ্ট হয়ে থাকে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। সলজ্জ হাসিমুখে ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে সকলেই।

এটাই চেয়েছিলেন তাপস। এরা তাঁর বোঝানোর, বা বিষয়টি যুক্তিগ্রাহ্য করার কাজটা আরও সহজ করে দিল।

"মঙ্গলার্থে যে প্রার্থনা করা হয়, তা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছোবে, এই বিশ্বাসেই যদি প্রার্থনাটা করি, তাহলে অমঙ্গলার্থে যে প্রার্থনা, তা আমরা কাকে উদ্দেশ্য করে করি?"

সকলে চুপ করে রয়েছে দেখে তিনি কালো কাপড়ের মোড়কটির থেকে বের করলেন একটি বাঁধানো বই, হ্যাঁ, বইই বটে। দেখেই বোঝা যায় আদ্যিকালের। কালো রঙের শক্ত কভারের উপর ক্ষয়াটে সোনালি দিয়ে ভাঙা ভাঙা লেখাটা সম্ভবত আরবি ভাষায় কিছু একটা হবে।

"ব্যাফোমেট অথবা বাফোমেট এমন এক অপদেবতা ছিলেন, যাঁর পুজো করাটা একপ্রকার শয়তানের উপাসনা বলে ধরা হত এবং পরবর্তীকালে তা গুপ্ত ও রহস্যবাদী ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোনোপ্রকার অশুভ সাধনা বা অশুভ চিন্তা বা কারও অহিত প্রার্থনা... এইসব সাকার করতে শয়তানের অনুসরণকারীরা ব্যাফোমেটের পূজা করতেন, বলা হয়... যে সকল অমঙ্গলসাধনকারী অনুরোধ, তা সবই ওঁর কাছে গিয়ে পৌঁছোত... বিভিন্ন ধর্মে শয়তানের বা তার অনুগামীর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে, যেমন সেটানিক বাইবেলে ব্যাফোমেট, কোরানে ইবলিশ..."

"স্যার..."

কোণের ছেলেটি হাত তুলেছে দেখে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাত করে থামলেন তাপস।

"বলো..."

"স্যার, তার মানে, কারও খারাপ চাইতে হলে আমরা ভগবানকে ডাকার জায়গায় আসলে শয়তানকে ডেকে ফেলি...?"

থমকে গেলেন তাপস কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপরেই নিদারুণ বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন, "ইয়ারকি হচ্ছে? এটা কি মজা করার বিষয়, অ্যাঁ?... প্রত্যেকটা ব্যাপার ছেলেখেলা মনে হয়? সব কিছুই তোমার ইচ্ছামতো হবে? সিট ডাউন, আই সে সিট..."

হতভম্ব এবং ত্রস্ত ছেলেটি ফ্যালফেলে মুখে বসে পড়ে অগত্যা। তাপস জানেন যে ও কোনো ভুল প্রশ্ন করেনি। একটা লুকিয়ে রাখার মতো ভয়ানক সত্য প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। নিজের তাগিদেই সেটাকে অবান্তর চ্যাঁচামেচি করে ঢাকলেন তিনি। এ কথা আর বাড়তে দেবেন না তিনি, কিছুতেই না।

* * * * * * * *

(আরও দিন তিনেক আগের এক শনিবারের সন্ধ্যা)

"মানস বশীকরণ অন্য ব্যাপার... এতে যার উপর বশীকরণ প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার থেকে প্রচুর ধনসম্পদ, অর্থাদি প্রাপ্তি হয় বশীকরণ যে করাচ্ছে, তার। তুমি তা চাইতে আসোনি হে..." হাসিমুখেই কথাগুলি উপস্থিত তরুণটিকে বললেন মাতৃসাধক শ্রীগোরক্ষানন্দ মহারাজ।

"না, অর্থপ্রাপ্তি নয়, বাড়িঘর, টাকাকড়ি এইসব প্রার্থনা করি না আমি... নিজের চেষ্টায় এইগুলো অর্জন করার ক্ষমতা আছে আমার, বা অদূর ভবিষ্যতে সে ক্ষমতা তৈরি হবে আশা করছি; এইসব না, আমি ধ্বংস চাই, বিনাশ চাই, চরম ক্ষতির ব্যবস্থা চাই..."

"আরে বাবা..." মাঝপথে তাকে থামিয়ে সহাস্যে বলে উঠলেন গোরক্ষানন্দ, "এটা মায়ের থান, আমি মাতৃসেবক।

মঙ্গলকামনা করতে পারি হয়তো, বা কিছু পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা, ওই মানস বশীকরণের কথা তুললে না? কিন্তু এসব খুন, জখম, রাহাজানি, এ কি ভাড়াটে গুন্ডার ঠেক? এগুলোর কোনোটাই মায়ের থেকে চাওয়ার নয়, এতে পাপের সৃষ্টি হয়... ও কথা মুছে ফ্যালো মন থেকে। মায়ের থানে সার্বিক মঙ্গলের কথা বলতে হয়, ব্যক্তিগত রোষের কথা নয়।"

অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে দক্ষিণার ১০১ টাকা টেবিলের উপর একরকম ছুড়ে মারে তরুণটি। তারপর হনহন করে হেঁটে বড়ো দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় বগলা মায়ের মন্দিরের চাতালস্থিত ছোট্ট ঘরটির থেকে। মনে প্রচুর আশা নিয়ে এখানে এসেছিল সে... ঠাকুরকে বললে তো সব হয়। তার অসীম ক্রোধ, ঘৃণা ও সুতীব্র প্রতিহিংসার সাতকাহন শুনে কি মা তার অভীষ্ট বিনাশসাধনে তাকে সাহায্য করবেন না? মন্দিরের পূজারি গোরক্ষানন্দ বাবা তাকে ফিরিয়ে দিলেন পত্রপাঠ। পারতেন না তিনি, মহাশক্তির কাছ থেকে তার প্রতি হওয়া অপরাধের সুবিচার পাইয়ে দিতে?

তার চলে যাওয়ার রাস্তার দিকে দুঃখিত, চিন্তান্বিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন বগলা মায়ের একনিষ্ঠ পূজারি ব্রাহ্মণ গোরক্ষানন্দ। বশীকরণ, মাদুলি, তাবিজ, কবচ— এইসব অল্পবিস্তর পারেন বটে, কিন্তু এই সাংঘাতিক মনোভাবের পরিবর্তন কোন বিদ্যায় করবেন তিনি? দ্বিতীয় রিপুর বশবর্তী হয়েছে ছেলেটা। ক্রোধ বড়ো ভয়ানক জিনিস। ও যাতে ক্রোধের বশে ভয়াবহ কিছু না করে ফ্যালে, সে দুশ্চিন্তায় বুক কেঁপে উঠছে তাঁর। সীমিত ক্ষমতা তাঁর, একে রুখতে তিনি পারবেন না চট করে।

সবে মন্দিরের দরজা বন্ধ করবেন ভেবে ঘরটি থেকে বেরিয়ে চাতালে উঠেছিলেন তিনি, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে চূড়ান্ত অমঙ্গলের আশঙ্কায় যারপরনাই সন্ত্রস্ত হয়ে আবার ধপ করে বসে পড়লেন চাতালেই।

বগলা মায়ের মূর্তিটির দক্ষিণ হস্তের গদাটির মুখ আপনা-আপনি নীচের দিকে ঘুরে গেছে! বগলামুখী বা বগলা হলেন হিন্দু দশমহাবিদ্যা দেবমণ্ডলীর অন্তর্গত অন্যতম দেবী। তিনি ভক্তের মানসিক ভ্রান্তিনাশের দেবী। তবে কি ভক্তের ভ্রান্তি নাশ না করতে পেরেই তাঁর অস্ত্রমুখ শেষে নিম্নগামী হল? কোন ভ্রান্তিতে পড়ে কী এমন সর্বনাশা কাজ করতে চলেছে ছেলেটি?

* * * * * * * *

(এ ঘটনারও মাসখানেক আগে, আরেক শনিবার)

শনি ও মঙ্গলবার করে তাপস কোথাও বের হতে চান না বাড়ির থেকে। ওই দুটি দিন তিনি নিরামিষ খান এবং শুদ্ধাচারে থাকেন। ঘুম থেকে উঠে স্নান এবং প্রাতঃকৃত্য সারা হলে আরাধ্য দেবতার উপাসনা করে বই পড়তে বসেন।

বই, বিশেষত গুপ্তবিদ্যার বই খুব ভালো লাগে তাপসের। সারাদিন কেটে যায় বইতে মজে থেকে। বিয়ে করেননি, কলেজে পড়ান, মা-বাবা এবং একটি সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় বিমাতা গত হওয়ার পরে এই সুবিশাল বাড়িতে তিনি মোটামুটি একাই থাকেন এখন।

ঠিক একা বলা চলে কি? একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর বুক থেকে, নিজের অকারণ একাকিত্ব নিয়ে ভাবলেই। একটি বৈমাত্রেয় ভাই আছে তাঁর। এই বাড়িতেই থাকে সে। তিনি ভাইয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করলেও সে দাদার সঙ্গে কোনোপ্রকার সৌহার্দ্য রাখতে চায় না।

নিজের প্রথম পক্ষের স্ত্রী-র অকালমৃত্যুর পরে নিতান্তই শিশু তাপসকে মানুষ করার তাগিদে আরেকটি বিয়ে করেছিলেন তাঁর বাবা ত্রৈলোক্যনাথ শিকদার। কিন্তু বরাবর নিজের সুযোগ্য বড়োছেলেকেই বিশেষ পছন্দ করতেন তিনি। ছোটোছেলে অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-র সন্তানকে যে দেখতে পারতেন না তা নয়। তবে নিজের সুবিশাল প্রতিপত্তি, ব্যাবসা ও জমিজিরেতের সকল দায়িত্ব, কর্তব্য, ভালোমন্দ উনি দায়িত্বশীল বড়োছেলের হাতেই তুলে দিতে চেয়েছিলেন।

ফলস্বরূপ, ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী মৃন্ময়ী দেবী এবং কনিষ্ঠ পুত্র, মৃন্ময়ীর ছেলে তন্ময়, কেউই তাপসকে মন থেকে পছন্দ করতেন না কোনোকালেই। তাঁদের ব্যবহারে সেই অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠত অনুক্ষণ। মাছের বড়ো টুকরোটি তন্ময়কে দেয়া থেকে সব কিছুরই অসম বিভাজন করে নিজের ছেলেকে সব কিছু উত্তম এবং প্রয়াতা সতিনের ছেলেকে সব কিছু অধম প্রদান করাটাই স্বাভাবিক ছিল মৃন্ময়ীর কাছে।

তন্ময়ও মা-র প্ররোচনায় দাদাকে শিশু বয়স থেকেই এড়িয়ে চলত। মাঝে মাঝেই ছোটোখাটো অকিঞ্চিৎকর কারণে দ্বন্দ্ব বাধত দুই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মধ্যে। ত্রৈলোক্যনাথ বুঝতেন-শুনতেন সব কিছুই, কিন্তু গৃহকলহ যাতে আরও সাংঘাতিক পর্যায়ে না পৌঁছোয়, সেই ভয়ে মুখ বন্ধ করে রাখতেন তিনি। ক্রমে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে একদিন মারা গেলেন ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর উইল অনুযায়ী সমস্ত সম্পত্তির

মৌলিক হয়ে বসলেন তাপস।

মৃন্ময়ী এবং তন্ময়ের ক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোল এতে। তাপসের প্রতি দুর্ব্যবহার, কথায় কথায় কটুবাক্য, এমনকি নানা উপায়ে তাকে মারার চেষ্টা করতে থাকলেন মৃন্ময়ী। তিনি গ্রাম-বাংলার মেয়ে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে বড়ো হয়ে তুকতাক, বাটি চালান— এইসবে বিশ্বাস করেন। নিজেও বাড়িতে এসব করার চেষ্টা করতে লাগলেন সতিনপুত্রের বিনাশকামনায়।

এমতাবস্থায় হঠাৎই আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে শুধু তাপস আর মৃন্ময়ী ছিলেন। তন্ময় গিয়েছিল কোনো বন্ধুর বাড়িতে। তাপস কী একটা কারণে বাড়ির ছাদে উঠে এক আজব দৃশ্য দেখে থমকে গেলেন। অমাবস্যা তিথির সন্ধ্যা, সূর্যডুবি হয়েছে তা-ও প্রায় অনেকক্ষণ। ছাদের দরজা ভেজানো ছিল, তাপস ঠেলে ঢুকে দেখলেন, মৃন্ময়ী ছাদের এক কোনায় একটা কালো ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। খোলা চুল, কালো শাড়ির লুটোনো আঁচল হাওয়ায় উড়ছে, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন পরপার থেকে আসা কোনো বিদেহী আত্মা নিজের উপস্থিতি গোপন করতে ওই কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাদে ঢোকার আগে খেয়াল করেননি তাপস, একটা মৃদু মন্ত্রোচ্চারণের শব্দও আসছে ওইদিক থেকেই, যেখানে মৃন্ময়ী দাঁড়িয়ে আছেন। মন্ত্রের ভাষা দুর্বোধ্য, সুরটিও কেমন যেন ভীতি উদ্রেককারী। এ ছাড়াও লক্ষণীয় ছিল একটি বিশ্রী দুর্গন্ধ। মাংস পচে গেলে যেমন হয়, তেমনি একটা গন্ধ যেন ঘিরে রেখেছে গোটা ছাদটিকে।

"ছোটোমা..." ডাকলেন তাপস, কিছুটা হতবুদ্ধি হয়েই। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল মন্ত্রের আওয়াজ। হঠাৎই ভেসে এল এক ভয়ানক 'আঁক' শব্দ। নারকীয়, আর্ত, নারীকণ্ঠের মরণ চিৎকার। মৃন্ময়ীর চিৎকার। কালো, অপার্থিব ধরনের ধোঁয়াটে ছায়াটা, যাকে তাপস মৃন্ময়ী মনে করেছিলেন, সেই ছায়াটিই এতক্ষণ আড়াল করে রেখেছিল আসল মৃন্ময়ীকে। সম্ভবত কোনো পুজো বা আরাধনায় বসেছিলেন মৃন্ময়ী, সামনে সাজানো অদ্ভুত সামগ্রীগুলি দেখে যদিও মনে প্রশ্ন জাগে যে কোন দেবতার পুজো এটা...। একটা মরা কালো বেড়াল, মরা কাক, দুটো বড়ো হাড্ডি, দেখে মনে হয় গোরু বা মোষের পায়ের হাড়, এক কৌটো সিন্দুর, কয়েকটি সুচ, একটা লেবু এবং একটা বই। হ্যাঁ, কালো, চতুষ্কোণ একটা বই, যেটার থেকে তিনি মন্ত্রপাঠ করছিলেন।

তাপসের ডাকে তাঁর মন্ত্রপাঠ বন্ধ হয়ে যাওয়ামাত্র সেই আশ্চর্য কালো ছায়াটি একপ্রকার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মৃন্ময়ীর উপর। তাঁর ঘাড় ধরে মাথাটি ঘুরিয়ে দিয়েছিল পিছনদিকে। 'আঁক' শব্দটি করে তখনই ছাদের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মৃন্ময়ী। একই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই অপার্থিব ছায়াটিও।

এই ঘটনায় যারপরনাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখভঙ্গি করে তাপস কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন ছাদে। তিনি যা দেখলেন তা কি আদৌ সত্যি? এ কি সম্ভব কোনোভাবে? পাগলের মতো দৌড়ে নীচে নেমে এসে তাপস পুলিশকে ফোন করলেন হাউমাউ করে।

* * * * * * * * *

(দ্বিতীয় পর্ব)

তন্ময় মায়ের এই আশ্চর্য মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিল তাপসকেই। তাপস প্রায় সব কথাই সঠিক জানিয়েছিলেন পুলিশকে। মুখে-চোখে সাংঘাতিক ভয়ের অভিব্যক্তি নিয়ে। তাঁর কথাগুলি কোনোভাবেই পুলিশ বা তন্ময়ের যুক্তিগ্রাহ্য মনে হল না এবং সেটাই স্বাভাবিক। বাড়িতে একা পেয়ে দাদা মা-কে নৃশংসভাবে খুন করেছে— এই ছিল তন্ময়ের বক্তব্য। আইনি প্রমাণের অভাবে এবং ঘটনার বর্ণনা আদালতে শোনাবার পরে যদিও তাপসের কোনো শাস্তিই হল না। উলটে তাঁর মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন— এই রায় দিয়ে আদালত তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

প্রায় এক মাস কেটে গিয়ে কেসটি আনসল্‌ভ্‌ড মিস্ট্রির ফাইলবন্দি হয়ে যায় অচিরেই। মৃন্ময়ীর মৃতদেহের পশে পাওয়া সামগ্রীগুলির মধ্যে বিড়াল ও কাকের দেহ দুটি পচনশীল বলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। বাকিগুলো পুলিশি তদন্তের পরে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে তন্ময়।

দাদার অপরাধ প্রমাণ করা গেল না দেখে এক বন্ধুর মুখে নাম শুনে গোরক্ষানন্দর সঙ্গে দেখা করে আজ দাদার ক্ষতির প্রার্থনা করতে গিয়েছিল সে। তিনি ফিরিয়ে দিলেন যখন, সে আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না। সত্যিই, ঈশ্বরকে নালিশ করলে সুবিচার পাওয়া যায় না। গেলে হয়তো সব অত্যাচারিত মানুষই তা-ই করতেন।

দাদাকে কোনোকালেই পছন্দ করে না সে। আগাগোড়াই লোকটাকে বিড়ালতপস্বী মনে হয় তার। বই নিয়ে সারাদিন বসে থাকলেই যে ভালো মানুষ হওয়া যায় না, দাদা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ছোটোবেলার থেকেই দাদার প্রতি বাবার অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখে দেখে তন্ময়ের ক্ষোভ উত্তরোত্তর

বেড়েই চলেছিল। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে সেই ক্রোধ। ঠাকুরের কাছে সুবিচার পাওয়া গেল না যখন, অন্য কোনো ব্যবস্থা করবে সে।

দাদা তাপসের বইয়ের বিপুল কালেকশন মাঝে মাঝে ঘেঁটে দেখার অভ্যেস আছে তার। না, বই পড়াতে ইনটারেস্ট নেই মোটেই। বইগুলি ঘেঁটে সে অনেক সময় বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য বই পেয়েছে, যেগুলির বই-বাজারে বিশাল দাম। অসময়ে কাজে লাগাত সে ওইসব বই। বাবা সম্পত্তির মালিকানার ভাগ দেবেন না যখন, সে এইভাবেই বাবার ছেলেকে লুটবে। মা-র মৃত্যুর দিন তিনেক পরে দাদার বইয়ের দেরাজ ঘাঁটতে গিয়ে একটা বই পেয়েছিল সে। বেচব বেচব করেও বেচেনি।

সুপ্রাচীন বইটার নাম হল 'কিতাব-অল-আজফ'। আরবি ভাষায় লেখা বইটি বেশ ভালো দামেই বিক্রি হবে মনে করে সে সাত তাড়াতাড়ি বইটি হাতিয়ে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। আজ গভীর রাতে বাথরুম সেরে বেরোতে গিয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে থমকে যায় তন্ময়।

ঘরের কোনায় যে ব্যাগের মধ্যে বইটি লুকিয়ে রেখেছিল সে, সেই ব্যাগটির থেকে এক আশ্চর্য নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে ব্যাগটি খুলে সে দ্যাখে, আলোটা ওই বইটার থেকেই বেরোচ্ছে। মোহাবিষ্ট হয়ে বইটি খোলে সে।

খুলে আরও চমৎকৃত হয়ে যায়। কোথায় আরবি বই? এ তো বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় লেখা! মন দিয়ে পড়তে শুরু করে তন্ময়। প্রতিটি পাতায় শয়তান ও তার মাহাত্ম্যের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া রয়েছে।

'শয়তান' শুধু একটি নাম নয়। এটি একটি ধারণা বা কনসেপ্ট, যাকে বিভিন্ন ধর্মে এক অপশক্তির মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়। আত্মার ক্ষতিসাধন, মহানুভবতার বিনাশ এবং শুভশক্তির ধ্বংসের প্রয়াসে সচেষ্ট এই আঁধারময় সত্তা, সারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটি ডাকের অপেক্ষায় ঘুরে বেড়ায়। ডাক পেলেই সে আহ্বানকারীর কাছে পৌঁছে যাবে। সাহায্য করবে তাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে।

"তবে শুধুমাত্র অশুভ ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পারে এই দুষ্ট ও প্রতিহিংসাপরায়ণ সত্তা। কারও ভালো করার উদ্দেশ্য বা ক্ষমতা তার কখনোই নেই।"

বইটির শব্দগুলি, প্রত্যেকটি লাইন... কী ভীষণ তথ্যপূর্ণ! এবং প্রত্যেকটি তথ্যই তন্ময়ের প্রয়োজনীয়। তার লক্ষ্যে তাঁকে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় তন্ময় এই কথা, যে বইটি প্রথমবার খোলার সময় সে স্পষ্ট দেখেছিল বইটি আরবি ভাষায় লেখা। প্রতিশোধের নেশায়, ক্রোধের আগুনে তার দগ্ধ চেতনা তাকে এই আশ্চর্যজনক ঘটনাটি কিছুতেই অনুধাবন করতে দিল না।

একটি পাতায় এসে চোখ আটকে যায় তার। কীভাবে ডাকতে হবে শয়তানকে, তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া রয়েছে সেই পাতায়। সামান্য কিছু উপকরণ, যে-কোনো দুটি মৃত প্রাণীর শরীর, মোষের পায়ের হাড়, একটি লেবু, কয়েকটি সুচ, সিন্দূর এবং অমাবস্যা তিথি। প্রাণী দুটি অবশ্যই মৃত হতে হবে। আহ্বায়ক ছাড়া কোনো জীবন্ত প্রাণীর থাকার নিয়ম নেই। পুজোর বা ডাকের মাঝে উঠে পড়ার বা মন্ত্রপাঠ থামানোর নিয়ম নেই। থামলেই মহাসর্বনাশ! শয়তান তার প্রতি ভক্তের অভক্তি দেখলে তৎক্ষণাৎ সেই ভক্তের প্রাণ কেড়ে নেয়।

চমকে উঠল তন্ময়। আজ অমাবস্যা না? হ্যাঁ, শনিবার, অমাবস্যাই বটে। মা-ও এইগুলি জোগাড় করেছিলেন, এসব ওঁর ঘাড়-ভাঙা, বিকৃত মরদেহের পাশ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছে সে। দাদা তাহলে মিথ্যে কথা বলেনি পুরোপুরি! হয়তো মা এগুলো গুছিয়ে নিয়ে বসেছিল সবে। দেখতে পেয়ে দাদা মা-কে খুন করে কোনো কাল্পনিক কালো শাড়ি-পরা পেতনির নামে খুনটা চাপিয়ে এখন দায় এড়াতে পাগল সাজছে।

কিন্তু মা এই বইটা পেল কোথায়? এ বই তো তার মৃতদেহের পাশ থেকে আবিষ্কৃত হয়নি!

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলতে থাকে তন্ময়ের মনটা। কাঁপা হাতে পরের পৃষ্ঠা ওলটায় সে। পরের পাতায় মন্ত্র লেখা আছে। শয়তানকে আনার মন্ত্র। হরফ বাংলাই, কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য।

একটা মরা আরশোলা পড়ে আছে ঘরের কোণে। আর-একটা? একটু এদিক-সেদিক তাকাতেই চোখে পড়ে যায় তন্ময়ের। ডানা-ভাঙা খয়েরি মথ। শরতের বিকেলে খুব ওড়াউড়ি করে এগুলো। তারই একটা হবে।

হাড়, সুচ, সিন্দূর— এগুলো তো মা নিজেই জোগাড় করেছিলেন, প্লাস্টিকে মোড়া জিনিসগুলি খাটের তলাতেই রাখা আছে। লেবু খুঁজলেই পাওয়া যাবে ফ্রিজে।

উপকরণগুলি গুছিয়ে নিয়ে বসে তন্ময়। আজ প্রথমবার সে শয়তানকে ডাকবে। আকুল হয়ে সুবিচার প্রার্থনা করবে তার কাছে।

রাত সাড়ে তিনটে। দাদা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। তন্ময় মন্ত্রপাঠ শুরু করে। ধীরে ধীরে তার মন্ত্রোচ্চারণ একটা ভয়াবহ সুর ধরে। যেন নরকের অতল থেকে উঠে-আসা প্রেতের হাহুতাশ। চারিদিক ক্রমে ভরে ওঠে মাংস পচার তীব্র দুর্গন্ধে।

মন্ত্রপাঠে বিভোর হয়ে থাকা তন্ময় খেয়াল করে না, যে তার ঠিক পিছনেই মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে ভেসে রয়েছে একদম তারই মতো দেখতে একটি অবয়ব। ঘোরতর কালো তার গাত্রবর্ণ, পরনে কালো পোশাক, ঘাড়টি একদিকে সামান্য বেঁকানো। নিজের ছায়াময় শরীর দিয়ে সে আড়াল করে দাঁড়ায় তন্ময়কে।

* * * * * * * *

(শেষ পর্ব)

(সে রাতের দিন তিনেক পরে)

তিন দিনের মাথায় অপঘাতে মৃত ভাইয়ের অন্তিম ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একে একে শুভানুধ্যায়ীদের বিদায় দিলেন প্রফেসার তাপস শিকদার। তারপর অশান্ত মনটা নিয়ে ঘরে ঢুকে বসলেন।

পৃথিবীতে এখন তিনি সত্যিই একা। নিজের বলতে কেউ নেই তাঁর। কেউ না।

বিষাদময়, ভাঙা মন নিয়ে সিলিঙের দিকে অর্থহীন, ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কাউকে নিজের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি কোনোদিনই। নির্বিবাদী মানুষ হিসেবেই এ সমাজে তাঁর নাম রয়ে গেছে। বই পড়া আর পড়ানো ছাড়া তিনি আর তেমনভাবে কীসের মধ্যেই বা থাকেন?

ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ গেল তাকে সাজিয়ে-রাখা তাঁর অমূল্য বইগুলোর দিকে। বড়ো কষ্ট করে খেটেখুটে তৈরি করা তাঁর বইয়ের কালেকশন। তিনি জানতেন যে তন্ময় তাঁর বই চুরি করে বাজারে বেচত। তা-ও ভাইকে কিছু বলেননি মুখ ফুটে কখনও।

সব ভালো এবং উল্লেখযোগ্য বই যদিও তন্ময় বেচে দিতে পারেনি। তেমনই একটি হল ওই বইটা। ওই যে... কালো রং, হার্ড কভারের বইটা...

'কিতাব-অল-আজফ' তাপসের সেরা সংগ্রহের মধ্যে একটি। এক ফকিরকে একবেলার খাবার খেতে দিয়ে তাঁর থেকে বইটি পেয়েছিলেন তিনি। আরবি ভাষায় লেখা দেখে বইটি তখনই ফেরত দিতে যাচ্ছিলেন। ফকির বলে উঠল, ''অগর পড়না চাহতেঁ হ্যায় তো ইয়ে কিতাব খুদ আপ কি বস মেঁ আয়েগি জনাব... লে জাইয়ে হুজুরালি, পড়কে জরুর দেখনা...''

নতুন বই পড়ার কৌতূহলে তাপস সেদিন খেয়াল করেননি, যে তার বইটি হাতে নিয়ে পিছন ফেরামাত্র ওই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল ফকিরটি। আর তার চিহ্নমাত্র দেখতে পাওয়া যায়নি।

বইটা মন দিয়ে পড়েছিলেন তাপস। আদ্যোপান্ত। বইটি নিজেই বাংলায় অনূদিত হয়ে নিজেকে পড়িয়ে নিয়েছিল। তাপস নিষ্ঠাভরে সব নিয়ম মেনে শয়তানকেও ডাক দিয়েছিলেন। এসেছিল সে।

শয়তানই মৃন্ময়ীর ঘরের বাইরে বইটি ফেলে রেখে এসেছিল তাঁর ও তন্ময়ের অলক্ষে, তাপসের আদেশে। তারপর সেই ক্রিয়ার মাঝে ইচ্ছা করেই ব্যাঘাত ঘটিয়েছিলেন তাপস নিজেই, মৃন্ময়ীর 'ডাক' নষ্ট এবং ডাকের মাঝে মন্ত্র থামানোর ফলে শয়তানেরই দ্বারা তার প্রাণনাশ করার জন্য। মৃন্ময়ীর মৃত্যুর পরে তাপস বইটা চুপিচুপি কুড়িয়ে নিয়ে স্বস্থানে রেখে দিয়েছিলেন।

ঠান্ডা মাথায় ওই বিশেষ বইটি তন্ময়ের চোখে পড়ার মতো জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন তিনিই। বাকি কাজ তো সোজা।

সেই রাতে যখন তন্ময় শয়তানকে ডেকে আনার প্রক্রিয়ায় মত্ত, তার মন্ত্র যখন প্রায় শেষ, তখনই হঠাৎ পায়ের কাছে, মাটির উপর, কিছু একট চলমান জিনিসের একঝলক আড়চোখে দেখতে পেয়ে চমকে যায় সে। মথটা অল্প অল্প নড়ছে। সে কি? তবে কি সে মরেনি এখনও? নিদারুণ ভীতিতে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তন্ময়ের মন্ত্রপাঠ। আর তারই সঙ্গে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে-থাকা, তারই মতো দেখতে ছায়াটি।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে-থাকা তাপসের মুখে খেলে গিয়েছিল কুটিল হাসি। আধমরা মথটা তো ভাইয়ের ঘরে ফেলে এসেছিলেন তিনিই। সেই সময়, যখন তন্ময় গোরক্ষানন্দর কাছে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। মথ আর আরশোলাটা ছাড়া ঘরে একটি মাছিও রাখেননি তিনি। যাতে মৃত প্রাণী খুঁজতে গিয়ে তন্ময়ের চোখ ওই দুটো জিনিসের উপর অবশ্যই পড়ে এবং ক্রিয়ার সময় মথটি ছোঁয়া পেয়ে বেঁচে ওঠার শেষ চেষ্টায় নড়ে ওঠে। একবার হলেও।

তন্ময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলে ঠিকই দেখতে পেত যে মথটি মরেনি। শুধুমাত্র ডানায় জখম হওয়ার দরুন পড়ে ছিল নির্জীব হয়ে। সে খেয়াল করেনি, তাই মন্ত্রপাঠ চমকে উঠে থামিয়ে ফেলে শয়তানের শিকার হয়েছে।

আজ ভাইয়ের মৃত্যুতে তাপস একা হয়ে গেলেন। আর তাঁর শত্রু রইল না। এই বাড়ি, ঘর, সম্পত্তি, আজ থেকে সব কিছুই তাঁর।

শনি ও মঙ্গলবার করে সকলের সামনে লোক-দেখানো শুদ্ধাচার করে, তারপর রাতে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে নিয়মিত শয়তানের আরাধনা করে গেছেন তাপস। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে শয়তান সেই যে এসেছিল, সে আর যায়নি। এখানেই রয়ে গেছে সে। তাপসের ভেতরেই।

এই বই আসলে একটা সত্য উদ্‌ঘাটন করে দেয় পাঠকের কাছে। প্রতিটি মানুষের মনে ভালো ও মন্দ দুইটি সত্তাই একসঙ্গে থাকে। অশুভ সত্তার থেকে শুভ সত্তার শক্তি ও পাল্লা বেশি ভারী হওয়ায় মানুষ শুভাশুভ বিচারে সক্ষম হয়। এই বই আসলে প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে থাকা তারই আঁধারময় দিকটিকে বাইরে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। তাই যে-কোনো ব্যক্তির ডাকে সাড়া-দেওয়া শয়তান একদম সেই ব্যক্তির মতোই দেখতে হয়।

তাপসের ডেকে-আনা শয়তানও দেখতে একদম তাঁরই মতো। যখন সে বেরিয়ে আসে তখন নানা নোংরা, অনৈতিক এবং বিনাশকারী কাজ করে বসেন তিনি। সেইসব কাজের জেরে তাঁর শরীর ও মনের উপর চাপ পড়তে থাকে। দৈনন্দিন কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। কলেজ যাওয়া হয় না তারপর কিছুদিন।

মৃন্ময়ীর এবং তন্ময়ের সুপরিকল্পিত খুনের জন্যও তাঁর ভেতরের শয়তানটি দায়ী। ভাবতে ভাবতে আজ ভাবান্তর ঘটল তাঁর। মুখে শোকের ছায়ার জায়গা নিল অসম্ভব কুটিল সেই হাসি।

যাক, কাল অনেকদিন পর কলেজ যাবেন তিনি। একটি গুরুত্বপূর্ণ লেকচার রয়েছে তাঁর। হালকা মনে ঘুমিয়ে পড়লেন তাপস, বা তাঁর মধ্যে থাকা তাঁরই মতো কেউ।

এই বিশাল ফাঁকা বাড়িতে একা থাকতে কখনোই ভয় লাগেনি তাপসের। যার সঙ্গে স্বয়ং শয়তান আছে, তার আবার কীসের ভয়? রাতে ভয়ের স্বপ্নও দেখেন না কোনোদিন।

কিন্তু আজ রাতের শেষে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি আয়নার সামনে বসে আছেন। তাঁর চোখে ভীতি, উৎকণ্ঠা, কিন্তু আয়নায় তাঁর প্রতিবিম্বের মুখে ক্রূর হাসি। তিনি অবাক হয়ে সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই হঠাৎ তাঁর প্রতিবিম্ব আয়না ভেদ করে নিজের হাত বাড়িয়ে হিড়হিড় করে টেনে নেয় তাঁকে আয়নার ভেতরে। কয়েদ হয়ে যান তিনি সেখানে। তাঁর প্রতিবিম্বটি তাঁর জায়গায় বেরিয়ে আসে আয়না থেকে। তাঁর অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়ে তাঁরই কলেজের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পেছন ফিরে তাকায় তাঁর দিকে। তারপর মুচকি হেসে বেরিয়ে যায় ধীরপায়ে।

এতটাই জীবন্ত স্বপ্ন যে ভয়ে চিৎকার করে জেগে ওঠেন তাপস। সারা গা ভিজে গেছে ঘামে। তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে ভোরের নরম আলো এসে ঢুকছে ঘরে।

এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কেন দেখলেন তিনি? তবে কি তাঁর দ্বিতীয় সত্তাটি চাইছে পৃথিবীতে তাঁর স্থানটি দখল করতে?

আনমনে তৈরি হয়ে বইটা নিয়ে কলেজ গেলেন। ক্লাস নিতে গিয়ে যখন শয়তানের অনুগামীদের কথা স্টুডেন্টদের বোঝাচ্ছেন, তখনই হঠাৎ বেয়াড়া প্রশ্নটা করে বসল ছেলেটি, "স্যার, তার মানে, কারও খারাপ চাইতে হলে আমরা ভগবানকে ডাকার জায়গায় আসলে শয়তানকে ডেকে ফেলি..?"

উত্তর দিতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাপস দেখলেন, ছেলেটির পাশে বসে রয়েছে তাঁর দ্বৈত সত্তা, তাঁরই ডেকে আনা নরকের বাসিন্দা, তাঁরই মতো দেখতে, শয়তান। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে।

রাগে, ক্ষোভে ফেটে পড়ে তাপস বলে উঠলেন, "ইয়ারকি হচ্ছে? এটা কি মজা করার বিষয়, অ্যাঁ?... প্রত্যেকটা ব্যাপার ছেলেখেলা মনে হয়? সব কিছুই তোমার ইচ্ছামতো হবে? সিট ডাউন, আই সে সিট..."

বললেন কথাটা ওই শয়তানকে, ছেলেটা মনে করল, তাকে বলেছেন।

আর বেশিক্ষণ ক্লাস নিতে পারলেন না তিনি। যেটুকু সময় পড়ালেন, ওই অমঙ্গলের ছায়াটি তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে রইল ঠায়।

সেদিন লোকমুখে নাম-শোনা গোরক্ষানন্দর থানে গেলেন। বগলা মায়ের সাধক গোরক্ষানন্দ নিজের স্থাপন-করা মাতৃমন্দিরের চাতালেই একটি ছোট্ট ঘরে থাকেন। তাপস হাজারো চেষ্টা করেও কিছুতেই মন্দিরের চাতালে উঠতে পারলেন না। পায়ের তলায় অসহনীয় জ্বালা করতে লাগল, যেন আগুনে পা দিয়েছেন। আকুল হয়ে বাইরে থেকেই গোরক্ষানন্দকে ডাকতে লাগলেন তিনি।

ডাক শুনে বেরিয়েওছিলেন সাধক। কিন্তু তাপসকে দেখে চমকে ওঠেন তিনি। কুচকুচে কালো ভীষণদর্শন মুখ, হাতে বিশাল নখ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দেখে গোরক্ষানন্দ নিজের হাতের গঙ্গাজলের জারিকেন থেকে এক আঁজলা জল তার গায়ে ছুড়ে মারতেই আর্তনাদ করে তাপস একরকম দৌড়ে পালালেন।

পালাবার সময় নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন তাপস। তবে কি স্বপ্নে যা দেখলেন তা সত্যি? কোনো মানুষ যে গঙ্গাজলের ছিটে পেলে আর্তনাদ করে ওঠে, তা তাঁর জানা ছিল না।

তাঁর মনে হতে লাগল যে বইটা তিনি সম্পূর্ণভাবে পড়েননি। কিছু একটা বাকি রয়ে গেছে।

তাই বাড়ি ঢুকে আজ প্রথমেই বইটা নিয়ে বসলেন। সত্যি তো! শয়তান আনয়নের মন্ত্রের পরে আর তো বইটা পড়া হয়নি।

বই খুলে দেখলেন, একদম শেষ পাতায় লেখা আছে— "শয়তানকে একবার ডেকে আনলে আর তাকে ফেরত পাঠানো যায় না। শেষ অবধি সে রয়ে যায় আহ্বায়কের সঙ্গে। তার সত্তাকে গ্রাস করতে থাকে ধীরে ধীরে। ক্রমে পৃথিবীতে আহ্বায়কের জায়গাটা তার হয়ে যায়।" আরও কিছু লেখা ছিল... তাপস আর পড়তে পারলেন না।

এ বইয়ের সদ্গতি আজই করতে হবে। একে তো আর সঙ্গে রাখা যায় না। শহরের উত্তর প্রান্তে একটা পোড়ো জমি আছে, একটা পুরোনো কবরখানার পাশে। কেউ যায় না ওদিকটায়। বইটা ওখানেই পুঁতে ফেলবেন উনি। আজ রাতেই।

সেইমতো আজ রাতে বইটি চিরতরে লুকিয়ে ফেলতে এসেছেন তিনি। অপটু হাতে প্রাণপণে মাটি কেটে চলেছেন। পাথুরে জমিতে কোদালের এবড়োখেবড়ো খোঁচায় একটা আধা-ধাতব আওয়াজ উঠছে,

ঠং...ঠকাৎ... ঠং...ঠকাৎ... ঠং...ঠকাৎ... ঠং...

আচমকা গর্তের মেঝেটা নড়ে উঠতে দেখলেন বলে মনে হওয়ায় মাথাটা গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে কী দেখলেন তা ঠাহর করতে গিয়েছিলেন। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই গর্তের মেঝে থেকে বেরিয়ে আসে দুটো কালো, দীর্ঘ নখরযুক্ত হাত! আধগলা, পূতিগন্ধময় সেই হাত দুটি খপ করে তাঁর মাথাটা ধরে ফ্যালে। তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে থাকে মাটির ভেতরে... ভেতরে... আরও ভেতরে। রাতের নিস্তব্ধতা শুষে নেয় তাঁর আর্ত চিৎকার। মাটি ভরে উঠে বুজে যেতে থাকে গর্তটা।

কিছুক্ষণ পর জায়গাটা আবার আগের মতো হয়ে যায়। বোঝাই যায় না ওখানে কোনো গর্ত খোঁড়ার চেষ্টা আদৌ করা হয়েছিল একটু আগেই। পুরোনো কবরখানাটার পেছনের জঙ্গল থেকে রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে ডেকে ওঠে একপাল শৃগাল। বীভৎস, ভয়াবহ ঘটনাটির সাক্ষী হয়ে পড়ে থাকে শুধু কালো কাপড়ে মোড়া বইটা।

কয়েক মুহূর্ত পরে কেউ একজন এসে দাঁড়ায় জায়গাটাতে। ঝুঁকে পড়ে কুড়িয়ে নেয় বইটা। বইটার শেষ পৃষ্ঠা পুরোপুরি পড়তে পারেননি তাপস। ভীতি তাঁর মনোযোগ বিনষ্ট করেছিল।

সে পৃষ্ঠায় শেষ লাইনগুলি ছিল— "শয়তানকে যে আপন করে, ঈশ্বর তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তার বিনাশের সময় রক্ষাকর্তা অনুপস্থিত থাকেন, এবং পৃথিবীতে তার শূন্যস্থানটি শয়তান পূর্ণ করে।"

বইটা কুড়িয়ে নিয়ে একবার পেছন ফিরে বুজে-যাওয়া গর্তটার দিকে তাকায় তাপসের ডেকে-আনা, অবিকল তাপসেরই মতো দেখতে, তাপসেরই আঁধার সত্তা... মুখে ক্রূর-কুটিল হাসি। তারপর পেছন ফিরে চলতে থাকে তাপসের বাড়ির দিকে।





সৌম্যদীপ বোস

দেবতার জন্ম



"আচ্ছা দাদা, পাঁচ বাই সাত গঙ্গাধর সেন লেনটা কোনদিকে বলবেন?" প্রশ্নটা শুনে একটু বিরক্ত হল যমুনা, সবে হাতটা বেঁকিয়ে চিনিটা ওজনে মারতে শুরু করেছিল, মুখটা বেঁকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, "এই গলিটা দিয়ে চলে যান, সোজা গিয়ে ৩ নং গলিতে শেষ বাড়ি" বলে মুখ বেঁকিয়ে খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে বলল "দেখছেন তো দাদা, এই ব্যাটা খগেনের জ্বালায় হাড়মাস একশা হয়ে গেল। রোজ ওর কাছে খদ্দের আসবে আর আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবে। ব্যাটা এমন কিপটে, একটা বোর্ড লাগাতেও পারে না।" খদ্দেরের নাম হরেন, এলাকায় বহু পুরোনো বাসিন্দা। হরেন বলল, "আহা, বেচারা করে তো ওই সামান্য ব্যাবসা, তাতে আবার বোর্ড লাগাবে কী?" হরেন যমুনার দোকান থেকে বেরিয়ে গঙ্গাধর সেন লেনে ঢুকল, সরু একটা গলি, কোনোমতে একটা গাড়ি যেতে পারে, বাড়ির ভিড়ে গলিতে আলো তেমন ঢোকে না, খানিকটা গিয়ে একটা প্রায় পরিত্যক্ত বাড়ি, একটা অশ্বত্থ গাছ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আছে, তার পাশেই সে দেখল, যে লোকটা ঠিকানা জানতে চেয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে আছে। হরেন বলল, "কী হল ভাই?" লোকটার হাতে একটা বস্তামতো। বলল, "এই জায়গায় একদম নতুন দাদা, এই উত্তর কলকাতার গলি আমি একদম বুঝি না।" লোকটার মুখ দেখে হরেনের মায়া হল, "হাতে কী? বোতল?" লোকটা ঘাড় নাড়ল। হরেন হেসে তাকে খগেনের বাড়ি অবধি পৌঁছে দিল। খগেন তারই বাল্যবন্ধু, বহু বনেদি পরিবার, এখন সব শরিক আলাদা হয়ে গিয়ে খগেনের ভাগে কেবল একটা ঘর, আর একটা গোয়ালঘরমতো, সেখানে প্রায় কিছুই নেই,

স্বেচ্ছা ভরতি। পড়াশোনায় ভালো না-হওয়ায় এখন সে শিশি-বোতল সাফাই করার কাজ করে। পাড়ায় কারও সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে না। বিয়ে-থা-ও করেনি, মাঝে মাঝে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। হরেন ঘাড় নেড়ে চলে গেল সেখান থেকে।

খগেন মালের ডেলিভারি নিয়ে চুপ করে বসে নিজের কাজ করতে লেগে গেল, টুং টাং টুং আওয়াজে বোতল ধোয়া হতে থাকল, হাজার বোতলে একশো টাকা, দিনে কম করে দুই হাজার বোতল সে ধোয়, হাতে কেমিক্যাল লেগে, জল লেগে কিছু থাকে না হাত দুটোর, সারা গা-হাত-পা টনটন করে, তার পরেও তাকে নিজের রান্না নিজে করতে হয়, ঘরে শোয়ার বলতে তার কেবল একটা চৌকি, বাকি প্রায় সবই বোতল, সপ্তাহে গাড়ি আসে, তার মাল খালাস করে তাকে পয়সা দিয়ে চলে যায়, মাল রোজও খালাস করা যায়, কিন্তু হপ্তায় করলে তাকে দুশো টাকা বেশি দেয়, সেটা তার কাছে অনেক। সারাদিনের পর যখন তার আর ভালো লাগে না, সে তার স্যাঁতসেঁতে ঘর ছেড়ে মাঝে মাঝে গিয়ে গঙ্গার পাশে বসে, আবার কখনও বা যায় সামনের শ্মশানে। সেখানে মাঝে মাঝেই সন্ন্যাসীদের আখড়া বসে। সে আর কিছু না করুক, মাঝে মাঝেই তাদের সেবা করে। তার যতটা সাধ্যে কুলোয়। সন্ন্যাসীরাও তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে। যখন কিছু ভালো লাগে না, তখন সে জগাইদার বাংলার ঠেকে যায়, অনেকরকম লোক আসে ওখানে, কিন্তু খগেন একাই বসে মদ খায়, সঙ্গে ঝাল ঝাল লংকার চপ। নেশাটা কম হয়। রাতে যখন সে বাড়িতে আসে, গলির অশ্বত্থ গাছটাকে দেখেও সে ভয় পায় না। মাথা ঝিমঝিম করে, কিন্তু সে মাতাল হয় না।

এমন করেই দিন চলছিল। খগেন সেদিনও গেছে বাংলার ঠেকে। গিয়ে রোজের মতো একটা পাঁইট নিয়ে বসেছে, দেখে, একপাশে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। একটা রোগামতো লোককে তিন-চারজন মিলে মারছে। খগেনের কী মনে হল, সে আচমকাই চওড়া হয়ে দাঁড়াল তাদের সামনে। খগেনকে অনেকেই চিনত, খগেনকে দেখে তারাও ওর পাশে দাঁড়াল। লোকগুলো একটু হটে গেল, খগেন লোকটাকে টেনে তুলল, বেশ শক্তসমর্থ, গায়ে কশ আছে, একজন মাঝবয়সি লোক। তুলে লোকটাকে দেখল, বেশ রক্ত পড়ছে মুখের কশ বেয়ে। খগেনের নেশা মাথায় উঠল, সে আগে লোকটাকে নিয়ে সামনের ডাক্তারখানায় গেল। ডাক্তারবাবু বেশ যত্ন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন, আর একটা ব্যথার ইনজেকশন দিতেই লোকটা একটু আরাম পেয়ে নেতিয়ে গেল। খগেন আর উপায়ান্তর না দেখে একটা রিকশা ডেকে তাতে করেই বাড়ি ফিরল।

দোকানের সামনে যমুনা দাঁড়িয়ে ছিল, খগেনকে দেখে হেঁকে বলল, ''বাবা, খগাবাবুর দেখি আর পা মাটিতে পড়ছে না, বাবুর খুব ফুটানি বেড়েছে দেখছি আজকাল। হ্যাঁ রে খগা, বোতল ধুয়ে ক-টাকা পাস?'' খগেনের মাথাটা চট করে গরম হতে-না হতেই সে সামলে নিল, যমুনার দুঃখটা সে জানে। খগেনের যখন বিয়ে হচ্ছেল না, যমুনা তার অল্পবয়সি বিধবা বোনটার সঙ্গে খগেনের সম্বন্ধ করতে এসেছিল, কিন্তু খগেনের এখন যেমনই অবস্থা হোক, সে বনেদি বাড়ির ছেলে। সে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের বংশের ছেলে করবে নাকি মুদির বোনকে বিয়ে? তার পর থেকেই যমুনা তাকে দেখলে ধারে কাটে। যা-ই হোক, খগেন রিকশা থেকে বেশ কষ্ট করেই লোকটাকে নামাল, অসুস্থ মানুষ দেখে রিকশওয়ালাও সাহায্য করল, দুজনে মিলে ধরাধরি করে এনে তাকে ঘরে শুইয়ে দিল। তার চৌকিতে কোনোমতে সে-ও শুয়ে পড়ল।

এরপর বেশ এক সপ্তাহ লোকটা অসুস্থ হয়ে রইল, এই এক সপ্তাহ তার যা যা দরকার সব খগেন করেছে, খাওয়াদাওয়া থেকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া—সব। নিজের ছেলের মতো। লোকটা আস্তে আস্তে সুস্থ হয় গেল, বড়ো চুপচাপ। নিজের নাম বলল রামেশ্বর। কী করে, সেটা আর খুলে বলল না। খগেনও জিজ্ঞাসা করল না। আস্তে আস্তে খগেনের বোতলের কাজে হাত লাগাল রামেশ্বর। খগেনও আপত্তি করল না। তারও আর একা থাকতে ভালো লাগছিল না। এভাবে কেটে গেল প্রায় দু-মাস।

একদিন রামেশ্বর যমুনার দোকানে গেছে কিছু কিনতে। যমুনা তাকে তার জিনিস দিয়ে বলল ''হ্যাঁ গো, তুমি কি খগার ঘাড়েই চাপলে নাকি? খগা ভালো করে খেতে দেয় তো?'' রামেশ্বর কিছু না বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। এই দুই মাসে খগেন তাকে অনেক কিছু বলেছে। রামেশ্বর যদিও তার ব্যাপারে তেমন কিছু বলেনি, কিন্তু খগেনের পেটে মাল পড়লে খগেন তোতা পাখি হয়ে যায়, তাই সে জানত যমুনার ব্যাপারটা। যমুনা বেরোনোর সময় আবার বলল, ''শালা খগার নিজের ভাত জোটে না, আবার পুষ্যি নিয়েছে। এমন শখ আছে জানলে ওকে পাড়াছাড়া করব আমি এই বলে দিলাম।'' যমুনার চিৎকার শুনে বেশ কিছু লোক জড়ো হল। যমুনা তাদের বেশ রং চড়িয়ে রসালো করে খগেন আর

রামেশ্বরের কথা রটাতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই রটে রটে তাদের একটা মিথ্যা বিকৃত সম্পর্কের কথা সারা পাড়ায় কান পাতলেই শোনা যেতে লাগল।

এক সন্ধ্যাবেলায় আচমকা খগেন আর রামেশ্বর যখন একটু রুটি বানানোর জন্য বসেছে, তখনই তাদের ঘরের দরজায় ঠকঠক আওয়াজ উঠল। এমনিতে তো খগেনের ঘরে কেউ আসে না, এমনকি পাড়ার ছেলেপুলেরাও চাঁদা তোলার জন্য পারতপক্ষে এই বাড়িটা এড়িয়েই চলে। খগেন একটু মনে কিন্তু কিন্তু নিয়েই দরজাটা খুলল। খুলে সে অবাক, দেখে পাড়ার বেশ কয়েকজন মান্যগণ্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। হরেনও আছে পেছনে, আবার যমুনাটাও পেছনে দাঁড়িয়ে, মুখে মিচকি হাসি।

খগেন কিছু বলার আগেই পাড়ার মুরুব্বি অনিলবাবু বলে উঠলেন, "শোনো খগেন, তুমি এখানকার পুরোনো বাসিন্দা, কিন্তু এভাবে তুমি পাড়ার নাম ডোবাবে—এটা তো আমরা হতে দিতে পারি না।"

খগেন কিছু বোঝার আগে হরেন বলে উঠল, "আহ্, আগেই এসব কেন? আগে ওকে কিছু বলতে দিন, তবে না আপনি বলবেন।"

অনিলবাবু থামিয়ে বললেন, "এসব অনাচারে আর বলবে কী?"

খগেন মিনমিন করে বলল, "আমি তো কিছুই জানি না, কীসের অনাচার?" এবার অনিলবাবুর গলা সপ্তমে উঠল, "কীসের অনাচার? এই যমুনা নিজে দেখেছে তোদের কী সব—ইশ্, ছি ছি, সেসব আমার মুখে আনতেও ঘেন্না হচ্ছে। এসব অনাচার তো মেনে নেওয়া যায় না। দেখো খগেন, তুমি ভদ্র ঘরের সন্তান, তোমায় কিছু বলব না, কিন্তু এই লোকটাকে যত তাড়াতাড়ি পারো, পাড়া থেকে বিদায় করো, নয়তো..." বলে অনিলবাবু থামলেন। সবার বুঝতে অসুবিধা হল না, না হলে কী হবে।

লোকেরা বিদায় নিলে খগেন তার চৌকিটায় ধপাস করে বসে পড়ল। রামেশ্বর তার পাশে বসে বলল, "চিন্তা কী? আমি চলে গেলেই তো সব সমস্যা শেষ।" বলেই সে কাঁধে হাত রাখল খগেনের।

খগেন ছিটকে উঠে বলল, "তাতে কী? ও শালা যমুনা আমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছ? আবার চুগলি করে করে পাড়াছাড়া করবেই।"

রামেশ্বর একটু ভেবে বলল, "একটা উপায় আছে, তাতে আমিও থাকব, তুমিও থাকবে।"

খগেন কান খাড়া করল, কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেল সে। রামেশ্বর প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলল, "শিব তুলবে?"

শিব তুলবে! এ আবার কেমন কথা! শিব কি আলু না মুলো! যে যেখান-সেখান থেকে উঠবে! খগেনের ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মুখ দেখে হেসে ফেলল রামেশ্বর। সে আবার বলল, "যদি তোমার গোয়ালঘরে শিব ওঠে?"

এবার খগেন খানিকটা রেগেই বলল, "হ্যাঁ, সেই। শিব তো আমার বাবার সম্পত্তি! যেখানে বলব, সেখানে উঠবেন।"

রামেশ্বর হেসে ফেলল তার কথা শুনে, "না, তোমার না, আমার সম্পত্তি, যেখানে-যেখানে স্বয়ম্ভু শিব দ্যাখো, সব এই শর্মার কীর্তি। ব্যাস, আমার কিছু মালপত্তর লাগবে আর একটা বড়ো নুড়ি।"

খগেনের এবার মাথায় ঢুকল, "ও, নকল শিব? ওই করি আর আমার হাল বাবা খলেশ্বরের মতো হোক আর কী!"

এবার রামেশ্বরের অবাক হওয়ার পালা—"খলেশ্বর! সে আবার কী?" সে অবাক হয়ে বলল।

খগেন হেসে বলল, "খল চেনো?"

"হ্যাঁ, খলের ছলের অভাব হয় না, পাজি লোক। আমায় তোমার খল মনে হয়?"

রামেশ্বর তেড়ে যেতেই খগেন হাত নেড়ে বলল, "আরে তুমি না, কবিরাজদের খল, যাতে পিষে পিষে পাঁচন বানায়। একবার হয়েছে কী, এক কবিরাজের বেশ ভালো পসার, গাঁয়ের এক ছোকরা তা-ই দেখে কবিরাজকে পটিয়েপাটিয়ে তার শিষ্য হয়ে গেল। এখানে আবার কবিরাজের কোনো মেয়ে ছিল না কিন্তু, যা-তা ভেবো না।" রামেশ্বর মুচকি হেসে ফেলল। তাকে হাসতে দেখে খগেন আবার শুরু করল, "সে ছোকরা তো কবিরাজের কাছে আছে, কিছু না কিছু কাজ শিখছে। কিন্তু সে আর যা-ই পারুক, ওই খল আর নুড়িতে পিষে পাচন কিছুতেই বানাতে পারে না। এক-এক খলের এক-একরকম ব্যবহার, বুঝলে তো!" রামেশ্বর মাথা নাড়ায় সে বলল, "ধরো, মিহি করে কিছু বাটবে, তখন এক ধরনের। আবার দানা দানা থাকলে আরেক ধরনের। মোদ্দা কথা, কবিরাজের কাছে অনেক খল ছিল। আর নুড়িও।" বলে একটু জল খেল খগেন, "তো একদিন হয়েছে কী, কবিরাজ গেছেন শহরে, কিছু ওষধি আছে, যেগুলো নাকি গ্রামে পাওয়া যায় না, শহরে সেগুলো ডাকযোগে আনার ব্যবস্থা করতে হয়, যাওয়ার সময় শিষ্যকে বলে গেছেন যে তাঁর দুই-তিন দিন লাগবে, এর মধ্যে যেন সে তিন-চার রকমের পাচন বানিয়ে

সুখে।"

রামেশ্বর বেশ মজা পাচ্ছিল, সে বলল, "তারপর!"

খগেন বলল, "দু-দিন তো বেশ ভালোই কেটেছে, সে একটা পাচনও বানিয়েছে। কিন্তু সেদিন বিকালে ছোকরা নুড়ি দিয়ে এমন ঘষেছে—খল হড়কে পুরো মেঝেতে। ব্যাস, খলের খলতা শেষ।"

রামেশ্বর বলল, "তাতে কী হল?"

খগেন বিরক্ত হয়ে বলল, "আহ্ শোনোই না। সে ছোকরা তারপর কী করল, সেদিন রাতেই খলটাকে এমনভাবে পুঁতল যেন দেখে মনে হয় শিবলিঙ্গ আর তার পরের দিন সকালে উঠে তো সে চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে, গ্রামের যত লোক আছে প্রায় সব ভিড় করে এসেছে, কবিরাজ মশাইয়ের উঠোনে শিব উঠেছে। বলতে পারো, ওখানে প্রায় মেলা বসে গেছে। এমন সময় কবিরাজ মশাই এসে হাজির।"

রামেশ্বর বেশ মন দিয়ে শুনছিল, আগ্রহের সঙ্গে বলল, "এই রে, এবার হবে কেস।"

খগেন হেসে বলল, "শোনোই না, কবিরাজ মশাই তো এসে ব্যাপারস্যাপার দেখে হাঁ। তাঁকে বেশ খাতির করে সবাই নিয়ে গেল শিবলিঙ্গের কাছে। দেখেই তাঁর মুখ কেমন শক্ত হয়ে গেল। আর ছোকরাটা যে কোথায় লুকোল, তাকে আর কেউ তখন খুঁজে পেল না।"

"বেশ বেশ, ছোকরাটার কী হল?" রামেশ্বরের গলায় কৌতুক।

"সে ছোকরাকে তো লোকজন খুঁজে নিয়ে এল, ততক্ষণে গ্রামের প্রধান কবিরাজ মশাইকে বলে বসেছেন যে এই বিগ্রহের নামকরণ করুন। এদিকে কবিরাজ মশাই তো জানেন এই মাল কী! তিনি আমতা আমতা করে বললেন, যাক, তবে এই লিঙ্গের নাম দিন বাবা খলেশ্বর।"

হো হো করে হেসে উঠল রামেশ্বর। তারপর হাসির দমক খানিকটা কমলে বলল, "না না, এখানে তেমন কিছু হবে না। খালি আমার কয়েকটা জিনিস চাই। সেগুলো দিলেই হবে।"

খগেন চুপ করে রইল, তারপর বলল, "বেশ।"

প্রথমে রামেশ্বর যেটা চাইল, সেটা হল একটা শাবল। শাবল পেতেই সে পরের দিন কাজে লেগে গেল, বেশ একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে ফেলল সে গোয়ালঘরের মাঝখানে। আর মাটিগুলো জমিয়ে রাখল বাড়ির সামনে, তারপর রাত হতে-না হতেই সেগুলো চুপিচুপি গিয়ে কাছের পুকুরে ফেলে আসত। সেইজন্য এক বুকসমান গর্ত খুঁড়তে তার লেগে গেল প্রায় দশ দিন। এই গর্ত খোঁড়া, মাটি সরানো সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে এক অদ্ভুত আবদার করল। বলল, "এবার এক বস্তা কাঁচা ছোলা আনো।"

খগেন হাঁ করে বলল, "সে দিয়ে কী হবে?"

রামেশ্বর একটু বিরক্ত হয়েই বলল, "যা বলছি শোনো-না, যাও, নিয়ে এসো।" খগেন আর বাক্যব্যয় না করে নিয়ে এল। তখন রামেশ্বর বলতে শুরু করল, "এই ছোলাগুলো এবার মাটিচাপা দেব। তারপর নুড়িটাও মাটির একটু তলায় রাখব। আর তারপর রোজ গোয়ালঘরের মাটিতে ভালো করে জল দেব।"

এতদূর শুনেই খগেনের মাথায়ও বুদ্ধি চাগাড় দিয়ে উঠল, সে বলে উঠল, "ব্যাস, বুঝে গেছি, জল পেয়ে ছোলাগুলো ভিজে উঠে ফুলে উঠবে, আর তারপর ওরাই নুড়িটাকে কিছুটা ঠেলে তুলবে, যবে থেকে ওঠা শুরু করবে, তবে থেকেই বলে রাখব লোকেদের।"

রামেশ্বর একটু হেসে বলল, "বেশ তা-ই হবে। এখন এসো, কাজগুলো সেরে ফেলি।"

যথারীতি দু-তিন দিন পর ভেজা মাটি ফাঁক করে একটু নুড়িটা দেখা দিল। খগেন আগেই কাউকে বলল না। কেবল হরেনকে ডেকে আনল। হরেন তখন চা খাচ্ছিল। সকাল সকাল খগেনকে দেখে সে একটু অবাকই হল। খগেন সাধারণত কারও বাড়ি বেশি যায় না। সে অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে রে?"

খগেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "হারু, দেখে যা কী হয়েছে।"

হরেন তেমন প্রথমে পাত্তা দিল না, কিন্তু গিয়ে দেখল, খগেনের গোয়ালঘরে কী একটা ঠেলে উঠছে, সে বলল, "এক কাজ কর, এটা যদি আরেকটু ওঠে, তখন আমায় ডাকবি, বুঝলি?" হরেনের গলায় উত্তেজনার ছোঁয়া দেখে খগেন বুঝল তার আধা কাজ হাসিল। দু-দিন পর হরেন নিজেই এল, এসে দেখল, একটা পাথর অনেকটা ঠেলে উঠেছে, তার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে গেল, "শিব! স্বয়ম্ভু শিব!" বলেই সে উত্তেজিত হয়ে পাড়ার লোকজনকে ডাকতে লাগল, ধীরে ধীরে সারা পাড়া এসে ভেঙে পড়ল খগেনের ছোট্ট বাড়িটাতে। যমুনা অবধি আজ কোনো কথা বলতে পারল না।

এর পরেই পাড়ার মহিলারা এসে পাথরটার সামনে ধূপধুনো জ্বেলে পুজো করে গেলেন, কেউ আবার সিঁদুর লেপে গেলেন। বেশ একটা শিবলিঙ্গ-শিবলিঙ্গ মনে হতে লাগল।

এরপর প্রায় দুই মাস কেটে গেল, খগেনের বাড়ি আর

পুরোনো বাড়ি বলে চেনাই যায় না, তার স্বয়ম্ভু শিবের কথা বেশ দূর অবধি ছড়িয়ে গেছে। এখন তার বাড়িটাকে বেশ একটা মন্দির মন্দির মনে হয়, সামনের গোয়ালঘরে তার শিব মন্দির আর বাড়িটা সে কাঠের পাটাতন দিয়ে আলাদা করে দিয়েছে। খগেন আর খগেন নেই, তার নাম 'বাবা স্বয়ম্ভুনন্দ'। স্বয়ং মহাদেব নাকি স্বপ্নে তাকে এই নাম ধারণ করতে বলেছেন। বলাই বাহুল্য, এসব বুদ্ধি রামেশ্বরের, রামেশ্বর নিজে এখন বাবার প্রধান সেবায়েত। তার প্রধান কাজ হল ভক্তদের সঙ্গে বাবার বেশি কথা বলতে না-দেওয়া।

এখন বাবার তো অনেক ভক্তও হয়। কেউ যদি বাবার থেকে কিছু দর্শনের বা অন্য কথা জানতে চায়, তবেই তো সর্বনাশ। একবার এক ভক্ত জানতে চেয়েছিলেন, "বাবা, আমি ফরসা, আর আমার বর কালো, সন্তান কালো হবে না ফরসা?"

সবে রামেশ্বর বলতে যাচ্ছিল, খগেন ফট করে বলে বসল, "দ্যাখো মা, সে তো আমাদের হাতে নেই, ভগবানের হাতে। তবে সাদার ওপর কালো ছোপ বা কালোর ওপর সাদা ছোপ হবে না, এটুকু বলতে পারি।"

ভক্ত চলে গেলে রামেশ্বর বলেছিল, "এটা কী হল?"

খগেন মুচকি হেসে বলেছিল, "কেন, নেড়িকুকুর দেখোনি?" রামেশ্বর গজগজ করে চলে গেল।

এদিকে যতই বাবার পসার জমে, যমুনার যন্ত্রণা বাড়ে। আগে তো তা-ও একজন-দুজন, কিন্তু এখন তো প্রায় কাতারে কাতারে লোক তাকে জিজ্ঞাসা করে। সে একটা নতুন নাম দিয়েছে, 'বোতলবাবা'। পাড়ার লোকে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে সটান বলে, "ব্যাটা কাজ করত বোতলের, খেত বোতল। বোতলবাবা বলব না কেন?"

কিন্তু দিনে দিনে খগেনের মন্দিরের নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এখন তার মন্দিরের সামনে তিন তিনটে জুতো রাখার দোকান, সোমবার সোমবার দুধের বন্যা বয়ে যায়, হ্যাঁ, মেঝেটা কিন্তু এখন পাথর-বাঁধানো। রামেশ্বর এমন সময় এক সন্ধ্যাবেলা খগেনের সঙ্গে বসে ছিল। দুজনের এখন নতুন অভ্যাস হয়েছে, বাবার প্রসাদ, মানে গাঁজা। ছয় মাস হয়ে গেছে রামেশ্বরের এখানে, আর স্বয়ম্ভু শিবের আশীর্বাদে তাদের টাকাপয়সার অভাব নেই। আর খগেনের এখন রামেশ্বরের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, সে এখন তার রামুদা। তো এমনই একদিন গাঁজা খেতে খেতে রামেশ্বর বলল, "আর ভালো লাগছে না রে।"

খগেন বলল, "কেন দাদা? আমাদের মন্দির তো বেশ জমে উঠেছে!" রামেশ্বর হাত নেড়ে বলল, "ধুর, ওসব আর ভালো লাগে না। আমার বউটার জন্য মন কেমন করছে।"

খগেন একটু অবাক হল, এর আগে কখনও সে রামুদার পরিবারের কথা শোনেনি। অবাক স্বরে বলল, "তোমার আবার পরিবার আছে নাকি?"

রামেশ্বর একটু হেসে বলল, "সে আবার নেই? আমার বিয়েই তো এক গল্পের মতো গো।"

শুনে খগেন উৎকর্ণ হল, "কেমন?"

রামেশ্বর একটু হেসে বলল, "আর বলিস কেন? আমি না জোয়ান বয়সে একটু বিপথে গেছিলাম। ওই মদ-গাঁজাও আমার তখনই শুরু, কেমন হয়ে গেছিলাম, কিন্তু অপর্ণার কী জানি কেন আমায় মনে ধরেছিল, আমার থেকে তো বয়সেও কত ছোটো! কিন্তু মেয়ের কী জেদ! আমি মানা করলাম, ওর বাবা-মা মানা করল, তার পরেও সে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিল! সে মরে যায় আর কী! শেষমেশ তার জেদের সামনে সবাইকে হার মানতে হল। কিন্তু আমার স্বভাব কি আর বদলায় বল! আমি সেই কখনও বাড়ি যাই, আবার কখনও বেরিয়ে পড়ি। সে কিন্তু সব মেনে নিয়েছে।"

খগেনের চোখ যেন বন্ধ হয়ে গেল, "বাহ্, বউদি তো খুব ভালো! তা রামুদা, ছেলেপিলে হয়নি!"

রামেশ্বর হেসে বলল, "আছে তো! দুটো ছেলে। একটা বম্বেতে, আরেকটা ব্যাঙ্গালোরের কাছে কোথায় একটা থাকে। ওদের খবর বেশির ভাগই থাকে ওদের মায়ের কাছে। আমার কাছে তো ওদের ঠিকানাও নেই।"

খগেন একটা নিশ্বাস ছাড়ল। মনে মনে বলল, 'অতি বড়ো গৃহিণীর মেলে না তো ঘর।' তারপর একটু থেমে বলল, "আচ্ছা, বউদিকে এখানে ডেকে আনলে কেমন হয়?"

রামেশ্বর মুখে একগাল হাসি নিয়ে বলল, "আমি তো তোকে সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম গো। যাক, ঠিক আছে, তবে অনুমতি দাও। আমি অপর্ণাকে নিয়ে আসি।"

খগেন একটু হেসে বলল, "বাবা, বউয়ের নামে একেবারে বিনয় ঝরে পড়ছে দেখি গলা দিয়ে। যাও যাও, আর দেরি কোরো না, গিয়ে বউদিকে নিয়ে এসো।" বলে হেসে উঠে পড়ল খগেন। আজকাল গাঁজা খেলেই তাকে কোথাও একটা যেতে হয়। তা-ও ট্যাক্সি করে। আসেও বেশ রাত করে। মুখে সামান্য মদের গন্ধ আর একটা মিচকি হাসি থাকে।

পরের দিনই রামেশ্বর তার বউকে আনার জন্য বেরিয়ে পড়ল। খগেন এই কয়দিন একা একা সব সামলেছে, রামেশ্বর যা শিখিয়ে দিয়েছিল—সব পইপই করে মেনেছে। কোনো

প্রশ্ন এলেই সে মৌনী হয়ে থেকেছে। কয়েকদিন পরেই রামেশ্বর যখন তার বউকে নিয়ে ফিরল, সে একাধারে শ্বাস ছেড়ে বাঁচল, আরেক ধারে তার মুখ হাঁ হয়ে থাকল। কারণ রামেশ্বরের বউ অপর্ণা।

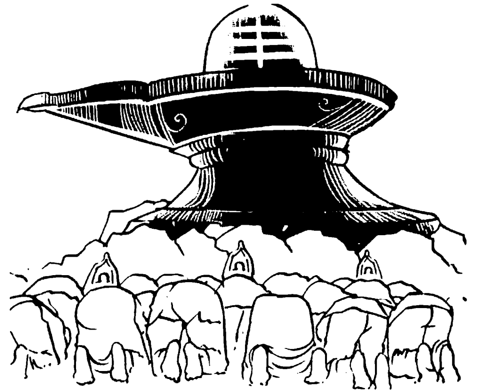
অপর্ণা অসাধারণ সুন্দরী। তাকে দেখলে যে-কোনো পুরুষের মন ছলাত করে উঠবেই। এদিকে রামেশ্বর আবার তার বউয়ের ওপর খুব স্পর্শকাতর। কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করল সে। তার বউও মন্দিরের ভোগ রাঁধার ভার পেল। দেখা গেল অপর্ণার চমৎকার রান্নার হাত। মন্দিরের ভোগের সুখ্যাতিও দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি পাড়ার অনিলবাবুদের মতো গণ্যমান্যরাও শিবরাত্রির দিনে বাবা স্বয়ম্ভুনন্দের ভোগ না খেয়ে যেতেন না। খগেনের আর মনে সুখের শেষ নেই। তার হাতে এখন অনেক টাকা। এমনকি যমুনাও আর তাকে বোতলবাবা বলে ডাকে না আড়ালে। কিন্তু আজকাল তার গাঁজা আর গাঁজার পরে ট্যাক্সি করে ভ্রমণ বেশ বেড়ে গেছে। সামনে সাধু হলে কী হবে! ওসব তো ভেক। শরীরের খিদে, যা ছাইচাপা আগুনের মতো যেটা অভাবের মাটি পড়ে চাপা ছিল, এখন অর্থের হাওয়া এসে সেই আগুন দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এমনভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে। রামেশ্বরের দিন দিন গাঁজা খাওয়া আর মদ খাওয়া বেড়েই যাচ্ছে। একদিন তো অপর্ণা তাকে বাড়ি থেকে বেরই করে দিয়েছিল, তারপর কোনোমতে খিদের জ্বালায় রামেশ্বর অপর্ণার হাতে ধরে ক্ষমা চায়, কিন্তু আবার কিছুদিন পরেই যে কে সেই। এমন অবস্থায় খগেন কিন্তু চুপ করে বসে নেই, রামেশ্বরের ভাগ্য দেখে সে হু হু করে জ্বলে। এখন মন্দিরের অনেকটা কাজই সে শিখে গেছে। মন্দিরের বাইরেটা সামলায় সে আর ভেতরে সামলায় অপর্ণা। রামেশ্বর যেন থেকেও নাই। বেশির ভাগ দিনই গাঁজা খেয়ে থাকে আর বসে বসেই ঝিমোয়। খগেন অপর্ণার কাছে এই সুযোগে ঘেঁষার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু অপর্ণার ভয়ানক ব্যক্তিত্বের সামনে সে যেন কেমন কুঁকড়ে যায়, অপর্ণা তাদের এই গাঁজা খাওয়া যে মোটেই পছন্দ করে না, হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়। এভাবেই কেটে গেল আরও মাস ছয়েক।

সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ছিল, প্রচণ্ড গরমের পর বৃষ্টি, তাপিত প্রাণগুলো যখন জুড়িয়ে গেছে, রামেশ্বর তখন খগেনের ডেরায় মদ খেয়ে বুঁদ। তার খানিক বাদেই অপর্ণা তাকে ডাকতে এল। সারা পাড়ায় লোডশেডিং। ঘনঘন বাজ পড়ছে, ছাতায় সে বৃষ্টি আটকায়নি, অপর্ণা পুরো ভিজে গেছে বৃষ্টিতে। খগেন আগে অনেকবার অপর্ণাকে দেখেছে, কিন্তু আজ আর চোখ ফেরাতে পারল না সে। এমনিতেই গাঁজায় তার দেহের আগুন বল্‌গাছাড়া ঘোড়ার মতো দৌড়োতে থাকে, আর তার ওপর সামনে এমন সুন্দরী। আর পারল না সে। ভেজা চুলের থেকে অপর্ণার টুপটুপ করে পড়া জলের ফোঁটা হ্যারিকেনের আলোয় যেন কোহিনুরের মতো জ্বলছিল। অপর্ণা যখন রামেশ্বরকে ঠেলে তুলছিল, খগেন এক হাতে চুপিসারে দরজা বন্ধ করে দিল আর পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল অপর্ণার ওপর। অপর্ণা কেবল একটাই কথা বলতে পারল, "খবরদার খগেন, সর্বনাশ হয়ে যাবে তোর।" ধুপ করে একটা আওয়াজ হল। আর একটা ভয়ানক ঠান্ডা হাওয়া সারা পাড়াকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সকালবেলায় ভক্তরা এসে দেখল মন্দির বন্ধ। পাড়ার লোকে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই দেখল, খগেন ঘরে পড়ে আছে। চোখ দুটো তার খোলা, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সেই চোখে যেন ভয়াবহ অবিশ্বাস আর আতঙ্ক লুকিয়ে আছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। সকলে মন্দির খুলে দেখল পাথরটা আর নেই। সেখানে একটা গভীর গর্ত। রামেশ্বর আর অপর্ণাকে আর কেউ কোনোদিন কোথাও দেখেনি।





সৌমিক দে

গুপ্তঘাতকের কবলে কালীগুণীন



যেবারের কথা আজ তোমাদের বলতে চলেচি, সেই সময়ে মুখুজ্জেমশাই রায়দিঘড়া থেকে কানাই সর্দারকে সঙ্গে করে কলকাতায় এসেচিলেন দেওয়ানি কিছু কাজকর্ম নিয়ে আলিপুরের সদরে। কাজ সমাধা হবার পর দিন দুয়েক আমার নেবুতলার বাড়িতে কাটিয়ে যাবেন, এমনটাই ছিল ইচ্ছা, কিন্তু বিধি বাম। পথে কোনো এক ভাতের হোটেলে আহারের পর তাঁকে ধরল পীতজ্বর রোগে। হয়তো দীর্ঘদিনের অনিয়ম আর অমানুষিক পরিশ্রমের জন্যই। অমন শক্তপোক্ত শরীরখানাকে পুরোপুরি কবজা না করতে পারলেও রীতিমতো কাবু করে এনেচিলো তাকে। কানাইকে ফেরত পাঠিয়ে মুখুজ্জেমশায় বারংবার কয়ে দিল যে সে যেন গাঁয়ে ফিরে এইটেই বলে যে, হাকিম ছুটিতে রয়েচেন। তাঁর ফিরতে দিনকতক বিলম্ব হবে, তারপর কাজকর্ম মিটিয়ে একেবারে সে বাড়ি ফিরবে। আমি রাত্তির জাগরণ করে, ঔষধ বদলে বদলে খাইয়ে, শিশির পর শিশি মিক্সচার তৈরি করে মোটামুটি আরোগ্য করে এনেচি, এমন সময়ে একদিন দ্বিপ্রহরে কালীপদকে ঔষধ দিচ্চি, হঠাৎ শিশি সরিয়ে কালীপদ বড়ো বিব্রত হয়ে বলে উঠলে, "আহঃ, এ বড়ো জ্বালা হল।"

আমি অভিমানী স্বরে কইলাম, "তা বলবে বই-কি, রাত জেগে সেবা করলুম, আর এখন ঔষধসেবনের বেলায়..."

কালীপদ তিক্ত কণ্ঠে কইল, "তোমাকে বলিনি। আরও বড়ো বিড়ম্বনা এসে উপস্থিত। এখন কী জবাব দিই তা-ই ভেবে সারা হচ্চি।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই কানাইকে সঙ্গে করে গৃহে পা রাখল বউঠান। কানাইকে পইপই করে যে কথাটির জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়েচিলো, সরল কানাই বউঠানের হাকিমি জেরা সইতে না পেরে সেইটে ফাঁস করে বসে আছে। কানাই অপরাধী

মুখ করে ছাতা রাখার আকর্ষির কাছে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রয়েচে, আমার মুখ দোটানায় পড়া দায়গ্রস্ত পিতার ন্যায়, কালীপদ শুষ্ক হেসে কী যেন একটা অজুহাত দিল, কিন্তু স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হল না।

এমতাবস্থায় বউঠান যদি দুটো ভালোমন্দ কথা, নিদেনপক্ষে বকাঝকাও করত, তা-ও ঝড়টা কেটে যেত, কিন্তু সে বাইরের কলে হাত-পা ধৌত করে সোজা কক্ষে গিয়ে ঢুকল। কালীপদ একটা শ্বাস ফেলে কানাইয়ের পানে চাইতেই কানাই তড়িঘড়ি অন্যত্র চলে গেল।

দ্বিপ্রহরে দুইজনের কী কথা হয়েচে তা জানিনে, তবে সন্ধ্যা থেকে ঔষধের ভার আমার উপর ন্যস্ত করে নিজে রসবতীতে প্রবেশ করল পথ্যের ভার সামলাতে। এইভাবে আরও একটা হপ্তা গেলে পর কালীপদ শরীরে কিছুটা বল ফিরে পেয়েচে, ক্ষুধাও হচ্চে বিলক্ষণ। তো, সেইদিন রাত্তিরে দুইজন আহার করতে বসেচি, বউঠান আহার্য পরিবেশন করচে। ধোঁয়া-ওঠা অন্নরাশি, ঘন কলাইয়ের ডাল, আলু ভাজা, কাঁচকলার ব্যঞ্জন, গরমমশলার আঘ্রাণ-মাখানো ফুলকপির তরকারিতে লম্বা চৌচির-করা আলুর টুকরো আর ফুলকপির ডাঁটার সরষে চচ্চড়ি। কালীপদ আর বউঠান কলকাতায় এলেই আমি ন-টাকায় মোট দশ কিলোগ্রাম আলু কিনে আনি, আর মরশুম বুঝে আট থেকে নয় টাকা কিলোগ্রামের মধ্যে খুব ভালো ইলিশ মাছ। গ্রামে আর যা-ই সহজলভ্য হোক, আলু বেশ দুষ্প্রাপ্য। আলুকে একখানা বড়োমানুষি শৌখিন খাবারের মধ্যে ফেলা হয়। কানাই এই কয়দিন কালীপদর থেকে লুকিয়ে বেড়িয়েচে। আজ একরাশ রুটি আর ডাল নিয়ে বসেচে রসুইয়ের সুমুখে।

যাক, কাজের কথায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা এসে পড়ে। তো, আমরা আহার করচি, হঠাৎ সদরের দিকের জানালায় একখানা মুখ উঁকি দিয়ে কইল, "ডাক্তার, বাড়ি আছ?"

আমি প্রথমে চিনতে পারিনি, কারণ দুই বৎসর পূর্বে যখন দেখি, তখন এর ঝাঁকড়া চুল, আর এখন প্রায় ন্যাড়া বললেই চলে। ভালো করে তাকিয়ে আনন্দের সঙ্গে বললুম, "ও কে ও? ঈশ্বর নাকি? আসো, আসো ভায়া..."

ঈশ্বর উদ্‌বিগ্ন স্বরে উত্তর দিলে, "না না, আজ নয়, কাল সকালে গাড়ি আছে শিয়ালদহ থেকে। কাল একবার আসব যাবার আগে। কথা রয়েচে ডাক্তার। এখন আসি।"

আমি হাঁ হাঁ করে উঠবার আগেই ঈশ্বর গবাক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজপথে মিলিয়ে গিয়েচে। আমি বিরক্ত হয়ে কইলাম, "কেমন যেন হয়ে গিয়েচে লোকটা। এভাবে আসার মানে কী? দুয়োর থেকে ফিরে গেল, দুটো কথা অবধি নাই।"

কালীপদ বিরাট ডাবরের মতো জলপাত্রে হাত-মুখ ধুয়ে কইল, "দোষটা তার পরিস্থিতি না জেনেই আরোপ করাটা হয়তো উচিত নয়। সম্ভবত বড়ো জ্বালায় ভুগচে বেচারা। সকালে যখন আসবে, তখন জেনে নিয়ো।"

"কিন্তু কীসের জ্বালায় এমন বাণের গতিতে ছুটে চলেচে বাখরাবাদ থেকে কলকাতায় এসে? পুলিশ কর্মচারী পিছনে ফেউ লাগেনি তো?"

কালীপদ খর দৃষ্টি মেলে খালি জানালার পানে চেয়ে কইল, "তোমার অনুমান যথার্থ। ফেউ একটা লেগেচে, ডাক্তার। তবে সেটা লাল পাগড়ি নয়।"

আমি বিস্মিত হয়ে শুধালাম, "তবে?"

উত্তরে কালীপদ একটাও শব্দ খরচ করল না, শুধু আমার পানে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে এমনভাবে চাইল, যে দৃষ্টি দেখে আমি চমকে উঠে নিচু গলায় বলে উঠলাম, "কী সর্বনাশ!"

* * * * * * * *

রাত্তিরে আহারান্তে বৈঠকের ঘরে কালীপদ বই মুখে নিয়ে লবঙ্গ চিবুচ্চে, এমন সময়ে আমি প্রবেশ করতেই সে মুখ তুলে শুধাল, "পড়া ধরবে আবার?"

কালীপদ এই অলস দিনগুলিতে কর্মের অভাবে গোগ্রাসে বইপত্তর পড়ে চলেচিলো। সেগুলি এমন কিছু সুখপাঠ্য পুস্তক নয়, আমারই তাকে ঠাসা চিকিৎসা বিষয়ক কিছু বইপত্তর। কোনোটি অস্থি বিষয়ক, কোনোটি অণুজীব সংক্রান্ত এবং কোনোটি বা শুধুই স্নায়ুতন্ত্র। আমি ইতিপূর্বে ভেবেচিলাম যে এই কঠিন বইগুলি পড়া কেবলমাত্র কাল অতিবাহিত করার ছলমাত্র, কিন্তু কৌতূহলবশত অস্থি, অণুজীব নিয়ে বাইশটি কঠিন প্রশ্নের মুখে কালীপদ উনিশটি জবাবই যখন সঠিক দিল, তখন আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলাম তার স্মৃতিশক্তির বিষয়ে!

আজ হেসে কইলাম, "নাহ্, আজ আর সওয়াল নয়। আজ এইটে কোন বইটা পড়চো?"

"এইটে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত সংক্রান্তও বটে। দুই পাণ্ডবের মামার বিষয়ে।"

আমি চোখ কপালে তুলে কইলাম, "চিকিৎসা সংক্রান্ত, আবার পাণ্ডবদের মামা সংক্রান্ত? কোন বই এখানা?"

কালীপদ একগাল হেসে চামড়ায় মোড়ানো বইখানা পাশে রাখতেই লেখা দেখলুম, 'শল্যচিকিৎসা'। আমি হেসে ফেললাম।

পরদিন সকালের জলযোগের পর ঈশ্বর তার আট বৎসরের পুত্রকে নিয়ে উপস্থিত হল। এখন পেটা ঘড়িতে নয়টা বাজে।

বাখরাবাদের গাড়ির প্রথম ঘন্টির সময় হল বারোটা দশ। এই তিনটি ঘণ্টা সে আমাদের সঙ্গে কাটাতে চায়। ঈশ্বরের পুত্র একখানা চোঙা দূরবিনের মতো খেলনা নিয়ে ইতিউতি দেখছিলো, বউঠান আদর করে শুধাল, "তোমার নাম কী বাবা?"

বালক মিঠা স্বরে উত্তর দিলে, "শ্রীমান ঐশিক নন্দি।"

কালীপদ আদরের স্বরে কইল, "তোমার হাতে ওইটা কী? বন্দুক?"

ঐশিক অবাক হয়ে বলল, "এ মা, দাদু তুমি তো কিছুই জানো না। এটা তো দূরবিন। দূরের জিনিস দেখা যায়।"

কালীপদ বিষণ্ণ কণ্ঠে কইল, "হ্যাঁ দাদুভাই, আমি কিছুই পারিনে।"

বালক তাকে আশ্বস্ত করে আবার কইল, "আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব দাদু। তুমি ছবি আঁকতে পারো? শিব ঠাকুরের ছবি আঁকতে পারো?" কালীপদ অক্ষমভাবে দু-দিকে মাথা নাড়তে বালক কী যেন ভেবে শিক্ষকের ভঙ্গিতে বললে, "বানরের ছবি আঁকতে পারো?"

"তা-ও পারিনে দাদুভাই।"

বউঠান বিপদ বুঝে তার হাতে স্বহস্তনির্মিত দুইখানি নাড়ু দিতেই তাদের ভাব হয়ে গেল। আমি প্রথমাবধি লক্ষ করে চলেছি, ঈশ্বর কিছু একটা কইবার জন্য ছটফট করচে, কিন্তু মুখ ফুটে বলচে না। আমি দাদাকে একদাগ মিক্সচার সেবন করিয়ে শুধালাম, "কী হয়েচে তোমার ঈশ্বর? এই চেহারা করলে কেমন করে?"

ঈশ্বর কুণ্ঠার সঙ্গে কইল, "সে অনেক কথা ভাই, পরে যদি ভগবান সময় দেন তো বলব আর কখনও। এখন তোমার রোগীর সুমুখে সেসব কথা..."

আমি জিভ কেটে বাধা দিলুম, "আরে, রোগী কী হে? ইনি আমার দাদা বলতে পারো। সহোদরের অধিক। ইনি দক্ষিণের রায়দিঘড়া তালুকের জমিদার। তোমাদেরই মতো।"

জমিদার শুনে ঈশ্বরের চক্ষে পূর্বের চাইতে সম্ভ্রম ও শিষ্টতা ফুটে উঠল বটে, তবে দ্বিধাজড়িতভাবে বললে, "বুঝেচি ভায়া, কিন্তু আমি যদি সব কথা কইতে থাকি তবে তোমরা আমাকে উন্মাদ ঠাউরে নেবে এখুনি। তোমারটা তা-ও সইবে, কিন্তু একজন অচেনা..."

কালীপদ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বিড়বিড় করে কইল, "আমি না হয় উঠে যাচ্চি বাছা, কিন্তু তোমার ললাটে বিষম বিপদ উঁকি দিচ্চে। বড়ো বিপদ! তোমার খুব সাম্প্রতিক পিতৃবিয়োগের যোগ সংঘটিত হবে। অপ্রিয় কথার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো।"

কালীপদ উঠে দাঁড়াতেই ঈশ্বর অবিশ্বাসের সুরে কইল, "আশ্চর্য! আপনি কেমন করে জানলেন? মাত্র মাসখানেক আগেই আমার পিতার ভয়ংকর মৃত্যু হয়েচে। আপনি কে ঠাকুর?"

"ব্রাহ্মণ, নাম কালীপদ মুখুজ্জে, নিবাস রায়দিঘড়া গাঁ। আমি ডাক্তারের চাইতে বয়সে প্রবীণ, কিন্তু অনেকখানি মিত্রভাবাপন্ন হয়েই মেলামেশা করে থাকি।"

ঈশ্বর অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বাস ফেলল। আমি হতচকিত হয়ে কইলাম, "সে কী! মেসোমশাই কীভাবে গত হলেন? তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য তো বেশ..."

"শরীরের ব্যামো তাঁকে স্পর্শ করেনি ডাক্তার, তাঁর মৃত্যু হয়েচে বড়ো ভয়ানকভাবে। আপনার স্ত্রী-কে ধন্যবাদ ঠাকুর, তিনি ঐশিককে ওই ঘরে নিয়ে গিয়েচেন, নচেৎ তার সুমুখে সবটুকু খুলে বলা সম্ভব হত না। ধীরে ধীরে সবটুকু বলচি।

"আমরা, নন্দিরা বাখরাবাদ তালুকের জমিদার। তালুকের আশি ভাগের সামান্য অধিক জমিই আমাদের আওতায়। বাকি জমি মনোতোষ সমাজপতিদের দখলে। ওইটুকু জমি নিয়ে জমিদার হওয়া সাজে না, কিন্তু তবুও মনোতোষের বাপ-পিতেমো নিজেদের ওই অংশের ভূস্বামী বলেই পরিচয় দিতেন, আদায় উশুল পার্বণীও নিতেন। এ নিয়ে আমরা কখনও কিছু কইতে যাইনি। সামান্য কুটুম্বিতের একটা দুর সম্পর্কও বাধত আমাদের মধ্যে, কারণ পালপার্বণে ওই একটি ঘরই আমাদের পালটি ঘর ছিল। হোক সে তেরো আনা আর তিন আনার ব্যবধান।

"এই মনোতোষের বাপ চিত্তপ্রিয় ছিলেন বড়ো বেহিসাবি এবং অমিতব্যয়ী ধরনের মানুষ। যার যা আয়, তা থেকে চাল বড়ো হলে মানুষ কেন, দেবতারও দুর্দশা হয়। চিত্তপ্রিয়রও হল তা-ই। পুত্রের অজ্ঞাতে তাঁর তিন আনার প্রায় সবটাই গচ্ছিত রইল আমার কাকা স্বর্গীয় ভগবান নন্দির কাছে। আমাদের জমিদারির বিষয়-আশয় তিনিই সামলাতেন। আমার পিতা স্বর্গীয় মহাদেব নন্দি বিলেত-ফেরত গবেষক। উনি বিলেতে আলো আর বর্ণ নিয়ে গবেষণা করে ডিগ্রি লাভ করে, পরে দেশের টানে চলে আসেন নিজের গাঁয়ে। কাকা নিজের দাদাকে বহির্বাটীতে, আমাদের মন্দিরের থেকে একটু দূরের একখানা বিরাট কক্ষ বরাদ্দ করে দেন তাঁর গবেষণার জন্য। বাবা অধিকাংশ সময়ই ওই ঘরেই কাটাতেন। বাকি সময়ে প্রথম প্রথম নিত্যপূজার জন্য মন্দিরে, অথবা আহারের জন্য ভিতরবাড়িতে আসতেন। পরে অবশ্য পূজাপাঠ একেবারেই

বন্ধ করে দেন তিনি। আমাদের বাইরের সেই ঘরে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। একমাত্র তাঁর নাতি ছিল তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। ঐশিক তার দাদুর সঙ্গে সারাদিন ঘুরঘুর করত। তার এই উপদ্রবকে বাবা হাসিমুখে মেনে নিতেন। মাঝে মাঝে খেলনা বানিয়ে দিতেন। ওই ওর হাতে যে খেলনা দুরবিনটা দেখলেন, ওটাও বাবার তৈরি করা উপহার। আমি চোখ লাগিয়ে দেখেছি, ওই ছেলে-ভোলানো যন্তরে দূরের বস্তু নিকটবর্তী হয় না মোটেই, কিন্তু ছেলেমানুষ অতশত বোঝে না। ওতেই খুশি। তার দাদুর হাতে তৈরি উপহার।"

ঈশ্বর আলগোছে চোখের কোণটুকু মুছে নিয়ে কইল, "যা হোক, যা বলচি, তো এই চিত্তপ্রিয় সমাজপতি লোকটি বড়ো ধড়িবাজ। গোপনে নিজের তিন আনা সম্পত্তি বিক্রয় করে সরে পড়ার ধান্দায় ওঁত পেতে ছিল, কিন্তু আমার কাকা বৈষয়িক মানুষ, তাঁরও গুপ্তচর রয়েচে। সেই খবর পেয়ে কাকা লোকজন নিয়ে গিয়ে গোটা গাঁয়ের সামনে চিত্তপ্রিয়কে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিলে। উত্তরে সমাজপতিও কটু কথা কইল। কাকা ক্রুদ্ধ হয়ে কইলেন, 'বটে? এতদিনের দয়ার এই ফল তবে? আমি তোমার বন্ধকির কথা গোপন রেখেচিলাম। ভেবেচিলাম, সুদিন এলে আপনিই ছাড়িয়ে নেবে, কিন্তু তোমার মতো জোচ্চোরের পক্ষে আদালতই সঠিক স্থান। এইবার মকদ্দমা উঠবে, তোমার সম্পত্তি ডিক্রি হবে। জারিও হবে। সে ডিক্রির জারি নেব আমি নিজে। তৈরি থাকো।'

"বেইমান চিত্তপ্রিয় বুক ফুলিয়ে সকলের সঙ্গে তর্ক করতে আরম্ভ করলে যে, এই মামলা নাকি ভুয়ো। আসলে ভগবান নন্দি হাকিমকে ঘুস দিয়ে বাখরাবাদের বাকি তিন-আনা দখল করতে চায়। সমাজপতিদের প্রজারা তাদের জমিদারকে দিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা গোপনে বিদ্রোহ করে আমাদের সহায়তা করতে আরম্ভ করলে। তারা আমাদের প্রজা হতে চায়, কারণ আমাদের কাছে অজন্মা, বান বা খরায় কর মকুব আছে, পার্বণীর ঝঞ্ঝাট নাই, স্বতন্ত্র কর নাই।

যথাসময়ে ডিক্রি হল। জারি নেওয়া হল আমার বাবার নামে। প্রজারা বৈকালে ফুল-মিষ্টি নিয়ে এসে তাদের নূতন ভূস্বামীকে সামান্য নজর দিয়ে গেল, আর পরদিন প্রত্যুষেই ওই তরফের কিছু বাগদি রায়ত হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে, গতকাল রাতে নিজের স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে, চিত্তপ্রিয় নিজে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেচে। বেলা বাড়তে পুলিশে বাড়ি ছেয়ে গেল তাদের। চিত্তপ্রিয়র ঝুলন্ত দেহ দড়ি কেটে নামানো হল। কাকা এবং আমি দুইজন নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে রইলাম। গোটা বাখরাবাদ সাক্ষী দিলে যে, নন্দি জমিদাররা দেবতুল্য মানুষ। জুয়াচোর সমাজপতিরা মামলায় হেরে গিয়েই এই কাণ্ডখানা ঘটিয়েচে। দারোগা সাইকেল চেপে বিদেয় হল। আমরাও হাঁপ ছাড়লাম। সেই দিনটা যে বিপদের শেষ নয়, সূত্রপাতমাত্র, তা আমরা তখন বুঝতে পারিনি। বুঝলাম ঠিক দুই মাস পর, যখন চিত্তপ্রিয় সমাজপতির গৃহত্যাগী বড়োছেলে বাখরাবাদে ফিরে এল।

তার নাম যতদূর স্মরণ হয় অঘোর ছিল। সে ছাত্রাবস্থায় অত্যন্ত মেধাবী ছিল, পরপর তিনবার জলপানি পেয়েচিলো, তারপর কী মাথায় চাপলো, একেবারে গৃহত্যাগী হয়ে কামাখ্যায় চলে গিয়েচিলো বলেই জনশ্রুতি ছিল, এইবার তাকে চাক্ষুষ দেখে বুঝলাম জনরব এতটুকু মিথ্যা নয়! সে কী বলব ঠাকুর, দশাসই জটা-পড়া বলিষ্ঠ চেহারা। উচ্চতা আপনার থেকেও একটু বেশি, তাহলেই বুঝুন। মাথার জটা পিঠে এসে নেমেচে, চক্ষু নির্দয় এবং হিংস্র! বিরাট কঠিন বক্ষদেশ, পোড়া গায়ের বর্ণ। মানুষ তো নয়, যেন একটা হিংস্র দানব! সে নিজেদের শূন্য গৃহে ফিরে প্রথমটা নাকি থমকে যায়। আড়াল থেকে কৌতূহলী প্রজারা উঁকিঝুঁকি মেরে খবর দেয়, সে শয়তান নাকি বহুক্ষণ একেবারে পাষাণের ন্যায় শূন্য গৃহের পানে চেয়ে বসেচিলো। তারপর গাঁ ঘুরে ঘুরে সব সংবাদ আহরণ করে ভীষণ ক্রোধে ফুঁসতে থাকে। গাঁয়ের লোকেদের দাঁত পিষে বলে, 'তবে তোরাও মিছে সাক্ষী দিয়েচিস বাবার বিরুদ্ধে? আচ্ছা? গোটা গাঁ-ই তাহলে আমার পরিবারকে হত্যা করেচিস?'

গাঁয়ের লোকেরা তার চেহারা আর ভাব দেখে কেউই বলতে সাহস করলে না যে মামলা আগাগোড়া সত্য ছিল। তারা ভয় পেয়ে আমাদের বাড়ি বয়ে এসে সংবাদটা দিলে পর কাকা সেসব উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এসব কি একটা কথা বাছা? সে একা মানুষ কী করতে পারবে? আমাদের গাঁ লেঠেলের গাঁ। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।'

"প্রজারা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেল, অঘোরও দিনকতক কোথায় যেন গা-ঢাকা দিল। মাঝে একদিন বাবা আহারের সময়ে বললেন, 'আহাহা, এসব আবার কেন বউঠান?'..."

বউঠান লুচির পাত্র আর জল নামিয়ে রেখে হাসিমুখে ভিতরে চলে গেল। ঐশিক তার আঁচল জাপটে গল্প শুনতে চাইচে। বাচ্চাটির হাতে খেলনা দুরবিনের সঙ্গে আরেকখানা রামধনু রঙের রবারের বল হাজির হয়েচে। এই রবারের গোলা আমার বাড়ির ঠিক পিছনের দোকানেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ বউঠান খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে এই চার আনা মূল্যের খেলনা উপহার দিয়েচে তার নূতন বন্ধুকে। পাত্রের

দিকে তাকিয়ে ক্ষুধার্তভাবে খাবার মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে ঈশ্বর বলতে শুরু করল, "খেতে বসে বাবা বললেন, 'বুঝলি ছোটো, আমাদের একখানা কুকুর পোষা দরকার। রাতে যখন কাজ করি, আমার ঘরখানার বাইরে কেউ মনে হয় উঁকিঝুঁকি দিয়ে লক্ষ রাখে আড়াল থেকে।'

"কাকা সে কথা উড়িয়ে দিলেন, এবং উড়িয়ে দিয়েই সবচাইতে বড়ো ভুলটা করলেন। দুই দিন পর আমার বাবার মৃতদেহ পাওয়া গেল তাঁর পরীক্ষার ঘরে। কী ভয়ংকর ঠাকুর, কী নৃশংস! বাবার ঘাড়টা ধরে মুচড়ে দেওয়া হয়েচে উলটোদিকে! তাঁর চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁটের থেকে কশ বেয়ে নেমে এসেচে রক্ত, গোটা পরীক্ষাগারে যেন দক্ষযজ্ঞ হয়ে গিয়েচে! সব বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে রয়েচে। আমরা কাঁদতে কাঁদতে দেহ আগলাচ্চি, হঠাৎ ঐশিক কইল, 'দাদুর খাতা-বইয়ের দপ্তর গেল কোথা?'

"আমরা তখন লক্ষ করে দেখি, বাবার পরীক্ষার যাবতীয় নথিপত্র, নকশা, খাতা এবং যা যা দপ্তুরি দ্রব্য ছিল, তার কিছুই প্রায় নাই। ঐশিক ইতিউতি ঘুরে আবার কইল, 'দাদুর বাক্সের ভিতরে যন্তরগুলো কোথা?' আমরা সে কথা শুনে এগিয়ে এসে বাবার একখানা লোহার ভারী টেবিলে চারখানা স্ক্রু দিয়ে আঁটা একটা গুরুভার তোরঙ্গের সামনে এসে ভালো করে দেখলাম, তার ডালাটা উন্মুক্ত হয়ে রয়েচে, তার ভিতর থেকে গায়ের জোরে কিছু কিছু জিনিস যেন খুলে নেওয়া হয়েচে। হয়তো তোরঙ্গ সমেতই বেহাত হত, কিন্তু স্ক্রুয়ের প্যাঁচ খোলার আয়াস স্বীকার করেনি আততায়ী। তোরঙ্গের ডালাতে "ছয়খানা ছিদ্র রয়েচে।

আমরা এ ঘরে খুবই কম এসেচি, কিন্তু ঐশিক সারাদিন দাদুর গায়ে লেপটে রইত, অতঃপর তার কথা উড়িয়েও দেওয়া চলে না। তিন দিন পর নিরানন্দ পরিবেশে পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা হল। প্রজারা বাবাকে সত্যই শ্রদ্ধা করত, তারা একযোগে বললে, এ নিশ্চয়ই সমাজপতিদের ওই অঘোরের কাজ। সে-ই আমাদের চরম অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং স্বভাবে হিংস্রও বটে। কাকা খেপে গিয়ে লেঠেল পাঠালেন তিনআনির দিকে, আর বৈকালে আহত, রক্তাক্ত লেঠেলরা ভগ্নদূত হয়ে এসে জানাল, সেই নররাক্ষস এই দশাসই চারজন পাকা লাঠিয়ালকে অবলীলায় ধরাশায়ী করে গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েচে।

"আমাদের মন এত সহজে তার গাঁ-ত্যাগ মানতে পারল না। আগেই বলেচি, চারদিকে কাকার গুপ্তচর রয়েচে, তাদের মধ্যে একজন খবর দিলে, তিনআনির অঘোর বাখরাবাদের সদর বাজারের থেকে একখানা বড়ো আকারের লোহার শক্তপোক্ত তোরঙ্গ খরিদ করেচে অনেক বেশি মূল্যে, প্রায় কুড়ি টাকা দিয়ে। সেই ভবঘুরে কোথায় যে টাকা পেল তা বুঝলাম না, তবে হয়তো সমাজপতি বাড়ির অভ্যন্তরে সে টাকা পেয়েচে কিছু।

"চমক আরও ছিল। সন্ধ্যার মুখে সদরের ময়রা ভবানীশংকর এসে জানালে, ওই অঘোরনাথ নাকি মণি স্যাকরার গদিতে গিয়ে ছয়খানি মাঝারি মাপের হিরা খরিদ করেচে! আমাদের মাথায় গোল লেগে গেল। ভবঘুরে হিংস্র সাধুসন্নেসি মানুষ, সে তোরঙ্গ বা অতগুলি হিরা দিয়ে কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে? কাকা বললেন, 'অত সহজে সব ধোরো না বাছা, ভুলে যাচ্চো কেন, দাদার পরীক্ষার সমস্ত নথি তার হাতে পড়ার পরেই সে এসব কিনতে আরম্ভ করেচে। দুইটার মধ্যে কিছু একটা সংযোগ রয়েচে বাপ। বড়ো বিপদের গন্ধ পাচ্চি। সে লোক মোটেই সুবিধার নয়, তায় এককালে ছোকরা ভীষণ মেধাবী ছিল। চারদিকে চোখ-কান খোলা রেখে চলাচল করো কয়টা দিন।'

"কাকা নিঃসন্দেহে আমাকেই সচেতন করেচিলেন, কিন্তু মরলেন তিনি নিজে। আরও ভয়ংকর তাঁর মৃত্যু! কয়দিন পরের কথা। কাকা রাতে বাইরে গিয়েচিলেন গাড়ু-গামছা নিয়ে। ফিরে আসতে দেখলাম তাঁর মুখটা দ্বিধাগ্রস্ত। তখন ঘরে ছিলাম আমি, আমার পুত্র, কাকা, আর একজন বেহারি রান্নার ঠাকুর আর জোগানদার। তাদের রন্ধন সমাপ্ত হয়েচে, কিন্তু আহারের তখনও বিলম্ব রয়েচে। আমার ছেলের ক্ষুধার উদ্রেক হয় দেখে আমি তাকে নিয়ে রসুইঘরে প্রবেশ করে নিজের হাতে দুধ জ্বাল দিচ্চি, কাকা বৈঠকে বসে ওই বামুন দুইজনের সঙ্গে কথা কইচে, হঠাৎ আমার মনে হল, সদরের দিকের কপাট-খোলা জানালা দিয়ে একটা আলোর ঝলক দেখা দিল। বাইরে অকালবৃষ্টি হয়ে চলেচে, বজ্রপাতেরও বিরাম নাই, কিন্তু এ আলো বাজের আলো নয়! এ যেন কেউ বাইরে আগুন জ্বেলেচে। আমি ভালো করে কিছু বোঝার আগেই একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল।

"আমি বৈঠকের দিকে চেয়ে দেখলাম, বৈঠকটা আলোকোজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও যেন ঠিকঠাক ঠাহর করা যাচ্চে না! যেন একপাল ঘন মেঘ এসে সব ঢেকে দিয়েচে। না না, মেঘ নয়, যেন কিছু একটা শক্তি এসে সব আড়াল করে তুলেচে। আমি কী করে বোঝাই ঠাকুর!"

কালীপদ চকিতে একবার বিরাট ঘড়িটার পানে চেয়ে, নজর ফিরিয়ে কইল, "আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেচি বাছা, তারপর?"

"তারপর যেন সেই মেঘের জাল রসুইয়ের দিকে এগিয়ে

আসতে আরম্ভ করল। আমি আতঙ্কে কাঠ হয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। অদৃশ্য হয়ে-যাওয়া বৈঠক থেকে তিনজনেরই কাতর স্বর একবারের জন্য কানে এসেচিলো, তারপর রান্নাঘরের জানালার ঠিক বাইরের নারকেলের গাছটাতে কান-ফাটানো শব্দ করে একটা ভয়ানক বাজ পড়ল। আমি ছেলেকে বুকে জড়িয়েই অচৈতন্য হয়ে ঢলে পড়লাম।

"যখন ঐশিকের কান্না আর ঠেলাঠেলিতে আমার সাড় ফিরল, তখন চেয়ে দেখি, সেই আঁধার-করা সর্বনাশা মেঘের জাল দূর হয়েচে, কিন্তু বৈঠকের মেঝেতে কাকা আর ঠাকুর দুইজনের মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েচে। তাদের দেহের কঙ্কালে যেন শুধুমাত্র চামড়াটুকু লেগে রয়েচে। সেই শুষ্ক মৃতদেহগুলিকে যেন কোনো অজানা রাক্ষস এসে রক্তমাংস শুষে নিয়ে ফেলে দিয়েচে! আমরা দেওয়ালের আড়ালে ছিলাম বলেই বেঁচে গিয়েচি সেই খুনি নজর এড়িয়ে।

"আমি কক্ষে প্রবেশ করে কাঁপতে কাঁপতে দ্বার রুদ্ধ করে বাকি রাত্তিরটুকু জাগরণ করি। উষায় গোপালক এলে পর তাকে দিয়ে গাঁয়ে খবর পাঠাই। গোপালক কাঁদতে কাঁদতে জানায়, ধলা আর মুংলিরও মৃতদেহ পড়ে রয়েচে গোহালে! তাদেরও শরীর অমন ছিবড়ে হয়ে গিয়েচে। এই ভয়ংকর এবং ততোধিক রহস্যময় ঘটনায় গোটা বাখরাবাদে হইহই পড়ে গেল। প্রজারা সমস্বরে কইল, এ নিশ্চয়ই ওই শয়তান অঘোরের কাজ।

"এ ছিল সবে আরম্ভ। এরপর মাঝে মাঝেই একেকদিন, বিশেষত রাতের দিকে একেকটি গৃহে আক্রমণ আরম্ভ হল। গোটা বাড়ির সব কয়টি প্রাণী যেন একটা অদেখা, অজানা রাক্ষসের রাক্ষুসে ক্ষুধার শিকার হয়েচে। শরীরকে যতদূর শুষ্ক করে তুলে প্রাণরস শুষে নেওয়া যায়, ততদূর সে শুষে নিয়ে কাঠ হয়ে-আসা দেহগুলো ফেলে রেখে গিয়েচে।

"কারও গৃহে হয়তো ঘরসুদ্ধ লোক শুকিয়ে মরে রয়েচে, অথচ উনানের উপরে রান্না ব্যঞ্জন পুড়েঝুড়ে ছাই হয়ে রয়েচে, কারও বা সামনে অন্নপাত্র ভরতি পড়ে রয়েচে অমনিই, যেন ওই শয়তান একেবারে পলকের মধ্যে প্রাণবায়ু নিংড়ে নিয়েচে।

"এর মধ্যেই দুইখানি খবর আমার মনকে বিকল করে তুলল। মনোহর ঘোষ একদিন বেশ রাতের দিকে গামছা-গাড়ু নিয়ে বাইরে গিয়েচিলো। সে সকালে খবর দিলে যে, রাতে তার নজর একঝলক গিয়েচিলো তার প্রতিবাসী হরিহর পরামানিকের গৃহের দিকে। মনোহর হতভম্ব হয়ে লক্ষ করল যে হরিহরের বাড়িটি যেইখানে থাকার কথা, সেখানে কিছুই দেখা যাচ্চে না, অথচ সেই স্থানের আশপাশের সবকিছুই বিদ্যমান রয়েচে! মনোহর এই কাণ্ডে ভীত হয়ে ছুটে এসে দরজায় আগল দেয়। সকালে আবার দেখে হরিহরের গৃহ যথাস্থানেই আছে! সেই সকালে সাহস করে কিছু প্রতিবাসীকে জুটিয়ে পরামানিকের বাড়িতে ঢুকে সকলে আঁতকে ওঠে। এই কয়দিনে যে শাপ লেগেচে বাখরাবাদে, তারই আক্রমণ ঘটেচিলো নাপিতের গৃহেও। হরিহর, তার স্ত্রী, দুই কন্যা আর বৃদ্ধ পিতা শুকিয়ে কাঠ হয়ে মরে রয়েচে। চোখগুলো যেন ওই রাক্ষস খুবলে খেয়েচে। এইভাবে কতগুলো ঘর যে উজাড় হল ঠাকুর, তার গুনতি নাই। সকলে গাঁ ছেড়ে পালাচ্চে। এইবার বোধহয় আমাকে মেরে তবেই জঠরাগ্নি জুড়োবে তার।

"আর দ্বিতীয় খবরটি হল, ভবানীশংকর রায়ের বাড়িতে একটা পূর্ণিমায় আক্রমণ হল। তখন একজন প্রজা নিজের ফসল পাহারায় ছিল। সে পরিষ্কার দেখেচে যে, সমাজপতিদের ওই অঘোর নাকি একখানা ভারী তোরঙ্গের মতো জিনিস হাতে রায়বাড়ির বাইরে এসে বাক্সটা নামায়। তারপরেই বাক্সে আগুন জ্বলে ওঠে, আর সেই প্রহরারত প্রজাটির চোখের সামনেই রায়বাড়ি বাতাসে মিলিয়ে যায়, অথবা কিছুতে ঢাকা পড়ে। আবার কিয়ৎকাল পর অঘোর নিজের সরঞ্জাম তুলে নিয়ে চলে যায়। সকালে ভবানীদের অতগুলি লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়।"

কালীপদ হাত দেখিয়ে ঈশ্বরকে থামিয়ে কইল, "তুমি বাছা সেই প্রথম থেকেই রাক্ষস রাক্ষস বলে চলেচো, এর ভিত্তি কী? কেউ তো অঘোরকেও ওই ঘটনাগুলোর সময়ে হত্যা করতে দেখেনি। যদি আনুমানিক ঘটনাগুলোর জন্য সে-ই দায়ী বলে মানি, তাতেও রাক্ষসের তত্ত্ব আসচে কেন?"

ঈশ্বর বউঠানের রেখে-যাওয়া গেলাসের পেতলের ঢাকনি সরিয়ে বাকি জলটুকু গলায় ঢেলে বললে, "তত্ত্ব আসচে, কারণ আছে ঠাকুর। আমার সন্দেহ, আমার বাবা কোনো পৌরাণিক তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছু একটা সন্ধান পান এবং তা থেকে কোনো ভয়ংকর রাক্ষসের জন্ম দেওয়ার সূত্র আবিষ্কার করেন। সেই সূত্রই এখন ওই অঘোরের হাতে। সে ওই সূত্রকে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করেই একটা রাক্ষুসে শক্তির জন্ম দিয়েচে। দাঁড়ান ঠাকুর, উতলা হবেন না, কারণটা বলচি এবার।

"প্রথমতল একদিন রাতে আহারের সময়ে কাকা জিজ্ঞাসা করেন, 'দাদা, আপনার গবেষণা কেমন চলচে?'

"উত্তরে বাবা বলেন, 'গবেষণা আর কী রে ভগাই,

সর্বনাশ বল। আমি যে আঁধারের পথের চাবিকাঠি খুলে ফেলেচি। বড়ো সর্বনাশা পরীক্ষা করে ফেলেচি অজান্তেই। এই অন্ধকারের পথ থেকে আমাকে উদ্ধার করার কেউ নাই।'

''কাকা আহারের পরে বহুক্ষণ যত্নপূর্বক সাধ্যসাধনা করেন বাবাকে সবটুকু বিপদ খুলে বলার জন্য, কিন্তু বাবা মুখে কুলুপ আঁটেন। শুধু এই নয়, আগে বাবা বিদেশ থেকে ফেরার পরেও নিয়মিত পূজার্চনা করতেন নিজের হাতে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেসব বন্ধ করে দেন। যেন সত্যিই তিনি অন্ধকারের সাধক হয়ে উঠছেন। যেন সত্যিই সেখানে কোনো শুভশক্তির আর স্থান নাই। আমাদের প্রাঙ্গণেই নিজস্ব মন্দির স্থাপিত রয়েচে, আমার প্রপিতামহের স্থাপন করা মহামৃত্যুঞ্জয় মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন সেথা। বড়ো ভয়ংকর উগ্রমূর্তি। আপনি কখনও দেখেচেন ঠাকুর? গলায় নরমুণ্ডের ন্যায় মালা, হাতে তীক্ষ্ণধার শূল, আবক্ষ ব্যাঘ্রচর্ম, রত্নময় চক্ষু আর মাথার জটায় বসানো রয়েচে যজ্ঞপাত্র। তাতে ধুনার আগুন যখন জ্বালানো হত, তখন সেদিকে চাইলে মনে হবে যেন স্বয়ং প্রচণ্ড রুদ্র মাথায় অগ্নি প্রজ্বলন করে সর্বরোগ নিরাময় করতে বসেচেন। আমরা কোনোদিনই তেমন একটা পূজার্চনা করিনি। বাবা নিজেই একমাত্র ভক্তিভরে মহামৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করতেন, পশুবলিও হত, কিন্তু শেষের দিকে তাঁর যেন মন্দিরে পা দিতেই ঘৃণা হত। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে ভাগাড়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, যেন সেই পচা, গন্ধময় স্থানটাই তাঁর পরম পাওয়া। ভাগাড়ের চৌকিদার দ্বারিক মাঝে মাঝে আমাদের এসব বলে যেত গোপনে।

''একদিন ঐশিক বাবার পরীক্ষার কক্ষে ঢুকে দেখেন, বাবা বড়ো ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েচেন। ঐশিক বলে, 'দাদু, তুমি রাগ করে আছ?'

''তার উত্তরে বাবা রাগে ফেটে পড়ে বলেন, ''তুমি এখন এ ঘর থেকে যাও দাদুভাই। আমাকে একা থাকতে দাও।'

''আমার ছেলে হতভম্ব হয়ে শুধায়, ''তুমি এমন করচো কেন দাদু? আমি কিছু ভুল করেচি?''

''আমার ছেলেটির বয়স অল্প, কিন্তু স্মৃতি বড়ো প্রখর। সে পুঙ্খানুপুঙ্খ আমাদের পরে সব কথা বলেচে। তার প্রশ্নের উত্তরে বাবা দস্তুরমতো হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে অদৃশ্য কারও উদ্দেশে গালি পেড়ে বলেন, 'না না না, এই দুশ্চরিত্র, লম্পট জানোয়ারদের চরিত্রের ঠিকঠিকানা নাই দাদুভাই। আজ এক, কাল এক। শেকলে বাঁধা থাকলেও বড়ো নরঘাতক জিনিস এরা। ছদ্মবেশী ভণ্ড কোথাকার। স্নেহের মুখোশ পরে আশ্রয়দাতাকেই ছোবল মারে হতভাগা। রক্তবীজের ঝাড়কে উপড়ে ফেলব আমি।'

''তাঁর অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে আমার ছেলে জিজ্ঞেস করে, 'জানোয়ার? কেমন জানোয়ার?'

''উত্তরে বাবা চোখ পাকিয়ে বলেন, 'ঠিক তোমার মতোই গুণধর।'

''এইবার আপনিই বলুন ঠাকুর, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ভদ্র মানুষ কখনও কি নিজের ওইটুকু নাতির সুমুখে এমন খারাপ ভাষা উচ্চারণ করতে পারে? ঐশিক কাঁদতে কাঁদতে আমাদের এসে সব বলার পর দুপুরে খাবার সময়ে কাকা একবার ইতস্তত করে কইল, 'আজ ঐশিক কাঁদচিলো দাদা আপনার আচরণে। আপনি কোন জানোয়ার নিয়ে পরীক্ষা করচেন জানতে চাই। এটা কোনো জনশূন্য পরীক্ষাগার নয় দাদা, এ যে ভদ্রাসন! বাস্তু। এখানে আপনি কোন আপদদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে আছেন তা জানলে আমরাও সাবধান হতে পারি। ভূতপ্রেত নয় তো দাদা? না হলে এইবার যে বাখরাবাদের বাস তুলতে হচ্চে।'

''উত্তরে বাবা বিষণ্ণ হয়ে বলেন, 'না, ঠিক জানোয়ার নয় রে। ভূতপ্রেতও নয়।'

'তবে কী ধরনের প্রাণী?'

'প্রাণী নয়।'

''কাকা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে শুধালেন, 'ওহহ, জড়বস্তু? কোনো রসায়ন কি?'

''বাবা বিহ্বল নজরে চেয়ে বলেন, 'জড়বস্তু নয় ভাই, তাদের মধ্যে প্রাণ আসে মধ্যে মধ্যে।'

''এবার শুধু কাকা নয়, আমিও আহার ফেলে চমকে উঠে দাঁড়ালাম! হয় বাবা উন্মাদ হয়ে গিয়েচেন, নচেৎ তাঁর অজান্তেই এমন কোনো রাক্ষুসে চাবিকাঠি তাঁর হাতে এসে ঠেকেচে, যার থেকে উৎপন্ন হয় খুব ভয়ংকর কোনো জীব।''

কালীপদ একখানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঈশ্বর নিজের তোড়ে কথা বলে চলেচিলো, কিন্তু আমি এ শ্বাসের মানেটা বিলক্ষণ বুঝি।

আমি কইলাম, ''কিছু ধরতে পেরেচো কি দাদা?''

কালীপদ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আমার প্রশ্ন শুনে ধীরে ধীরে বললে, ''ধরতে কিছুই পারিনি, এতদূর থেকে বোঝা সম্ভবও নয়, কিন্তু শুধু একটা কথা ভাবচি, যখন ঈশ্বরের কাকা, রান্নার ঠাকুররা মারা পড়ল তখন ঈশ্বর বা তার পুত্রকে ওই রাক্ষসেরা রেয়াত করল কেমন করে?''

ঈশ্বর কইল, ''এ কথা আমিও ভেবেচি ঠাকুর। আমরা রসুইয়ের প্রাচীরের আড়ালে ছিলাম বলেই তারা হয়তো

তাদের দেখতে পায়নি।"

কালীপদ অসন্তোষ প্রকাশ করে বললে, "বড়ো ছেঁদো তর্ক। তোমার কথানুযায়ী, যে প্রজাটি অঘোরকে বাক্স হাতে একঝলক দেখেছিলো ভবানীশংকর রায়ের বাড়িতে আক্রমণের রাতে, তা তো সত্যি? তবে তো অঘোর অবশ্যই ওই রাক্ষসটিকে বা রাক্ষসের দলকে বাইরে থেকেই বাড়ির ভিতরে পাঠিয়েছিল, এবং সেই নরঘাতী জীবরা নিজেরাই বাড়িতে ঢুকে, সব স্থান খুঁজেপেতে সব কয়টি মানুষকে নিধন করে যায়। ফলে তোমাকেও রান্নাঘর থেকে খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে একটুও অসম্ভব নয়।"

ঈশ্বর একটু ভ্রূ তুলে ভেবে নিয়ে কইল, "তবে হয়তো আমি বেহুঁশ ছিলাম বলে তারা কোনোভাবে আমাকে জীবিত বলে টের পায়নি। হয়তো তাদের এই ধরনের কোনো দুর্বলতা রয়েচে?"

কালীপদ আঙুল মটকে কইল, "দুর্বলতা হয়তো আছে, কিন্তু তুমি যা বললে, সেসব কখনও তাদের দুর্বলতা হতেই পারে না। তুমি না হয় অচেতন ছিলে, কিন্তু তোমার পুত্র তো অজ্ঞান হয়নি বাছা। তার প্রতিও রাক্ষসদের এমন দয়ার কারণ? এভাবে শুনে শুনে কোনো সিদ্ধান্তে আসা চলে না ঈশ্বর। আর-একটা কথা, তোমার বাবা হয়তো জেনে-বুঝে কোনো সর্বনাশা আবিষ্কার করেননি, দৈবাৎ হয়ে গিয়েচে। তোমার পুত্র যখন একটু আগেই আমাকে ছবি আঁকতে পারি কি না জিজ্ঞেস করচিলো, তখন আমি খেয়াল করিনি যে দাদুভাই আমাকে বেছে বেছে শিব ঠাকুর আর বানরের ছবির কথাই কেন বলেচিলো। মনে হয়, তোমার বাবা তার নাতির কাছে শিব গড়তে বাঁদর গড়ার উপমা দিয়েচিলো কখনও।"

ঈশ্বর এক মুহূর্ত বিচলিত হয়ে, কালীপদর হাত দুটো ধরে আকুল হয়ে বলে উঠল, "আপনি মনে হয় বড়ো সাধারণ মানুষ নন ঠাকুর। আপনি যাবেন বাখরাবাদে? আমার বাড়িতে? আমি বড়ো অসহায় ঠাকুর, না হলে ফিরে যেতাম না সেখানে। ওই অঘোর নানান তন্ত্রে পারদর্শী। আমরা শহরে লুকিয়ে থাকলেও পার পাব না। আর বিশেষ, সে আমাকে না পেলে গোটা গাঁ-কে চিতেয় তুলে ছাড়বে। আমার দুইজন পুরোনো চাকর আমাদের কলকাতার বাড়িতে দেখভাল করচিলো কিছুদিন, তাদের কাছেই ছেলেকে রেখেচিলাম কটা দিন, কিন্তু এখন সবাইকে নিয়ে ফেরত যাচ্চি। আপনি পারেন না যেতে?"

কালীপদ একটু নিশ্চুপ থাকল। রান্নাঘরের থেকে সজোরে বাসনপত্র রাখার আওয়াজ আসচে, সঙ্গে অকারণ চুড়ি-বালার ঝনঝন। কালীপদ নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা মনে করে আরেকটা শ্বাস ফেলল দেখে আমিই তড়িঘড়ি কইলাম, "না না ঈশ্বর, তা হয় না। দাদার শরীর বড়ো অসুস্থ এখনও। এই দেহে..."

ঈশ্বর বিষণ্ণ হয়ে হেসে বলল, "না না, আমার আবদার বড়ো অনুচিত। আচ্ছা, এইবার অনুমতি দিন তবে। গাড়ির সময় হল। আর হয়তো কখনও দেখা হবে না ডাক্তার।" এই বলে ছেলেকে হাঁক দিল। ঐশিক তার নতুন দিদুনের দেওয়া রামধনুরঙা বল নিয়ে বাবার হাত ধরল এসে। সেদিকে তাকিয়ে আমার বুকটা শতখান হয়ে গেল। দাদারও মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ঈশ্বর বিদায় নিল।

রাতে আহারে বসে কালীপদ খাবার খুঁটে চলেচে দেখে আমি বললুম, "কী হল দাদা?"

কালীপদ একটু উদাস স্বরে বললে, "একটা কথা তুমি ভেবেচো কি না জানি না ডাক্তার, তবে আমি ভেবেচি। এই বিপদের সময়ে ঈশ্বর তো একাও গাঁয়ে ফিরে যেতে পারত। সে আদরের মা-মরা ছেলেটাকে ওই মৃত্যুপুরীতে নিয়ে গেল কেন?"

আমি অস্ফুট কণ্ঠে কইলাম, "কেন?"

"কারণ ঈশ্বরের মনের ভাবটা আমি ধরতে পেরেচি। সে ভাবচে, আমার মৃত্যু হলে ছেলেটাও এখানে বসে মরেই যাবে দু-দিন পর অনাহারে। পরের অচেনা ছেলেকে এই শহরে খাওয়াবে কে? কিন্তু ওখানে থাকলে সে অন্তত বাপের সঙ্গে নিশ্চিন্তে মরতে পারবে।"

বউঠান পাশে বসে চিলো। হঠাৎ সে কেঁদে ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে দৌড়ে চলে গেল। কালীপদ ধীরেসুস্থে উঠে, হেঁশেলে গিয়ে বউঠানের মাথায় হাত রেখে কইল, "তোমাকে দোষ দিইনে মন্দা, তুমি আমার লক্ষ্মী, আমার অন্নপূর্ণা। আমার মঙ্গলের চিন্তাতেই তুমি তখন অন্ধ হয়ে ছিলে, কিন্তু আপৎকালে যে পুরুষ আর্তের প্রাণরক্ষা করতে ভীত হয়, সেই পুরুষের স্ত্রী হওয়া কখনও গর্বের নয়।"

বউঠান স্বামীর দুই কাঁধ ধরে ফুঁপিয়ে বলে উঠল, "ওদের গাঁ থেকে ফেরার সময়ে ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এসো একবার। ও গল্প শুনতে চেয়েচিলো। শরীরের খেয়াল রেখো। আর সে রবারের বল পেয়ে আত্মহারা হয়ে তার খেলনা দূরবিনখানা ফেলে রেখে গিয়েচে, তাকে দিয়ে দিয়ো।"

কালীপদ বউঠানের মাথায় হাত রেখে কইল, "তুমি বরাবর আমার কারণে যে ত্যাগটুকু স্বীকার করে এসেচো, আজ তার ব্যতিক্রম নয় বটে, তবু ফেরার দিনে নিজের হাতে তোমার

জন্য কিছু কিনে আনতে চাই। কী নেবে?"

আমি বুঝলাম যে এই কথাখানা কেবলমাত্র এইটে বোঝানোর জন্যই বলা, যাতে বউঠানের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে আমাদের ফিরে আসা নিয়ে। বউঠান আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে কইল, "আমার নিত্য আরাধ্য ঠাকুরের একখানা বই নিয়ে এসো পারলে।"

আমি হেঁশেল থেকে বেরিয়ে এসে কোঁচা দিয়ে চোখ মুছে নিলাম। এই ক্ষুদ্র কথোপকথনের মধ্যে একজন স্ত্রী-র যে কতখানি ভরসা প্রচ্ছন্ন রয়েচে তাঁর স্বামীর ক্ষমতার প্রতি, তা আর কেউ বুঝবে না।

* * * * * * * *

ঈশ্বর বাখরাবাদে ফিরে এসেচে গতকাল। প্রজারা তাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করে। তারা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে রইলেও একবার করে এসে দেখা করে গেল তার সঙ্গে। বৈকালের মুখে একজন বৃদ্ধ রায়ত এসে খবর দিলে, অঘোরকে সে বাক্স হাতে জমিদারবাড়ির পিছনের বনে ঘুরতে দেখেচে। ঈশ্বর হয়তো সত্যিই চেয়েচিলো যে তার নিষ্পাপ সন্তান তার সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করুক, কিন্তু এক্ষণে সন্তানের জীবনরক্ষায় তার চিত্ত উত্তাল হয়ে উঠল। কলকাতা থেকে আসা দুইজন ভৃত্যের মধ্যে রামশরণকে কইল, "বাজারের ফর্দ লিখেচি, ইস্টিশানের বাজার থেকে নিয়ে আয়। আর ছোটোবাবাকে সঙ্গে নিয়ে যা। সে ঘরে থাকতে চাইচে না মোটে।"

রামশরণ বাবুর তৈরি দীর্ঘ তালিকা দেখে অবাক হল। ঈশ্বর জেনে-বুঝেই হাবিজাবি দ্রব্যের মনগড়া তালিকা প্রস্তুত করে তাদের যথাসাধ্য বিলম্ব করাতে চায়। তার মন বলচে, হিংস্র অঘোর আজই বাড়িতে হানা দেবে। রামশরণ ঐশিককে নিয়ে চলে যাবার পর ঈশ্বর হাঁক দিয়ে দ্বিতীয় ভৃত্যকে ডেকে কইল, "জীবন, আমার কিছু পাওনা মনে হয় সরকারমশায়ের কাছে জমা পড়ে রয়েচে। চট করে একবার ওপারে গিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে হিসেবটা লিখিয়ে নিয়ে আয় তো।"

জীবনরাম বহুদিনের ভৃত্য। সে মাথা নিচু করে কইল, "এই বিপৎকালে তুচ্ছ অর্থের হিসেবে বসার মানুষ আপনি নন। আমাকে মাপ করতে হচ্চে কর্তা, আমি আপনার মতলব বুঝেচি। শরণকে আর ছোটোবাবাকে পাঠিয়েচেন ভালো কথা, কিন্তু আমি মরলে আপনার সঙ্গেই মরব।"

ঈশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। হিসাব সে ঠিকই করেচিলো, শয়তান অঘোর মরণদূত হয়ে তার পরিবারের নিকাশের উদ্দেশেই আসচিলো, কিন্তু সেই লক্ষ্য হঠাৎ পরিবর্তিত হল। অঘোর বনের প্রান্তভাগ থেকে দেখলে যে, একজন ভৃত্য ঈশ্বরের পুত্রকে নিয়ে বাজারের পথ ধরেচে। তার মনের ভিতরে উথালপাথাল জিঘাংসা নেচে উঠল। অঘোর তার সর্বনাশা তোরঙ্গ বনেই লুকিয়ে রেখে গোপনে পিছু নিল রামশরণের।

রামশরণ বাজারে গিয়ে বহু সময় নিল সেসব পণ্য খরিদ করতে, কিন্তু তার সতর্ক নজর রয়েচে ছোটোবাবার দিকে। মাঝখানে ইস্টিশানে রেলগাড়ি প্রবেশের সময়ে ঐশিক ছুটে যেতে চেয়েচিলো সেদিকে, কিন্তু রামশরণ হাত চেপে ধরে কইল, "খপরদার ছোটোবাবা, আমাকে ছেড়ে এক-পা-ও যাবে না কোথাও। চলো, আমরা এখন বাড়ি ফিরব।"

আসার পথে খালি হাতে যে সতর্কতা অবলম্বন করেচিলো রামশরণ, ফেরার কালে অতগুলি বোঝা নিয়ে কিন্তু তত সম্ভব হল না। সে চলেচে অনেকগুলো মোট বোঝা নিয়ে, ঐশিক চলেচে তার পিছুপিছু বল খেলতে খেলতে। ঘাড়ের বোঝার ভারে রামশরণ ঘাড় ঘোরাতে পারচে না। ইস্টিশানের সুমুখের রাস্তাটা দিয়ে চলার পর যখন বাঁদিকে পথটা বাঁক নিল, তখন রামশরণ সভয়ে ওই আলো-আঁধারিতে লক্ষ করল যে তার পিছনে জনপ্রাণী নাই। রামশরণ ঘাড়ের সওদা ছুড়ে পথে ছড়িয়ে ফেলে চিৎকার করে হতাশায় কেঁদে উঠল। সে পাগলের মতো দৌড়ে ছোটোবাবার নাম করে কাঁদতে আরম্ভ করল, কিন্তু উত্তরে কোনো শব্দ শোনা গেল না। রামশরণ পাষাণের ন্যায় পথে বসে পড়ল।

ইস্টিশানের যে পথটা থেকে অঘোর মুখ চাপা দিয়ে বাচ্চাটাকে তুলে এনেচে, সেইটা পথের পাশেই একটা জলা ধরনের নিচু জমি। জলাজমিটুকু দিয়ে একটু এগোলেই একখানা ভাঙা, পরিত্যক্ত মন্দির। অঘোর সেই মন্দিরে ক্রন্দনরত ঐশিককে নামিয়ে সশব্দে একখানা চপেটাঘাত করল। সেই দৈত্যাকৃতি শরীরের প্রহারে ঐশিক চিতিয়ে পড়ল শক্ত মেঝেতে। তার কপাল কেটে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করল, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র প্রাণ তখন বোবার ন্যায় নিশ্চুপ হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েচে এই দানবের দিকে।

অঘোর সেইদিকে চেয়ে সন্তুষ্ট হল। হাঁ, শিকার হিসেবে তুচ্ছ বটে, কিন্তু এমন কচি গলা টিপে সুখ আছে। যখন প্রাণবায়ুর অভাবে এই ছোট্ট শরীরটা ছটফট করবে, লাথি ছুড়বে, সে ভারী সুখের দৃশ্য। আরও সুখ হবে, যখন এর বাপ উঠানে ছড়িয়ে-থাকা ছেলের দেহটা আবিষ্কার করবে। অঘোর নিজের হিংস্র দাঁত ছড়িয়ে হেসে উঠে হিসহিস করে কইল, "দাদুকে তুই বড়ো ভালোবাসতি, তা-ই না?"

বালক ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই শয়তান

শুধল, "দাদুর কাছে যাবি?"

ঐশিক আবার সরল মনে কইল, "হাঁ।"

"তবে আয়, তোকে সেখানে পাঠাই", এই বলেই নিজের রাক্ষুসে মুষ্টি দিয়ে ওই ক্ষুদ্র শিশুর কণ্ঠদেশ টিপে ধরল অঘোর। বালক দমবন্ধ হয়ে রুদ্ধকণ্ঠে শূন্যের দিকে চেয়ে একবার কেবল ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, "দাদু..."

স্নে-হমাখা স্বরে বাইরে থেকে প্রত্যুত্তর এল, "এই তো দাদুভাই।"

অঘোর চমকে উঠে পিছন ঘুরেই বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল! এই আঘাটায় যে কেউ সন্ধানে আসতে পারে এমনটা সে ভাবেনি। অঘোর দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে উঠল, "কে তুই?"

"ব্রাহ্মণ। নাম কালীপদ মুখুজ্জে। নিবাস রায়দিঘড়া।"

কালীপদর হাতে ঐশিকের ইস্টিশানের পথে আচমকা ফেলে-আসা রবারের বলটা ধরা রয়েচে। অঘোর সেইদিকে চেয়ে হিংস্র কণ্ঠে কইল, "বুঝেচি। ওইটে দেখার পর চিনতে পেরে তারপর এই জলায় আমার পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে এসে পড়েচিস ঠিক, তবে আজ একটা নরহত্যা করতাম, এইবার তিনটে করব।" এই বলামাত্র চকিতে তার দুটি বজ্রের মতো হাত কাঁকড়ার দাঁড়ার ন্যায় চেপে বসল আমাদের কণ্ঠে।

অঘোরের অস্বাভাবিক দৈহিক শক্তির কথা ঈশ্বরের মুখেই শুনেচি, কিন্তু আমার মনে হল, হাত নয়, কোনো লোহার যন্ত্র যেন আমাদের গলায় এঁটে বসেচে! এ যেন মানুষের হাত নয়, এ খুনি হাত দুটো দানবের শক্তি ধরে। কালীপদর শারীরিক বল খুব কম নয়, কিন্তু একে তার শরীর দুর্বল, তায় এই দৈত্যের মোকাবেলা করা তার সাধ্য নয়। অঘোর পিশাচের ন্যায় হেসে উঠে কইল, "আজকের সন্ধ্যা তোদের অন্তিম সন্ধ্যা হল। তোদের মতো কুড়িজন এলেও আমাকে শক্তিতে পরাস্ত করতে পারত না। তেমন কোনো মানুষ এখনও জন্মায় নাই।"

কালীপদ দুই হাতে যথাসাধ্য শক্তিতে ওই রাক্ষসের বাম হাতখানা সামান্য শিথিল করে ক্ষীণস্বরে ডেকে উঠল, "কানাই..."

কানাই বাইরেই প্রহরায় ছিল কালীপদর কথামতো। ভিতরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে সে হতবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল, "কর্তাবাবা! এ কী!" এই বলে ছুটে এসে অঘোরের দুইখানি হাত নিজের মুষ্টিতে চেপে ধরামাত্র অঘোরের হাত শিথিল হয়ে আমরা মাটিতে পড়ে গেলাম। কানাই আমাদের উপরে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়েচিলো। অঘোর সেইটুকু সুযোগে নিজের সবল হস্তে কানাইয়ের গলাটা পেঁচিয়ে ধরামাত্র কানাই একটা ভয়ংকর আওয়াজ করে অবলীলায় অঘোরের জটাভার মুঠিতে ধরে তাকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। নিজের প্রাণপ্রিয় কর্তাবাবার দুর্দশায় বুঝি লেঠেল সর্দারের শরীরকে আজ দানোয় পেয়েচে! অঘোর উঠে দাঁড়াতেই কানাই তার বুকে একটা সবল পদাঘাত করে আবার চিতিয়ে ফেলে দিল। মট করে একখানা হাড় ভাঙার শব্দ হল। অঘোর ভীষণ বেদনায় চিৎকার করে উঠে চকিতে মন্দিরের ভাঙা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল বাইরের জলাজমিতে, আর মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

কালীপদ আর আমি ধুলা ঝেড়ে উঠে ঐশিককে তুললাম। তার কপালে ধুলা-মাখা রক্ত। তাকে কোলে তুলে আমরা এগোনোর পথে দেখি, একজন মানুষ পাথরের মূর্তির মতো অন্ধকার পথে বসে রয়েচে। তার নিকটে আসামাত্র সে "ছোটোবাবা!" বলে আনন্দে কেঁদে উঠল।

ঈশ্বর সব কথা শুনে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলে ধীরে ধীরে বলল, "আপনার অনুমান নির্ভুল, কিন্তু এখন আমি ভাবচি, এই নিষ্পাপ প্রাণটাকে কেন আমি এই মরণ ফাঁদে মরতে নিয়ে এলাম। সে থাকত ডাক্তারের কাছে, খেতে-পরতে পেত, বেঁচে তো থাকত ঠাকুর।"

আমি লজ্জায় কানে হাত দিলাম। কালীপদ তার কাঁধে হাত রেখে কইল, "অযথা মিছে আশ্বাস দেব না, তবে এসে যখন পড়েচি তখন চেষ্টা করতে ক্ষতি কি বাঁচবার? আজ আর সে শয়তান এদিকে ঘেঁষবে না। কানাইয়ের হাত যার শরীরে দাগ রেখেচে, সে একদিনে সুস্থ হয় না। আমাকে তোমার বাবার পরীক্ষার ঘর, বসতবাড়ি আর যাবতীয় স্থান একবার দেখাতে পারো?"

বাড়িটি দুইতলা কিন্তু প্রকাণ্ড। নীচে একখানা বিরাট বৈঠকখানা, তার লাগোয়া দুইখানি বিশাল শয্যাকক্ষ, একখানা বড়ো রসুইঘর আর পিছনের কলতলায় বেরুবার দরজা। এই বৈঠকেই তিনজন মারা পড়ে বেঘোরে। কালীপদ সবটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে বলে নিজে একবার আলগোছে চোখ রাখল জানালা দিয়ে রান্নাঘরের লাগোয়া কলপাড়ের দিকে, আর খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই বলল, "তা-ই কি?"

নীচের বড়ো শয়নকক্ষ দুটি ছিল স্বর্গত দুই ভায়ের। উপরের তলায় শোয় সপুত্রক ঈশ্বর এবং তার বাইরের ছোটো ঘরে দুইজন ভৃত্য। আমরা ঘর দেখা শেষ করে বাড়ির প্রাঙ্গণে স্থাপিত মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরে প্রবেশ করলাম। ধ্যানস্থ যোগীর রূপে প্রশান্ত মহাদেবের মূর্তি, তবে ঈশ্বরের কথাও সত্য, এ মূর্তির মধ্যে একটা গা-ছমছমে ব্যাপার আছে। ক্ষুরধার শূলে পেঁচিয়ে

রয়েচে ফণা উদ্যত সাপ, রত্নখচিত চোখগুলি যেন প্রখর দৃষ্টিতে মনের অন্তঃস্থল অবধি দেখতে পাচ্চে, মাথার জটায় বসানো রয়েচে ধুনায় ভরা পাত্র। এই পাত্রে আগুন জ্বেলে মহামৃত্যুঞ্জয় মহাদেব বসে থাকেন আর মানুষকে আয়ু এবং নীরোগ শরীর প্রদান করেন। বিগ্রহের পদপ্রান্তে ভোলানাথের বাহন শিং উঁচিয়ে বসে রয়েচেন। কালীপদ সম্ভ্রমের সঙ্গে দেবমূর্তিকে করজোড়ে প্রণাম করল। মন্দিরের নিশ্চিত কোনো নিজস্ব শুভকর শক্তি রয়েচে, যার ফলে অন্ধকারের পথে নামা বিজ্ঞানসাধক এই মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইতেন না শেষের দিকে। কিংবা এমনও হতে পারে, যে গৃহদেবতাকে উনি নিত্যপূজা করতেন, সেই বিগ্রহের সামনে পাপিষ্ঠের আসতে লজ্জা হত।

আমরা বৈঠকে বসে চা পান করচি, সরকার এসে খবর দিলে, "ছিদামকে আনা হয়েচে। তাকে তো বৈঠকে আনা চলে না, তাই একটু কষ্ট করে উঠানের বাইরে আসতে হচ্চে।"

ছিদাম হল বাখরাবাদের ভাগাড়ের প্রহরী এবং দ্বারিক। গাঁয়ের লোকেরা চাঁদা তুলে তাকে বেতন দেয় পশুপাখির মৃতদেহ সৎকারের জন্য। আমরা বেরোতে ছিদাম অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে হাতজোড় করল। কালীপদ একটু চিন্তা করে বললে, "আচ্ছা শ্রীদাম, তুমি তো এ বাড়ির বড়োকর্তাকে বেশ চিনতে-জানতে, তো উনি তোমার ভাগাড়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াতেন শুনেচি। কিন্তু ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো অস্বাভাবিক আচরণ তোমার চোখে পড়েচে কি?"

ছিদাম কিঞ্চিৎ স্মরণ করে কইল, "অস্বাভাবিক কেমনে বলি ঠাকুরমশায়, বড়োবাবুর কাজকর্ম তো জানতুম আমি, তাঁর পক্ষে কিছু কিছু কাজ করা অতি স্বাভাবিক, যা আমাদের মতো গেরস্ত মানুষের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়।"

আমি এই প্রায় অশিক্ষিত মানুষটার কথার সাবলীলতায় বিস্মিত হলাম! ছিদাম বলে চলল, "সামান্য বেচাল বলতে একটা কথা কইতে পারি, একদিন ভাগাড়ে তিনখানা কুকুরের মৃতদেহ এসেচিলো। বাবু আগেই বলে রেখেচিলেন কুকুরের মৃতদেহ পেলেই জানাতে। তখনও বাবু নিয়মিত ভাগাড়ে ঘোরাফেরা আরম্ভ করেননি। আমি খবর দিতে বাবু উপস্থিত হলেন ভাগাড়ে। কুকুরগুলোর দেহ নিরীক্ষা করে বাবু কইলেন, 'শ্রীদাম, তুমি ওইদিকটে ঘুরে এসো। আমার কাজ রয়েচে।'

"এরপর আমি কিছু সময় পরে সেইদিকে গিয়ে দেখি, বাবু নিজের পুঁটুলিটা পাশে রেখেচেন, তার পাশে একখানা চিমটা, ছোটো ছুরি আর কৌটা। বাবু নিজেই কুকুরগুলোকে সমাধিস্থ করেন। এই কথা শুনে আমি লজ্জায় শিউরে উঠতে বাবু শান্ত স্বরে বলেন, 'লজ্জা পেয়ো না শ্রীদাম, সমাধিস্থ অথবা দাহ করাকে শাস্ত্রমতে সৎকার্য বলা হয়, আর সৎকার্যে তো সবারই অধিকার রয়।' এই বলে বাবু চলে গেলেন।"

কালীপদ ভ্রূ কুঁচকে বলল, "ছুরি, কৌটা, সমাধি? ভারী আশ্চর্য বটে!"

শ্রীদাম প্রস্থানোদ্যত হলে পর কালীপদ ইতস্তত করে তাকে পিছু ডেকে কইল, "আচ্ছা শ্রীদাম, তোমার কথায় বুঝেচি তুমি কিঞ্চিৎ পড়াশুনা শিখেচো এবং সাবলীল বুদ্ধিও ধরো। এই ভাগাড়ের কাজ করতে ইচ্ছে হয় তোমার?"

শ্রীদামকে এই প্রশ্ন হয়তো আজ অবধি কেউ করেনি। তার মুখে পলকের জন্য একটা বিষাদের ছায়া পড়ল, পরমুহূর্তেই সে হেসে জবাব দিল, "যা করে বস্ত্রাহার জুটচে, তাকে মন্দ বলি কেমন করে ঠাকুরমশায়? তাতে পাপ বাড়ে বই কমে না।"

কালীপদ সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, "তুমি একটু গোপনে অঘোরের সুলুকসন্ধান নিতে থেকো বাছা।"

"আজ্ঞা ঠাকুর।"এই বলে শ্রীদাম প্রস্থান করল।

* * * * * * * * *

দুইতলার দ্বিতীয় শয়নকক্ষে আমরা আশ্রয় নিয়েচি। কানাই দ্বিপ্রহরে ঘুমিয়ে নিয়েচে, এক্ষণে সে সুপ্রশস্ত ছাতে একখানা সড়কি নিয়ে একাই পাহারা দিচ্চে, এতটুকু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই সে হাঁক দেবে। কালীপদর কোলে ঐশিক বসে ঢুলচে।

নন্দি পরিবারের পুরোনো আলোকচিত্র আলেখ্য কুঞ্চিকা পড়ে রয়েচে। এখন তোমরা যাকে ফোটো অ্যালবাম বলো, তার সঙ্গে এর বিস্তর ফারাক। তখনকার দিনে প্রতিটা আলোকচিত্রের নীচে সুন্দর হরফে সেই চিত্রের ইতিহাস আর তারিখ লেখা থাকত ঝরঝরে ভাষায়। কালীপদ একটা ছবিকে মন দিয়ে দেখচিলো। ছবিতে দোর-খোলা মন্দিরের সিঁড়িতে ঈশ্বরের পিতা, কাকা আর ঈশ্বর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েচে। তখন সবার বয়স অল্প। সেটাকে খুঁটিয়ে দেখে কালীপদ একবার ভ্রূ তুলে কী যেন ভাবতে লাগল।

কালীপদ পালঙ্কের একপাশে বসে রয়েচে, ঐশিক ঘুম-ঘুম চোখে কালীপদর কোলে বসে ঝিমুচ্চে। ঘরে ঈশ্বরের পিতা মহাদেবের যুবাকালের আবক্ষ তৈলচিত্র। কালীপদ একটু ভেবে শুধাল, "আচ্ছা ঈশ্বর, তোমাদের যে প্রজাটি ওই পরামানিকের বাড়িতে আক্রমণের রাতে অঘোরকে নিজের লোহার তোরঙ্গতে আগুন জ্বালতে দেখেচিলো, সেই আগুন ঠিক কী ধরনের ছিল তা জিজ্ঞাসা করেচিলে কি?"

"হাঁ ঠাকুর, করেচি। তা-ই বা কেন বলি, কাকার মৃত্যুর রাতে সেই আগুনের একটা আভা আমিও দেখেচি বাইরে। প্রথমে একটা সাধারণ মশালের ন্যায় আভা, তারপর অনেকগুলো মশালের সমান উজ্জ্বল আলো, আর চোখের পলক না ফেলতেই যেন চারদিক ধাঁধিয়ে-যাওয়া আগুনের প্রভা দেখতে পেয়েচি আমরা। মনোহরও তেমনটাই দেখেচে, কিন্তু এমন অস্বাভাবিক আগুনে দীপ্তি কখনও দেখিনি ঠাকুর।"

একটু পুরোনো কথা স্মরণ করে ঈশ্বর আবার কইল, "আরও একটা কথা মনে পড়ল ঠাকুর, যে বৃদ্ধ হারান দুলে অঘোরকে তোরঙ্গ নিয়ে বনের ভিতরে ঘোরাফেরা করতে দেখে খবর দিয়ে গিয়েচিলো, সে বলেচিলো, অঘোরের ওই সর্বনাশা লোহার তোরঙ্গের গায়ে অনেকগুলো চকচকে পুঁতির মতো কী যেন বসানো রয়েচে, সেগুলি আবছা আলোয় ঝলমল করে জ্বলচিলো! সেইজন্যই বৃদ্ধের চোখে পড়ে সেইগুলি। তো আমি তাকে তখন শুধালাম, কয়খানা পুঁতি দেখেচেন হারানকাকা? উত্তরে বৃদ্ধ ললাটে কুঞ্চন ফেলে কইল, 'ঠিক যেন দুইখানি তিনকাটির মতো।'

কালীপদ অবাক হয়ে কইল, "তিনকাটি অর্থ?"

ঈশ্বর বললে, "এ আমাদের গ্রাম্য স্থানীয় বুলি। তিনকাটি বলতে ত্রিভুজাকৃতি কিছুকে বোঝায়।"

কালীপদ নিজের মনেই বিড়বিড় করল, "দুইখানি ত্রিভুজের মতো দেখতে? মানে ছয়খানা মতো পুঁতি? জ্বলজ্বলে? ত্রিভুজ? তোমার বাবার তোরঙ্গের ডালাতেও ছয়খানা ছিদ্র ছিল, তা-ই না? তার অর্থ, স্রষ্টার তৈরি ওই একমাত্র বিস্ময়কর যন্ত্রকে ধ্বংস করে সেই জিনিসই নূতন করে গড়ে নিয়েচে ওই শয়তান। হয়তো তার তৈরি প্রাণঘাতী ওই যন্ত্রকে একমাত্র প্রতিহত করা যেত তোমার বাবার তৈরি যন্ত্র দিয়েই, কিন্তু সে পথ সুকৌশলে রুদ্ধ করেচে পাষণ্ড।"

"আজ্ঞা হাঁ ঠাকুর, তা-ই।"

আমি একটু বিলম্ব নিয়ে বললাম, "ঈশ্বর, ওই অঘোর যেন কয়খানা হিরা খরিদ করেচিলো? ছয়খানা নয় কি?"

ঈশ্বর চোখ বড়ো করে উত্তর দিল, "ঠিক তো! তা-ই বটে! তবে ওই শয়তান হিরাগুলিকে লোহার তোরঙ্গে বসিয়েচে? কিন্তু কেন?"

এর জবাবের প্রত্যাশায় আমি কালীপদর দিকে চেয়েও উত্তর পেলাম না। সে হতাশার স্বরে বললে, "কেন বসিয়েচে তা জানার উপায় নষ্ট হয়েচে ডাক্তার। আর কানাই সর্দার যতই বলবান হোক, ওই ধূর্ত পিশাচের মতো শয়তানটাকে তখনকার মতো পরাজিত করতে পারলেও হয়তো শেষ সময়ে তার দৈহিক বল কোনো কাজেই এল না। তোমার বাবার আবিষ্কৃত কোনো মারণ রাক্ষুসে সংকেত যদি অঘোর সমাজপতির হাতে পড়ে থাকে এবং সে ওই লোহার তোরঙ্গ, খরিদ-করা হিরা আর ওই আগুন দ্বারা সেই সুপ্ত রাক্ষসকে জাগ্রত করার পন্থা পেয়ে গিয়েই থাকে, তবে অঘোরকে পরাস্ত করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব কি?"

কালীপদ আনমনে নিজের আঙুলগুলো মটকে নিয়ে শুষ্ক স্বরে বললে, "একজন আবিষ্কারক যখন কোনো আবিষ্কার করেন, তা সে ভালোমন্দ যা-ই হোক, তিনি নিজে আগে পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা করে তারপর সিদ্ধান্তে আসেন। এটাই স্বাভাবিক। তাই ঈশ্বরের পিতাও অতি অবশ্যই সেই তথাকথিত রাক্ষস জাগানোর কলকবজা নিজে আগে তৈরি করেচিলেন, এমনটা বিশ্বাস করা যেতেই পারে। অঘোর যখন ঈশ্বরের পিতাকে হত্যা করে পরীক্ষাগারে লুঠতরাজ করে, তখনই সে ওই একমাত্র যন্ত্রটি তছনছ করে রেখে যায়। উপায় হয়তো একটা হত, যদি উনি আরও একটি যন্ত্র তৈরি করে রেখে যেতেন, কিন্তু গোটা গৃহ তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেইরকম কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি, ফলে সেই আবিষ্কার এখন সম্ভবত একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপে একটা নররাক্ষসের হাতের অনিবার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেচে। হা ভবানী! বিফল চেষ্টা জানি, তবু কাল আরেকবার ওঁর পরীক্ষার ঘরটা খুঁটিয়ে দেখতে হচ্চে।"

পরীক্ষার ঘরে যাবার কথা শুনে ঐশিক কালীপদর কোল থেকে নেমে বাপের কোলে আশ্রয় নিল দেখে আমি বিষণ্ন হয়ে কইলাম, "ছোটো ছেলেটা হয়তো এখনও তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় দাদুর আচরণটা ভুলতে পারেনি ঈশ্বর। মেসোমশায়ের অমন রুক্ষ আচরণ করা গর্হিত কাজ হয়েচে, ঠিক যতটা হয়েচে নাতির সামনে নোংরা ভাষা ব্যবহার করায়। তোমার ছেলে অন্তত বার চারেক আগ্রহ করে আমার কাছে জানতে চেয়েচে, 'ডাক্তারকাকা, লম্পট মানে কী? চরিত্র কী? মেসোমশায়ের মতো বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল মানুষের থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশা করা যায় কি ঈশ্বর? উনি নিজে না হয় পাপের পথে, অন্ধকারের জগতে পা দিয়েচেন, কিন্তু তাতে কি একটা মানুষের শিক্ষাদীক্ষা এতটা হীন হয়ে যায়? কিছু মনে কোরো না ভায়া, হয় উনি মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েচিলেন, আর নয়তো সত্যিই ওঁর চোখের চামড়াই নাই, যার ফলে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে, একটা এইটুকু শিশুর সামনেও অমন অশ্লীল...'

ঈশ্বর আমাকে অস্বস্তিতে থামিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েচিলো, কিন্তু তার আগেই কালীপদর "শশশশ্" শব্দে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে থেমে গেলাম! কালীপদর মন এতক্ষণ

এক বিন্দুতে একাগ্র হয়ে তীক্ষ্ণভাবে চতুর্দিক থেকে সামান্য কোনো সূত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টায় হাতড়ে বেড়াচ্ছিলো, এইবার সে ধ্যানভঙ্গ হয়ে বিস্ফারিত চক্ষে কইল, "তা-ই তো ডাক্তার! ঠিক বলেচো!"

"কী হয়েচে দাদা?"

কালীপদ আবার হিসহিস করে কইল, "চোখের চামড়া নাই, এইটে এতক্ষণ মনে পড়েনি আমার।"

ঈশ্বর হতভম্ব হয়ে একবার অজান্তেই নিজের চোখে হাত বুলিয়ে নিয়ে শুধাল, "কার?"

কালীপদ আলোকচিত্র সংগ্রহের বইখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল। আমি উঁকি মারতেই চোখ পড়ল চিত্রটার পানে। আমি অবাক হয়ে খুব ভালো করে দেখেও ছবিতে তিনজনের কারও চোখেই তেমন কিছু খুঁত খুঁজে পেলাম না। ভদ্রমানের সেই আলোকচিত্রে কোনো শারীরিক বিচ্যুতি নাই। কালীপদ উত্তেজিত হয়ে কইল, "এইবার অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠিক ঠিক। তাই তো সুতোটা জুড়তে পারচিলাম না। আর ভাগাড়ে গিয়ে সদ্যোমৃত কুকুরের কেন দরকার পড়ল তা-ও ধরতে পারচিলাম না। এইবার পেরেচি হয়তো। তোমরা শুয়ে পড়ো। আমাকে একবার নীচে যেতে হচ্চে। নীচের সব ঘরের দোরের চাবিকাঠি আমাকে দাও।" এই বলে কালীপদ নিজের স্যুটকেস খুলে বের করল ঐশিকের ফেলে-আসা খেলনা দূরবিনটা আর কইল, "দাদুভাই, তোমার দিদু এইটে তোমাকে ফেরত দিয়েচেন। আমার একটু দরকার রয়েচে এটায়, তারপর তোমাকে ফেরত দিয়ে দেব। সাবধানে রাখবে এইটা।" খোয়া-যাওয়া খেলনা দেখতে পেয়ে ঐশিক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

নীচে সম্ভবত পরীক্ষাগারের ভারী দোর খোলার ক্ষীণ শব্দ কানে এল। কালীপদ ফিরে এল বেশ কিছুক্ষণ পর। তার শরীর ঘর্মাক্ত, মুখে উত্তেজনা। আমি কিছু শুধাবার আগেই কালীপদ কইল, "এখন আর সওয়াল-জবাব নয় ডাক্তার, আমার মন বলচে, খুব শীঘ্রই আক্রমণ করবে ওই পাষণ্ড। গণ্ডির ব্যবস্থা করে এলাম। আক্রান্ত হলে তবেই গণ্ডি বলবৎ করব। শোনো ডাক্তার, উঠানের এ মুড়ো-ও মুড়ো দেখবে একখানা গভীর দাগ কেটে এসেচি। ওই নরঘাতক আক্রমণ করলে তোমরা গণ্ডির ভিতরে ঢুকে পড়বে। আমিও প্রবেশ করব, তারপরেই গণ্ডি জেগে উঠবে। অঘোরকে রুখবার একেবারে নিশ্চিত কোনো উপায় আমি পাইনি। যেটুক পেয়েচি, তার প্রয়োগ নিয়েও যথেষ্ট ধন্দ রয়েচে, তাই নিজেদের রক্ষা করাই একমাত্র উপায়। গণ্ডির ভিতরে তারা ঢুকতে পারবে না, ঠিক যেমন পারেনি ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে সেইদিন।"

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আমি কম্পিত স্বরে কইলাম, "তারা? তারা কারা দাদা?"

"রাক্ষস, ডাক্তার রাক্ষস! বড়ো ভয়ংকর রাক্ষস! তাদের চরিত্রের কোনো ঠিকঠিকানা নাই, তারা স্নেহের মুখোশ পরে আশ্রয়দাতাকেই ছোবল মারে। মহাদেব নন্দি সত্যিই অন্ধকারের জগতের ভয়ংকর একটা দরজা খুলে ফেলেচে।"

মৃত মহাদেব নন্দির কথাগুলো হুবহু কালীপদর মুখে শুনে আমার শরীর কেঁপে উঠল। তবুও শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, "ঈশ্বর সেদিন কী কারণে রক্ষা পেয়েচিলো তা তুমি ধরতে পেরেচো?"

"পেরেচি। সে আড়ালে থাকার জন্য কক্ষনো বেঁচে যায়নি, সে রক্ষা পেয়েচে অপ্রত্যাশিত বজ্রপাতের কারণে। হয়তো ঈশ্বরের আর তার পুত্রের পরমায়ু ছিল বলেই বাজটা পড়ল একেবারে রান্নাঘরের গায়ে একটা নারকেলের গাছে। সেই অভিঘাতে ঈশ্বর জ্ঞান হারায়। বজ্রপাতের ফলে ক্ষণিকের জন্য যে বৈদ্যুতিক চুম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রভাবেই সেই রাক্ষসরা পরাভূত হয় তখনকার মতো। মহাদেব নন্দির আবিষ্কৃত নরখাদক শয়তানদের এই একখানা দুর্বলতা আমি খুঁজে পেয়েচি, তাই একখানা বিশেষ গণ্ডি আমি তৈরি করে রাখলাম।"

আমি কাতরস্বরে আজকের শেষ প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম, "প্রয়োগ নিয়ে ধন্দ রয়েচে বললে? কীসের প্রয়োগ দাদা? বিজ্ঞানী মহাদেব নন্দির সেই মারণযন্ত্র তো ধ্বংস হয়ে গিয়েচে চিরকালের মতো!"

উত্তর পাবার আশা করিনি, কিন্তু পেলাম। কালীপদ ঐশিকের সেই খেলার দূরবিনটা চৌপাইতে খুব সাবধানে রেখে, একেবারে চাপাস্বরে বলল, "রাক্ষসদের আহূত করার আরও একখানা যন্ত্র অতি সংগোপনে গড়ে গিয়েচিলেন ঈশ্বরের বাপ। সে যন্ত্র এতই খোলামেলা আর উন্মুক্তভাবে সবার চোখের সামনে ছিল, যে কেউ তাকে গুরুত্ব দেয়নি।" এই বলে আমার হাতটা ধরে কালীপদ গাঢ়স্বরে বললে, "এই দূরবিনটা কাল সকাল থেকে তোমার জিম্মায় রেখো ডাক্তার। চাইলেই যেন হাতে পাই।"

আমি সভয়ে একবার দুইদিকে মোটা কাচের পরকলা-বসানো চোঙাকৃতি দূরবিনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম! তার ভিতরে কয়েকখানা ঘষা কাচের গুড়ুলের ন্যায় পদার্থ বসানো রয়েচে।

নানান সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য কথার দোলাচলে পড়ে সারাদিনের মানসিক ক্লান্তিতে আমি নিদ্রা গেলাম অচিরেই।

* * * * * * * *

রাত সামান্য বাড়লে পর শ্রীদাম এসে দাঁড়াল উঠানের বাইরে। কালীপদ তার সুমুখে যেতে ফিসফিস করে কিছু কথা কয়ে সে চলে গেল। কালীপদ আমার দিকে তাকিয়ে বিরস স্বরে কইল, "আমার ধারণাই ঠিক। সেই নরহন্তা দানব গভীর বনে তার যন্ত্রের পরীক্ষা করেচে দুইবার। হয়তো সবাইকেই আক্রমণের পূর্বে সে এভাবেই ঝালিয়ে নেয় নিজের মারণাস্ত্র, তাই সে আর দুই-তিন রাতেই হানা দেবে ডাক্তার। তৈরি হও। আত্মরক্ষাই এখন একমাত্র পন্থা। বাকিদের গণ্ডিটা বুঝিয়ে দিয়েচো ডাক্তার? যখনই আক্রমণ হবে, তৎক্ষণাৎ আমরা সকলে ওই দাগের ভিতরে চলে যাব। তার পাঠানো রাক্ষসরা গণ্ডি পেরোতে পারবে না। অঘোর নিজেও পারবে না। এ সর্বনাশা দাগ একবার জেগে উঠলে তাকে শরীরধারী কেউই এপার-ওপার করতে পারে না।" কালীপদর কথায় সকলে আরেকবার ভয়ে ভয়ে দাগটার দিকে চেয়ে দেখল!

আমরা, এমনকি কালীপদও জানতাম যে আক্রমণ হতে আর অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু পিশাচটা যে আজকেই ছোবল দেবে, তা কেউই ভাবিনি, কারণ কানাইয়ের হাতে ভীষণ আহত হবার পর আমার অন্তত চিকিৎসক মনে ধারণা হয়েচিলো যে সে অন্তত পক্ষে তিন দিনের আগে এদিকে ঘেঁষতে পারবে না। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েচে। ভৃত্যবর্গ টুকিটাকি গার্হস্থ্যকর্ম সমাধা করচে, ভিতরে পাচকঠাকুর রন্ধনের আয়োজন করচে, ঈশ্বর ঐশিককে নিয়ে মন্দিরে পিদিম জ্বালচে এবং আমি আর কানাই উঠানের বেদিতে বসে চা পান করচি। কালীপদ উপরি উপরি যতই স্বাভাবিক আচরণ দেখাক, আমার চেনা চোখে দেখতে পাচ্চি, তার অন্তঃস্থল সর্বদা ভীষণ চকিত হয়ে রয়েচে। সে এখন মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ফটকের জোর পরীক্ষা করচে।

আমি সেদিকে একবার তাকিয়ে কানাইকে কী একটা যেন কইতে যাব, আচমকা বাইরে থেকে শ্রীদাম পড়ি-মরি দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বেদম হয়ে চিৎকার করল, "ঠাকুর... সে এসে পড়েচে! পালান ঠাকুর!" আমার হাতের থেকে পেয়ালা-পিরিচ পড়ে গেল। কালীপদ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, "সবাই দাগের ভিতরে ঢুকে পড়ো এখুনি, শ্রীদাম তুমিও। শিগগির করো।" আমরা হুড়োহুড়ি করে গৃহের কাছাকাছি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কালীপদ ক্ষিপ্রহস্তে ফটকের গায়ে অঙ্গুলি স্পর্শ করে কী যেন একটা করতে যাচ্চে, হঠাৎ বনে আঁধার ফুঁড়ে আবির্ভাব হল একখানা নরদানবের মূর্তি! অঘোর! তার হাতে বিরাট লোহার তোরঙ্গ, হাতে মশাল জ্বলে উঠচে, তার ধীরেসুস্থে ফেলা পদক্ষেপ জানিয়ে দিচ্চে যে সে নিজের বাসনা, আসন্ন নরমেধের বিষয়ে শত ভাগ নিশ্চিত। সে যতখানি স্থিতধী এবং কৃতসংকল্প হয়ে রয়েচে, কালীপদও যদি ততখানি হতে পারত তবে হয়তো ঘটনাক্রম বদলাতে পারত, কিন্তু কালীপদ এই চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে এমন একখানা কাজ করে বসল, যা দেখে আমি প্রমাদ গনলাম।

শয়তানটা ঠিক ফটকের ওপারে এসে তোরঙ্গটা নীচে নামিয়ে রেখে তাতে হাতের মশালটা ছোঁয়াল। প্রথম নিভু নিভু, তারপর মুহূর্তে চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আগুনে ভরে উঠল তোরঙ্গের উপরে বসানো ইন্ধনপাত্রটা। কালীপদ তখনও ফটকের বাঁধন সমাধা করে উঠতে পারেনি। সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত দেখে সে বাঁধন ফেলে আমাদের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের দক্ষিণ হাতের তর্জনীটা দুইবার কাটাকাটি দেবার মতো করে বাতাসে ঘোরাল। চোখের পলকে আমার মনে হল, কালীপদর দেওয়া গণ্ডি বরাবর একখানা নীলাভ স্বচ্ছ কাচের প্রাচীর জেগে উঠল মাটি ফুঁড়ে! সেই প্রাচীরের শরীর জুড়ে আবছা বিদ্যুতের চিড়বিড় ফুটে উঠচে! বর্ষার মেঘময় আকাশে যেমন নিঃশব্দ তড়িৎপ্রভা দেখা যায়, ঠিক তেমনি।

কালীপদ হয়তো ভেবেচিলো, সে গণ্ডির ভিতরে ঢুকে আসার পরেই গণ্ডি জেগে উঠবে, কিন্তু এক মুহূর্তের গোলমালে সব ওলটপালট হয়ে পড়ল। কালীপদ ছুটে এসে আমাদের দিকে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রাচীরে স্পর্শমাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে পড়ল ওপারেই। কানাই হায় হায় করে বেরুতে যাওয়ামাত্রই সে-ও ছিটকে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। ঐশিক কেঁদে উঠল। কালীপদ উপায়ান্তর না দেখে মন্দিরের সিঁড়ির আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল। আমি কী করতাম বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ একটা নারকীয় দৃশ্য ফুটে উঠল চোখের সামনে। সেই বিদ্যুতের প্রাচীর জুড়ে যেন কোটি কোটি সূচিপ্রমাণ আলোকবিন্দু ফুটে উঠচে কাতারে কাতারে। আগুনের আলোতে যেমন শত শত শ্যামাপোকা এসে জ্বলে মরে, ঠিক তেমনি ওই ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা পাষণ্ড যেন নিজের যন্ত্র থেকে আমাদের দিকে লক্ষ্য করেই ছুড়ে দিয়েচে অজানা, অদেখা কোনো একটা স্রোত, যে স্রোত সোজাসুজি আমাদের লক্ষ্য করেই ধেয়ে আসচে এবং শক্তিমান গুণীনের স্বহস্তে কেটে-দেওয়া গণ্ডিতে ঠেকে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যাচ্চে! সেই সঙ্গে চারদিক যেন ঝাপসা আঁধারে ঢেকে যাচ্চে। একটা ভীষণ অন্ধকারের স্রোত আমাদের চোখ থেকে বাইরের দৃশ্য অস্ফুট করে তুলেচে।

একসময়ে আগুন নিভে গেল। আঁধারের বদলে আবার বাইরেটা দেখতে পেলাম। অঘোরের চোখে বিস্ময়, মুখে হিংস্র ভাব। সে বুঝি তার যন্ত্র-প্রেরিত রাক্ষুসে জীবদের এভাবে

রুখে দেবার কথা কল্পনাও করতে পারেনি। এই বিদ্যুৎগণ্ডি ঠিক কীসের, তা-ও বুঝতে পারেনি, কিন্তু তখনই তার দৃষ্টি ফিরল সিঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে-থাকা কালীপদর দিকে। গণ্ডির যতই ক্ষমতা থাক, কালীপদ যে হাজার চেষ্টা করেও সেই বাঁধনের ভিতরে আর ঢুকতে পারবে না, তা দানবটা বেশ টের পেয়ে ভীষণ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের প্রায় ভস্ম করে দিয়ে এগিয়ে চলল কালীপদর দিকে। ধীরপায়ে।

কালীপদ বিপদের চরম মুহূর্তে পৌঁছে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘‘ডাক্তার, দূরবিন’’। আমি চকিতে দূরবিনটা বের করে উত্তেজনায় ছুড়ে দিলাম কালীপদর দিকে। সেখানা সোজাসুজি ছুটে গেলে কালীপদ তাকে ধরতে পারত সন্দেহ নাই, কিন্তু বাদ সাধল বিদ্যুতের গণ্ডি। সেই প্রায় স্বচ্ছ বলয়ে দূরবিনটা ঠেকামাত্র সজোরে ছিটকে পড়ল গৃহের বহিঃপ্রাচীরের গায়ে এবং তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হয়ে মাটিতে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল! আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কালীপদ একটা অস্ফুট হতাশার স্বরে কী যেন বলেই আত্মরক্ষার্থে ছুটে গেল একমাত্র আশ্রয়স্থল মন্দিরের ভিতরে এবং ভারী দুয়ার এঁটে দিল।

অঘোর মন্দিরের দোরের সামনে এসে নিজের বাক্সের ডালা দুয়ারের দিকে লক্ষ্য করে সেটাকে ভূমিতে বসাল। ইন্ধনের পাত্রকে পূর্ণ করল সঙ্গে আনা নূতন ইন্ধন দ্বারা, আর তারপর হাতের জ্বলন্ত মশালটা অপর হাতে নিয়ে মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে সবলে পদাঘাত করল। সেই গুরুভার কপাট দানবের পদাঘাতে মড়মড় করে উঠল। পরপর পাঁচবার পদাঘাতের পর প্রাচীন কপাটের একটি দড়াম করে বিচ্যুত হয়ে ভূমিশয্যা নিল। অপরটিকে হাতের ধাক্কায় উন্মুক্ত করে দিল অঘোর। তাকিয়ে দেখলাম, কালীপদ আত্মগোপন করেচে মন্দিরের একেবারে পিছনের দেওয়ালের গায়ে। তারপরে পালানোর সব পথ রুদ্ধ। অঘোর সেই জাঁতাকলে আটকে-পড়া ব্রাহ্মণের দিকে একবার নির্মম নজরে চেয়ে, আগুন ছোঁয়াল বাক্সের ইন্ধনে। আগুন হু হু করে জ্বলে উঠল, কিন্তু এ কী!

আগুনের দীপ্তি একটি নয়, দুইখানি! কালীপদ দিয়াশলাই ঠুকে আগুন জ্বেলেচে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের বিগ্রহের জটায় বসানো ধুনার পাত্রে। দুইখানি আগুনই হু হু করে জ্বলে ওঠামাত্র কালীপদ বসে পড়ল বিগ্রহের পিছনে একেবারে অন্তরালে। অঘোর মন্দিরের সোপানে দাঁড়িয়ে প্রথমে এই পাগলামি দেখে হেসে উঠেছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই কী যেন মনে করে তার হাসি ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল! আমি বিস্মিত নয়নে হাঁ করে চেয়ে দেখলাম, ভগবান শংকরের তিনখানা রত্নময় চোখ ঝিকিয়ে জ্বলে উঠেচে! শুধু ভগবান শংকরই নন, তাঁর পদপ্রান্তে বসে-থাকা বৃষভের মুখেও তিনখানি চোখের মতো হিরার কুচি জ্বলে উঠেচে! অঘোর দৌড়ে পালাতে যাওয়ামাত্র একটা তীব্র সংঘাতে চারদিকটা যেন কেঁপে উঠল। মন্দির, সোপান সব একটা আঁধারের কালো স্রোতে ডুবে গেল চোখের সামনে, আর সেই আঁধারপিণ্ডের ভিতর থেকে কানে এল মরণাহত পশুর ন্যায় নরাধম অঘোরের আর্ত চিৎকার। সেই মরণাহত আর্তনাদ কিন্তু স্থায়ী হল না। কোনো এক অদৃশ্য রাক্ষস যেন নিজের শিকারের কণ্ঠরোধ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে।

কতটা সময় কেটেচে তার হিসাব নাই, কিন্তু একটা সময় পরে আগুন নিভে গেলে পর মন্দির আবার ধীরে ধীরে ফুটে উঠল চোখের সামনে। কালীপদ বাইরে এসে হাত ঘোরাতেই বিদ্যুৎ বাঁধন বাতাসে মিলিয়ে গেল। কালীপদ তড়িঘড়ি দৌড়ে এসে ভাঙা দূরবিনটা তুলে আপশোশ করে কইল, ‘‘একটা দারুণ আবিষ্কার নষ্ট হয়ে গেল ডাক্তার! ইশ্‌শ।’’

আমরা উপরের কক্ষে এসে বসেচি সকলে মিলে। অঘোরের শুষ্ক, কাঠ হয়ে-যাওয়া মৃতদেহটা কানাই তুলে দিয়েচে গোযানে। শ্রীদাম সেটাকে নিয়ে চলে গিয়েচে ভাগাড়ে পুঁতে ফেলতে। আমি কইলাম, ‘‘ওই দূরবিনটা কীসের দূরবিন ছিল দাদা?’’

কালীপদ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘রাক্ষস আবিষ্কার করার যন্ত্র কেবলমাত্র রাক্ষসের পালকে জন্ম দেয়, কিন্তু একমাত্র এই দূরবিনেই সেই রাক্ষুসে জীবদের চোখে দেখা যেত। এর ভিতরে এমন কয়েকখানা জিনিস বসানো রয়েচে, যার ফলে তা দিয়ে অতিপ্রাকৃত বহু এমন জিনিস বা ঘটনা চাক্ষুষ করা যায়, যা খালি চোখে অসম্ভব।’’

ঈশ্বর শুধাল, ‘‘কিন্তু এমন কী জিনিস বসানো ছিল ওতে?’’

কালীপদ উত্তর দিলে, ‘‘কুকুরের চোখ। হাঁ বাছা, কুকুরের চোখ। এ হল এমন এক আশ্চর্য বস্তু, যার মাধ্যমে কুকুররা এমন বহু সত্তা বা ঘটনা দেখতে পায়, যা আর কোনো প্রাণীই পায় না। তোমার বাবা ভাগাড়ে ঘুরে ঘুরে সদ্যোমৃত কুকুরদের শরীর থেকে ছুরি দিয়ে এই তিনজোড়া চোখ উপড়ে নিয়ে আসে এবং কিছু বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা দিয়ে ওই দূরবিনটা প্রস্তুত করে।’’

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে শুধালাম, ‘‘কিন্তু উনি ঠিক কী আবিষ্কার করেচিলেন?’’

‘‘বলচি। শুনতে বড়ো বিস্ময়কর লাগবে বটে। উনি বিদেশে থাকতে আলো আর বর্ণবিচ্ছুরণ নিয়ে গবেষণা করতে করতে দৈবাৎ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী একখানা আবিষ্কার করে ফেলেন। বৈদ্যুতিক বাতি আলো উৎপাদন করে। আলোর অভাবকেই

আমরা অন্ধকার বলি। কিন্তু উনি যান্ত্রিকভাবে অন্ধকার সৃষ্টির পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেন। সে যন্ত্র স্বল্প বিদ্যুতের ছোঁয়ায় প্রাণ পায়। উনি আগুনের মাধ্যমে সেই বিদ্যুৎ তৈরি করতেন। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের মাথার ধুনার পাত্রে আগুন দিলে সেই পাত্রের আকৃতির যন্ত্র উত্তপ্ত হয়ে মহাদেবের বিগ্রহের ভিতরে বসানো অন্ধকার তৈরির যন্ত্র জেগে ওঠে, এবং ভগবান শংকর আর তাঁর বাহনের ছয় চক্ষু থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে আলোর মতোই সরল পথে।

"ঈশ্বরের বাপ এই ভগবানের বিগ্রহের আসল চোখের স্থানে যান্ত্রিক হিরার চোখের আকৃতির পরকলা বসিয়ে দেন, ইংরেজিতে যাকে বলে লেন্স, ফলে মূর্তির চোখ তার সৌন্দর্য কিছুটা হারায়। ধ্যানস্থ যোগী মহাদেবের চক্ষু সবসময়ই অর্ধনিমীলিত শিবনেত্র হয়ে থাকে, কিন্তু এই বিগ্রহের চোখের চামড়াই নেই, পুরোটাই হিরার মণি। আমি সেইদিন চোখের চামড়ার কথা বলার পর তোমরা জিজ্ঞেস করেছিলে, 'কার চোখের চামড়া নাই?' আমি উত্তরে তোমার বাবার ছবিটা দেখিয়েছিলাম। উত্তরটা কিন্তু তখনও সঠিক ছিল। মহাদেব নন্দি। ভগবান মহাদেব এবং নীচে বসে-থাকা ষাঁড়রূপী নন্দি মহারাজের চোখে উনি নিজের আবিষ্কার বসিয়ে দেন। মহাদেবের চক্ষু আগে থেকেই রত্নগঠিত ছিল, ফলে তফাতটা দূর থেকে বোঝা যায়নি কারও নজরেই। ঈশ্বররা ভালো করে দেখলে হয়তো ধরতে পারত, কিন্তু তারা কখনোই নিজের হাতে পূজার্চনা করেনি, তাই খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ ঘটেনি। আমি দ্বার-খোলা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা পুরোনো আলোকচিত্রের মধ্যে জীবিত মানুষগুলোকে নয়, পিছনের বিগ্রহটাকেই দেখছিলাম। সেটার চোখের সঙ্গে এখনকার বিগ্রহের চোখের অনেক ফারাক।"

আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে কাঁপা গলায় আবার শুধালাম, "কিমাশ্চর্যম্! আঁধার তৈরি করারও যে যন্ত্র গড়া সম্ভব এমনটা কল্পনাও করিনি। এইজন্যই হয়তো উনি বলতেন, আমি অন্ধকারের জগতের চাবিকাঠি খুলে ফেলেচি। কিন্তু তার ফলে বাড়িঘর, লোকজন চোখের সামনে হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেইসব প্রাণী, লোকজন শুষ্ক হয়ে মারা পড়ত কেন?"

কালীপদ হাত দেখিয়ে কইল, "ধীরে ডাক্তার, ধীরে। সবটুকু ধরতে পেরেচি অনুমানে। আলো জিনিসটা যেমন একটা বিশেষ কণার স্রোতমাত্র, তেমনি এই কৃত্রিম আঁধারও একটা সর্বনাশা স্রোতেরই ফল। ওই যন্ত্র থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে সহস্র সহস্র, কোটি কোটি অণুজীব, যাদের খালি চোখে দেখা চলে না। বড়ো রাক্ষুসে জীব তারা। এ রহস্য আমি আমার সামান্য বিদ্যায় ধরতে পারতাম না। পেরেচি তোমার আর পীতজ্বরের কল্যাণে। সেইসব অলস দিনগুলিতে বসে বসে তোমার চিকিৎসার বইগুলি পড়তে পড়তে একদিন পড়ছিলাম অণুজীবের কেতাব। তুমি পড়াও ধরেচিলে আমাকে, মনে পড়ে?

"ওই যন্ত্র থেকে ছুটে-আসা এই ধরনের অণুজীবরা এমনই বুভুক্ষু ক্ষুধা নিয়ে আসে যে তারা তাদের চলার পথে সবটুকু আলোর কণাকে গিলে ফেলে। ফলে সবকিছু আঁধারে ঢেকে যায়। কিন্তু এটুকু হলে ক্ষতি ছিল না তত, অথচ এই রাক্ষসদের চরিত্রের ঠিকঠিকানা নাই। এরা সামনে কোনো জীবিত প্রাণী পেলে মুহূর্তে নিজেদের চরিত্রে বদল ঘটিয়ে আক্রমণ করে তার শরীরকে।"

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলাম, "চরিত্র বদল করে? মানে, ভাইরাস।"

"হাঁ ডাক্তার, তেমন নামই রয়েছে কেতাবে। এরা জীব আর জড়ের মাঝামাঝি একটা সত্তা। একমাত্র প্রাণীদেহের আশ্রয় পেলেই এরা যথার্থ প্রাণীর মতো আচরণ করে। জীবদেহে থাকা কোষের স্নেহপদার্থের একটা নকল চাদর গায়ে জড়িয়ে এরা শরীরকে বিভ্রান্ত করে দেয়। স্নেহপদার্থের আড়ালে এই আত্মগোপন এবং আক্রমণকেই ঈশ্বরের বাপ 'স্নেহের মুখোশ পরে ছোবল মারা' বলেচিলেন। তখন বুঝতে পারিনি। এই সবটুকু আক্রমণ এতটাই চোখের পলকে সাধিত হয় যে হতভাগ্য নিজেকে রক্ষার সময়টুকু অবধি পায় না। তাদের দেহের সবটুকু রস শুষে নিয়ে শুষ্ক কাঠের মতো দেহটা পড়ে থাকে শুধু।"

আমি একটা শ্বাস ফেলে কইলাম, "কিন্তু মেসোমশাই থাকতে তো একজন মানুষও মারা পড়েনি, ওঁর পরীক্ষাগারে কোনো প্রাণীও রাখতেন না, তবে উনি কার উপরে পরীক্ষা করে এই মারণশক্তির বীভৎসতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে এলেন?"

কালীপদ একটু চিন্তা করে বললে, "একটা সম্ভাবনাই রয়েচে। উনি মন্দিরের ভিতরে পশুবলি দিতেন শুনেচি ঈশ্বরের মুখেই। হয়তো সেই পশুদের উপরেই রুদ্ধ দ্বারে সেই শক্তির পরীক্ষা করেচিলেন।"

বর্তমান পাচকঠাকুর দুয়ার থেকে হাতজোড় করে কইল, "আমি এ বাড়ির বহুদিনের লোক ঠাকুর। আগে আগে মন্দিরে বলির পরে সেই বলিপ্রদত্ত মাংস প্রসাদ হিসেবে রেঁধে খাওয়া হত। আমিই আমিষ রান্না রাঁধি বরাবর। কিন্তু শেষের দিকে দুই-তিনবার বলি হবার পর কর্তাবাবু মাংস খেতে দেননি, বলির পশুগুলোকে আঁশঘরেও পাঠাননি। জিজ্ঞেস করাতে

বলেচিলেন, 'ওতে আর মাংস নাই বামুন ঠাকুর। সবটুকু মৃত্যুঞ্জয় খেয়ে ফেলেচেন।'..."

কালীপদ এ কথা শুনে বললে, "তবে আমার অনুমান মিথ্যা নয়।" তারপর ঐশিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "এদেরকেই তোমার দাদু মহাদেব নন্দি 'সর্বনাশা জানোয়ার' বলে আখ্যা দিয়েচিলেন। আর এরা ঠিক তোমারই মতো গুণধর, এটাও সত্যি। না না ডাক্তার, বাধা দিয়ো না। ও ছোটো হলেও বোধবুদ্ধি হয়েচে। ওর সবটুকু জানা উচিত। শোনো দাদুভাই, তোমার দাদু তোমাকে জানোয়ার বলেননি সেদিন, শুধু তাদের স্বরূপটা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েচিলো রাগের মাথায়।

"পুরাণে ঐশিক নামের একরকম বাণের কথা আছে। এই বাণের গুণ হল, একে যেমনভাবেই নিক্ষেপ করা হোক, এ ঠিক নিজের শত্রুকে ত্রিভুবন খুঁজে খুঁজে বধ করে। তুমি ছেলেদের রামায়ণ পড়েচো? একবার সীতার গলার কণ্ঠহার নিয়ে পালায় একটা কাক। রামচন্দ্র রেগে গিয়ে তার উদ্দেশে ঐশিক নিক্ষেপ করেন। সেই বাণ স্বর্গে পৌঁছে, ব্রাহ্মণের রূপ ধরে 'জয়ন্ত' নামের সেই কাককে খুঁজে বের করে এবং শাস্তিস্বরূপ তার একখানা চোখ নষ্ট করে রামচন্দ্রর তূণীরে ফিরে আসে।

"এই অণুজীবরাও সরল পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে বটে, কিন্তু জীবিত শিকারের সন্ধান পেলে তাকে খুঁজে খুঁজে নিধন করে। যেমন সেই রাতে তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে হেঁশেলে চলে এসেচিলো। উনিও তোমাকে নয়, তোমার নামটার জন্যই ও কথা বলেচিলেন। তোমার দাদু তোমাকে খুব ভালোবাসতেন দাদুভাই।"

ঐশিকের ফুঁপিয়ে কান্না প্রমাণ করল কালীপদর কথাই সত্য। সেই বালক সবটুকু কথা আত্মস্থ করতে পেরেচে। ঈশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতজোড় করে কইল, "আপনি যা অসাধ্য সাধন করলেন, তার জন্য গোটা তালুক আপনার কাছে বিক্রীত হয়ে রইল। কিন্তু ঠাকুর, বিগ্রহের ভিতরে যখন এই মারণযন্ত্র এখনও লুক্কায়িত রয়েচে, তবে এই বিগ্রহের বিসর্জন আবশ্যক।"

কালীপদ মাথা নেড়ে কইল, "তার দরকার নাই। গৃহদেবতাকে কোন অপরাধে ত্যাগ করবে বাছা? ওঁর মাথার ধুনার পাত্রটা লোক লাগিয়ে খুলে ফেলো, তাতেই আপদ যাবে।"

* * * * * * * *

আমরা ফেরার সময়ে ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে রয়েচি। বাখরাবাদ তালুকের অগুনতি প্রজা আমাদের বিদায় জানাতে এসেচে। হঠাৎ শ্রীদাম একখানা ধবধবে কামিজ ধুতি পরে এসে কালীপদকে কইল, "এসে গিয়েচি ঠাকুর।"

কালীপদ ঈশ্বরের উদ্দেশে কইল, "আরে হাঁ, ভুলে গিয়েচি বলতে, এই শ্রীদামকে আমি সঙ্গে নিয়ে চললুম। আমার তালুকের সরকারে একখানা কাজ দেব। আর তোমার খোকাবাবুকেও নিয়ে চললাম। কয়দিন পর কানাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

শিয়ালদহে নেমে কালীপদ কইল, "দাঁড়াও, একটা জিনিস কেনা বাকি রয়েচে।" আমরা কিছুক্ষণ পর নেবুতলায় পৌঁছে গেলাম। কালীপদ আমার গৃহের দোরের শিকলে নাড়া দিতেই বউঠান মুহূর্তে দোর খুলল। তার চকিত ভাব দেখে অনুমান করলাম, আমরা যাবার পর থেকেই অনুক্ষণ সে এই কাঙ্ক্ষিত শব্দের প্রতীক্ষা করেচে কান মেলে। ঐশিককে কোলে তুলে, চুমা খেয়ে বউঠান এইদিকে তাকিয়ে ভাঙা অথচ হাসি-মাখা গলায় কইল, "আমার নিত্য আরাধ্য ঠাকুরের একখানা বই আনতে বলেচিলাম, তা নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েচো?"

কালীপদ একখানা কাগজে মোড়া বই এগিয়ে দিল স্ত্রী-র দিকে। বউঠান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ভিতরে গেলে পর আমি ভ্রূ নাচিয়ে শুধালাম, "বই কখন কিনলে?"

"একটু আগেই। ইস্টিশানের বাজারে।"

"বউঠানের সেই ঠাকুরের বইটির নাম জানতে পারিনে কী? লেখক কে?"

কালীপদ বিষণ্ণ মুখে বললে, "দুঃখের কথা আর কী বলি ভায়া। লেখক আমারই মতো একজন সম্পন্ন জমিদার। শিলাইদহে তাঁর জমিদারি। অত্যন্ত সুদর্শন পুরুষ। উনিই মন্দাকিনীর আরাধ্য। তোমার বউঠান তাঁকে নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করে বসে রয়েচেন। আমারই কপালের ফের।"

আমি অবাক এবং বিপন্ন হয়ে কইলাম, "আচ্ছা আচ্ছা, সে যেন হল! বইটার নাম কী?"

একটু ফিক করে হেসে আমার চোখের দিকে চেয়ে কালীপদ কইল, "গীতাঞ্জলি"।

হেঁশেল থেকে বউঠানের গুনগুন কানে এল। সে আপামর বাঙালির নিত্য আরাধ্য ঠাকুরের লেখা গান গাইচে, "চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে/ অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে।"

আমরা গানের কথাগুলো শুনে পরস্পরের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম। কালীপদ ঠোঁটে তর্জনী রেখে হেসে কইল, "**শশশশ্**"।



ক্ষেপি মায়ের থান

অমিতাভ রায়

জায়গাটা খুবই সুন্দর। আর রিয়াকে নিয়ে আসার পর থেকে জায়গাটার সৌন্দর্য যেন আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। এসব কথা বললে লোকে হাসবে, সেটা জানে রাজ। কিন্তু, ওর এই অনুভূতি ও নিজের কাছ থেকে লুকোবে কী করে? এই যেমন, আজ অফিস থেকে ফেরার পরে রিয়া ওকে চা দিয়ে নীচের ছোট্ট বাগানটায় ঘুরছিল। বারান্দায় বসে চায়ের কাপে উঁকি দিয়ে দেখছিল রাজ। এই বাড়ি আর বাগান ছাড়িয়ে কিছুটা দূরেই জঙ্গল। সেইসব গাছপালা, শেষবেলার রাঙা আকাশ, উতলা হাওয়া আর রিয়া... সব মিলিয়েই যেন একটা মধুর ছবি।

রিয়ার সঙ্গে বিয়ের আগে নিজের জীবন নিয়ে তেমন কোনো স্বপ্নই ছিল না রাজের। হঠাৎ করেই চাকরিটা পেয়ে যাওয়া এই নির্জন অঞ্চলে। বাবা আর দাদা রাজি থাকলেও মা আর বউদির ইচ্ছে ছিল না রাজ এখানকার চাকরিটা নেয়। একসময় উগ্রপন্থী আন্দোলনে এইসব জায়গায় লোকজন আসতে ভয় পেত। এখন সেসব শুধুই স্মৃতি। বাবার এক বন্ধুর একটা বাংলো টাইপের বাড়ি এখানে আছে শুনে, কোনো কিছু না ভেবেই ও বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নেয়। যদিও এই বাড়িটা আরও নির্জন জায়গায়। বাড়িটা পেরিয়ে কিছুটা এগোলেই জঙ্গল আর টিলা। টিলার গা বেয়ে আবার একটা ঝরনাও অবিরাম বয়ে চলেছে। অফিসের কাজ সেরেই রাজ চলে যেত ওখানে।

তবে, এই বাড়ির দেখভাল যে করে, সেই শুকদেব অবশ্য বারণ করে এদিক-ওদিক যেতে। বলে হাতি বা ভালুক বেরিয়ে আসতে পারে। ভালুক তো বেরোতেই পারে। কেননা, মহুয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে গিয়েছে চারদিক। ভালুকের আর কী দোষ!

শুকদেব সপরিবারে একতলার একটা ছোট্ট ঘরে থাকে। ওর বউ সন্ধ্যামণি রান্না করে। আর সেই রান্নার কী স্বাদ! যেন অমৃত! শুকদেবের ছেলে অবশ্য শহরে চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছে। সেখানেই থাকে। এই স্থানীয় দম্পতিকে খুব ভালো লাগে রাজের। এখানকার মানুষ অবশ্য খুবই সরল। ওদের দেখাদেখি রাজ কয়েকবার মহুয়া খেয়েও দেখেছে, বেশ নেশা হয়। এই বাড়িটা গ্রামের একেবারে প্রান্তে। গ্রামের মাঝখান দিয়েই রাজকে অফিসে যেতে হয়। অনেকের সঙ্গেই ওর আলাপ হয়ে গিয়েছে।

রাজ চাকরি পেতেই মা ওর বিয়ে বিয়ে করে প্রায় খেপে গিয়েছিল। ছোটোছেলে একা এই নির্জন জায়গায় থাকবে—এটা মায়ের সহ্য হচ্ছিল না। মায়ের কথায় রাজি না হয়ে রাজের উপায় ছিল না। বউদিরই এক দূর সম্পর্কের বোনের সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক হল। রিয়ার গায়ের রং একটু চাপা। কিন্তু খুব মিষ্টি দেখতে। প্রথম দেখাতেই রাজের বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল রিয়াকে। বিয়ের পর এখানে এসে প্রতিনিয়ত রিয়াকে কাছে পেয়ে কীরকম নেশার মতো যেন ওর দিনরাতগুলো কেটে যাচ্ছে।

সত্যি সত্যিই যে এখানে এসে ভালুক দেখতে পাবে তা ভাবেনি রাজ। রবিবার রিয়াকে নিয়ে ঝরনা ছাড়িয়ে আর-একটু গিয়েছিল ও। প্রকৃতিও ছিল খুব মনোরম। মহুয়ার গন্ধে মাতানো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রিয়ার হাত ধরে হাঁটতে ওর খুব ভালো লাগছিল। কখনও প্রজাপতি, কখনও পাখির ডাক, আবার কখনও বুনো ফুল দেখে ওর উচ্ছ্বাস।

এরই মধ্যে এক জায়গায় রিয়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর পেছনে ফিরে রাজকে ভয়ে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, "ওটা কী?" রিয়ার মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। রিয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে রাজ দ্যাখে, সত্যিই কিছু একটা। আর-একটু ভালো করে তাকাতেই অবশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। একটা ভালুক বোধহয় মহুয়ার সন্ধানে চলে এসেছিল। রিয়ার আর্তনাদ শুনেই হোক, বা অন্য কোনো কারণেই হোক, ভালুকটা অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন জঙ্গলের মধ্যে।

রাজের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রয়েছে রিয়া। ভয়ে কাঁপছে। রাজ রিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিসফিস করে বলে, "ওটা ভালুক। চলে গিয়েছে। এখন নেই।" একটু থেমে বলে, "আর তা ছাড়া, আমি তো আছি। তোমার কোনো ভয় নেই।" এই কথাটা বলে ওর যে কী ভালো লেগেছিল! একঝাঁক পাখি যেন সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠেছিল বুকের ভেতর। রাজের কথা শুনে রিয়া মুখ তুলে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তখনও সেই মুখে ভয়ের ছাপ লেগে রয়েছে। আত্মহারা হয়ে সেইদিন রিয়ার মুখ চুম্বনে ভরিয়ে দিল রাজ।

দিব্যি কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু, এর মধ্যেই হঠাৎ একটা ব্যাপার লক্ষ করে রাজ। বিকেলের আলো নিভে যাওয়ার আগে ও না ফিরলে রিয়া কীরকম একটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। এর কারণ বুঝতে পারে না রাজ। অবশ্য রিয়া শহুরে মেয়ে। এমন নিকষকালো অন্ধকারকে ও ভয় পেতেই পারে। বিশেষ করে এরকম নির্জন জায়গায়।

ভালুক দেখার পরে বেশ কয়েকদিন ওরা জঙ্গলের দিকে যায়নি। দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়ল ওরা ঝরনার ধারে। অনেকক্ষণ বসে গল্প করল। তারপর, যেখানে ভালুকটা দেখেছিল, সেখানে একবার যাওয়ার কৌতূহল হল রাজের। ওরা দুজনে হাত ধরে এগিয়ে গেল। না, আজ আর কিছু নেই। আর-একটু ভেতরে ঢুকতেই বেলা পড়ে এল। সন্ধের আগে ফিরতে হবে। তাই ওরা ফেরার পথ ধরল। কী আশ্চর্য! চেনা রাস্তাটা হঠাৎই যেন অচেনা হয়ে গিয়েছে। সেই ঝরনার কাছে আর ফিরতেই পারছে না ওরা। ক্রমশ যেন অজানা কোনো এক জায়গায় চলে যাচ্ছে ওরা। বিভ্রান্ত রাজের মনে হল, ওরা হয়তো একই জায়গায় ঘুরেই চলেছে। তার সঙ্গে এ-ও মনে হল, কোনো একটা বুনো হিংস্র জন্তু যেন অলক্ষে থেকে অনেকক্ষণ ধরে ওদের লক্ষ করে চলেছে।

হঠাৎই সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল ওরা। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে, সামনের পাথরের ঢিপিটার ওপরে বসে আছে একটি মেয়ে। তার কোলে একটি বাচ্চা। ওদের দিকে মেয়েটার খেয়ালই নেই। বাচ্চাটাকে আদর করছে, আর বাচ্চাটা খিলখিল করে হাসছে। এই নির্জন বনাঞ্চলে এরকম একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না ওরা দুজনে। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

মেয়েটা বাচ্চাটাকে আদর করতে করতেই সামনের দিকে তাকাল। ওদের দেখে একটা স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল মেয়েটার মুখে। হাত তুলে এমনভাবে দেখাল, যেন ও জানে, ওরা কোনদিকে যাবে। নিঃশব্দে রিয়াকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল রাজ। একবার পেছন ফিরে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে সবকিছু। কিছুটা এগোতেই ওরা

জঙ্গল, একটা নদী বয়ে চলেছে। রাজ বুঝতে পারল এটা সুবর্ণরেখা। গ্রামের অন্য প্রান্তে চলে এসেছে ওরা।

এদিকে সচরাচর কেউই আসে না। শুকদেবও ওকে এদিকে আসতে বারণ করেছিল। এখানে একমাত্র মৃতদেহ দাহ করতেই গ্রামের লোকে আসে। সামনেই একটা শ্মশান। তার থেকে কিছুটা দূরে একটা ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে পরিত্যক্ত। আকাশে ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে। একটু এগোতেই দূরে গ্রামের আলো দেখা গেল। রিয়ার হাত শক্ত করে চেপে ধরে সেইদিকে এগিয়ে গেল রাজ।

শুকদেব আর সন্ধ্যামণি ওদের দেরি দেখে খুঁজতে বেরিয়েছিল। ওদের সঙ্গে পথেই দেখা হয়ে গেল। সব শুনে সন্ধ্যামণি দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকায়। অস্ফুট স্বরে বলে, ''খেপি মা রক্ষা করেছেন!''

বিস্মিত রাজ জিজ্ঞেস করে, ''খেপি মা কে?''

শুকদেবের মুখে জানা গেল, ওখানে খেপি মায়ের থান আছে। রাতে ওদিকে কেউ যায় না। রাজ এতদিন জানত, কটোয়ার মা কালীকে খেপি মা বলা হয়। তাই জিজ্ঞেস করল, ''উনি কি মা কালী?''

শুকদেব মাথা নাড়িয়ে না বলে। রাজ ঠিক করে, পরের দিন সকালে অফিসে যাওয়ার আগে একবার ওখানে যাবে। পরের দিন জঙ্গলে ঢুকে কালকের জায়গাটা চেনার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই জায়গাটা খুঁজে পেল ও। যে শিমুল গাছের তলায় বউটা বসেছিল, সেখানে একটা বড়ো পাথর। এর ওপরেই তো মেয়েটা বসেছিল! সেই কালো পাথরটায় কেউ সিঁদুর মাখিয়ে রেখেছে। ফুল আর বেলপাতাও রয়েছে। তার মানে এর মধ্যেই কোনো ভক্ত এসে পুজো দিয়েছে। চারদিকে একটু ঘুরে দেখল রাজ। কিন্তু উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখতে পেল না। ফেরার পথে দেখল, শ্মশানে একটা মৃতদেহ এসেছে। ওকে দেখে লোকগুলো বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সুবর্ণরেখার ধার দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল রাজের। তিরতির করে জল বয়ে যাচ্ছে। জল কম। চারদিক কালো কালো পাথরে ভরতি। এই নদীটাই বেশ কিছুটা এগিয়ে যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটা টুরিস্ট লজ হয়েছে। ওদিকে হাট বসে। রাজ ভাবে, এই রবিবারে রিয়াকে নিয়ে ওখানে যাবে।

এরকম হাট আগে কখনও দেখেনি ওরা। স্থানীয় মানুষের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বেশ কৌতূহলের সঙ্গেই দেখছিল রিয়া। সেখানেই দেখা হয়ে গেল রাজের অফিস কলিগ কিংশুকের সঙ্গে। কিংশুক ওর বউয়ের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিল। ওর বউয়ের নাম ঝুমুর। মেয়েটা খুব মিশুকে। রিয়ার সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিল। একটা চায়ের দোকানে বসে ওরা চা আর তেলেভাজা খেল। কথায় কথায় খেপি মা-র কথা এল। কিংশুক বলে, ''এ নিয়ে একটা গল্প আছে। একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে বলব।''

ওরা যে অদ্ভুত দৃশ্যের সম্মুখীন হয়েছিল, সেটা শুনে ঝুমুরের চোখ প্রায় বিস্ফারিত। বলে,''বউদি, একদিন সকাল সকাল গিয়ে পুজো দিয়ে আসব। খেপি মা তোমাদের পথ দেখিয়েছেন।'' ঠিক হল, সামনের শুক্রবার দোলের দিন বিকেলে এসে ওরা আড্ডা দেবে, আর তারপরে কোনো একদিন সকালে যাবে খেপি মায়ের থানে।

দোলের দিন সকালে রিয়া ঠাকুরকে রং দিয়ে রাজের মুখ আবিরে ভরিয়ে দেয়। রাজও মুঠো মুঠো আবিরে রঙিন করে দেয় রিয়াকে। বিকেলেই চলে আসে কিংশুক। সন্ধ্যামণির রান্নার গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। ওরা বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে গল্প করে। সন্ধে হয়ে গেলে মহুয়া নিয়ে বসে রাজ আর কিংশুক। পকোড়া নিয়ে আসে রিয়া।

রিয়া বলে, ''এবারে খেপি মায়ের কথা শুনি।'' কিংশুক বলতে শুরু করে। বলে, ''এটা বাস্তব ঘটনা না গল্প তা বলা মুশকিল। তবে স্থানীয় মানুষ এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করে। বাইরের কাউকেই অবশ্য বলতে চায় না। আমি আমাদের অফিসের দারোয়ান বাবুলালের কাছ থেকে শুনেছি।''

কিংশুক খেপি মায়ের কাহিনি বলতে শুরু করে। ''অনেকদিন আগের কথা। এই গ্রামে তখন লোকসংখ্যা ছিল খুব কম। সে সময় এই গ্রামে যে মোড়ল ছিল, তার ছেলেটা ছিল চরিত্রহীন লম্পট। মোড়ল কিন্তু তাকে কোনোদিন শাসন করেনি। সে সময় এই গ্রামে অন্য এক গ্রাম থেকে এক দম্পতি আর তাদের একমাত্র মেয়ে এখানে এসে থাকতে শুরু করে। কেন এ গ্রামে এসেছে ওরা, তা অবশ্য কেউ জানত না। তবে, মেয়েটা ছিল পাগলি। হয়তো সেজন্যই নিজেদের গ্রামে তিষ্ঠোতে পারেনি। শ্মশানের পাশে ওদের বাড়ি ছিল।

''মেয়েটা দেখতে কিন্তু খারাপ ছিল না। গ্রামের লোকে ওকে খেপি বলে ডাকত। সেই পাগলিও রেহাই পেল না মোড়লের ছেলের হাত থেকে। ওর বাবা-মা মোড়লকে অভিযোগ জানিয়েও কোনো বিচার পেল না। খেপির একটা মেয়ে হল। গ্রামে এবার কিন্তু হইচই শুরু হয়ে গেল। মেয়েটা যে মোড়লের ছেলের তা নিয়ে গ্রামের লোকের কোনো সন্দেহই ছিল না। বাচ্চাটাকে নিয়ে মেয়েটা প্রায়ই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বসে থাকত।

"গ্রামের লোকের এই কানাকানি মোড়লের ছেলের বোধহয় সহ্য হয়নি। একদিন ওই বাচ্চাটাকে আর পাওয়া গেল না। খেপি পাগলের মতো হাহাকার করে গ্রামের চারদিকে ঘুরতে লাগল। একদিন দেখা গেল, মোড়লের বাড়ির সামনেই বসে রয়েছে সারাদিন। তারপর খেপির মৃতদেহ পাওয়া গেল সুবর্ণরেখার পাড়ে। খেপির বাবা-মা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।"

কিংশুক চুপ করতেই বিস্মিত রিয়া বলে ওঠে, "এখানেই গল্প শেষ!"

কিংশুক একটা পকোড়ায় কামড় দিয়ে বলল, "না না, বলছি।" পকোড়াটা খেয়ে মহুয়ার গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে, "বেশ কিছুদিন চলে গেল। মোড়ল মারা গেছে। ছেলেটাই মোড়ল হয়েছিল। একবার ও বন্ধুদের নিয়ে শিকারে গিয়েছিল। বন্ধুরা ফিরে এলেও ছেলেটা আর ফিরে এল না। শোনা গেল অলৌকিক এক ঘটনার কথা। ওরা কিছু খরগোশ আর পাখি শিকার করেছিল। ওরা ফিরছিল যখন, তখন রাত অনেক। যদিও পূর্ণিমার রাত বলে সবই দেখা যাচ্ছিল। ওদের ফিরতে অসুবিধে হচ্ছিল না। কয়েকটা মশালও ছিল। প্রত্যেকেই তখন মাতাল। ক্লান্ত হয়ে ওরা মেয়েটা যেখানে বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রায়ই বসে থাকত, ঠিক সেই জায়গাটায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় একটা ভালুককে দেখতে পেল ওরা। ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ভালুকটাকেও আজ শিকার করব।" ভালুকটা দেখা দিয়েই জঙ্গলের আড়ালে সরে গিয়েছিল। ছেলেটা সেদিকে ছুটে যায়। ওরা ক্লান্ত শরীরে পেছনে পেছনে যায়। ছেলেটাকে কিন্তু ওরা আর দেখতে পাচ্ছিল না।

"হঠাৎ ওর আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। ওরা সেদিকে ছুটে গিয়ে নির্বাক হয়ে দ্যাখে ভালুক কোথায়! একটি মেয়ে ছেলেটার মাথার চুল ধরে তার গলায় খাঁড়ার কোপ বসাচ্ছে। ছেলেটা পড়ে গেল। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে মেয়েটা চলে গেল। ওরা সবিস্ময়ে দেখল মেয়েটা আর কেউ নয়—সেই খেপি! ওদের মধ্যে দুজন অজ্ঞান হয়ে গেল। বাকি কয়েকজন ফিরে এসে খবর দিল।

"গ্রামের লোক জঙ্গলে গিয়ে সেই মৃতদেহ দেখল। আশপাশের গ্রামেও খবরটা ছড়িয়ে গেল। যে পাথরের ওপর খেপি বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে থাকত, সেটা তারপর থেকে খেপি মায়ের থান হিসেবে পরিচিত হল। বিপদে পড়লে লোকজন সেখানে পুজো দিয়ে মানত করে। ফলও নাকি পায়। কেউ জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেলে খেপি মা তাকে পথও নাকি দেখিয়ে দেন। বিশেষ করে যদি ওই জঙ্গলে পথ হারিয়ে ভালুকের মুখে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কেউ কেউ রাতে খেপি মাকে ওখানে নাকি দেখেওছে। অবশ্য খুব কম লোকই রাতে ওখানে যাওয়ার সাহস পায়।"

কিংশুকের বলা শেষ হতেই দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকায় রিয়া। কিছুক্ষণ সবাই নীরব। তারপর কিংশুক ফের বলে, "নিশ্চয়ই তোমাদের কপালে সেদিন বড়ো ফাঁড়া ছিল, জঙ্গলে হিংস্র জন্তু তো কম নেই, সঙ্গে ভালুকের ভয়ও আছে। আর কিছুক্ষণ ওই জঙ্গলে ঘুরলে নিশ্চয়ই কিছু একটা ভয়ংকর বিপদে পড়তে। সেজন্যই খেপি মা নিজে এসে তোমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন।"

রিয়া, রাজ দুজনেই ভক্তি ভরে প্রণাম করল। ওদের দুজনের গায়েই কাঁটা দিচ্ছে। দুজনের চোখেই এই মুহূর্তে ভেসে উঠছে একটাই দৃশ্য...

একটা ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে আছে খেপি মা সেই কালো পাথরের ওপর। আর ওদের দেখে হাসতে হাসতে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে!

হয়তো খেপি মা আদৌ কোনো ঈশ্বরী নন, কেবলই এক অতৃপ্ত প্রেত, যে মৃত্যুর পরেও ওই জঙ্গলেই আটকে রয়ে গিয়েছে...

তবুও মানুষের বিপদে যিনি পথ দেখান, তিনিই তো আসল ঈশ্বর, তা-ই না?



জানতে চেও না

পিয়াস গড়গড়ি



(১)

অন্ধকার ঘর, জানালা দিয়ে সামান্য আলো ঘরের ভেতর এসে পড়েছে। আজ পূর্ণিমা, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে যাচ্ছে আকাশে—মাঝে মাঝে আড়াল করে দিচ্ছে চাঁদকে। ঘরের মাঝে আবছা আলো-আঁধারিতে চোখ বেশি দূর চলে না, তবু যেন মনে হয়, ঘরের মধ্যে ছায়া-ছায়া কারা যেন সব জড়ো হয়েছে। তাদের দেখা যায়, আবার দেখা যায় না—এই আছে, এই নেই। কারা এরা? চুপ, জানতে চেয়ো না...

কেউ কি কথা বলছে? হাওয়ায় কান পাতলে একটা ফিসফিস-কানাকানির শব্দ শোনা যায়—

"সবাই এসেছে?"

"হ্যাঁ, সর্বাধিনায়ক।"

"ভালো, ভালো। আমাদের নতুন বন্ধুর কী খবর?"

"খবর ভালো নয়, মহান সর্বাধিনায়ক। আমাদের সংঘের চারজন সদস্যকে আমরা হারিয়েছি তার কারণে—চারজন অত্যন্ত শক্তিশালী সদস্য।"

"তা-ই? আর আমরা কী পদক্ষেপ নিয়েছি?"

খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর আবার ফিসফিস শোনা গেল—

"ছি ছি, আমাদের প্রাচীন সংঘের শক্তিশালী বীরেরা পরাজিত হয়েছে এক সাধারণ মানুষের কাছে? লজ্জা, আমাদের লজ্জা—আমরা তা-ও কিছু করিনি।"

"আসলে মানুষটা আমাদের সম্পর্কে জানে, বোঝে আর চর্চাও করে। চায়, যাতে আমাদের পরিচয় সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়—আমাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়।"

"তা সত্ত্বেও কি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব?"

একটা তীব্র শ্লেষের সুর ভেসে আসে। অন্ধকারে ফিসফিস-কানাকানির স্বর তীব্রতর হয়।

"না না, কখনোই না।"

বাতাসে আবার ভেসে আসে—

"আমাদের নতুন বন্ধুর সমাদর করবার সময় চলে এসেছে। আমাদের মধ্যে থেকে এক দল গঠন করা হবে, যাদের কাজ হবে নতুন বন্ধুকে বরণ করে নেওয়া আমাদের দলে।"

"আপনি থাকলে ভালো হত না, হে মহান সর্বাধিনায়ক?"

বাতাসে একটা খিলখিল শব্দ ভেসে আসে, গায়ে শিরশির কাঁপন-ধরানো ফিসফিসে হাসি—

"দেখা যাক।"

চাঁদ ভয়ে চুপ করে থাকে।

(২)

সম্মেলনে বক্তব্য রাখা প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ, পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা আধ ঘণ্টার বক্তব্যের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ পড়াশোনা করতে হয়। শ্রোতাদের কাছ থেকে উড়ে-আসা প্রশ্নবাণের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়—না হলে নিজের সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের যুগে যে বিষয় নিয়ে অচিন্ত্যবাবু গবেষণা করেন, বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান—বিস্তর পড়াশোনা না থাকলে তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক বোদ্ধাদের কাছে পদে পদে অপদস্থ হতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে এমনটা কখনও ঘটেনি, বরং তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তির বাণে উড়ে গেছেন বড়ো বড়ো বিজ্ঞানবোদ্ধা। হ্যাঁ, অনুমান সঠিক, অচিন্ত্যবাবুর গবেষণার বিষয়—প্যারানর্মাল বা অতিপ্রাকৃত, বিশেষভাবে ভ্যাম্পায়ার বা পিশাচদের নিয়ে। তাঁর নিজের গবেষণাগারে তিনি একা হাতে কার্যত প্রমাণ করে দিয়েছেন ভ্যাম্পায়ারদের উপস্থিতি, কার্যকারিতা, খাদ্যাভ্যাস—উলঙ্গ করে দিয়েছেন অন্ধকারে লুকিয়ে-থাকা পাশবিক এক সত্ত্বাকে। বিদ্রুপ কম জোটেনি কপালে তার জন্য, 'ভীমরতি', 'পাগলা সায়েন্টিস্ট'—সমস্ত অপবাদ গালাগাল নীরবে নিভৃতে সহ্য করে গেছেন। আর আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর নিরলস পরিশ্রমের ফলে স্বীকৃতি জুটেছে—মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে পিশাচদের উপস্থিতি, সতর্ক হয়েছে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে। দেশ-বিদেশ থেকে ডাক আসছে, প্রফেসর অচিন্ত্য রায় প্যারানর্মাল রিসার্চে এখন এক উল্লেখযোগ্য নাম।

তেমনি একটা কনফারেন্সে বক্তব্য শেষ করে পোডিয়ামে বসে শ্রোতাদের প্রশ্নের অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সাধারণত যা প্রত্যাশা করেছিলেন, সেই প্রশ্নই আসছিল বেশির ভাগ—বিজ্ঞান মানলে কীভাবে ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব মানা উচিত? তিনি তাঁর মানসিক সুস্থতা পরীক্ষা করিয়েছেন কি না এইসব। আর তার মাঝে মাঝে ভ্যাম্পায়াররা কী খায়, কোথায় থাকে, কীভাবে চেনা যায়—এসব ছুটকোছাটকা প্রশ্ন। যন্ত্রের মতন উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন শুনে ঘুরে তাকালেন অচিন্ত্যবাবু।

"প্রফেসর, আপনি যতদূর জানি একা থাকেন, ভয় করে না?"

প্রশ্নকর্তা এক কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক, শীর্ণদেহ; কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। চোখে-মুখে এক অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ভাব।

"কেন বলুন তো?"

"না, আপনি ওদের নিয়ে সভা করছেন, ওদেরকে দুনিয়ার সামনে নাঙ্গা করে দিচ্ছেন—ওরা প্রতিশোধ নেবে না?"

এবার উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন অচিন্ত্যবাবু, "সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু সফল হয়নি কোনোবারেই। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, আমি যত কিছু গবেষণা আমার বাড়িতেই করি। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পিশাচের উপস্থিতি অনুমান করার, তাকে ধ্বংস করবার উপকরণ মজুত থাকে; কিন্তু নিরাপত্তাজনিত বিশেষ কারণে আপনাকে আমি সব ক-টা এই মুহূর্তেই বলতে পারছি না। কারণ, আপনি নিশ্চয় জানেন, পিশাচ রূপ পরিবর্তনে পারদর্শী। পিশাচ কেউ হয়তো এই ঘরেই আছে, আমাদের সব কথা শুনছে।"

হলে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। অচিন্ত্যবাবু বলে চললেন, "কাজেই সে যদি কারও রূপে এখানে আমার প্রতিরক্ষাব্যবস্থার আগাম খবর জেনে নিতে পারে, তাহলে

ফের আগে প্রাণসংশয় হবে আমার। আর সে কারণেই আমি আপনার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে অপারগ, আশা করি, আপনি বুঝবেন।"

প্রশ্নকর্তা বসে পড়লেন, কী যেন একটা বলতে গিয়েও বললেন না, কারণ ততক্ষণে অন্যদিক থেকে একজন যুক্তিজাল বিস্তার করতে শুরু করেছেন। অচিন্ত্যবাবুর কেমন একটু অস্বস্তি হতে লাগল।

কনফারেন্স শেষ করে গাড়িতে উঠেও অস্বস্তিটা গেল না। সারাক্ষণ কে যেন একটা নজর রেখে চলেছে, তাকে দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কেউ আছে। অচিন্ত্যবাবুর ষষ্ঠেন্দ্রিয় টিকটিক করে জানান দেয়, কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

সতর্ক ছিলেন বলেই দুর্ঘটনাটা এড়ানো গেল। গাড়ি ফুল স্পিডে চলছিল, ভেতরে হালকা ভলিউমে রবীন্দ্রসংগীত, সামনে ফাঁকা রাস্তা—জ্যোৎস্নার আলোয় সবকিছু মায়াবী লাগছিল। কিন্তু ডানদিকে অন্ধকারে কিছু একটা হচ্ছে না? গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিলেন অচিন্ত্যবাবু, আর সেটাই রক্ষা। কারণ সেই অন্ধকার থেকে তিরবেগে গাড়ির বনেটের ওপরে পড়ল একটা দেহ, পড়েই ছিটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষলেন অচিন্ত্যবাবু—গাড়িটা তীব্র আর্তনাদ করে থেমে গেল।

চারদিকে শুনশান, কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। এমন অবস্থায় এই ফাঁকা জায়গায় গাড়ি থামানোটা উচিত হয়নি—অচিন্ত্যবাবুর ভেতর থেকে কে যেন বারবার বারণ করতে লাগল, "নেমো না, নামলেই বিপদ।" কিন্তু সামনে যে মানুষটা এসে পড়ল, সে বেঁচে আছে কি না না দেখেই চলে যাবেন—এতখানি অমানুষ তিনি নন। অনেকক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর শেষে মনুষ্যত্বেরই জয় হল। অচিন্ত্যবাবু গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

হেডলাইটের আলোয় সামনের রাস্তাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ধুলোবালি, রক্তের মধ্যে পড়ে আছে একটা দেহ। কাছে গিয়ে চমকে উঠলেন অচিন্ত্যবাবু। একটা মেয়ে! অল্প অল্প নড়ছে তখনও।

গাড়ি থেকে জলের বোতলটা বের করে নিয়ে এলেন। কাছে গিয়ে মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতেই মেয়েটা চোখ মেলে তাকাল।

অচিন্ত্যবাবু নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "উঠতে পারবে?"

মেয়েটা ওঠার চেষ্টা করতেই মুখ দিয়ে যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ বেরিয়ে এল। অচিন্ত্যবাবু মেয়েটাকে ধরে ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু মেয়েটা বারবার টলে টলে পড়ে যেতে লাগল। অচিন্ত্যবাবুর একটু অস্বস্তি যে হচ্ছিল না, তা নয়; কিন্তু তাঁর তো একটা দায়িত্ব আছে, তাঁরই গাড়ির সামনে তো মেয়েটা এসে পড়েছিল। তিনি কীভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন?

ধরে ধরে কোনোমতে মেয়েটাকে গাড়ির সিটের ওপর বসালেন অচিন্ত্যবাবু, জলের বোতলটা খুলে মুখের সামনে ধরলেন। মেয়েটা একনিশ্বাসে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। আর তখনই অচিন্ত্যবাবুর চোখে পড়ল, এত কিছু সত্ত্বেও মেয়েটা বুকের কাছে কী একটা জড়িয়ে রেখেছে পুঁটুলির মতন। সেটা আবার থেকে থেকে নড়ছে। বাচ্চা? এই মেয়েটা বাচ্চা নিয়ে এত রাতে এই শুনশান জায়গায় কী করছে?

মেয়েটার জল খাওয়া শেষ হল। অচিন্ত্যবাবু মনের মধ্যে জমে-ওঠা প্রশ্নগুলো করতে গিয়েও থেমে গেলেন, কারণ মেয়েটার মুখের অভিব্যক্তি তখন পালটে গিয়েছে। সেখানে কেবল নিঃসীম ত্রাস, চোখে ফুটে উঠেছে নির্ভেজাল ভয়। একরাশ আতঙ্ক নিয়ে মেয়েটা তাকিয়ে আছে অচিন্ত্যবাবুর পেছনে।

মেয়েটার দৃষ্টি লক্ষ্য করে পেছন ঘুরলেন অচিন্ত্যবাবু। কোথাও কেউ নেই, শুনশান চারিদিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ষষ্ঠেন্দ্রিয় বারংবার বিপদের সংকেত দিতে লাগল। একটু দূরে অন্ধকারের তালটা নড়াচড়া করছে। মেয়েটা ওইদিকেই তাকিয়ে আছে। কী আছে ওখানটায়?

অচিন্ত্যবাবু সেদিকে এগিয়ে যেতেই মেয়েটা হাত জড়িয়ে ধরল—"ওখানে যেো না বাবুজি।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"ওখানে ডর আছে, বাবুজি, বহুত কোশিশকে বাদ বাচ্চিকো লেকে ভাগ আয়া।"

"কী?"

(৩)

ভাঙা-ভাঙা দোআঁশলা বাংলা-হিন্দি মেশানো ভাষায় মেয়েটা যা বলল, সেটা হল—

মেয়েটা লোকের বাড়িতে কাজ করে। বাবুদের বাড়িতে আজ বাচ্চা হয়েছিল, কাজ সারতে সারতে রাত হয়ে

গিয়েছিল। রাত্রে এই রাস্তায় ডর বাতাস ঘোরাফেরা করে, তাই এই জায়গায় কেউ আসে না। মেয়েটা তা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে সেই রাস্তায় পা দিয়েছিল, কারণ বড়োরাস্তা দিয়ে ঘুরে গেলে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে, বাড়িতে তার মরদ আর বাচ্চা না খেয়ে বসে থাকবে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ টের পেল পেছনে একটা শনশন শনশন আওয়াজ, আর তারপরেই কারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোলের বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল বারবার, কিন্তু মায়ের শক্তি অসীম। বারংবার আঁচড় সত্ত্বেও কোলেরটাকে শক্ত করে ধরে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে ছুটছিল—খেয়াল করেনি সামনে থেকে এগিয়ে-আসা গাড়ি।

এটুকু বলেই মেয়েটা হাঁপাতে লাগল। অচিন্ত্যবাবু দেখলেন, মেয়েটা নেতিয়ে পড়ছে। গাড়ির ভেতর থেকে রিভলভারটা বার করে অন্ধকারটার দিকে এগোলেন অচিন্ত্যবাবু। মেয়েটা আবার হাত জড়িয়ে ধরল—বারংবার মিনতি করতে লাগল না-যাওয়ার।

অচিন্ত্যবাবু মেয়েটাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ভয় পেয়ো না। এই গাড়ির মধ্যে সে তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না, কারণ গাড়ির ভেতর বিভিন্ন জায়গায় আমি রসুন ভরে রেখেছি আর ওরা রসুনের গন্ধে দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। আমি একটু এগিয়ে বরং শয়তানগুলোর হেস্তনেস্ত করে আসি, নইলে ওরা পিছু নেওয়া ছাড়বে না।"

মেয়েটা তা-ও শোনে না। গাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়...

হাতে রিভলভারটা শক্ত করে ধরে এগিয়ে গেলেন অচিন্ত্যবাবু। এগোতেই নাকে একটা বোটকা গন্ধ ঝাপটা মারল। অনেকদিন ঘর না খুললে যেরকম একটা বাসি বোটকা গন্ধ পাওয়া যায়, অনেকটা সেইরকম। সমস্ত ইন্দ্রিয় মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল।

আরেকটু এগোতেই পিশাচগুলোকে দেখতে পেলেন অচিন্ত্যবাবু। একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওগুলো। ওদের মধ্যে একজনকে একঝলক দেখেই অচিন্ত্যবাবুর মনে হল, ঠিক এই মূর্তি তিনি আগেও দেখেছেন। কোথায় দেখেছেন, ঠিক মনে পড়ছে না।

পিশাচগুলো গাছের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওদের গাঢ় লাল চোখ আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে-আসা ঝকঝকে শ্বদন্ত—সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন অচিন্ত্যবাবু। আর যেটা একজনের ক্ষেত্রে লক্ষ করলেন, সেটা হল অস্বাভাবিক পাণ্ডুর কৃশকায় চেহারা। ঠিক এই চেহারা তিনি আজকেই দেখেছেন, কোথায় দেখেছেন? কোথায়?

ঠিক তখনই পিশাচটা মানুষের গলায় বলে উঠল, "এবার ভয় করছে, প্রফেসর?"

মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, এ-ই তো আজকে প্রশ্ন করেছিল ওঁর বাড়ি নিয়ে, ওঁর সুরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। তাহলে এই ব্যাপার? এটা একটা ফাঁদ? বাড়িতে সুবিধে হবে না বলে রাস্তায় টেনে নিয়ে মারতে চায় এরা? ঠিক আছে, এরা জানে না প্রফেসর অচিন্ত্য রায় কী জিনিস।

মুচকি হেসে অচিন্ত্যবাবু রিভলভারের সেফটি ক্যাচ সরালেন, পিশাচটার চোখে চোখ রেখে বললেন, "না, ভয় করছে না।"

বাকি পিশাচগুলো গরগর করে উঠল। ওদেরকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে প্রথমজন বলে উঠল, "আপনি আমাদের হাতে কোনো উপায় রাখলেন না। এখনও বলছি, ভালো চান তো সরে দাঁড়ান।"

"আগের বারও তোদের চারটেকে যমের দুয়োরে পাঠিয়েছি, এবার তোদের পালা।"

"প্রফেসর, আপনি বড্ড বোকা। আপনি তো জানেন, ওই বন্দুক-পিস্তলে আমাদের কিচ্ছু হয় না। একটু আওয়াজ হয়, দু-চারটে মানুষ মরে ওতে; কিন্তু আমাদের পিশাচদের ওতে কিচ্ছু হয় না। ও দিয়ে আপনি আমাদের ঠেকাবেন?"

একটা রিনরিনে হাসি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পিশাচগুলো হাসছে, সেই হাসি মেরুদণ্ডের ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দেয়। দেখাদেখি, অচিন্ত্যবাবুও হা হা হা হা করে হাসতে থাকেন। পিশাচগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল।

অচিন্ত্যবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, "তোরা আমাকে এত মূর্খ ভাবিস? আমি তোদের সম্পর্কে এত রিসার্চ করেও এটুকু জানব না যে সাধারণ বুলেটে তোদের কিচ্ছু হবে না। কিন্তু যদি বুলেটটা হয় খাঁটি রুপোর, তাহলে? পিছু হটছিস কেন? ভয় করছে এবার?"

পিশাচগুলো নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে শলাপরামর্শ করে নেয়, তারপর হঠাৎ একসঙ্গে ঝাঁপ মারে প্রফেসরের চারদিক থেকে। অচিন্ত্যবাবুর রিভলভার ঝলসে ওঠে বারবার—

গুড়ুম...গুড়ুম...গুড়ুম...গুড়ুম...গুড়ুম...

পিশাচদের দেহ মিলিয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না। আগে যেখানে শয়তানগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে পড়ে থাকে খানিকটা ছাই আর অন্ধকার।

(৪)

হঠাৎ পেছনে কারও যেন নিশ্বাস পড়ল না?

অচিন্ত্যবাবু রিভলভার না নামিয়েই পেছনে ঘোরেন।

ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়িয়ে আছে আজকের মেয়েটা, গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দ পায়ে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অচিন্ত্যবাবুকে ঘুরতে দেখে ভয়-জড়ানো গলায় বলে ওঠে, "আমার একা খুব ভয় করছিল! আর কেমন দম আটকে আসছিল।"

অচিন্ত্যবাবু উত্তর দেন না। শুধু রিভলভারটা মেয়েটার দিকে তাক করেন। তারপর চাপাস্বরে বলে ওঠেন, "তোর খেল খতম।"

এবার মেয়েটা নিঃশব্দে হেসে ওঠে, শ্বদন্তগুলো অন্ধকারেও ঝিকিয়ে ওঠে।

অচিন্ত্যবাবুর ঠোঁটেও একচিলতে হাসি খেলে যায়—"ছদ্মবেশটা ভালো ছিল, ফাঁদটাও দুর্দান্ত—কিন্তু একটু ভুলের জন্য ধরা পড়ে গেলি। না হলে তোকে বিশ্বাস করে গাড়িতে তুলে নিতাম। কী, প্ল্যান বি তা-ই ছিল তো, চলন্ত গাড়ির মধ্যে আমাকে খুন করার?"

মেয়েটা ওরফে পিশাচটা হেসে ওঠে, শ্বদন্তগুলো ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে আসে—"আমাদের কোনো প্ল্যান এ, বি, সি, ডি হয় না, প্রফেসর। আমাদের উদ্দেশ্য যেনতেনপ্রকারেণ আমাদের পথের কাঁটাকে উপড়ে ফেলা। তাই তোমার সরে যাওয়াটা খুব দরকারি, প্রফেসর। কিন্তু তোমার বুদ্ধিকে আমরা একটু হেয়ই করেছিলাম। এখন দেখছি, ভুল করেছি।"

"ভুল তো করেইছিস। না হলে কেউ নিজেকে বলে মানুষ অথচ গাড়ির ভেতরের রসুনের গন্ধে দম আটকে আসে? বোকা ঠাওরেছিস আমায়?"

পিশাচটা ব্যঙ্গ করে হেসে ওঠে—"ভুল যখন করেইছি, তখন শুধরেও যে নিতে হবে, প্রফেসর।"

পিশাচটা ঝাঁপিয়ে পড়ে, অচিন্ত্যবাবুর অস্ত্র একবার অগ্নিবর্ষণ করে...

তারপর? তারপর একটু ধোঁয়া, একটু ছাই, একটু আঁধার। শান্তি শান্তি শান্তি...

গাড়ির দরজাটা খুলতে গিয়ে অচিন্ত্যবাবু চমকে ওঠেন। কোথা থেকে একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসছে না? কে কাঁদে? পিশাচদের মায়া? না? নিজে হাতে সব ক-টাকে শান্তিধামে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তবুও এখানে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কেন?

তাহলে কি সেই পিশাচটা সত্যিই একটা শিশুকে ধরে নিয়ে এসেছিল নিজেদের জন্য? কারও কোল খালি করে '
নিয়ে চলে এসেছিল হারানিধি? তাহলে, তাহলে '
এখানে রেখে দিয়ে চলে গেলে তো ঘোর পাপ, বাচ্চাট
সারারাতের হিমেই মারা যাবে। অচিন্ত্যবাবু শব্দের '
লক্ষ্য করে পা চালান। কিন্তু দু-পা এগোতেই দাঁড়িয়ে প
হল, শব্দটা এখন পেছন থেকে আসছে, না এবার ডান
এবার বাঁদিক...

অচিন্ত্যবাবুর মাথা গুলিয়ে গেল। কী হচ্ছে এসব? পি
মায়া? তা-ই যদি হবে তাহলে সে কোথায়?

পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন ফিসফিস করে '
"প্রফেসর, সব গুলি তো খরচ হয়ে গেল, এবার?"

পেছনে ঘুরেই অচিন্ত্যবাবু ট্রিগার টিপলেন, শব্দ হল—

অচিন্ত্যবাবুর সারা শরীর হিম হয়ে গেল। পেছনে দাঁ
একটা বাচ্চা, দেখলে কোনোমতেই তার বয়স দু-ব
বেশি মনে হয় না। তাহলে একেই ওই মেয়েটা কাপড়ে
আনছিল?

বাচ্চাটা হেসে উঠল—"হিসেব গুলিয়ে গেল, প্রফে
ছ-টা গুলি যে খতম হয়ে গেল?"

অচিন্ত্যবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি, তুমি তো '
বাচ্চা?"

আবার খিলখিল হাসির শব্দ ভেসে এল বাতাসে, "সে
তো তোমাকে বোকা বানানো গেছে। বয়স অনুযায়ী আম
চেহারা পরিবর্তন যে তোমাদের মানুষের মতন নয়,
উলটো। আর তাই আমাকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখোনি। হি
একটু যে ভুল হয়ে গেল, প্রফেসর।"

অচিন্ত্যবাবু গলার থেকে ক্রুশ নামিয়ে বাগিয়ে ধ
বাচ্চাটা আবার ফিসফিস করে বলে ওঠে, "ম্যাজিক দে
প্রফেসর? ম্যাজিক? দেখতে থাকো, দেখতে থাকো—অ
চোখের দিকে তাকিয়ে থাকো, দ্যাখো, দ্যাখো..."

পিশাচ সর্বাধিনায়ক এগিয়ে যেতে থাকে অন্ধকারের দি
পেছন পেছন মন্ত্রমুগ্ধের মতন অনুসরণ করেন প্র
অচিন্ত্য রায়। অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে মিশে যায়
ছায়া... নতুন বন্ধুকে বরণ করে নেওয়ার সময় যে
এসেছে... দরকার নতুন সর্বাধিনায়কের... এরকম স
বলবান মানুষই তো পরবর্তী পিশাচ সর্বাধিনায়ক
যোগ্যতা রাখে...

ওরা পিশাচ, ওদের সম্পর্কে বেশি জানতে চেয়ো



কাইতি

ত্রিজিৎ কর



// ১ //

"বেশি বাড় বেড়ো না, কালনাগিনিতে খাবে।"

ছেলেটির মুখের দিকে আরও একবার ভালো করে তাকাল অরিত্র। আহা রে! কী নিষ্পাপ মুখটা। বয়স আর কত হবে, খুব বেশি হলে সতেরো-আঠারো। সবে সবে ঠোঁটের ওপর হালকা গোঁফের রেখা গজাচ্ছে। এর মধ্যেই কিনা ঘরবাড়ি ছেড়ে এই হিজড়েদের খোলে এসে যোগ দিল! অরিত্রর একই সঙ্গে খুব রাগ আর মায়া হল ছেলেটার ওপর। কী এমন দরকার পড়ল ওর? আর ক-টা বছর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করলে হত না।

"তুমি নিজে থেকে এই দলে এসে যোগ দিয়েছ? কেউ তোমায় জোর করেনি? সত্যি কথা বলো, দ্যাখো, আমাদের সঙ্গে পুলিশ অফিসার আছে। কোনো ভয় নেই।" ছেলেটিকে আরও একবার জিজ্ঞেস করল অরিত্র। এই ছেলেটির এখানে আসার

খবর গতকালই ওরা পেয়েছে লোকাল এজেন্টের মারফত। এই নিয়ে একুশ নম্বর। শেষ এক সপ্তাহে বিভিন্ন শহর থেকে পুরো একুশটি অল্পবয়সি ছেলে এই হিজড়েদের দলে এসে যোগ দিয়েছে। এমনিতে এদের দলে নতুন নতুন লোক এসে যোগ দিতেই থাকে, কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এতগুলি নতুন হিজড়ে যোগ দেওয়া শুধু অদ্ভুতই নয়, বেশ রহস্যজনকও বটে। অন্তত অরিত্রর ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে...

"কী হল, বলো? কোনো ভয় নেই। আমাদের সত্যি কথা বলো। এরা তোমায় জোর করে ধরে এনেছে?" কানের ঝোলা দুলটা ঠিক করতে করতেই আবারও জিজ্ঞেস করল অরিত্র। অরিত্ররা এখানে এই খোলের ভেতরে এসেছে তিনজন। ও, সৌরভ আর দেবযানীদি। ওদের এনজিও 'রামধনু'র আরও দুজন মেম্বার, দিশানি আর সাবর্ণদা বাইরে গাড়িতেই আছে। ওরা আর ভেতরে আসতে চাইল না।

সৌরভ অনেকক্ষণ ধরে ছেলেটিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। ছেলেটিও মাঝে মাঝে চাপদাড়ি আর চশমা-আঁটা সৌরভের গম্ভীর মুখটা আড়চোখে দেখছিল। অরিত্র সৌরভের হাতে মৃদু টোকা দিল একটা। এ ইশারা সৌরভ ভালোই বোঝে। সৌরভ এবার মৃদু কেশে গম্ভীরভাবে বলল, "এই যে ছেলে, চুপ করে বসে আছ যে। একটা কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তো! তুমি এখানে নিজে থেকে এসেছ না তোমায় এরা জোর করে ধরে এনেছে?"

সৌরভের কথায় একটা চোরা ধমক লুকিয়ে ছিল যেন। সেই ধমকে এবার কাজ হল। ছেলেটা খাটিয়ার ওপরেই নড়েচড়ে বসল। তারপর মিনমিন করে নিচু স্বরে বলল, "কেউ জোর করেনি। নিজে থেকে যোগ দিয়েছি। আগে কলকাতায় মানিকতলার খোলে ছিলাম কিছুদিন। আমার গুরুমা এ খোলে পাঠিয়ে দিলেন কালকে। বললেন, এখানে ক-দিনের মধ্যেই কী সব..."

"অ্যাই বারোভাতারি, চুপ কর।" ছেলেটির কথা শেষ হওয়ার আগেই তার পাশে দাঁড়ানো হিজড়েটি ঝাঁজিয়ে উঠল। বহুক্ষণ ধরেই পান চিবোতে চিবোতে সে এই কথোপকথন শুনছিল। এইবার ছেলেটির কথা শুনে আচমকাই সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারপর একটা অশ্রাব্য খিস্তি দিয়ে তালি বাজাতে বাজাতে বলল, "যা জিজ্ঞেস করছে, শুধু তার উত্তর দে, বুইচিস? একখান বাড়তি কতা কইলে ওই জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব। বলি, দীক্ষের সময় তোর গুরুমা কি তোর কানে মন্তর দেয়নি? নিজ ধম্মের কতা অন্য লোকের সামনে মরে গেলেও ফাঁস করতে নেই—এ কতা জানিসনে?"

যে হিজড়েটি কথাগুলো বলছিল, তার মুখটা বেশ লম্বাটে টাইপের। পরনে একটা বাহারি নাইটি। মুখে মেকআপ, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। বোঝাই যায়, ছল্লা করে সদ্য খোলে ফিরেছিল। শাড়ি পালটে মুখের মেকআপ সবে তুলতে যাবে এমন সময়েই অরিত্ররা চলে এসেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অরিত্রদের প্রতি সে বেজায় চটে আছে। তাতে অবশ্য অরিত্রদের কিছু যায় আসে না। এ কাজে এদের ভয় পেলে চলে না। প্রথম প্রথম এদের কমিউনিটির প্রতি একটা সহানুভূতি থাকলেও দীর্ঘ দু-বছরের অভিজ্ঞতায় এদের সম্পর্কে ঘৃণা আর রাগ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই অরিত্রর।

অরিত্র এবার চারিদিকে একবার ভালো করে চেয়ে দ্যাখে। এই খোলের চারিদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটাই সদর দরজা। সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে একটা বৃহৎ গোলাকার উঠোন, তার চারিদিকে সার দিয়ে পরপর হিজড়েদের টালির ঘর। উঠোনটা বেশ অন্ধকার। উঠোনের মাঝখানে একটা কাঠের চৌকি অনাথের মতো পড়ে আছে। তার ওপরেই বসে আছে ছেলেটি। উঠোনের এককোণে টিমটিম করে একটা ষাট ওয়াটের বাল্ব যথাসাধ্য আলো ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না, পুরো উঠোনটাই ডুবে আছে আবছায়া অন্ধকারে। এখন বর্ষার মরশুম, পুরো দমে স্যাঁতসেঁতে হাওয়া বইছে। এর মধ্যে এই অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতেও অরিত্রর শরীরটা কেমন যেন শিরশির করছে।

তবে খোলটা একটু বেশিই ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে না আজ? হিজড়েদের খোল এই ভর সন্ধেবেলা তো এত ফাঁকা-ফাঁকা থাকে না। এ তো এদের হইহল্লা, আমোদ-প্রমোদের সময়। এই সময় এখানে এমন শ্মশানের নিস্তব্ধতা কেন? ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক না! অরিত্র এবার সেই হিজড়েটির চোখে চোখ রেখে কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাকি লোকজন কই? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে। সব ছল্লা করে ফেরেনি? এত সন্ধ্যা হয়ে গেল..."

অরিত্রর কথাটা শোনামাত্রই হিজড়েটির চোয়াল দুটি অচিরেই শক্ত হয়ে উঠল। মুখের পানটুকু চিবোতে চিবোতেই অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে আবারও একটা বিশ্রী খিস্তি দিয়ে সে বলল, "এত কৌতূহল কীসের হ্যাঁ? দেখে তো মনে হচ্ছে কোতি তায় আবার ঠুংঠাং... পারিক নিয়ে এখানে সমাজসেবা মারাতে এসচ! নেহাত দারোগাবাবু নে এয়েছেন, নইলে সব ক-টার পেছনে লাথ মেরে ভাগাতাম। যাও যাও, এখন এখান

থেকে ভাগো তো। আর ঝামেলা বাড়িয়ো না। কুক্কুরী মা বড়োমার খোরাকি দিতে বসেছেন। শুনতে পেলে অনথ হবে।"

কথাটা বলেই হিজড়েটি একবার জিভ কাটল, ঠিক যেন কথা বলার বেগে মুখ ফসকে এমন কিছু বেরিয়ে গেছে, যা মোটেই বলা উচিত ছিল না। যদিও অরিত্র ব্যাপারটা অতটা খেয়াল করল না। ওর মনে 'কোতি' আর 'ঠুংঠাং' শব্দটা এই মুহূর্তে আঁচড় কাটছে। এ দুটো শব্দের মানেই ও জানে। এদের ভাষায় কোতি মানে হল মেয়েলি পুরুষ, আরও ভালোভাবে বললে যারা বাইরে পুরুষ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মেয়ে।

একটু শিক্ষিত আর পড়াশোনা-জানা কোতিকে এরা 'ঠুংঠাং' বলে। অরিত্রর পোশাক, কানের দুল, কপালের টিপ—এসব দেখেই এর ধারণা হয়েছে অরিত্র কোতি। কথা বলার ধরন দেখে ধারণা করেছে ও ঠুংঠাং। এত দূর অব্দি ঠিকই আছে, কিন্তু পারিক নিয়ে আসার ব্যাপারটা বড্ড খটকাল অরিত্রর মনে। সৌরভকে কি এরা অরিত্রর পারিক ভাবল? কিন্তু সৌরভ যে...

"হ্যাঁ রে তাম্বূলী? এই সাঁঝের বেলায় এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? মা খোরাকি দিতে বসেছেন, খেয়াল নেই? বলি, সন্ধে হল কি হল না, পেটে খিলুয়া ঢাললি নাকি!"

ভেতর থেকে আরেকটি কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই কণ্ঠস্বরের ধমকে তাম্বূলী নাম্নী এই হিজড়েটি যে বেশ চমকে উঠল তা বলাই বাহুল্য। অরিত্র জানে, এরপর কী হতে চলেছে। অগত্যা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করেই ও জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কাছে খবর আছে, এই এক সপ্তাহের মধ্যে এই খোলে একুশজন অল্পবয়সি ছেলে এসে তোমাদের দলে যোগ দিয়েছে। এত লোক একসঙ্গে এখানে যোগ দিচ্ছে কেন? কী হচ্ছে বলো তো তোমাদের এই খোলে? তোমরা কী করবে এদের দিয়ে? আমরা কিন্তু সব জানি, তোমাদের এসব খোলে তলে তলে কী চলে... সত্যি কথা বলো, নইলে কিন্তু পুলিশ এনে রেইড করাব..."

অরিত্রর কথাগুলো শেষও হয়নি এমন সময় একটা প্রচণ্ড হাততালির আওয়াজে ও প্রায় লাফিয়ে উঠল যেন। আওয়াজটা হিজড়েদের স্বভাবসিদ্ধ হাততালির। কিন্তু এই ভর সন্ধেবেলা এই অন্ধকার ঝোড়ো পরিবেশে আচমকা এই শব্দ এতটাই বিকট শোনাল যে অরিত্রর বুকের ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল যেন।

সৌরভ আর দেবযানীদিও আওয়াজটা শুনে যথেষ্ট চমকে উঠেছে। ওরা পেছনে তাকাবার আগেই একটা কর্কশ পুরুষসুলভ কণ্ঠ ওদের কানে এসে তীক্ষ্ণ ফলার মতো বিঁধল, "কোন গুদমারানির ব্যাটা হিজড়েদের খোলে দাইড়ে হিজড়েদের থেরেট দিচ্ছে রে! কার এত বুকের পাটা হল! বলি ও আপিসার, মাসের পেত্থমে তো মোটা টাকা ঝলকি নিয়ে গেলে। এখন নাটক মারাতে এসেচ নাকি!"

অরিত্ররা এবার পেছনে ফিরল। উঠোনের পেছনে একটি কোনার ঘর থেকে এক মধ্যবয়সি দীর্ঘাঙ্গী হিজড়ানি বেরিয়ে এসেছে। তার পরনে লালপেড়ে কালো একখানা থান কাপড়, কপালে সিঁথি ভরতি তামাটে সিঁদুর, গলায় অসংখ্য তাবিজ-মাদুলির মতো কী সব যেন ঝুলছে। হিজড়েটির মুখের নীচের দিকটা কেমন যেন ঈষৎ বাঁকা, সম্ভবত জন্মগত কোনো ত্রুটি। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর যা তা হল হিজড়েটির চোখের দৃষ্টি। যেমনি ক্রূর, তেমনি হিমশীতল, ঠিক যেন বিষ-মাখানো তিরের ফলা, যাকে দেখছে, তাকে দৃষ্টি দিয়েই পারলে ফালাফালা করে দেবে যেন। হিজড়েটির পেছন পেছন এবার একটি ল্যাজকাটা নেড়িকুকুরও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কী অদ্ভুত! কুকুরটার চোখের দৃষ্টিও অবিকল ওই হিজড়েটির মতোই, নৃশংস ও ক্ষুধার্ত।

"প্লিজ মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ!" এতক্ষণে কথা বলল দেবযানীদি। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে দেবযানীদি ট্রান্সওম্যান আর হিজড়ে কমিউনিটিকে নিয়ে রিসার্চ করছে। সুতরাং এদের কীভাবে বাগে আনতে হয়, দেবযানীদি ভালোই জানে। হিজড়েটির চোখে চোখ রেখেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ও এবার বলল, "দেখুন, আমরা একটা এনজিও থেকে আসছি। আমাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলুন। আমাদের এনজিও-টি ট্রান্সজেন্ডার-সহ অন্যান্য প্রান্তিক যৌনতার মানুষদের সমাজের মেনস্ট্রিমে নিয়ে আসার জন্য অনবরত কাজ করছে। আমরা খবর পেয়েছি, গত সাত দিনে আপনাদের খোলে একুশটি নতুন ছেলে এসে যোগ দিয়েছে। আমরা জানতে চাই, আপনারা তাদের সঙ্গে এগজ্যাক্টলি কী করবেন? আমরা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমরা দেখতে চাই, তারা নিজে থেকে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে নাকি তাদের আপনারা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে জোর করে এখানে ধরে এনেছেন!"

দেবযানীদি কথা শেষ করার পর কয়েক সেকেন্ডের জন্য সমস্ত খোল জুড়ে একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এল। যেন সুচ পড়লেও শব্দ পাওয়া যাবে। শুধু খোলের ভেতরে কোথাও থেকে অত্যন্ত ক্ষীণ শব্দে ভেসে আসতে লাগল খচখচ করে

একটা শব্দ। যেন অত্যন্ত দ্রুতবেগে কেউ কিছু চিবোচ্ছে। তারপর একসময় সেই নীরবতা খানখান করে আচমকাই সেই মধ্যবয়স্কা হিজড়ানি হা হা করে হেসে উঠল। তার সঙ্গে যোগ হল তাল দিয়ে আবার সেই আগের মতো জোরে জোরে হাততালি। পেছন থেকে তাম্বুলী নাম্নী সেই হিজড়েটিও এবার বিকট ভঙ্গিতে হাততালি দিতে দিতে এই হাসিতে যোগদান করল। তার হাসি দেখে মনে হল, দেবযানীদি যেন এমন কোনো হাসির কথা বলেছে যে তারা হাসতে হাসতে লুটিয়েই পড়বে।

তারপর একসময় মধ্যবয়স্কা হিজড়াটি হাসি থামাল। দেবযানীদির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিশ্রী একটা খিস্তি দিয়ে বলল, "কোন গাঁয়ে দাইড়ে আছিস জানিস! এ হল গিয়ে হিজড়িয়া গ্রাম। এ গাঁয়ে হিজড়েদের কতাই শেষ কতা, এখানকার মানুষ হিজড়েদের ভগবানের মতো পুজো করে। যদি চাই তো এই আপিসারের সামনেই এক্ষুনি তোদেরকে কেইট্টে এই মাটিতে পুঁইতে দিতে পারি। থানাপুলিশ কিচ্ছু হবেনে। সারা গাঁয়ে কেউ টুঁ শব্দটিও করবেনে। বুঝলি! বড়োমার খোলে দাইড়ে আমার চেলিদের ভাগিয়ে নে যাওয়ার কথা, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা তোরা ভাবলি কেমন করে! আমি হলাম এই খোলের গুরুমা। আমি, এই কুক্কুরী মা যদি চাই তাহলে এক্ষুনি তোদের সব ক-টাকে..."

"ওদের ছেড়ে দিন কুক্কুরী মা। ওরা শহর থেকে এসেছে। ঝোঁকের বশে ভুল কথা বলে ফেলেছে। আমি ওদের এক্ষুনি নিয়ে চলে যাচ্ছি।" এতক্ষণে কথা বললেন অফিসার রায়। উনিই অরিত্রদের এখানে নিয়ে এসেছেন। এমনি এমনি নয় অবশ্য, সাবর্ণদার কথায় ওপরতলার থেকে চাপ ছিল তাই। এতক্ষণ দরজার সামনে উনি চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভেবেছিলেন, মানে মানে ঝামেলা মিটলে এদের নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়বেন। কিন্তু জল এবার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কথা বলতেই হল।

অরিত্র, সৌরভ, দেবযানীদি তিনজনই অফিসারের মুখের দিকে তাকাল একবার। ওঁর মুখ বজ্রগম্ভীর। ইঙ্গিত স্পষ্ট। এখনই এখান থেকে চলুন, এরপর কিছু হয়ে গেলে আমরা কিন্তু কোনো দায়িত্ব নেব না। অথচ অরিত্রর যে বাচ্চা ছেলেটির জন্য মায়া পড়ে গেছে। বেচারির কত অল্প বয়স। কোন গ্রহের ফেরে এই খোলে এসে উঠেছে। কে জানে, এরা কী করবে ওর সঙ্গে। যদিও বা হিজড়ে হয়েই থাকে এখানে, তাহলেও তো সারাজীবন লোকের ঘেন্না, তাচ্ছিল্য নিয়েই বাঁচতে হবে।

অরিত্র এবার চট করে পেছনে ফিরে ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "দ্যাখো, এখানে থাকলে তোমায় এদের সঙ্গে ভিক্ষে করতে হবে, লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে। আরও অনেক খারাপ কাজও করতে হতে পারে। তুমি যদি চাও, আমাদের সঙ্গে আসতে পারো। তুমি পড়াশোনা শিখতে পারবে, নিজের মনের মতো কাজ করতে পারবে। আমায় দ্যাখো, আমিও তোমার মতো। কিন্তু আমি মাথা উঁচু করে বাঁচি। এদের মতো কষ্টের জীবন আমায় বাঁচতে হয় না। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?"

ছেলেটি এবার মুখ তুলল। একবার অরিত্রর হাতের আংটিটার দিকে তাকাল। কী যেন ভাবল ওদিকে চেয়ে চেয়ে। তারপর ফের তাকাল অরিত্রর দিকে। ওর চোখ দুটো ছলছল করছে। কিছু কি বলতে চায় অরিত্রকে? হয়তো কিছু বলতও, তার আগেই আচমকা ঠিক নিজের পেটের কাছে সজোরে একটা আঘাত অনুভব করল অরিত্র। মুহূর্তের মধ্যেই উঠোনের আরেক প্রান্তে ছিটকে পড়ল ও। তারপর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চোখ খুলতেই দেখল, একটি শ্যামবর্ণ রোগাটে হিজড়ে ওর মুখের দিকে ঠান্ডা খুনির মতো স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হিজড়েটির বয়স খুব বেশি হলে ত্রিশ-বত্রিশ। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অত্যন্ত হিমশীতল কণ্ঠে সে বলে উঠল, "মা! একে এখানেই গলা টিপে মেরে ফেলি? কী বলেন? তিন দিন বাদে ডিঙ্গিরি আছে, বড়োমাকে খোরাকির সঙ্গে ভালো ভেটও দেওয়া যাবে।"

শ্যামাঙ্গী এই হিজড়েটির কথায় সামান্য যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন কুক্কুরী মা। তারপর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বললেন, "না না, সেইসবের প্রয়োজন নেই, শর্মিলা। এদের তাড়াতাড়ি এখন থেকে বিদায় কর তো। আর আপিসার, তিন দিনের মধ্যে এদের গাঁ থেকে বিদায় করুন দেকিনি! গাঁয়ের নিয়মকানুন আপনাকে নতুন করে শেখাতে হবে না নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ কুক্কুরী মা, আমি এদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে পাঠিয়ে দেব। এই তোমরা চলো। কুইক!"

সৌরভ এতক্ষণে অরিত্রকে এসে তুলে ধরেছে, দেবযানীদিকেও যথেষ্ট আতঙ্কিত দেখাচ্ছে। এর আগে বহু জায়গায় ওরা গেছে, কিন্তু এরকম সরাসরি শারীরিক আক্রমণের মুখোমুখি কোথাও হতে হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে এরা কী পর্যায়ের ভয়ংকর! সৌরভ যদিও প্রচণ্ড রেগে গেছে। 'দেখে নেব তোদের' টাইপের কিছু একটা ও বলতেও যাচ্ছিল, কিন্তু দেবযানীদিই পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে ওকে

থামিয়ে দিল।

অরিত্ররা আর দাঁড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল দরজার দিকে। ওদের পেছন পেছন দরজা বন্ধ করতে এল শর্মিলা নাম্নী সেই হিজড়েটি। অদ্ভুতভাবেই খোলের দরজাটা বন্ধ করার আগে অরিত্র আর সৌরভের দিকে তাকিয়ে সরীসৃপের ন্যায় ঠান্ডা একটা হাসি হাসল সে। তারপর বলল, "তিন দিনের আগেই বাড়ি ফিরে যান। এ গাঁয়ে থাকবেন না। কথায় আছে না, বেশি বাড় বেড়ো না, কালনাগিনিতে খাবে।" কথাটা বলে আবারও একই রকম হাসল শর্মিলা। তারপর আচমকাই গলার পারদ কয়েক ডিগ্রি নামিয়ে হিসহিস করে বলল, "জানেন তো, এ গাঁয়ের শ্মশানে যত লাশ পোড়ানো হয়, তাদের কারও হাতে আঙুল থাকে না। হে হে হে... কেন থাকে না বলুন তো?"

কী অদ্ভুত! নিজে প্রশ্নটা করে নিজে কোনোরকম উত্তর দেওয়ার আগেই দড়াম করে মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল শর্মিলা। অরিত্র আর সৌরভ বেশ অবাকই হল এতে, তারপর হাঁটা দিল গাড়ির দিকে। শুধু গাড়িতে যাওয়ার পথে অরিত্রর মাথায় আঁচড় কাটতে লাগল অদ্ভুত কয়েকটা প্রশ্ন...

আচ্ছা, ঠিক কী হতে চলেছে এ গাঁয়ে তিন দিন পর? কেন তিন দিনের আগেই ওদেরকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলল কুক্কুরী মা। এই শর্মিলা নামক হিজড়েটা 'ডিঙ্গিরি' বলে কিছু একটা হওয়ার কথা বলল না! কী এই ডিঙ্গিরি? এর জন্যই কি একুশজন হিজড়েকে নিয়ে আসা হয়েছে এই খোলে? কী হয় এই ডিঙ্গিরিতে? আর শর্মিলা শেষ যে কথাটা বলল, তারই বা মানে কী! কেন এ গায়ে কোনো লাশের হাতে আঙুল থাকে না! কেন? কেন কেন কেন?

// ২ //

"ওই উৎসবে কী হয় তা কেউ জানে না।"

বাইরে মুশলধারে বৃষ্টি নেমেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। গাড়ির ঝাপসা হয়ে-আসা কাচটা দিয়ে বাইরের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে ছিল অরিত্র। সৌরভ আর সাবর্ণদা গেছে রাতের জন্য রুটি আর মাংস আনতে সামনের ধাবা থেকে। অগত্যা এখন কিছুক্ষণ গাড়িতে বসে বসে এই আদিম অন্ধকার গ্রামবাংলার বুকে বর্ষার উদ্দাম নৃত্য দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

অরিত্রর পেছনের সিটেই মোবাইলে মুখ গুঁজে বসে আছে দিশানি। বাইরের বৃষ্টিকে একেবারে পাত্তা না দিয়েই নিজের নতুন প্রেমিকার সঙ্গে চ্যাটিং চালিয়ে যাচ্ছে সে। এই মাসকয়েক হল এই এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দিশানি। ওর বয়স বেশি নয়, সবে প্রেসিডেন্সি থেকে ফিজিক্সে মাস্টার্স করছে এখন। আপাতত নিজের নতুন প্রেমিকা অলিকে নিয়ে দিব্যি মজে আছে সে।

দিশানির পাশের সিটে বসে দেবযানীদি সেই তখন থেকে বরের সঙ্গে মোবাইলে বকবক করে যাচ্ছে। কী সব মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে কথা হচ্ছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে অরিত্রর চোখে চোখ পড়লেই মাঝে মাঝে মুচকি হাসছে দেবযানীদি। এর মানে অরিত্র জানে। আসলে ওপর ওপর কথা হচ্ছে মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে, কিন্তু তলে তলে চলছে অশ্লীল বার্তালাপ।

দূরে থাকা যক্ষিণীকে উদ্দেশ্য করে বিরহী যক্ষ ছুড়ে দিচ্ছে ননভেজ জোকস। সেকালে ছিল মেঘ, একালে রেডিয়ো ওয়েভ। দূর থেকে বহন করে আনছে বিরহীর কামাতুর বার্তা। যক্ষিণীর মুখে ফুটে উঠছে সলজ্জ অনুরাগের হাসি। বছরখানেক আগে বিয়ে-হওয়া দেবযানীদির রসে টইটম্বুর দাম্পত্যজীবন কানায় কানায় ভরে উঠছে নিবিড় গোপন সুখে।

দেবযানীদির পেছনের সিটে বসে আছেন অফিসার রায়। শাম্ব রায়। বয়স খুব বেশি নয়। ত্রিশ-বত্রিশ। দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। বেশ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এ গাড়িতে ওঠা থেকেই কখনও আড়চোখে, কখনও সরাসরি, কখনও বা লুকিয়ে-চুরিয়ে তিনি অরিত্রকে দেখে চলেছেন।

বলাই বাহুল্য, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে প্রশংসা নেই। কৌতূহলও নেই, বরং আছে একটা অদ্ভুত কৌতুক। এই যে অরিত্রর পোশাক আর পাঁচটা তথাকথিত পুরুষের মতো নয়, এই যে অরিত্রর চোখে কাজল, গলায় হার, কানে দুল—এই সমস্ত কিছুই ওঁর কাছে বেশ কৌতুকের বিষয়। ঠিক যেন অরিত্র একটা সার্কাসের জোকার, যাকে দেখে যখন খুশি খুব একদফা মনে মনে হেসে নেওয়া যায়, পারলে হাসতে হাসতে মুখে থুতুও ছিটিয়ে দেওয়া যায় একদলা।

অরিত্র অবশ্য এসবের ধার ধারে না। কলকাতা শহরে নিত্যদিন মানুষের এই সরু চোখ আর চাপা হাসি নিয়ে ওকে জীবন কাটাতে হয়। তাতে অবশ্য ওর আক্ষেপ নেই। কারণ ও জানে ও একজন শিল্পী। ও যখন ঘুঙুর পরে মঞ্চে ওঠে, যখন গানের সুরে এক সভা মানুষের সামনে মেলে ধরে ওর ভেতরকার জেন্ডার ফ্লুইডিটিকে, যখন ওর নাচের শেষে এক হল মানুষ দাঁড়িয়ে উঠে ওকে হাততালি দিয়ে সম্মান জানায়,

তখন এসব চোখ ট্যারাটেরি, চাপা ফিসফাস কথা খুব ক্ষুদ্র, খুব তুচ্ছ মনে হয়। তখন ওর খুব ইচ্ছে করে ওই মঞ্চে দাঁড়িয়েই দু-হাত ছড়িয়ে গান ধরতে, "তোরা যে যা বলিস ভাই! আমার সোনার হরিণ চাই!"

অরিত্র জানে, ওর এই সোনার হরিণ আসলে ওর অন্তরের শিল্পীসত্তা, যা মানুষের ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, পরিচয় সবকিছুর উর্ধ্বে, যার সামনে স্বয়ং মহাকালকেও মাথা নত করতে হয়। শুধু একটা জিনিস ভাবলেই বড়ো অবাক লাগে অরিত্রর, অরিত্রও নাচে, আবার হিজড়েরাও নাচে। কিন্তু নাচের বদলে অরিত্র পায় সম্মান, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা... আর হিজড়েরা! কেবলই বিদ্রুপ, ঘেন্না আর তাচ্ছিল্য। কী অদ্ভুত নিয়ম তা-ই না!

"আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম ওখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনারাই বেকার জোর করলেন। দেখলেন তো কী ফল হল!" অফিসার রায় অনেকক্ষণ ধরেই কথা বলার জন্য উশখুশ করছিলেন। এবার কথাটা পেড়েই ফেললেন।

অরিত্র বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়েই মুখ বাঁকাল। ওর মেকআপ-ঢাকা পরিপাটি মুখশ্রীতে ফুটে উঠল একরাশ বিরক্তির মেঘ। একরকম ইচ্ছে করেই ওঁর কথার কোনো উত্তর দিল না অরিত্র। দেবযানীদি আর দিশানিও নিজেদের মতোই রইল। ফলে উত্তর না পেয়ে অফিসার রায় একটু দমে গেলেন যেন। তারপর আবার মিনিটকয়েক পর অরিত্রর দিকে তাকিয়েই বললেন, "আপনার লাগেনি তো? আপনি ঠিক আছেন?"

"ঠিক আছি। তবে আপনি আমার প্রতি দয়া না দেখিয়ে ওই বাচ্চা ছেলেটার প্রতি দয়া দেখালে বেশি খুশি হতাম।" অরিত্রর মুখে জমে-থাকা রাশি রাশি মেঘে এবার যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। অফিসার সাহেবের এই ন্যাকামো ওর স্রেফ অসহ্য লাগছে। অন্যদিকে কাউকে না বুঝতে দিলেও, পেটের কাছটা এখনও কিন্তু ভালোরকমই চিনচিন করছে যন্ত্রণায়। ইশ্! সৌরভকে একটা পেইনকিলার আনতে বলা উচিত ছিল।

"আমাকে আপনি ভুল বুঝছেন, ম্যা..." অরিত্রকে ম্যাডাম বলতে গিয়ে একটু যেন ধন্দে পড়লেন অফিসার। অরিত্রকে কি আদৌ ম্যাডাম বলা যায়... কী জানি, মনে মনে কী হিসাব কষলেন, কিন্তু পরক্ষণেই প্রসঙ্গ পালটে ফেলে বললেন, "এসব হিজড়ে গুরুমাদের আপনি চেনেন না। ভীষণ ডেঞ্জারাস। আর এই কুক্কুরী মা তো সাংঘাতিক। একদিকে যেমন বড়ো বড়ো নেতা-মন্ত্রীর সঙ্গে এঁর ওঠাবসা, তেমনই ড্রাগ, কোকেন—এসব আন্ডারগ্রাউন্ড সার্কলের সঙ্গেও এঁর ভীষণ দহরম মহরম। শুনেছি, ওঁর নাকি অনেকরকম অলৌকিক ক্ষমতাও আছে..."

"যত্তসব রাবিশ! সিরিয়াসলি আপনি পুলিশ হয়ে এসবে বিশ্বাস করেন? এই হিজড়েদের জন্যই এ দেশে আমাদের কমিউনিটির মানুষরা আরও বদনাম হচ্ছে..." অরিত্র গাড়ির দরজা খুলে দিল সৌরভের জন্য। রুটি, মাংস নিয়ে ওরা ইতিমধ্যে হাজির হয়েছে। সৌরভ উঠল ওর পাশে ড্রাইভিং সিটে, সাবর্ণদা পেছনে অফিসারের পাশে। দুজনে একখানা ছাতা নিয়েছিল বটে, তবে সাবর্ণদা আয়তনে কিঞ্চিৎ স্থুল হওয়ায় সৌরভ ছাতার ভাগ অতি সামান্যই পেয়েছে, ফলস্বরূপ সৌরভ পুরো কাকভেজা হয়ে ফিরেছে।

"কী যে করিস, বললাম, আরেকটা ছাতা নিয়ে যা..." নিজের ওড়নাটা দিয়ে সৌরভের মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে রাগ দেখাল অরিত্র।

"আহা! ছাতা নিয়ে গেলে তো আর এমন আদর করে মাথা মুছিয়ে দিত না কেউ!" সাবর্ণদার কথায় মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতেই দিশানি এবার হেসে উঠল।

সৌরভও মৃদু হাসল অরিত্রর দিকে তাকিয়ে। তারপর পেছন ফিরে বলল, "একটা বিয়ে করুন সাবর্ণদা, আপনারও এরকম একজন একনিষ্ঠ মাথা মোছানোর মানুষ জুটে যাবে। সঙ্গে আমাদেরও কিঞ্চিৎ পেটপুজো হবে।"

"থাক বাবা। একলা মানুষ। ঝাড়া হাত-পা, দিব্যি আছি। বিয়ে করলেই হাত-পায়ে শিকল, বুঝলে। এই দেবযানীটাকেই দ্যাখো না। এখানে এসেছে। তা-ও বরের ওপর কেমন ফিসফিস করে ইন্সপেকশন চালাচ্ছে।"

"সাবর্ণদা, ভালো হবে না কিন্তু..." ফোন হাতে ধরেই ছদ্মরাগ দেখাল দেবযানীদি। সৌরভও আর দেরি করল না, বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়ছে। চট করে গাড়িতে স্টার্ট দিল ও। তারপর অরিত্রর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "পেইনকিলার এনেছি, বাড়ি গিয়ে একটা খেয়ে নিবি। ব্যথা নেই তো আর?"

অরিত্র এবার বোকার মতো কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সৌরভের দিকে। ওর মুখে এতক্ষণ ধরে জমে-থাকা সমস্ত মেঘ যেন একনিমেষে উধাও হয়ে গেল। সৌরভের দিকে তাকিয়েই মৃদু হাসল ও। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "উঁহু, কোনো ব্যথা নেই। আসল পেইনকিলার পেয়ে গিয়েছি যে!"

* * * * * * * * *

বাইরে বৃষ্টির বেগ আগের থেকে আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। তার মধ্যে দিয়েই গাড়ি ছুটে চলেছে নিজস্ব গতিতে। যে পথ দিয়ে ওরা এখন যাচ্ছে, সেই পথের দু-ধারে লম্বা লম্বা গাছের সারি ডালপালা মেলে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে আকস্মিক বিদ্যুতের আলোয় তাদের চোখে পড়লে বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে, অতি লম্বা কোনো পারলৌকিক জীব বলে ভ্রম হয়।

গাড়ির ভেতর বেশ খানিকক্ষণ সবাই চুপ থাকার পর সাবর্ণদাই একসময় অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী যেন বলছিলেন অফিসার, অলৌকিক ব্যাপারস্যাপার, তন্ত্রমন্ত্র..."

অফিসার রায় এবার যেন একটু লজ্জা পেলেন।

"ও কিছু না। গাঁয়ের লোকে নানান কথা বলে আর কী! এসব খোল তো শুধু নামেই হিজড়েদের খোল, তলে তলে দেহব্যাবসা থেকে গাঁজাচক্র সবই চলে। কুক্কুরী মা যা পাওয়ারফুল, ও যদি চায়, আপনাদের সবার বডি ফেলতে এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না। দেখলেন না কী দাপট! পুলিশ এদের কাছে নস্যি।"

"দেহব্যাবসা! হিজড়েদের খোলে? স্ট্রেঞ্জ! ওখানে মেয়েরাও থাকে নাকি!" দিশানি এবার একটা ইন্টারেস্টিং টপিক পেয়ে মোবাইল বন্ধ করে নড়েচড়ে বসল।

"কী যে বলেন! মেয়েরা থাকবে হিজড়েদের খোলে! তাহলেই হয়েছে।" অফিসার সাহেব নিজের গোঁফে তা দিতে দিতে বিদ্রুপের সঙ্গে হাসতে থাকেন। তারপর বলেন, "এখানে সব থাকে ছক্কা মাল। বাইরে মর্দ, ভেতর ভেতর জেনানা। অনেকে এদের দলে যোগ দেওয়ার পর পুরুষাঙ্গ কাটিয়ে ফ্যালে, অনেকে আবার রেখেও দেয়। এসব খোলে যারা আসে, তারা আসে বাটুর লোভে। বাটু বোঝেন তো?" বলেই দিশানিকে আকার-ইঙ্গিতে বাটু কী তা বুঝিয়ে দেন অফিসার। অরিত্রর অবশ্য নতুন করে এর মানে জানার প্রয়োজন নেই। ও জানে এদের ভাষায় বাটু মানে আসলে পায়ুছিদ্র। যাদের ভগবান যোনি দেননি, অথচ হৃৎকমলে নারীত্বের ফুল ফুটিয়েছেন, তাদের শরীরে বর্ষা নামলে তারা যাবে কোথায়! তাদের ওই বাটুই ভরসা...

"এ গাঁয়ের লোক বুঝি হিজড়েদের খুব মানে?" দেবযানীদি কখন যেন ফোন রেখে দিয়েছে, অফিসারের দিকে তাকিয়ে করল প্রশ্নটা।

"হ্যাঁ, বিশাল। একরকম পুজোই করে বলতে পারেন। এ গাঁয়ের লোকজনের বিশ্বাস, এখানকার হিজড়েদের প্রচুর ক্ষমতা। হিজড়েরা আছে বলেই নাকি এ গাঁয়ে সুখশান্তি বজায় আছে। এই 'হিজড়িয়া' গাঁয়ের নামটা তো হিজড়েদের থেকেই এসেছে। বহু পুরোনো আমল থেকেই এ গাঁয়ে নাকি হিজড়েরাই হর্তাকর্তাবিধাতা। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এরা এখানে এক ভয়ংকর দেবীর পুজো করে আসছে। হিজড়েদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও ওই দেবীকে খুব মানে। ভয়ও পায়। সেই থেকেই এদের প্রতি এত ভক্তি। নইলে এই খিস্তি-দেওয়া বজ্জাতগুলোকে কেউ স্বেচ্ছায় মাথায় করে রাখে!"

"হিজড়েদের এই দেবীর কী নাম?" দেবযানীদি কৌতূহল ভরে জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে এই প্রশ্নটা শোনামাত্রই অফিসার সাহেবের মুখ কেমন যেন কালো হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মনে মনে বিড়বিড় করে কাকে যেন একটা প্রণাম করলেন। তারপর আমতা আমতা করে বললেন, "এসব কথা থাক-না! আপনারা যে কাজে এত দূর থেকে এসেছিলেন তা তো হল না। আমি জানতাম, হবেও না। একবার হিজড়েদের খোলে যারা দীক্ষা নেয়, তারা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না। যা-ই হোক, কাজ হল না যখন, ভালোয় ভালোয় ফিরে যান। বেশি দেরি করবেন না। কালকের মধ্যেই পারলে বেরিয়ে পড়ুন।"

"কেন বলুন তো? এত তাড়াতাড়ি গ্রাম থেকে ভাগিয়ে দিতে চাইছেন কেন? কিছু আছে এই গ্রামে?" একটু থামে অরিত্র, তারপর মোক্ষম কামড়টা দেয়, "তিন দিন পর এই গ্রামে ডিঙ্গিরি বলে হিজড়েদের কিছু একটা হবে তা-ই না? তার আগেই আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইছেন।"

অফিসার রায় এই কথাটা শুনে এবার একটা ঢোঁক গিললেন। এই স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা আবহাওয়াতেও ওঁর কপালে অশনিসংকেতের মতো জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখুন, সব গ্রামের কিছু নিয়মকানুন থাকে। সেগুলো মেনে চলাই উচিত। বেশি মাতব্বরি না-করাই ভালো। আপনাদের ভালোর জন্যই বলছি, কালকের মধ্যেই গ্রাম ছেড়ে চলে যান। কাজ তো মিটেই গেছে..."

অফিসারের কথা শেষ করার আগেই অরিত্র আবার প্রশ্ন করে বসল। এবার একেবারে অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে, "ডিঙ্গিরি কী, অফিসার? সত্যি করে বলুন-না। আপনি তো

পুলিশ! আপনার কীসে ভয়? কী লুকোচ্ছেন আমাদের থেকে?"

এরপর কয়েক সেকেন্ড চলন্ত গাড়ির ভেতর পিনপতন নিস্তব্ধতা। বাইরে অবিরত বৃষ্টির শব্দ, মধ্যে মধ্যে মেঘ ডাকার আওয়াজ। গাড়ির ভেতরে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ শিকারির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অফিসারের দিকে। অফিসার রায়ের মুখ কীসের আতঙ্কে এবার যেন আরও কালো হয়ে এল। ধরা পড়ে-যাওয়া শিকারের মতো মাথা নিচু করে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে তিনি উত্তর দিলেন, "ডিঙ্গিরি হল হিজড়েদের গোপন একটা উৎসব। এই উৎসবে কী হয়, কেউ জানে না। কোনো সাধারণ মানুষের ডিঙ্গিরি দেখার নিয়ম নেই। ওইদিন এ গাঁয়ের কেউ রাতের বেলা বাড়ির বাইরেও বেরোয় না। ওইদিন রাতের বেলা বাড়ির বাইরে বেরোলে নাকি সে মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকে বলে, ওইদিন মধ্যরাতে হিজড়েরা নাকি নাচতে নাচতে ওদের সেই ভয়ংকর দেবীর কাছে যাত্রা করে। প্রতি বছর এক বিশেষ তিথিতে এই ডিঙ্গিরি হয়। ডিঙ্গিরির রাতে কাইতি মা তাঁর ভিঙা পরিবর্তন করেন..."

শেষকথাটা বলামাত্রই সর্বাঙ্গ যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল অফিসার রায়ের। প্রচণ্ড আতঙ্কে উনি নিজের হাত দিয়েই নিজের মুখ চেপে ধরলেন তৎক্ষণাৎ। ঠিক যেন এমন নিষিদ্ধ কোনো শব্দ উনি উচ্চারণ করে ফেলেছেন, যা এই রাতের বেলা উচ্চারণ করাও পাপ।

ঈশানি অফিসার রায়ের কথা শেষ হতে-না হতেই জিজ্ঞেস করল, "কাইতি মা! এই কাইতি মা কে? ইনিই কি হিজড়েদের সেই ভয়ংকর দেবী! এঁর সম্বন্ধে কোথাও শুনিনি তো কিছু। ভিঙা পরিবর্তনটাই বা কী জিনিস? এমন অদ্ভুত রিচুয়ালের কথাও শুনিনি কোথাও। এই কাইতি মা..."

ঈশানি কথাটা শেষ করার আগেই গাড়িটা আচমকাই জোরে একটা ব্রেক কষল। তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা থামতেই-না থামতেই গাড়ির ভেতরের আলোটাও দপ করে নিভে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল একটা অদ্ভুত ঠান্ডা হাওয়া। গভীর অন্ধকারে ক্রমশ ডুবে যেতে যেতেই অরিত্রর মনে হল, ঠিক যেন কেউ নিজে থেকেই গাড়ির ভেতরের এসি-টা অন করে দিয়েছে।

"কী হল? গাড়ি থামালি কেন এইভাবে!" অরিত্রর গলায় উদ্বেগ।

"আরে, রাস্তার মাঝখানে একটা বুড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। স্পষ্ট দেখলাম..."

সৌরভ কথা শেষ করার আগেই অফিসার রায় অদ্ভুত আতঙ্কিত স্বরে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, "ভুল হয়ে গেল... খুব বড়ো ভুল হয়ে গেল... এবার কী হবে! বড়োমার নাম তো মুখে নিতে নেই... ওই নাম নিলেই..."

কথাগুলো শেষও করতে পারলেন না অফিসার রায়, তার আগেই গাড়ির ওপর ধপ করে কিছু একটা পড়ার শব্দ হল। আর তারপরেই গাড়ির বাইরে থেকে পাওয়া গেল একটা বিকট হাততালির শব্দ। উঁহু, যে-সে হাততালি নয়, হিজড়েদের হাততালি। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে, এই অন্ধকার গাড়ির ভেতর বসে আচমকা এই হাততালির শব্দটুকু শোনামাত্রই গাড়ির ভেতর সকলেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল প্রায়! কেউ কিছু বলবার আগেই কয়েক সেকেন্ডের জন্য আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির ভেতর শোনা গেল দেবযানীদির প্রচণ্ড আর্তনাদ, "ও মা গো! ওটা কে!"

দেবযানীদির কথা শুনে সামনের দিকে তাকাতেই সকলের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল যেন। ওরা দেখল, গাড়ির ঠিক সামনের কাচটার ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে এক ভয়ংকরদর্শন বুড়ি হিজড়া। তার মাথার মাঝখানে বিস্তৃত টাক, দু-পাশ দিয়ে পাতলা অবশিষ্ট চুল গলা অবধি ঝুলছে নোংরা শ্যাওলার মতো। গলার চামড়াও আঙুরের মতো ঝুলছে নীচের দিকে। দুই চোখের পাতার ওপর পোকার মতো কালো কালো কী সব গিজগিজ করছে। হিজড়েটার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কালো কশের মতো কী একটা। ওই অবস্থাতেই গাড়ির কাচের ওপর বসে হাততালি দিতে দিতে সে ধীর লয়ে ঠোঁট নাড়াল আর অদ্ভুতভাবে এই অন্ধকার গাড়ির ভেতর বসেও সবাই শুনতে পেল সেই হিজড়ের হিমশীতল কর্কশ কণ্ঠস্বর, "আমায় কে ডাকলি র‍্যা? কার হল র‍্যা? কার হল? তোর হল?"

"গাড়ি চালান... গাড়ি চালান... এই মুহূর্তে গাড়ি স্টার্ট করুন... চালান গাড়ি!" অফিসার রায় এত জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে অরিত্রর কানে প্রায় তালাই লেগে গেল যেন! সৌরভের কী মনে হল কে জানে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিল ফুল স্পিডে।

এরপর সেই ভয়ংকর বুড়ি হিজড়ে যেমন হঠাৎ করে এসেছিল, তেমনিই হঠাৎ করেই এক মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল। ঠিক মনে হল সবটাই যেন একটা সিনেমার দৃশ্য, সবটাই যেন ওদের একটা ভ্রম। যা-ই হোক, এরপর গাড়ি

একেবারে গিয়ে থামল পুলিশ স্টেশনে। অফিসার রায় দ্রুত নেমে গেলেন। শুধু থানার ভেতর চলে যাওয়ার আগে ওদের গম্ভীরভাবে বলে গেলেন, "দেখুন, আপনারা ওপরতলা থেকে অর্ডার এনেছিলেন। তাই গিয়েছি। আপনাদের কাজ হয়নি। ব্যাস, আমার দায়িত্ব শেষ। আমায় আর ডিস্টার্ব করবেন না। আর হ্যাঁ, পারলে কালকেই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যান, প্লিজ। এ গ্রামে আর একদিন থাকাও আপনাদের উচিত হবে না।"

গাড়ি এবার স্টার্ট দিল হোমস্টের দিকে। কিছুক্ষণ আগের ঘটনায় সকলেই একরকম শক খেয়েছে। ফলে সকলেই জানলার দিকে তাকিয়ে নীরব রইল। যদিও অরিত্র জানে, সকলের মনে এখন একটাই দ্বন্দ্ব চলছে। কিছুক্ষণ আগে গাড়ির ওপর ওরা যাকে দেখল, সে কে? ওরা যা দেখল তা আদৌ সত্যি তো নাকি সবটাই ভ্রম! কিন্তু একসঙ্গে এতজন মিলে ভুল দেখবে... তা-ও কি হয়! আচ্ছা, অরিত্র যা ভাবছে তা নয়তো? ওরা যাকে দেখল, তার সঙ্গে হিজড়েদের দেবী কাইতির কোনো যোগ নেই তো? কিংবা হয়তো ওরা যাকে দেখল, সে নিজেই...

// ৩ //

"এমনই বিষ কালনাগিনির নিজের ডিঙাও খাস"

হিজড়েদের দলটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই ঘোমটার আড়াল থেকে আকাশের দিকে একবার তাকাল অরিত্র। বর্ষাকালের রাতের আকাশ। একেবারে চাপ চাপ মেঘ আঙুরের থোকার মতো ঝুলে আছে অন্ধকার আকাশের গায়ে। তিরতির করে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াও বইছে। বোঝাই যাচ্ছে, যে-কোনো সময় মুশলধারে নামবে।

অরিত্ররা যে পথ দিয়ে চলেছে, তার দুই ধারে যত দূর চোখ যায়, শুধু খেত আর খেত, গাঢ় অন্ধকার সেসব খেতের টুঁটি চিপে ধরেছে। হিজড়েরা সামনে তালি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে। কয়েকজনের হাতে খোল-করতাল। একদম সামনে কয়েকজন হিজড়ে একটা পালকি গোছের কিছু বয়ে নিয়ে চলেছে। খুব সম্ভবত পালকির ভেতরে কেউ একটা আছে। মাঝে মাঝেই তার ভেতর থেকে কারও একটা উন্মাদের ন্যায় বীভৎস চিৎকার ভেসে আসছে। পালকির সামনে চলেছেন কুক্কুরী মা আর শর্মিলা। তাঁর পায়ে পায়ে চলেছে কুক্কুরী মায়ের প্রিয় পোষ্য সেই ল্যাজকাটা নেড়িকুকুরটি। ওর নাম ভ্রমর। খোলে একে সবাই কুক্কুরী মা-র মেয়ে বলে ডাকে।

পালকির ভেতর থেকে মাঝে মাঝে আর্তনাদ ভেসে এলেই কুক্কুরী মা তালি বাজিয়ে জোর গলায় মাথা দোলাতে দোলাতে চিৎকার করে উঠছেন, "মায়ের ভেক উইঠছে গো, মায়ের ভেক উইঠছে! পচা-গলা ডিঙিতে আর থাইকতে পারছে না! দাঁড়া মা, দাঁড়া! আর কিছুক্ষণ! তারপরেই নতুন ডিঙা পাবি! কী বলিস রে সবাই!"

দলের বাকি হিজড়ারা এ কথা শোনামাত্রই এক অদ্ভুত মাদকীয় আনন্দে নেচে উঠছে যেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল-করতাল বাজিয়ে হাততালি দিয়ে ছড়ার মতো সুরে তারা গান ধরছে—

"আজই রাতে কাইতি মা গো, ভূমিতে আসিলা,
পুরান ডিঙি ছাইড়া মা গো; নতুন ডিঙা নিলা,
ডিঙি না নিলা মা গো, দংশিলা নাগিনি
কালনাগিনির বিষে মা গো, হইলা পিশাচিনী...
ডিঙা নাও নাও নাও, ডিঙা নাও নাও নাও
নতুন ডিঙা চইড়া মা গো, বিপদ কাটাও...
ডিঙা নাও নাও নাও, ডিঙা নাও নাও নাও..."

অরিত্র একবার পেছনের দিকে তাকাল। দেবযানীদি, সাবর্ণদা, দিশানি পেছন পেছনই আসছে। আর সৌরভ চলেছে ওর পাশে পাশে। লাল শাড়ি পরে, একগলা ঘোমটা দিয়ে সৌরভকে বেশ লাগছে কিন্তু। এখনও ওদেরকে কেউ চিনতে পারেনি। পারবেও না। এই হিজড়েদের দলের সকলেই আজকে লাল শাড়ি পরে এসেছে। সকলেরই আধগলা ঘোমটা। সব ঠিকঠাক থাকলে এই ডিঙ্গিরি উৎসবে ঠিক কী হয়, সেটা নির্বিঘ্নে দেখে বেরিয়ে আসতে পারবে অরিত্ররা।

সত্যি বলতে সেদিন অফিসারের কথা শুনেই এই রিচুয়ালটার প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল অরিত্রর। শুধু অরিত্রর বললে ভুল হবে, দিশানি, সৌরভ, ওদেরও আকর্ষণ ছিল খুব। আর হবে না-ই বা কেন! এই ডিঙ্গিরি হিজড়েদের এতই গোপন একটা উৎসব যে এখানে সাধারণ কোনো মানুষের প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ! এমনই সেই উৎসবের ভয়াবহতা যে সারা গাঁয়ের মানুষ এই উৎসবের দিন আঁধার হতে-না হতেই ঘরের বাইরে আর পা রাখে না। দুয়ার এঁটে ভয়ার্ত মূষিকের মতো লুকিয়ে থাকে যে যার নিজেদের গর্তে। ভাবা যায়!

শুধু তা-ই নয়! এই হিজড়েদের উপাস্য দেবী কাইতি মা নাকি ভীষণ ভয়ংকর। তাঁর নাম এ গাঁয়ের লোক আঁধার নামলে মুখে পর্যন্ত নেয় না। অথচ এই দেবীকে দেখতে

[illegible]ন, কী এঁর বৃত্তান্ত, কোথায় এঁর মন্দির—এসব সম্পর্কেও খোলসা করে কিছু বলে না। অফিসার রায় তো সেদিন মুখের ওপর চলে যেতেই বলে দিলেন এখান থেকে। হোমস্টের [illegible] কাম কেয়ারটেকার মশাইও এ ব্যাপারে বিশেষ আলোকপাত করতে পারলেন না। অন্যদিকে গাঁয়ের লোককে গত দু-দিন বহুবার জিজ্ঞেস করেও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। অধিকাংশই 'কাইতি মা' এবং 'ডিঙ্গিরি' শব্দ দুটো শোনামাত্র কানে হাত চাপা দিয়ে কী একটা ফিসফিস করতে করতে পালিয়েছে।

শুধু গাঁয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে এক বহু পুরোনো পিরবাবার মাজারে এক বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ইমামকে পাওয়া গেল। তাকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে জানা গেল যে এই হিজড়েরা নাকি ওইদিন রাতে লাল শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে গান গাইতে গাইতে কোথাও একটা যায়। ব্যাস, এর বেশি কিছু বলতে তিনি একেবারেই রাজি হলেন না। যদিও অরিত্রদের যেটুকু প্রয়োজন ছিল তা অবশ্য ওদের জানা হয়ে গেল।

"আআআআ" প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারের শব্দে হাঁটতে হাঁটতেই ভীষণরকম চমকে উঠল অরিত্র। উফ! কী ভয়ংকর! কোথা থেকে ভেসে আসছে এই বীভৎস চিৎকারের শব্দ! ঠিক যেন কারও গায়ে আগুন লেগেছে... শরীরের চামড়া একটু একটু করে পুড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে চিৎকার করছে পাগলের মতো। কিন্তু কোথা থেকে ভেসে আসছে এই চিৎকার!

বেশি খুঁজতে হল না অরিত্রকে। তার আগেই সৌরভ হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাল পালকিটার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই অরিত্রর বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধক করে উঠল। কী আছে ওই পালকিটার ভেতর? কে চিৎকার করছে এমন বীভৎসভাবে! কী হয়েছে তার? আর কী অদ্ভুত এই হিজড়েদের দল! পালকির ভেতর দিয়ে যত ভেসে আসছে সেই প্রচণ্ড হাহাকারের শব্দ, তত এদের হাসি যেন মুহুর্মুহু বৃদ্ধি পাচ্ছে। খোল-করতাল, হাততালির শব্দে আঘাত পেয়ে পালকির ভেতরকার সেই আর্তনাদ যেন আরও আরও ছড়িয়ে পড়ছে দুর থেকে দুরান্তে!

"গায়ে আগুন লাইগছে গো, বড়োমায়ের গায়ে আগুন লাইগছে! পুরোনো ডিইঙ্গা জ্বইলেপুইড়ে খাক হয়ে যাবে! আরও জোরে বাজা, আরও জোরে বাজা! মায়ের গায়ে আগুন ধইরছে র‍্যা... আগুন!" কুক্কুরী মা তালি দিতে দিতেই আবারও চেঁচিয়ে ওঠেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বের থেকে বহুগুণ জোরে রণোন্মত্ত হস্তিনীদের মতো গর্জে ওঠে হিজড়েদের খোল-করতাল। ফের সমবেত কণ্ঠে তারা গান ধরে—

"যা কিছু পুরানো মা গো, পুড়াইয়া ফেলিলা
বংশ খাইলি, জাতি খাইলি, কিছু না বাদ দিলা,
এমনই বিষ কালনাগিনির নিজের ডিঙাও খাস
বছর বছর নতুন নতুন কচি ডিঙা চাস
ডিঙা নাও নাও নাও, ডিঙা নাও নাও নাও
নতুন ডিঙা চইড়া মা গো বিপদ কাটাও...
ডিঙা নাও নাও নাও, ডিঙা নাও নাও নাও..."

কী এই ডিঙা! কেনই বা কাইতি মা-র প্রতি বছর বছর লাগবে নতুন নতুন কচি কচি ডিঙা? এই গানের আসল মানে কী—ওই অরিত্র যখন এসব কথা ভাবছে, হঠাৎ ও খেয়াল করল, হিজড়েদের দলটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ও গ্রাম থেকে বহু দূরে চলে এসেছে। এখন তারা যে পথে যাচ্ছে, সেই পথটি যথেষ্ট বন্ধুর, কখনও চড়াই, কখনও উতরাই... খুব সম্ভবত কোনো পাহাড় বা টিলার পাদদেশ। এখানে চারিদিকে গাছগাছালির ঝোপও যথেষ্ট বেশি।

একসময় হাঁটতে হাঁটতেই আচমকা অরিত্রর গায়ে কোথা থেকে দু-এক ফোঁটা জল এসে পড়ল। তারপরেই এক মুহূর্তের জন্য মাথার ওপরে আচমকাই হাজার ওয়াটের বিজলি বাতি জ্বলে উঠল যেন। আর সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখা গেল, সামনে কিছু দূরেই অন্ধকারের মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড গুহার মুখ। গুহাটাকে দেখেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিউরে উঠল অরিত্রর। ওর কেন জানি না মনে হল গুহাটা আসলে প্রকাণ্ড একটা জীব, ক্ষুধার্ত শিকারির মতো মুখ হাঁ করে বসে আছে, শিকার কখন নিজে পায়ে হেঁটে তার মুখের ভেতর ঢুকবে, সেই অপেক্ষায়। কোনোভাবে এই হিজড়েরা কি এই গুহার ভেতরেই...

অরিত্রর আশঙ্কাই সত্যি হল। হিজড়েদের দল ওই গুহার ভেতরেই ঢুকে যেতে লাগল এক-এক করে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আচমকা ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। আর তার সঙ্গেই খুব সামনেই কোনো গাছে প্রচণ্ড শব্দ করে বাজ পড়ল একটা। দলের পেছনে থাকা হিজড়েরা এবার দৌড় দিল সামনের দিকে, তাদের দেখাদেখি অরিত্রও দৌড়োল গুহার ভেতর।

গুহার ভেতর পা দেওয়ামাত্রই অরিত্রর সারা শরীরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যেন। কেন জানি না ওর মনে হল, এই গুহার মধ্যে কিছু একটা আছে। এমন কিছু যা ঠিক স্বাভাবিক নয়, এমন কিছু যা শুধু অনুভূতি দিয়ে

বোঝা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। গুহার ভেতর হাঁটু অব্দি জল। সেই জল ভেঙেই হিজড়ের দল এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। তাদের গান আপনা থেকেই থেমে গেছে অদ্ভুতভাবে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে, অত্যন্ত ধীরপায়ে তারা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। কোথাও কোনো আলো নেই, শুধু একটানা ভেসে আসছে গুহার ভেতর জলে ছপাং ছপাং শব্দ। গুহার ভেতর একটু দূরে এগোনোমাত্রই বাইরের বৃষ্টির আওয়াজও স্তিমিত হয়ে এল। অরিত্রর মনে হল, এই প্রাচীন আদিম গুহা ঠিক ওদের মতোই যেন বহির্বিশ্বের সমস্ত শব্দ হজম করে নিল নিমেষেই।

যত দূর চোখ যায় শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। তার মধ্যে দিয়েই একদল ছায়াশরীর প্রায় নিঃশব্দে একহাঁটু জল ভেঙে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। অরিত্র সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এক-দুবার পাশে সৌরভকে ফিসফাস আওয়াজ দিল বটে, কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর এল না। সৌরভ ওর সঙ্গে আদৌ চলছে তো? নাকি দৌড়োনোর সময় ও আলাদা হয়ে গেছে সৌরভের থেকে! এই প্রথম অরিত্রর বুকের ভেতরটা কেমন যেন টিপটিপ করতে লাগল। কেমন যেন ওর মনে হতে লাগল, আজকে এই বৃষ্টিমুখর ঝড়বাদলার রাতে হিজড়েদের এই গোপন উৎসবে বোধহয় না এলেই হত!

হঠাৎই এক জায়গায় এসে সব হিজড়ে এইবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পরের মুহূর্তেই অরিত্রর থেকে কয়েক হাত দূরে উঁচুমতো একটা টিলার ওপর দপ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। সেই মশালের আলোয় দেখা গেল, ওরা গুহার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

একই সঙ্গে মশালের আলোয় অরিত্র খেয়াল করল, সমগ্র গুহার গায়ে খোদাই করা আছে অদ্ভুত বিকট সব ছবি। কোথাও একটা সাপ নিজেই নিজের ল্যাজ কামড়াচ্ছে, কোথাও একটা বিকট চারপেয়ে জন্তু মুখে দড়ির মতো কী একটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা একসঙ্গে অনেকগুলো হাত, যেগুলোর একটাতেও আঙুল নেই! ছবিগুলো কেমন ঠিক শিল্প সুষমাপূর্ণ নয়। বরং বেশ ভয়ংকর, কিছু ক্ষেত্রে বীভৎসও। এসব ছবির মানে কী! গুহার গায়ে এরকম ছবি আঁকলই বা কারা?

গুহার শেষ প্রান্তে সেই উঁচু সমতল টিলার মতো জায়গায় পালকিখানা নামানো হয়েছে। তার একদিকে দাঁড়িয়ে আছে কুক্কুরী মা, অন্যদিকে শর্মিলা! পালকিটার সামনে অতন্দ্র প্রহরীর মতো চার পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুক্কুরী মায়ের কন্যা, ভ্রমর। মশালের আলো তার চোখের কোণে পড়ায় এই অন্ধকারে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে স্বচ্ছ মণির মতো।

বাকি হিজড়েরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে টিলার নীচে জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। ঘোমটার ভেতর দিয়ে সকলের কৌতূহলী চোখ স্থির হয়ে আছে পালকিটার ওপর। কারণ পালকিটা এই মুহূর্তে প্রচণ্ড কাঁপছে। সেটাকে দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন তার ভেতরে কোনো ভয়ংকর হিংস্র জন্তুকে বেঁধে রাখা হয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে পালকি থেকে বেরিয়ে সেটা ঝাঁপিয়ে পড়বে নীচে এই হিজড়াদের ওপর।

"অ তাম্বুলী, একুশখান খোরাকি লাইন দিয়ে দাঁইড় করা দিকিনি। কাইতি মা নিজে এদের মধ্যে থেকে নতুন ডিঙা বেছে নেবেন।" কুক্কুরী মা মশাল হাতে গর্জে উঠল।

একুশখান খোরাকি মানে কি একুশজন নতুন হিজড়ে, যাদের বিভিন্ন শহর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে! আর কাইতি মা এদের মধ্যে থেকে পরবর্তী ডিঙা বেছে নেবেন মানে? একেকজন মানুষই কি একেকটা ডিঙা নাকি প্রত্যেকটা মানুষের...

কথাগুলো ভাবছে, ঠিক এমন সময় নিজের হাতে একটা টান অনুভব করল অরিত্র। আর তার পরের মুহূর্তেই ও দেখল, একটা ঘোমটা-দেওয়া লম্বাটে হিজড়া ওকে টানতে টানতে সামনের একটা সারিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু কী অদ্ভুত! ও তো হিজড়ে নয়। ও তো সাধারণ মানুষ। ও এই সামনের সারিতে এসে দাঁড়াবে কেন? এদের নিশ্চয়ই চিনতে কোনো ভুল হচ্ছে... আর এই সামনের সারি। এ কী! এই সারিতে তো ঠিক ঠিক একুশজনই দাঁড়িয়ে। তার মানে এটাই সেই কাইতি মা-র একুশটা খোরাকির লাইন... কিন্তু এর মধ্যে অরিত্র দাঁড়াতে যাবে কেন! অরিত্র তো এদের কেউ না! কী করবে এরা অরিত্রর সঙ্গে? এই মুহূর্তে অরিত্রের মনে হল, ওর হৃৎপিণ্ডটা বুঝি প্রচণ্ড আতঙ্কে এক্ষুনি ফেটে গিয়ে বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে!

অরিত্র আর কিছু ভেবে ওঠার আগেই কুক্কুরী মা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "এইবার বড়োমা আমাদের ডিঙা পাইলটাবেন র‍্যা, ডিঙা পাইলটাবেন! কী রে, কী বলিস তোরা!"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিজড়েদের দলের পেছন থেকে আবারও কয়েকটি খোল-করতাল প্রচণ্ড শব্দে ঝংকার তুলল। তাদের সেই ছন্দবদ্ধ আওয়াজ গুহার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে এমন বিকট প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করল যে অরিত্রর মনে হল, এই গুহার ভেতর বহুকাল ধরে বন্দি অতিকায় প্রাচীন কোনো জীব এইবার বুঝি তার নিদ্রা ভঙ্গ করে জেগে উঠবে! এর

পরক্ষণেই কুক্কুরী মা বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, "সবাই মন দিয়ে শোন, কাইতি মা কী বলে...

"এই শরীর হইল ডিঙা আর কাম হইল নদী
কোন ডিঙাতে কে চড়িবে নিজের নিজের মতি
এক ডিঙাতে জন্ম যাদের, আরেক ডিঙায় ঘর
কাইতি মা-র আশীর্বাদ তাদের উপর..."

এ কথা শোনামাত্রই হিজড়েরা একসঙ্গে উলুধ্বনি দিতে দিতে আনন্দে নাচতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে, এ ছড়ায় কাইতি মা-র হিজড়েদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণের কথা বলা হচ্ছে। এর ঠিক পরক্ষণেই কুক্কুরী মা আবার চিৎকার করে উঠল,

"এ জগতে যতেক কোতি ডিঙা বদলাবি,
কাইতি মা-র আশীর্বাদ মাথার উপর পাবি।
কেবল বছর বছর নতুন ডিঙা কাইতি মারে দিস,
টঙ্কা কড়ি চিপটি ছ্যাদা যাহা ইচ্ছা লিস
যে কোতি কাইতি মারে ডিঙা সমর্পিবে
আর জনমে রাজকুমারী হইয়া জন্মিবে!"

আবারও সমস্ত হিজড়ে তাদের স্বভাবসিদ্ধ তালি বাজাতে বাজাতে উলুধ্বনি দিতে লাগল।

এরপরেই আচমকা কুক্কুরী মা নিজের হাত শূন্যে তুলে সকলকে থামতে বললেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আওয়াজ থেমে গেল। গুহার ভেতর নেমে এল দম-বন্ধ-করা নিস্তব্ধতা।

এইবার মশালের আবছা আলোয় অরিত্র খেয়াল করল, পালকির ভেতর থেকে ক্রমশ একটা আবছায়া কালো মূর্তি হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। ক্রমে ক্রমে মূর্তিটি মশালের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অরিত্র অনুভব করল, ওর সারা শরীরে ভয়ংকর কাঁপুনি আরম্ভ হয়েছে। ঠিক পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই ও প্রায় ঠকঠক করে কাঁপছে। আর কাঁপতে কাঁপতে বিস্ময়ে, ভয়ে, বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে সামনের টিলার দিকে।

ও...ওটা কী। ও...ওটা কি কোনো মানুষ নাকি অন্য কিছু! সারা শরীরের চামড়া এখানে-ওখানে খোবলানো, শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাংস প্রায় ঝুলে পড়েছে, মাথার দু-ধারে রুক্ষ চুল, মাঝখানে দীর্ঘ টাক, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লাল কশ... আর সবচেয়ে অদ্ভুত গাঢ় সবুজ রঙের দুটি চোখ! এই কি তবে কাইতি মা! নাকি এই সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে-থাকা একুশজনের মতো এ-ও ছিল কোনো সাধারণ মানুষ। যদি তা-ই হয়, তবে এমন হাল হয়েছে কী করে এর! তবে কি...

অরিত্র আর কিছু ভেবে ওঠার আগেই জীবটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দুই হাতে জোরে জোরে তালি বাজাল। তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভয়ংকর ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো টিলার ওপর থেকে ঝাঁপ মারল জলের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবে সামনে দাঁড়ানো একুশজন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। আর এর ঠিক কয়েক সেকেন্ড পরেই শোনা গেল ওই লাইনেরই একজন হিজড়ার প্রচণ্ড চিৎকার, "ছাড়ো... ছাড়ো... আমায় ছেড়ে দাও... আআ... ছেড়ে দাও আমার পা..."

সঙ্গে সঙ্গে গুহার মধ্যে আবার খোল-করতাল বেজে উঠল সজোরে। কুক্কুরী মায়ের কুকুরটিও বিকট শব্দ করে ডেকে উঠল টিলার ওপর থেকে। শর্মিলা এবার ভাবলেশহীন মুখে ওই ঘোমটা-দেওয়া হিজড়েটিকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল টিলার নীচে। তারপর শাড়ির আঁচল থেকে বের করে আনল একটা ছোটোখাটো জিনিস। মশালের ক্ষীণ আলোতেও জিনিসটাকে দেখে গলার ভেতরটা কেমন শুকিয়ে গেলে অরিত্রর। জাঁতি! সুপুরি কাটবার জাঁতি! কিন্তু ওটা দিয়ে কী করবে শর্মিলা?

"অ শর্মিলি, কাইতি মা নিজের ডিঙি বেইছে নিয়েছেন যে। দাইড়ে রইলি ক্যান! এইবার মা-কে ডিঙার আঙুল উৎসর্গ কর! তারপর তো মা ডিঙায় ঢুইকবে।" অত্যন্ত আমোদের সঙ্গে কথাগুলি বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল কুক্কুরী মা।

শর্মিলা এবার সেই একই রকম ভাবলেশহীন মুখে হিজড়েটির হাতের পাতাটা টেনে ধরল। তারপর অস্বাভাবিক দ্রুততায় একেকটা আঙুলের ওপর সজোরে বসিয়ে দিতে লাগল ধারালো জাঁতিখানা।

"আআআআ" বীভৎসভাবে চিৎকার করে উঠল হিজড়েটি। তার হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটে এসে লাগল শর্মিলার মুখে, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আঙুলগুলো এক-এক করে খসে পড়তে লাগল মাটিতে। সব ক-টা আঙুল কাটার আগেই হিজড়েটির শরীর কাঁপতে কাঁপতে লুটিয়ে পড়ল নীচে। আর এর ঠিক পরেই অরিত্র দেখল, জলের থেকে এইবার অত্যন্ত ধীরে ধীরে ডাঙায় উঠে এল সেই জীবটা। তারপর সরীসৃপের মতো হামাগুড়ি দিতে দিতে সেই আঙুলগুলোর কাছে গিয়ে বুভুক্ষুর মতো মুখের ভেতর পুরে নিতে লাগল সেগুলো। পুরো দৃশ্যটা দেখে অরিত্র সারা শরীর গুলিয়ে উঠল যেন, মনে হল, এক্ষুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে এখানে।

ঠিক এই সময় আচমকাই পেছন থেকে এক নারীকণ্ঠের উচ্চ চিৎকার শোনা গেল। ঠিক যেন কোনো ভয়ংকর কিছু দেখে চিৎকার করছে সে। সমস্ত গুহা মুহূর্তে নিঃশব্দ হয়ে গেল। তার পরের মুহূর্তেই শোনা গেল আরও দু-তিনটে কণ্ঠ, "চুপ করো দেবযানীদি, ওরা আমাদের ধরে ফেলবে!"

"বাইরের লোক! ডিঙ্গিরির ভেতরে বাইরের লোক!" কয়েক মুহূর্ত যেন পাথরের মতো স্থবির হয়ে গেলেন কুক্কুরী মা। তারপর দ্বিগুণ আক্রোশে প্রায় পাগলের মতো নিজের মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "কোন হারামজাদি বোকাচুদি ডিঙ্গিরিতে ঢুইকেছিস র‍্যা... সব্বনাশ হইয়ে গেল... ডিঙ্গিরি অশুদ্ধ হইয়ে গেল! এইবার কী হবে! বাইরের মানুষ এইলে ডিঙ্গিরি যে অশুদ্ধি হইয়ে যায়, আর উৎসব অশুদ্ধি হলে কাইতি মা যে নতুন ডিঙায় ঢুইকতে পারেন না। তখন তিনি পরিণত হন..."

কুক্কুরী মা কথা শেষ করার আগেই তাম্বুলীর হাতে ধরা মশালটা দপ করে নিভে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অরিত্র অনুভব করল, সমস্ত গুহার ভেতরটা ক্রমশ বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর তার সঙ্গেই গুহার ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে একটা বিকট দুর্গন্ধ। কয়েক মুহূর্ত যে যার জায়গায় পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই হঠাৎ গুহার মধ্যে অন্ধকারেই জলের মধ্যে থপথপ আওয়াজ শোনা গেল। এরপর আচমকাই একটা হিজড়ের তালির আওয়াজ, আর তারপর সারা গুহার ভেতর অত্যন্ত ধীর লয়ে ছড়িয়ে পড়ল একটা হিসহিসে কর্কশ কণ্ঠস্বর, "কে আমায় ডাকলি র‍্যা? কার হল র‍্যা? কার হল? তোর হল!"

এরপর চারিদিকে প্রচণ্ড চিৎকার... অন্ধকারে জলের ওপর ছপাং ছপাং শব্দ... সবাই গুহার বাইরের দিকে পালাচ্ছে... অরিত্রও দৌড়োচ্ছে প্রাণপণে... কেউ একটা পড়ে গেল জলের মধ্যে... তারপর একটা বীভৎস চিৎকার... গুহার বাইরের দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে অরিত্রর কেন জানি মনে হল, যে হিজড়েটির বীভৎস যন্ত্রণাকাতর কান্না এই মুহূর্তে গুহা থেকে ভেসে আসছে, সেই হিজড়েটির বুকের ওপর এই মুহূর্তে বসে আছে এক ভয়ংকরদর্শন বুড়ি হিজড়া! ভয়ংকররকম গা-ঘিনঘিনে হাসি হাসতে হাসতে সে এখন তার শিকারের হাতের আঙুল কুচ কুচ করে কেটে ফেলছে ধারালো জাঁতির কামড়ে আর তারপর পরম তৃপ্তির সঙ্গে তা ঢুকিয়ে দিচ্ছে মুখের ভেতর...

অরিত্র জানে এই বুড়ি হিজড়া আর কেউ নয়, স্বয়ং এই হিজড়েদের দেবী কাইতি মা!

// ৪ //

"Where is Elio?"

"অরিত্র কোথায়, সাবর্ণদা? ও তো এই গুহাতে নেই!" গুহার স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের গায়ে সৌরভের কথাগুলো যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে ফিরে আসতে লাগল। "কাল রাত থেকে অরিত্র বাড়ি ফেরেনি। আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের ধারটায় কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলাম কাল রাতে, তা-ও ও এল না। আপনারা বললেন, ও নিশ্চয়ই হোমস্টেতে ফিরে গেছে। কিন্তু সেখানে গিয়েও দেখলাম নেই। আমি কাল রাতেই এই গুহায় ফিরে আসতে চেয়েছিলাম। আপনারাই আসতে দিলেন না। কেন দিলেন না বলুন। কেন দিলেন না! আজ সারা সকাল গড়িয়ে গেল। এই দুপুরবেলা কি এখানে এসে কোনো লাভ হবে!"

"আঃ সৌরভ। পাগলামি কোরো না। মাথা ঠান্ডা করো। তোমার মনে হয়, কাল রাতে এ গুহায় তোমার ফেরা উচিত ছিল? তুমি দেখলে না কাল এখানে কী হল। পালকি থেকে যেটা বেরিয়ে এল... মাই গুডনেস! হোয়াট ওয়াজ দ্যাট! আমার এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমি পইপই করে বারণ করেছিলাম তোমাদের। এসব হিজড়েদের রিচুয়ালে আসতে হবে না। তোমরা সব বেশি পাকা, কেউ আমার কথা শুনলে না..." সাবর্ণদা মোবাইলের আলোয় গুহার অন্ধকার দেওয়ালের ওপর খোদাই-করা আঁকাগুলো দেখতে দেখতে বলল কথাটা।

বাইরে এখন দুপুর গড়িয়ে ক্রমশ বিকেল নামছে হিজড়িয়া গাঁয়ের বুকে। বর্ষাকালে যেমন হয়, দুপুর থাকতে থাকতেই আকাশ কালো করে এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে, আজও জোর ঝড়বৃষ্টি হবে। গুহার মুখ থেকে বাইরের যেটুকু আলো ভেতরে এসে পৌঁছোচ্ছে, তাতে গুহার ভেতরে টলটলে কালো জল আর দুই ধারে বিশাল উঁচু দেওয়াল দুটি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না প্রায়।

"একটা স্ট্রেঞ্জ জিনিস খেয়াল করেছ সৌরভ? গুহার গায়ে এই ছবিগুলোর একটা ক্রোনোলজি আছে। আই গেস, এই ছবিগুলো কোনোরকম গল্পকে তুলে ধরছে। এই দ্যাখো এই ছবিটা... একটা মেয়ে নাচছে... তার পরের ছবিটায় মেয়েটা কিছু একটা পান করছে... এই চারপেয়ে জন্তুটার ছবিটা দেখেছ? এটা কী হতে পারে বলো তো? মুখে সরু দড়ির মতো কিছু একটা ধরে আছে..."

সাবর্ণদার কথা শেষ করার আগেই অরিত্র চেঁচিয়ে উঠল, "ওই তো! ওই তো সেই টিলাটা! এইখানটায় তো কালকে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওই দেখুন, পালকিটা এখনও রাখা আছে টিলাটার ওপরে।"

সৌরভের কথায় সাবর্ণদার হুঁশ ফিরল। দেখতে দেখতে গুহার অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে ওরা। একেবারে প্রায় শেষ প্রান্তে। পেছনে গুহামুখ আর দেখা যায় না। ওদের হাতে দুটো মোবাইলের টর্চের আলো ছাড়া গুহার ভেতর কোনো আলো নেই। একেবারে নিকষ অন্ধকার। সাবর্ণদা একটা ঢোঁক গিলল। কে জানে কেন ওই টিলাটার ওপর রাখা পালকিটা দেখে আজকেও ওঁর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

"সৌরভ, আ...আমার মনে হয়, এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে না। বাড়িতে দেবযানী অসুস্থ, কাল রাতে ফেরার পর থেকেই বমি করছে। দিশানি আছে, কিন্তু ওর শরীরও ভালো না বলল। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। অরিত্র এখানে নেই। থাকলে তো আমরা দেখতেই পেতাম, বলো!"

"অরিত্র... এখানে... নেই... অরিত্র এখানে নেই..." মনে মনে কথাটা কয়েকবার যেন বিড়বিড় করল সৌরভ। তারপর আচমকাই চিৎকার করে উঠল, "অরিত্র যদি এখানে না থাকে তাহলে ও কোথায়, সাবর্ণদা? ও এখানে নেই, বাড়িতে নেই, জঙ্গলে নেই... তাহলে ও কোথায়! রাতারাতি তো একটা মানুষ হাওয়ার মতো উবে যেতে পারে না। নাকি... নাকি আপনি বলতে চাইছেন..."

সৌরভের মুখের ভঙ্গি ক্রমশ পালটে যাচ্ছে। টর্চের আলোয় ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে একটা দম-বন্ধ-করা অস্বস্তি, ঠিক যেন এমন কিছু ও বলতে চলেছে, যা ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চায় না।

"আপনি কি বলতে চাইছেন সাবর্ণদা... কালকে এই গুহা থেকে বেরোবার সময় যার আওয়াজ আমরা শুনলাম, ও...ওটা আমাদের অরিত্র ছিল! আ...আপনি কি বলতে চাইছেন অরিত্র আর বেঁচে নেই?" সৌরভের কথা শেষও হয়নি, আচমকাই সাবর্ণদা একটা বিকট শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই ওর মোবাইলটা ছপাৎ করে পড়ে গেল জলের মধ্যে। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে উত্তেজিত স্বরেই সাবর্ণদা এবার চেঁচিয়ে বলল, "সৌরভ! সৌরভ আমার পা... কে যেন জলের তলায় আমার পা চেপে ধরেছে। আ...আমি ছাড়াতে পারছি না..."

কয়েক মুহূর্ত সৌরভ যেন বোকার মতো চেয়ে রইল সাবর্ণদার দিকে। কী করা উচিত, কিছুই যেন বুঝতে পারল না ও। তার পরের মুহূর্তেই দৌড়ে গিয়ে সাবর্ণদার পায়ের কাছে টর্চ মারল সে। কালো জলের তলায় কী আছে, কিছুই বোঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবেই জলের হাত ঢুকিয়ে দিল সৌরভ। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা নরম একগোছা চুলের মতো কী যেন হাতে ঠেকল ওর।

সেটা ধরে টান দিতেই জলের ওপর উঠে এল একটা আস্ত মানুষের মাথা! টর্চের আলো তার ওপর পড়তেই দেখা গেল মুখটা অস্বাভাবিক ক্ষতবিক্ষত, ঠিক যেন কেউ আঁচড়ে-কামড়ে ফালাফালা করে দিয়েছে সেটা। শুধু চোখদুটো অক্ষত রয়েছে। সে দুটো স্থির হয়ে আছে ওপরের দিকে। দু-চোখেই বাসি মড়ার মতো ঘোলাটে দৃষ্টি।

"ওরে বাবা!" সৌরভ প্রচণ্ড আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে হাত থেকে ছেড়ে দিল জিনিসটা। সাবর্ণদাও একলাফে সরে এল জিনিসটা থেকে। তারপর নিচু হয়ে পায়ের থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কী একটা যেন ছাড়িয়ে নিল সে।

"ক...ক...কালকের হিজড়েদের দলের কেউ! মুখটা দেখলে? ওটা অরিত্র না কিন্তু... কাল যার আঙুল কাটা হল, সে-ও নয়... মনে হয় অন্য কোনো হিজড়ে... কাল পালানোর সময় যার আওয়াজ শুনলাম। ওর শাড়িতে আমার পা-টা আটকে গিয়েছিল..."

কথাটা শেষ করার আগেই গুহার মধ্যে একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ পাওয়া গেল। আর তার পরের মুহূর্তেই সৌরভ আর সাবর্ণদা খেয়াল করল, টিলার ওপর থাকা পালকিটা খুব ধীরে ধীরে কাঁপছে। ঠিক যেন ওটার ভেতরে বসে কিছু একটা জিনিস অতি সন্তর্পণে ওদের ওপর নজর রাখছে।

"সৌরভ পালাও! আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক না!"

সাবর্ণদা কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পালকিটা সজোরে একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। ঠিক যেন ওটার ভেতরে যে ছিল, সে বেরিয়ে আসবার জন্য প্রস্তুত হল। পালকিটার দিকে এবার টর্চের আলো পড়তেই পালকির ভেতরে একজোড়া হিংস্র চোখ দাবানলের মতো জ্বলে উঠল!

"ও...ও...ওটা কী, সাবর্ণদা! প...প...পালকির ভেতর...!" সৌরভ কথা শেষ করার আগেই ডান হাতের কনুইয়ে একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল সৌরভ। তার পরের মুহূর্তেই ও বুঝতে পারল, ও দৌড়োচ্ছে। প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে। আর ওর পেছনে পালকিটা বীভৎস জোরে কাঁপছে। আর সেই প্রচণ্ড কম্পমান পালকির ভেতর থেকে ভেসে আসছে খিলখিল করে একটা কর্কশ হাসির শব্দ। ওই পালকির ভিতরে বসে উন্মাদের মতো সেই খিলখিল হাসির সঙ্গে কে যেন প্রচণ্ড

জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে। যে সে হাততালি নয়, হিজড়েদের স্বভাবসিদ্ধ হাততালি। এই হাততালির আওয়াজটা সৌরভের খুব চেনা। সেইদিন রাতে খোল থেকে ফেরার সময় যে বিকটদর্শন বুড়ি হিজড়া ওদের গাড়ির ওপর আছড়ে পড়েছিল তার হাততালির শব্দটাও অবিকল ঠিক এরকমই ছিল না?"

// ৫ //

"কালনাগিনির বিষে মা গো হইলা পিশাচিনী"

বাইরে এখন সকাল না রাত্তির বোঝা দায়। ঠিক কতক্ষণ যে এই ঘুপচি ছোটো ঘরটায় বন্দি হয়ে আছে অরিত্র, তারও কোনো ঠিক নেই। একরাত, একদিন নাকি তারও বেশি! কে জানে! ও শুধু জানে, ও একটা জালের মধ্যে আটকে পড়েছে। এমন একটা জাল, যেখানে ওর জড়ানোর কথাই ছিল না। এমন একটা জাল, যা কেটে বেরোনো এখন ওর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

মাথায় যন্ত্রণাটা বড্ড বেড়েছে। খুব সম্ভবত ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল ওকে, তারপর অচেতন অবস্থায় এই ঘরে এনে হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রেখে গেছে। ঠিক যেমন বাকি উনিশজনকে রাখা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই এখনও অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। কয়েকজনের সদ্য জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু তারাও এখন অরিত্রর মতোই বোঝার চেষ্টা করছে যে কাল রাতে ঠিক কী হয়েছিল ওদের সঙ্গে।

অরিত্র নিজের মাথায় একটু জোর দিল। সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমার দৃশ্যের মতো ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল কিছু দৃশ্য। একটা অন্ধকার গুহা, হিজড়েদের সেই ভয়ংকর উৎসব, দেবযানীদির চিৎকার, তারপর সব অন্ধকার... জলের মধ্যে ছপাৎ করে শব্দ, কী একটা জিনিস যেন ওর পা আঁচড়ে ধরল... তারপর দৌড় দৌড় দৌড়... সৌরভ, দিশানি সব কোথায় হারিয়ে গেল... চারিদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে... মেঘ ডাকছে... অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতেই কী একটা ভারী জিনিস মাথার পেছনে এসে লাগল... ব্যাস, তারপর সব অন্ধকার... সবটা...

"তুমি এখানে! তুমি সেদিন আমায় খোল থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলে না?" হঠাৎই পাশ থেকে ফিসফিস করে একটা শব্দ ভেসে আসায় চমকে উঠল অরিত্র। তারপর কোনোমতে অত্যন্ত কষ্টে পাশের দিকে ঘাড় ফেরাতেই অবাক হয়ে গেল ও। আরে, এটা সেই ছেলেটা না! যাকে ওরা সেদিন বাঁচাতে গিয়েছিল! ছেলেটা ওকে ঠিক চিনতে পেরেছে। কী করবে এখন অরিত্র... মিথ্যে বলবে? কিন্তু মিথ্যে বলেও কী লাভ? ছেলেটা তো ওকে ধরিয়েই দেবে। আর যা-ই হোক, হিজড়েদের এই উৎসব নষ্ট তো হয়েছে অরিত্রদের জন্যই!

"ভয় নেই। আমি কাউকে বলব না। আমি তোমাকে কালকেও দেখেছি ওখানে... তোমার বন্ধুদেরও... আমি সুযোগ পাইনি, নইলে তোমাদের সাবধান করে দিতাম... তুমি যে কালকে ভুল করে খোরাকির লাইনে চলে এসেছিলে তা-ও খেয়াল করেছিলাম।", ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অরিত্র আজ আরও ভালো করে একবার দেখল ছেলেটিকে। কালকের ওই ঘটনার পর ছেলেটির মুখ যেন আরও শুকনো দেখাচ্ছে। অরিত্রও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী গো?"

"চিতু। আগে নাম ছিল চিত্ররথ। দীক্ষে নেওয়ার পর আমার গুরুমা নাম দিলেন চিত্রা। সবাই চিতু বলেই ডাকে।"

"আমাদের এখানে এভাবে কেন আটকে রেখেছে বলো তো? কী করবে ওরা আমাদের সঙ্গে?" অরিত্রর কথায় চিতুর মুখটা যেন কিঞ্চিৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কোনোমতে মিনমিন করে ও বলল, "জানি না... তবে যা-ই করুক, ভালো কিছু করবে না... এদের খোলের নিয়মকানুন সব আলাদা।" কথাটা বলে অরিত্রর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল চিতু। তারপর বলল, "আমার ধারণা, আমাদের যে একুশজনকে খোরাকি দেওয়ার কথা ছিল, তার মধ্যে যাকে বড়োমা ডিঙা হিসেবে বাছল, সে ডিঙা হতে গিয়েই মারা গেছে। আর আরেকজনের জায়গায় তুমি ভুল করে চলে এসেছিলে। তুমি যার জায়গায় ভুল করে এসেছিলে, সেই হিজড়েটাই কালকে মারা গেছে বড়োমার কোপে। ওর চিৎকারই আমরা গুহার থেকে পালাবার সময় শুনতে পেয়েছিলাম। ওর বদলেই ওরা ভুল করে তোমায় এখানে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা বোধহয় ভেবেছে, যার আঙুল কাটা হল, তার ওপরেই বড়োমার কোপ পড়েছে। সেইদিক দিয়ে ওদের হিসেবে এখানে কুড়িজন থাকার কথা। কুড়িজনই আছে।"

"আমি কালকে খোরাকির লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, বুঝলে কী করে?" অরিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

"কেন! তুমি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলে তো। তোমার

হাত দেখা যাচ্ছিল। তোমার হাতের আংটিটা দেখেই চিনতে পেরেছি। সেইদিন আমার মাথায় হাত বোলানোর সময় আংটিটা খুব ভালো লেগেছিল।"

অরিত্র একটু যেন বিস্মিত হল। তারপর বলল, "এরা কী চায় বলো তো!"

"জানি না। কিন্তু কালকে রাতের উৎসব সফল হয়নি, এটুকু শুনেছি। অনুষ্ঠানে অশুদ্ধির জন্য বড়োমা ডিঙা পাননি। কালনাগিনির বিষ এবার মাথায় চড়বে... গানটা শোনোনি? আমার মনে হচ্ছে, বড়ো কোনো বিপদ ঘটতে চলেছে..."

আরও কী সব যেন খুব নিম্নস্বরে বলল চিতু। যদিও অরিত্র সেসব কিছুই শুনতে পেল না।

ও ফের জিজ্ঞেস করল, "বড়োমা মানে তোমাদের কাই...?"

'কাইতি মা' সম্পূর্ণ শব্দটা শোনার আগেই সর্বাঙ্গ যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল চিতুর। একটা অজানা আতঙ্কে শিকল-বাঁধা অবস্থাতেও ওর শরীর কাঁপতে লাগল। ঠিক যেন এক বালতি বরফ কুচি ওর চামড়ার ওপর কেউ ঢেলে দিয়েছে।

"শশশ্... চুপ... ওই নাম কখনও মুখে আনতে নেই।" চিতু ফিসফিস করে বলতে লাগল, "বড়োমা বলে ডাকতে হয়। ওই নামে ডাকতে নেই। একমাত্র উৎসবের সময় বড়োমার পালাগান ছাড়া ওই নাম মুখে আনা পাপ। যে ওই নাম মুখে নেয়, তার ওপর বড়োমার কোপ পড়ে! যে একবার ওই নাম মুখে নিয়েছে, তার আর নিস্তার নেই, জীবনে কখনও না কখনও বড়োমা তার আঙুল নেবেনই নেবেন।"

"আঙুল! আঙুল কেন!" অরিত্রর চোখে-মুখে অদ্ভুত বিস্ময়। অরিত্রর প্রশ্নে চিতু কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর ঘরের টিমটিম করে জ্বলতে-থাকা আলোটার দিকে তাকিয়ে বলল, "সবটা জানিনে। তবে কিছু কিছু শুনেছি। বড়োমার শরীরে নাকি কালনাগিনির বিষ! মানুষের আঙুল খেয়ে তবে সেই বিষ নামে। তাই বড়োমাকে মানুষের আঙুল খোরাকি দেওয়া হয়! এ অঞ্চলে যত মানুষ মারা যায়, তাদের সবার হাতের আঙুল কেটে তবে শ্মশানে পোড়ানো হয়। ওই আঙুল বড়োমাকে উৎসর্গ করা হয় খোরাকি হিসেবে।"

"খোরাকি মানে খাবার তা-ই তো! তোমাদের বড়োমা মানুষের আঙুল খান!" কথাটা বলে ভেতরে ভেতরে নিজেই শিউরে ওঠে অরিত্র। এরপর খানিকক্ষণ ফের চুপ করে থাকে ও। একটা প্রশ্ন করা উচিত কি উচিত হবে না, ভাবতে থাকে মনে মনে। তারপর একসময় জিজ্ঞেস করে, "চিতু, তুমি কি এখানে নিজের থেকেই এসেছ? এখানে আসার আগে এত কিছু জানতে?"

চিতু নিঃশব্দে দু-দিকে মাথা নাড়ায়। অর্থাৎ না। তারপর ফের ফিসফিস করে বলে, "আমার কলকাতার গুরুমা আমায় বললেন, হিজড়িয়া গাঁয়ে যা। ওখানে নাকি হিজড়েদের অতি প্রাচীন এক উৎসব হবে খুব শিগগিরই। সেই উৎসব নাকি খুব জাগ্রত! যে দেবীকে নিয়ে এই উৎসব, তিনি আশীর্বাদ দিলে নাকি আমি আর জন্মে মেয়ে হয়ে জন্মাব। এই হিজড়ে জন্মের সমস্ত জ্বালা নাকি তক্ষুনি জুড়িয়ে যাবে। সেই কথা শুনেই এখানে এসেছিলাম! কিন্তু..."

"কিন্তু?" অরিত্র প্রশ্নটা করল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই খুব কাছেই কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল।

আর তারপরেই দুম করে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই শর্মিলা ঘরের ভেতর ঢুকল। তার পেছনে পেছনে কুক্কুরী মা ও তার আদরের নেড়ি ভ্রমর!

কুক্কুরী মা-কে দেখামাত্রই অরিত্রর বুকের ভেতরটা কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গেল। কী বীভৎস দেখতে লাগছে কুক্কুরীকে। আগের দিনের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর। একরাতের মধ্যে যেন কয়েক বছর বেড়ে গিয়েছে তাঁর বয়স। শুধু তা-ই নয়, আজ তাঁর আলুথালু খোলা কোঁকড়ানো চুল ঘাড়ের ওপর লুটোচ্ছে আর তাঁর সারা মুখে লেগে আছে লাল চটচটে তরল পদার্থের মতো কিছু। কুক্কুরী মা-কে ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে আজ। অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁর মুখ দেখলে মনে হচ্ছে, এক্ষুনি হাতের সামনে তিনি যাকে পাবেন, তারই গলা টিপে তাকে নির্দ্বিধায় খুন করতে পারেন। কুক্কুরী মায়ের পেছনে দাঁড়ানো কুকুরটা ঘরে ঢুকে অদ্ভুতভাবে সকলের গন্ধ শুঁকতে শুরু করেছে।

"খুব সাবধান! ওই কুত্তিটার হেব্বি নাক। চিনে না ফ্যালে।" চিতু ফিসফিস করে বলল।

"ও কি কুক্কুরী মায়ের পোষা?" অরিত্র ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

"পোষা না, ওটা ওর দীক্ষের দান। কুক্কুরী মা-র গুরুমা যখন ওকে এ খোলের গুরুমা বানিয়েছিল, তখন ওই কুকুর ওকে দান করে গিয়েছিল। তার আগের গুরুমা আবার তাকে দান করে গিয়েছিল এই কুকুর। এরকম আর কী। এ খোলের প্রধান গুরুমাকে এই কুকুরটাকে মেয়ে হিসেবে দত্তক নিতে হয়। সেইজন্যই এদের কুক্কুরী মা বলে ডাকে সবাই। শুনেছি এ কুত্তিটার বয়স নাকি কয়েক হাজার বছর। প্রথম কুক্কুরী মা-র আমল থেকেই ও এই খোলে আছে। সত্যি-মিথ্যে জানি না।" চিতুর কথা শুনে অরিত্র অবাক হল। বাবা! কত কিছু লুকিয়ে সামান্য নামের পেছনে। কিন্তু ব্যাপারটা ভীষণ

গাঁজাখুরি না! একটা কুকুর আদৌ কয়েক হাজার বছর বাঁচতে পারে! আর চিতু এত কিছু জানল কী করে? ও তো এই খোলে নতুন? এই খোলেরই কারও কাছ থেকে শুনেছে নিশ্চয়ই।

কুক্কুরী মা-র চিৎকারে সংবিৎ ফিরল অরিত্রর, "মুখে মুখে তক্ক করিসনে শর্মিলা! অ্যাদ্দিন ধরে চলে-আসা কাহিনি বেঠিক হতে পারেনে। আর দু-দিন পর তুই এ খোলের কুক্কুরী হবি, তোর মুকে এ কতা মানায়নে। আমার কোথাও বুইঝতে ভুল হচ্ছেনে। তুই বরং দেখ, এখানে ওদের কেউ আছে কি না! যে গুদমারানির ব্যাটাগুলোর জন্য আমাদের উৎসব নষ্ট হয়েছে, তাকে বেইর কর খুঁজে! একবার তাদের হাতে পেলে..."

কুক্কুরী মা কথা শেষ করার আগেই শর্মিলা গিয়ে গিয়ে এ ঘরের সকলের মুখ দেখতে আরম্ভ করল! আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরে হামানদিস্তা পিটতে শুরু করল অরিত্রর। ওর ক্রমশ মনে হতে লাগল, এ ঘরের ভেতরেও ক্রমশ যেন একটা ঠান্ডা হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে যেন মৃত্যু কালনাগিনির মতো সর্পিল গতিতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে... এখান থেকে পালাবার আর কোনো পথ নেই!

এসব ভাবতে ভাবতে আচমকাই অরিত্রর চুলের মুঠিতে সজোরে একটা টান পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলতেই প্রায় ভূত দেখার মতো অরিত্র দেখল, শর্মিলা তার চুলের মুঠি ধরে তার মুখের দিকেই স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখে একই সঙ্গে নৃশংসতা এবং কৌতূহল। মনে মনে সে যেন কী একটা বিড়বিড় করছে। খুব সম্ভবত সে ভাবার চেষ্টা করছে, অরিত্রকে আগে সে এই দলে দেখেছে কি না!

"ও আমাদের দলেরই শর্মিলাদি, তুমি ওকে আগেও দেখেছ।" আচমকাই পাশ দিয়ে চিতুর ফিসফিসে গলায় একরকম চমকেই উঠল অরিত্র। চিতুর কথা শুনে ভাবলেশহীনভাবে শর্মিলা আরেকবার একবার তাকাল চিতুর দিকে, তারপর ফের একবার তাকাল অরিত্রর দিকে। ওর মুখ দেখে ভেতরকার অভিব্যক্তি কিছুই বোঝা গেল না। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ডাক এল—"কী রে, পেলি?"

"না গুরুমা। নতুন কেউ নেই। সবাই পুরোনো।"

অরিত্রর চুলের মুঠি আলগা করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শর্মিলা। ওঠার সময় খুব দ্রুত চিতুর দিকে আরেকবার তাকাল শুধু। ওদের মধ্যে চোখে চোখে কোনো কথা হল কি? কে জানে!

কুক্কুরী মা এবার যেন রীতিমতো পাগল হয়ে গেলেন। নিজের হাতে নিজের খোলা চুল টানতে টানতে চিৎকার করে বললেন, "যাদের জন্য এই ডিঙ্গিরি ভেস্তে গেছে, তারা কেউ নিস্তার পাবেনে, কেউ না! যদি বড়োমার কোপ না পড়ে ওদের ওপর তাহলে আমার নামও কুক্কুরী না! শর্মিলা, এদের এখানেই আটকে রাখ আপাতত। তারপর দুজন করে করে খুপরি ঘরে চালান দিবি। সাত দিন পর যখন অনুষ্ঠান শুদ্ধ করতে হবে, তখন এসব ক-টাকে আবার কাজে লাগবে... জানিসই তো এদের কী হবে..."

কথাটা বলার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই কুক্কুরী মা-র সাধের মেয়ে অত্যন্ত বিকট স্বরে ডেকে উঠল অরিত্র আর চিতুর দিকে চেয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গেই অরিত্রর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল যেন।

"কী হয়েছে র‍্যা? চিৎকার কইরছিস কেন?" ভ্রমরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে কুক্কুরী। কুকুরটি এবার অরিত্রর দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর হিংস্রভাবে ডাকতে থাকে। এই রে! অরিত্রকে কি চিনে ফেলল তবে? এবার কী হবে?

"থাম বাপু, থাম। হয়েছে। কী আছে ওইদিকে? নতুন কেউ?" কথাটা বলতে বলতেই অরিত্রদের দিকে এগিয়ে আসছিল কুক্কুরী মা। হঠাৎই তাম্বুলী ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "সব্বনাশ হয়ে গেচে, গুরুমা। যা ভয় পেয়েচি তা-ই। গাঁয়ে কাল রাতে দুইজন মারা গেচে। দুজনেরই হাতের আঙুল কাটা। কালনাগিনির বিষ মাথায় চড়েছে গো গুরুমা... বড়োমা এবার সত্যি সত্যিই পিশাচিনী হয়েচেন!"

তাম্বুলীর কথা শুনে কুক্কুরী মা কিছুক্ষণ পাথরের মতো স্থির হয়ে রইলেন। তারপর একবার নিঃশব্দে তাকালেন শর্মিলার দিকে। চোখে চোখে কী যেন কথা হল দুজনের। তার পরের মুহূর্তেই কুক্কুরী মা চিৎকার করে উঠলেন, "দেখলি তো শর্মিলা, কী কয়েছিলাম। মিলল তো! এ কাহিনি ভুল হতে পারেনে। এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। কেউ শালা বাঁচবেনে, কেউ না। শর্মিলা, জোগাড়যন্তর কর! সাত দিনের মধ্যেই শুদ্ধি কইরতে হবে। নইলে বড়োমার অভিশেপ আর যে কোনোদিন কাটানো যাবে না। নিয়মকানুন তো সব জানিসই। ব্যবস্থা কর, ব্যবস্থা কর। আর দেরি করিসনে। আমি যাই, ওই গুদমারানির ব্যাটাগুলোকে খোঁজার ব্যবস্থা করি। ওদের না পেলে যে শুদ্ধি অনুষ্ঠান হবে না..."

নিজের মনেই আরও কী সব বলতে বলতে ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। শর্মিলাও তার পিছু নিল। শুধু ঘরের দরজায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রইল

সেই ল্যাজকাটা কুকুরটা। তার হিংস্র চোখ এখনও স্থির হয়ে আছে অরিত্র আর চিতুর দিকে। দাঁত বের করে ভয়ংকরভাবে ফোঁপাচ্ছে সে। যেন সুযোগ পেলেই দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে অরিত্রদের ওপর...

আর কিছু ভাবার আগেই চিতু কানের সামনে ফিসফিস করে উঠল, "তোমার বন্ধুদের খুঁজতে গেল। ওদের কপালে দুঃখ আছে খুব!"

"আমাদের কপালেও কি নেই?" চিতুর দিকে তাকিয়ে করুণভাবে হাসল অরিত্র।

চিতু কিন্তু এর উত্তরে হাসল না। শুধু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "আরও বেশি!"

// ৬ //

"কার হল র‍্যা কার হল? তোর হল?"

দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেছে। একদিকে সৌরভরা যখন পাগলের মতো সর্বত্র অরিত্রকে খুঁজতে খুঁজতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে অরিত্র তখন হিজড়েদের খোলে ছোট্ট একটা খুপরিতে বন্দি হয়ে জীবন কাটাচ্ছে চিতুর সঙ্গে। গ্রামে ইতিমধ্যেই ভয়ংকর মড়ক লেগেছে। কেউ না কেউ প্রায় মরছে অজানা ঘাতকের হাতে। মৃতদেহের সারা শরীর অক্ষুণ্ণ থাকছে, শুধু হাতের আঙুলগুলো ছাড়া। ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, সব ক-টি মৃতদেহের হাতের আঙুল কেউ যেন জাঁতি দিয়ে উপড়ে নিয়েছে।

এদিকে খোলের মধ্যেও এই ক-দিনে কিছু কিছু অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করেছে অরিত্র। এই চিতু ছেলেটির সঙ্গে ওই শর্মিলা নামক হিজড়েটির একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। মাঝে মাঝেই ওরা চোখে চোখে কথা বলে। একে অপরের সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব যেন আলোচনা করে। শর্মিলা অন্যদের প্রতি ভয়ংকর ক্রূর হলেও চিতুর প্রতি যেন অত্যধিক নরম। যদিও তা সকলের সামনে প্রকাশ করে না সে। চিতুর প্রতি শর্মিলার এহেন পক্ষপাতিত্বের সঠিক কোনো কারণ খুঁজে পায়নি অরিত্র। যদিও এটুকু এ ক-দিনে বুঝেছে যে শর্মিলাকে ও যেমনটা ভেবেছিল, শর্মিলা ঠিক অতটাও খারাপ না। শর্মিলার বাইরেটো দেখে ভেতরটা আন্দাজ করা বড়ো মুশকিল।

এই খোলে আবার স্পষ্ট দুটো দল আছে। একদল যারা শর্মিলাকে পছন্দ করে। আরেক দল যারা পছন্দ করে তাম্বূলীকে। সম্ভবত পরবর্তী কুক্কুরী মা হওয়ার জন্য এই দুজনের মধ্যে একটা চাপা প্রতিযোগিতা আছে। যদিও চিতুর কথা শুনে অরিত্র স্পষ্ট অনুমান করতে পারে যে শর্মিলাই পরবর্তী কুক্কুরী মা হতে চলেছে।

আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপারও খেয়াল করেছে ও। কুক্কুরী মা-র কুকুরটা ওকে আর চিতুকে সবসময় কেমন নজরে নজরে রাখে। বহুদিন ওদের খুপরির সামনে বসেই দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এর কারণ কী! কোনোভাবে কি কুকুরটা অরিত্রকে চিনতে পেরেছে? হয়তো সেইজন্যই ওকে নজরছাড়া করে না। চিতু অবশ্য কুকুরটাকে একদম দেখতে পারে না। ওকে দেখলেই বলে, "কুত্তিটা নিশ্চয় তোমায় চিনতে পেরেছে। হেব্বি নাক ওটার। কেমনভাবে চেয়ে থাকে, দ্যাখো না! যেন গিলে খাবে। ওটা মরলে বাঁচি।"

অরিত্র অবশ্য এ কথা শুনে হাসে। কিন্তু মনে মনে একটা চাপা অস্বস্তি ওর মনে দানা বাঁধতে থাকে। একদিকে সৌরভরা কেমন আছে, সেই চিন্তা, অন্যদিকে আর ক-দিন পরে শুদ্ধি অনুষ্ঠানে ওদের সঙ্গে কী ঘটতে চলেছে, সেই আতঙ্ক... সব মিলিয়ে অরিত্রর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কী যে করবে ও, ভেবে পায় না। এখান থেকে বাঁচার কি কোনো পথ আছে? কে জানে...

এরই মধ্যে আজ একটা ঘটনা ঘটল। এসব হিজড়ের খোলে যে তলে তলে দেহব্যাবসা চলে তা আগেই জানত অরিত্র। এসব খোলে কীরকম মানুষরা কাস্টমার হিসেবে আসে, সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা ছিল ওর। কিন্তু ওকে যে কখনও এই বেশ্যাবৃত্তির মধ্যে যোগ দিতে হবে—এ যেন স্বপ্নেও ভাবেনি ও।

সুতরাং আজ যখন কাস্টমারের ঘরে অরিত্রর ডাক পড়ল, তখন আপনা থেকেই ওর বুকের ভেতরটা যেন ঠান্ডা হয়ে গেল। কোনোরকমে তাম্বূলীর সঙ্গে ও গেল বসার ঘরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কাস্টমারের আসনে অফিসার রায়কে দেখে একরকম চমকেই উঠল অরিত্র। অফিসার রায় এদের কাস্টমার! ইনিও এখানে আসেন দেহের খিদে মেটাতে! অথচ সেদিন ওঁর কথাবার্তা শুনে তো মনে হয়েছিল, উনি এদের পছন্দই করেন না।

অফিসার সাহেবও ওকে দেখে একরকম চমকে উঠেছিল। উনিও বোধহয় এটা কোনোভাবেই এক্সপেক্ট করেননি। প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন ঘর ছেড়ে। অদ্ভুত বিষয়, ওঁর পুরো বাঁ হাতে কালকে ব্যান্ডেজ জড়ানো ছিল।

র পর অরিত্র ঘরে ফিরলে, তাম্বূলী ওকে অনেক জেরা

করছিল। ওর মুখের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলও একটা। হয়তো ওকে ধরেই ফেলত, তার আগেই শর্মিলা চলে আসে।

"আরে, ওকে ছাড় তো তাম্বুলী! ওই অফিসারের কোনো ঠিক আছে নাকি? শালা নিজেই হিজড়ে মাল। ওপরে দেখায় এক, ভেতর ভেতর আরেক। ওর জন্য এত চিন্তা করিস না। মা বড়োমার পুজোয় বসেছেন, দেখ গিয়ে কিছু লাগবে নাকি!"

শর্মিলার ওপর তাম্বুলী কথা বলে না। সন্দেহজনক চোখে অরিত্রকে একবার জরিপ করে ফিরে যায় নিজের কাজে। শর্মিলাও ওকে বিশেষ ঘাঁটায় না। শুধু ফিরে যাওয়ার আগে অন্যমনস্কভাবে ওকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে ও, "আচ্ছা, একটা সাপ নিজের ল্যাজ কেন খাবে? তোমার কী মনে হয়?"

অরিত্র অবাক হয়ে কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই শর্মিলা ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণ বোকার মতো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ও। তারপর খুপরির মেঝেতে পাতা মাদুরের ওপর শরীর এলিয়ে দেয় ও। ধীরে ধীরে ও তলিয়ে যেতে থাকে ঘুমের দেশে।

সেই ঘুমের মধ্যেই ওর স্বপ্নে ফুটে ওঠে এক ভয়ংকর বুড়ি হিজড়ের মুখ। তারপর সেই হিজড়ে আস্তে আস্তে পালটে যেতে থাকে এক বিশাল বড়ো সাপে। একসময় সাপটা নিজেই নিজের ল্যাজ কামড়ে ধরে... স্বপ্ন ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসে অরিত্র।

ও বুঝতে পারে, এই ছবি সে আগেও দেখেছে। সেই ভয়ংকর রাত্তিরে... সেই রাক্ষুসে গুহার গায়ে ঠিক এইরকমই একটা সাপের ছবি ছিল না? গুহার গায়ের সেই ছবিটায় এভাবেই সাপটা নিজের ল্যাজ কামড়ে ধরেছিল না? কিন্তু শর্মিলা এই ছবির মানে খুঁজছে কেন? কী জানতে চাইল সে অরিত্রর কাছে!

তাহলে কি ওই ছবির মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন কিছু, যা কাইতি, ডিঙ্গিরি, এমনকি অরিত্রদের প্রাণের সঙ্গেও যুক্ত?

কী সেই জিনিস, যা জানার জন্য এতটা উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে এই খোলের আগামী কুক্কুরী মা স্বয়ং শর্মিলা!

* * * * * * * * *

রান্নাঘরে একমনে কিছু একটা বানাচ্ছিল দিশানি। সৌরভদা আর সাবর্ণদা আজও গিয়েছিল পুলিশ স্টেশন। অরিত্রদার খোঁজে। অফিসার রায় নাকি ছিলেন না স্টেশনে। কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসে জানিয়েছেন, অরিত্রদার নাকি একটা খোঁজ পাওয়া গেছে। কাল সকালে উনি সেখানে নিয়ে যাবে ওদের।

তবে একটাই শর্ত, অরিত্রদাকে বাঁচাতে হলে ওদের সবাইকেই নাকি ওঁর সঙ্গে সেইখানে যেতে হবে, যেখানে অরিত্রদা আছে। কী অদ্ভুত তা-ই না! পুলিশ রেসকিউ করবে অরিত্রদাকে, সেখানে ওদের সবাইকে কী প্রয়োজন, সেটাই যেন ভেবে পাচ্ছে না দিশানি।

সৌরভদারা ফিরে আসছে। বৃষ্টির জন্য পথে আটকে পড়েছে। দিশানি ওদের জন্যই কিছু খাবার বানিয়ে রাখছে। কী করতে এখানে আসা হল আর কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল... ধুস, ভাবলেও এখন কেমন যেন একটা লাগছে দিশানির।

রান্নার কাজ হয়েই এসেছিল। নিজের জন্য কফিটা বানাতে বানাতেই জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল ও। বাইরে একেবারে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নেমেছে,বৃষ্টির বেগ দেখে মনে হচ্ছে বুঝি সমস্ত গ্রামটাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই আবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বেশ একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা আমেজ। সত্যি বলতে অরিত্রদার যদি কিছু না হত, সব যদি স্বাভাবিক থাকত, তাহলে হয়তো আজ জমিয়ে বসে হ্যারিকেনের আলোয় ভূতের গল্প শোনা হত! উফ, এরকম দিনে এমন গ্রামগঞ্জের বুকে বসে ভূতের কাহিনি শোনার থ্রিলটাই আলাদা লেভেলের।

"ওয়ায়ায়ায়াক... ওয়ায়ায়াক..." হঠাৎই একটা আওয়াজে চমকে উঠল দিশানি। আরে, দেবযানীদি না! দেবযানীদি কি আবার বমি করতে গেল! কী যে হয়েছে সেদিনের পর থেকে দেবযানীদির। মাঝে মাঝেই বমি করছে, মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। আর যতক্ষণ জ্ঞান থাকছে, কথা বলার মতো অবস্থায় থাকছে, ততক্ষণই বলছে, "আঙুল... আঙুলগুলো কেটে নিল... উফ, কীভাবে আঙুলগুলো কেটে নিল..."

কফির মাগটা হাতে নিয়েই বাথরুমের দিকে পা বাড়াল দিশানি। এমনিতে হোমস্টের একজন কেয়ারটেকার কাম রাঁধুনি থাকে এখানে, কিন্তু আজ সে বাড়ি গেছে কোনো একটা কাজে। সুতরাং বাড়িতে দিশানি আর দেবযানীদিই একা।

বাথরুমের সামনের প্যাসেজওয়েটায় এসে দাঁড়াল দিশানি। এইখানটায় ছোট্ট একটা নাইট বাল্ব আছে, সেটাই জ্বলছে টিমটিম করে। কে জানে কেন এই প্যাসেজওয়েটা অস্বাভাবিক ঠান্ডা। প্যাসেজওয়ের সামনে এসে দাঁড়াতেই সারা শরীর কেমন শিরশির করে উঠল দিশানির। কোনোমতে গুটিগুটি পায়ে বাথরুমের দিকে এগোতে এগোতেই একবার ডাক দিল ও, "দেবযানীদি বাথরুমে? দেবযানীদি!"

"ওয়্যাআয়াক... ওয়াআআআক..." কী অদ্ভুত! বমি করার আওয়াজটা আসছে বাথরুম থেকেই অথচ দেবযানীদি কোনো সাড়া দিচ্ছে না। শরীরটা কি খুব খারাপ হল নাকি! ঠিক বাথরুমের সামনেটা এসেও বুকের ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি ক্রমশ দলা পাকিয়ে উঠল দিশানির। সত্যিই কি দেবযানীদি বাথরুমের ভেতরেই আছে নাকি অন্য কিছু...

কফি মাগটা শক্ত করে চেপে ধরে বাথরুমের দরজাটা খুলল দিশানি। আর সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠল যেন। আরে, কোথায় কে! কেউ নেই তো! বাথরুম তো ফাঁকা! অথচ ও যে স্পষ্ট শুনছিল বাথরুম থেকে বমির আওয়াজ। এতটা ভুল হল?

"ওয়াআআআক... ওয়্যাআয়াক..." আবারও সেই শব্দটা পেয়ে চমকে উঠল দিশানি। কেন কে জানে, এইবার ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয়ে উঠল। কফির মাগ হাতে নিয়েই ও খুব শান্তভাবে শুনল, আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে। দেবযানীদির ঘর! আওয়াজটা দেবযানীদির ঘর থেকেই আসছে। কিন্তু ঘরের মধ্যেই কেন বমি করবে দেবযানীদি! কিছুতেই যেন মাথা কাজ করল না দিশানির। কফি মাগ হাতেই এক ছুট লাগাল দেবযানীদির ঘরের দিকে।

দেবযানীদির ঘরের সামনেটা আসতেই পা দুটো কেমন যেন লোহার মতো ভারী হয়ে আসতে লাগল দিশানির। আর যেন কোনোভাবেই সামনে এগোতে পারছে না ও। কীসের যেন একটা অজানা ভয় ওকে খামচে টেনে রাখতে চাইছে পেছনে! এই জায়গাটাও বাথরুমের প্যাসেজওয়ের মতোই ঠান্ডা। গায়ের রোমগুলো আপনা থেকেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ঘরের ঠিক সামনেটায় আসতেই ড্রয়িং রুমের আলোটাও যেন অজানা কীসের আতঙ্কে প্রচণ্ড কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎই দপ করে নিভে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাড়ি জুড়ে নেমে এল মিশমিশে অন্ধকার।

"দেবযানীদি... ও দেবযানীদি..." বুকের ভেতরটা প্রচণ্ড জোরে টিপটিপ করছে, তা-ই নিয়েই কোনোমতে কাঁপা-কাঁপা পায়ে অন্ধকারে ঘরে ঢুকল দিশানি। এ কী! এ ঘরের জানলাগুলো হাট করে খোলা কেন? জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে তো। আচমকাই বাইরে প্রচণ্ড জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। জানলা দিয়ে সেই বিদ্যুতের আলোয় ঘরের ভেতর এক মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল সবটা! আর তাতেই দিশানি যা দেখল, তাতে আতঙ্কে ওর হাত-পা অবশ হয়ে এল যেন! ও দেখল, সারা ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে রক্ত। আর ঘরের এককোণে খোলা জানলার নীচে চুল খুলে বসে রয়েছে দেবযানীদি। ওখানে বসেই ওয়াক ওয়াক করে বমি করছে সে। তার মুখ থেকে বেরোনো রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা ঘর।

"দি...দি... এ...এ...এত রক্ত কী করে এল এই ঘরে! তোমার বমির সঙ্গে এরকম রক্ত বেরোচ্ছে কেন!" ফ্যাকাশে মুখে কথাগুলো বলতে বলতে ক্রমশ দেবযানীদির সামনে এগিয়ে গেল দিশানি। আর ঠিক তখনই আবারও বিদ্যুৎ চমকে উঠল। আর এবারের আলোয় দিশানি যা দেখল, তাতে প্রচণ্ড আতঙ্কে ওর হাত থেকে কফি মাগটা মাটিতে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ দু-আধখানা হয়ে গেল। এই মুহূর্তে দিশানি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না...

ওর চোখের সামনেই দেবযানীদি বমি করছে... ওর সারা মুখে লেগে আছে রক্ত... আর ওর বমির সঙ্গে... ওর বমির সঙ্গে উঠে আসছে গাদা গাদা রক্তাক্ত আঙুল! হ্যাঁ... হ্যাঁ... আর কিছু নয়, মানুষের আঙুল! দেবযানীদির প্রত্যেকটি ওয়াকের সঙ্গে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষের হাতের থেকে কাটা রক্তাক্ত আঙুল!

"এ...এ...এসব কী দেবযানীদি... ও...ওগুলো কী?" প্রচণ্ড আতঙ্কে একরকম কাঁপতে কাঁপতেই জিজ্ঞেস করল দিশানি। আর তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ওর দিকে মুখ ফিরে তাকাল দেবযানীদি। উফ, কী ভয়ংকর দেখতে লাগছে ওকে। সারা মুখে রক্ত লেগে, চোখ দুটো যেন সবুজ হয়ে গিয়েছে। উশকোখুশকো চুলগুলো এসে পড়েছে মুখের ওপর। দিশানির দিকে তাকিয়ে আচমকাই খিলখিল করে হেসে উঠল দেবযানীদি, তারপর অদ্ভুত কর্কশ গলায় সুর করে বলে উঠল সেই ছড়াটি, যা ওরা শুনেছিল ডিঙ্গিরি উৎসবে...

"ডিঙা না নিলা মা গো দংশিলা নাগিনি
কালনাগিনির বিষে মা গো হইলা পিশাচিনী..."

আর এর ঠিক পরেই নিজের পেছনে আচমকা একটা হাততালির শব্দ পেল দিশানি। যে-সে হাততালি নয়, ঠিক হিজড়েদের মতো তালির শব্দ। আর তার সঙ্গেই সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। পেছনে ফিরতে যাওয়ার আগেই দিশানি স্পষ্ট শুনল, কে যেন ওর পেছন থেকে হিসহিসে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, "আমায় কে ডাকলি র‍্যা? কার হল রে? কার হল? তোর হল বুঝি?"

কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটির ওপর পড়ে গেল দিশানি। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই সরীসৃপের মতো একটা কালো অবয়ব ওর বুকের ওপর উঠে বসল... এ...এ তো সেই ভয়ংকর বুড়ি হিজড়েটা, যাকে ওরা সেদিন গাড়ির ওপর

দেখেছিল! সেই ভয়ংকর মুখ, আঙুরের মতো ঝুলন্ত চামড়া, চোখের পাতায় অজস্র কালো কালো পোকা... আর মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কুচকুচে কালো কশ... হিজড়েটা ওর ডান হাতটা টেনে ধরল সজোরে। তারপর আরেক হাত দিয়ে ওর চোখের সামনে তুলে ধরল সুপুরি কাটার ধারালো জাঁতি... তারপর জিভ দিয়ে একবার পরম আদরে চাটল নিজের জাঁতিটাকে... এরপর কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান... দিশানি কিছু ভেবে ওঠার আগেই ওই ধারালো জাঁতি খ্যাঁচ করে বসে গেল দিশানির নরম আঙুলে।

একটা কান-ফাটানো চিৎকার... বাইরে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল... সেই বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, ঘরের মেঝে বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে টাটকা লাল রক্ত। ঠিক এই সময়, এই অন্ধকার ঘরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে একটা একটানা খচখচ শব্দ। ঠিক যেন কেউ খুব তাড়াতাড়ি কিছু চিবোচ্ছে।

ঠিক এই শব্দটাই প্রথম দিন অরিত্ররা খোলে গিয়ে পেয়েছিল না?

// ৭ //

"Everyone has a story"

"তুমি হিজড়েদের দলে যোগ দিলে কেন? কী হয়েছিল?"

শর্মিলার প্রশ্নে অরিত্র একবার ঢোঁক গিলল। ইতিমধ্যে শর্মিলা এই খোলের প্রধান কুক্কুরী মায়ের পদে অভিষিক্ত হয়েছে। কালকেই হয়ে গেছে অভিষেক উৎসব। যেহেতু নতুন গুরুমার অভিষেক উৎসবে খোলের সব হিজড়েকে এক জায়গায় থাকতে হয়, সেজন্য অরিত্র, চিতু ওদেরকেও হাত বেঁধে শর্মিলার অভিষেক উৎসব দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ওদের সামনেই সমস্ত নিয়ম-উপাচার সেরে আগের কুক্কুরী মা তাঁর পোষা কুকুর ভ্রমরকে শর্মিলার হাতে দিয়ে সুর করে করে বলেছেন,

"এই যে দিলুম কুক্কুরীকে, যত্নে রাখিস লা,
কালনাগিনি ধরতে পারে কেবল আমার ছা...
এক কাহিনি খোদাই করা, এক কাহিনি মুখে
এক কাহিনি লুকিয়ে আছে এ কুক্কুরীর বুকে,
একে যত্নে রাখিস, পালন করিস, খাস এ আগে খেলে
কুক্কুরীতেও কইবে কথা, আসল মা-কে পেলে..."

"কী হল, একটা প্রশ্ন করলাম, কানে যাচ্ছে না?" শর্মিলার প্রশ্নে আরও একবার চমকে উঠল অরিত্র। কালকের অদ্ভুত অনুষ্ঠান আর কুক্কুরী মায়ের ছড়ার মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল ও। শর্মিলার প্রশ্নে আবারও বর্তমানে ফিরে এল যেন।

অরিত্র ভেবে পেল না ঠিক কী বলা উচিত ওর শর্মিলার প্রশ্নের উত্তরে! ও তো হিজড়েদের দলে যোগই দেয়নি কখনও। অথচ এই প্রশ্নের উত্তর না দিলে, কিছু না বললে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। একটা কথা এখনও পর্যন্ত অরিত্র অনেকবার ভেবেছে। কেন অরিত্রকে শর্মিলা এতদিনেও চিনতে পারেনি! এর একটা কারণ হয়তো সেদিন অরিত্রর সাজপোশাক, মেকআপ। বলাই বাহুল্য, এ দুটো নিয়ে আর এ দুটো বাদে অরিত্রকে হুট করে চেনা বেশ কঠিন।

সে যা-ই হোক, চিনতে পারেনি পারেনি, কিন্তু এখন উত্তর না দিলে নির্ঘাত চিনে ফেলবে। অরিত্র কিছু বলতে যাওয়ার আগেই চিতু উত্তর দিল, "আমার মতোই কেস, দিদি, বাড়ি থেকে বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েদের পোশাক পরে ছেনালি করত। বাপের সহ্য হয়নি। পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়ে বের করে দিয়েছে!"

চিতুর কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করল শর্মিলা। আগের মতোই সেই কাঠ-কাঠ কণ্ঠে বলল "তুই কী ছেনালি করতিস যে তোকে তোর বাপ খেদিয়ে দিল?"

এ কথার উত্তরে যন্ত্রণার মধ্যেও একটু হাসল চিতু। তারপর বলল, "সে করতুম অনেক। মেয়েদের মতন কথা কইতুম, কোমর দোলাতুম, ছেলে দেখলে নজ্জা-নজ্জা ভাব করে কথা কইতুম। বাপ এসব নিতে পারত না, না করত। যত না করত, আমি আরও বেশি করে করতুম। একবার জোর করে দিদির সালোয়ার কামিজ পরে রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম বাপকে শিক্ষে দেওয়ার জন্য। ওইটাই কাল হল। পাড়ার লোকজন বাড়ি বয়ে একগাদা খিস্তি করে গেল। ভয় দেখিয়ে গেল যে বাড়িতে এমন হিজড়ে পুষলে বড়োমেয়ের বে হবে না, সমাজ ত্যাগ দেবে। বাপ সেদিন খুব মারধর করলে। রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বললে, যা, নিজের পথ নিজে দেখে নে। তারপর আর কী! পথে নেমে পড়লুম। পথের হিজড়েরা আমায় আপন করে নিল। ভিড়ে গেলুম ওদের দলে। কলকেতার মানিকতলার আটপুরে গুরুমা আন্নাকালীর কাছে দীক্ষিত হলুম।"

চিতু কথা শেষ করতেই অরিত্র নিজের বুকের ভেতর একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল। আহা রে! বেচারাকে কত যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। অরিত্রর ভাবনা ভুল

ছিল। এ লাইনে বোধহয় কেউ শখ করে আসে না। আসে তাড়নায়, আসে যন্ত্রণায়, আসে অব্যক্ত বেদনায় মলম লাগাতে!

অরিত্র অবশ্য খুবই সৌভাগ্যবান। ওর বাবা-মা ওকে এ ব্যাপারে খুব সাপোর্ট করেছে প্রথম থেকেই। সমাজের সামনে নিজেরা তো মাথা নত করেইনি, অরিত্রকেও করতে দেয়নি। সবসময় বুঝিয়েছে যে ও আলাদা, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। ও যেন নিজের জীবন নিজের মতো করে বাঁচে, আর এমন কিছু করে দেখায়, যাতে যারা ওকে ঘেন্না করেছিল, তারাই একদিন সম্মানে ওর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। সেজন্যই তো নাচকে বেছে নিয়েছে অরিত্র। একমাত্র নাচের মধ্যে দিয়েই যে ও সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরতে পারে নিজেকে। হায় রে সেই সুবিশাল স্টেজ, সেই হল ভরতি দর্শক, আর কি কোনোদিন ফিরে পাবে ও...

"তুমি কেন এদের দলে যোগ দিলে, শর্মিলাদি?" চিতুর প্রশ্নে ফের বর্তমানে ফিরে এল অরিত্র। শর্মিলা এই প্রশ্নের উত্তরে বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইল।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ছাড়-না, কী হবে ওসব শুনে?"

"আহা, বলোই-না..." চিতু নাছোড়বান্দা। অগত্যা শর্মিলাকে বলতেই হল।

তার ভাবলেশহীন রুক্ষ কণ্ঠেই সে বলতে শুরু করল, "আমার বাপ-মা মারা যায় ছোটোবেলায়। আমার একখানা ভাই ছিল। চোখ দুটো ছিল ঠিক তোর মতো, জানিস, মায়াভরা। বাপ-মা মরার পর থেকে আমি আর ভাই কাকার বাড়িতেই থাকতাম। ছোটোবেলা থেকে কাকাদের সব ফাইফরমাশ খাটতাম, সব কাজ করে দিতাম। তা-ও কখনও কাকাদের কাছের মানুষ হতে পারিনি। কাকারা যেন আমাদের দু-চক্ষে দেখতে পেত না। খাটিয়ে মারত, ঠিক করে খেতেও দিত না। আমি তা-ও আমার ভাগের খাবারটুকু দিয়ে দিয়ে ভাইটাকে আগলে রাখতাম। কিন্তু পোড়ার কপাল। একরাতে হঠাৎ বমি শুরু হল, বমির সঙ্গে রক্ত। রাত ফুরোতে-না ফুরোতেই সব শেষ। ভাইও আমায় ছেড়ে বাপ-মায়ের কাছে চলে গেল।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শর্মিলা।

"তারপর?" ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল অরিত্র।

"ছোটোবেলা থেকেই আমি মেয়েলি ছিলাম, যত বড়ো হই, বুঝতে পারি, বাইরের এই খোলাটা ছেলের হলে কী হবে, আমি ভেতরে ভেতরে আসলে একটা মেয়ে। কাকার বাড়ির কেউই আমায় ভালোবাসত না। একমাত্র আমার কাকার ছেলে আমায় খুব ভালোবাসত। ও বয়সে আমার চেয়ে বড়ো ছিল। আমি ডাকতাম টুকুদা বলে। বাড়িতে কেউ না থাকলে ওই টুকুদা আমায় আদরও করত। আস্তে আস্তে যত বড়ো হতে লাগলাম, ওর আদর করার ধরনও পালটে যেতে লাগল।"

"পারিক?" চিতুর মুখে দুষ্টু হাসি।

'পারিক' মানে জানে অরিত্র। সাময়িক যৌনসঙ্গী। পারিকদের সঙ্গে কোতিদের সম্পর্ক শুধু সুখ লেনদেনের। ও পথে ভালোবাসার কোনো নামগন্ধ নেই। সেদিন সৌরভকে অরিত্রর পারিক বলায় খুব গায়ে লেগেছিল কথাটা ওর। কারণ ও জানে সৌরভ ওর পারিক নয়, সৌরভ ওর প্রেমিক। একজন পুরুষ তার কাঙ্ক্ষিত স্ত্রী-কে যতটা ভালোবাসে, সৌরভও ঠিক ততটাই ভালোবাসে অরিত্রকে। সেই ভালোবাসা নিখাদ ও পবিত্র। অরিত্র এ-ও জানে, এই মুহূর্তে সৌরভ ওকে নিশ্চয়ই পাগলের মতো খুঁজছে সর্বত্র।

"পারিক! বলতে পারিস... তবে প্রথম প্রথম আমি অত বুঝতাম না তো। বোকার মতো ওকে ভালোই বেসে ফেলেছিলাম, নিজেকে ওর প্রেমিকা কল্পনা করে কত কিছু ভাবতাম। কিন্তু পরে যখন ও বাড়িতে ওর নতুন প্রেমিকাকে নিয়ে আসা শুরু করল, আমার সামনেই ঘরে দোর দিয়ে তাকে আদর করা শুরু করল... বুঝলাম, আমাদের হিসেব খাতায় তো শুধু সুখের কথা লেখা ছিল, ভালোবাসার কথা ভগবান সেখানে লেখেননি তো!" বহু দিনের একটা চাপা হাহাকার যেন বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল শর্মিলার।

"তারপর কী হল?"

"এরকমই চলছিল। ওর প্রেমিকা থাকা সত্ত্বেও ও আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত, জানিস তো। আর আমি এত বোকা, ভুলে গিয়ে শরীর দিতাম। একদিন এই করতে গিয়ে কাকা দেখে ফেলল। ও তো সঙ্গে সঙ্গে মুখ মুছে নিল। বলল, আমি নাকি ওকে জোর করে এসব করাই। ওর আর ওর প্রেমিকার ব্যাপারে সব কাকার কাছে বলে দেব—এই ভয় খাইয়ে ওকে আমার সঙ্গে এসব করতে বাধ্য করি। আমার কাকাটাও ছিল তেমনিই জানোয়ার। এক-পাড়া লোকের সামনে বের করে রাস্তায় ফেলে আমায় পেটাতে লাগল। পাড়ার লোকও আমায় হিজড়েমোর জন্য দেখতে পারত না। তারাও এসে সুযোগ বুঝে খুব করে হাতের সুখ মিটিয়ে নিতে লাগল... ওইদিন ওইখানেই হয়তো মরে যেতাম, কিন্তু তার আগেই কুক্কুরী মা আমায় ওদের হাত থেকে বাঁচায়।

তারপর নিজের কাছে নিয়ে এসে নিজের মেয়ের মতো সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে। পরে আমিও কোতি জানতে পেরে দীক্ষে দেন।"

শর্মিলা কথা শেষ করে। ঘরে কিছুক্ষণের জন্য নেমে আসে একটা বোবা নিস্তব্ধতা। তিনটি প্রাণী যে এই ঘরে আছে, বোঝাই যায় না। মনে হয়, তিনটি জীবন্ত লাশ কেউ যেন এ ঘরের মধ্যে বন্দি করে দিয়ে গেছে। একসময় অরিত্রই এই নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করে, "এই হিজড়েদের দলে থাকতে তোমার অসুবিধা হয় না? এই যে লোকজন হিজড়েদের এত ঘেন্না করে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে। তোমার ভালো লাগে? মনে হয় না এর চেয়ে সুস্থ স্বাভাবিক একটা জীবন পেলে ভালো হত?"

"বাল ছেঁড়া যায় আমার!" অরিত্রর কথা শুনে এবার আচমকাই ঝাঁজিয়ে ওঠে শর্মিলা। তারপর অত্যন্ত কঠিন স্বরেই বলে, "এ সমাজ আমায় কী ভাবল-না ভাবল, আমার তাতে স্রেফ ছেঁড়া যায়! যখন বাপ-মা মরে গেল, কাকার বাড়িতে কুত্তার মতো দুই ভাই পড়ে থাকতাম, এই সমাজ দেখতে এসেছিল? যখন দিনের পর দিন কাকা আমাদের কুত্তার মতো খাটিয়ে দিনের শেষে এক থালা ভাতও দিত না, এই সমাজ দেখতে এসেছিল? তোমাদের এই সমাজের মুখে মুতি আমি। আর কাদের সঙ্গে থাকব! এই চুতিয়াগুলোর সঙ্গে? যারা আমায় আমার মতো করে মেনে নিতে পারে না! যারা আমার বিপদের দিনে আসবে না, অথচ সুখের দিনে নিয়ম মারাতে আসবে! শুনে রাখো, তোমাদের এই চুতিয়া সমাজ যতটা হিজড়েদের ঘেন্না করে, হিজড়েরাও ঠিক ততটাই ঘেন্না করে এই সমাজকে। বুঝেছ! সেইজন্য তো মন ভরে আমরা খিস্তি দিই। যা এই সমাজ আমাদের মনে মনে দেয়, সেগুলোই আমরা তাদের জোরে জোরে ফিরিয়ে দিই।"

শর্মিলা থামে। ঘরের পরিবেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে। অরিত্র প্রসঙ্গ পালটে ফ্যালে,

"আচ্ছা, তোমরা কি আমাদের খাবারে কোনোরকম ঘুমের ওষুধ মেশাচ্ছ। আজকাল যখন-তখন প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। কী জানি কেন বুঝতেই পারছি না।"

অরিত্রর কথায় শর্মিলার কপালে ভাঁজ পড়ে। সে কোনো উত্তর দেয় না। শুধু একবার অরিত্র আর একবার চিতুর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে।

"কাইতি আসলে কী, শর্মিলাদি? দেবী? পিশাচিনী? নাকি এমন কিছু, যা মানুষের বোধের বাইরে! কেন বছর বছর তার প্রয়োজন হয় নতুন শরীর। কেন তাকে তুষ্ট রাখার জন্য এত কিছুর আয়োজন?" শর্মিলার নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করে চিতু।

চিতুর প্রশ্ন শুনে শর্মিলা যেন শিউরে ওঠে। তৎক্ষণাৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সে বলে, "শশশ্... চুপ চুপ... বড়োমার নাম মুখে নিতে নেই! কতবার বলেছি না!" এই বলেই ধড়ফড় করে উঠে পড়ে শর্মিলা। তারপর এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

দরজা দিয়ে বেরিয়েই যাবে, তার আগে চিতু জিজ্ঞেস করে, "আমায় তোমার ভাইয়ের মতো দেখতে, তাই তুমি আমায় এত ভালোবাসো, তা-ই না শর্মিলাদি?"

শর্মিলা এই প্রশ্ন শুনে দরজার সামনেই পাথরের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। অরিত্রর মনে হয়, শর্মিলার চোখটা যেন এই ক্ষীণ আলোতেও চিকচিক করে উঠছে। চিতু আবার প্রশ্ন করে, "কালকেই ডিঙ্গিরির শুদ্ধি অনুষ্ঠান। আমাদের সঙ্গে কী করবে ওরা? আমরা কি আদৌ বাঁচব?"

শর্মিলা এই প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দেয় না। বরং অদ্ভুত শান্ত একটা কণ্ঠে বলে, "কালনাগিনির বিষ মাথায় চেপেছে, প্রাণ নেওয়ার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে। আজ রাতের বেলায় জেগে থাকিস। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়িস না। আসি।"

// ৮ //

'কাইতিমঙ্গল'

"আচ্ছা অরিত্রদা, তোমার কী মনে হয়, এদের এই বড়োমা আসলে কী?" মাটিতে শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন করল চিতু। এখন প্রায় মধ্যরাত। এখনও ওরা ঘুমোয়নি। বিশেষ করে শর্মিলার কথা শোনার পর থেকে তো আরই যেন ঘুম উড়ে গেছে চোখ থেকে। শর্মিলা কেন ওদের জেগে থাকতে বলল তা জানার জন্য ওরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

"কে জানে... তবে আমার মনে হয়, হিজড়েদের এই বড়োমার পুরো কাহিনিটা আমরা এখনও জানি না। পুরোটা জানলে তবেই একমাত্র অনেকগুলো রহস্যের জট খুলবে। তবে আমার মনে হয়..." অরিত্র কথা বলতে বলতে দরজার দিকে তাকায়। দরজার বাইরে একটা পায়ের শব্দ হল না? ঠিক শুনল ও?

"কী মনে হয়?" চিতু আবার প্রশ্ন করল।

"আমার মনে হয়, এদের বড়োমা কোনো একটা পৈ..." অরিত্র কথা শেষ করার আগেই এবার খুট করে একটা শব্দ

হল দরজায়। অরিত্র আর চিতু সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল মাটিতে। এ শব্দ ওরা চেনে। কেউ একটা ওদের দরজার শিকল খুলল বাইরে থেকে। এবার সে ভেতরে আসবে। কিন্তু এত রাতে কে আসবে এই ঘরে? কেনই বা আসবে! তবে কি...

চিতু আর অরিত্র বেশ খানিকক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে চেয়ে বসে রইল দরজাটার দিকে চেয়ে। কিন্তু কী অদ্ভুত! কেউ ভেতরে ঢুকল না। একসময় ওরা যখন উঠে দেখতেই যাবে, ঠিক তখনই একটা কালো আবছায়া মূর্তি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। ঘরের অন্ধকারে হ্যারিকেনের আলোয় প্রথমে না বুঝলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই চিতু বলে উঠল, ‘‘শর্মিলাদি!’’

‘‘শশশশ্... হ্যাঁ আমিই!’’ শর্মিলা ধীর লয়ে ওদের সামনে মাটিতে এসে বসল। তারপর বলল, ‘‘তোমরা সকালবেলা বড়োমার গল্প শুনতে চেয়েছিলে না! সেই গল্প শোনানোর জন্যই এলাম।’’

‘‘কিন্তু এত রাতে! তখন বললেই তো হত!’’ অরিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘‘উঁহু, দেওয়ালেরও কান আছে। এ কাহিনি সবার শুনতে নেই। কেবল কুক্কুরী মা একবার খিলুয়ার ঘোরে আমায় বলে ফেলেছিলেন। তা-ও আমি পরবর্তী কুক্কুরী হব বলে... যদিও তখন সবটা বলেননি... সেদিন অভিষেকের রাতে একলা ঘরে ডেকে পুরো কাহিনিটা বললেন।’’ শর্মিলার মনে একটা চাপা দ্বন্দ্ব।

‘‘ছাড়ো ওসব কথা। বড়োমার কাহিনিটা বলো!’’ চিতুর চোখে-মুখে যেন একটু বেশিই আগ্রহ।

শর্মিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ফিসফিস করে বলতে শুরু করল, ‘‘এ কাহিনি কতকাল ধরে চলে আসছে, আমার জানা নেই। বড়োমার গুহায় নানান সাংকেতিক ছবির মাধ্যমে এই কাহিনি আঁকা আছে। বলা হয়, এই খোলের প্রথম কুক্কুরী মা তাঁর হিজড়েদের দিয়ে ওই ছবিগুলি আঁকিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনিই ছড়ার আকারে এই কাহিনি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই কাহিনি আমি শুনেছি আমার কুক্কুরী মায়ের মুখ থেকে, তিনি শুনেছেন তাঁর কুক্কুরী মায়ের মুখে। এভাবেই চলে আসছে। এ কাহিনির শুরু দেবরাজ ইন্দ্রর নৃত্যসভায়।’’

‘‘দেবরাজ ইন্দ্র?’’ অবাক হল অরিত্র।

‘‘হ্যাঁ, দেবরাজ ইন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্রর নৃত্যসভায় বহু অপরূপ অপ্সরা ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অপ্সরা ইল্লিরা। তিনি দেখতে যেমন ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, তাঁর নৃত্যকলাও ছিল তেমনই মনোমুগ্ধকর। তিনি যখন নৃত্য প্রদর্শন করতেন, সমস্ত দেবতা তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারতেন না। ইন্দ্রের সভায় নৃত্যশিল্পী হিসেবে তাঁর বেশ কদর ছিল। কিন্তু অন্য অপ্সরাদের কাছে ইল্লিরার এই গুণই ছিল অত্যন্ত ঈর্ষার বিষয়। তাঁরাও রূপে-গুণে কেউ কম না, অথচ ইল্লিরার মতো প্রশংসা তাঁরা কখনও কারও কাছ থেকে পেতেন না।

‘‘ফলে ঈর্ষার জ্বালায় তাঁরা সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করেন ইল্লিরাকে পাকে ফেলার। কথিত আছে, তাঁরা দেবী মনসার কাছে গিয়ে এর বিহিত চান এবং তাঁকে পুজো দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। মনসা তাঁদের পুজোয় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাঁর এক অনুচর কালনাগিনিকে পাঠান ইল্লিরাকে দংশন করবার জন্য।

‘‘ইল্লিরা যখন ঘুমোচ্ছেন, কালনাগিনি তখন এসে তাঁর ঘুমের মধ্যেই তাঁকে দংশন করে। ইল্লিরা সে কথা বুঝতে পারেন না যদিও। সেদিন রাতে বিষ কাজ করে না, কিন্তু তার পরের দিন সকাল থেকেই ইল্লিরা হঠাৎ অনুভব করেন, তাঁর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তেষ্টা মিটছে না। বহুবার জল খেয়েও যখন তেষ্টা মেটে না, তখন তেষ্টা মেটানোর জন্য ইল্লিরা চুরি করে দেবতাদের সোমরস খান। কী অদ্ভুত! মাত্র এক ঢোঁক সোমরস খেতেই তাঁর তেষ্টা মেটে।

‘‘কিন্তু গোল বাধে এরপরে, যখন তিনি সোমরস পান করার পরই ইন্দ্রর সভায় নৃত্য প্রদর্শন করতে যান। স্বাভাবিকভাবেই সোমরসের প্রকোপে সেইদিন ইল্লিরার নৃত্য ভুল হয়, নাচ করতে করতেই সভার মধ্যে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে যখন জানা যায়, তিনি চুরি করে সোমরস পান করে সভায় এসেছেন, তখন দেবতাগণ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন।

‘‘দেবরাজ ইন্দ্র প্রচণ্ড ক্রোধের বশে তাঁকে অভিশাপ দেন, তাঁর এই অন্যায়ের জন্য তাঁকে পৃথিবীতে কুৎসিত, ভয়ংকর বীভৎস এক বুড়ি হিজড়ে হয়ে জন্মাতে হবে। তা-ও কোনো মনুষ্য যোনি থেকে না, বরং মনুষ্যেতর পিশাচ যোনি থেকে। যে হাতের আঙুল দিয়ে তিনি দেবতাদের পবিত্র সোমরসের পাত্র ধরেছিলেন, পৃথিবীতে থাকাকালীন সেই হাতের আঙুলই হবে তাঁর প্রধান খাদ্য। যে হাতে তাঁর ফুটে উঠত অপূর্ব নৃত্যকলা, সেই হাতেই থাকবে তাঁর ভয়ংকর জাঁতি। পৃথিবীতে থাকাকালীন মনুষ্যের আঙুল ওই জাঁতি দিয়ে ছিন্ন করে তা খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে ইল্লিরাকে, এই তাঁর শাস্তি।’’

‘‘এ বাবা! এ তো ভারী অন্যায় হল ইল্লিরার সঙ্গে! অন্যদের হিংসের জন্য বিনা অপরাধে তাকে কী ভয়ংকর শাস্তি পেতে হল। এরপর কী হল, শর্মিলাদি? এই অভিশাপের

থেকে বাঁচবার কোনো পথ কি পেল সে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল চিতু।

"একটা উপায় সে পেল বটে।" শর্মিলা ফের শুরু করল, "অভিশপ্ত হয়ে ইল্লিরা দেবরাজের কাছে যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বহুবার তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনার পর দেবরাজ ইন্দ্রর রাগ প্রশমিত হয়। তখন তিনি ইল্লিরাকে বলেন যে, দ্যাখো, যে অভিশাপ দিয়েছি তা তো আর ফেরাতে পারি না, তবে যদি কোনো সৎ নির্ভীক যুবতি হিজড়ে স্বেচ্ছায় তোমায় তার নিজের শরীরে থাকতে দেয়, তবে তোমায় আর পিশাচিনী হয়ে থাকতে হবে না, তখন তুমি দেবীর সমান ক্ষমতা পাবে। মানুষের হিতাহিত সাধন করতে পারবে। সমস্ত মনুষ্য সম্প্রদায় তোমায় ভক্তি ভরে পূজা করবে। তবে যে তোমায় শরীর দেবে, তার শরীরে তুমি প্রবেশ করামাত্র তার মৃত্যু ঘটবে এবং তার শরীরের নিয়ন্ত্রক হবে তুমি।

"কিন্তু প্রতি বছর তোমায় শরীর পালটাতে হবে। আর যদি কোনোভাবে শরীর পালটাতে ব্যর্থ হও, তবে তুমি ফের পরিবর্তিত হবে আঙুলখাকি পিশাচিনীতে। আগের কোনো স্মৃতি তোমার থাকবে না। মনুষ্যের ক্ষতিসাধনই তখন হবে তোমার একমাত্র লক্ষ্য!"

শর্মিলা থামে কিছুক্ষণ। তারপর ফের বলতে শুরু করে, "এরপর ইল্লিরা মর্ত্যের কিন্নরদের প্রধান অখণ্ডপ্রভার কাছে এসে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর সাহায্যের বদলে তিনি কিন্নরদের নাম-যশ-খ্যাতি, নিজেদের মতো বাঁচার অধিকার, নবজাতকদের আশীর্বাদ করার ক্ষমতা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্নরপ্রধান অখণ্ডপ্রভা এই প্রস্তাবে সম্মত হন। ফলে ইল্লিরা পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলে অখণ্ডপ্রভা তাঁকে শরীর বা ডিঙা দিয়ে দেবীতে রূপান্তরিত করেন। আমাদের মতো কোতিদের দেবতা, তাই মর্ত্যলোকে তাঁর নাম হয় কা..." কাইতি বলতে গিয়েও থেমে যায় শর্মিলা। সে জানে, ভুল করেও এ নাম মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে বিপদ আছে।

"সেইজন্যই বছর বছর এই ডিঙ্গিরি করা হয়, যাতে কাইতি নিজের শরীর বদলাতে পারে, এবং তার বদলে সে হিজড়েদের দান করে কিছু বিশেষ ক্ষমতা! তা-ই তো?" অরিত্র প্রশ্ন করে।

শর্মিলা নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়। অরিত্র খানিকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবে, তারপর বলে, "এ কাহিনি কি সত্যি? মানে কোনো পুরাণের কাহিনি? কোনো পুঁথি-টুথি আছে?"

"উঁহু, কোনো পুঁথি নেই। কুক্কুরী মা বলেছিল, এ হল হিজড়েদের নিজেদের গল্প। যিনি প্রথম কুক্কুরী মা ছিলেন, তিনিই নাকি বলে গিয়েছিলেন, এ কাহিনিকে বাইরে থেকে আমরা যা ভাবি, এ কাহিনি আসলে তা নয়। একজন হিজড়ে প্রথম বয়সে যখন বুঝতে পারে সে কোতি, তখন এ সমাজের তাড়নায় তার নিজেকে বীভৎস, কুৎসিত মনে হয়। মনে হয় সে একখানা আস্ত পিশাচ, যার এ সমাজে থাকাই উচিত না। কিন্তু পরে সে যখন নিজের সত্যিকে স্বীকার করে, গুরুমার দীক্ষা নিয়ে নিজে থেকে হিজড়ে হয়, তখনই সে হয়ে ওঠে দেবী, বরদাত্রী, নিজের মর্জির মালিক। একই সঙ্গে হিজড়ানি ও রাজরানি! কোতি থেকে হিজড়েতে উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনিই আসলে কাইতি মা-র গল্প। তবে কোনো পুঁথিতে এর নাকি হদিস মিলবে না। এ কাহিনি নাকি মৌখিক। গুরু-চেলি পরম্পরায় বাহিত হচ্ছে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে।"

শর্মিলার কথা শুনে অরিত্র ঠোঁট কামড়ায়। তারপর বলে, "সবই বুঝলাম। কিন্তু এসবই তো গল্প। এ শুনে আমাদের কী লাভ! কালকের ডিঙ্গিরি শুদ্ধির অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে কী করা হবে, সেটা বলো।"

এই প্রশ্ন শুনে শর্মিলা কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, "এই ডিঙ্গিরি শুদ্ধি অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনোভাবে এই অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় তাহলে বড়োমা আর কোনোদিন দেবী হতে পারবেন না, অনন্তকাল ধরে পিশাচিনী হয়েই তাঁকে থেকে যেতে হবে।" একটু থামে শর্মিলা, তারপর বলে, "একবার ডিঙ্গিরি অশুদ্ধ হলে সাত দিন পর আবার তাঁকে শুদ্ধ করার অনুষ্ঠান হয়। এই সাত দিন বড়োমা অস্থায়ীভাবে গোপনে কারও শরীর বাসা বেঁধে থাকেন। তারপর শুদ্ধি অনুষ্ঠানে বড়োমা আবার তাঁর নতুন ডিঙা বাছেন। তবে যাদের জন্য অনুষ্ঠান আগের বার অশুদ্ধ হয়েছিল, তাদের জীবন্ত সমাধি দিতে হয়। যে কুড়িজন খোরাকি বেঁচে যায়, তাদেরকেও! তোমাদের সঙ্গেও তা-ই হতে চলেছে।"

কথাটা শুনে চিতুর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অরিত্র বুঝতে পারে, এই ঠান্ডা আবহাওয়াতেও সে রীতিমতো দরদর করে ঘামছে। একসময় একটা ঢোঁক গিলে চিতু জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের এই বড়োমার থেকে বাঁচার কি কোনো উপায় নেই? বড়োমাকে শেষ করার কোনো উপায় নেই!"

শর্মিলা এবার চোয়াল শক্ত করে। তারপর বলে, "উপায়! কী জানি, উপায় কিছু আছে কি না! তবে প্রথম কুক্কুরী মা অখণ্ডপ্রভা তাঁর গানে এমন কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, যা আমরা এখনও বুঝিনি। কিছু কথা, কিছু হিসেব যেন মিলছে

না কিছুতেই। এর মধ্যে বহুবার আমি বড়োমার গুহায় গিয়েছি, জানো। গুহার গায়ে আঁকা ছবিগুলো ভালো করে মিলিয়ে দেখেছি বড়োমার পালাগানের সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়। গুহার গায়ে আঁকা এমন কিছু ছবি আছে, যার সঙ্গে বড়োমার কাহিনির কোনো যোগসূত্র নেই। কোথাও যেন কিছু ফাঁক আছে। কিছু একটা যেন মিলছে না...”

“আচ্ছা, সেইজন্যই কি তুমি সেদিন আমায় ওই সাপের সিম্বলটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলে? একটা সাপ, যে উলটো হয়ে নিজের ল্যাজ নিজেই কামড়াচ্ছে। এটা কিন্তু মানুষের লোভের সিম্বল।”

“লোভ!” অরিত্রর কথায় শর্মিলা যেন চমকে উঠল।

“হ্যাঁ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন কালচারে এই সিম্বলটা দেখা যায়। তার মধ্যে একেক জায়গায় একেকরকম মিনিং। কিন্তু বহু জায়গাতেই এই সিম্বল মানুষের লোভকে ইঙ্গিত করে। মানুষের লোভ যেমন আখেরে তাকেই গিলে খায়, এই সাপও তেমনি নিজেই নিজের ল্যাজ কামড়ে ধরে।”

“লোভ... লোভ... লোভ!” হঠাৎই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় শর্মিলা। তাকে এভাবে উঠতে দেখে একটু যেন অবাকই হয়ে যায় চিতু। সে কিছু বলার আগেই শর্মিলা বলে, “আমাকে এক্ষুনি একবার গুহায় যেতে হবে... আমি যা ভাবছি তা যদি সত্যি হয়...”

কথা শেষ করার আগেই হন্তদন্ত হয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় শর্মিলা। ঠিক তক্ষুনিই তার কী একটা যেন মনে পড়ে যায়। পেছন ফিরে অরিত্রর দিকে তাকিয়ে সে বলে, “তোমার বন্ধুরা ধরা পড়েছে। ওই শালা ঢ্যামনা পুলিশ অফিসার ওদের ভুলিয়েভালিয়ে এনে কুক্কুরী মায়ের হাতে তুলে দিয়েছে। শুনলাম, শুয়োরটাকে বড়োমা নিতে নিতেও নেয়নি। একটা আঙুল কেটে ছেড়ে দিয়েছে এই শর্তে যে এদেরকেও ভুলিয়েভালিয়ে এখানে নিয়ে আসবে। যাদের এনেছে, তাদের মধ্যে দুটো ছেলে, একটা মাঝবয়সি মাগি। আরেকটা মেয়ে আছে, অল্পবয়সি, সে আবার বড়োমার খোরাকি হতে হতে বেঁচেছে। হাতের তিনটে আঙুল কাটা। ও নাকি বাড়িতে অন্য মাগিটার সঙ্গে একা একা ছিল। তখনই বড়োমার কোপ পড়ে। ওকে নাকি মেরেই ফেলছিল, ঠিক সেই সময় তোমার প্রেমিকরা বাড়ি ফিরে আসে, একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে মেয়েটিকে কোনোভাবে বাঁচায়।”

একটু থামে শর্মিলা। তারপর অরিত্রর দিকে তাকিয়েই বলে, “তোমার প্রেমিক তোমার জন্য খুব চিন্তা করছিল। বারকয়েক আমায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করল। আমি কিছু বলিনি।”

অরিত্রর প্রেমিক... মানে সৌরভ... কিন্তু শর্মিলা তো অরিত্রকে চেনে না, তাহলে সৌরভ যে ওর প্রেমিক, সেটা চিনল কী করে? এর মানে কি...

“হ্যাঁ, তোমাকে আমি প্রথম দিনই চিনতে পেরেছিলাম। শুধু চিতুর কথায় কুক্কুরী মা-কে বলিনি। আজ সকালে মজা করেই তোমায় জিজ্ঞেস করছিলাম, এই হিজড়েদের দলে কীভাবে এলে। দেখতে চাইছিলাম, তুমি কী বলো। যা-ই হোক, এখন তোমার কিছু একটা দাও! তোমার প্রেমিককে দেব, যাতে তার দুশ্চিন্তা কমে।”

সবটা বুঝে উঠতে খানিকক্ষণ সময় নেয় অরিত্র। এতদিন ওর মনের ভেতর থাকা শর্মিলার ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে যেন পালটে যেতে থাকে। ও আর দেরি করে না, নিজের হাত থেকে একটা হ্যান্ড ব্যান্ড খুলে শর্মিলার হাতে দেয়। ব্যান্ডটির ওপর গোটা গোটা অক্ষরে খোদাই করা ‘ELIO’। এক বছর আগে সৌরভ নিজে এই ব্যান্ডটা উপহার দিয়েছিল অরিত্রকে। সৌরভের হাতেও এরকমই আরেকটা ব্যান্ড আছে। তাতে খোদাই করে লেখা ‘OLIVER’।

“এই যে এটা দিয়ো, ও দেখলেই চিনতে পারবে।”

শর্মিলা অরিত্রর হাত থেকে ব্যান্ডটা নিয়ে নেয়। তারপর দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দিয়ে দরজা দিয়ে দেয়। চিতু ঘরের লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দেয়। তারপর ক্রমশ জমাট বাঁধতে-থাকা অন্ধকারে মিনমিন করে জিজ্ঞেস করে, “আমরা বাঁচব তো অরিত্রদা?”

অরিত্র কিছুক্ষণ পাথরের মতো চুপ করে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “আশা ছাড়তে নেই, চিতু। শেষ নিশ্বাস অব্দি লড়ে যেতে হয়। আমার বাবা বলতেন। দেখো, আমরা বাঁচব... বাঁচবই!”

// ৯ //

“নতুন ডিঙা নাও মা, নতুন ডিঙা নাও”

গুহার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই অরিত্রর নিশ্বাসটুকুও বন্ধ হয়ে আসছিল যেন। আবার সেই গুহা! আবার সেই দম-বন্ধ-করা অন্ধকার, আবার সেই একহাঁটু জলের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ ধীরপায়ে এগিয়ে যাওয়া গুহার পেটের ভেতরে... উফ! যত এগোচ্ছে সামনের দিকে, যত পা চালাচ্ছে বরফের মতো ঠান্ডা জলের ভেতর, তত যেন বুকের ভেতর অস্বস্তি

বাড়ছে অরিত্রর।

এদিকে অরিত্রর সারা শরীর ভিজে চুপচুপে হয়ে গিয়েছে। আজও বাইরে মুশলধারে বৃষ্টি নেমেছে, সঙ্গে ঝড়। ঠিক সাত দিন আগের ডিঙ্গিরি উৎসবের মতোই। আঁধার নামতে-না নামতেই আজও গাঁয়ের লোকজন দ্বার দিয়েছে কুক্কুরী মা-র আদেশে। তার মধ্যেই এই মধ্যরাতে নির্জন রাস্তা দিয়ে হিজড়েদের দল কাইতি মা-র গান গাইতে গাইতে, খোল-করতাল বাজিয়ে নাচতে নাচতে এসে পৌঁছেছে এই গুহার ভেতর।

অরিত্র একবার পেছন ফিরে চাইল। গুহার নিকষ অন্ধকারে অনেকগুলি অস্পষ্ট আবছায়া মূর্তি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। যদিও ও জানে, ওর ঠিক পেছনেই সৌরভরা আসছে। আগের দিনের কুড়িজন খোরাকির সঙ্গে ওদেরকেও যে লাগবে আজকের শুদ্ধি অনুষ্ঠানে।

কথাটা ভাবতেই অরিত্রর সারা শরীরে একটা কাঁপুনি ধরল যেন! কী যে হতে চলেছে আজ এই রাতে গুহার মধ্যে, কে জানে। সত্যি সত্যিই কি আজ ওদের এখানে, এই গুহার ভেতর জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে। এই হিমশীতল জলের মধ্যে, এই কাদামাটির তলায়... কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই অরিত্রর দু-গাল যেন ভারী হয়ে এল। চোখ দিয়ে নিজের অজান্তেই গড়িয়ে পড়তে লাগল জলের ধারা। ইশ্! সাত দিন আগে অত সাহস করে হিজড়েদের এই অনুষ্ঠানে কেন যে ওরা আসতে গিয়েছিল, কে জানে! যদি না আসত, তাহলে হয়তো আজ এইভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধীরপায়ে এগিয়ে যেতে হত না।

এইসব ভাবতে ভাবতেই অরিত্ররা যে কখন গুহার প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছে তা ও খেয়ালও করেনি। আচমকাই টিলার ওপরে ফস করে মশাল জ্বলে ওঠায় একরকম ভয়ে লাফিয়েই উঠল ও। তারপর মশালের ক্ষীণ লালচে আলো গুহার ভেতর ছড়িয়ে পড়তেই অরিত্রর সারা শরীর আবার যেন শিউরে উঠল।

ওই তো গুহার গায়ে সেই বিকট বীভৎস ছবিগুলো আবার যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওই তো গুহার গায়ে সেই ভয়ংকর সাপটা, যা নিজের ল্যাজ নিজেই কামড়ে খাচ্ছে! আর ওই... ওই যে টিলার ওপরে সেই পালকিটা রাখা। অবিকল সাত দিন আগের মতোই নিজ স্থানে স্থির হয়ে আছে সেটা। কে জানে কেন পালকিটা দেখামাত্রই পেটের ভেতরটা কেমন যেন কুঁকড়ে গেল অরিত্রর।

"আইজ থেকে সাইত দিন আগে এইখানে বড়োমার ডিঙ্গিরি উৎসব অশুদ্ধ হয়েছিল কয়েকটা বাইরে থেকে আসা ছেলেমেয়ের জন্য! আইজ তাদের সবাইকে এইখানে বড়োমার সামনে খোরাকি দেওয়া হবে!" টিলার ওপর পালকির পাশে দাঁড়িয়েই বয়স্কা কুক্কুরী মা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর ফের বললেন, "এই গুহাই বড়োমার আবির্ভাবস্থান। এই গুহাতেই পেত্থম কুক্কুরী মা অখণ্ডপ্রভা বড়োমাকে নিজের শরীরে নেছিল তার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। আর আজ এই গুহাতেই আবারও বড়োমা তাঁর নতুন ডিঙা বেছে নেবেন। ডিঙ্গিরি অনুষ্ঠান শুদ্ধ হবে। কী রে, তোরা চুপ করে রইলি ক্যান! খোল বাজা। উলু দে। গান ধর! আজ যে বড়ো আনন্দের দিন!"

মশালের আলোয় কুক্কুরী মা-র চোখ দুটো চকচক করে উঠল যেন। তার পাশেই পালকির সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা আরেকজনের চোখেও ফুটে উঠল নৃশংস ক্ষুধা! কী অদ্ভুত, ও আজও স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে অরিত্রদের দিকেই! উঁহু, ও আর কেউ নয়, ভ্রমর। কুক্কুরী মায়ের একান্ত প্রিয় পোষ্য, থুড়ি, কন্যা। যদিও এখন তাকে দত্তক নিয়েছে এ খোলের নতুন কুক্কুরী মা, শর্মিলা।

শর্মিলার মুখের দিকে একবার তাকাল অরিত্র। টিলার নীচে কুক্কুরী মা-র পাশে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার কপালে জমাট-বাঁধা রাশি রাশি মেঘ। এ ক-দিনে শর্মিলাকে যতটুকু চিনেছে অরিত্র, তাতে ও নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, শর্মিলা এই অনুষ্ঠান চায় না। শর্মিলা আগে কীরকম ছিল, অরিত্রর জানা নেই, কিন্তু এ ক-দিনে ও অনেকটা বদলে গেছে। ও চায় না এতগুলো মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই এভাবে মারা যাক। বিশেষ করে ও চায় না চিতুর কোনো ক্ষতি হোক...

আচমকাই প্রচণ্ড খোল-করতালের শব্দে সংবিৎ ফিরল অরিত্রর। চারপাশে তাকাতেই ও দেখল, দলের বাকি হিজড়েরা আগের দিনের মতোই ফের প্রচণ্ড শব্দে খোল-করতাল বাজাতে শুরু করেছে। তারই সঙ্গে শুরু হয়েছে হাততালি, নৃত্য আর সুর করে করে কাইতি মা-র গান—

"গোপন ডিঙায় ছিল্যা মা গো, সাত রজনি ধইরা,
আজিক রাতে আইসো ফিরি, নতুন ডিঙা কইরা,
ফেরার আগেই ভাইঙ্গা গেলে গোপন ডিঙাখানা,
কী হবে কী হবে মা গো, কইতে পারি না না
ডিঙা নাও নাও নাও, ডিঙা নাও নাও নাও
নতুন ডিঙা লইয়া মা গো, বিপদ কাটাও।"

"বলি ও নতুন কুক্কুরী, কাইতি মা-কে ডিঙা বাছতে ক

দিকিনি।", টিলার ওপর দাঁড়িয়েই গর্জে উঠলেন বৃদ্ধা কুক্কুরী মা। কিন্তু কী অদ্ভুত! তাঁর কথার কোনো জবাব দিল না শর্মিলা। মশাল হাতে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়। কুক্কুরী মায়ের কথা অমান্য করার ভাবনাটুকু যে শর্মিলা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না কখনও, আজ তার হল কী! অরিত্রর মনে হল, শর্মিলা যেন মশাল হাতে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অরিত্রর পাশে দাঁড়ানো চিতুর দিকেই!

"বলি ও শর্মিলি! কানের মাতা খেলি নাকি রে। নাকি প্রথমবার বড়োমার নাম মুখে নিতে ভয় লাগছে! আরে বাবা, কুক্কুরী মা-রা বড়োমার নাম মুখে নিতে পারে, কোনো ভয় নেই!" কুক্কুরী মা কিছুক্ষণ থেমে অপেক্ষা করলেন শর্মিলার প্রত্যুত্তরের। কিন্তু এবারেও যখন শর্মিলা কিছু বলল না, কুক্কুরী মা একরকম বিরক্ত হয়ে নিজেই ফের গর্জে উঠলেন, "উফ! তুই এত নেকিচুদি কবে হলি রে শর্মিলা! ভয়ে মুখ দিয়ে রা বেরোচ্ছেনে! ছাড় ছাড়, তোকে কইরতে হবে না। আগের কুক্কুরী মা-ও বড়োমাকে আহ্বান করতে পারে। আমিই তাকে ডাকছি।" এই বলে শর্মিলার দিকে একবার বিষদৃষ্টি বর্ষণ করে কুক্কুরী মা ফের তালি দিতে দিতে গর্জে উঠলেন, "কাইতি মা গো! নিজের জন্য নতুন ডিঙা বাছো গো মা, নতুন ডিঙা বাছো!"

কুক্কুরী মা-র চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত গুহা জুড়ে নেমে এল একেবারে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। অরিত্র যেন স্পষ্ট শুনতে পেল, গুহার মধ্যে দাঁড়ানো প্রত্যেকটা মানুষের হৃৎপিণ্ড একই তালে একই লয়ে কম্পিত হচ্ছে। আর এর ঠিক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঠিক আগের বারের মতোই একটা বীভৎস আর্তনাদ ভেসে এল গুহার ভেতর থেকে।

সেই আর্তনাদের শব্দে হাত-পা-বাঁধা অবস্থাতেও সৌরভের সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল যেন। ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। শুধু ও কেন, সাবর্ণদা, দিশানি, দেবযানীদি—কেউই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যা দেখছে। অরিত্র! ওদের অরিত্র পাগলের মতো চিৎকার করছে! ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সারা শরীরে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। উন্মাদের মতোই কাঁদতে কাঁদতে, ছটফট করতে করতে প্রচণ্ড জোরে আর্তনাদ করছে ও।

"এই তো! এই তো এই তো এই তো... নতুন ডিঙা মা বেইছে নিছে গো! নতুন ডিঙা মা বেইছে নিছে। তোরা খোল বাজা, করতাল বাজা! ও তাম্বূলী, ওর আঙ্গুলগুলো কেইটে ফেল দিকিনি।" টিলার ওপর থেকেই বিশ্রীভাবে হাসতে হাসতে তাম্বূলীকে নির্দেশ দিলেন কুক্কুরী মা। মশালের লালচে আলোয় তার মুখ ক্রমশ যেন আরও পৈশাচিক হয়ে উঠছে!

আর এর ঠিক কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজের চুলের মুঠিতে একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল অরিত্র। তারপর চোখের নিমেষে কেউ যেন চুল ধরে ওকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ফেলল টিলার পাদদেশে। ততক্ষণে অরিত্রর গায়ের জ্বালা একটু যেন কমেছে। তাতেই কোনোমতে ধাতস্থ হয়ে চোখ খুলতেই ও দেখল, ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাম্বূলী। তার মুখে হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় ঠান্ডা হাসি। অরিত্রর দিকে তাকিয়েই সে হিসহিস করে বলে উঠল, "আঙুলখানা দাও দিকিনি কোতি! বড়োমাকে উৎসৃগ্ন করতে হবে যে! তারপরেই তো তিনি এই নতুন ডিঙায় চড়তে পারবেন। হে হে হে!"

এই বলেই অরিত্রর হাতটা সজোরে টেনে ধরল তাম্বূলী। তারপর নিজের শাড়ির আঁচল থেকে বের করে আনল একখানা ছোট্টমতো কী জিনিস। সারা গায়ে অসহ্য জ্বালা সত্ত্বেও অরিত্র একবার দেখাতেই চিনতে পারল জিনিসটা! জাঁতি! কাইতির প্রধান অস্ত্র। তাহলে কি এবার অরিত্ররই পালা! অরিত্রই হতে চলেছে কাইতির নতুন ডিঙা?

ধারালো জাঁতিখানা অরিত্রর আঙুলের ওপর ক্ষুধার্ত কামটের ন্যায় চেপে বসতে যাবে, তার আগেই গুহার মধ্যে একটি হিজড়ের কণ্ঠস্বর বিদ্যুতের মতো গর্জে উঠল, "বন্ধ করো... এই উপাচার বন্ধ করো। আমি হিজড়েদের বর্তমান গুরুমা, প্রধানা কুক্কুরী আদেশ করছি। এক্ষুনি এ প্রথা বন্ধ করো!"

শর্মিলার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে সমস্ত গুহা যেন কেঁপে উঠল। হিজড়েদের খোল-করতালের শব্দ সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল চোখের পলকে। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা বয়স্কা কুক্কুরী মা-ও যেন বুঝতে পারলেন না কী হচ্ছে। এ কী বলছে শর্মিলা! কাইতি মা-র প্রথা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হবে! ও কি পাগল হয়ে গেল!

"কী হচ্ছে, শর্মিলা! কী বলছিস তুই! তোর কোনো মাথার ঠিক আছে?" তাম্বূলী জাঁতি হাতেই চিৎকার করে উঠল।

"শর্মিলা নয় তাম্বূলী, কুক্কুরী মা। খোলের প্রধান গুরুমাকে কী বলতে হয় তোর জানা নেই? আর খোলের প্রধান কুক্কুরী মা হিসেবেই আমি তোকে আদেশ করছি। যা করছিস, এক্ষুনি বন্ধ কর। এক্ষুনি। এই মুহূর্তে।"

শর্মিলার কথায় তাম্বূলীর দু-গালে যেন নিঃশব্দে দুখানা চড় কষাল কেউ। সে এই খোলের নিয়ম হাড়ে হাড়ে জানে। মরে গেলেও এই খোলে প্রধান কুক্কুরী মা-র কথার অন্যথা করা যায় না। অগত্যা তার হাত অরিত্রর হাত ছেড়ে ধীরে

ধীরে নেমে এল নীচের দিকে।

"এই শর্মিলা! এ কী ঢেমনিগিরি শুরু করলি হ্যাঁ!" টিলার ওপরে দাঁড়িয়েই শর্মিলার দিকে ফিরে তাকালেন কুক্কুরী মা। তারপর ফের বললেন, "তুই জানিসনে এই নিয়ম বন্ধ করলে কী হবে! তুই জানিসনে আজকেও যদি বড়োমা নতুন ডিঙা না পান তাহলে তিনি আর কোনোদিন দেবী হয়ে উঠতে পারবেননে। এই আঙুলখাকি হয়েই তাঁকে থেকে যেতে হবে। তুই কি তা-ই..."

"কাইতি কখনোই কোনো দেবী ছিল না খুড়ি মা, কাইতি শুরু থেকেই এক ভয়ংকর পিশাচিনী ছিল। এখনও আছে। আর যতদিন এ পৃথিবীতে থাকবে, পিশাচিনী হয়েই থাকবে।" শর্মিলার কথায় বয়স্কা কুক্কুরী মা যেন বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "এ-এ কী বলছিস তুই, শর্মিলা! তোর মাতার ঠিক নেই! তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস।"

"আমি পাগল হয়ে যাইনি, খুড়ি মা। আমি শুধু সঠিক সত্যিটা বুঝতে পেরেছি। যে সত্যিটা এতদিন ধরে কোনো গুরুমা বোঝেননি। যে সত্যিটা প্রথম কুক্কুরী মা অখণ্ডপ্রভা তাঁর মৃত্যুর আগে সবাইকে বলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্ধ ভক্তি আর ক্ষমতার লোভে যা কেউ বুঝেও বুঝতে চায়নি।"

"কোন সত্যির কথা তুই বলছিস, শর্মিলা?" এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তাম্বুলী।

"এই সত্যি যে কাইতি আদৌ কোনো দেবী নন। তিনি পিশাচিনী। কাইতির যে কাহিনি আমরা যুগের পর যুগ ধরে শুনে আসছি তা পুরোটা ঠিক নয়। আসল কাহিনি এতদিন আমাদের চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা বুঝতে পারিনি।"

"এর মানে কী!" শর্মিলার কথার বিন্দুবিসর্গ যেন কিচ্ছু বুঝতে পারছিলেন না কুক্কুরী মা। মশালের আলোয় তাঁর ভাঙাচোরা মুখে ক্রমশ ফুটে উঠছিল বিস্ময়ের বলিরেখা।

"আপনার কখনও এই গুহার ছবিগুলো দেখে সন্দেহ হয়নি খুড়ি মা? কেন এই গুহার ছবিগুলোর সঙ্গে কাইতির গানের বহু অংশের কোনো মিল নেই! সেই যে কালনাগিনির ছবিটা, যেটা নিজেই নিজের ল্যাজ খাচ্ছে কিংবা সেই ছবিটা, যেখানে একটা জন্তু তার মুখে একটা সাপ ধরে আছে। আপনার কখনও মনে হয়নি এসব ছবির আসল মানে কী।"

শর্মিলার কথা শুনে যেন পাথর হয়ে গেছেন কুক্কুরী মা। সত্যিই তো! এই ছবিগুলি তিনি বহুবার দেখেছেন, তাঁর মনে কৌতূহলও জেগেছে, কিন্তু এই ছবিগুলোর অর্থ কী, সেটা অনুসন্ধান করার চেষ্টা কখনও করেননি তিনি। কিছুটা কাইতি মা-র প্রতি অন্ধ ভক্তিতে, বেশির ভাগটাই আদি অকৃত্রিম ভয়ে। তিনি আর কিছু বলে ওঠবার আগে শর্মিলা ফের বলে উঠল, "আমরা এতদিন ধরে ভুল গল্প জানি, খুড়ি মা। বলা ভালো, আমাদের এতকাল ধরে ভুল গল্প শুনিয়ে আসা হচ্ছে! কাইতির কাহিনিতে ইল্লিরাকে মনসার পাঠানো কোনো কালনাগিনিতে কামড়ায়নি, মা। এই কাহিনি মিথ্যা। আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখার জন্য এ কাহিনি তৈরি করেছে কাইতি নিজেই। যদি এ কাহিনি সত্যি হত, তার একটা অন্তত ছবি এ গুহায় থাকত, অথচ একটাও ছবি নেই। আছে এরকম কোনো ছবি? প্রথম কুক্কুরী মা কেন তবে এরকম ছবি খোদাই করাননি গুহার গায়ে! ভালো করে দেখুন, এখানে শুধু আছে এমন একটি কালনাগিনির ছবি, যে নিজেই নিজেকে কামড়াচ্ছে।"

কুক্কুরী মা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই যেন কেঁপে উঠলেন। তারপর কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বললেন, "তাহলে আসল কাহিনি কী, শর্মিলা?"

"আসল কাহিনি হল এই যে, গুহার গায়ে আঁকা এই কালনাগিনি আর কিছু নয়, মা, এ হল মানুষের লোভ।" মশাল হাতেই গর্জে উঠল শর্মিলা, "মানুষের লোভ নিজেই নিজেকে দংশন করে, যে শরীরে থাকে, তাকেই শেষ করে দেয়। প্রথম কুক্কুরী মা আমাদের এই ছবির মধ্যে দিয়ে এই সংকেতই দিতে চেয়েছিলেন। ইল্লিরা আসলে কোনো সাপের বিষ থেকে বাঁচতে সোমরস খায়নি। সে সোমরস খেয়েছিল লোভে পড়ে। নিজের নাচের পারদর্শিতায় এতটাই অহংকারী হয়ে পড়েছিল সে, যে তার মনে হয়েছিল, সোমরসের ওপর দেবতাদের মতো তারও অধিকার আছে।

"আর ইন্দ্র যখন তা জানতে পারেন, তখন তাকে শাপ দেন যে সে অমর হবে, কিন্তু অপ্সরা হিসেবে নয়। পিশাচিনী হিসেবেই। তাকে পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হয়ে এই পৃথিবীতে থাকতে হবে, এবং মানুষের আঙুল খেয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। যতবার সে নিজের আঙুল নিজে খাবে, ততবার অজস্র আঙুল তার হাতে গজিয়ে উঠবে। তার আঙুল কোনোদিন ফুরোবে না, তার লয়ও কোনোদিন ঘটবে না। অনন্তকাল নিজের আঙুল নিজে কেটে নিজেই সেই আঙুল খাওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হবে তাকে। পরে বহু কান্নাকাটির ফলে ইন্দ্র তাকে মুক্তির পথ বলে দেয় যে, যদি কোনো হিজড়ে স্বেচ্ছায় তাকে তার শরীর দেয়, তবে এই অভিশাপের থেকে তার মুক্তি ঘটলেও ঘটতে পারে। সেই কাহিনিই এই গুহায় বর্ণিত আছে এই ছবির মধ্যে দিয়ে, যা আমরা এতদিন বুঝেও বুঝিনি।" টিলা থেকে নেমে

এইবার গুহার গায়ে এক জায়গায় মশাল ধরল শর্মিলা। তাতে ফুটে উঠল এক বীভৎস নারীমূর্তির ছবি, যার হাতে অজস্র অসংখ্য আঙুল!

শর্মিলা থামল। সমস্ত গুহায় ভয়ংকর নীরবতা। তারই সঙ্গে গুহার ভেতর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা হাড়-কাঁপানো শৈত্য। শর্মিলাই আবার বলে উঠল,

"হিজড়েদের প্রথম কুক্কুরী মা অখণ্ডপ্রভা নিজে থেকে কাইতিকে কখনোই শরীর দিতে রাজি হননি। আমাদের এতদিন ভুল কাহিনি বোঝানো হয়ে আসছে, মা। আজ থেকে বহু বছর আগে কাইতিই আসলে অখণ্ডপ্রভাকে ভয় দেখিয়েছিল, তিনি যদি তাকে শরীর না দেয় তাহলে সে তার অপশক্তি প্রয়োগ করে এ গাঁয়ের সব মানুষের আঙুল তো কাটবেই, তারই সঙ্গে এ গাঁয়ের মানুষের ওপর নামিয়ে আনবে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া। তখন এ গাঁয়ের মানুষকে রক্ষা করতেই প্রথম কুক্কুরী মা তাকে শরীর দিতে রাজি হন। বদলে কাইতিও কথা দেয়, কারও ক্ষতি করবে না সে। ওসব নাম, যশ, প্রতিপত্তি—এসবই আসলে টোপ, দিনের পর দিন হিজড়েরা যাতে কাইতিকে শরীর দেয়, সেইজন্য।

"প্রথম কুক্কুরী মা অখণ্ডপ্রভা জানতেন তিনি অসহায়। কোনোভাবেই এই কাইতিকে তাঁর পক্ষে শেষ করা সম্ভব নয়। বরং কাইতির স্বার্থ সিদ্ধি হওয়ামাত্রই তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। তিনি এ-ও বুঝেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কাইতির আসল কাহিনি কেউ মনে রাখবে না। ইন্দ্রর অভিশাপে কাইতি তখন এক ভয়ংকর অপশক্তি। তার অলৌকিক ক্ষমতার শেষ নেই। অখণ্ডপ্রভা জানতেন তাঁর শরীর দখল করার পরই কাইতি, যারা আসল কাহিনি জানে, তাদের সকলের স্মৃতি অলৌকিক ক্ষমতাবলে মুছে ফেলবে। ও বাকিদের ভুল বোঝাবে যে সে আসলে দেবী, পিশাচিনী নয়। এবং যুগের পর যুগ ধরে সেই কাহিনিই চলতে থাকবে।

"সেজন্য তিনি বুদ্ধি করে এই গুহায় কাইতির কাহিনি সাংকেতিক ছবির আকারে খোদাই করে রেখেছিলেন, যাতে সকলে এই কাহিনি দেখতে পায় এবং যারা বোঝার—আসল সত্যিটা বুঝতে পারে, এবং কাইতিও কোনোরূপ সন্দেহ না করে। শুধু তা-ই না, তিনি পরবর্তী কুক্কুরী মায়েদের জন্য কাইতি মা-র গানও রচনা করে যান, যার মধ্যে তিনি খুব বুদ্ধি করে লুকিয়ে রেখে যান কাইতি মা-কে শেষ করবার উপায়!"

* * * * * * * * *

"কাইতি মা-কে শেষ কইরবার উপায়! কাইতি মা-র গানের মধ্যে! কী বইলছিস তুই, শর্মিলা! কীভাবে তা সম্ভব।" টিলার ওপর থেকেই কাঁপা-কাঁপা পায়ে নীচে এসেছেন কুক্কুরী মা। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময়। পুরো গুহাতেও এখন দম-বন্ধ-করা নীরবতা। কাইতি মা-কে যে শেষ করা যায়—এ কথা শুধু কুক্কুরী মা না, এ গুহার কেউই ভাবতে পারছে না।

"এই যে এক্ষুনি গানটা হল, সেই গানটাই তো কাইতিকে শেষ করার উপায়, মা। গানটা কী বলছে, শোনেননি? গোপন ডিঙায় ছিল্যা মা গো, সাত রজনি ধইরা/ আজিক রাতে আইসো ফিরি, নতুন ডিঙা কইরা/ ফেরার আগেই ভাইঙ্গা গেলে গোপন ডিঙাখানা/ কী হবে কী হবে মা গো, কইতে পারি না না!

"এর মানে কাইতি মা-র ডিঙ্গিরি অশুদ্ধ হলে, কাইতি মা সাত দিনের জন্য কোনো গোপন ডিঙা অর্থাৎ কোনো গোপন শরীরে আশ্রয় নেন। অবশ্যই ওই উৎসবের সময় গুহায় যারা থাকে, তাদেরই কারও শরীরে। এখন আবার উৎসব শুদ্ধ হওয়ার আগে, এক বছরের জন্য নতুন ডিঙায় ফেরার আগে যদি সেই গোপন ডিঙা ভেঙে যায় তাহলে কী হবে তা বলা যাচ্ছে না। এর মানে স্পষ্ট, যার শরীরে এই সাত দিন কাইতি লুকিয়ে আছে, তাকে যদি এর মধ্যে কোনোভাবে মারা যায় তাহলেই কাইতির শেষ হবে!"

"কিন্তু কার শরীরে কাইতি লুকিয়ে তা বুঝব কী করে?" কুক্কুরী মায়ের চোখ এবার ছলছল করছে। গলার স্বর ভেজা-ভেজা শোনাচ্ছে।

"এর উত্তরও প্রথম কুক্কুরী মা দিয়ে গিয়েছেন।" শর্মিলা এবার হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় গিয়ে গুহার গায়ে মশালটা তুলে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গেই গুহার গায়ে দেখা গেল একটা চারপেয়ে শ্বাপদের ছবি, যার মুখে ধরা একটা দীর্ঘ সাপ।

"আমাকে কুক্কুরী মা পদে অভিষেক করার সময় কী বলেছিলেন, মনে পড়ে মা? এই যে দিলুম কুক্কুরীকে, যত্নে রাখিস লা/ কালনাগিনি ধরতে পারে কেবল আমার ছা/ এক কাহিনি খোদাই করা, এক কাহিনি মুখে/ এক কাহিনি লুকিয়ে আছে এ কুক্কুরীর বুকে..."

শর্মিলা থামল। তারপর টিলার ওপরের দিকে আঙুল তুলে বলল, "ওই যে ও! ও-ই একমাত্র পারে কাইতিকে চিনতে। ভ্রমর!" শর্মিলার কথা শুনে সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকাল টিলার ওপরের দিকে। সেখানে পালকির পাশেই চার পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাজকাটা এক ক্ষুধার্ত শ্বাপদ। অন্ধকারে ক্ষীণ

আলোর বিকিরণে তার চোখ অগ্নিকুণ্ডের মতো জ্বলছে।

"প্রথম কুক্কুরী মা অখণ্ডপ্রভার দিয়ে-যাওয়া এই কুকুর কোনো যে-সে কুকুর নয় মা। সে ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। সেইজন্যই সে এত বছর বেঁচে আছে। আমরা যেটাকে নিছক কাহিনি ভাবি তা আসলে সত্যিই। ভ্রমর সত্যিই কয়েকশো বছর ধরে আমাদের খোলে আছে। অখণ্ডপ্রভা নিশ্চিত তাঁর সাধনায় কোনো দেবতার কাছ থেকে কাইতিকে শেষ করবার উপায় জেনেছিলেন এবং ভবিষ্যতে কখনও ডিঙ্গিরি অশুদ্ধ হলে কাইতিকে খুঁজে বের করার জন্য এ কুকুরকে পেয়েছিলেন। ও-ই একমাত্র পারে বলতে, কাইতি কার শরীরে আছে!"

শর্মিলার কথা শেষ করার আগেই কুক্কুরী মা হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন, "তোর কথা যদি ঠিক হয়, তবে এই হাতে কত পাপ কইরেছি রে শর্মিলা। না জেনে কত নিরীহ হিজড়েকে তুলে দিয়েছি ও রাক্ষুসির হাতে! তুই আমায় আগে এত কিছু বলিসনি কেন! কেন? আগে বললে হয়তো কিছু প্রাণ বাঁচত!"

"আমি নিজেও জানতাম না, কুক্কুরী মা সবটা। কালকেই ওই কোতির সঙ্গে কথা বলার পর গুহায় এসে সবটা বুঝতে পেরেছি। তা ছাড়া আমি আপনার বিরুদ্ধে যাব, সে কথা কখনও ভাবতেও পারিনি। কিন্তু কিছুদিন আগে এই খোলে যখন চিতু আসে, ওকে দেখে আমার ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। বিশ্বাস করুন, আমি চাইনি চিতুর কিছু হোক। সেইজন্য প্রথম থেকে চেষ্টা করে গিয়েছি, যাতে এই ডিঙ্গিরি না হয়। কীভাবে এই সমস্ত কিছু আটকানো যায়। প্রথমবার চিতু বেঁচে গেলেও এইবার ওর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেইজন্য আমি পাগলের মতো খুঁজেছি এইসব কিছু শেষ করার উপায়। আর কাল যখন সব বুঝলাম, তখন আর আপনাকে বলার সাহস করিনি। কারণ তখনও একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি যে কাইতি কার শরীরে আছে... কিন্তু এখানে এসে ডিঙ্গিরি শুরু হওয়ার পরই আমি তা বুঝতে পারি..." শর্মিলার কথা শেষ করার আগেই গুহার মধ্যে একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ শোনা গেল।

"আআআআ..." শর্মিলাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সেদিকে তাকাতেই প্রচণ্ড বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গেল অরিত্র। ও দেখল ভ্রমর, সেই ভয়ংকর হিংস্র কুকুরটা কখন যেন টিলার থেকে নেমে এসে চিতুর হাতে কামড় বসিয়েছে! তারই কামড়ে চিতু প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করছে।

"এ কী! এ কী শর্মিলাদি, ওই কুকুরটা চিতুর হাত কামড়ে ধরেছে কেন! ওকে ছাড়তে বলো! চিতু তো কিছু করেনি!"

অরিত্র এবার পাগলের মতো দৌড়োতে লাগল চিতুর দিকে। উফ, কুকুরটা কী বিশাল জোরে কামড়ে ধরেছে চিতুকে। মনে হচ্ছে, হাতটাই ছিঁড়ে নেবে যেন। অরিত্র যখন চিতুর একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে, তখনই পেছন থেকে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল শর্মিলা, "দাঁড়াও!"

শর্মিলার প্রচণ্ড চিৎকারে অরিত্র থেমে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাল। শর্মিলা যেন মশাল হাতে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেই অবস্থাতেই ভাঙা-ভাঙা গলায় ও বলে উঠল, "ভ্রমরের কোনো ভুল হয়নি, অরিত্র... ও... ও চিতু নয়... ও কাইতি! মনে আছে, ডিঙ্গিরি অশুদ্ধ হওয়ার পর থেকেই ভ্রমর তোমার আর চিতুর দিকে সবসময় তাকিয়ে থাকত! প্রথম প্রথম খেয়াল না করলেও পরে আমার সন্দেহ হয় যে ভ্রমর কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। পরে একটু তলিয়ে ভাবতেই বুঝতে পারি যে না, ভ্রমর আসলে কাইতির গোপন ডিঙা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু কাইতি তোমার না চিতুর, কার শরীরে আসলে আছে তা এখানে আসার আগেও নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারিনি। সেদিনকে তুমি যখন বললে, তোমার সারাদিন খুব ঘুম পায়, তখন একটা সন্দেহ ছিল অবশ্য। কারণ আমরা তোমাদের খাবারে কোনোরকম ঘুমের ওষুধ মেশাইনি। তাহলে তোমার ঘুম পাচ্ছে কেন!

"কিন্তু সেটা আগেভাগেই প্রকাশ করলে কাইতি সতর্ক হয়ে যেত। সেইজন্য এখানে এসেও দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করছিলাম কাইতির ডিঙা বাছা পর্যন্ত। যেই মুহূর্তে কাইতি তোমাকে ডিঙা বাছল, সেই মুহূর্তে সবটা জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। বুঝলাম, তোমার শরীরে কাইতি থাকতে পারে না, কাইতি আছে চিতুর শরীরে। আরেকটা জিনিসিও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। কেন প্রথম দিন থেকে চিতু তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে আসছে, সবসময় নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখছে। এর একটাই কারণ অরিত্র। চিতুর শরীরে সাময়িকভাবে আশ্রয়-নেয়া কাইতি প্রথম থেকেই তোমায় নিজের পরবর্তী ডিঙা হিসেবে বেছে নিয়েছিল! সেইজন্যই এতদিন সে তোমায় আগলে আগলে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, দিনের অধিকাংশ সময় নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে খুব সূক্ষ্মভাবে তোমায় ঘুম পাড়িয়েও রেখেছে, যাতে চিতুর সঙ্গে সারাদিন থেকেও তুমি সন্দেহ না করতে পারো যে চিতুর মধ্যেই কাইতি আছে..."

শর্মিলার কথা শেষ হওয়ার আগেই অরিত্রর পেছনে একটা প্রচণ্ড হাততালির আওয়াজ পাওয়া গেল। পেছনে ফিরতেই ও যা দেখল, তাতে যেন কিছুতেই নিজের চোখে বিশ্বাস

করতে পারল না! চিতু! ওর এই ক-দিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী চিতু এখন পাগলের মতো কর্কশ স্বরে হাসছে আর হাসতে হাসতেই অরিত্রর দিকে তাকিয়ে তালি দিচ্ছে।

ঠিক এই সময় শর্মিলার হাতের মশালটা আচমকাই দপ করে নিভে গেল। আর তারপরই সারা গুহায় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল হাড়-হিম-করা অন্ধকার আর প্রচণ্ড শৈত্য। এর ঠিক কয়েক মুহূর্ত পরেই গুহার ভেতর শোনা গেল খিলখিল করে একটা বিকট হাসির শব্দ আর সেই সঙ্গে ভয়ংকর কর্কশ হিজড়ে কণ্ঠস্বর, "আমায় কে ডাকলি র‍্যা? কার হল র‍্যা? কার হল? তোর হল?"

কিছু বুঝে ওঠবার আগেই হঠাৎ গুহার মধ্যে প্রচণ্ড কলরব উঠল। বাকিরা আগের রাতের মতোই উদ্ভ্রান্ত হয়ে যে যার মতো ছুটতে লাগল। শুধু অরিত্র চেঁচিয়ে উঠল প্রাণপণে, "চিতুকে শেষ করতে হবে, শর্মিলাদি! আমার শরীরে ঢোকার আগেই কাইতির গোপন ডিঙা ভেঙে ফেলতে হবে। একমাত্র তাহলেই..."

কথাটা শেষ করার আগেই কে যেন প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা দিল অরিত্রকে। সেই ধাক্কায় অন্ধকারে জলের মধ্যেই পড়ে গেল অরিত্র। আর ঠিক তখনই সরীসৃপের মতো ওর বুকের ওপর চেপে বসল চিতু। এ কি চিতু, নাকি চিতুর খোলস ছিঁড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে-আসা সেই ভয়ংকর বুড়ি হিজড়া কাইতি! তারপর একসময় ওর হাতের আঙুলগুলো টেনে নিয়ে সেই একই রকম কর্কশ কণ্ঠে হাসতে হাসতে বলল, "এতদিন ধরে এত যত্ন করে আগলে আগলে রাখলাম... এখন পালালে হবে... আঙুলগুলো দাও দিকিনি..."

এই বলেই কাইতি মুহূর্তের মধ্যে খ্যাঁচ করে জাঁতির একটা কোপ বসিয়ে দিল ওর ডান হাতের তর্জনীর ওপর। জাঁতির সেই ধারালো কামড়ে ওর নরম আঙুলটা সঙ্গে সঙ্গে আলাদা হয়ে গেল হাত থেকে!

"আআআআ..." পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল অরিত্র।

এরপর প্রচণ্ড যন্ত্রণা... চারিদিকের জলের মধ্যে মারাত্মক ছুটোছুটির শব্দ... সৌরভের আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে... আরও একটা আঙুলের ওপর জাঁতি চলল... আবারও যন্ত্রণা... সমস্ত কিছু আরও গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে... দূরে যেন কেউ এখনও গাইছে... ডিঙা নাও নাও নাও... হঠাৎই অরিত্রর ওপর বসা চিতুর পেছনে কেউ যেন ধারালো কিছু ঢুকিয়ে দিল... সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত গুহা জুড়ে কার যেন কান-ফাটানো আর্তনাদ... প্রচণ্ড সাদা আলোর বিস্ফোরণ...

অদ্ভুত একটা সুর ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে... তাহলে শেষমেশ আজ কি সমাপ্তি ঘটল শতাব্দীপ্রাচীন অভিশাপের! গুহার দেওয়াল, মাটি, জল প্রচণ্ড জোরে কেঁপে উঠছে যেন... যে-কোনো মুহূর্তে ধসে পড়বে... যদিও এই আওয়াজ বেশিক্ষণ শুনতে হল না অরিত্রকে... ওর চোখের সামনে ক্রমশই নেমে আসতে লাগল একটা কালো পর্দা... ঠিক নাচ শেষের পর মঞ্চের ওপর থেকে নেমে আসত যেরকম পর্দা... উফ, কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে অরিত্রর... এই বুঝি অরিত্রর শেষ... আর বুঝি বাড়ি ফেরা হল না, মঞ্চে ওঠা হল না, সৌরভের হাত ধরে শেষবারের মতো বলা হল না—ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি...

সমস্তটা চির অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগে শেষ একবার ডাকল অরিত্র, "সৌরভ..."

"অরিত্র... এই তো আমি!" সৌরভের একটা ক্ষীণ আওয়াজ পাওয়া গেল কি? এটা কি সত্যি নাকি ভ্রম! মৃত্যুর আগে কি কাছের মানুষের কণ্ঠস্বর এভাবেই কানে বেজে ওঠে? কে জানে, কে জানে...

// উপসংহার //

"তাহলে শেষমেশ আমরা বাড়ি ফিরছি!" গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হাসিমুখে বলল সৌরভ।

"হ্যাঁ বাবা! অনেক খেল দেখিয়েছ তোমরা। আর না! এইবার মানে মানে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।" সাবর্ণদা জোড়হাত করে নমস্কার করার ভঙ্গিতে মাথায় হাত ঠেকালেন।

তাঁকে দেখে অরিত্রসহ গাড়ির সকলে হো হো করে হেসে উঠল। অরিত্র এখন একদম সুস্থ, ওইদিন রাতের পর খানিকটা ব্লিডিং হয়েছিল, তবে শর্মিলার রক্ত ওর গ্রুপের হওয়ায় অনেকটা রিকভার করা গেছে। ভাগ্যিস সেইদিন শর্মিলা ঠিক সময় চিতুর শরীরে ছোরাটা ঢুকিয়েছিল। নইলে আজ হয়তো ওরা কেউই বাঁচত না।

দিশানিও এখন পুরোপুরি সুস্থ। সেই রাতের ঘটনার কথা ভাবলে এখনও সারা শরীর শিউরে ওঠে দিশানির। ভাগ্যিস সেদিন সৌরভরা সঠিক সময়ে ফিরে এসেছিল, নইলে যে কী হত কে জানে! বাড়ি ফিরে এসে ওরা দিশানি আর দেবযানীদি দুজনকেই সেদিন অচেতন অবস্থায় পায়। দিশানি আঙুল-কাটা অবস্থায় অচেতন, আর দেবযানীদি ঘরের ভেতরেই রক্তবমি করতে করতে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই

দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যায় ওরা। সাবর্ণদার ওপরমহলে যোগাযোগ থাকায় ডাক্তাররাও তৎপরতা দেখায় ভালোই। ঠিক যেমন অরিত্রর ক্ষেত্রেও দেখাল। ফলে দুজনেই রিকভার করেছিল পরের দিনের মধ্যে। তবে একটা ব্যাপার বেশ অদ্ভুত। সেই রাতের কথা দিশানির মনে পড়লেও, দেবযানীদির কিন্তু কিছুই মনে পড়েনি। এর পেছনে ঠিক কী কারণ, কেনই বা দেবযানীদি সেদিন ওরকম করছিল, সবটা সত্যি নাকি ভ্রম, এখনও পুরোটা বুঝতে পারেনি দিশানি! যা-ই হোক, ওর মুখেও আজ অন্ধকার পেরিয়ে আলো ফোটার হাসি।

শর্মিলাও আজকে ওদের সঙ্গেই গাড়ি করে কলকাতা চলে যাচ্ছে। সেদিনের সেই ঘটনার পর শর্মিলা আর ওই খোলে থাকতে চায়নি। তার সমস্ত দায়িত্ব তাম্বূলীর কাঁধে তুলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে খোল থেকে। নিজের হাতে চিতুকে হত্যা করার আঘাত থেকে সে এখনও সেরে উঠতে পারেনি।

"তুমি কিন্তু আমাদের এনজিও-তে যোগ দিতে পারো, শর্মিলাদি। আমরা খুব খুশি হব। বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে কথা বলেই আমি উপলব্ধি করেছি, একজন হিজড়েকে ঠিক কতটা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে প্রত্যহ যেতে হয়, কেন এই সমাজের প্রতি তাদের এত ঘৃণা, এত বিতৃষ্ণা। হিজড়েদের নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা পালটে গেছে। আমরা আমাদের এনজিও-র মাধ্যমে এবার হিজড়েদের ভালোর জন্যেও কাজ করব। তুমি চাইলেই যোগ দিতে পারো।"

"না ভাই, আমি এসবে নেই। আমি ভেবেছিলাম, সব মিটে গেলে চিতুকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাব। এতদিন যা জমিয়েছি তা দিয়েই দুজনের বেশ চলে যেত। তা-ই যখন হল না..." একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শর্মিলা। "তোমরা তোমাদের মতো কাজ করো। আমি দেখি, কলকাতায় কী করি। তবে মাঝেসাঝে দেখা করে আসব গিয়ে।"

শর্মিলা থামলে গাড়িতে একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে আসে। দেবযানীদি এতক্ষণ ফোনে বরের সঙ্গে বকবক করছিল। সকলের নীরবতা দেখে এইবার ফোন রেখে বলে ওঠে, "সব চুপ করে গেলি যে! একটা গুড নিউজ আছে!"

"গুড নিউজ? কী গুড নিউজ?", সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন ধেয়ে আসে।

"আই অ্যাম প্রেগনেন্ট। আমি মা হতে চলেছি। এখানে আসার আগেই রিপোর্ট করতে দিয়েছিলাম, আজ এতদিন পর তোদের জামাইবাবু রিপোর্ট জানালেন!"

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত গাড়ির মধ্যে আগের মতোই নীরবতা থাকে। তার পরের মুহূর্তেই প্রায় সবাই মিলে একসঙ্গে বলে ওঠে, "ও মাই গড! এ তো বাম্পার নিউজ! কলকাতায় ফিরেই পার্টিইইই..."

এর মধ্যেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আনন্দে যখন সবাই নিজের সিটের ওপর বসে আসন্ন পার্টির প্ল্যানিং করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন আচমকাই ওদের আনন্দে জল ঢেলে পেছনের সিট থেকে উঠে এসে দেবযানীদিকে প্রায় খামচে ধরল শর্মিলা, "তুমি গর্ভবতী? এখানে আসার আগে থেকেই?"

শর্মিলার মুখ-চোখে অদ্ভুত আতঙ্ক, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

"হ্যাঁ, এখানে আসার আগে থেকেই আমি গর্ভবতী। কিন্তু কেন?"

"তুমি তোমার পেটে বাচ্চা নিয়েই ওইদিন ওইখানে ছিলে, যখন আমি চিতুকে শেষ করে ফেলি!"

"হ্যাঁ, ছিলাম তো। আমিও দেখেছিলাম সেই আলো... কেন বলো তো!"

দেবযানীদির কথা শুনে সিটের ওপরেই মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে বসে পড়ে শর্মিলা, "সর্বনাশ হয়ে গেছে... সর্বনাশ..."

গাড়ির সকলে এবার সিরিয়াস হয়ে ওঠে। অরিত্র গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে, শর্মিলাদি? তোমার মুখটা এরকম কালো হয়ে গেল কেন? কী হয়েছে, সত্যি কথা বলো।"

শর্মিলার গলা এবার কেঁপে ওঠে। নিজের মাথায় হাত দিয়ে সে কোনোমতে বলে, "তোমাদের বলা হয়নি। কাইতি মা-কে শেষ করার ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে... যদি কখনও কাইতিকে শেষ করতে হয় তাহলে তাকে শেষ করার সময় তার ওই গুহার মধ্যে যেন কোনো গর্ভবতী মহিলা না থাকে। কারণ যদি ওই সময় কোনো গর্ভবতী মহিলা ওখানে উপস্থিত থাকে তাহলে..."

"তাহলে?" সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করে। শর্মিলা এ প্রশ্নের উত্তরে কোনো উত্তর দেয় না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে। অরিত্রদের গাড়ি হিজড়িয়া গ্রাম ছেড়ে এগিয়ে চলেছে কলকাতার দিকে। বাইরে দূর আকাশের গায়ে তখন রাশি রাশি কালো মেঘ জমছে। কালবৈশাখী কেটে গেছে বটে... কিন্তু প্রকৃতি কি আবার তৈরি হচ্ছে নতুন কোনো আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের জন্য?

কে জানে!



আগমবাগীশ এবং মধুপুরের দানব

অরিজিৎ ভট্টাচার্য্য



একদিকে সুউচ্চ পর্বতমালা এবং অন্যদিকে ঘন সবুজ অরণ্যের মাঝে এক বিশাল সমতল জায়গা জুড়ে বেশ অনেকগুলো গ্রাম। এদের সকলের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ, পাহাড়ের কোল বেয়ে শুধুমাত্র একটাই রাস্তা এই সমতলের সমস্ত গ্রামের সঙ্গে শহরের কোনোভাবে একটা ক্ষীণ যোগাযোগ রেখে দিয়েছে। বিরাট সমতলভূমির সমস্ত গ্রামের মধ্যমণি হল মধুপুর গ্রাম। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সব কয়টি গ্রামের আবহাওয়া যেমন মনোরম, তেমনই উর্বরা এখানকার মাটি। আশপাশের সব গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা বলেন, এখানকার মাটিতে সাক্ষাৎ ভগবানের বাস। প্রায় সব ধর্মের লোকেরা বসবাস করেন এবং সবার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে নিজের ঘরের লোকেদের মতোই। বিপদে-আপদে সবাই একজোট হয়ে

সেই সমস্যার মোকাবিলা করে, তা ছোটো হোক বা বড়ো কোনো সমস্যা। যাদের কোনো না কোনো সময় কিছুদিনের জন্যেও গ্রামে থাকার অভিজ্ঞতা আছে, তারা বিলক্ষণ জানে যে, গ্রামের প্রত্যেকেই তাদের প্রতিবেশী তো বটেই, এমনকি তাদের গ্রামের শেষে যে পরিবার থাকে, তারও খোঁজ রাখে একদিন দেখা না পেলেও।

নিজেদের এই পরিবারসুলভ মানসিকতাটা তো বটেই, কিন্তু এই মধুপুর গ্রামে এটা ছাড়াও আরও একটা কারণ আছে বলে মনে করেন এই গ্রামের প্রায় সবাই। একমাত্র মধুপুরেই আছে একটি ভগবান বিষ্ণুর মন্দির, সেই মন্দিরের যেমন অপূর্ব কারুকার্য, তেমনই সুন্দর তার ভেতরের কষ্টিপাথরের তৈরি ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শায়িত মাঝারি আকৃতির একটা মূর্তি। ভগবানের চক্ষুমুদ্রিত বিগ্রহের দিকে তাকালেই যেন নিজের সমস্ত বিপদ মুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়ে এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে মন ভরে ওঠে। আশপাশের গ্রাম তো বটেই, অনেক দূর দূর থেকে, এমনকি শহর থেকেও এই মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তের সমাগম হয় প্রায় প্রতি সন্ধেয়। এখানকার সব লোকের অগাধ বিশ্বাস এই ভগবানের প্রতি। আর হবে না-ই বা কেন, সবার মতে আরাধ্য এই দেবতা যে জীবন্ত, যেন সাক্ষাৎ ভগবান নিজে নিদ্রামগ্নভাবে চোখ বন্ধ করে আছেন, কিন্তু সমস্ত ভক্তের কথা, সবার মনের দুঃখ উনি বুঝতে পারেন, কিছু না বলতেও টের পেয়ে যান কার কী বিপদ। আর সেই সমস্যার সমাধানও হয় খুবই দ্রুতভাবে। এমনকি কোনো দম্পতি যদি ভক্তিভরে এই ভগবানের কাছে এসে সন্তান কামনা করে তাহলেও ভগবান তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করে থাকে, এমনটাও হয়েছে বহু দম্পতির ক্ষেত্রে। তাই এই ভগবানের যাতে নিদ্রাভঙ্গ না হয় তাই মন্দিরে প্রবেশ করার পর থেকে পুজো শেষ না-হওয়া অবধি কেউ কথা বলে না। এমনকি কাঁসর-ঘণ্টা বাজানো সম্পূর্ণভাবে নিষেধ গর্ভগৃহের ভেতরে। কোনোভাবে বাইরের কথা যাতে কানে না পৌঁছোয়, তার জন্য সবাই নিজেদের কানে তুলো গুঁজে রাখে, যতক্ষণ মন্দিরের ভেতরে থাকে। এই মন্দিরের প্রধান বৃদ্ধ পূজারি, যার কথামতন যবে থেকে এই মন্দিরের পুজো শুরু হয়েছে, এই রীতি নাকি সেই প্রথম দিন থেকেই সবাই মেনে এসেছে। দৈনন্দিন কাজের শেষে সন্ধের দিকে সকলেই ভগবানের পুজো দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে। কিন্তু কথায় বলে সুখ চিরস্থায়ী নয়। মধুপুরসহ গোটা সমতলভূমির সমস্ত গ্রাম সেই অমোঘ সত্যির থেকে বিরত থাকল না, খোদ ভগবানের বাসভূমিতে শুরু হল এক ভয়ানক উপদ্রব।

সেদিন অপরাহ্লের একটু পর মন্দিরের বহুদিনের বৃদ্ধ পুরোহিত একলাই ভগবানের আরতির জন্য পুষ্পপাত্রে রকমারি ফুল সাজিয়ে রাখছিলেন। ওঁকে সাহায্যের জন্য এই মন্দিরের যে তিনজন সেবায়েত আছে, তারা তখনও এসে পৌঁছোয়নি সেখানে। প্রতিদিন ভগবানের সান্ধ্য আরতিতে পুজো দেওয়ার লোক ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে, সবাই যাতে ভগবানের পায়ে ফুল দিতে পারে তাই বৃদ্ধ পূজারি ওঁর কম্পিত হাতে রকমারি ফুল জোগাড় করে রাখছেন। যতটা বেশি ফুল রেখে দেওয়া যায়, তত বেশি ফুল দেওয়ার সুযোগ পাবে ভক্তরা। ছোটোবেলায় ওঁর ঠাকুরদার মুখে শুনেছিলেন, এই মন্দির আর এই ভগবান যে কোন সময় থেকে এখানে আছে তা সঠিকভাবে কেউই জানে না, কিন্তু এই মন্দির আবিষ্কার হওয়ার পর মাত্র দুজন লোক নিয়ে এই মন্দিরের পুজো শুরু হয়েছিল এবং আজ সেখানে ভক্তের সমাগমের জন্য সামনের এই বিরাট খোলা মাঠও যেন বড্ড ছোটো, এইসবই তো ভগবানেরই লীলা। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই আচমকাই ভয়ানকভাবে দুলে উঠল মাটি, পুরোহিতমশাই আচমকাই সেই প্রবল কম্পনের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে মন্দিরের মেঝেতেই গড়িয়ে পড়ে গেলেন। গর্ভগৃহের ভেতরে রাখা ভগবানের ফুল-মালা দিয়ে সাজানো পেতলের ঘটটা ধাতব শব্দে উলটে পড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, ঘটের জল মেঝেতে সমুদ্রের মতন ঢেউ তুলল, মন্দির প্রাঙ্গণে শায়িত অবস্থাতেই এক বিকট কান-ফাটানো চড়চড়াৎ শব্দে বাইরের দিকে তাকাতে বিহ্বল পুরোহিতমশাই দেখতে পেলেন, মন্দিরের সামনের বিশাল মাঠের মাঝখান থেকে বিরাট ফাটল ধরেছে সেই প্রবল কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেই ফাটল থেকে জলের বদলে উঠে আসছে হলদে বালুকারাশি, ঠিক যেমনটা দেখা যায় কোনো মরুভূমিতে। সেই বিপুল বালুরাশির সমুদ্রে এবার এক বিশাল ধুলোর ঘূর্ণিঝড় উঠল, সেই ঝড় যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে নিমেষের মধ্যে চতুর্দিক ছেয়ে গেল ধুলো আর বালির অন্ধকারে। অপরাহ্লের তেজোদৃপ্ত সূর্যালোককে আচ্ছন্ন করে বসল সেই কালো ধুলোর ঝড়, সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেই একটা গোঙানির সঙ্গে আবির্ভাব হল এক বিকট কালো বর্ণের দীর্ঘকায় দানবমূর্তির। সেই প্রেতাকৃতির কালো ছায়া স্পর্শ করল মন্দিরের চাতাল, প্রেতের গরম নিশ্বাসের হলকা এসে লাগল সেই মুহূর্তে বোধ-জ্ঞানশূন্য বৃদ্ধ পূজারির দেহে। হঠাৎ ভূমির কম্পনের ফলেই হোক বা এমন অদ্ভুত অকল্পনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার ফলেই হোক, মন্দিরের পূজারি জ্ঞান হারালেন।

মন্দিরের পূজারির যখন জ্ঞান ফিরল, তখন উনি দেখতে পেলেন চারদিকে কালো ধোঁয়া আবৃত, কানে এল বহু লোকের সম্মিলিত ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার। একটু ধাতস্থ হতে বুঝতে পারলেন, উনি মন্দিরের মেঝেতেই শুয়ে আছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। এই প্রথম বোধহয় ভগবানের সন্ধ্যারতি বাদ পড়ল। এ যে খুবই অলুক্ষুনে ব্যাপার। কে জানে, কী বিপদ এসে উপস্থিত হল এই গ্রামে। ভীত, অবসন্ন শরীর নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, আকাশের এককোণে একফালি চাঁদ উঠেছে, কিন্তু তার আলো যেন আজ বড্ড ফিকে। বৃদ্ধ পূজারি বাইরে বেরোতেই গ্রামের পাঁচ-ছয়জন ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে কারও মুখ বোঝা না গেলেও তাদের হৃদ্‌যন্ত্রের শব্দ বেশ স্পষ্টভাবেই পূজারির কর্ণগোচর হল। গ্রামের মোড়ল রমাকান্ত ভীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "ঠাকুরমশাই, আপনি সুস্থ আছেন তো?"

"এ কী কাণ্ড হল রমা? এমন ভয়ানক ভূমিকম্প এর আগে কখনও দেখেছ?"

"না ঠাকুরমশাই, এমন ঘটনা শুনিওনি এত বছরে। তবে একটু আগে যেটা হল তা যে শুধু ভূমিকম্প নয়, আমাদের গ্রামের পশ্চিমদিকের বেশ অনেক ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখনও সেই জায়গায় আগুন জ্বলছে। এ কোন অমঙ্গলের ইঙ্গিত ঠাকুরমশাই? এ কেমন ধরনের ভূমিকম্পন?"

মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহের দিকে ফিরে দু-হাত জোড় করে কাঁপা-কাঁপা গলায় বৃদ্ধ পূজারি ওঁর আরাধ্য ভগবানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "রক্ষা করো নারায়ণ, এ কী নতুন বিপদ উপস্থিত হল তা তুমিই জানো।" ঠাকুরমশাইয়ের এমন কণ্ঠস্বরে ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা পাঁচজন জোয়ান লোকের সর্বশরীর শিহরিত হয়ে উঠল এক অজানা ভয়ে। পশ্চিমদিকে এখনও ধিকিধিকি করে জ্বলতে-থাকা বাড়িঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই এক কীট প্রবেশ করল রমাকান্তর মনে, ভূমিকম্পই যদি হয়ে থাকে তাহলে ওইদিকের গ্রামে আগুন লাগল কীভাবে?

যেদিন বিকেলের দিকে ভূমিকম্প হয়েছিল তা শুধুমাত্র মধুপুর আর তার আশপাশের দু-তিনটে গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক আলোচনার পরেও কেউ কোনো সমাধানে পৌঁছোতে পারল না। কিন্তু এমন অদ্ভুত ভূমিকম্পের কারণটাও কেউ বুঝতে পারল না। দিন সাতেকের মধ্যে এই ঘটনা যখন গ্রামের প্রায় সব লোক ভুলতে বসেছে, তখন আবার আচমকাই সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মতো থাবা বসাল এবং এবারে আরও ভয়ানকভাবে এই ভূমিকম্পের আত্মপ্রকাশ ঘটল। পাহাড়ের পাদদেশে যেখান থেকে সমতলের শুরু, সেটাই কোনারি গ্রামের সীমানা। এই গ্রামের প্রায় বেশির ভাগ লোক চাষাবাদ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। সেদিন রবিন চাষি সকাল সকাল আরও পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে নিজেদের খেতে আসে। বেশ কিছুদিন ধরে ওরা লক্ষ করছে যে ধানের গোড়াগুলো কীরকম যেন হলদেটে বর্ণ ধারণ করছে আর নেতিয়ে পড়ছে। তাই ওরা আজ সকাল সকাল এসে মাটি খুঁড়ে সে জায়গায় কিছু ওষুধ ছড়াবে, যাতে বাকি ফসলগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। রবিন নিজের খেতে কোদালের দু-কোপ মারার পরেই কাদামাটির ভেতর থেকে হলদেটে বালির সঙ্গে কালোমতন তরল বেরোতে শুরু করল। রবিন প্রথমে একটু অবাক হলেও ব্যাপারটায় তেমন পাত্তা দিল না, সে আবারও সেই জায়গায় আরও একবার কোপ দিতেই এক ভয়ানক "আউউউউ" শব্দ যেন মাটির গভীর থেকে উঠে এল, শব্দের আকস্মিকতা ও ভয়াবহতার কারণে হাত থেকে কোদালটা পড়ে গেল রবিনের। গর্তের যে জায়গা দিয়ে কালো জলের মতো তরল বের হচ্ছিল, সেখানে এখন একটা বিরাট গহ্বর হয়েছে, সেই গর্তের ভেতরে একটা স্পন্দন লক্ষ করল রবিন, যেন কোনো জীব ঘাপটি মেরে বসে আছে সেই জায়গায়। ব্যাপারটা কী তা জানার জন্য রবিন যেই না একটু ঝুঁকেছে, অমনি বিকট 'চড়চড়াৎ' শব্দে ওখানে উপস্থিত সবাই দু-হাত দিয়ে নিজেদের কান চাপা দিল। মুহূর্তের মধ্যে ওদের উর্বরা জমি চড়চড় করে ফাটতে শুরু করল। অবাকভাবে সেইদিকে তাকাতে সব দেখল, মাটি দু-ভাগ হওয়ার সঙ্গে সেখান থেকেই জলের বদলে উঠে আসছে হলদেটে বালি। এবারে সেই ফাটলের ভেতর থেকে শুরু হল ভয়ানক ধুলো আর বালির ঘূর্ণিঝড়, খেতের আশপাশের ছোটো ছোটো ধানের গোলাঘরের টিনের চালগুলো এই তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে আকাশে ছেঁড়া কাগজের মতো ঘুরতে লাগল, রবিনের সঙ্গে যারা এসেছিল, তারা সবাই সেই ঝড়ের তীব্রতায় এদিক-ওদিকে ছিটকে পড়ল, রবিনও নিজের প্রাণ বাঁচাতে ছোটার চেষ্টা করতে যেতেই দেখতে পেল, ঠিক পায়ের সামনে যেখান থেকে মাটিতে ফাটল তৈরি হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘকায় কালো অবয়ব বাইরে বেরিয়ে আসছে। সেই দীর্ঘদেহী প্রেত অবয়বটার মুখের দিকে তাকাতেই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল রবিন, সে দেখলে, দানবটার মুখের জায়গাতে বীভৎসভাবে বাইরে বেরিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। দানবটা তার মুখ আকাশের দিকে তুলে একটা অবোধ্য বুক-কাঁপানো চিৎকার করে উঠল, সেই চিৎকার এতটাই নির্মম যে আপনা থেকে হৃদ্‌যন্ত্র যেন স্তব্ধ হয়ে

আসে। দানবটার মৃত্যু লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আঠালো কাদামাটিতে আবৃত রবিনের চোখের দিকে। রবিন দেখল, সেই ভয়াল প্রেতের মুখের একপাশ থেকে লালার মতন কালো তরল বেরিয়ে আসছে, বোধহয় ওই কালোমতন তরল এই দানব বিভীষিকার রক্ত। রবিন সেই বীভৎসতা সহ্য করতে পারল না, পালাতে চাইল সেখান থেকে। কিন্তু হা অদৃষ্ট! রবিনের পা দুটো সেই কাদামাটিতেই যেন জমে গেছে, রবিন শত চেষ্টা করেও একচুলও নড়তে পারল না সেখান থেকে। ভয়াল সেই দানব যে রবিনকে সম্মোহন করেছে তা সেই হতভাগা বোঝার আগেই দানবের মুখ থেকে বেরিয়ে এল লেলিহান অগ্নিশিখা। মুহূর্তের মধ্যে ঝলসে উঠল চারদিক আর তারপরই এক বিকট হিংস্র হুংকার দিয়ে সেই অগ্নিদানব আবার তলিয়ে গেল ভূগর্ভের অতল গভীরে আর মাটির ওপরে শুধু পড়ে রইল কিছু রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত লোকের দেহ, ঝলসে-যাওয়া ধানের খেত আর রবিনের সম্পূর্ণ পুড়ে শুকিয়ে-যাওয়া কালো শরীর। শয়তানের প্রস্থানের সঙ্গে ঝড়ের দাপট কমলেও মাটির সমস্ত উর্বর শস্যশ্যামলা জমি ডুবে গেল হলদেটে বালির সমুদ্রে। এই ভয়ানক ঘটনার কথা এবারে চারদিকে চাউর হতে বেশি সময় লাগল না, ঘটনাস্থলে সেই গ্রাম ছাড়াও প্রায় সব গ্রাম থেকেই লোকেরা দেখতে এল, তাদের মধ্যে মধুপুর গ্রামের মোড়ল রমাকান্তও ছিল, কিন্তু ঘটনার বীভৎসতায় সবাই মুহূর্তের মধ্যে সেই জায়গা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করল। এবারে এই ঘটনায় ওখানে উপস্থিত প্রতিটা লোকের মনে এক অজানা আতঙ্ক গেড়ে বসল। ওদের প্রতিপক্ষ যে ঠিক কে এবং কীসের জন্য তার এত আক্রোশ, সেটাই ওরা কেউ কিছুতেই বুঝে উঠে পারল না।

মধুপুরের বৃদ্ধ পূজারি ধীরে ধীরে রমাকান্তর মুখে সবই শুনছিলেন এবং শোনার মাঝে মাঝেই যেন কেঁপে উঠছিলেন। ঘটনার বিবরণ শেষ হলে পর ফ্যাকাশে মুখে উনি নিজের ঘরে ঢুকলেন এবং কিছু সময় পরে হাতে একটা কাগজ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। একবার ওঁর চারপাশে খুব গোপনে তাকিয়ে রমাকান্তর হাতে সেই কাগজখানা গুঁজে দিয়ে বললেন, "বাছা! এই চিঠিটা আজ রাতেই তুমি শহরের ডাকবাক্সে ফেলে এসো, এ তোমার কাছে আমার অনুরোধ। আমাদের সবার বিপদে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই আমি।"

অতর্কিতে ভূমির কম্পন আর তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের আবির্ভাব এবং সেই ঝড় কমলে দেখা যায়, সেখানকার মানুষ-পশু সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর সেই জায়গার উর্বরা সজীব মাটি পুড়ে কালো বর্ণ ধারণ করেছে আর সেখানে জমে আছে হলদেটে বালির স্তূপ। এই বিভীষিকার সঙ্গে গ্রামের লোকেরা কিছুটা হয়তো মানিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে শুরু হল আরও একটা জঘন্য ঘটনা। হঠাৎ করেই খবর শোনা যেতে লাগল যে সাত বছরের মধ্যের কিছু বাচ্চা চুরি যাচ্ছে মধুপুরসহ বাকি সব গ্রামেই। ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরের সামনে সন্তানহারা বাবা-মায়ের দল হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেও এর কোনো সুরাহা হলই না, বরং বাচ্চাদের চুরি আরও বেড়ে যেতে লাগল, সবাই এটা ভালোমতন লক্ষ করল, যে গ্রামে সেই অগ্নিদানবের আবির্ভাব হয়, ঠিক সেখান থেকেই বাচ্চারা নিখোঁজ হয়ে যায় তারপরে। একে অদৃশ্য দানবের অতর্কিত আক্রমণে সবার জীবন ওষ্ঠাগত, তার ওপরে প্রতিনিয়ত বাচ্চা চুরির ঘটনায় মধুপুর এবং বাকি গ্রামের লোকেদের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসে চিড় ধরল, প্রতিবেশীদের মধ্যে বাড়তে লাগল সন্দেহ, সবার মনেই অন্যদের প্রতি অবিশ্বাস শুরু হল। বলা বাহুল্য, কয়েকদিন আগে অবধি যেটা সাক্ষাৎ ভগবানের বিচরণক্ষেত্র ছিল তা যেন নিমেষে নরকভূমিতে পরিণত হল।

এবারে সেই অদেখা শয়তান সপ্তাহ ঘোরার আগেই আবার আঘাত করল। বিরেঝাড় গ্রামটার শেষ সীমানা থেকে ঘন সবুজ অরণ্য শুরু। এখানকার বেশির ভাগ মানুষজন সেই জঙ্গলের কাঠ কেটে সেই কাঠ বিক্রি করে নিজেদের সংসার চালায়। সঞ্চয় কী, সেটা এরা প্রায় জানেই না, প্রতিটা দিনই এরা নতুনভাবে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। সেই গ্রামের বেশির ভাগ লোকেরাও এইরকম অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড শোনার পর থেকে তাদের যতটা সম্ভব সজাগ হয়েছে বা হওয়ার চেষ্টা করেছে। কোনো দৃশ্যমান শক্তির সঙ্গে লড়াই করা যায়, কিন্তু যে শক্তি অতর্কিতে আক্রমণ করে, যার নিশ্চিতরূপে কোনো আকার বোঝার উপায় নেই, সেই শক্তির সঙ্গে এরা মোকাবিলা করবে কী উপায়ে? কথায় বলে, "যদি যাও বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে।"

দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে যখন গ্রামের জোয়ান ছেলেরা সবে জঙ্গলে গেছে শুকনো কাঠ-পাতার সন্ধানে, ঠিক তখনই গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে ঘন জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা চাপা হিংস্র রক্ত-জল-করা শব্দ গ্রামের বাকি বৃদ্ধ-বউ-বাচ্চার কানে এসে পৌঁছোল। ছোটো বাচ্চাগুলো তাদের মায়ের গলা জড়িয়ে আতঙ্কে কেঁদে উঠল। এতদিনে মধুপুর আর তার আশপাশের অনেক জায়গায় সেই শয়তানের নৃশংস থাবা বসেছে, আজ সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন এই গ্রামেরও হতে

চলেছে, সেটা বুঝতে কারোই বাকি থাকল না। মুহূর্তের মধ্যেই জঙ্গলের আকাশ অকস্মাৎ কালো মেঘে ঢেকে গেল, সেই কালান্তক মেঘের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের সীমান্তে একটা ঘূর্ণিঝড় উঠল। সেই কালান্তক ঝড় জঙ্গলের ভেতরকার বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি মাটি থেকে দূর্বা ঘাসের মতো অবলীলায় উড়িয়ে নিয়ে এই গ্রামে প্রবেশ করল। সময়ের সঙ্গেই খুব দ্রুতভাবে সেই ঝড়ের বেগ প্রবল থেকে আরও প্রবলতর হয়ে উঠল, শোঁ শোঁ করে আওয়াজ করতে করতে এসে প্রবেশ করল গ্রামের ভেতরে। ঝড়ের শব্দে গ্রামের বৃদ্ধ মহিলারা তাদের বাচ্চাদের হাত ধরে বাইরের খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, কারণ তাদের মধ্যে কেউ আগের ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শী বা লোকমুখে শুনেছে যে এই অদৃশ্য দানব আসার সময় ভূমির কম্পন হয় আর খুব ঝড় ওঠে। তাই একদিকের খোলা জায়গায় সবাই দলবদ্ধ হয়ে বসে ছিল, যাতে তাদের প্রাণহানি অন্তত না হয়। কিন্তু এই দানব যেমন ধূর্ত, তেমনই তার আসুরিক শক্তি। গ্রামের বেশির ভাগ লোক যে জায়গায় জড়ো হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গার মাটি এবারে ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল, মনে হতে লাগল যেন এই মুহূর্তে পৃথিবী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সৃষ্টি রসাতলে যাবে। এবারে সেখান থেকেই মাটির বুক ফাটতে শুরু করল, হলদেটে বালির সঙ্গে মাটির চেরা ফাটল থেকে বেরিয়ে এল কালান্তক এক দানবমূর্তি। এখন এই মূর্তির অবয়ব অনেকটাই পরিষ্কার, এই কয়েকদিনে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সেটা দানবটার আচরণেই বোঝা গেল।

দানবটা যেন একটা ছোটো ঘূর্ণিকে ভর করেই ওপরে উঠে আসছে। হঠাৎ-ওঠা ঝড় আর মাটি দু-ভাগ হয়ে দানবের আগমনের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকেরা যেন সম্মোহিত হয়ে গেল, তারা নিষ্পলক চোখে তাদের মৃত্যুদূতকে দেখতে লাগল, দেখতে লাগল সেই দানবের নৃশংস ধ্বংসলীলা এবং অগ্নিতাণ্ডব। দানবটা প্রথমে ওই মানুষগুলোর অসহায়তার সুযোগে প্রথমে আশপাশের বাড়িঘর লক্ষ্য করে নিজের রোষানলের অগ্নিতে ধ্বংস করল, তারপর তার ক্রোধাগ্নি পড়ল সেই সম্মোহিত দলবদ্ধ অসহায় লোকদের ওপরে। এবারে সেই দানব একটা বিরাট 'হাঁ' করামাত্র সেখান থেকে এক লেলিহান অগ্নিশিখার পিণ্ড সেই অসহায় মানুষের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তাদের গায়ে আগুনের তাপ আসার পূর্বমুহূর্তে সেই মানুষদের ঘিরে একটা নীলাভ সুরক্ষা বলয় তৈরি হল, আর সেই জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড সেই বলয় ছোঁয়ামাত্র ঝুপ করে নিভে গেল। এই প্রথমবার দানবের আক্রমণ বিফল হল, এমন আকস্মিক ঘটনায় বোধহয় সেই দানবও সাময়িক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই বলয় উদ্দেশ্য করে আরও ভয়ংকর অগ্নিবর্ষণ করল, কিন্তু তারও পরিণাম হল সেই একই। নীলাভ বলয় ছোঁয়ামাত্র আগুন নিভে গেল নিমেষে। এবারে সেই ঝড়ের দাপটও কমে গেল যেন কোনো এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে। এবারে সেই দানবমূর্তি নিষ্ফল আক্রোশে আকাশের দিকে মুখ তুলে এক বিকট শব্দ করে মাটির ফাটলের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ধীরে ধীরে আকাশের কালো মেঘ কেটে সূর্যরশ্মি আবার মাটি স্পর্শ করলে ওখানে উপস্থিত সকলে লক্ষ করল ওদের থেকে একটু দূরে একজন দীর্ঘকায়, সাদামাটা পোশাক পরিহিত একজন ভদ্রলোক, ওঁর মুখের দিকে তাকালেই যেন মনের ভেতরে একটা আলাদা বলবৃদ্ধি হয়। ওঁর দিকে তাকাতে যেন সেই দলবদ্ধ আতঙ্কগ্রস্ত মানুষদের সম্মোহন কাটল। ওই দলের ভেতর থেকে পায়ে পায়ে সেই নবাগত ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন সিধু দলুই, এই গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত মোড়ল। ওঁর দিকে অবাকভাবে তাকিয়ে দু-হাত জোড় করে কম্পিত স্বরে বললেন, ''মহাশয়! আপনার পরিচয়?'' ও প্রান্ত থেকে গম্ভীর, দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর এল, ''সঞ্জীব হালদার, কিন্তু লোকে আমায় আগমবাগীশ বলেও সম্বোধন করে, সঞ্জীব আগমবাগীশ।''

মধুপুরসহ বাকি তিন গ্রামের সমস্ত লোক এতদিন যাবৎ পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোতে চাইত না। যদিও বা বেরোত তাহলেও নিজের প্রাণ হাতে করেই, কারণ সাক্ষাৎ সেই যমদূত ঠিক কখন কোথায় কীভাবে উপস্থিত হবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। বাড়িতে থাকলেও যে প্রাণে বেঁচে যাবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। মধুপুর গ্রামের ভগবান বিষ্ণুর প্রতিও তাদের এতদিন ধরে যে বিশ্বাস ছিল, তাতেও ভাঙন ধরেছিল, কারণ মৃত্যুভয় যে সব থেকে বড়ো, এতে কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আজ সবাই নিজেদের হারানো বল অনেকটাই ফিরে পেয়েছে, ফিরে পেয়েছে নিজেদের আত্মবিশ্বাস আর এর কারণ একজন, শুধুমাত্র একজন, সঞ্জীব আগমবাগীশ। এত আক্রমণের পর, এত প্রাণহানির পরে এই প্রথম সেই শয়তান আজ বাধা পেয়েছে এই মানুষটার কাছে।

সন্ধ্যারতি শেষ করে মধুপুরের ভগবানের মন্দিরের চাতালে বসে আছেন বৃদ্ধ পূজারি, তাঁর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত রয়েছে এই গ্রামসহ আরও চার পাঁচটা গ্রামের মোড়ল এবং

সঞ্জীব আগমবাগীশ। বৃদ্ধ পূজারি এবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না মহাশয়! আপনার পরিচয়টা যদি একটু বলেন।" সঞ্জীব নিজের জামার পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে পূজারির হাতে দিল। সেই চিঠি হাতে নেওয়ার পর উনি অবাকভাবে সঞ্জীবকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ চিঠি তো আমি আমার গুরুভাইকে লিখেছিলাম, এই বিপদের সময় আমার একমাত্র ওর কথাই মনে এসেছিল, এই চিঠি আপনি পেলেন কেমন করে?"

সঞ্জীব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আগের বছর আপনার গুরুভাই দেহ রেখে ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন ঠাকুরমশাই। তিন দিন আগে ওঁর বাৎসরিক কাজে আমি সেখানে যাই, আর সেদিনই আপনার চিঠি আমার হাতে আসে, সেদিন রাতে উনি আমায় স্বপ্নে দেখা দেন এবং আপনাদের এখানে আসার অনুমতি দেন।"

বৃদ্ধ অবাকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে বাবা?"

সঞ্জীব ডান হাতের চেটো দিয়ে নীচের চোখ মুছে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, "আমি ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্তীর শিষ্য। মৃত্যুর অন্তিম ক্ষণে তিনি আমায় দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, যদি কেউ কোনো সময় বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে আমি যেন নিঃস্বার্থভাবে তাদের সাহায্য করি।"

বৃদ্ধ পূজারি এবারে অশ্রুসজল চোখে সঞ্জীবের হাত ধরে বললেন, "বাবা! আজ সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে তুমি এদেরকে রক্ষা করেছ, বোধহয় স্বয়ং ভগবান তোমায় আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। এই গ্রামকে, আমাদের সকলকে এই দানবের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করো!"

এতক্ষণ ধরে সকলেই সঞ্জীব এবং বৃদ্ধ পূজারির কথোপকথন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলেন। এবারে ওঁদের কথা শেষ হলে মধুপুরের মোড়ল রমাকান্ত সামান্য কেশে সঞ্জীবকে উদ্দেশ করে বললেন, "সঞ্জীববাবু, আমি শুনেছি, আপনি কীভাবে সবাইকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু এই বিপদের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্রাণের উপায় কি আছে? তার মধ্যে আমাদের গ্রাম থেকে বেশ কয়েক মাস ধরে বাচ্চা চুরি হয়ে চলেছে। এই দানবের সংহার না হলে আমার পক্ষে এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়াও সম্ভব হয়ে উঠছে না যে।"

সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সঞ্জীব বৃদ্ধ পূজারির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠাকুরমশাই, একটু আগের ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বুঝতে পেরেছি, আপনারা বিগত অনেকদিন ধরে খুবই বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু কীভাবে এই দানবের সৃষ্টি হল তা সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারবেন?"

একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ পূজারি নিজের কপালে হাত দিয়ে উদাস কণ্ঠে বললেন, "সবই বোধহয় আমার কপালের দোষ বাবা! সেদিন আমি কথাগুলো সবাইকে বললে হয়তো আজকে এই দিনটা আমাদের দেখতে হত না।"

"কীসের কথা বলছেন আপনি ঠাকুরমশাই?" রমাকান্ত জিজ্ঞেস করল।

"বাছা! এই কথাটা তোমাদের কাউকে বলিনি আমি। ভেবেছিলাম, এটা বলার দরকার পড়বে না। তবে আমিই বোধহয় ভুল ছিলাম। মাস তিনেক আগের ঘটনা। আমি চাতালের এই জায়গায় বসে একমনে ভগবানের পূজার থালা-বাসন পরিষ্কার করছি, দেখলাম কালো কৌপীন-পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালের ঠিক মাঝে লাল সিঁদুরের তিলক কেটে একজন সাধুমতন লোক ডান হাতে একটা চিমটে নিয়ে এই মন্দিরের সামনে এসে চিমটেয় একটা ধাতব শব্দ করে দাঁড়ালেন আমার সামনে। আমি মুখ তুলে ইশারায় ওঁকে সেখানেই বসতে বললাম। তারপর আমার হাতের কাজ সেরে বসলাম ওঁর পাশে। একটা-দুটো কথা বলার পরে উনি ভগবানের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে চাইলেন। ভগবানের গর্ভগৃহে সবাই প্রবেশ করতে পারে, তবে মন্দিরের নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়ে আমিও ওঁর পেছন পেছন ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, উনি ভগবানের মূর্তিটাকে বেশ খুঁটিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপর মূর্তির বেদির চারপাশে বেশ অনেকবার ঘুরে আরও কী সব দেখে ঘাড় নাড়িয়ে বাইরে এসে মন্দিরের দাওয়ায় বসলেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম উনি নাকি পিশাচসিদ্ধ কাপালিক। কোন একটা মহাশক্তির খোঁজ করতে করতে এখানে এসেছেন। তারপর আমায় একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। বললেন, 'আপনার কাছে কোনো গোপন পুঁথি আছে এই মন্দির সংক্রান্ত?'

"আমি অবাক হয়ে দু-পাশে মাথা নাড়াতে দেখলাম, ওঁর ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে। বুঝতে পারলাম, উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। তারপরে আরও একটা নোংরা প্রস্তাব করেন আমায়।"

সঞ্জীব উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী প্রস্তাব ঠাকুরমশাই?"

"সাত বছরের নীচে বাচ্চা খুঁজে দেওয়ার প্রস্তাব, যা বলি দেবে ওই পিশাচসিদ্ধ কাপালিক।" ক্লান্ত, অবসন্ন গলায় বলেন বৃদ্ধ পূজারি। তারপরে সকলের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু আমি লোকটার সেই কুপ্রস্তাবে রাজি হইনি। বরং আমি তক্ষুনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় লোকটাকে চলে যেতে

বলি। যাওয়ার আগে লোকটা কেমন বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল, সেই চাহনিতে বীভৎস রাগ এবং লালসা ভরপুর ছিল। তার পরেও আরও দুবার বিভিন্ন অছিলায় ঢুকতে চেয়েছিল মন্দিরের গর্ভগৃহে এবং আমায় সেই একই কুপ্রস্তাব দিতে, যদি আমি রাজি হই তাহলে ও নাকি আমায় কিছু শক্তিও দেবে, কিন্তু আমি রাজি হইনি। বৃদ্ধ হলেও আমিও শক্তিহীন নই, ভগবানের আশীর্বাদে আমিও কিছু মন্ত্রশক্তি লাভ করেছি, তা-ই দিয়েই আমি সেই পিশাচসিদ্ধ কাপালিককে প্রতিহত করে এই গোটা গ্রামকে বেঁধে দিই, যাতে মধুপুর তো বটেই, মধুপুরের আশপাশের কোনো গ্রামেও যেন প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু লোকটা চলে যাওয়ার মাসখানেক পর থেকেই তো শুরু হল এই মৃত্যুমিছিল। আমার মন্ত্রকবচ যে ভেঙে পড়েছে তা প্রথমবার দানবের আবির্ভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি, কিন্তু তার শক্তির আন্দাজ করতে পারিনি, যদি প্রথমদিকে আমি চেষ্টা করতাম তাহলে হয়তো এই এত লোকের প্রাণহানি হত না।" এসব কথা বলতে বলতেই নিজের কপালে সবেগে করাঘাত করতে লাগলেন বৃদ্ধ পূজারি।

সঞ্জীব চুপ করে ওঁর সব কথা শুনছিল, এবারে ওঁর দু-হাত ধরে বলল, "আপনার কাছে কি সত্যিই এই মন্দির সংক্রান্ত কোনো গোপন তথ্য ছিল, যা আপনি ওই কাপালিককে বলতে চাননি?"

"তোমার কাছে আর কী গোপন করব। ছিল বাবা। একটা পুঁথি ছিল, দেখলেই বোঝা যায় সেটা বহু পুরোনো। একবার খুলেছিলাম, কিন্তু পুঁথির লেখা অনেক হরফ আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। এই মন্দিরের পূজারি হওয়ার জন্য উত্তরাধিকারসূত্রেই আমার বাবা শেষ বয়েসে সেই পুঁথির পুঁটুলি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন সারাজীবন তা রক্ষা করতে, কেউ যেন সেটা টের না পায়, তাহলেই এক মস্ত অঘটন ঘটবে।"

"সেই পুঁথি একবার আমায় দেখাতে পারেন ঠাকুরমশাই?"

বৃদ্ধ পূজারি এবারে মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতর প্রবেশ করলেন আর কিছু সময় পরে একটা অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্য-করা চন্দন কাঠের একটা মাঝারি মাপের বাক্স এনে চাতালের ওপরে রেখে বললেন, "এর ভেতরেই সেই অমূল্য পুঁথি রাখা ছিল। লাল কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল, কিন্তু সেই দু-সপ্তাহ আগে একবার এটা খুলে পরিষ্কার করার সময় দেখি পুঁথির কোনো পাতাই সেখানে নেই, শুধুমাত্র এই ছেঁড়া দুটো পাতা ছাড়া।" সঞ্জীব হাত বাড়িয়ে সেই ছেঁড়া দুটো পাতার অংশটা খুব সাবধানে তুলে নিয়ে সামনে রাখা প্রদীপের আলোর কাছে নিয়ে দেখতে পেল একটা ছেঁড়া পাতায় একটা ছন্দ লেখা—

"বক্ষ মাঝে রতন যার দীর্ঘদেহ অতি
সর্প তাহার নিত্যসঙ্গী চক্রসম গতি
চক্ষু যাহার অতল গভীর জিহ্বারূপে মেদিনী
পদ্ম তাহার চরণ চুমে লক্ষ্মী ভাগ্যমতী"

এবং অন্য পাতাটির খুবই সামান্য পড়ার যোগ্য। তাতে শুধু একটা শব্দ লেখা—'ধুন্ধুমার'।

সঞ্জীব নিজের আনমনে বলে উঠল, "কোথায় যেন একটা বড়ো খটকা আছে, এই দানবের সঙ্গে কীসের যেন একটা মিল আছে। কোথায় যেন শুনেছি এমন কথা কিছুতেই মনে আসছে না।" তারপর আশপাশে তাকিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য পূজারিকে জিজ্ঞেস করল, "এই গ্রামের নামটা কিন্তু বড়ো মিষ্টি, মধুপুর।"

পূজারি এবারে একটু যেন চনমনে হয়ে বললেন, "এই গ্রামের নামের পেছনেও একটা ইতিহাস আছে, শুনেছিলাম ঠাকুরদার মুখে। তখন আমি খুব ছোটো।"

"তা-ই নাকি? নামের পেছনেও ইতিহাস?"

"হ্যাঁ বাবা! একটা পৌরাণিক ঘটনা শোনা যায় এই নামের পেছনে। পুরাণকালে যখন ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন ওঁর দুই কর্ণকুহর থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানবের সৃষ্টি হয়। তখন এই পৃথিবীর চারদিকে শুধু জল আর জল। এই দুই দানব তখন অন্তরিক্ষে একটা বীজমন্ত্র শুনতে পায় এবং এক হাজার বছর ধরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করার ফলস্বরূপ মহামায়ার কাছ থেকে ইচ্ছামৃত্যু আশীর্বাদ পায় আর তারপরেই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাকে আক্রমণ করে। ভয়ে ব্রহ্মা যোগমায়ার আরধনা শুরু করেন এবং যোগমায়া ভগবান বিষ্ণুর শরীরের সাতটা জায়গা থেকে নির্গত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়। তারপরেই ভগবানের সঙ্গে মধু এবং কৈটভের এক ভয়ানক যুদ্ধ বাধে, কিন্তু সেই যুদ্ধের কোনো নিষ্পত্তি হল না। বাধ্য হয়ে ভগবান যোগমায়ার আহ্বান করলে উনি এসে দুই দানবের মনে এক ভ্রম তৈরি করেন, ফলে দুই দানব ভ্রমিত হয়ে বিষ্ণুকে বলে, 'তোমার সঙ্গে যুদ্ধে আমরা খুবই প্রীত। বলো তোমার কী বর চাই?' বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ বলেন, 'তোমরা দুজনেই আমার বধ্য হও।' দুই দানব বিষ্ণুকে সেই বর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে যে ওদের হত্যা যেন জলশূন্য স্থানে হয়। বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ্ণু নিজের দেহের আকৃতি বহুগুণ বাড়িয়ে দুই দানবকে নিজের জঙ্ঘাতে রেখে চক্র দিয়ে হত্যা করেন। সেই থেকে ভগবান বিষ্ণুর নাম মধুসূদন এবং তাদের মেদ হতে

এই মেদিনী সৃজন করেন। ঠিক এই জায়গাতেই নাকি সেই দানব মধুর নাভি পতিত হয়েছিল, তাই সেই থেকেই এই গ্রামের নাম মধুপুর।" এই ঘটনা বলার সঙ্গে আবেগে ওঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল, উনি নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বললেন, "এই কালান্তক নরপিশাচের হাত থেকে তুমি আমাদের সবাইকে রক্ষা করো! এই দানব আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কত নিষ্পাপ লোকে প্রাণ হারিয়েছে, আমাদের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ছিনিয়ে নিয়েছে, এই পুণ্য ভূমি আজ নরকে পরিণত হয়েছে, একমাত্র তুমিই পারবে আমাদের এই ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার করতে!"

সঞ্জীব ওঁর দু-হাত নিজের হাতের ভেতরে চেপে ভরাট কণ্ঠে বলল, "বিশ্বাসই মানুষের সেরা অস্ত্র ঠাকুরমশাই, সেটা নষ্ট করার ক্ষমতা কোনো অপদেবতার নেই। বিশ্বাস আর ইচ্ছাশক্তির মিশেলকেই বলে তন্ত্রবিদ্যা, যার শক্তি এই দুই শক্তিশালী স্তম্ভের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার বলা পৌরাণিক কাহিনি শোনার পর আমার খটকা দূর হল। তবে একটা কথা সবাই জেনে রাখুন, যে দানবের ক্রূর দৃষ্টি এই গ্রামে পড়েছে, সে কোনো সামান্য পিশাচ বা প্রেত নয়। আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে এক ভয়ংকর বিপদের সামনে আমাদের সবার প্রাণ ঝুলে আছে। আমার আরও কিছু কথা জানার আছে। তবে একটা কথা আপনাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করি, যদি কোনো সময় প্রয়োজন হয় তাহলে আপনাদের সাহায্য কি পাব আমি?" ওখানে উপস্থিত সবার একসঙ্গে মিলিত উল্লসিত কলরব সঞ্জীবের উত্তর দিয়ে দিল।

পরদিন দুপুর নাগাদ সঞ্জীব মধুপুরের ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ির উঠোনে বসে ইটের টুকরো দিয়ে দাগ কেটে একটা ছোটো নকশা অঙ্কন করছিল, গতকাল রাতে বৃষ্টির ফলে সামনের মাটি এখনও সামান্য ভিজে হয়ে রয়েছে। এমন সময় হঠাৎ সামনের দিকে চোখ গেল সঞ্জীবের। সে দেখতে পেল, একটা বাচ্চা ছেলে বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একভাবে ওকে দেখছে। বাচ্চা ছেলেটার মুখটা বড্ড নিষ্পাপ, মুখের দিকে তাকালেই আগত সব বিপদের কথা আর মনেই আসে না। ছেলেটা এবার পায়ে পায়ে সঞ্জীবের পাশে এসে বসল। সঞ্জীব একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম তোমার?"

ছেলেটা ডান হাতে ধরা একটা পদ্ম ফুল সঞ্জীবের হাতে দিয়ে মিষ্টি সুরে বলল, "সূদন।"

"তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি কি এই গ্রামেই থাকো?" সঞ্জীব কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"আমি তো সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়াই।" অদ্ভুত এক সরলতার সঙ্গে উত্তর দিল ছেলেটা। সঞ্জীব আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভেতর থেকে ঠাকুরমশাই বেরিয়ে এলেন। তারপর সূদনকে দেখে হেসে বললেন, "ও মা! সূদন! তুমি এখানে কী করছ বাবা?"

"ফুল দিতে এসেছিলাম এঁকে।" সঞ্জীবের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল সূদন।

"বাড়িতে তোমার দাদু তো চিন্তা করবে বাবা। যাও, বেলা হল অনেক।" তারপর সঞ্জীবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "বড় ভালো ছেলে এই সূদন, আমাদের দেবতারই দান। ওর বাবা-মা হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত দিনের পর দিন ভগবানের মন্দিরে, তারপরেই ওদের কোল আলো করে এই ছেলে এল। কিন্তু প্রসবের সময়েই হতভাগার মা-টা মারা যায়। আর সেই দুঃখে ওর বাপটাও চলে গেল ঘর ছেড়ে। সেই থেকেই সূদন ওর দাদুর কাছেই মানুষ। কথা শুনতে শুনতেই সূদনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সঞ্জীব। ঠাকুরমশাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা প্রজাপতিকে দেখতে পেয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল সূদন। সূদনের দৌড়ে চলে যাওয়ার দিকে একভাবে সঞ্জীব তাকিয়ে আছে দেখে ঠাকুরমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখছ বাবা ওইদিকে?"

সঞ্জীব আগমবাগীশ সামান্য হেসে ভেজা মাটির ওপরে স্পষ্টভাবে ফুটে-ওঠা সূদনের পায়ের ছাপ দেখিয়ে বলল, "পুরো লক্ষ্মীমন্ত।"

সে একমনে সেই আরতি দেখে চলেছে সঞ্জীব। পঞ্চপ্রদীপের আলোয় কালো কষ্টিপাথরের বিষ্ণুর বিগ্রহ থেকে থেকেই ঝলমল করে উঠছে, আজ অনেকদিন পরে আবার অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে এই মন্দির প্রাঙ্গণে। সবাই ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভগবানের পদযুগল ভরিয়ে তুলেছে, সবার মনের ভেতরে আগের পুরোনো আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও ফিরে এসেছে, কিন্তু যার জন্য সবার মনের এই পরিবর্তন, সেই সঞ্জীব কিছুতেই এই পুজোয় সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারছে না। সঞ্জীবের কেবলই মনে হচ্ছে, কোনো একটা খারাপ কিছু হতে চলেছে, কেউ যেন সর্বক্ষণ আড়াল থেকে ওদের সবাইকে লক্ষ করে বেড়াচ্ছে। পুজোর প্রায় শেষের দিক উপস্থিত, পূজারিমশাই প্রদীপের শিখার তাপ নেওয়ার জন্য সেটা এগিয়ে দিলেন সঞ্জীবের দিকে, সঞ্জীব হাত বাড়িয়ে সেই শিখার ওপরে রাখামাত্র ওর চোখের সামনে একটা ঝাপসা পর্দায় ফুটে উঠল টুকরো কিছু ঘটনা, কিন্তু তা পুরোটা স্পষ্ট নয়। সঞ্জীব দেখতে পেল, একজন কালো বস্ত্র পরিহিত, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা হাতে চিমটে নিয়ে প্রবেশ

করল ভগবান মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহের ভেতরে। হাতের চিমটেটাকে সোজাভাবে ধরতেই সেখান থেকে এক মৃদু আলোর আভা বেরিয়ে এসে খুবই সামান্য জায়গা আলোকিত হয়ে উঠল গর্ভগৃহের ভেতর। লোকটা এগিয়ে গেল ভগবানের বেদির দিকে। এবারে ওর পেছনে আরও একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সঞ্জীব। সেই ছায়ামূর্তির সাহায্যে ভগবানের বেদির এক বিশেষ জায়গায় চাপ দিতেই ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে আপনা থেকেই বাইরে বেরিয়ে এল একটা কারুকার্য-করা কাঠের বাক্স, আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল একটা পুরোনো পুঁথি। এর পরেই আবার সঞ্জীবের সামনের দৃশ্যপট পরিবর্তন হল, ও দেখল, লোকটি খুব দ্রুত পদক্ষেপে গ্রামের বাইরের দিকে হেঁটে চলেছে আর তার পেছনে চলেছে সেই ছায়ামূর্তি। গ্রামের সীমানার বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আচমকাই কালো কৌপীন পরিহিত লোকটা পেছন ঘুরেই হাতের চিমটেটাকে সজোরে বিঁধিয়ে দিল সেই ছায়ামূর্তিটির বুকে।

সঞ্জীবের ঘোর কেটে গেল মন্দিরের বাইরের মাঠের একটা শোরগোল শুনে। মন্দিরের চাতালের সামনে যেতেই ভিড় থেকে সামনে এগিয়ে এল বিরেঝার গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ মোড়ল, দু-হাত জোড় করে উনি সঞ্জীবের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। সঞ্জীব শক্ত হাতে ধরে পাশে বসিয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

কান্না-ভেজা গলায় সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে সিধু দলুই বলল, "আমার শিবরাত্রির সলতে, আমার সুদনকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে! আমার ও ছাড়া আর যে কেউ নেই সঞ্জীববাবু। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল আপনাকে ফুল দেওয়ার জন্য, সেই যে বেরিয়েছে, এখনও ঘরে আসেনি। অথচ ছেলে আমার খুবই বাধ্য। আমায় না বলে কোথাও যায় না যে সে। আপনি কি পারবেন আমার নাতিকে খুঁজে দিতে?"

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল সঞ্জীবের। মনে মনেই বলল, অনেক হয়েছে এই জঘন্য কাজ, কিন্তু আর নয়। এবারে এর একটা বিহিত করতেই হবে। দরকার হলে নিজের প্রাণ দিয়ে এই নৃশংস হত্যালীলা বন্ধ করবে সে। একবার ভগবান বিষ্ণুর মূর্তির দিকে প্রণাম করে গমগমে স্বরে ওই জায়গায় উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আঁচ করতে পেরেছি, সমস্ত ঘটনার পেছনে কার হাত রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত নই তাই আপনাদের কাউকে তা প্রকাশ করতে পারব না। তবে আমি আজকের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব।" বলে দ্রুতপদে সেই স্থান ছেড়ে চলে গেল।

মধ্যরাতের বেশ কিছু আগেই সঞ্জীব এগিয়ে চলেছে পশ্চিমদিকের ঘন জঙ্গলের সীমানার দিকে। আকাশের চাঁদ সঞ্জীবকে তার যৎসামান্য আলো দিয়ে চলতে সাহায্য করছে। মন্দিরের চাতালে বসে সঞ্জীবের চোখের সামনে যে ঝাপসা দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছিল, সেই সময়ই এই জঙ্গলের ভেতরের একটা গোপন গুহার আবছা দৃশ্য সঞ্জীবের চোখে এক মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠেছিল। এখন সঞ্জীবের লক্ষ্য সেইদিকেই। কাউকে না বললেও সঞ্জীব নিজে সম্পূর্ণভাবেই নিশ্চিত যে ওই জায়গাতেই সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। এসব কথা চিন্তা করতে করতে সঞ্জীব খেয়াল করেনি এক প্রকাণ্ড ধুলোর ঘূর্ণি নিঃশব্দে ঠিক ওর পেছনেই চলেছে, এবারে হঠাৎই যেন চারদিকের নিস্তব্ধটা ছিন্ন করে সেই ঝড় শোঁ শোঁ শব্দে হিংস্র হাঙরের মতোই গিলে নিল সঞ্জীবকে কিছু টের পাওয়ার আগেই, সেই ঘূর্ণির ভেতরে প্রবেশ করামাত্র যেন সঞ্জীবের সর্বশরীর অবশ হতে শুরু করল, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে গেল সঞ্জীব আগমবাগীশ।

সঞ্জীব যখন জ্ঞান ফিরে পেল, তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করল প্রায় স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার একটা গুহার ভেতরে। এই গুহার চার দেওয়ালে চারটে মশাল জ্বলছে, কিন্তু তাদের আলোয় এই গুহার ভেতরে একটা আলো-আঁধারের সৃষ্টি হয়েছে। একটা দমবন্ধ গুমোট ভাবের সঙ্গে মাংস-পচা গন্ধের ঢেউ থেকে থেকেই সঞ্জীবের নাকে এসে লাগছে। অন্ধকারে চোখ একটু সয়ে যেতে সঞ্জীব লক্ষ করল, চারদিকের মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে অসংখ্য মুণ্ডবিচ্ছিন্ন বাচ্চার উলঙ্গ ধড়, তাদের শরীরে লাল আর হলুদের দাগ দেখে সঞ্জীব বুঝতে পারল, বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে এইসব বাচ্চার শরীর। এই কাজ নিশ্চিতরূপেই সেই শয়তান কাপালিকের, নৃশংসভাবে এই বাচ্চাদের বলি দিতে একটুও হাত কাঁপেনি তার। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই গুহার বাইরে যেন একটা ঝড়ের শব্দ সঞ্জীবের কানে প্রবেশ করল, তার পরেই লম্বা লম্বা পা ফেলে কালো কৌপীন পরিহিত সেই পিশাচসিদ্ধ কাপালিক ভেতরে প্রবেশ করল, শয়তানটার কোলে নিদ্রামগ্ন সকালের সেই নিষ্পাপ শিশু সূদন। বাচ্চাটার শরীর থেকে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। সঞ্জীব কাপালিককে দেখে এগোতে যেতেই টের পেল, কোনো অদৃশ্য শক্তি ওর সমস্ত শরীর বেঁধে ফেলেছে নিমেষের মধ্যে। বেশ কয়েকবার নিষ্ফল আক্রোশে চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে মেঝেতেই বসে পড়ল সঞ্জীব। সঞ্জীবের

ছটফটানি দেখে খসখস শব্দে হেসে ফেলল কাপালিক। এই বদ্ধ গুহায় সেই হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন আরও বীভৎস মনে হল। হাসতে হাসতেই কাপালিক চিবিয়ে চিবিয়ে সঞ্জীবকে উদ্দেশ্য করে বলল, "মূর্খ! তোর মতো তুচ্ছ সাধক আমি এর আগে ঢের দেখেছি। আমার শক্তির কাছে তুই সামান্য এক মূষিকমাত্র। এই বাচ্চার বলির পর তোরও বলি দেব।"

"কীসের এত বড়াই করিস তুই শয়তান? নিষ্পাপ বাচ্চাদের বলি দিয়ে তুই এমন কোন শক্তির উপাসনা করছিস? মনে রাখিস, প্রয়োজনে একটা মূষিক কিন্তু তার থেকে শতগুণ শক্তিশালী প্রাণী হাতিকেও নিমেষে কাত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।"

"সাধনার তুই কী বুঝিস রে? তুই কি জানিস, আমি কী সাধনা করছি? জানিস না, জানিস না!"

"জানতেও চাই না শয়তান। তবে এটা বলতে পারি, তোর সাধনা কোনোদিনও সফল হবে না, হতে পারে না।"

"হাঃ হাঃ হাঃ! মূর্খ তুই, তাই না জেনে কথা বলছিস। শোন রে অর্বাচীন! সাধনা আমার সফল হয়েছে অনেকদিন আগেই, যে মহাশক্তিকে আমি জাগিয়ে তুলেছি, আজ এই শেষ বলির মাধ্যমে তাকে আমি চির অমর করে দেব। আর তার সঙ্গে আমিও গোটা পৃথিবীকে নিজের করায়ত্ত করব, গোটা পৃথিবী হবে শুধু আমার শাসনের অধীন।"

সঞ্জীব অবাকভাবে তাকিয়ে আছে দেখে কাপালিক যেন আরও মজা পেল। কোলের ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে নীচে নামিয়ে রেখে সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিভিন্ন পৌরাণিক পুঁথিতে যেসব ভয়ানক দানবের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী দানবকে আমি জাগিয়ে তুলেছি। সহস্র সহস্র বছর ধরে অনন্তকাল নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল সেই দানব। আর তাকে জাগ্রত করার পদ্ধতি লুক্কায়িত ছিল মধুপুরের বিষ্ণুমূর্তির বেদির ভেতরের প্রকোষ্ঠে। আমার গুরুদেবের কাছে সেই হদিশ পেয়ে আমি শেষে এই মধুপুরে এসে তার সন্ধান পাই। বোকা পুরোহিত আমায় মিথ্যে বলে ভেবেছিল, আমি সেটা বিশ্বাস করে নেব? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সে-ও তোর মতোই মূর্খ। আবার গ্রামবন্ধন করেছিল, যাতে আমি ঢুকতে না পারি। খসখস করে হেসে উঠল কাপালিক। হাসির চোটে তার মাথার জটা নড়ে উঠল। যেন ভারী একটা মজার ব্যাপার। হাসির দমক কমলে আবার সেই শয়তান বলল, আমি সেই পুঁথি খুঁজে বের করি। তারপর সেই দানবকে জাগিয়ে তুলি, পুঁথির লেখামতন ধীরে ধীরে তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাচ্চা বলি দিতে থাকি আর সে আরও আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। প্রাচীন পুঁথির কথামতো, একুশটা বলি দিতে পারলে সেই দানব আবার নিজের পুরোনো শক্তি ফিরে পাবে। আজ এই শেষ বলি আমি দেব তোর সামনেই। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

সঞ্জীব দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য আর কত নীচে নামবি রে শয়তান? লোভ দেখিয়ে এই মন্দিরের এক সহকারীর সাহায্যে তুই ওই পুঁথি চুরি করেছিস। শুধু তা-ই নয়, নিজের কাজ শেষ করার পরেও তোর সহকারীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলি তুই। নরকেও ঠাঁই হবে না রে তোর শয়তান।"

কাপালিক সঞ্জীব আগমবাগীশের স্পষ্টচারিতায় মুহূর্তে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরেই, "তবে রে! দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে।" বলে গুহার এককোণ থেকে একমুঠো বালি ডান হাতে চেপে বিড়বিড় করে কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিকট শোঁ শোঁ শব্দের সৃষ্টি হল গুহার বাইরে আর তার পরেই গুহার মেঝে প্রবলভাবে কেঁপে উঠল। সেই কম্পনের ফলে মেঝেতে ফাটল ধরল আর সেই ফাটল থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতে লাগল দীর্ঘকায় এক দানবমূর্তি, যার অগ্নিতাণ্ডব নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে সঞ্জীব দু-দিন আগেই। সেই বিরাটকায় দানবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাপালিক হাঁটু মুড়ে তাকে অভিবাদন জানাল, তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ল মাটিতে শোয়ানো সূদনের দিকে। তারপরে সেই কাপালিকের কিছু মন্ত্রোচ্চারণের ফলে গুহার মাঝখানে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হল। কাপালিক ঘুমন্ত সূদনের শরীরে এবারে কুণ্ডের পাশে রাখা সিঁদুর আর হলুদ কুমকুম মাখানোর সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করল। সেই ভাষা যেমন দুর্বোধ্য, তেমনই কর্কশ কাপালিকের গলার স্বর। সমস্ত শরীরে সেই সিঁদুর আর কুমকুমের প্রলেপ লাগানোর পরে কুণ্ডের অন্য প্রান্ত থেকে এক বিরাট খড়্গ বের করে আনল সেই শয়তান। তার চোখ দুটো এখন সর্বশক্তিমান হওয়ার লোভে চকচক করছে। দু-হাতে সেই খড়্গ তুলে প্রচণ্ড বেগে সেটা নামিয়ে দিল ঘুমন্ত বাচ্চাটার গলা লক্ষ্য করে, কিন্তু এ কী! অবাক বিস্ময়ে কাপালিক লক্ষ করল, তার ধারালো খড়্গটা সূদনের গলার অনেকটা ওপরেই থেমে গেছে, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি অবলীলায় থামিয়ে দিয়েছে এই ধারালো অস্ত্রটা। তারপরেই কাপালিক লক্ষ করল নীচের বাচ্চাটি আর সেখানে নেই, বরং তার থেকে কিছু দূরে উঠে দাঁড়িয়ে আছে আর তার এক হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জীব।

সঞ্জীব সূদনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তুমি ঠিক আছ সূদন? তোমার কোথাও লাগেনি তো?" দু-পাশে মাথা

নাড়িয়ে সে বলল, "তোমার গলার ওই লকেটটা আমায় দেবে?" সঞ্জীব লক্ষ করল, ওর গলার লকেট থেকে নীলাভ আভা বেরোতে শুরু করেছে, যা একমাত্র কোনো দৈবশক্তির সান্নিধ্যেই প্রকাশ পায়।

এবারে গমগমে স্বরে এক তীব্র ভর্ৎসনা ভেসে এল কাপালিকের কানে। শুনতে পেল, সঞ্জীব তার গুরুগম্ভীর স্বরে বলছে,

"বক্ষ মাঝে রতন যার দীর্ঘদেহ অতি
সর্প তাহার নিত্যসঙ্গী চক্রসম গতি
চক্ষু যাহার অতল গভীর জিহ্বারূপে মেদিনী
পদ্ম তাহার চরণ চুমে লক্ষ্মী ভাগ্যমতী"

হতবাক কাপালিককে আরও বিস্মিত করে সঞ্জীব বলল, "পুঁথির যে জায়গাটুকু অপ্রয়োজনীয় বলে তুই ফেলে গিয়েছিলি, সেই জায়গাতেই তোর মৃত্যুর উপায় লেখা ছিল। ভগবান ইচ্ছাকৃতভাবেই তোর মতো শয়তানকে নিকেশ করতে জন্ম নেয় এই ধরাধামে।" সাময়িকভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও এবারে দ্বিগুণ রাগে ঘুরে দাঁড়াল সেই পিশাচসিদ্ধ শয়তান আগমবাগীশের দিকে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমায় কে আটকাবে? তুই? তোর থেকেও বহুগুণ শক্তির অধিকারী আমি।"

সঞ্জীব মাথা নেড়ে বলল, "মূর্খ! শুধু শক্তি অর্জন করলেই হয় না, সেই শক্তিকে নিজের আয়ত্তে রাখার কৌশলটাও জানতে হয়। সেটাই তন্ত্রসাধনার আসল বিদ্যা।"

পাশ থেকে এবার সূদন বলে উঠল, "ও নয়। তোর মৃত্যুর কারণ আমি। নিজের মৃত্যুর জন্য তৈরি হ শয়তান।" সূদন সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার গলার ওই লকেটটা আমায় দাও।"

সূদনের গলার স্বরে কী এক সম্মোহন লুকিয়ে ছিল। সঞ্জীব নিজের গলার লকেট খুলে পরিয়ে দিল সূদনের গলায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই লকেটের নীলাভ আলোর আভা যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল।

কাপালিক দেখল, তার বলির উদ্দেশ্যে চুরি করে আনা বাচ্চাটার শরীর জুড়ে দৈবিক আলোর খেলা শুরু হয়েছে। মুহূর্তে বিহ্বল হলেও কাপালিক এই দৃশ্য দেখে এবারে নিজের হাতের ধারালো খড়্গ ছুড়ে দিল বাচ্চাটার দিকে, কিন্তু সেই অস্ত্র মাঝপথেই থেমে সেখানেই ভূপতিত হল। পিশাচসিদ্ধ কাপালিক নিজের শক্তির বড়াই করে এসেছে এতদিন ধরেই, কিন্তু এখন নিজের বিপদ বুঝে মারণমন্ত্র মনে করার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কোনো মন্ত্রই তার সেই মুহূর্তে মনে এল না। কেউ যেন অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাপালিকের মস্তিষ্কের ভেতরে প্রবেশ করে তার সমস্ত ভয়ানক মন্ত্র একেবারে মুছে দিয়েছে। নিষ্পাপ শিশু সূদন কাপালিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "পারবি না, কোনো মন্ত্র তুই আর মনে করতে পারবি না।" তার মৃত্যুর অন্তিম ক্ষণ আসন্ন বুঝতে পেরে চকিতে গুহার মেঝের একপাশ থেকে একমুঠো বালি ছুড়ে জাগিয়ে তুলল নরকের অতল গভীর থেকে সেই অগ্নিদানবকে। বিকট চিৎকারের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল এই গুহা ও তার চারপাশের মাটি, প্রবল কম্পনের সঙ্গে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়কে সঙ্গী করে সেই দানব ছুটে চলল মধুপুরসহ সমস্ত সমতলভূমির ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। দানবের প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুযোগ বুঝে কাপালিক এমন সময় নিজের প্রাণ বাঁচাতে ছুটল গুহার বাইরে। কাপালিকের পেছনে সূদনও বেরোতে যাবে, পেছন থেকে সঞ্জীব আগমবাগীশ বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞেস করল,

"কোথায় যাচ্ছ সূদন?"

পেছনে মুখ ঘুরিয়ে হেসে সূদন বলল, "ধুন্ধুমার।"

আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে এবারে সঞ্জীবের কানে এল শঙ্খধ্বনি, মিষ্টি ফুলের সুবাসে সুরভিত হয়ে উঠল চারপাশ, সঞ্জীব সূদনের পেছনে গুহার বাইরে বেরোতেই দেখতে পেল, শয়তান কাপালিক বেশি দূর পালাতে পারেনি। তার আগেই সূদনের হাতের মুঠি শক্তভাবে চেপে বসেছে কাপালিকের গলায়। সেই পিশাচ কাপালিক, যে শুধুমাত্র শক্তির লোভে এতগুলো নিষ্পাপ শিশুর বলি দিয়েছে, যার দুষ্ট বুদ্ধির ফলেই এই দেবভূমি নরকে পরিণত হয়েছে, সেই কাপালিক সূদনের বজ্রমুঠির থেকে মুক্তির আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। এবারে তার মৃত্যুর সময় আগত তা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারল সঞ্জীব। সূদনের বজ্রমুঠির বন্ধনে একটা চাপা 'কট' শব্দ কানে এল এবং তারপরেই কাপালিকের নিস্তেজ শরীর এলিয়ে পড়ে গেল কর্দমাক্ত মাটিতে। একদিকে পাপিষ্ঠ কাপালিকের নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে রইল মাটিতে, অন্যদিকে আগমবাগীশ দেখল, প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে মুহুর্মুহু অগ্নির বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে সেই পৌরাণিক দানব। সমগ্র সমতলভূমি হলদেটে বালির সমুদ্রে প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে আর তার সঙ্গে নাকে লাগছে পোড়া কটু গন্ধ। সঞ্জীবকে অবাক করে নিমেষের মধ্যে সেই দানবের দিকে ছুটে গেল সূদন। দৈবশক্তিসম্পন্ন সূদনের শরীরে আলোর খেলা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সূদন দানবের কাছে পৌঁছোনোমাত্র সেই দানব তার সঙ্গী ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে সূদনকে স্থানচ্যুত করতে চাইল, কিন্তু সূদনের দেহের ওজন যেন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে সেই জায়গাতেই অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এতে

দানবের ক্রোধ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। সে তার শেষ এবং সব থেকে ভয়ানক অস্ত্র নিক্ষেপের জন্য 'হাঁ' করার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে গনগনে আগুনের শিখা বেরিয়ে ছুটে গেল সূদনের শরীর লক্ষ্য করে। সঞ্জীব দূর থেকেই এসব লক্ষ করছিল। সে দেখল, সেই ভীষণ আগুনের পিণ্ড সূদনের শরীরে যেন মিলিয়ে গেল। এদিকে বারবার আঘাতের পরেও ব্যর্থতার ফলে সেই দানব এবার ছলের আশ্রয় নিয়ে মাটির ফাটলে অদৃশ্য হয়ে আবার পরক্ষণেই সামান্য দূরে মাটি ফুঁড়ে পেছন থেকে সূদনকে আক্রমণ করতে লাগল। এবারে সূদনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তার দেহের আকার ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগল। কিছু সময়ের মধ্যেই সঞ্জীব দেখতে পেল, সূদনের স্থানে এক দৈবদেহীর আবির্ভাব হয়েছে, যার চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। এক প্রচণ্ড তেজোরশ্মি ছিটকে বেরিয়ে আসছে সেই দৈবদেহ থেকে। আপনা থেকেই সঞ্জীবের দু-হাত জোড় হয়ে গেল সেই দৈবের উদ্দেশে। পাতালের গর্ভ থেকে উঠে-আসা সেই দানব যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে তারও মৃত্যু আসন্ন। তাই শেষবারের জন্য প্রকাণ্ড হাঁ করল অগ্নি উদ্‌গিরণের উদ্দেশ্যে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই দৈবদেহীর ললাটে তেজোবিন্দু প্রকাশিত হল। এক ভয়ানক তেজোরশ্মি বেরিয়ে ঝলসে দিল দানবের শরীর।

দানবের মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে শান্ত হল পৃথিবী, দৈবশক্তির তেজোরশ্মি ধীরে ধীরে কমে এল, তারপর সূদনের দেহ থেকে নির্গত হয়ে বিলীন হয়ে গেল মধুপুরের ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরের ভেতরে। ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করে আকাশের দিকে তাকাতে সঞ্জীব দেখতে পেল, পুবদিক লাল হয়ে উঠেছে, আর কিছু মুহূর্ত পরেই সূর্যের নির্মল পবিত্র আলোয় ধুয়ে-মুছে যাবে পৃথিবীর সমস্ত পাপ, কালিমামুক্ত হবে এই বিশ্বসংসার।

ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরের চাতালে এখন প্রচুর লোকের সমাগম। সবাই জানতে পেরেছে যে সেই ভয়ংকর অগ্নিদানব এবং কাপালিকের মৃত্যু হয়েছে, আর কোনো বিপদ নেই তাদের কারও। বৃদ্ধ পূজারি সঞ্জীবের হাত ধরে বললেন, "বাছা! সবই তো বুঝলাম, কিন্তু ওই দানব কে ছিল তা তো বুঝতে পারলাম না।"

সঞ্জীব বলল, "প্রথমটায় আমিও ধরতে পারিনি, কিন্তু আপনার থেকে যখন মধু আর কৈটভের ইতিহাসটা আবার শুনলাম, তখন মনে পড়ে গেল আরেকটি পুরাণকথা। মধু ও কৈটভের ছেলের নাম ধুন্ধু। সে ছিল ব্রহ্মার বরে বলীয়ান। থাকত বালির গভীরে এবং বছরে মাত্র কয়েকবার তার নিশ্বাস ত্যাগ করত। সেই নিশ্বাসে আগুন বেরোত, ধুলোর ঝড় উঠত, এমন ঝড় যে তা সূর্যের আলোকেও ঢেকে দিত। সেই ধুন্ধুকে মায়াশক্তির মাধ্যমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল এবং তাকে জাগানোর উপায় লেখা ছিল যে পুঁথিতে তা এই ভগবানের মন্দিরের বেদির ভেতরে রক্ষিত ছিল এতদিন। পুরাকালের দানবদ্বয় মধু ও কৈটভের মৃত্যুর পরে তাদের শরীরের মেদ দিয়েই এই পৃথিবীর এক ভাগ স্থলের উৎপত্তি। তাই পৃথিবীর অপর নাম মেদিনী। মধুপুর গ্রামেই সেই মধু এবং কৈটভ দৈত্যের নাভি ভূপতিত হয় এবং সেখান থেকেই তাদের পুত্র ধুন্ধুর জন্ম হয়েছিল। এই দানব ধুন্ধুকে মন্দিরেরই মাটির গভীরে মন্ত্রের মাধ্যমে বহু যুগ আগে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল আর যাতে কোনো রকমের শব্দ তার কানে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্যই আপনাদের মন্দিরে ঢোকার পর কথা বলা, এমনকি ভগবানের আরতির সময় কাঁসর-ঘণ্টা না-বাজানোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। পিশাচসিদ্ধ কাপালিক তার গুরুর কাছে এই তথ্য পেয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়। ঠাকুরমশাইকে প্রথমে লোভ দেখিয়ে ব্যর্থ হলে ওঁর এক সহকারীর সাহায্যে সেই পুঁথি বের করে আনে এবং সেই সহকারীকেও সেই পাষণ্ড হত্যা করে।"

"কিন্তু সূদনই যে সেই দৈবশক্তির অধিকারী তা কি আপনি আগে বুঝতে পেরেছিলেন?" রমাকান্ত উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, পেরেছিলাম। যেদিন প্রথম সূদনকে দেখি, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম যে সূদন দৈবশক্তিসম্পন্ন। অমন নিষ্পাপ মুখের চাউনি খুবই কম মেলে, মাটির পায়ের ছাপে ওর দৈব ক্ষমতার স্পষ্ট লক্ষণ দেখেছিলাম আমি সেদিনই। আর পুরাণের পুঁথিতে লেখা ছন্দের সঙ্গে সূদনের শারীরিক লক্ষণ প্রায় সবটাই মিলে যায়, আর বাকি লক্ষণের প্রকাশ ঘটে ওর গলায় এই লকেট পরিয়ে দেওয়ার পর থেকে। এ ছাড়া ঠাকুরমশাই যখন বললেন যে সূদন বরপ্রাপ্ত সন্তান, তখন আর কোনো সন্দেহই আমার মনে ছিল না।"

ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় চক্ষুমুদ্রিত কষ্টিপাথরের বিগ্রহের দিকে দু-হাত জোড় করে একবার প্রণাম করল সঞ্জীব। তারপর হাসিমুখে সব থেকে বিদায় নিয়ে পাড়ি দিল নিজের গন্তব্যের উদ্দেশে। মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত সকলের মনে প্রোথিত হয়ে রইল একটাই নাম—'সঞ্জীব আগমবাগীশ'।



কোডেক্স গিগাস

ঊর্মি মুখার্জী



দৃশ্য ১

(পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রি, ১৯০৫
পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা)

একটা ঘোলাটে মেঘ সমস্ত শহরটাকে ঢেকে ফেলেছে। অবিরাম বৃষ্টিতে ধুয়ে সামনের ম্যানহোলের দিকে ভেসে যাচ্ছে কবরস্থানের কাদামাটি। কফিনটাকে গোল করে ঘিরে রেখেছে কালো পোশাক-পরা, মাথায় ছাতা-ধরা একই পরিবারের কয়েকজন সদস্য।

যাকে ঘিরে আজ এই আয়োজন, সেই গ্র্যান্ড মা স্যান্ডি ডি কোস্টা শুয়ে আছেন কফিনের মধ্যে। ক্রস-করা নিথর দুই হাতের মাঝে তাঁর স্পন্দনহীন বুকের ওপর রাখা আছে একটা বিশাল আকৃতির বই। পশুর কালো চামড়া দিয়ে তৈরি বইটিকে একটি

প্লাস্টিকের মোড়কে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেন মৃত্যুপথযাত্রী এক নারীর শেষ সম্বলকে খুব যত্ন করে তাঁর সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছেন তাঁর পরিবারের মানুষ। পারিবারিক ডাক্তার বাড়ির চাপে বাধ্য হয়ে বলেছেন, মৃত্যু হয়েছে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে। অর্থাৎ এই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু লিলি জানে তার গ্র্যান্ডমার মৃত্যু মোটেই স্বাভাবিক নয়। রাত্রে লিলি তাকে দেখেছিল। সে এক ভয়ংকর আতঙ্কের পরিবেশ। সেই আতঙ্কের ছাপ এখনও লিলির চোখে-মুখে লেগে আছে।

লিলি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কফিনে শোয়ানো গ্র্যান্ড মা স্যান্ডির মুখের দিকে। এই একরাতেই যেন তার মুখের বলিরেখা অসংখ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাকে যেন আরও বেশি বয়স্কা বলে মনে হচ্ছে। তার চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত, মুখটা হাঁ হয়ে আছে। খুব পটু হাতে একটা সাদা কাপড় দিয়ে তার গলাটা ধড়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার্চের ফাদার বলে চলেছেন... "উই লিফ্‌ট হার টু ইউ টুডে, ইন অনার অফ দা গুড উই স ইন হার অ্যান্ড দ্য লাভ উই ফেল্ট ফ্রম হার। প্লিজ গিভ আস দ্য স্ট্রেংথ টু লিভ হার ইন ইয়োর কেয়ার, ইন দ্য নলেজ অফ ইটারনাল লাইফ থ্রু জিসাস ক্রাইস্ট। আমেন!"

দৃশ্য ২

(ডি কোস্টা হাউস, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫)

চোখ বন্ধ করলেই সেই দিনের সেই ঘটনাটা আজও মনে পড়ে লিলির। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত এই বিশাল বাড়িটার বিভিন্ন জায়গায় এখন ড্যাম্প হয়েছে। শ্যাওলা-জমা একটা সবজেটে রং বাড়ির দেওয়ালগুলোকে আরও যেন জীর্ণ করে দিয়েছে। দেওয়ালে টাঙানো গ্র্যান্ড মা স্যান্ডির ছবিটার দিকে তাকালেই সেই দিনটা যেন স্পষ্ট দেখতে পান লিলি। সেদিন ঠিক কী দেখেছিলেন, সেটা তখন না বুঝলেও পরে যত বড়ো হয়েছেন, বুঝতে পেরেছেন। নিজের ডায়েরিতে এঁকেওছেন সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাত।

ক্যাঁচ-চ্‌-চ্‌-চ্‌... শব্দ করে খুলে গেল আদ্যিকালের দরজাটা। খুব সন্তর্পণে কেউ ঢুকল লিলির ঘরের ভেতরে। আশি বছর বয়সের বৃদ্ধা লিলি তাঁর ডায়েরি খুলে কাঁপা-কাঁপা ক্ষিপ্র হাতে একটা কিছু এঁকে চলেছেন। এমন সময় তাঁর পেছনে এসে দাঁড়াল একটা নিবিড় কালো ছায়া। ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকালেন লিলি। এবং তিনি যা দেখলেন, তাতে তাঁর বিস্ফারিত চোখে খেলে যায় মৃত্যু আতঙ্ক।

সজোরে একটা ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয় মাথায়। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে যান বৃদ্ধা। কিন্তু আহত অশীতিপর হাত দুটো বুকের কাছে চেপে ধরে কালো ডায়েরিটা। ছায়ামূর্তি একটু বলপ্রয়োগ করেই ছিনিয়ে নেয় সেই কালো ডায়েরি, যা জীবৎকালে কাউকে কোনোদিন দেখাননি লিলি। একবার কম্পিত হাতটা ওঠে বাধা দেওয়ার জন্য, তারপর ঢলে যায় চিরশান্তির ঘুমে।

দৃশ্য ৩

(পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রি, ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫)

প্রায় মাঝরাত হয়ে এসেছে। রাতের বেলা এমনিতেই এদিকে কেউ খুব একটা আসে না। তারপর এই হাড় জমিয়ে দেওয়া ঠান্ডাটা যেন চারিদিকের পরিবেশটাকে আরও নিঝুম, নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। আকাশের তারাগুলি মিটিমিটি চোখে এদিকেই তাকিয়ে আছে। মাটিতে পড়ে-থাকা শুকনো পাতাগুলোকে মড়মড় শব্দ করে মাড়িয়ে কয়েকটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল একটা গ্রেভের সামনে। তাদের দলের মাথা যে মানুষটি, তিনি খুব সাবধানে টর্চ জ্বালিয়ে একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে, টর্চের আলো ফেললেন সামনের শ্যাওলা পড়ে-যাওয়া ফলকটার ওপরে। ধুলো আর শ্যাওলার একটা পুরু আস্তরণ নামফলকটাকে পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে। দলের একজন এগিয়ে গিয়ে ঘষে ঘষে সেটা পরিষ্কার করে দিতেই আবছাভাবে নামটা দেখা গেল—স্যান্ডি ডি কোস্টা।

"এই তো সেই কবর, ভাঙ এটা", ফিসফিস করে বলে উঠল হাতে টর্চ-ধরা ছায়ামূর্তিটা।

তারপর যতটা কম শব্দ করা যায়, সেইভাবে পুরো দলটা মিলে কবর ভাঙতে শুরু করল। বেশ অনেকক্ষণের পরিশ্রমের পরে কফিনটা টেনে তুলতে পারল ওরা। এতখানি পরিশ্রমে এই শীতেও তাদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। কফিনটাকে খুলে তারা দেখল কতকগুলো হাড়, মাথার খুলি আর একটা কালো চামড়ার ডায়েরির মতো একটা বই। হাতে টর্চ-ধরা ব্যক্তিটি এগিয়ে এসে খুব সন্তর্পণে সেই বইটা তুলে নিলেন। আর ঠিক তখনই বিকট আওয়াজ করে একটা বাজ

পড়ল। এতক্ষণে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখল ওরা, মিটমিট করে জ্বলতে-থাকা তারাদের ঢেকে দিয়ে ঘন কালো করে কখন মেঘ জমেছে, ওরা খেয়ালই করেনি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। সেই ব্যক্তি বইটা কোর্টের পকেটে চালান করে একটা ইশারা করতেই সমস্ত দলটা দুড়দাড় করে ছুটে পালিয়ে গেল। কবরটা অমনিই পড়ে রইল। উন্মুক্ত।

দৃশ্য ৪

(৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫, কলকাতা)

বাইরে তখন মুশলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝেই বজ্রবিদ্যুতের ঝলক খেলে যাচ্ছে আকাশে। নিজের ঘরের আর্মচেয়ারে বসে ওয়াইনের গ্লাসে একটা করে চুমুক দিচ্ছিল সে। আর সেই জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল। এই মহার্ঘ বস্তুটা এতদিন কলকাতার বুকে ছিল, সেটা কেউই জানত না। বিদেশের বাজারে এটার যা দাম হবে, ভেবেই সে পাগল হয়ে গেল। কিন্তু এটা একবার পরখ করে দেখতে হবে। কাজ শুরু করা যাক!

দৃশ্য ৫

(কলকাতা, ২০২০)

ঘটনা ১

কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে সুমনা। তাদের পাড়াতেই শেখরদার কোচিং সেন্টার আছে, সেখানেই এখনও ক্লাস করে সে। শেখর ওকে স্কুলে থাকতে বায়োলজি পড়াত। একপ্রকার শেখরের পড়ানোর জন্যই সুমনা বোটানি সাবজেক্টটাকে এত ভালোবেসে ফেলেছিল যে সেটাকেই আগামী তিন বছরের জন্য বেছে নিল। শেখরও বরাবর সেটাই চেয়েছিল মনে মনে। পড়াতে পড়াতে নিজের অজান্তেই কখন যেন শেখরের ভালো লেগেছিল সুমনাকে। ভালোবেসে ফেলেছিল সে ওই মেয়েটাকে।

কিন্তু মানুষ যা চায় তা-ই কি পায়? শেখর ভালোবাসার পরিবর্তে ভালোবাসা চেয়েছিল, কিন্তু সুমনা তো সেই প্রথম থেকেই তার সহপাঠী আকাশকেই ভালোবেসেছে। প্রথম দিনেই দুজনের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। যেন একে অপরকে কবে থেকে চেনে। এইভাবে মাস দুয়েক চলতে চলতেই আকাশ আর সুমনা বুঝতে পেরেছিল, ওরা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছে। সেভাবে ফর্মালি কেউ কাউকে বলেনি, শুধু ক্লাসের পরে এক-আধ দিন যখন দুজনে প্রিন্সেপ ঘাটে বসে থাকত, গঙ্গার ওপর দিয়ে নৌকাগুলোকে দেখতে দেখতে যখন সুমনা আকাশের কাঁধের ওপর নিজের মাথাটা এলিয়ে দিত। আকাশ আরও শক্ত করে ওকে কাছে টেনে নিত। নিজের গালটা ওর মাথার ওপর হেলিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে সূর্যাস্ত দেখত ওরা। সেদিনই ওই অস্তগামী সূর্যের লালচে আভার মতোই লজ্জায় রাঙা হয়ে একবার চোখ তুলে দেখেছিল সুমনা। আকাশের চোখেও যেন সেই 'সব পেয়ে গেছি'র আনন্দ খেলে গিয়েছিল সেদিন।

সেদিন শেখরের বাড়িতে পরীক্ষা দিতে দিতে একটু বেশিই দেরি হয়ে গিয়েছিল সুমনার। আচমকাই বৃষ্টি শুরু হয়। সে কী বজ্রবিদ্যুৎ! আর হঠাৎ করে কারেন্টটাও চলে গেল। এই শীতকালেও এইভাবে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়তে খুব একটা দেখেনি সুমনা। সুমনার পড়া হয়ে গেলেও তাই সে শেখরের বাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি। বারান্দার জানলা দিয়ে ঝড়বৃষ্টি দেখছিল সুমনা। ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপুনি হচ্ছিল। হঠাৎই একটা গরম নিশ্বাস যেন ঘাড়ে পড়তে থাকে সুমনার। ঝটিতি পেছন ফিরে দ্যাখে শেখর দাঁড়িয়ে। ঠিক ওর পেছনে। হাতে একটা মোমবাতি, যেটা যে-কোনো মুহূর্তে নিভে যেতে পারে। সুমনা ব্যস্ত হয়ে বলল, "আরে শেখরদা, মোমবাতিটা নিভে যাবে তো! ভেতরে চলো।"

কিন্তু কোনো কথাই যেন শেখরের কানে ঢুকল না। মোমবাতিটাও যেন একগুঁয়েমি দেখিয়ে নিভতে চাইছে না। বারবার হাওয়ায় দুলে উঠলেও আবার স্ব-মহিমায় ফিরে ফিরে আসছে। সুমনা কাঁপছে, মোমবাতির শিখা কাঁপছে, আর তার সঙ্গে কাঁপছে শেখরের গলার স্বর!

কোনোভাবে কম্পিত কণ্ঠে শেখর বলল, "সুমনা, আমি তোকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি রে। অনেকদিন থেকেই বলব বলব ভাবছিলাম, কিন্তু পারিনি বলতে! আজ না জানি কোথা থেকে এত সাহস এল, যে বলে ফেললাম।"

সুমনা স্তম্ভিত হয়ে শুনল শেখরের কথাগুলো। আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু শেখরদা, আমি তো তোমাকে ওইভাবে কখনও দেখিনি। আমি তো আকাশকে ভালোবাসি।" আর ঠিক তখনই মোমবাতির শিখাটা দপ করে নিভে গেল। তার এতক্ষণের যুদ্ধ শেষে সে পরাজিত সৈনিকের মতো হার স্বীকার করে নিল।

এই ঘটনার পরে সুমনা আর শেখরের কাছে পড়তে

যায়নি। আকাশকেও বলেছিল সে শেখরদার ব্যাপারটা। আকাশ ওকে বুঝিয়েছিল একদিন শেখরের বাড়ি যেতে। ভালোবাসাটা কোনো অপরাধ না। কিন্তু সুমনা ওর কাছে পড়তে না গিয়ে যেটা করছে, তাতে শেখরকে আরও বেশি অপমান করা হচ্ছে। এটা ঠিক না। সবাই ম্যাচিয়োরলি ব্যাপারটা সামলে নিলে কোনো জড়তাও থাকবে না।

(১০ ডিসেম্বর, কলকাতা)

সেদিন কলেজ থেকে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল সুমনার। ফেরার পথে শেখরের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার পথেই হঠাৎ কী মনে করে ঢুকে গেল ওদের বাড়ি। আকাশও বলেছে, ও এই ব্যবহারটা ঠিক করছে না। শেখরদের বাড়িটা দোতলা। একতলায় কাকিমা টিভি দেখছিলেন। সুমনাকে দেখে হাসিমুখে দরজা খুলে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে? এতদিন আসিসনি কেন? শরীর ঠিক আছে তো?"

সুমনা বুঝতে পারল, কাকিমাকে শেখর কিছুই বলেনি। ওপরে উঠতেই একটা অস্বাভাবিক ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা যেন তিরের ফলার মতো এসে বিঁধল ওর সারা শরীরে। বারান্দাটা পেরোলেই ওপাশে শেখরের ঘর। শেখরের ঘরের দরজাটা খুব অল্প ফাঁক করা। ভেতর থেকে একটা লাল আলোর আভা আসছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সুমনা গিয়ে শেখরের ঘরের দরজাটা ঠেলল..

হঠাৎই একটা বীভৎস আর্তনাদ শুনতে পেলেন শেখরের মা। ছুটে ওপরে উঠে দেখেন, দরজার সামনে পড়ে আছে সুমনা। কাছে পৌঁছে দেখেন, বুক থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছে। অক্ষিকোটরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ধড় থেকে মাথাটা ছিঁড়ে পড়ে আছে একপাশে। তখনও শরীরটা কাটা ছাগলের মতো ছটফটাচ্ছে। আর বাথরুমের দরজার সামনে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শেখর।

(২১ ডিসেম্বর, কলকাতা)
ঘটনা ২

নিজের বেডরুমে বসে আছেন মিস্টার হেমেন্দ্র পালকার। সারা ভারত জুড়ে বিশাল বেডিং-এর ব্যাবসা। তাঁর দুই ছেলে। বড়োটা অকালকুষ্মাণ্ড। ছোটোটাও তদ্রূপ। ব্যাবসা যা সামলানোর, মা-বাপ-মরা ভাইপোটাই দ্যাখে। এই তো সবে একটা বিশাল টাকার বিজনেস এনে দিয়েছে সে। মিস্টার পালকার তাতে বেজায় খুশি। নিজের উকিল-বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছেন, যেহেতু নিজের সন্তান, নিজের রক্ত, তাই যৎসামান্য কিছু দেবেন আর বাকিটা সবই ভাইপোর জন্য উইল করে দেবেন, সেটাই ভেবেছেন। সেই ব্যাপারেই আজ লইয়ার মিস্টার বোস আসবেন বাড়িতে।

ঘরে একটা গ্রামোফোন চালিয়ে গান শুনছেন হেমেন্দ্রবাবু। এখনও গ্রামোফোনে গান শোনার অভ্যাসটা তাঁর বজায় আছে। একটা ডিম লাইট জ্বলছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে চুরুটের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। হঠাৎই তিনি দেখলেন, ঘরের ডিম লাইটটা তিরতির করে কাঁপছে, এবং ঘরের তাপমাত্রা যেন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। একটা দমকা হওয়ার ঝাপটা এসে মুখে লাগতেই তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন। কোনো জানালা খুলে গেছে কি না দেখার জন্য উঠলেন, আর্মচেয়ার থেকে উঠে ঘুরে দাঁড়াতেই থমকে গেলেন তিনি। বিস্ফারিত চোখে দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। তাঁর জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। আপ্রাণ নিজের দু-হাত দিয়ে চেষ্টা করছেন কোনো এক মৃত্যুপাশ থেকে নিজের মুক্তির, কিন্তু পারছেন না। চোখটা বড়ো হতে হতে ঠিকরে বেরিয়ে এল। আর দাউদাউ করে দুই অক্ষিকোটরে জ্বলে উঠল আগুন। আর ঠিক তখনই কেউ যেন প্রবল আক্রোশে মাথাটা ছিঁড়ে ফেলল ধড় থেকে।

দৃশ্য ৬
(২২ ডিসেম্বর, গোয়েন্দা বিভাগ,
লালবাজার, কলকাতা)

"মে আই কাম ইন স্যার?" হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গোয়েন্দা বিভাগের সব থেকে বুদ্ধিমতী অফিসার সূর্যানি মুখোপাধ্যায়।

"এসো এসো", ব্যস্ত হয়ে গোয়েন্দা বিভাগের হেড মিস্টার ঘোষ বললেন। ইশারায় বসতে বলে নিজেই কথা শুরু করলেন।

"সূর্যানি, বুঝতেই পারছ, তোমাকে ছুটির মাঝখানে কেন ডেকেছি। সকাল থেকে মিডিয়া, নেতা, মন্ত্রী সামলে সামলে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি জানি, তুমি ছুটি নিয়েছিলে। কিন্তু এই যে কলকাতার বুকে একের পর এক রহস্যজনক খুন

হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে গতকাল রাতে খুন হয়েছেন নামি ব্যবসায়ী মিস্টার হেমেন্দ্র পালকার। বুঝতেই পারছ কী পরিমাণ চাপ আমাদের ওপর। এই কিছুদিনের মধ্যেই পরপর খুন হল দুজন। কূলকিনারা করতেই হবে তোমাকে। এই কেসটা সামলে দাও, তারপর আমি নিজে তোমার ছুটির ব্যবস্থা করে দেব।"

হায়ার অফিসারের কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে আর না করতে পারল না সূর্যানি। বাধ্য হয়ে এতদিন সুমনা মার্ডার কেসটা যে দেখছিল, তার থেকে কেসের ফাইলগুলো হাতে নিয়ে গিয়ে বসল নিজের ডেস্কে। কাজের কাজ বলতে শুধু, রবার্টকে এই কেসে সহকারী হিসেবে চেয়ে যে শর্ত সূর্যানি দিয়েছিল, সেটা যা হোক করে মঞ্জুর করানো গেল।

রবার্ট ডিপার্টমেন্টেরই একজন অফিসার। কিন্তু তার বদ মেজাজের জন্য প্রায় সময়ই তাকে সাসপেন্ডেড থাকতে হয়। বর্তমানেও সে সাসপেন্ডেড। তবে সূর্যানি জানে রবার্ট ঠিক কতটা কাজের ছেলে। ভীষণ বুদ্ধিমান। আর প্রত্যেকটা কেসের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে যায়, যে ক্রাইমটা যেন তার চোখের সামনে ঘটেছে বলে মনে হবে। ছেলেটা যতই বদমেজাজি হোক, সূর্যানির সঙ্গে আজ অব্দি খারাপভাবে কথা বলেনি। আর যে ক-টা কেস ওরা একসঙ্গে সামলেছে, সব ক-টাই সাফল্যের সঙ্গে ক্লোজ করতে পেরেছে। তাই সূর্যানি এই কেসের ব্যাপারে কোনো চান্স নিতে চায়নি। পুরোনো চেনা টিম থাকলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।

দৃশ্য ৭

(২৩ ডিসেম্বর, লালবাজার, কলকাতা)

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনোরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে সূর্যানি যখন অফিসে পৌঁছোল, তখন অলরেডি সেখানে রবার্ট বসে আছে। এবং একমনে ডেডবডিগুলির ও ক্রাইম সিনের ছবিগুলো দেখছিল, সূর্যানিকে আসতে দেখে মাথা তুলে একবার দেখল বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা এতই ভাসা ভাসা ছিল যে সূর্যানি ভালোমতোই জানে যে, রবার্ট আসলে কেসের মধ্যে ঢুকে গেছে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে সূর্যানি জিজ্ঞেস করল, "ইয়ে মানে, কী মনে হচ্ছে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রবার্ট বলল, "ছবি থেকে যেটুকু বুঝতে পারছি, এটা কোনো সিরিয়াল কিলারের কাজ। কারণ সব ক-টা বডির অবস্থা এক। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই জাতীয় খুনিরা কোনো একটা প্যাটার্ন ফলো করে। এখানে সেটাই ধরা যাচ্ছে না। না ডেট, না টাইম, না দিন, আর না প্রফেশন, এমনকি ভিকটিমরা কোনোভাবে রিলেটেডও না। সেক্ষেত্রে কী প্যাটার্নে খুনটা হচ্ছে, সেটা বোঝাটা আগে দরকার।"

"রিলেটেড না, সেটা হয়তো খাতায়-কলমে, কিন্তু মিস্টার হেমেন্দ্র পালকার, বা সুমনা যে আর কোনোভাবে পরিচিত না, এটা কি এক্ষুনি বলা যায়? চলো, ভিকটিমদের বাড়িগুলোতে যাওয়া যাক এইবার। হয়তো ওখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসতে পারে।"

সূর্যানির কথাতে সম্মতি জানাতে, রবার্ট আর ও রওনা দিল ওদের প্রথম গন্তব্যের উদ্দেশে। যা হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেল মেন্টাল হসপিটাল।

দৃশ্য ৮

জেলে বিচারাধীন কয়েদি শেখর গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করতে এল সূর্যানি ও রবার্ট। যেহেতু সুমনা রায়ের মৃত্যুর সময়ে ঘরের মধ্যে শেখর উপস্থিত ছিল, আর আকাশ সেন বলে ছেলেটি জানিয়েছে, তার বান্ধবী সুমনার প্রতি শেখরের একটা আকর্ষণ ছিল, এবং নিজের মনের কথা শেখর সুমনাকে বলেছিল একদিন। কিন্তু সুমনা শেখরের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। আর সেই রাগেই শেখর নৃশংসভাবে খুন করেছে সুমনাকে।

আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখর কিছুই বলতে পারেনি। সেই দিন থেকে শেখর যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। আজকাল সে যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। কিন্তু শেখর জেলে থাকার পরেও সেই একরকমভাবে খুনটা তাহলে কে করল! শেখরের মানসিক অবস্থা দেখে জেলের ডাক্তার তার মেন্টাল হসপিটালে থাকার ব্যবস্থা করেন। তাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যখন সূর্যানি ও রবার্ট পৌঁছোল, তখন শেখর হসপিটালের ঘরের মধ্যে অবাক দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সারা দেওয়াল জুড়ে কী সব হিজিবিজি আঁকা।

একটা টুল টেনে নিয়ে সূর্যানি শেখরের সামনে এসে বসল। কিন্তু শেখরের সেদিকে কোনো হুঁশ নেই। সে একমনে দেখছে দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলো। শেখরের দৃষ্টি অনুসরণ করে রবার্টও তাকিয়ে আছে দেওয়ালের দিকে।

এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও সূর্যানি কোনো কথাই বের করতে পারল না শেখরের মুখ থেকে। সে এক-আধবার চেষ্টা

করেছিল কিছু বলার। কিন্তু এতই অস্পষ্ট, এতই দুর্বোধ্য সেই কথা যে অনেক চেষ্টা করেও কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। রবার্ট অবশ্য শেখরের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। সে শুধু দেওয়ালের শেখরের আঁকা ওই অদ্ভুত ছবিগুলোর কতকগুলো ফোটো তুলে নিল। সেসব হয়ে যেতে, সূর্যানিকে ইশারা করল উঠে পড়ার জন্য। যদিও সূর্যানি এই কেসের হেড। কিন্তু রবার্ট যখন কাজ করে, তখন সূর্যানি তার হাতেই অনেক কিছু ছেড়ে দেয়। রবার্ট যখন উঠে যেতে বলছে, তার মানে ওখান থেকে যা পাওয়ার তা পাওয়া হয়ে গেছে, অথবা আর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই অযথা কথা না বাড়িয়ে সূর্যানি ও রবার্ট উঠে পড়ে।

এবার গন্তব্য পালকার হাউস।

দৃশ্য ৯

(পালকার হাউস)

আগে থাকতে ফোন করে বাড়ির সবাইকে থাকতে বলে দেওয়া হয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগের তরফ থেকে। তাই সূর্যানি ও রবার্ট যখন পালকার হাউসে এসে পৌঁছোল, তখন বাড়ির সদস্যরা নীচের হলঘরে অপেক্ষা করছিল। মিস্টার পালকারের বড়োছেলে ধর্মেন্দ্র, তার স্ত্রী রানি দেবী এবং তাদের দুই ছেলেমেয়ে। ছোটোছেলে জিতেন্দ্র, তবে তার স্ত্রী তাদের বছর সাতেকের মেয়েকে নিয়ে ঘরের মধ্যে আছে। কারণ বাচ্চাটি নাকি খুবই অসুস্থ। দাদুর মৃত্যুর পর থেকেই তার খেপে খেপে জ্বর আসছে। মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারাচ্ছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে হয়তো, আসলে দাদুর খুব কাছের ছিল সে, প্রায় সময়ই দাদুর ঘরে খেলত। আর নীচে আছে মিস্টার পালকারের ভাইপো বিজয়। তার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকে বিজয় এই বাড়িতেই বাকি দুই ভাইয়ের সঙ্গে বড়ো হয়েছে। এখনও বিয়ে করেনি। মিস্টার পালকার বিজয়কে খুব স্নেহ করতেন। বিজয়ও তাঁকেই নিজের বাবার মতোই শ্রদ্ধা করত।

সূর্যানি ও রবার্ট দুটো সোফাতে বসল। এবং একে একে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। সবার উত্তর মোটামুটি একরকম। সবারই হতবাক অবস্থা। বড়োছেলে ধর্মেন্দ্র হিন্দিতে যা বলল, তার বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায়—“প্রতিদিনের মতোই বাবা নিজের ঘরে ছিলেন। আমাদের লইয়ার মিস্টার বোসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমারা ছিলাম আমাদের ঘরে। হঠাৎ করেই বাবার চিৎকার শুনতে পেয়ে আমরা ওঁর ঘরে ছুটে গিয়ে দেখি, বাবা মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর মাথাটা ধড় থেকে আলাদাভাবে মেঝেতে পড়ে আছে। বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। চোখগুলো জ্বলে গেছে। উফফ, সে কী বীভৎস দৃশ্য”, বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ধর্মেন্দ্র।

“আপনারা বাবার খুনিকে তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করুন। এইভাবে বাবাকে মেরে কার কী লাভ হবে, সেটা আমরা জানি না, তবে আমাদের বাবার খুনিকে আমি সামনে পেলে ছাড়ব না”, এই বলে বিজয় নিজের হাতেই একটা ঘুসি মারল।

“আপনি শান্ত হোন। আমরা যখন কেসটা দেখছি, আশা করছি, এই কেসের মীমাংসা করতে পারব”, ঠান্ডা গলায় বলল সূর্যানি।

“আপনাদের বাড়িতে তো যথেষ্ট সিকিউরিটি আছে। বাড়িতে অনেক পরিচারক-পরিচারিকাও আছে দেখছি তো। তারা কেউ কিছু দেখেনি? সেই সময় কেউ এসেছিল কি না?” খুব ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করল রবার্ট।

“না! ঠিক বাবার চিৎকার করে ওঠার আগে থেকেই বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোও খারাপ হয়ে গেছে। কোনো ক্যামেরাই কাজ করছে না। অথচ তার আগে সবই ঠিক ছিল। একসঙ্গে সব খারাপ হয়ে গেল কী করে, সেটাও আমাদের সিকিউরিটি অফিসাররা বুঝতে পারছে না”, বললেন হেমেন্দ্র পালকারের ছোটোছেলে জিতেন্দ্র পালকার।

এইসব শুনতে শুনতে হঠাৎ করেই রবার্ট বলে, “আপনার মেয়েই সেদিন প্রথম দাদুর ঘরে গিয়েছিল, বলেছিলেন না? আর তারপর দাদুকে ওই অবস্থায় দেখে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল?”

“হ্যাঁ।”

“বলতে খারাপ লাগছে, তা-ও কি একবার দেখা করা যাবে আপনার মেয়ের সঙ্গে?”

“আসলে ও কিছুই বলছে না, আমরা অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি ওকে। সেদিনের পর থেকে কেমন চুপ করে আছে। খেতে চাইছে না। খুব জ্বর।”

“আমি সবই শুনেছি, চিন্তা করবেন না, আমি বেশি সময় নেব না।”

প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও পালকার পরিবার না করতে পারল না। এবং জিতেন্দ্র পালকারের মেয়ে খুশির ঘরে রবার্ট ও সূর্যানিকে নিয়ে এল।

খুশি জেগেই ছিল। চুপ করে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। আর তার মা সামনে বসে ছিলেন। এরা যে এতজন ঘরে ঢুকল, সেদিকে খুশি একবারও দেখল না। অথচ বাচ্চা মেয়েটি ভীষণ হাসিখুশি ছিল। সূর্যানি আস্তে আস্তে খুশির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হিন্দিতেই জিজ্ঞেস করল, "খুশি, আমি তো শুনেছি তুমি খুব সাহসী মেয়ে। আচ্ছা, তুমি আমাদের বলবে, তুমি সেদিন কী দেখেছিলে?"

খুশি কোনো উত্তর দিল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। যেন একটা মোমের পুতুল। সূর্যানি আবার জিজ্ঞেস করল, "খুশি, তোমার কি কিছু মনে পড়ছে?" কিন্তু সেই একভাবেই চুপ করে থাকল খুশি।

বেশ অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরেও যখন খুশি কিছু বলল না, তখন রবার্ট নিজের মোবাইলটা বের করে কতকগুলো ফোটো তুলে ধরল খুশির সামনে। ফোটোগুলোর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎই খুশির মুখের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। ওর চোখ দুটো ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, খুশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। রবার্ট শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "বলো খুশি, তুমি কি এমন কিছু দেখেছ সেদিন দাদুর ঘরে?" কিন্তু কিছু বলার আগেই খুশি আবার জ্ঞান হারাল। একটা ফুটফুটে মেয়ের ওপর আর মানসিক চাপ বাড়াতে চায়নি সূর্যানি। তাঁরা একে একে বেরিয়ে এলেন সেই ঘর থেকে।

দৃশ্য ১০

গাড়িতে যেতে যেতে সূর্যানি দেখছিল ফোটোগুলো। সেভাবে একঝলকে দেখলে মনে হবে হিজিবিজি আঁকা। কিন্তু একটু ভালোভাবে একদৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে ওই হিজিবিজিগুলোর পেছনে দুটো চোখ আছে। ঠিক মানুষের চোখের মতো না। কোনো ক্ষিপ্র জন্তুর চোখের মতো বা সেরকমও না... আসলে ছবিটা আঁকার পরে কালি দিয়ে বারবার সেটার ওপর কাটা হয়েছে তাই ছবিটা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু যে ছবিটা দেখে খুশি অজ্ঞান হয়ে গেল, সেখানে চোখ দুটো একটু স্পষ্ট। সূর্যানি মুখ তুলে দেখল রবার্টের দিকে। রবার্ট একদৃষ্টে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্যানি বুঝতে পারল, ও নিজের মাথার মধ্যে কাটাকুটি খেলা শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল সূর্যানির মাথায়। ও রবার্টকে উদ্দেশ করে বলল, "আচ্ছা, আমরা তো একটা সাদা কাগজ দিয়ে দেখতে পারি। ও যদি আবার কিছু একটা আঁকে?"

জানালার দিকের থেকে চোখ না ফিরিয়েই রবার্ট বলল, "হুম্‌ম্‌, আমিও সেরকমই কিছু একটা ভাবছিলাম। কারণ খুশি যেভাবে এই ছবিটা দেখে রিঅ্যাক্ট করল, তাতে এটা স্পষ্ট যে এই ছবির চোখ দুটো কোনোভাবে রিলেটেড এই দুটো খুনের সঙ্গে।"

"আমার মনে হয়, আমাদের কালই একবার শেখরের সঙ্গে দেখা করা উচিত।"

দৃশ্য ১১

(২৩ ডিসেম্বর, রাত ১১টা, পালকার হাউস)

খুশিকে অনেক কষ্ট করে রাতের খাবার খাইয়ে বাড়ির এক পরিচারিকা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খুশির ঘরের পাশের ঘরে তখন জিতেন্দ্র আর তার স্ত্রী স্নেহা সবে ডিনার সেরে ঢুকছে। হঠাৎই ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া অনুভব করে তারা। ঘরের আলোগুলো দপদপ করছে। কোনো জানলা খোলা আছে, নাকি এসি চালিয়ে দিয়েছে কেউ, সেটা দেখার জন্য যখন ঘরের এদিক-ওদিক দেখছে ওরা, হঠাৎই একটা আর্তনাদ শোনে পাশের ঘর থেকে। "খুশি!" বলেই চেঁচিয়ে উঠে পাশের ঘরে এসে দ্যাখে সব শেষ! খুশির ছোট্ট দেহটা তখনও কাঁপছে, চোখের আগুন তখনও নেভেনি। আর উত্তরের জানলাটা হাট করে খোলা।

দৃশ্য ১২

রাতেই খবরটা যায় সূর্যানির কাছে। রবার্টকে জানালে সঙ্গে সঙ্গে সে অকুস্থলে পৌঁছোয়। এখনও অব্দি এই খুনের ভিকটিমদের শুধুমাত্র ছবিই দেখেছে ওরা। ছোট্ট খুশিকে ওইভাবে দেখতে হবে—এই কথা অবশ্য ভাবেনি কেউ। সূর্যানি নিজেও একজন মা। স্নেহাকে কিছু সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। মিস্টার পালকারের মতোই একরকমভাবে খুশিকে হত্যা করা হয়েছে। বুকের কাছটায় যেভাবে চেরা হয়েছে, কোনো মানুষ ওইভাবে ফালা ফালা করতে পারে না। কিছুক্ষণ দেখার পরে সূর্যানি আর দেখতে পারে না। রবার্টের মতো কাঠখোট্টা মানুষও মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

বাড়ির পেছনের দিকে সার্ভেন্টস' কোয়াটার। সেখানেই অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায় ড্রাইভার হরিকে। রবার্ট বেশি দেরি না করে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় হরির কোয়ার্টারে। মুখে জল দিয়ে সবে হরির জ্ঞান ফেরানো গেছে। যা হোক করে সামলে নিয়ে বসে হরি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে। সূর্যানি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "তুমি দেখেছিলে হরি?" হরি আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।

"কে ছিল?"

"একটা জানোয়ার ছিল, মেমসাহেব, ওটা কোনো মানুষ না, টিকটিকির মতো বাড়ির দেওয়াল বেয়ে ছোটোসাহেবের ঘরের দিকে চলে গেল। এত তাড়াতাড়ি বেয়ে উঠে গেল যে আমি ল্যাজটা আর একবার লাল আগুনের মতো দুটো চোখ দেখতে পেয়েই অজ্ঞান হয়ে যাই।"

রবার্ট আর দেরি করল না। এতক্ষণ পর্যন্ত যতজন খুনিকে দেখেছে, কেউই কিছু বলার মতো অবস্থায় ছিল না। এ-ই একমাত্র সাক্ষী। একটু সুস্থ করেই রবার্ট পুলিশ প্রোটেকশন বাড়িয়ে দেয় হরির ঘরের সামনে। সূর্যানি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে ডেকে পাঠায় প্রফেশনাল আর্টিস্টকে, যে হরির কথামতো ছবি আঁকবে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার এবং বারংবার ফোন করার পরেও যখন সঞ্জয় আসছিল না, ঠিক তখনই একটা কল আসে সূর্যানির ফোনে। আঁকার জন্য সঞ্জয় আসছিল, রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টে সে মারা গেছে।

এইসব একের পর এক ঘটনার ভয়ে হরিও কেমন অচৈতন্য হয়ে পড়ে। হরিকে নিয়ে কাছের একটা হাসপাতালে ভরতি করায় সূর্যানি। এবং পুলিশ প্রোটেকশন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। রবার্ট ও সূর্যানি দুজনেরই মাথায় চিন্তার ভাঁজ। হরি রাত হলেই একটু নেশা করে, আর সেই কারণেই রাতে কখনও কারও দরকার হলে হরিকে গাড়ি চালাতে দেওয়া হয় না। কিন্তু বহু পুরোনো লোক বলে ছাড়াতে পারেনি। হেমেন্দ্রবাবুর বিশেষ পছন্দের লোক হরি। হরি যেটুকু বলেছে, সেটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

(২৪ ডিসেম্বর, কলকাতা)

ঘড়িতে যদিও চারটে বাজে, কিন্তু শীতকাল বলে সূর্যের কোনো দেখা নেই। সূর্যানি নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু রবার্ট নিজের বাড়িতে গেল না। গাড়ি ঘুরিয়ে গেল ফাদার জোসেফের কাছে।

ফাদার জোসেফ সেন্ট মেরিস চার্চে থাকেন। রবার্টের কাছে ফাদার জোসেফ শুধুমাত্র একজন পাদরি নন, অনাথ রবার্টের জীবনে ফাদারের ভূমিকা একজন বাবার থেকে কম না। রবার্ট খুবই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল। তাই ফাদার জোসেফ বিশেষভাবে যত্ন নিতেন রবার্টের পড়াশোনার। রবার্টও ছোটোবড়ো যা অসুবিধা হত, সেটা নিয়ে পৌঁছে যেত ফাদারের কাছে। ফাদারের অমায়িক হাসিটা দেখলেই ওর সব অশান্তি যেন নিমেষে মিলিয়ে যেত। সেইজন্যই ও ছুটল ফাদারের কাছে। ফাদার জোসেফই পারবেন ওর এই অশান্ত মনকে শান্ত করতে।

দৃশ্য ১৩

হরিকে পাহারা দিচ্ছিল যে দুজন কনস্টেবল, শীতের রাতে কখন যে তাদের চোখ লেগে এসেছিল, তারা জানে না। হরির ঘর থেকে একটা আর্তনাদে তারা তড়িঘড়ি যখন ঘরের মধ্যে ঢুকল, ততক্ষণে হরির রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে মাটিতে। থরথর করে কাঁপছে!!

চার্চ থেকে বেরিয়ে রবার্ট নিজের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল। মাঝরাস্তায় কলটা এল। সূর্যানি ফোনে জানাল হরির খবরটা।

দৃশ্য ১৪

(২৪ ডিসেম্বর, সকাল ১০টা
গোয়েন্দা বিভাগ, লালবাজার)

"একটা স্ট্রং লিড হারালাম আমরা", মাথায় হাত দিয়ে বসে সূর্যানি বলল।

"হুম্‌ম্।" রবার্ট যেন আরও বেশি চুপ হয়ে গেছে। সূর্যানি বুঝতে পারছে, রবার্ট কিছু একটা ভাবছে, নিজের মোবাইলে কিছু একটা দেখছে।

সূর্যানি আবার বলল, "ভিকটিমরা কীভাবে রিলেটেড—এটাই বোঝা যাচ্ছে না। পালকার হাউস বাদে সুমনা কীভাবে এই খুনের সঙ্গে জড়িত, সেটাই ...."

ওকে মাঝপথে থামিয়ে রবার্ট বলল, "খুনটা যদি কোনো মানসিক বিকারগ্রস্ত সিরিয়াল কিলার করতো তাহলে পালকার হাউসের এতজন মারা যেত না। কারণ এই জাতীয় সিরিয়াল

কিলাররা যে প্যাটার্ন ফলো করে, সেই হিসেবে একই দিনে খুশি ও হরিকে মারত না। খুশি ও হরির মৃত্যুটা মনে যে খটকাটা আনছে...”

সূর্যানি বলল, “ঠিক যেন সাক্ষী সরাতে চাইছে। কেউ চাইছে না যে আমরা খুনির কাছ পর্যন্ত পৌঁছোই। ছবি আঁকতে আসার কথা ছিল সঞ্জয়ের, ওরও অদ্ভুতভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মৃত্যু হল। হরি যেটুকু দেখেছিল বলতে পারত, ওকেও সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সেটা তো পালকার হাউসের ব্যাপার বলে ভাবা যেতে পারে, এর সঙ্গে সুমনা ও পলাশের মৃত্যুটা লিংক কীভাবে হচ্ছে?”

“সেটাই তো আসল ব্যাপার। শেখরের কাছে একবার যেতে হবে। এখন একমাত্র শেখরই পারবে খুনির ছবিটা আঁকতে।”

ওরা বেরোতেই যাচ্ছিল, তখনই বাইরে একটা কোলাহল শুনে উঠে দেখল, পিন্টুকে একজন ইন্সপেক্টর ধরে খুব মারছে। পিন্টু এমনিতে পকেটমার। ছিঁচকে চোর। কিন্তু তার আড়ালেও কিন্তু পুলিশের খোঁচড়। মানে কালো দুনিয়ার অনেক খবর থাকে ওর কাছে। অনেকবারই সেইসব খবরে পুলিশ ভালো লিড পেয়েছে। রবার্ট তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে পিন্টুকে উদ্ধার করল। আসলে ইন্সপেক্টরটি নতুন। সে জানে না পিন্টু এইসব করলেও তাকে খুব বেশি শাস্তি পেতে হয় না, বড়োজোর একরাত লকআপে রেখে ছেড়ে দেয়,এটাই ডিল পুলিশের সঙ্গে। এইজন্যই পিন্টু প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে খবর পাচার করে। রবার্ট পিন্টুর ভালো দিক সম্পর্কে নতুন ইন্সপেক্টরকে জানাতে সে পিন্টুকে লকআপে পুরে দিল। ঠোঁটের আগা দিয়ে একটু রক্ত চুইয়ে পড়ছিল। পিন্টু সেটা মুছতে মুছতে বলল, “থ্যাংক ইউ স্যার, আমি কখন থেকে লোকটাকে এটাই বোঝাতে যাচ্ছি, শালা শোনেই না।”

রবার্ট একটু ধমকের সুরেই বলল, “অ্যাই চুপ কর, ইন্সপেক্টরকে শালা বলছিস, তা-ও আমার সামনে! তোর সাহস দিনে দিনে বাড়ছে কিন্তু! আজকাল তো খবরও দিতে পারিস না কিছু, তোর সঙ্গে সব ডিল ক্যানসেল করে দেব। লকআপে পচে মর শালা!”

“কী খবর লাগবে বলুন শুধু, পিন্টুর কাছে খবর নেই, সেটা হবে না।”

“এই যে খুনগুলো হচ্ছে, এগুলো নিয়ে কী জানিস?”

“কোন খুনগুলো? ওই আগুনে চোখ পুড়িয়ে? বুক চিরে ফেলে?”

“হ্যাঁ।” রবার্ট একটু উত্তেজিত।

“না স্যার, এই ব্যাপারে কিছু জানি না। তবে...”

“তবে?”

“তবে একটা কথা ভাসা ভাসা শুনছিলাম। কেউ একজন নতুন মাল, টাকা নিয়ে কনট্রাক্টে লোক মারছে। সেই লোকটা এইগুলো করছে কি না জানি না।”

“কে লোক? কোথায় থাকে? আমাকে সব বল।”

“স্যার, এর বেশি কিছু জানি না। মালটা এত চুপচাপ কাজ করছে যে কেউ ধরতে পারছে না কে এটা। তবে একজন আছে, আমাদের খবরিদের বাপ! দেখি, তাকে ধরে চেষ্টা করে দেখছি, কতটা কী জানতে পারি।”

রবার্টের বলাতে পিন্টুকে একটা রাতও লকআপে থাকতে হল না। সে খবর নিতে বেরিয়ে পড়ল। আর সূর্যানি আর রবার্ট গেল শেখরের কাছে।

দৃশ্য ১৫

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থেকেও শেখর একটা আঁচড়ও কাটল না খাতায়। রবার্ট অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করল, শেখরের নামে যে মিথ্যা অভিযোগ এসেছে, সেটা চলে যাবে। অনেক প্রলোভন দেওয়ার পরেও শেখরের চোখ-মুখের কোনো পরিবর্তন হল না।

সূর্যানি আস্তে করে পাশে বসল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, “তুমি সুমনাকে ভালোবাসতে না? তুমি চাও না ওর খুনি ধরা পড়ুক? একটু চেষ্টা করো শেখর, তুমি পারবে সেই মুখটা মনে করতে। সুমনার কথা ভাবো। আর ওর রক্তাক্ত দেহটা ভাবো। তুমি কি চাও না মেয়েটা ন্যায়বিচার পাক? কারা করল এরকম? জানতে চাও না?”

শেখরের মধ্যে এবার একটু পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তার দু-গাল বেয়ে কান্না ঝরে পড়ল। সূর্যানি আর বেশি কিছু বলল না। কাগজ-পেনসিলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে রবার্টকে ইশারা করল ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসতে।

ওরা বাইরে অপেক্ষা করল আরও এক ঘণ্টামতো। তারপরে ভেতরে যখন ঢুকল, শেখর তখন সাদা কাগজে আঁচড় কেটে যাচ্ছে। তবে এবারে আর হিজিবিজি না। একটা স্পষ্ট মুখ। একটা অবয়ব। সেটা মানুষ না গোরু না বাদুড় না গিরগিটি নাকি সবকিছুর মিশ্রণ, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। হরির কথাগুলো নেশার ঘোরে মনে হলেও, শেখর মানসিকভাবে অসুস্থ হলেও খুনির ব্যাপারে দুজনের একই রকম বয়ান এতটা

কাকতালীয় হতে পারে না।

সূর্যানি ছবিটা তুলে নিল শেখরের হাত থেকে। শেখর হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করে দেওয়ায় এবং কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় ডাক্তারদের হাতে শেখরকে রেখে ওরা বেরিয়ে এল।

ওরা হসপিটাল থেকে বেরোতেই একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন এল রবার্টের ফোনে।

"হ্যালো।"

"স্যার, আমি পিন্টু। কিছু খবর পেয়েছি..."

খবরটা শুনে রবার্ট একটু চুপচাপ হয়ে গেল। সূর্যানির বারংবার জিজ্ঞেস করার পর ও সবটা বলল।

তারপর বলল, "আমি এক্ষুনি একটা জায়গায় যাব। তুমি যাবে আমার সঙ্গে? নাকি তোমাকে অফিসে ছেড়ে দেব?"

"কোথায় যাবে?"

"সেন্ট মেরিস চার্চ।"

"চলো।"

দৃশ্য ১৬

ওরা যখন চার্চে এল, তখন জানতে পারল, ফাদার জোসেফ একটা মিটিং-এ ওঁদের কার্সিয়াঙে যে সেন্ট মেরিস চার্চ আছে, সেখানে গেছেন। আগামীকাল যেহেতু ক্রিসমাস তাই দু-তিন দিন পরে ফিরবেন। আপাতত ফাদার জুডি আছেন। এই ক-দিন ফাদারের অনুপস্থিতিতে উনি চার্চের দায়িত্ব নিয়েছেন। রবার্ট সেভাবে চেনে না ফাদার জুডিকে। আগে দেখেছে যদিও, তবে আলাপ করার সেভাবে সুযোগ হয়নি। কয়েক বছর আগেই ফাদার জুডি এই চার্চে আসেন। একবার ভাবল, কথা বলবে কি না। কিন্তু তারপর ভাবল, দু-দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে কি না। ওর মনে যে চিন্তাটা এসেছে, সেটা একবার ফাদার জুডির সঙ্গে আলোচনা করে নিলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।

দৃশ্য ১৭

রবার্ট ও সূর্যানি যখন ফাদার জুডির রুমে ঢুকল, তখন চেয়ারে বসে এক বছর ষাটের সৌম্য পুরুষ। ওদের দেখে একগাল অমায়িক হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। রবার্ট ও সূর্যানি নিজেদের পরিচয় দিল। এ কথা-সে কথার পর সূর্যানি বলল, "আমাদের এখানে আসার একটা কারণ আছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কলকাতার বুকে একের পর এক খুন হয়ে যাচ্ছে। এবং সেই সূত্রেই খুনির ছবি হিসেবে আমাদের হাতে আসে এই ছবি।" বলে ছবিটি এগিয়ে দিল।

জুডি সেটা দেখেই আঁতকে উঠলেন। মুখে কিছু বিড়বিড় করলেন। অস্ফুটে বেরিয়ে এল নাম—"স্যাটান।"

"আমাদেরও ছবিটা দেখে প্রথমেই এই নামটাই মনে এসেছিল। কিন্তু এ তো অসম্ভব।"

জুডি হেসে বললেন, "যদি তুমি মনে করো গড আছেন, তাহলে তার অপোজিট স্যাটান কেন থাকবে না?"

"কিন্তু স্যাটান পৃথিবীতে এসে শুধু শুধু মানুষ মারতেই বা যাবে কেন?"

"স্যাটান নিজে থেকে কখনোই আসে না। তাকে আহ্বান করতে হয়। ডেভিল'স ওরশিপ এত সোজা জিনিস না। সেটাও একটা সাধনা। আর সেই সাধনা আজ অব্দি কেউ জানে বলেও শোনা যায়নি।"

"তাহলে?"

"আমার মনে হচ্ছে, কেউ ইচ্ছাকৃত এইভাবে পোশাক পরে অহেতুক বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কারণ স্যাটানকে আহ্বান যে কেউ করতে পারে না। অনেক বড়ো মাপের সাধকই তা পারে। একমাত্র তার সাধনার শক্তিতেই স্যাটান সন্তুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে আসে। কাল ক্রিসমাস, প্রতিবারের মতো ক্রিসমাস কার্নিভ্যালে কেউ জেসাস সাজে, কেউ মাদার মেরি সাজে, তো আবার কেউ স্যাটানও সাজে। সেরকমই কিছু হবে এটা।"

রবার্ট এইসব কথা যেন শুনছেই না। তার মন যেন অন্যত্র পড়ে আছে। সূর্যানি সেটা লক্ষ করেছে। রবার্টের মেজাজি স্বভাবের জন্য সে বেশি ঘাঁটাতে চায় না।

ফাদারের সঙ্গে কথা কথা বলে ওরা বেরিয়ে এল।

দৃশ্য ১৮

(২৪ ডিসেম্বর, রাত)

ক্রিসমাস ইভের রাতের কলকাতা একেবারেই অন্যরকম চেহারা নেয়। চারিদিকে আলোর রোশনাই। সারা পার্ক স্ট্রিট জুড়ে মানুষের ঢল নামে। রাস্তা জুড়ে ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে মেলা বসে, কার্নিভ্যাল হয়। তবে এই বেশ কিছুদিন আকাশে

মেঘের ঘনঘটা খুব বেশি। যখন-তখন ঝোড়ো হাওয়া সমেত বৃষ্টি হচ্ছে। শীতের কলকাতা ক্রিসমাসের সময় এত বৃষ্টি কখনও দেখেনি এর আগে। ওরা যখন চার্চ থেকে বেরোচ্ছিল, তখন সারারাত জুড়ে সেখানে প্রেয়ার হওয়ার প্রস্তুতি দেখেছিল। রবার্টের নিজের স্কুলের দিনগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল।

পিন্টুর সঙ্গে কথা বলে যখন রবার্ট বাড়ি ফিরল, তখন ঘড়িতে বাজে ঠিক এগারোটা। রিপন স্ট্রিটের একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে রবার্ট। সেন্ট মেরিসের অনাথ আশ্রমে বড়ো হয়েছে। যবে থেকে চাকরি পেয়েছে, এই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু মনটা আজও পড়ে আছে অনাথ আশ্রমে। অনাথ আশ্রমে থাকাকালীন রিচার্ড ছিল ওর সব থেকে প্রিয় বন্ধু। না, রিচার্ড অনাথ না। ওদের আশ্রমেও থাকত না। ওরা একসঙ্গে স্কুলে পড়ত। রিচার্ড কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান পরিবারের ছেলে। রিচার্ড ডি মেলো। অনেকবার রিচার্ডের সঙ্গে তার বাড়িতে গেছে রবার্ট। তার পরিবারকে দেখে সবসময় নিজের একটা পরিবারের ছবি এঁকেছে। গ্র্যান্ডমা লিলি ডি মেলো একটু অদ্ভুত ছিলেন,কিন্তু তার আর রিচার্ডের বন্ধুত্ব দেখে দুটো ক্রস দিয়েছিলেন, যেটা এখনও রবার্ট পরে থাকে। ওর বাবার ইয়া মোটা গোঁফ ছিল, আর দারুণ পিয়ানো বাজাতেন তিনি। ওর মা দারুণ কেক বানাতেন। সবাইকে আজও মনে পড়ে রবার্টের। বিশেষত এই ক্রিসমাস ইভ-এর দিনটা ছোটোবেলায় কাটত ডি মেলো পরিবারের সঙ্গে। তাই ডি কোস্টা হাউসের ঠিকানাটা আজও মনে গাঁথা আছে। এইসব পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে গরম করতে দিতে গেছে এমন সময় সূর্যানির ফোন আসে। এক্ষুনি পৌঁছোতে হবে ডি কোস্টা হাউসে।

রবার্ট এইসবের জন্য তৈরিই ছিল। পিন্টুর সঙ্গে যখন ফোনে কথা হয়, তখন পিন্টু জানায় যে রিচার্ড একটা কনট্রাক্ট কিলিং-এর এজেন্সি খুলেছে, যেখানে পয়সাওয়ালা ক্লায়েন্টরা তাদের পথের কাঁটা সরানোর জন্য টাকা দেয়। এবং তার পরেই সেই কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে যায়। তাই অল্প দিনের মধ্যে হলেও তার পসার বেশ বেড়ে গিয়েছিল। সব কাজই খুব গোপনীয়তার সঙ্গে করা হচ্ছিল। কিন্তু পসার বাড়তেই একটু একটু করে খবর বাইরে আসতে শুরু করে। রিচার্ডের বাড়িতে নাকি কী সব শয়তানের সাধনা হয়। আর সেই সাধনায় জড়িয়ে আছে চার্চের এক পাদরি। প্রায় সময়ই রাতের দিকে সেই ফাদারকে ডি কোস্টা হাউসে আসতে দেখা যায়। এই কথাই সূর্যানিকেও জানিয়েছিল সে।

দৃশ্য ১৯

সূর্যানি টিম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডি কোস্টা হাউসের সামনে। সূর্যানি ওকে ফোনে জানাল যে ঘূর্ণিঝড়ের মতো একটা লাল ঝোড়ো হাওয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডি কোস্টা হাউসে ঢুকে গেল। আর তারপরেই একটা বিকট আর্তনাদ শোনা গেল। রবার্টও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে সেখানে। আজ অনেক বছর পরে রবার্ট ডি কোস্টা হাউসে ঢুকল। আগে বহুবার এসেছে এই বাড়িটায়, তখন কত উজ্জ্বল দেখাত বাড়িটা। আজ যেন কেমন স্যাঁতসেঁতে গন্ধ নাকে এল। সূর্যানিও বাড়িতে ঢুকে নাকে রুমাল দিল। আর অদ্ভুতভাবে বাড়িটা ভীষণ ঠান্ডা। এতটা ঠান্ডা এর আগে কখনও বোধ হয়নি। পুরো বাড়িটা অন্ধকার, প্রথমে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু লম্বা করিডোরটার একপাশে একটা ঘর থেকে একটা লাল আভা বের হতে দেখে ওরা সেই আলোর উৎসের দিকে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যেতে থাকে। ওরা যত এগিয়ে যাচ্ছে, সূর্যানি ও রবার্ট দুজনেই অনুভব করতে লাগল তাদের শরীর ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। তাদের চলার গতি ক্রমশ মন্থর হচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘরের ঠিক সামনেটায় উপস্থিত হয়ে আলতো করে দরজাটা ঠেলল সূর্যানি। ঘরের মধ্যে একটা লাল আভা। আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। রবার্ট পাশ থেকে আর্তনাদ করে উঠল, ফাদার জোসেফ!

ফাদার জোসেফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তখনই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা ভয়ংকর জীব তাঁর গলার নলিটা চেপে ধরল। সূর্যানি অনুভব করল, সে তার চলনশক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে। শরীরটা অস্বাভাবিকরকম ভারী হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে গেছে।

এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা জান্তব আওয়াজ শুনে ওর হাতের রিভলভারটা মাটিতে পড়ে যায়। ওদের চোখের সামনে সেই অদ্ভুতদর্শন জীবটা ফাদার জোসেফের দেহটা তুলে ধরে শূন্যে। ফাদার জোসেফের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে সেখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। তারপর পৈশাচিক উল্লাসে ফাদারের মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ছুড়ে ফেলে দেয় সেই প্রাণীটি। আর বুকের মধ্যে পাঁজর ভেদ করে উপড়ে আনে ফাদারের হৃৎপিণ্ডটা।

জীবটার সারা শরীরটা নরকের ফুটন্ত লাভার মতো লাল,

মাথাটা ন্যাড়া, মাথার ওপরে দুটো শিং, চোখ দুটো যেন ভাটার মতো জ্বলছে, মাঝে মাঝে সাপের মতো কাটা জীবটা বের করছে। কাঁধের দু-পাশ থেকে বাদুড়ের মতো দুটো ডানা বেরিয়ে আছে, এদিকে লম্বা লম্বা আঙুল সমেত হাতও আছে।

শেখরের আঁকা ছবিটার সেই মুখ, সেই চোখ দেখেই সন্দেহ হয়েছিল রবার্টের। ছোটোবেলায় পড়েছে বইতে এর কথা। ঈশ্বরের ভূমি থেকে বহিষ্কৃত সাক্ষাৎ শয়তান! বা স্যাটান বা ডিমন বা ডেভিল—যে নামেই ডাকা হোক। এই সেই শয়তান।

সূর্যানির শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। ওর হৃৎপিণ্ডের গতি অতি দ্রুত। এক্ষুনি মনে হচ্ছে, পাঁজর ভেদ করে হৃৎপিণ্ডটা ছিটকে বেরিয়ে আসবে। সারা শরীরে এক অদ্ভুত কাঁপুনি। চোখ ঘুরিয়ে রবার্টের দিকে দেখল সে। তারও একই রকম অবস্থা।

নিজের হাতের থাকা মোবাইলের এসওএস মেসেজের বাটনটা কোনোরকমে প্রেস করে ও। বাইরেই ওদের টিম অপেক্ষা করছে ফাদার জুডিকে নিয়ে। সূর্যানির সিগন্যাল পেয়ে তারা তড়িঘড়ি ঢুকে পড়ল ডি কোস্টা হাউসে।

কিন্তু ততক্ষণে ডেভিল একলাফে রবার্টের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। রবার্ট চেষ্টা করছে কিছু বলার। কিন্তু তার বাক্‌শক্তি নেই। একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ ছাড়া কিছুই বেরোল না ওর মুখ থেকে। রবার্ট ডেভিলের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই আগুন চোখের মধ্যে যেন কিছু খুঁজতে চেষ্টা করছে। ডেভিলও একদৃষ্টে দেখছে রবার্টকে। তার গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে পশুর মতো আওয়াজ বের হচ্ছে, নিশ্বাসের সঙ্গে যেন আগুনের হলকা এসে পড়ছে মুখে রবার্টের মুখে। সে যে কী দুর্বিষহ অবস্থা! হঠাৎ সারা আকাশ জুড়ে কালো মেঘের মধ্যেই তীব্র কান-ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল।

ডেভিলও যেন তাতে আরও ক্ষিপ্র হয়ে তার হাত দিয়ে চেপে ধরল রবার্টের গলা। আর ঠিক তখনই ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। রবার্টের গলার ক্রসটা একটা নীলাভ সাদা আলোয় জ্বলে উঠেছে। সেই নীলাভ সাদা আলোর তীব্রতা ক্রমে বাড়তে বাড়তে সারা ঘর ভরিয়ে দিল। শয়তানের লাল আভাকে যেন ঢেকে ফেলেছে সেই পবিত্র আলো। এই এত পবিত্রতা স্যাটান কি সহ্য করতে পারে? পারে না।

মুখ দিয়ে একটা বিকট আওয়াজ করে উঠল সে। আর ঠিক তখনই ফাদার জুডি, যিনি আজ রাতের প্রেয়ারে উপস্থিত না থেকে এতক্ষণ সূর্যানিদের সঙ্গে ডি কোস্টা হাউসের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ডেভিলের শরীরে মন্ত্রপূত হোলি ওয়াটার ছড়িয়ে দিলেন, সঙ্গে উচ্চারণ করতে থাকলেন প্রভু যিশুর নাম। ঈশ্বরের নাম।

তীব্র আর্তনাদ করতে করতে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। ধীরে ধীরে তার রক্তবর্ণের শরীরটা বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকল। এবং অবশেষে হয়ে পড়ে রইল একটি মানুষের শরীর। ধীরে ধীরে ঘর ভরতি সেই নীলাভ আলোটাও বিলীন হয়ে গেল এই জগৎসংসারে।

"রিচার্ড!" বলে চেঁচিয়ে ওঠেন ফাদার জুডি।

খুব ছোটোবেলার স্মৃতিও মনে আছে রবার্টের। গ্র্যান্ডমা লিলি ওর গলায় ক্রসটা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "জেসাস উইল প্রোটেক্ট ইউ ফ্রম স্যাটান।" রবার্টের নিজের বলতে কেউ নেই, পরিবার কী জিনিস তা-ই জানে না সে। গ্র্যান্ডমায়ের আশীর্বাদ হিসেবে এই ক্রসটা ছিল ওর খুব প্রিয়। তাই এই এত বছরে পরেও এই পবিত্র ক্রসটাকে ও কাছছাড়া করেনি। আর সেই ক্রসই আজ ওর সঙ্গে ওর সমস্ত সঙ্গীকে প্রাণে বাঁচাল।

দৃশ্য ২০

জোসেফের মৃতদেহের পাশে পড়ে আছে একটা শক্ত বাঁধাইয়ের পশুর চামড়ায় মোড়া বেশ বড়ো সাইজের একটা বই। ফাদার জুডি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে বইটা তুলে নিলেন। বইটা উলটে-পালটে দেখলেন তিনি। এবং বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "এই বইটা হল বিখ্যাত কোডেক্স গিগাস বা ডেভিল'স বাইবেলের হারিয়ে যাওয়া অংশ। ডেভিল'স বাইবেল নামটা শুনে তোমাদের অদ্ভুত মনে হলেও কথিত আছে, স্বয়ং স্যাটান এই বই এক রাতের মধ্যে লিখেছিলেন। এই বইটিতেই সর্বপ্রথম একটা গোটা পাতা জুড়ে শয়তানের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই এই বাইবেলের নাম ডেভিল'স বাইবেল। বইটি বর্তমানে সুইডেনের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আছে। আরও একটি কারণে এই বইয়ের নাম ডেভিল'স বাইবেল রাখা হয়েছিল, কারণ এই বইয়ে বর্ণিত ছিল স্যাটানকে আহ্বান করার গুপ্ত পদ্ধতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই পৃষ্ঠাগুলি হারিয়ে যায়। সেটা যে কীভাবে বই আকারে রিচার্ডের হাতে এসে পড়ল, সেটাই এক রহস্য।"

রবার্ট বলল, "সেটার উত্তর সম্ভবত এই কালো ডায়েরিতে আছে।" এই বলে রিচার্ডের স্টাডি টেবিলে খুলে-রাখা একটা কালো ডায়েরি তুলে ধরল রবার্ট।

"ছোটোবেলায় যখন রিচার্ডের সঙ্গে এই বাড়িতে আসতাম, তখন গ্র্যান্ডমা লিলির হাতে এই ডায়েরি দেখেছি বহুবার। জিজ্ঞেস করতাম রিচার্ডকে, এত মন দিয়ে লেখেন কী গ্র্যান্ডমা লিলি? ও বলত, সেটা নাকি ওরাও কেউ জানে না। ওই ডায়েরি গ্র্যান্ডমা কাউকে ছুঁতে দিতেন না। উনি ধর্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন। ভগবানের ওপর অগাধ আস্থা ছিল ওঁর। তাই হয়তো সেই সম্পর্কিতই কিছু লেখেন। কিন্তু ফাদার দেখুন, এর কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু ডেভিলকে আঁকা। এই ডায়েরিটা না পড়লে অনেক কিছুই অজানা থেকে যাবে, এই ডায়েরিটা আমি নিয়ে যাব সঙ্গে।"

সূর্যানি ফাদার জুডির দিকে ফিরে বলল, "ফাদার, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, রিচার্ড এইরকম ডেভিলের মতো হয়ে গিয়েছিল কেন? আর এইসব কিছুর আড়ালে ফাদার জোসেফ ছিলেন? কিন্তু তিনি যখন রিচার্ডের সঙ্গী ছিলেন তাহলে সে এইভাবে ফাদার জোসেফকে হত্যা করল কেন?"

ফাদার জুডি বললেন, "ডেভিল হল এক ভয়ংকর শক্তি। তাকে আহ্বান করলে সে যাওয়ার আগে একটা প্রাণ নিয়ে তবেই যাবে। আজকে ওরা ডেভিলকে আহ্বান করেছিল কারও প্রাণ ভোগ হিসেবে দেবে বলে। কিন্তু রবার্ট আর তুমি এখানে এসে পড়ায় সেই কার্যসিদ্ধি হয়নি। তাই তাকে মারতে না পেরে ডেভিল চলে যাওয়ার আগে তার প্রাপ্য হিসাবে ফাদার জোসেফেরই প্রাণ নেয়। আর ডেভিলকে আহ্বান করলে তাকে একটা ভেসেল বা আধার দিতে হবে, যাকে পোজেস করে ডেভিল থাকতে পারবে। এই ক্ষেত্রে রিচার্ড সেই ভেসেল বা আধার হয়েছিল। ওর শরীরের মধ্যেই ডেভিলকে আহ্বান করা হয়েছিল।" একটু থামলেন ফাদার জুডি।

তারপর আবার বললেন, "আমি যখন বছরখানেক আগে আসি এই চার্চে, তখনই প্রথম দেখা হয় ফাদার জোসেফের সঙ্গে। তখনও সবকিছু খুব সাধারণ ছিল। রিচার্ডের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় প্রায় মাসখানেক আগে। সেটাও ফাদার জোসেফের রুমেই। তখনও বুঝিনি, এইরকম কিছু ঘৃণ্য কাজে ফাদার জড়িয়ে পড়েছেন।"

এরা যখন কথা বলছিল, তখন রবার্ট একমনে রিচার্ডের স্টাডি টেবিলটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, সেখান থেকেই সে কতকগুলো ডায়েরি, স্টিকি নোটস কালেক্ট করে সূর্যানির দিকে ফিরে বলল, "কালকেই কেসগুলোর যবনিকাপতন হবে। তার আগে আমাদের কয়েকটা ফোন করতে হবে সকালে, আর পালকার হাউসের সামনে পুলিশ পাহারা বসাতে হবে। আজ আপাতত এদের ব্যবস্থা করা হোক।"

পুলিশবাহিনী সূর্যানির নির্দেশে ফাদার জোসেফের বডি ও অজ্ঞান হয়ে-যাওয়া রিচার্ডকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সূর্যানি ও রবার্ট ফাদার জুডিকে চার্চে পৌঁছে দিল।

দৃশ্য ২১

(২৫ ডিসেম্বর, আজ ক্রিসমাস)

গাড়িতে যেতে যেতে রবার্ট ও সূর্যানি পরের দিনের ছক কষে ফেলল। সেই হিসেবে পালকার হাউসে বেশ কয়েকজনকে আসতে বলেছে তারা।

রবার্ট, সূর্যানি ও পুলিশের একটা বেশ বড়ো টিম যখন পালকার হাউসে পৌঁছোয়, তখন সেখানে উপস্থিত পুরো পালকার পরিবার। শেখর, আকাশ ও সুমনার পরিবার।

কোনোরকম ভণিতা না করেই সূর্যানি বলা শুরু করল, "আমাদের কাছে প্রথম যে কেসটা এসেছিল, সেটা ছিল সুমনার মৃত্যু। যেহেতু শেখর সুমনাকে ভালোবাসত, এবং সুমনা আকাশকে, তাই সবার প্রথমেই কেসটা শেখরের দিকে আঙুল তোলে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সুমনাকে মেরে ফেলে শেখর নিজের রাগ মিটিয়েছে।

"কিন্তু এখানে আমার খটকা লাগে। ধরে নিই, শেখর যদি সুমনাকে খুন করেও থাকে, সেই খুনের পদ্ধতি কিন্তু অন্য হত। এইরকম নৃশংসভাবে খুন করা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

"মনে খটকা থাকলেও, আসল ব্যাপারটা আমরা পরে জানতে পারি। এটা একটা কনট্র্যাক্ট কিলারের কাজ, যার নাম রিচার্ড। সে কীভাবে মানুষ খুন করত, সেটা এই মুহূর্তে আলোচনার দরকার নেই। তবে সেই রিচার্ডের বাড়ি থেকে আমরা উদ্ধার করেছি, কে বা কারা, কাকে কাকে মারার জন্য তাকে কনট্র্যাক্ট দিয়েছিল। বর্তমানে রিচার্ড পুলিশি হেপাজতে, এবং পুলিশের জেরায় সে সব নাম বলে দিয়েছে, ও দোষ স্বীকার করেছে।

"যদিও এই ভার্ডিক্ট কোর্ট দেবে তা-ও বলে রাখি, আমি আমাদের তদন্তের ফলে যে রেজাল্ট পেয়েছি, তাতে সুমনা

মার্ডার কেসে শেখর নির্দোষ। কারণ সেদিন তার বাড়িতে সুমনা আসবে, সেটা সে নিজেও জানত না।

"সেদিন তার বাড়িতে ডেভিল গিয়েছিল সুমনাকে নয়, বরং আকাশের কনট্রাক্ট দেওয়াতে শেখরকে হত্যা করতে। শেখর সুমনাকে পছন্দ করেছে, সম্ভবত সেই রাগেই আকাশ শেখরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। বা হয়তো ইনসিকিউরিটিতে, যে যদি কোনোভাবে শেখর সুমনাকে কেড়ে নেয় তার থেকে। তো যা-ই হোক, সেই সময় শেখর সেই ঘরে উপস্থিত ছিল না। বাথরুমে ছিল, আর সুমনা সেই ঘরে প্রবেশ করে এবং ডেভিলের শিকার হয়ে যায়। বাথরুমের জানালা দিয়ে একটা মস্ত কিছু বেরিয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি বাইরে আসে শেখর। এবং ঘরের মেঝেতে মৃত সুমনাকে দেখতে পায়। হঠাৎ করে পাওয়া এই শকে সাময়িকভাবে সে নিজের বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফ্যালে।

"হসপিটালের দেওয়ালে আঁকা বা পরবর্তী সময়ে সাদা পাতায় আঁকা শেখরের ছবিগুলো এই কেসে একটা বিরাট মোড় নেয়। আমরা রিচার্ডের বাড়ি থেকে ক্লায়েন্ট হিসেবে আকাশের নাম ফোন নাম্বার পাই। এবং রিচার্ডের প্রাইভেট নাম্বারে করা আকাশের ফোন কলগুলোও আমাদের কাছে আছে। সর্বোপরি রিচার্ডও আকাশকে শনাক্ত করেছে।"

আকাশ মাথা নিচু করে বসে ছিল। শেখর কাঁদতে কাঁদতে মাটিতেই বসে পড়ে। নিজের মুক্তির আনন্দও সে যেন উপভোগ করতে পারছে না কিছুতেই। 'সুমনা' তাকে সারাজীবনের মতো একা করে দিয়ে চলে গেছে—এই কথাটা সে এখনও মেনে নিতে পারেনি।

সূর্যানি আবার শুরু করল, "এবার আসি এই বাড়ির কথায়। মিস্টার হেমেন্দ্র পালকারের এই বিপুল সম্পত্তির সিংহভাগ তিনি একজন কাউকে দিয়ে দেবেন—এটাই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু কাকে সে কথা তিনি কাউকে বলেননি। তাঁর নিজের দুই সন্তান ধর্মেন্দ্র ও জিতেন্দ্র সত্যি বলতে খুব একটা যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন না। বাকি থাকলেন বিজয়, যিনি নিজের সন্তান না হলেও মিস্টার পালকার তাঁকেই তাঁর ব্যাবসার যোগ্য উত্তরসূরি ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই কথা বাড়ির উকিল মিস্টার বোস জানলেও মিস্টার বিজয় পালকার তা জানতেন না। তাঁর মনে হয়েছিল, যেহেতু তিনি নিজের সন্তান নন, তাই তাঁকে যৎসামান্য কিছু সম্পত্তি দিয়ে বাকি দুই ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেবেন বলেই মিস্টার বোসকে বাড়িতে ডেকেছেন হেমেন্দ্রজি। তাই নিজে আগে থাকতেই নিজের নামে সমস্ত সম্পত্তির একটা নকল উইল বানিয়ে সেখানে মিস্টার পালকারের সই নকল করিয়ে রেখে হেমেন্দ্র পালকারের মৃত্যুর কনট্র্যাক্ট তুলে দেন রিচার্ডের হাতে। সেই খুন হতে দেখে ফ্যালে ছোট্ট খুশি। যে দৃশ্য শেখরের মতো একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মনে এতটা আতঙ্কের ছাপ ফেলেছে, সেই দৃশ্য খুশির মতো একটি বাচ্চার মনে কী পরিমাণ ভীতির সঞ্চার করবে, তা আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই।

"কিন্তু রবার্ট যখন ডেভিলের ছবি দেখাতে খুশি কেঁদে ফ্যালে, ভয় পেয়ে যায়, তখন বিজয় বুঝতে পারে যে খুশি অনেক কিছু জানে। পাছে সে কিছু বলে দেয় তাই এক পাপ ঢাকতে তিনি আরও দুটো কনট্র্যাক্ট দিলেন—একটা খুশির, আরেকটা ড্রাইভার হরির। খুশি হয়তো ডেভিলের ব্যাপারে বলে ফেলবে—এই ভয়ে তাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেন। আর হরি তো দেখেই ফেলেছিল ডেভিলকে। বিজয় পালকার কোনোভাবেই চাননি ডেভিলের ছবি আমাদের হাতে আসুক। তাই আমাদের প্রফেশনাল আর্টিস্টকেও অ্যাক্সিডেন্ট করে মেরে ফেলার পেছনে এই একই ব্যক্তি।"

জিতেন্দ্র পালকার আর থাকতে না পেরে হাতের সামনের পিতলের ফুলদানিটা তুলে ছুটে যান বিজয়ের দিকে। কয়েকজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে জিতেন্দ্রকে ধরে ফেললে বিজয় সেই যাত্রা রক্ষা পায়। দাঁতে দাঁত চেপে বিজয় বলেন, "এসবের কোনো প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে, অফিসার? নাকি গালগল্প ফেঁদে আজকাল মানুষকে হেনস্থা করছেন।"

"আপনার বিরুদ্ধে কী কী প্রমাণ আছে তা থানায় গেলেই বুঝতে পারবেন। রামবিলাস, অ্যারেস্ট হিম।" খুব কড়া গলায় কথাগুলো বললেন সূর্যানি।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। এমন সময় রবার্ট বলল, "কী ম্যাডাম, অবশেষে কেসের যবনিকাপতন হল তাহলে?"

একটু হেসে সূর্যানি বলল, "সত্যি রবার্ট, তুমি না থাকলে এই কেস আমি সামলাতে পারতাম না। শুধুমাত্র এইজন্যই আমি তোমাকে চেয়েছিলাম এই কেসে। আচ্ছা, ওই যে ডায়েরিটা নিয়ে গেলে, ওটাতে কী লেখা আছে?"

রবার্ট হাসল, বলল, "ওটা গ্র্যান্ডমা লিলির। ওখানে গ্র্যান্ডমা লিলি তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। সম্ভবত গ্র্যান্ডমা লিলি যখন চার-পাঁচ বছরের, তখন একদিন রাতের বেলায় ওঁর গ্র্যান্ডমা স্যান্ডি ডি কোস্টার রুমে উনি এই ডেভিলকে দেখেন। স্যান্ডি ডি কোস্টা কীভাবে না জানি ডেভিল'স বাইবেলের অংশগুলো পান। এবং সাধনা করে ডেভিলকে আহ্বান করেছিলেন নিজের শরীরে। কিন্তু উনি

জানতেন না যে ডেভিল এই পৃথিবীতে এলে একটা প্রাণ না নিয়ে ফেরে না। আর যদি কোনো প্রাণ না পায় তাহলে সে তার ভেসেল অর্থাৎ আধারকেই শেষ করে দিয়ে, তার প্রাণ নিয়ে চলে যাবে। আর তাই স্যান্ডি ডি কোস্টা নিজে মারা যান। সেই ছোটোবেলায় দেখা ডেভিলের অবয়ব তাই তিনি তাঁর ডায়েরিতে আঁকতেন। কীভাবে ডেভিলের হাত থেকে বাঁচা যায়, তার জন্য তিনি সাধনা করে এই মন্ত্রপূত ক্রস বানিয়েছিলেন, যা তিনি বাড়ির সবাইকে পরতে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকেও নিজের নাতির মতোই স্নেহ করতেন, তাই আমাকেও দিয়েছিলেন এই পবিত্র ক্রস। রিচার্ড ক্রসটা খুলে ফেলেছিল। তাই হয়তো তার শরীরে ডেভিল আশ্রয় নিতে পেরেছিল, কারণ এটা পরে থাকলে ডেভিল ছুঁতেও পারে না, তার প্রমাণ তো আমরা দেখেইছি। এই ডায়েরিতেই উনি লিখেছেন যে গ্র্যান্ডমা স্যান্ডি ডি কোস্টার কবরের মধ্যে ওই বই আছে, যা পড়ে ডেভিলকে ডাকা যায়, আর সেটা পড়েই রিচার্ড স্যান্ডি ডি কোস্টার গ্রেভটা ভাঙে।"

"ডেভিল'স বাইবেলের ওই অংশটার এবার কী হবে?"

"ফাদার জুডি ওটা প্রাগের আসল বইটি যেখানে আছে, সেখানে পাঠানোর জন্য কথা বলবেন বলে জানালেন। এটা সাধারণ মানুষের হাতে না-পড়াই ভালো।"

"আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না। এত পুরোনো একটা বই এতদিন মাটির নীচে থেকে নষ্ট হয়ে গেল না?"

রবার্ট হাসল, "এটা ভেলাম দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি একটা বইয়ের অংশ, যা ডেভিল নিজের হাতে লিখেছে। এত সহজে তা নষ্ট হবে?"

"আচ্ছা। যা-ই হোক, তুমি রেখেছ তো কোডেক্সটা ঠিকঠাক?"

"হ্যাঁ, আপাতত আমার কাছেই আছে।"

"আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি, এই কেসটা যেভাবে তুমি সল্‌ভ করলে, তাতে স্যার ভীষণ খুশি। তুমি সসম্মানে নিজের ডিউটি জয়েন করতে পারো। এবার আসি! মেরি ক্রিসমাস, রবার্ট।"

"থ্যাংক ইউ সূর্যানি, মেরি ক্রিসমাস টু ইউ টু।"

গাড়িতে ফেরার পথে রবার্ট ভাবছিল। আজ আবার বৃষ্টি পড়ছে সেই দিনের মতো। চোখ বন্ধ করে গাড়িতে বসে ব্যাগ থেকে বের করল কোডেক্সটা। গাড়ির কাচটা নামিয়ে দিল, মুখটা ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির জলে। চোখ বন্ধ করে ফিরে গেল অতীতে।

দৃশ্য ২২

(সেন্ট মেরিস অরফ্যানেজ, পার্ক স্ট্রিট ১১ জুলাই ১৯৯০)

যখনই আকাশ ঘিরে কালো মেঘ জমে, চারপাশটা একটা সবজে অন্ধকারে ঢেকে যায়, তখনই মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা হয় বছর ছয়েকের রবার্টের। সেন্ট মেরিস অরফ্যানেজের লম্বা করিডোরটা প্রায় একছুটে পেরিয়ে এসে সে ঢুকে যায় তার ঘরের মধ্যে। জানলা খুলে একমনে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। বৃষ্টির জল ধুয়ে নিয়ে যায় বল খেলার মাঠ, গোলপোস্ট আর তার সঙ্গে তার শৈশব।

এই অনাথ আশ্রমে সে জন্ম থেকে ছিল না। জন্ম থেকে অবশ্য খুব ভালো পরিবেশে যে বড়ো হয়েছে সে তা নয়। ঠাকুমার মৃত্যুর পরে বাবা ঠিক কী কাজ করতেন, তা সে জানে না। তবে বাবা সবসময় একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকতেন। আর মা যেন সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। মায়ের চোখের নীচে কালি পড়ে থাকত, মাথার চুল না আঁচড়ে জটা হয়ে থাকত। মাঝে মাঝেই বাবার ঘর থেকে কত কিছু আওয়াজ আসত, ওরা বাইরে থেকে বুঝতে পারত, কোনো কিছু নিয়ে বাবা খুব রেগে যেতেন। মা দরজায় কান লাগিয়ে শুনতেন, বাবা রেগে গেলে মা আরও ভয় পেয়ে যেত। বাবা কতবার রাগের ঝোঁকে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইত বাবার ঘরে, মা কোনোরকমে টেনে ওকে বাঁচাত। বাবার ঘরটা সে কয়েকবার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল। ওই ঘরে কারও ঢোকার অনুমতি ছিল না। এমনকি মায়েরও না। তা-ও মা ঢুকত। যখন বাবা মায়ের চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেত ঘরের মধ্যে। বেশ অনেকক্ষণ থাকার পরে যখন মা বেরিয়ে আসত, তখন মায়ের সারা গায়ে কালশিটে পড়ে যেত। মাথার চুলগুলো উশকোখুশকো হয়ে থাকত। জামাকাপড়ও ছিঁড়ে যেত। মা ওই ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে বেসিনের কলটা থেকে হাতে জল নিয়ে মুখে একটা ঝাপটা দিত। যেমন এখন বৃষ্টির ঝাপটাটা তার মুখে লাগছে। মনে হত, মা যেন কত আরাম পেলেন। যেমন এই গরমে বৃষ্টির ঝাপটাতে ও আরাম পাচ্ছে। বাবার ঘরে যখন ও কয়েকবার লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকেছিল, তখন একটা বেশ বড়ো সাইজের চামড়ার বাঁধাইয়ের বই দেখেছে। বইটা এমন অদ্ভুত দেখতে যে হাজারটা বই থাকলেও তার দিকে নজর যাবেই। তাই সে দেখেছে। কিন্তু হাত দেওয়ার আগেই মা কীভাবে

জানতে পেরে তাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসত ওই ঘর থেকে। তাই বইটা হাতে নিয়ে দেখা হয়নি কখনও। আজও ওর মনে আছে, এরকমই একটা বৃষ্টির দিনে, চারিদিক যখন সবুজ অন্ধকারে ঢেকে ছিল, সে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখেছিল, বাবার ঘরের সামনে দালানে মা শুয়ে আছেন, মায়ের মুণ্ডুটা ছেঁড়া। বলের মতো মায়ের ছেঁড়া মাথাটা হাতে তুলে নিয়ে ও দেখেছিল, চোখগুলো পুড়ে গেছে, মুখটা হাঁ হয়ে আছে। ভয় পেয়ে বাবার ঘরের দরজায় টোকা দিতে গিয়ে দেখেছিল বাবার ঘরও খোলা, আর তার মধ্যে বাবার ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ। টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে মাংস। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘরের মেঝেটা। সেদিনও অনেকক্ষণ বাড়ির দালানে বসে বৃষ্টিতে সব ধুয়ে যেতে দেখেছিল। মায়ের কষ্ট, মায়ের কান্না, মায়ের রক্ত।

তারপরে তার গন্তব্য হল সেন্ট মেরিসের অরফ্যানেজ। এখানে কেউ ওকে খেলতে নিত না। সবার বন্ধু আছে। ও তো নতুন এসেছে। ওর বন্ধু শুধু রিচার্ড বলে একটি মানসিকভাবে অসুস্থ ছেলে। ও যেদিন প্রথম এসেছিল এখানে, ফাদার জোসেফ ওকে ডেকে বলেছিলেন, রিচার্ড ও রবার্ট এক ঘরেই থাকবে। অনাথ আশ্রমে ওর নিজের বলতে একটা আলমারি ছিল। তার মধ্যে একটা টিনের স্যুটকেসের মধ্যে ও রেখেছিল সেই বইটা, আর বাবার আর গ্র্যান্ডমা লিলি ডি মেলোর কালো ডায়েরি দুটো। আর ঠাকুমার দেওয়া একটা ক্রস সবসময় পরে থাকত নিজের গলায়। এগুলো সে কাউকে দেবে না। বইটা হাতে নেওয়ার শখ অনেক দিনের থেকেই ছিল। কিন্তু এখন হাতে পেয়েও খোলার সাহস পায় না। শুধু খুলতে গেলেই বাবার মুখটা চোখে ভাসে। বাবা যেন চোখটা লাল করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ও সঙ্গে সঙ্গে বইটা বাক্সে পুরে আলমারিতে ঢুকিয়ে দেয়।

"কেমন দেখছেন ডক্টর?" উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন ফাদার জোসেফ।

"খুব একটা ভালো এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। ওর বাবাকে চার্চের তহবিল তছরুপের জন্য চার্চ থেকে বহিষ্কৃত করার পর থেকেই বাড়িতে যে সে অত্যাচার করত—এটা তো মোটামুটি আমরা সবাই জানি। তাই বাড়ির পরিবেশ ভালো ছিল না, তাই এমনিতেই বেড়ে ওঠার মধ্যে একটা সমস্যা ছিলই, আর তার মধ্যে এত বড়ো একটা শোক। একসঙ্গে মা-বাবা দুজনকেই হারানো। এটা আরও বেশি ওর মস্তিষ্কে আঘাত করেছে। সেই কারণেই ও এইভাবে আচরণ করে মাঝে মাঝে। কখনও খুব হাসিখুশি, কখনও আবার একদম চুপচাপ। কখনও খেলছে, কখনও আবার রাগের বশে পাথর তুলে মারতে যাচ্ছে। যে-কোনো ইমোশনই ওর জন্য লাগামছাড়া। তবে লাগাম পরাতে হবে। ওর চিকিৎসা আমি করব। আশা করি, সুস্থ হয়ে যাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। তবে আপনি ওই ডায়েরিটা আর বইটা কোথাও সরিয়ে দিন। ওর বাবার কোনো স্মৃতি ওর সামনে রাখবেন না।"

"আমি সেই চেষ্টাই করব, তবে ওইগুলো ও নিজের কাছছাড়া করতে চায় না।"

"ওটা ওকে ভুলিয়েই হোক, আর যেভাবেই হোক, কাছ থেকে সরাতে হবেই, তবেই ও স্বাভাবিক হতে পারবে।"

"আচ্ছা বেশ, আমি সেই চেষ্টা করব। অনেক ধন্যবাদ, আপনি ওর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন, আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।"

সেদিন মনোবিদের কাছ থেকে ফিরে ফাদার জোসেফ সোজা গেলেন ওর ঘরে। ও বাইরে বসে ছিল রিচার্ডের সঙ্গে। ফাদার কিচ্ছু না বলে, চুপচাপ টিনের স্যুটকেসটা নিয়ে এসেছিলেন। ফাদার জানতেন, ওর ভেতরে কী আছে। কিন্তু কোনোদিনও সেটা খুলে ব্যবহার করার চেষ্টা করেননি।

তারপরে এই তো সেদিনের কথা। একদিন ফাদার জোসেফ ওকে ডেকে ওর সেই সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন। সঙ্গে বললেন এই জিনিসটা সম্পর্কে। শয়তানকে আহ্বান করার গুপ্ত পদ্ধতি, যা রবার্টের বাবা পার্সিস ডি মেলো ওর ঠাকুমা লিলি ডি মেলোকে খুন করে হাতিয়েছিল ওদের পারিবারিক গ্রেভ থেকে। তারপর নিজে চেষ্টা করেছিল সেই সাধনপদ্ধতি। কিন্তু তাতে সফলতা পায়নি। কিছু ভুল থেকেই যেত। শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরে শয়তানকে আহ্বান করতে সক্ষম হয়েছিল, আর সেই শয়তানরূপে খুন করেছিল নিজের স্ত্রী-কে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি, কিছু ত্রুটি থাকায় তার ভেসেলের শরীর ফাটিয়ে শয়তান চলে যায়। এইসব অনেক কিছুই লেখা ছিল ওর বাবার কালো ডায়েরিতে। কিন্তু ফাদার জোসেফ ডায়েরি ও কোডেক্স পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন, কোথায় ভুল ছিল পার্সিসের সাধনায়। সেটা রবার্টকে জানাতে, সে নিজের সাধনায় কোনো ভুল করেনি। সে তার সাধনা দিয়ে রিচার্ডের শরীরে একাধিকবার শয়তানকে আহ্বান করেছে। রিচার্ডই ছিল তার যোগ্য সহচর। সবাই যারা কনট্রাক্ট দিত, তারা জানত, রিচার্ডকে দিচ্ছে, কিন্তু এইসব কিছুর পেছনে যে রবার্ট আছে, সেটা কেউ জানত না। কোডেক্সটা হয়তো দিয়ে দিতে হবে তাকে। কিন্তু সে-ই বর্তমানে একমাত্র যে জানে এই কোডেক্সকে ব্যবহার করার

সঠিক পদ্ধতি। এটা ভেবেই একটা শয়তানি ফুটে উঠল তার মুখে। তবে রিচার্ডের জন্য মায়া হয়। তার হাবাগোবা বন্ধুটা বড্ড ভালো। রবার্ট প্ল্যানটা করেই ফেলেছিল, ফাদার জোসেফকে ওইজন্যই ধরে আনা। শয়তানকে আহ্বান করলে কারও প্রাণ তো উৎসর্গ করতে হবেই। ওর বাবা যেটা পারেনি, ও করে দেখিয়েছে। এটা ভেবেই একটা পাশবিক আনন্দ হল ওর মনে। কিন্তু মনে একটা খটকা থাকলই। রিচার্ডকে ওখান থেকে সরাতে হবে। ওর একমাত্র বন্ধু। আর তাই সেই রাতেই ও পুলিশ স্টেশনে গেল। জিজ্ঞাসাবাদ করার নাম করে চাইল রিচার্ডকে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার। সেই হিসেবেই সব কাজ এগোচ্ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হল সূর্যানি। কিন্তু রাতে তো কারও থাকার কথা ছিল না স্টেশনে। মনে মনে ভাবল রবার্ট।

সূর্যানি বলল, "আমাকে এখানে দেখে অবাক হলে রবার্ট? কিন্তু তোমাকে এখানে দেখে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হইনি। আমি জানতাম, তুমি এখানে আসতেই। গোটা প্ল্যানটা ভালো সাজিয়েছিলে। শুধু দুটো ভুল। এক নম্বর, তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে তোমার মতো গোয়েন্দা আমিও। তাই প্রথমে সন্দেহ না হলেও পরে ঘটনাগুলো পরপর সাজাতে যাওয়ার সময় মাথায় খটকাটা আসে। যদি ফাদার জোসেফ ডি কোস্টা হাউসেই ডেভিলকে আহবান করে থাকেন, তাহলে সে বাইরে থেকে এল কীভাবে? বাইরে থেকে ঘূর্ণিঝড়ের মতো ডেভিলের প্রবেশ প্রমাণ করে, তাকে অন্যত্র আহ্বান করা হয়েছে। আর তা-ই যদি হবে তাহলে সেটা কোথায়? আর কে করল? আর এই প্রশ্নের উত্তর পেলাম তোমার পৈতৃক বাড়ি থেকে, যা তোমার দ্বিতীয় ভুল। দেওয়ালে টাঙানো তোমার মা ও তোমার ছবিটা সরাতে ভুলে যাওয়া।

"সেদিন যখন আমরা ডি কোস্টা হাউসে যাই, যেমন স্টাডি টেবিলে তুমি সব প্রমাণ সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলে, সেগুলো দেখি, তখনই আমার চোখ চলে যায় দেওয়ালে টাঙানো তোমার আর তোমার মায়ের ছবির দিকে। এই ছবিটা তখনই আমার খুব চেনা-চেনা লেগেছিল। কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না। কিন্তু পালকার হাউস থেকে বেরিয়ে তুমি তোমার মানি ব্যাগটা যখন খুললে, তখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

"আমি এই ছবি এর আগে বহুবার দেখেছি তোমার মানি ব্যাগে। তোমাকে একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম, তুমি বলেছিলে এটা তোমার মায়ের ছবি। এবং তোমার ব্যাপারে আজ সারাদিন খোঁজ নিয়ে জানতে পারি তুমি কে, এবং কোন বাড়ির ছেলে, তোমার অনাথ আশ্রমে বড়ো হওয়ার কথা, তোমার ও রিচার্ডের বন্ধুত্ব, ফাদার জোসেফের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। তোমার মনোবিদের সঙ্গে কথা বলি। রিচার্ডকে জেরা করার সময়তেই বুঝেছিলাম, এত বুদ্ধি রাখার মতো ছেলে রিচার্ড না, সে নিতান্তই অপরিণত মস্তিষ্কের একজন। কিন্তু তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসে, তাই মরে গেলেও তোমার নাম ও নিত না, ইমোশনাল করে ওর পেট থেকে বের করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমাদের। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট, মিস্টার রবার্ট ডি মেলো।"

রিচার্ড ও রবার্টকে ধরে লকআপে পুরে হাতে কোডেক্সটা ও লিলি ডি মেলোর ডায়েরিটা নিল সূর্যানি। সেখানে প্রথম পাতায় লেখা—"মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর ও শয়তানের বাস, আমরা আমাদের কর্মের মধ্যে দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাই। শয়তান আমাদের প্রতিমুহূর্তে লোভ দেখাবে তার পথে হাঁটার জন্য, আর যদি সেই ভুল করে ফেলি, তাহলে সেই শয়তানই আমাদের গ্রাস করবে।"





রুদ্র চ্যাটার্জী

কাগজওয়ালি



ওই তো ওখানে পড়ে আছে। পাঁচিলের ওপর থেকে দূরে পড়ে-থাকা জিনিসটা দেখতে পেয়ে যেন একটু স্বস্তি হয়েছিল। কিন্তু এ কী...

খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস মনিরুলের। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় হতে দেখেনি এমন একটাও দিন নেই ওর জীবনে। নতুন জায়গায় এসে প্রথম দুটো দিন একটু অনিয়ম হয়েছে ঠিকই; কিন্তু ও ঠিক করে নিয়েছে, এরপর থেকে ও আবার নিজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে।

মনিরুলের এই ভাড়াবাড়িটা ছোটো হলেও বেশ সাজানো। একতলা বাড়ির সামনের দিকে একটা বেশ বড়ো উঠোন। উঠোনে সুন্দর করে সাজানো একটা ছোট্ট ফুলের বাগান বানিয়েছেন বাড়ির মালিক। গাঁদা, টগর, জবা, নয়নতারার মতো এত সাধারণ ফুল দিয়েও যে এত সুন্দর একটা বাগান করা যায়, সেটা না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতেই চমকে গিয়েছিল মনিরুল। উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা ডায়েরি পড়ে

আছে। ডায়েরিটা দেখে ভারী অবাক হয়েছিল সে, এদিক-ওদিক দেখে বোঝার চেষ্টা করেছিল যে এই ডায়েরিটা এখানে এল কীভাবে? এবং তখনই সদর দরজার বাইরের দিকে 'ধপ' করে একটা শব্দ হয়েছিল। কেউ যেন পাঁচিল থেকে ঝাঁপ দিল বাইরের দিকে। মনে মনে হাসি পেয়েছিল মনিরুলের। বাংলার যেখানেই যাও-না কেন, ভোরবেলা ফুল চুরি হওয়ার হাত থেকে নিস্তার নেই।

একটু এগিয়ে গিয়ে উঠোনে পড়ে-থাকা ডায়েরিটা ভালো করে লক্ষ করল সে। খুব সুন্দর দেখতে ডায়েরিটা। পাতাবাহার পাতার মতো রঙিন ছোপ-দেওয়া কভারটার সঙ্গে একটি সুন্দর সোনালি রঙের সুতো আটকানো রয়েছে। ওই সুতো দিয়েই ডায়েরিটা বাঁধা হয়। কিছুটা ইতস্তত বোধ করে ডায়েরিটা হাতে তুলে নিল মনিরুল।

ডায়েরিটা উলটে-পালটে দেখল বেশ অনেকগুলো পাতা এখনও লিখতে বাকি। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ওর চোখ পড়ল ডায়েরির শেষ পাতার তারিখটায়, ৭ এপ্রিল। এ কী! এ তো আজকের তারিখ। ভাবনার একটা ভাঁজে মনিরুলের ভুরুজোড়া কুঁচকে নাকের ওপরে এসে মিলে গেল একটা অন্যটার সঙ্গে।

যার ডায়েরি, তার হাতের লেখা যে খুব সুন্দর তা মোটেই নয়। তবে ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে মানুষটার। বছরের প্রথম দিন থেকে একের পর এক পাতায় তারিখ দিয়ে দিনলিপি লিখেছেন তিনি।

আজ শনিবার। অফিস ছুটি। মনিরুল ভাবল, ব্রেকফাস্ট সেরে ডায়েরিটা নিয়ে বসবে। অন্যের ডায়েরি পড়ার মধ্যে একটা অনৈতিক উল্লাস আছে বই-কি।

এই মফস্‌সলে ও একেবারেই নতুন। এখনও কাজের লোক, রান্নার লোক ঠিক করতে পারেনি। নিজের কাজ নিজেই করছে দু-দিন ধরে। এই পরিস্থিতিতে মায়ের অভাবটা বড্ড বেশি বোধ করে সন্তানরা। ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে মা-কে ফোন করল সে।

বাইরে কী যেন একটা ঝামেলা হচ্ছে। পাড়ার লোকজন সব হইহই করছে। মনে মনে মনিরুল ভাবল, 'সক্কাল সক্কাল ঝামেলা করতে পারেও বটে লোকজন।' ও ইচ্ছে করেই বাইরে বেরোয়নি। সবে একটা নতুন জায়গায় এসে ঝামেলায় জড়াতে চায়নি সে।

ব্রেকফাস্ট সেরে, দুপুরের রান্না চড়িয়ে যখন ডায়েরিটা হাতে নিয়ে বসল, তখন প্রায় বেলা এগারটা।

ডায়েরিটা কী করে তার বাড়ির উঠোনে এল, সেটা নিয়ে এখনও একটা চাপা উৎকণ্ঠা রয়েই গেছে মনের মধ্যে। প্রথম দুটো পাতা পড়েই মনিরুল বুঝতে পারল যে ডায়েরির লেখক একজন পুরুষমানুষ। প্রথমদিকের পাতাগুলিতে নিতান্তই মামুলি ঘটনা লেখা রয়েছে। যার ডায়েরি, সে কী খাচ্ছে, কী করছে, ফেসবুকে কার সঙ্গে কী কথা বলছে—এই সব। বিরক্ত হয়ে কয়েকটা পাতা একসঙ্গে উলটে একটু থমকে গিয়েছিল মনিরুল। আগের পাতাগুলিতে লেখক সেভাবে পাতা ভরতি করা লেখা লেখেননি। কিন্তু এই বিশেষ তারিখের লেখাটি বেশ বড়ো।

কৌতূহলী হয়ে পড়তে শুরু করল সে—

৪ এপ্রিল:

আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম। উপলব্ধিটা হল, দিনের বেলা কোনো ব্যাপারকে আমরা যতটা সহজ, যতটা বাস্তব বলে মনে করি, দিনের আলো ঢলে এলে কিন্তু আমাদের সেই বাস্তবিকতার ওপর বিশ্বাস কমতে শুরু করে। একটা মায়া, একটা অনুচ্চারিত ফিসফিসানি, একটা ভয় ধীরে ধীরে এই চরাচরকে গ্রাস করতে শুরু করে।

হয়তো বড়ো শহরে নিয়ন লাইটের আলোর নীচে বসে, জানালার শিকের ফাঁকে ভেসে-আসা বাস-ট্রামের ঘটাং ঘটাং শব্দের আলোড়নে এই সূক্ষ্ম অনুভূতি এই শান্ত ব্যাপারগুলোকে উপলব্ধি করতে পারবেন না।

তাই আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য একটা উদাহরণ দিই। একটা জীবন্ত, বাস্তব উদাহরণ।

আমাদের মফস্‌সলের শেষের দিকে একটা ফাঁকা রাস্তা আছে। যে রাস্তার দু-পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোনাঝুরির বন, এবং বনের অপর পারে দিগন্তবিস্তৃত ধানের খেত। আগে প্রতিদিন সকালে আমি সেই রাস্তায় জগিং করতে যেতাম। কিন্তু আজকাল আর ওর ভয়ে বেরোতে পারি না। আগে যখন যেতাম, তখন খুব ভালো লাগত। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ছুটতাম। মাথার ভেতরে প্রাণ ভরে অক্সিজেন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম।

কিন্তু আজ সন্ধ্যায় যখন বাড়িতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল, কেউ যেন আমার মুখে বালিশ চাপা দিয়ে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে, তখন একরকম ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম বাড়ি থেকে।

আমি জানতাম, ও আমাকে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। আচ্ছা, ও কি তখন সেই শান্ত হাসিটা হাসছিল? জানি না। ও আমাকে বারণ করেছিল

বাড়ির বাইরে বেরোতে; কিন্তু আমি শুনিনি। আমি জানতাম, আমি বাড়ি ফিরে এলে ও আবার ওইসব করবে, আমি ভয় পাব। তাই যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তখন ঠিক করেই নিয়েছিলাম, এই যে বেরোলাম, আর ফিরব না। কিছুতেই না। ওর হাত থেকে আমার মুক্তি।

রাস্তায় বেরিয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন নতুন মনে হচ্ছিল। আজ কতদিন পর বাইরে বেরোলাম, আমার নিজেরই মনে পড়ে না। বোকা মানুষের মতো 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে রাস্তার আলো দেখছি। দূরে কোথাও একটা বিয়েবাড়ি আছে মনে হচ্ছে। হাওয়ায় ভেসে-আসা সানাইয়ের উদাস-করা সুরটাও যেন আজ আমার ভালো লাগছে। তরুণকাকু সাইকেলে করে পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করে গেল, "ভাইপো, দাড়ি কাটোনি কেন?"

মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলছে! আমি বেঁচে আছি এখনও? আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।

না! ওই বাড়িতে আমি আর ফিরব না। কিন্তু তাহলে যাব কোথায়? খুব ইচ্ছে হল, আমার প্রিয় রাস্তাটা একবার দেখে আসি। রাস্তায় বেরিয়েই যেন নতুন জীবন পেয়েছি। খুব খিদে পেয়েছিল। যে দোকান থেকে মাঝেমধ্যে চপ কিনি, সেখানে গিয়ে পেট পুরে চপ, ঘুগনি খেলাম। কিন্তু টাকা দিতে গিয়ে দেখি পকেটে টাকা নেই। সমস্যার কথাটা দোকানদারকে বলতে তিনি বললেন, "আরে দাদা, পয়সা নিয়ে এত ভাবছ কেন? পরে যেদিন আসবে, দিয়ে দিয়ো।" পাশে নন্দনের দোকানে ধার করে সিগারেট কিনলাম। আহ্! মুক্তি! শান্তি! সিগারেটের প্রতিটা টান আমাকে জানান দিচ্ছে, আমি বেঁচে আছি।

ধীরে ধীরে যখন আমার প্রিয় রাস্তাটার সামনে এসে পৌঁছোলাম, হাতের সিগারেটটা তখন সবে শেষ হয়েছে। দিনের বেলা রাস্তাটা যতটা আলো ঝলমল করে, এখন ঠিক ততটাই উলটো। একটা নিবিড় অন্ধকার যেন চাদরের মতো মুড়ে দিয়েছে রাস্তাটাকে। একটা ঠান্ডা বাতাস খুব মন্থরগতিতে বয়ে চলেছে। পিচ-ঢালা রাস্তার ডান পাশে একটা মস্ত বড়ো পুকুর। আর পুকুরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরমা দিয়ে তৈরি একটা ছোট্ট অস্থায়ী ঘর। ছেলেছোকরাগুলো এখানে লুকিয়ে মদ খায়। আমার পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট বেড়াল পা টিপে টিপে চলে গেল ঘরটার দিকে। রাস্তার দু-পাশে একনাগাড়ে ঝিঁঝিপোকা ডেকেই চলেছে। প্রতিদিনের চেনা রাস্তাটাও এই অন্ধকারে কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। দূরে থেকে একটা সাইকেল এগিয়ে আসছে আমার দিকে, সাইকেলের বিরক্তিকর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা যেন এই অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে বারবার আঘাত করছে। ধীরে ধীরে সাইকেলটা আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি নিজের খেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে সবে আরও একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেছি, অমনি শুনতে পেলাম, "দাদাবাবু...।" সিগারেটটা ঠোঁটেই রয়ে গেল। আমার সমস্ত শরীর যেন জমে গেছে। এই বীভৎস গরমেও যেন একটা শীতলতা আমার শরীরটাকে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিল।

"খাবা না দাদাবাবু? খেয়ে নাও। তোমার তো ঠান্ডা খাবার ভালো লাগে না..."

আমি জানি না তারপর আমি কখন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আচ্ছা, আমি আদৌ বেরিয়েছিলাম তো বাড়ি থেকে?

আমার সামনে ও দাঁড়িয়ে ছিল। ওর হাতে খাবারের থালা। আজকাল ওর মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করে, খুব ভয় করে। না, ওকে কিন্তু মোটেও ভয়ানক দেখতে নয়, বরং ঠিক তার উলটো। একজন অসাধারণ শিল্পী যেন নিজের সমস্ত সত্তা উজাড় করে এঁকেছেন ওর কপাল, নাক, ঠোঁট, গাল। শুধু ভয় লাগে ওর চোখের দিকে তাকাতে। তাই আমি ওর বুকের দিকে তাকিয়ে থাকি। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওর বুকের ওঠা-নামা দেখি। গলা থেকে গড়িয়ে-আসা একবিন্দু ঘামকে ওর বিভাজিকার মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখি।

যেদিন ও আমার ওপর খুব রাগ করে, সেদিন ও আমাকে নিজে হাতে খাইয়ে দেয়। তারপর আমি লাইট অফ করে শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুমোই না। কারণ ও রেগে থাকলে আমার ঘুমোতে ভয় করে।

এই তো সেদিন রাত্রে যখন ওর কথা না শুনে ওর সঙ্গে শুলাম না, সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ও আমার ওপর রেগে গেল। কিন্তু আমি বিশেষ মন দিইনি। নিজের ঘরে এসে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়েছিলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে বারান্দার নীল আলোর একটা ছটা আমার ঘরের ভেতরে এসে পড়ে। সেই হালকা নীল আলো ঘরের মধ্যে একটা মায়ার পরিবেশ তৈরি করে। এই পরিবেশ না হলে আমার ঘুম হয় না। খুব গভীর ঘুমিয়েছিলাম, মাঝরাতে কী এক অস্বস্তিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভয়ে প্রায় চিৎকার করেই ফেলেছিলাম। দেখেছিলাম আমার মুখের সোজাসুজি হাত দুটিকে পেছনে করে, হাতের আঙুল আর পায়ের পাতা দিয়ে সিলিং-এর থেকে ও ঝুলে আছে আমার দিকে মুখ করে। ও নগ্ন। খুব ধীরে ধীরে বলেছিল, "আমার সঙ্গে শোবে না দাদাবাবু?"

আমি নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। ওর গলার এই মিহি স্বরটা আমি সহ্য করতে পারি না। মনে হয়, কেউ যেন কানের ভেতরে ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে, আর সেই ছুঁচ কানের পর্দা ভেদ করে ধীরে ধীরে মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়ে, মাথার শিরা-উপশিরাগুলোকে ছিঁড়ে দিচ্ছে। এই অসহ্য যন্ত্রণায় প্রচণ্ড রাগ হয়। কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে পারি না। তাই অসহায় বোধ হয়। লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে ফেলি মাঝে মাঝে। সেই মিহিস্বরেই আবার বলেছিল, "শোবে না?"

ওর দু-চোখের কোনাগুলো ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে আর এটাকেই আমি ভয় পাই। জীবনে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। ওর ওই মিহি গলা শুনে অস্বস্তি হয়, যন্ত্রণা হয়। কিন্তু এই চোখজোড়া যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু। ঘাড় নেড়ে জানালাম, "শোব।" তারপর সারারাত ধরে ও আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল।

তাই আমি ওর চোখের দিকে তাকাই না। আমি জানি, আজ রাতেও কিছু একটা হবে। আচ্ছা, আমি বেঁচে আছি তো? আমি কোনো ভয়ানক স্বপ্ন দেখছি না তো? হয়তো এক্ষুনি ঘুম ভাঙবে আর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডায়েরিটা বন্ধ করে 'হাঁ' হয়ে বসে ছিল মনিরুল। এটা কি সত্যি কথা লিখেছেন লেখক? নাকি কোনো অলৌকিক গল্পের প্লট লিখেছেন? এটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু যদি গল্পের প্লট হত তাহলে তো সেভাবেই লিখতেন লেখক। আর বেশি ভাবতে পারল না মনিরুল। ডায়েরিটা হাতে তুলে নিয়ে আবার একটা পাতা খুলে আবার পড়তে শুরু করল সে।

৩ মার্চ:

সকালে ফ্রেশ হয়ে, চা নিয়ে বারান্দায় এসে বসেছি। ও এসে খবরের কাগজটা দিয়ে গেল। খবরের কাজগটা হাতে নিয়ে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ করছিলাম। অবাক লাগছে খুব। কাল ওকে খুব কাছ থেকেই দেখেছিলাম। এত নিখুঁত শরীরের ভাঁজ আমি আজ পর্যন্ত কারও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। প্রতিটা পদক্ষেপ ও যেন একদম মেপে মেপে ফ্যালে।

ওকে যেদিন প্রথমবার দেখেছিলাম, তখনও এরকম একটা সকাল ছিল। হাতে একটা বিশাল বস্তা নিয়ে আমাদের পাড়ার রাস্তায় কাগজ, প্লাস্টিক সংগ্রহ করছিল। খুব অবাক হয়েছিলাম ওকে দেখে। এই সময়কালে এই কাজ আর কেউ করে?

আমাদের ছোটোবেলার সময়ে তা-ও অনেকে ছিলেন, যাঁরা এই কাজ করতেন। দুপুরে যখন না ঘুমিয়ে মা-কে জ্বালাতাম, মা বলত, "ওই দেখ, ওরা দুষ্টু বাচ্চাদের নিজের বস্তায় ভরে নিয়ে যায়।" মায়ের এই কথাটায় আমি যত-না ভয় পেতাম, তার চেয়ে ঢের বেশি কৌতূহল হত। খুব ইচ্ছে ছিল, একদিন সুযোগ হলে উঁকি মেরে ওদের বস্তার ভেতরটা দেখব।

কিন্তু সেসব অনেক আগেকার কথা। এখন আর মা-বাবাও নেই, আর সেই সময়ও নেই।

প্রায় প্রতিদিনই দেখতাম, ও আমাদের পাড়ায় কাগজ কুড়োতে আসত। গতকাল সকালে বাজার যাব বলে দরজায় বেরিয়েছি এমন সময় হঠাৎ ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়াতে একটু যেন অস্বস্তিই হয়েছিল আমার। দেখলাম, ও আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। এসে বলল, "দাদাবাবু, একটু জল দেবেন? খুব তেষ্টা পেয়েছে।" ওর কথা বলার ধরন দেখে চমকে গিয়েছিলাম। সাধারণত এই শ্রেণির মানুষের কাছে এতটা মার্জিত ব্যবহার আশা করা যায় না।

ওকে ঘরে নিয়ে এসে বসিয়েছিলাম। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও ও মেঝেতেই বসেছিল। ফ্রিজের থেকে মিষ্টি বের করে, মিষ্টি-জল খেতে দিয়েছিলাম। ও কিছু না বলে মিষ্টি খেল, জল খেল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আমি ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল ওর উঁচু বুকের দিকে। ওর চেহারা দেখে কিছুতেই যেন ওকে ওর কাজের সঙ্গে মেলাতে পারছিলাম না। খাওয়া হলে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমার নাম কী?"

উত্তরে একটু বাঁকা হেসে ও বলেছিল, "আমাদের আবার নাম হয় নাকি? আমরা কাগজওয়ালি।" একরাশ অভিমান জমে ছিল ওর বলার ধরনে।

আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

এর উত্তরে ও আমাকে ওর অতীত জীবনের সমস্ত গল্প বলেছিল। যেটা ছোটো করলে হয়, ওর বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি দুটোই বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলায়। তেহট্টের এক ছেলের সঙ্গে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, ছেলেটির সঙ্গে লুকিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে এই পারে চলে আসে। কিন্তু এখানে এসে সে বুঝতে পারে ছেলেটির মতিগতি ভালো না। ছেলেটি নিজে বাইরে থাকে, আর ঘরে অন্য লোক পাঠায়। নতুন স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কী করে যে 'কাগজওয়ালি' হয়ে গেল, আজ আর ওর নিজেরই মনে নেই। ওর মহাজন ওকে নিজের বাড়ির বারান্দায় থাকতে দিয়েছে। কিন্তু লোকটা ভালো না, রাতে মদ খাওয়ার পরে ওর সঙ্গে খারাপ কাজ করার চেষ্টা করে।

সত্যি বলতে এরকম ঘটনা এর আগে অজস্রবার শুনেছি, কিন্তু এই ঘটনার জেরে ভুক্তভোগী কাউকে কোনোদিন চোখের সামনে দেখিনি। খুব মায়া হয়েছিল ওকে দেখে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, "তুমি রান্না করতে পারো?"

ও যেন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিল, "বাঙাল মেয়েকে রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করছেন দাদাবাবু?"

তারপর কোনো কিছু না ভেবেই দুম করে বলেছিলাম, "তুমি থাকবে আমার বাড়িতে? রান্না করবে। আমার রান্নার লোকটা চলে গেছে, তার জায়গায় তুমি থেকে যাও আমার কাছে।"

একটু অবাক হয়ে ও তাকিয়েছিল আমার দিকে। যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছে; কিন্তু করতে পারছে না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে খুব নিচু গলায় বলেছিল, "আমার আর কী! আমার না আছে জাত-ধম্ম, না আছে ঘরবাড়ি। তবে, আপনাকে দেখে ভালো, ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। আমি থাকলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?"

আমি বলেছিলাম, "কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। আমি একা মানুষ। একটা ঘরে থাকি। তুমি অন্য যে-কোনো একটা ঘরে থেকে যেও। ঘরের তো অভাব নেই।"

ও কত মাইনে নেবে জানতে চাওয়ায় বলেছিল, "থাকতে দিচ্ছেন, খেতে দেবেন আর কোন লজ্জায় কী চাইব? তবে সম্ভব হলে পরার জন্য একটা শাড়ি কিনে দেবেন'খন। এই ময়লা শাড়ি পরে তো রান্নাঘরে ঢুকতে নেই।"

আনন্দে গদগদ হয়ে ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, দুপুরের মধ্যে মহাজনের বাড়ি থেকে ওর জিনিস নিয়ে ফিরে আসবে। ও চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়েছিল আমার দিকে। বলেছিল, "দাদাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

বলেছিলাম, "করো।"

নিজের পায়ের পাতার দিকে একবার তাকিয়ে আগের মতোই নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমাকে কোনোদিন দুঃখ দেবেন না তো দাদাবাবু?"

একটু হেসেই বলেছিলাম, "ও কী কথা! দুঃখ কেন দিতে যাব?"

ও হেসে বলেছিল, "তাহলেই হবে। আসলে কী জানেন দাদাবাবু, আমাকে যে দুঃখ দেয়, তার খারাপ হয়।"

চুপ করে শুনেছিলাম ওর কথাগুলো।

সেদিনও পেছন থেকে ওর চলে যাওয়াটা দেখছিলাম, ঠিক আজকের মতোই। কোমর বাঁকিয়ে, মাপা পদক্ষেপে চলে যাচ্ছিল ও। এত লাস্যময়ী কাউকে তো এর আগে কোনোদিন দেখিনি। কিন্তু পার্থক্য আছে। সেদিনের চলে যাওয়া আর আজকের চলে যাওয়াটার মধ্যে একটা বিস্তর পার্থক্য আছে।

না, মিলল না। আগের বার অন্য কোনো তারিখের লেখা পড়েছিল মনিরুল। পড়ার সময় তারিখটা খেয়াল করেনি। এবার একের পর এক পাতা উলটে মিলটা খুঁজে পেলে তার পরের এন্ট্রিটা পড়তে শুরু করল সে।

৭ এপ্রিল:

না! আমি আজকে কিছুতেই ঘুমোব না। দরকারে সারারাত ডায়েরি লিখব; কিন্তু ঘুমোব না। ওর রান্না-করা খাবার আগে আমার অমৃত বলে মনে হত। আজকাল মনে হয় যেন বিষ খাচ্ছি। সাধারণত আমি রাত্রে আটটার মধ্যে খাবার খেয়ে নিই। আমি টেবিলে খেতে বসেছি, ও খাবার বেড়ে দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। খাবারটা মুখে দিয়েই কেমন যেন তেতো-তেতো লাগছিল। আমি বলেছিলাম, "এসব কী রান্না করেছ? এই খাবার আমি খাব না।"

আমার কথা শুনে ও আমার কাছে একটু এগিয়ে এসেছিল। সেই মিহি গলায় বলেছিল, "খাবা না দাদাবাবু? আমার রান্না খাবা না? আমি খাইয়ে দেব? হাঁ করো..." ওর কথা শেষ না করতে দিয়েই আমি ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার কানের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। ঘরের ভেতর থেকেই খুব আস্তে ওর খিলখিলিয়ে হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। যেন আমাকে এইরকমভাবে ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে ও খুব আমোদ পাচ্ছে...

এখন রাত প্রায় তিনটে বাজে। কিছুক্ষণ আগে দরজা খুলে বেরিয়েছিলাম বাথরুম যাব বলে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, ডাইনিং টেবিলে সমস্ত খাবার ঢাকা দিয়ে রাখা আছে। রাত্রে যে লাইটগুলি বন্ধ থাকার, সেগুলি বন্ধ, শুধুমাত্র নাইট বাল্‌বগুলো জ্বলছে। সিগারেটটা জ্বালিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে প্রস্রাব করে পেছন ফিরেছি বাথরুম থেকে বেরোব বলে, দেখি, বাথারুমের দরজার কোনায় ও উবু হয়ে বসে আছে। এভাবে আচমকা ওকে দেখে হৃৎপিণ্ডটা বুক ফেটে বেরিয়ে আসছিল ভয়ে। ও শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। পরের এক মুহূর্তের মধ্যে ও এসে দাঁড়াল আমার সামনে। ওর নাকটা আমার গলায়, ঘাড়ে ঘষতে ঘষতে বলছিল, "আমার রান্না-করা খাবার কেন খাবা না

দাদাবাবু?" ওর গরম নিশ্বাসটা ঘনঘন আমার গলায় পড়ছে। কিছুদিন আগে হলে হয়তো এতক্ষণে ও আর আমি... কিন্তু এখন ওর সঙ্গে এসব করতে অসহ্য লাগে আমার, ঘেন্না লাগে।

"প্লিজ আমাকে ছেড়ে দাও..." বলে ওকে ঠেলে দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসব এমন সময় কান্না-ভেজা গলায় ও আমাকে বলল, "আমাকে দুঃখ দিয়ো না গো দাদাবাবু। তুমি এরকম করলে আমার খুব কষ্ট হয়।" আর ঠিক তক্ষুনি আমি অনুভব করলাম, আমার বুকের বাঁদিকে একটা চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। আমি জানি এটা কী। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ফিরে বলেছিলাম, "আমি খাব।"

"সোনা দাদাবাবুটা আমার", বলে ও আমাকে টেবিলে নিয়ে এসে বসাল। নিজের হাতে করে খাইয়ে দিচ্ছিল ও আমাকে সেই বিষসম খাবার।

খাইয়ে দিতে দিতে ও আমাকে অনেক প্রশ্ন করছিল, "রান্না ভালো হয়েছে, দাদাবাবু?"

আমি কোনোরকমে ঘাড় নাড়িয়ে হ্যাঁ জানিয়েছিলাম।

"তোমার ওই মেয়েগুলোর কথা আর মনে পড়ে না তো?"

আবার কোনোরকমে ঘাড় নাড়িয়ে না বলেছিলাম।

"আমি তোমাকে ওই মেয়েগুলোর থেকে বেশি আনন্দ দিই। তা-ই না দাদাবাবু?"

ওকে না বলার সাহস তো আমার নেই। তাই আবার ঘাড় নাড়িয়ে হ্যাঁ বলেছিলাম।

ও আমাকে বলেছিল, "যাও, তুমি ঘরে যাও, আমি আসছি এক্ষুনি।"

ঘরে ঢুকে আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। ও দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু আমি দরজা খুলব না। কিছুতেই না। ও খুব করুণভাবে ডাকছে আমাকে দরজার বাইরে থেকে, কিন্তু আমি দরজা খুলব না। কিন্তু, কিন্তু এ কী! ওই তো ও দরজা ভেদ করে ভেতরে ঢুকছে...

ও আমাকে ডায়েরি লিখতে দেখে ফেলেছে। ও আমাকে বলছিল, "দাদাবাবু, আমাকে নিয়ে লিখছ ডায়েরিটা? ও পাপ জিনিস রেখো না গো। পুড়িয়ে ফ্যালো ওই ডায়েরিটা..." ও বলেছিল, ও আগুন নিয়ে আসছে, আমি যেন ওই আগুনে ডায়েরিটা পুড়িয়ে ফেলি। ও আগুন নিয়ে এসেছিল একটু আগে।

ওর ডান হাতের কবজিটা একটা বিশাল মোমবাতির মতো জ্বলছিল। ও বলছিল, ওই আগুনেই ডায়েরিটা...

আমি ওকে ভয় দেখিয়েছি, বলেছি, ও আমার সামনে এলে আমি ছুরি দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেব। ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছে। খুব কাঁদছে। আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা... ডায়েরিটা ছুড়ে দিলাম...

এ কী, ডায়েরিতে এরপরে আর কোনো এন্ট্রি নেই কেন? এরকম অর্ধেকভাবে সমাপ্ত কেন হল ডায়েরিটা? মনিরুল ডায়েরিটার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। এমন আজগুবি ভয়ানক লেখা ও জীবনে পড়েনি। নিজের উত্তেজনা সামলাতে না পেরে যেখানে আবার পরপর এন্ট্রি আছে, সেই পাতাগুলো খুলল মনিরুল।

২ মার্চ:

গতকাল বিকেলে ও যখন ওর মহাজনের বাড়ি থেকে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল, তখন সুতপা ছিল আমার বাড়িতে। সুতপা আমার বান্ধবী। না, বান্ধবী ঠিক নয়, আবার গার্লফ্রেন্ডও নয়। বলা ভালো, প্রয়োজন। ও আমাকে ভালোবাসে, আমি জানি। কিন্তু আমি...

আমাদের মফস্‌সলের একটা সুবিধা আছে, এখানে কেউ সেরকমভাবে কারও খোঁজ রাখে না। তাই কার বাড়ি কে এল, কে গেল, সেই নিয়ে কারও সেরকম মাথাব্যথা নেই।

ঘরে সুতপাকে দেখে ও যেন একটু অবাক হয়েছিল। সুতপাকে অবশ্য আগেই বলেছিলাম ওর ব্যাপারে। সব শুনে সুতপা খুব রাগারাগি করেছিল, বলেছিল, "চেনা নেই, জানা নেই, এরকম দুম করে একটা মেয়েকে কেউ থাকতে দেয় নাকি? তুমি কী করে জানলে, ও সব সত্যি কথা বলছে? ওর আইডি দেখেছিলে?"

আমি ঘাড় নাড়িয়ে "না" বলেছিলাম। সুতপা আবার বলেছিল, "এই দুনিয়ায় এত সহজ সরল, এত বোকা হলে বাঁচবে কী করে? নেহাত তোমার বাবা টাকা রেখে দিয়ে গেছে তাই, না হলে তোমার মতো লোককে রোজগার করে খেতে হত না।"

আমি নাকি বোকা? ভাবা যায়? সুতপা এখনও জানে না যে শুধু সুতপা না, ওর বোনও আসে আমার বাড়িতে। আর আমি ওকে রাখছি, কারণ কাউকে একজনকে তো চাই সব সময়ের জন্য। সুতপা শুধু মঙ্গলবার আর রবিবার আসে, ওর বোন সুমনা আসে সোমবার আর বুধবার। বাকি দিনগুলো আমার কী করে চলবে? তাই তো ওকে...

দুই বাহুর মাঝে জড়িয়ে ধরে সুতপাকে বলেছিলাম, "আমি বোকা তাই তো ভগবান তোমার মতো একজন বুদ্ধিমতী

মেয়েকে আমার জীবনে পাঠিয়েছেন। এই যে মাত্র দুটো দিন তুমি আমার কাছে আসো, তার মধ্যে এতক্ষণ ধরে আমার জন্য হাত পুড়িয়ে রান্না করো, সেটা কি আমার ভালো লাগে, বলো? আর তা ছাড়া আজ বাদে কাল তো পাকাপাকিভাবে চলেই আসবে আমার কাছে, তখন তো কাজের জন্য একজনকে লাগবেই। তাই তো আমি ওকে বললাম আসতে।"

আমাকে জড়িয়ে ধরে সুতপা বলছিল, "এত ভাবো আমার জন্য..." আর তক্ষুনি দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠেছিল। সারাদুপুর অপেক্ষা করার পর এতক্ষণে কলিং বেলটা বাজল। সুতপার সঙ্গে প্রথমবার যেদিন শুয়েছিলাম, সেদিনও মনে এত উত্তেজনা হয়নি, এই কলিং বেলের শব্দ শুনে যতটা উত্তেজনা হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে, সুতপাকে দেখে ও যেন থমকে গিয়েছিল। সুতপা শুকনো গলায় ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমার নাম কী?"

টিনের বাক্সটা দু-হাতে করে সামনে ধরে, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল ও। ওর মুখে-চোখে একটা স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। ও কোনো উত্তর দেয়নি সুতপার প্রশ্নের। সুতপা আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, "আরে, নামটা কী তোমার? ভোটার কার্ড, আধার কার্ড কিছু আছে তোমার কাছে?"

ও মাথা নেড়ে না বলেছিল। সুতপা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "থাক! এখন আর জেরা করতে বোসো না, তার চেয়ে তুমি ওকে একটু রান্নাঘর, রান্নার জিনিসপত্র দেখিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এসো। আমি রুমে আছি।"

আমি জানতাম, আমার কথার ইঙ্গিতটা সুতপা বুঝতে পারবে এবং এক মুহূর্তও দেরি না করে ও রুমে চলে আসবে। আসলে আমি চাইছিলাম না যে সুতপা ওকে কড়া কথায় কিছু বলুক। সুতপার কথায় ও যদি চলে যায় তাহলে তো আমার ক্ষতি।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা যখন আমার রুম থেকে বেরোলাম, তখন ওকে দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। দেখলাম, ও আমাদের জন্য চা, পকোড়া বানিয়ে রেখেছে। সুতপা একটা পকোড়া মুখে দিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, পকোড়াটা ভালো বানিয়েছে। কিন্তু আমাকে যেটা অবাক করেছিল, সেটা হল ওর চেহারাটা। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কেমন যেন শুকনো লাগছে ওকে দেখে। ওর বুকটা তো এত ছোটো ছিল না, আর ওর কোমরের ভাঁজ? সেটাই বা এমন সিলিন্ডারের মতো গোল লাগছে কেন?

পকোড়া খেতে খেতে সুতপা একটা চেয়ারে বসে ওকে আবার একই প্রশ্ন করল, "কই, তোমার নামটা তো তখন বললে না?"

এবারে কিন্তু ও আর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল না। শাড়ির খুঁটে হাত মুছতে মুছতে বলল, "দিদি, পুরোনো নাম পুরোনো কথা মনে পড়ায়। তোমাদের দরজায় থাকতে এসেছি। নতুন জীবন শুরু করছি। তোমরাই না হয় একটা নতুন নাম দিয়ো।"

ওর কথা শুনে আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। তারপর সুতপার দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর হাতের পকোড়াটা হাতেই রয়ে গেছে। চোখের কোনায় জল টলটল করছে। সুতপা এমনিতেই একটু বেশি আবেগি মানুষ। কারও কষ্ট ও সহ্য করতে পারে না। তারপর কেউ যদি ওর মন-ভেজানো কথা বলতে পারে তাহলে তো আর কথাই নেই (সেটা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে)।

সুতপা উঠে গিয়ে ওর মাথায়, কাঁধে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, "আজ থেকে তোমার নতুন নাম মায়া।"

দেখলাম, ও সুতপার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। মনে মনে ভাবছিলাম, বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকে।

যাওয়ার আগে সুতপা ওকে বলে গেল, "দাদাবাবুর খেয়াল রেখো মায়া।"

সুতপা চলে যেতেই আমি দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে উঁকি মেরে ওকে দেখে এসেছি। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কয়েক ঘণ্টা আগেও যে মেয়ের শরীর ফেটে যৌবন উপচে পড়ছিল, সে এরকম স্থূল কী করে হয়ে গেল!

মুশকিল হচ্ছে, এই ব্যাপারে ওকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছি না।

ও রাতে চিকেন ডাকবাংলো আর লুচি করেছিল। অপূর্ব রান্নার হাত ওর। কিন্তু তবু আমি যেন কিছুতেই স্বাদ পাচ্ছিলাম না। কিছু একটা খুব অদ্ভুত লাগছে।

৫ মার্চ:

গতকাল দুপুরে সুমনা এসেছিল। সত্যি বলতে সুতপার থেকে সুমনার সঙ্গ আমি বেশি উপভোগ করি। সুতপা নরম, ও সবকিছু ধীরে ধীরে চায়। কিন্তু সুমনা ঠিক তার উলটো। এমনিতে ওকে দেখে যতটা শান্ত-নিরীহ মনে হয়, ও কিন্তু তা নয়। বিছানায় বোঝা যায় ও আসলে কী জিনিস। ওর সঙ্গে সময় ঝড়ের মতো কেটে যায়। কিন্তু আজ সুমনার সঙ্গও ভালোভাবে উপভোগ করতে পারলাম না।

মনটা শুধু পড়ে আছে ওর দিকে। ওর হঠাৎ কী হল? ওকে প্রথমবার দেখে যেমন মনে হয়েছিল, এখন তো সেরকম লাগছে না। সত্যি বলতে, আগে ওকে দেখে মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা হত, মনের গভীরে কাম জেগে উঠত। কিন্তু এখন কেমন কাজের দিদি বলে মনে হয়। যার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা যায়, যাকে স্নেহ করা যায়; কিন্তু তার বেশি কিছু ভাবতেও ঘেন্না লাগে।

সুমনা বুঝতে পারছিল, আমার কিছু একটা হয়েছে। আমি ওকে তৃপ্তি দিতে পারছি না কিছুতেই। কিছুক্ষণ পরে ও রাগে গজগজ করতে করতে দুম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

বিকেলে জগিং করতে গিয়েছিলাম। কিলোমিটার দুয়েক ছুটে আর ভালো লাগছিল না। বারবার ওর সেই আগের মুখটা, আগের শরীরটা মনে পড়ছিল।

ফিরে এসে ঠান্ডা জলে স্নান করে খবরের কাগজটা নিয়ে বারান্দার জানালার সামনে বসেছি, ও এসে বলল, ''আপনার কফি।''

সত্যি বলতে, এখন ওর দিকে তাকাতেও আর ইচ্ছে করছে না। কফিতে প্রথম চুমুক দিয়েই জিভের সামনেটা একটু পুড়ে গেল। ও একটা স্পেশাল কফি বানাতে পারে, এটা সেই কফি। ও আসার পর থেকে আমি এটা বুঝেছি যে ও দুর্দান্ত রান্না করে। কিন্তু আমার মনের এই অবস্থার জন্য আমি ওই খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে পারিনি। এখন কফিটা খেয়ে মনটা যেন হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। যে চাপা দম-বন্ধ-করা অনুভুতিটা ছিল বুকের মাঝে, সেটা চলে গিয়ে এখন বুকের ভেতরটা অনেক হালকা লাগছে।

অনেকদিন ভালো করে গান শোনা হয়নি। কম আওয়াজে একটা গান চালিয়ে একটা বই নিয়ে বসেছি, এমন সময় একটা দারুণ গন্ধ নাকে এল। প্রাণ ভরে গন্ধটা শুঁকে কী রান্না হচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। শেষে কৌতূহলে থাকতে না পেরে রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে চমকে গিয়েছিলাম। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম রান্নাঘরের বাইরে। আমার দিকে পেছন ফিরে ও একমনে রান্না করছে। এক হাতে খুন্তি নাড়ছে, অন্য হাতটা রেখেছে ওর কোমরের নিখুঁত ভাঁজের ওপরে। ও কি শাড়িটা আজ একটু বেশি নীচে করে পরেছে? চুলটাকে বেঁধে রেখেছে ঘাড়ের ওপরে। রান্নাঘরের গরমে ওর ঘাড়ে, পিঠে চিকচিক করছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমি চুপচাপ ফিরে এসেছিলাম আমার রুমে। এই তো ও। এই ওকেই তো আমি দেখেছিলাম। তারপর কতক্ষণ ধরে মনে মনে আকাশ-পাতাল কল্পনা করেছি মনে নেই। তবে আমার সমস্ত কল্পনাটা জুড়ে যে শুধু ও ছিল, সেটা বলাই বাহুল্য।

কল্পনার দুনিয়া থেকে বেরোলাম ওর ডাকে, ''দাদাবাবু, খেয়ে নিন।''

খাওয়া! সত্যি বলতে, আজ আনন্দে খেতেই ইচ্ছে করছিল না। খেতে বসে ওর যা রূপ দেখলাম, তারপর আর কার খেতে ইচ্ছে করে। আমি জানি, আজ রাতে স্বপ্নে ওকেই দেখব।

৭ মার্চ:

আমি শিকার করতে মাঠে নামব, আর খালি হাতে ফিরব তা-ই কি হয়?

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখেছিলাম, মেঘ করেছে। কয়েকদিন ভালো করে ব্যায়াম করা হয়নি ভেবে ছুটতে বেরোলাম। এমনিতে আমার সারাদিন কিছুই কাজ নেই। গত জানুয়ারিতে একটা রানিং কম্পিটিশন ছিল জলপাইগুড়িতে। সেটা জিতে এসেছি। এরপরে আছে অক্টোবরে। অনেক দেরি আছে তাই এখন একটু আরাম করার মুডে আছি। কিন্তু আমি একটা মন্ত্রে বিশ্বাসী, ''ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টে লং, স্টে স্ট্রং।'' জগার পরে বেরিয়েছিলাম ঠিকই; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসতে হয়েছিল। টুপটাপ বৃষ্টি শুরু করেছে। এই অসময়ের বৃষ্টি আমার মোটেই ভালো লাগে না। বেলা বাড়তে-না বাড়তে বৃষ্টির দাপট বাড়ল।

রুমে বসেই একটা জার্নাল পড়ছিলাম, দরজার সামনে এসে ও জিজ্ঞাসা করল, ''দাদাবাবু, আজ খিচুড়ি খাবা?''

'সেই' দেখতে লাগছিল ওকে। বললাম, ''খাব। তুমি যা রান্না করবে তা-ই খাব।''

ও একটু যেন লজ্জা পেয়ে চলে গেল।

খানিক বাদে মুশলধারে বৃষ্টি শুরু হল। গবেষকরা বলে গেছেন, বৃষ্টির সঙ্গে কামনার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। বৃষ্টির তেজ যত বাড়ে, মনের চাহিদা, আকর্ষণও সমানুপাতিক হারে বাড়ে। আজ সুতপা, সুমনা কেউ আসবে না। কিন্তু আজকে ওদের না-আসা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই। আমি জানতাম, আজকের দিনটা ওদের সঙ্গে কাটানো একটা দিনের থেকে বেশি ভালো কাটবে।

দুপুরে যখন খেতে বসলাম, তখনও বৃষ্টির দাপট কমেনি। এই কয়েকদিনে দেখেছি দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস নেই ওর।

আমি তো কোনোদিনই দুপুরে ঘুমোই না। খাওয়ার পরে ওকে বলেছিলাম, ''সিনেমা দেখবে?''

খুব খুশি হয়েছিল ও আমার কথা শুনে। একমুখ আনন্দ নিয়ে ও বলেছিল, ''কতদিন ছবি দেখিনি। কী ছবি দেখাবে দাদাবাবু?''

আমি তো জানতাম, আমি কী ছবি দেখাব।

ছবি দেখতে দেখতে ওর গা ঘেঁষে বসেছিলাম আমি। ছবির উত্তেজনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল আমার মধ্যে। আড়চোখে দেখে বুঝেছিলাম, ওর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে সেই উত্তেজনা। ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম ধীরে ধীরে। মিশে গিয়েছিলাম ওর মধ্যে। বাইরে ঝমঝমে বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ওর চিৎকার, শীৎকারের শব্দ।

সত্যি এমন অনুভূতি, এমন ভালো লাগার আবেশ এর আগে অনুভব করিনি। যেন জন্মজন্মান্তরের পর এই শান্তি, এই তৃপ্তি পেয়েছি।

বিকেলে কফি খেতে খেতে মনে মনে সেই অনুভূতিরই জাবর কাটছিলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে একটু অদ্ভুত লাগল। আসলে সত্যি বলতে, মিলিত হওয়ার সময় একে অন্যকে একটা ভালোবাসার আঘাত করা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ও বেশ জোরে একটা চড় মেরেছিল আমার গালে। বিকেলে অনেক ভেবে মনে হল, সেই সময় ওর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় কোনো কারণ ছাড়াই সুমনার মুখটা কি মনে পড়েছিল একবার? কিন্তু তা-ও যদি হয়, তাহলে সেটাও তো হয়েছিল আমার মাথার ভেতরে, সেটা ও বুঝল কী করে? তাহলে কি ও মাইন্ড রিড করতে পেরেছিল?

তাহলেও হয়তো ঠিক ছিল। অবাক হয়েছিলাম রাত্রিবেলায়। রাতে ডিনার করে ঘরে নিজের কাজ করছি। এমন সময় ও এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে। ওর চোখে-মুখে কামনা উপচে পড়ছে। কাছে ঘেঁষে এসে বলল, ''করবা না দাদাবাবু?'' আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিলাম ওকে।

আমার কানে ফিসফিস করে ও আবার সেই আগে বলা কথাটা বলেছিল, ''তুমি আমাকে কোনোদিন দুঃখ দেবে না তো দাদাবাবু?''

আমার কানের লতি ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে। কামনার একটা সাপ ধীরে ধীরে শিরদাঁড়া বেয়ে ওপরদিকে উঠছে।

খুব অস্ফুটভাবে বলেছিলাম, ''না! কক্ষনো না! কক্ষনো না!''

১২ মার্চ:

ভয় না। আতঙ্ক বললেও হয়তো কম বলা হবে। এই পাঁচটা দিন কী করে কেটেছে, আমি হয়তো তা বলে বা লিখে কোনোভাবেই বোঝাতে পারব না। আমি লেখক নই, গুছিয়ে লেখা আমার কাজ নয়। তবুও এই পাঁচটা দিন কীভাবে আমার জীবন বদলে দিয়েছে, কীভাবে আমার জীবন শেষ করে দিয়েছে, সেটাই লেখার চেষ্টা করছি।

সেদিন রাতের পর ও অনেকটা বদলে গিয়েছিল। আমার ওপর যেন একটা স্বাভাবিক অধিকারবোধ কাজ করছিল ওর।

সেই রাতের পরের দিন থেকে সারাদিন ও আমার গা ঘেঁষে ঘেঁষে থাকছিল। প্রথম প্রথম ভালো লাগলেও পরে সেটা বিরক্তির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। সারাদিন তো আর এসব ভালো লাগে না। দুপুরবেলা যখন সবে খেয়ে উঠেছি, ও আচমকা এসে জড়িয়ে ধরেছিল পেছন থেকে। আদর করতে করতে বলেছিল, ''দাদাবাবু, তুমি শুধু আমার তা-ই তো?''

খুব অবাক হয়ে বলেছিলাম, ''মানে?''

আমার কথা শুনে ও যেন খুব লজ্জা পেয়েছে। আমার পিঠে মুখ গুঁজে দিয়ে বলেছিল,''তুমি এবার থেকে শুধু আমার সঙ্গে শোবে তা-ই তো দাদাবাবু?''

কিছুক্ষণের জন্য কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম, অবাক হয়েই বলেছিলাম, ''কী বলছ কী এসব?''

ও বলেছিল, ''কেন, আমি তো সব সময়ের জন্য আছি তোমার কাছে। তাহলে তোমার আর অন্য কারও কী প্রয়োজন? তুমি যখন যা বলবে, যেমনভাবে বলবে, আমি তা-ই দেব। তা-ই তো দিই। দিই না? তাহলে কেন অন্য মেয়ে তোমার ঘরে ঢুকবে?''

সত্যি বলতে, এতটা অবাক আমি আগে কক্ষনো হইনি। ব্যাপারটাকে এভাবে ভেবেও দেখিনি। কিন্তু সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে একজন কাজের মেয়ের এতটা স্পর্ধা আমার সহ্য হয়নি। ওর সঙ্গে যতই ভালো ব্যবহার করি, ওকে যতই বিছানায় তুলি। আসলে তো ও কাজের মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিজেকে ওর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিলাম, ''কী বলছ কী এসব? মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?''

''কীসের মাথা খারাপ, দাদাবাবু? কই না তো। তোমার যা প্রয়োজন, তুমি তো পাচ্ছ আমার কাছে। পাচ্ছ না? তাহলে আবার অন্য মেয়েমানুষ কেন লাগবে তোমার?''

ওর কথা শুনে একনিমেষে যেন মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। আমি কার সঙ্গে শোব, কার সঙ্গে ঘুরব, কার সঙ্গে কী করব,

সেই সমস্ত ঠিক করব আমি। আমার বাড়ির কাজের মেয়ে নয়। আর এটাই ভুল হয়েছিল। রাগের মাথায় মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছিলাম, "তুমি আমার বাড়ির কাজের মেয়ে। তুমি ঠিক করে দেবে, আমি কার সঙ্গে কী করব-না করব?"

মানুষ যখন কোনো কিছু দেখেশুনে অবাক হয়, তখন সে ভাবে, এর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর আর কী-ই বা হতে পারে। কিন্তু এই পৃথিবীতে যে কত কিছু আছে আমাদের বিস্মৃত করার, তার কোনো ইয়ত্তাই নেই।

বিস্মৃত হয়েছিলাম, অবাক হয়েছিলাম, ভয় পেয়েছিলাম এটা দেখে যে, ওর চোখের কোনায় জল টলটল করছে।

চোখের সাধারণ জল নয়, লাল রঙের জলে ধীরে ধীরে ভরে উঠছে ওর চোখ। একফোঁটা জল, জল বলব নাকি রক্ত? গড়িয়ে পড়ল ওর গালে বেয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকে অসম্ভব ব্যথা শুরু হল। শ্বাসকষ্ট। কেউ যেন সমস্ত পৃথিবীর বাতাস শুষে নিয়েছে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য সামান্য বাতাসও আর অবশিষ্ট নেই।

আমার কানের কাছে মুখটা এনে খুব মিহি গলায় ও বলেছিল, "তুমি যে আমাকে বলেছিলে, তুমি আমাকে কোনোদিন কষ্ট দেবে না। তাহলে আজ কেন কষ্ট দিচ্ছ দাদাবাবু? আমাকে কষ্ট দিয়ো না গো। জানো তো, যে আমাকে কষ্ট দেয়, তার খারাপ হয়..."

মুখে কিচ কিচ জাতীয় একটা শব্দ করে খুব শান্তভাবে হাসছিল ও।

দম বন্ধ হয়ে প্রায় শেষ নিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি এমন সময় ও আমাকে আবার প্রশ্ন করেছিল, "আর কষ্ট দেবে আমাকে কোনোদিন?"

কোনোরকমে ঘাড় নেড়ে না বলেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন একবুক বাতাস কেউ ভরে দিয়েছিল আমার বুকের ভেতরে।

তারপর সারাদুপুর ধরে মড়ার মতো পড়ে ছিলাম বিছানায়। আর ও একপ্রকার ধর্ষণ করেছিল আমাকে।

পরের দিন দুপুরে সুতপা এসেছিল আমার বাড়ি। বিগত একদিনেই যেন আমার জীবনের সমস্ত সূত্র, সমস্ত সংজ্ঞা বদলে গেছে। সত্যি বলতে, আমি সুতপার আসার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এই একদিনেই আমার ওর ওপর থেকে মন উঠে গেছে। না না, এটাকে মন উঠে যাওয়া বলে না। এটাকে বলে ভয়...

আমি দেখলাম, সুতপা ঘরে ঢুকতেই ও যেন প্রচণ্ড বিরক্ত হল।

সুতপা টেবিলে বসে গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কেমন আছ মায়া?"

ও কোনো উত্তর দেয়নি সুতপার প্রশ্নের। চুপচাপ রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। ওর এই আচরণে সুতপাও একটু অবাক হয়েছিল।

আমার খুব ইচ্ছে করছিল, সুতপাকে সবকিছু খুলে বলি। কিন্তু কী করেই বা বলব নিজের এই পাপের কথা?

আসলে একটা ভয় হচ্ছে মনের মধ্যে। কীসের ভয়, কী ভয় আমি জানি না, কিন্তু ভয় করছে।

শুধু মনে হচ্ছে, একটা বিপদ ধেয়ে আসছে আমার দিকে। আর এই বিপদ থেকে একমাত্র সুতপাই আমাকে বাঁচাতে পারে।

নিজের সমস্ত লজ্জা, নিজের সমস্ত ভয়, নিজের সমস্ত অপরাধবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে সুতপাকে ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

সেই প্রথম আমার সুতপাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছিল। নিজেকে উজাড় করে দিতে ইচ্ছে করছিল ওর সামনে। ওকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম সেদিন।

একে একে ওকে নিয়ে সব বলেছিলাম সুতপাকে।

ওর আমার বাড়ি আসার কারণ। আমার ইচ্ছে। আমার ভুল। অপকটে সমস্ত স্বীকার করেছিলাম।

এমনিতে সুতপা খুব ভালো মেয়ে, কিন্তু কারও ওপর একবার রেগে গেলে সে আর তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখে না। আমি জানতাম, সুতপা এরপরে আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না। কিন্তু এটাও জানতাম, সুতপা ওকে তাড়িয়ে তারপর নিজে যাবে।

সুতপা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ঘরের বারান্দার মধ্যে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। সুতপা রান্নাঘরে গিয়ে হাত ধরে বারান্দায় টেনে বের করে এনেছিল ওকে। সেই শুকনো গলায় ও বলেছিল, "এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও এই বাড়ি ছেড়ে।"

ও হাতজোড় করে এগিয়ে এসেছিল সুতপার কাছে, "এমন কাজ করবেন না দিদি। আপনাদের দয়ায় দুটো খেয়ে-পরে থাকতে পারছি। আপনারা বের করে দিলে..."

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই সুতপা একটা চড় বসিয়েছিল ওর গালে, বলেছিল, "নাটকের একটা সীমা রাখবি। যা, বেরো এই ঘর থেকে..."

সুতপার কথা শেষ হয়নি। আমি দেখলাম, ও সুতপার দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে জল টলটল করছে। লাল রঙের জল।

আমার চোখের সামনে সুতপা দু-হাতে করে নিজের বুক চাপা দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আর ওখানে দাঁড়িয়েই ও বলে চলেছে, "মর মাগি মর। আমার গায়ে হাত দিবি? আমার লোকটার সঙ্গে সোহাগ করবি? মর! তুই মরলে তবেই আমার জ্বালা জুড়োবে।"

সুতপা মারা গেল। আমার কোলে মাথা রেখে, দু-চোখ ভরতি ভালোবাসা নিয়ে সুতপা চলে গেল। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, সুতপা আমার প্রয়োজন ছিল না কোনোদিনই। অবলম্বন ছিল। বেঁচে থাকার অবলম্বন। সেই অবলম্বনটাই চলে গেল।

তারপর ঘর ভরতি পুলিশ এসেছিল। আমি কোনো কথা বলতে পারিনি। সুতপার মাথাটা কোলে নিয়ে পাথরের মতো বসে ছিলাম।

ও পুলিশকে সাক্ষী দিয়েছে, "দাদাবাবু আর দিদিমণি টেবিলে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ দিদিমণির বুকে ব্যথা শুরু হয়, দিদিমণি হার্ট ফেল করে। দিদিমণি দাদাবাবুকে ডাক্তার ডাকার সময়টুকুও দেয়নি..."

পুলিশ গাড়িতে করে সুতপাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি বারান্দায় বসে বসে দেখেছিলাম সুতপার চলে যাওয়াটা। কয়েকজন পড়শি এসেছিলেন পাশে দাঁড়াতে, কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজে 'প্রেমের কারণে মৃত্যু?'—এই হেডলাইন পড়ে আর কেউ এই বাড়ির ধারেপাশে আসেনি।

সুতপা আর নেই, সুমনা আর আসে না। আমি ভেবেছিলাম, সুতপার বাবা-মা হয়তো আমার কাছে আসবেন, কিন্তু ওঁরাও কেউ যোগাযোগ করেননি।

এখন প্রতিদিন রাতে-দুপুরে আমার ওপর অত্যাচার হয়। আমি কিছু বলতে পারি না। আজকাল খেতে ভালো লাগে না। ঘুমোতে ভালো লাগে না। গান শুনতে ভালো লাগে না। কিছুই ভালো লাগে না। শুধু সুতপার মুখটা মনে পড়ে। ওর চোখগুলো মনে পড়ে। ওর আমাকে জড়িয়ে ধরাটা মনে পড়ে। শেষবারের মতো ওর আমার কোলে মাথা রাখাটা মনে পড়ে।

২৫ মার্চ:

আমি কি আর বেঁচে আছি? জানি না! হয়তো একটা ঘোর, একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছি।

ও আমাকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেয় না। বাড়ির মুদিখানা, বাজারহাট সব ও করে। এমনকি আমার সিগারেটটা পর্যন্ত ও কিনে আনে। আমাকে বাইরে যেতে দেয় না।

আমার শুধু একটাই কাজ, ওকে ভালো রাখা, ওকে কষ্ট না-দেওয়া, ওকে আনন্দে রাখা।

মনিরুল পরের পাতা উলটে দেখল, ও যেখান পড়তে শুরু করেছিল, আবার সেখানেই চলে এসেছে।

ডায়েরিটা বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল মনিরুল। কিচ্ছু বুঝতে পারছে না ও। এসব কী? কার ডায়েরি? এসব কি সত্যি?

একটা পোড়া গন্ধে ওর চেতনা ফিরল। চিকেনটা গ্যাসে চড়িয়ে ডায়েরি পড়তে বসেছিল মনিরুল, সেই চিকেন পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

সারাদুপুর মনটা ভারী হয়ে রইল। বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিল মনিরুল। ওর পাশের বাড়ির দরজায় একটা ছোটো জটলা। দু-একটা ছেঁড়া ছেঁড়া কথা ওর কানে এসেছিল—"ছেলেটা ভালো ছিল", "একা থাকার এই জ্বালা", "এত অল্প বয়সে", "ওই প্রেমিকা মেয়েটা গেল, সঙ্গে করে ওকেও নিয়ে গেল। ভালোবাসা! যত্তসব..."

বিশেষ পাত্তা দেয়নি মনিরুল। মাঝে মাঝে ভাবে, লোকের কত সময় আছে এভাবেও নষ্ট করার।

এরপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। ডায়েরিটা মনিরুল আলমারিতে রেখে দিয়েছে।

সারাদিন নিজের কাজ, অফিসের কাজ করে হাঁপিয়ে ওঠে ও। মায়ের কথা বড্ড মনে পড়ে। বারবার বলার পরেও মা কিছুতেই ওর সঙ্গে এখানে আসতে চায়নি।

একদিন সকালে মনিরুল বাজার করে ফিরছে, দ্যাখে, ওর বাড়ির দরজায় একজন মহিলা বসে আছে। ওর মায়ের বয়সিই হবে...

মনিরুলকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে সেই মহিলা শুকনো গলায় বলেছিলেন, "একটু জল দেবে বাবা?"

মনিরুল হাসিমুখে ফ্রিজের ঠান্ডা জল নিয়ে এসে দিয়েছিল সেই মহিলাকে। খুব তৃপ্তি করে জলটা খেলেন তিনি।

হাসি-হাসিমুখে মনিরুল সেই মহিলাকে প্রশ্ন করল, "আপনি কে মা? এখানে কী করছেন?"

কাতর স্বরে সেই বৃদ্ধা বলেছিলেন, "আমি আবার কে বাবা... আমাদের তো একটাই পরিচয়... কাগজওয়ালি।"



অন্ধকার অতীত

মধুমিতা সেনগুপ্ত



সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ফ্রেশ হয়ে ব্রাশ করতে করতে পেছনের দরজা খুলে বাইরে বের হয়েই পাপিয়ার মাথা গরম হয়ে গেল। চিরদিনের শখ, একটা ছোটো ফুলের বাগান করবে। কিচেন গার্ডেন করে টবে টম্যাটো, বেগুন আর অল্প ঝাল লংকার বীজ পুঁতবে। কেমিক্যাল সার ছাড়া সবজি ফলানোর একটা ব্লগ খুলবে। কত কিছু স্বপ্ন দেখে পরিকল্পনা করে এই বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে লোন নিয়ে বাড়িটা কিনেছে। দু -মাস আগে এই বাড়িতে এসেছে ওরা। দিনকয়েক আগে গোটা কুড়ি টব কিনে হালকা সবুজ মেটাল পেইন্ট লাগিয়ে ছাতে রেখেছিল। দু-দিন আগে কিছু গাছ লাগিয়েছে। তারপর ছাতে বেশি রোদ লাগে আর জল দেওয়ার অসুবিধা থাকায় টবগুলোকে বাড়ির পেছনের ফাঁকা জমিতে নামিয়ে এনেছে।

আজ সে দেখল, তুলসীর টবগুলো মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। লংকা ফুলে ভরতি গাছ শিকড় সমেত উপড়ে পড়ে আছে। টবটা ভাঙা। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চশমা নাকে এঁটে পাপিয়া আবার ভালো করে গাছের অবস্থা দেখে বেডরুমের দিকে ছোটে।

লকডাউন চলছে। কুশল ন-টার আগে বিছানা ছাড়বে না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পাপিয়া ওকে ডাকে না। ডেকেও লাভ নেই। ঘুম ভাঙলেও কুশল গড়াগড়ি খেতে থাকে। ঘরে ঢুকে জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে কুশলের পা ধরে নাড়িয়ে দেয় পাপিয়া। কুশলের পায়ে হাত দিলেই ওর ঘুম ভেঙে যায়। ছেলেদের পায়ে সুড়সুড়ি থাকে—কুশলকে বিয়ে করার আগে এই তথ্যটি পাপিয়ার অজানা ছিল।

"উঃ। পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?" স্প্রিং-এর মতো পা গুটিয়ে নিয়ে কুশল সোজা হয়ে শোয়।

"তুমি রাত্রে পেছনের দরজায় তালা লাগিয়েছিলে যখন, তখন কি টবের গাছগুলো ঠিক ছিল?" প্রশ্ন করে পাপিয়া।

"সকালবেলা উঠিয়ে এসব কী ভুলভাল প্রশ্ন করছ? মাথাটা গরম করে দিয়ো না! আমি কি ছাগল যে তোমার গাছের খবর রাখব? খেয়েদেয়ে আমার কাজ নেই?" রেগে গিয়ে বলে কুশল।

"আমার গাছ মানেটা কী! আশ্চর্য কথাবার্তা! তোমার টাকা দিয়েই কেনা হয়েছিল টবগুলো। গাছের চারাগুলো আমি তোমার পয়সাতেই কিনেছি। কিছুই তো গাছের জন্য করতে বলিনি, শুধু একটু চোখ দিয়ে দেখা। রাত্রিবেলা তোমার চোখে পড়েছিল কি না—এটাই জানতে চাইছি। এজন্য এত কথা বলছ কেন? সকালবেলা তুমি উঠে বাসি মুখে ঝগড়া করতে পারো আর আমি পারি না?" পাপিয়া অল্প কথার মানুষ নয়। সে বলেই চলে।

"আসল ঘটনাটা ব্রিফ করো।"

"কুঁড়ের বাদশা! গা-টা নাড়িয়ে দেখবে চলো, কী সর্বনাশ হয়েছে আমার গাছগুলোর। দুমড়ে-মুচড়ে টব ভেঙে গলা টিপে যেন ওদের খুন করেছে কেউ। আমি কিন্তু ছাড়ব না। যে করেছে, তাকে আমি দেখিয়ে দেব মজা। বাড়ির বাইরে থেকে কেউ আসেনি নিশ্চয়ই এ কাজটা করতে। তোমাদের তিনজনের মধ্যে কেউ করেছে। সেটাই আমি জানতে চাইছি, কে করেছে?" শেষের দিকে পাপিয়ার গলার আওয়াজ চড়তে থাকে।

কুশল ভালো করে গাছগুলোকে দ্যাখে। অদ্ভুত ব্যাপার! তুলসী গাছগুলোকে যেন ভারী পাথর দিয়ে কেউ থেঁতো করেছে। লংকা গাছগুলোর কাণ্ডের জায়গাটা যেন সজনেডাঁটার মতো করে চিবিয়েছে কেউ। বাড়িটার চারপাশে ছয় ফুট পাঁচিল দেওয়া। পাঁচিলের ওপরে আরও দু-ফুট করে চৌকো খোপ খোপ গ্রিল দেওয়া। তার ওপরে মানিপ্ল্যান্টের হালকা ঝোপ। এর ওপর দিয়ে কুকুর-বেড়াল আসা তো অসম্ভব। তাহলে!

ওদের বেডরুমের পাশেরটা ছেলেমেয়েদের ঘর। তাথই ইলেভেন আর তান নাইনের ছাত্র। পাপিয়া গিয়ে তাদের ঘরে নক করে। তাথই এসে দরজা খুলে দাঁড়ায়।

"কী হয়েছে?"

"তোরা কি আমার গাছগুলোকে মেরে টবগুলোকে ভেঙে ফেলেছিস?" পাপিয়ার প্রশ্ন শুনে তাথই প্রথমে খুব অবাক আর পরে বিরক্ত হয়।

"দুর বাবা। আমার অনেক কাজ থাকে, মা।" আরও কিছু কথা বলতে যাচ্ছিল তাথই; কিন্তু তার আগেই কুশল এসে পড়ে। কুশল ডাইনিং স্পেসের বেসিনে হাত ধুয়ে-মুছে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

"কোনো জন্তু ঢুকেছিল বাড়িতে। কিন্তু এত বড়ো পাঁচিল ডিঙিয়ে কী ঢুকেছিল তা বুঝতে পারছি না। একটু চা করো তো। আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।" কথাগুলো বলে কুশল নিজেদের বেডরুমে ঢুকে যায়।

কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে পাপিয়া রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল চাপায়।

"এই ভাই, ভাই! ওঠ। মায়ের গাছগুলো নাকি কোনো জন্তু এসে ভেঙে দিয়ে গেছে।" দিদির ডাকাডাকি শুনে নিজের বিছানায় উঠে বসে তান। এতক্ষণ সে সুপারম্যান হয়ে করোনা ভাইরাসের আসল ঘাঁটিতে যুদ্ধ করছিল। ঘুম ভাঙিয়ে দিদি কী বলল—গাছ জন্তু মা! মাথার ভেতর কীরকম খিচুড়ি রান্না হয়ে গেল।

"এই মুটকি, উঠেছিস?" টুং করে হোয়াতে অনির মেসেজ ঢুকলো।

"হ্যাঁ। এই শোন, এই পাড়াতে কি এরকম কোনো অ্যানিম্যাল আছে, যে পাঁচিল টপকে এসে সব গাছ নষ্ট করে টব ভেঙে দিয়ে যেতে পারে?"

"না তো। কেন, তোদের বাড়িতে এরকম কোনো ইনসিডেন্ট ঘটেছে নাকি? দেখ, তানই করেছে এসব। খেপি, এখন রাখছি। মা ডাকছে।"

নাক কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বসে থাকে তাথই। তিন বছর আগে বাবার কলিগ ও খুব কাছের বন্ধু সুদীপ মিত্র আঙ্কল এই বাড়ির খবর দেন। কুশল একদিন সবাইকে নিয়ে বাড়িটি দেখতে আসে। সেদিন এই বাড়ির উলটোদিকে চারটি বাড়ির পরে ওঁর ফ্ল্যাটে যায় সবাই। টি পার্টি হয়। সেদিন মিত্র আঙ্কলের ছেলে অনিকেতকে কয়েক বছর বাদে দেখে তাথই মনে মনে আছাড় খায়। সেই রোগা ছোটো ছেলেটা এখন এত সুন্দর দেখতে হয়েছে, ভাবতেই তার অবাক লাগে। অনিকেতও ওকে দেখেছে। তারপর বড়োদের লুকিয়ে কায়দা করে ওর ফোন নম্বরটি নিয়ে নেয়। তারপর তিন বছর ধরে শুরুতে বন্ধুত্ব ও পরে আরও কাছাকাছি চলে আসে দুটি তাজা মন।

দু-মাস আগে কুশল বেশ বড়ো করেই গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান করে। তখন কুশলের হাতে হাতে অনেক কাজ করে দেয় অনি। তাথই দ্যাখে অনির পরিশ্রম সার্থক। কারণ বাবা-মা দুজনেই অভিভূত বা যাকে বলে ইম্প্রেস্‌ড হয়েছেন।

অনিরা তিনতলার সামনের দিকের ফ্ল্যাটে থাকে। ওর আবদার মেটাতে সকালে উঠে ফ্রেশ হয়ে তাথইকে একবার ওদের বাড়ির সামনের ছোট্ট খোলা জায়গায় বের হয়ে এসে দাঁড়াতে হয়। অনি নিজের ঘর সংলগ্ন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। দুজনেই সেরকম কিছুই দেখছে না মুখ করে একে অপরকে দেখে নেয়। পড়তে বসার আগে এইটুকু চোখের দেখা মনটাকে চাঙ্গা করে দেয়। আগে তাথই বাড়িতে ঢুকে যায়। না হলে ও দেখেছে, নিজে থেকে অনি কখনও ব্যালকনি ছেড়ে নড়ে না। তাথই জানে, উলটোদিকের দোতলার কর্মহীন কাকিমা ঠিক একদিন ওদের এই নির্ভেজাল চোখের খিদে মেটানোর পদ্ধতিটা ধরে ফেলবেন।

"তাথই, তুমি কাল রাতে ছাতে হাঁটছিলে? একা একা ভয় লাগেনি তোমার?" কাকিমা বললেন।

"আমি! কাল রাতে তো ছাতে যাইনি!"

"আরে, আমারও একদিন তোমার বয়স ছিল। বুঝি বুঝি।" কাকিমা হেসে ভেতরে ঢুকে যান।

পাগল নাকি! মা-কে আবার না বলে বসে। তাকে আর ভাইকে নিয়ে মায়ের প্রচুর স্বপ্ন। নিজে চাকরি করেননি। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে তাই তাকে রাতদিন বলেন, "চাকরি না পেলে একদমই বিয়ে দেব না। নিজের পায়ে না দাঁড়ালে আমার মতো অবস্থা হবে।"

"কী খারাপ রেখেছি তোমাকে? যখন যা বলছ, এনে দিচ্ছি।" একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে কুশল বলে। আবার তর্ক শুরু হয়।

গাছগুলো টবসহ ময়লার গাড়িতে ফেলতে যায় কুশল। মাঝবয়সি সাফাইকর্মীটি বলে, "এই বাড়িতে প্রথম যে স্বামী-স্ত্রী ছিলেন, তাঁদেরও গাছগুলো এভাবেই মরে যেতে দেখেছি। ওঁরা তো মাত্র দু-মাস ছিলেন এ বাড়িতে।" কুশল ভুরু কুঁচকে তাকায়। লোকটির তাড়া আছে তাই সে বাঁশি বাজিয়ে চলে যায়।

"হ্যালো সুদীপ। একটা কথা ছিল, তুই কি বিজি আছিস?"

"না না বল, কোনো অসুবিধা নেই।"

"দেখ, তোর চেনা যে ভদ্রলোক, মানে শুভ্র চৌধুরী, যাঁর কাছ থেকে আমি বাড়িটা কিনলাম, তিনি বলেছিলেন, তিনি বাড়িটা বানিয়েছেন। আর আজকে যে লোকটা ময়লা নিতে আসে, ও আমাকে বলল, এখানে নাকি একটা পরিবার ছিল, যারা দু-মাস ছিল—তারা কারা রে?"

"শোন, আমি যখন এই পাড়ায় ফ্ল্যাট কিনে আসি, তখন শুভ্রদা সপরিবারে এই বাড়িতে থাকতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে অনেক বছর আগে তিনি মাত্র একটা ঘর, রান্নাঘর আর একটা বাথরুমসহ বাড়িটি কিনেছিলেন। এরপর উনি বাইরে ট্রান্সফার হয়ে যান। তারপর কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে নিজের পছন্দমতো রিমডেলিং করে অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। রিটায়ার করে এখানে আসেন। ওঁর আগে কে থাকত, আমি জানি না রে।" জানায় সুদীপ।

"ওঁদের কি গাছ পোঁতার শখ ছিল?"

"না না। ওঁর স্ত্রী-কে তো আমি এসে অবধি অসুস্থ দেখেছি। বউদিও চাকরি করতেন। কিন্তু সেটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ওঁর যে কী অসুখ ভাই, কেউ ধরতে পারেনি। মানসিক অবসাদে ভুগতেন। তারপর একদিন ঘুমের মধ্যেই মারা যান।"

"ও। শুভ্র চৌধুরী জানিয়েছিলেন, ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন। আমি আর কোনো প্রশ্ন করিনি।"

"কুশল? এতদিন বাদে এসব প্রশ্ন করছিস কেন? কী হয়েছে? আমি কি একবার আসব?" সুদীপ একটু চিন্তিত গলায় বলে।

"আরে না না। ঠিক আছে। এমনি মাথায় এল, বললাম। লকডাউনে ভুলভাল চিন্তা করে টাইমপাস করা আর কী।"

একরাতে কুশল পেছনের দরজায় তালা লাগিয়ে ফিরে আসার সময় আলো নিভিয়ে দেয়। তারপর অভ্যাসমতো তালাটা টেনে দেখতে গিয়ে দ্যাখে, দরজার মাঝখানের কাচের ওপর একটা ছায়া নড়ছে। চমকে উঠে বাইরের আলো জ্বেলে দরজা খুলে দ্যাখে, সবকিছু ঠিকই আছে। কলা গাছের পাতাগুলো হালকা হাওয়ায় নড়ছে। অল্প হেসে আবার সব আলো নিভিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে চলে আসে কুশল। কলা গাছের ছায়াটা যেন একটি মানুষের মাথার মতো লাগছিল। এসব দেখেই সবাই ভয় পায়।

রাত তখন সাড়ে বারোটা। ভাইব্রেট করে ওঠে ফোনটা। তান ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে বইটা রেখে ফোনটা হাতে নিয়ে তাথই দ্যাখে, হোয়াতে মেসেজ করেছে অনি। সে এখুনি ভিডিয়ো কল করতে চায়। না, শুনবে না। এই হয়েছে মুশকিল। তান যদিও ব্যাপারটা জানে তা-ও তাথই ভাইকে এসবের মধ্যে জড়াতে চায় না।

অনি ভিডিয়ো কল করবে। তাড়াতাড়ি চুলটা খুলে আঙুল চালিয়ে একটু গুছিয়ে নেয় নিজেকে। ঠোঁটে একটু লিপবাম দিয়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু ফোন তো শান্ত হয়েই রয়েছে। মিনিট সাতেক পরে নিজেই বিরক্ত হয়ে ভিডিয়ো কল করে। এ কী! ফোন এনগেজ্ড! খুব রেগে যায় তাথই। তার কি পড়াশোনা নেই নাকি? মা ঠিকই বলেন, বহু ছেলেমেয়ে

প্রেমে পড়ে নিজের পড়াশোনার বারোটা বাজিয়ে ফ্যালে। আরও মেজাজ গরম হয়ে যায়, যখন দ্যাখে, তার ফোনটা সুইচ্‌ড অফ হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের ফোন থেকে ভিডিয়ো কল করে অনির অন্য ফোনটাতে। ফোন ধরে অনি অপার বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"কী, হলটা কী? আমায় বসিয়ে রেখে কার সঙ্গে কথা বলছিস?" চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে তাথই।

শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায় অনির। কারণ অন্য ফোনের স্ক্রিনে তাথই ওদের ছাতে দাঁড়িয়ে। রাস্তার আলো থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাথই সাদা টি-শার্টটা গায়ে। ফোনটা কোথাও বসিয়ে রেখে, দূরত্ব রেখে তাথই শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে আর হাসছে। নিজের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সে তাথইকে ছাতে ঘুরতে দেখে ভিডিয়ো কল করার কথা ভেবেছে।

অন্য ফোনে তাথই ওর বেডরুমে বসে অজস্র বকাবকি করছে। দুটো ফোনই কেটে দেয় অনি। সে একা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। ছাতের তাথই আরও সামনে এসে ফ্যাকাশে কাগুজে মুখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে কেমন দুর্বোধ্য একটা হাসি হাসছে। তাথইয়ের তো এত বড়ো চুল নেই। তা ছাড়া ওর কি ওপরের পাটির দাঁতগুলো এত বড়ো বড়ো? কাঁপুনি ওঠে অনির সারা শরীর জুড়ে। আজ মনে হচ্ছে, দুটো বাড়ির মধ্যের দূরত্বটা অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারলে ভালো হত। শেষ শক্তিটা জড়ো করে অনি ঘরে ঢুকে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

অনি ঠিক করে, তাথইকে কিছুতেই এসব জানানো যাবে না। বেচারি খুব ভয় পেয়ে যাবে। এর পরের দু-রাত এক অমোঘ আকর্ষণে তাথইদের বাড়ির ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকে অনি। কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না।

এর দু-দিন বাদে তাথই খেয়াল করে, ওদের বাড়িতে কিছু ঘটনা ঘটছে, যেটা ওর কাছে একেবারেই নতুন। সে সকালে উঠে দ্যাখে, ওর বাবা ড্রয়িং রুমে সোফার ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মায়ের হাঁড়িমুখ।

কারণ জিজ্ঞাসা করায় মা বলল, "দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বাবা একটু মেজাজ গরম করছে কথায় কথায়। ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে করে হয়তো বোর হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে তোদের ভাবার কিছু নেই।"

দুপুরে তান এসে দিদিকে বলে, "মা রান্নাঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিল।" এটা শোনার পরেই তাথইয়ের অস্থির লাগছে। কী হচ্ছে বাড়িতে? এত মেড ফর ইচ আদার কাপ্‌ল হঠাৎ এরকম আচরণ করছে কেন?

অনি সান্ত্বনা দেয়। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব স্বামী-স্ত্রী-র মধ্যেই সমস্যা হয়। আবার সব মিটেও যায়।

কিন্তু এক্ষেত্রে দিন দিন অশান্তি বাড়তে শুরু করে। এতটাই বেড়ে যায় যে অতিমার্জিত কুশল রান্নায় নুন কম হয়েছে বলে স্ত্রী-কে গালাগালি করে বসে। তাথই খুব কষ্ট পায় এবং অপমানিত বোধ করে। মা-কে নিজের ঘরে এনে বাবার ঘরে ভাইকে পাঠিয়ে দেয়। আর এই অচেনা বাবা তার এত মনে এতটাই আঘাত দেয় যে সে অনির কাছ থেকে এসব পারিবারিক কথা লুকিয়ে রাখতে শুরু করে। অনিও যেন কেমন একটু পালটে গেছে। আজকাল সবসময় যেন চিন্তিত থাকে। রাতের দিকে ফোন করে না। ছাতে ওঠার জন্য জোরাজুরি করে না। উলটে ছাতে উঠতে বারণ করে। কী হয়েছে কে জানে! সব দিক দিয়ে তাথই মানসিক কষ্টে ভোগে।

সেদিন কুশল আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়িতে লাগাতার অশান্তির চাপে তানের মন বিক্ষিপ্ত। তারপর নিজের বিছানায় যত আরামে ঘুম আসে, বাবার পাশে শুয়ে সেভাবে ঘুম আসছে না। চোখ বন্ধ করে সে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। কাল সকালে উঠে কিছু অঙ্ক করে রাখতে হবে। বেলা ন-টা থেকে অনলাইন টিউশন ক্লাস শুরু হয়।

হঠাৎ তার মুখের ওপর যেন কেউ ঠান্ডা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। চমকে তাকায় তান। তার মাথার দিক থেকে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা একটি মাথা। নাইট বাল্‌বের হালকা আলোয় সেই সাদা মুখের ঠোঁটের মধ্যে থেকে একটি হাসি ফুটে আছে। একটা চোখের ভেতরে দুটি মণি, অন্য চোখ চুলে ঢাকা। কী বিশ্রী আঁশটে গন্ধ লাগে নাকে। কিলবিলে কয়েকটা আঙুল তার কপালের ওপরের চুলগুলিকে খামচে ধরে। মুহূর্তে তানের হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হতে চায়। প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে তান।

কুশল লাফিয়ে উঠে বড়ো লাইট জ্বালিয়ে দেয়। তান উঠে বসে দুই হাঁটু জড়ো করে তার মধ্যে মাথা গুঁজে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। পাশের ঘর থেকে তাথই দৌড়ে আসে।

"ভাই, এই ভাই, এমন চিৎকার করলি কেন বাবু? তান, লুক অ্যাট মি।" বলে ভাইকে ধরে ঝাঁকুনি দেয় তাথই।

দিদির হাতের জাদুর স্পর্শ পেয়ে তান দিদিকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বলে, সে কী দেখেছে। শুনে কুশল তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

"ফালতু কিছু হরর মুভি আর ওয়েব সিরিজ দেখে দেখে

এই জেনারেশনটা গোল্লায় গেছে। দূর হ এখান থেকে। আমাকে সকালে উঠে গুষ্টির টাকার জোগান দিতে দশ ঘণ্টা ল্যাপটপে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। রাতে ঘুমোতে দিবি না আমাকে তা-ই না? তোরা তো চাকরি পাবি না। ফ্যা ফ্যা করে রাস্তায় ঘুরবি।"

"ব্যাস বাবা। তান বাজে কথা বলার ছেলে নয়। ওকে অবিশ্বাস করছ? খুব পালটে গেছ তুমি, বাবা। ছি।" ভাইকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কাছে নিয়ে যায় তাথই। মেয়ের তাচ্ছিল্য নিভে-আসা আগুনে যেন ঘি ঢেলে দেয়।

পাপিয়া বিছানায় বসে ছিল। ছেলের বিভ্রান্ত আতঙ্কে ভাসা মুখ দেখে তাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে। পাশের ঘরে বসে কুশল বিশ্রীভাবে চিৎকার করছে।

তাথই ফোন হাতে নিয়ে দৌড়ে যায়। হুমকি দিয়ে বলে, "বাবা থামো। না হলে পিসিকে ফোন করতে বাধ্য হব।" সপাটে জীবনে প্রথমবার মেয়ের গালে একটা চড় মারে কুশল। তাথই ছিটকে সামনে থেকে সরে যায়। গালের চেয়েও তার মনে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কান্না চেপে তাথই ছাতের দরজার চাবি নিয়ে সিঁড়ির আলো জ্বেলে ছাতে যায়। একটা মিশকালো কষ্টের ঢেউ তার মনকে ফালাফালা করে দেয়। ছাতে উঠে একটু সামলে অনিকে ফোন করে।

অনির ঘুম ভেঙে গেছে। তাথই এত রাতে ফোন করেছে? এখন তো পাপিয়া আন্টি ওর পাশে এসে থাকেন রাত্রে। তাহলে? ফোন ধরে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় তাথই কান্নায় ভেঙে পড়ে।

"কী বলছিস, কিছু বুঝতে পারছি না। কেউ তোর পাশে নেই?"

"না। ওরা সবাই নীচে। আমি ছাতে।" ফুঁপিয়ে বলে তাথই।

"ওহ্ নো! এত রাতে একা ছাতে... এক্ষুনি নীচে নেমে যা।" বলতে বলতে ঘরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসে অনি। তারপর ডানদিকে নীচের দিকে তাকাতেই তার শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়।

তাথইয়ের ঠিক পেছনেই আর-একটি সমবয়সি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। যেন তাথইয়ের পেছনে আর-একটি তাথই। দুজনেই তার ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে। শুধু সামনের জন কাঁদছে আর পেছনের জনের ফ্যাকাশে সাদা মুখে নিষ্ঠুর হাসি।

"অনি, বাবা আমায় মেরেছে।" কেঁদে উঠে বলে তাথই। পেছনের তাথই ক্রমশ যেন লিকলিকে দু-হাত উঁচু করে বাঁকা আঙুল দিয়ে তাথইয়ের গলা টিপে ধরতে যাচ্ছে।

"তুই নীচে নেমে ফোন কর। এখুনি নীচে পালা তাথই। পালা।" উৎকণ্ঠায় চেঁচিয়ে ফেলে অনি।

"পালাব? কেন?" তাথই পেছনে ফিরে কিছুই দেখতে পায় না। তবে তার হঠাৎ খুব শীত করে ওঠে। গা-টা কেমন শিউরে ওঠে। একটু ভয় পায় সে। একটু আগেই ভাই যা দেখেছে, সেরকম যদি কিছু সামনে এসে দাঁড়ায়! তাড়াতাড়ি সে নীচে নেমে যায়।

অনির মা পেছন থেকে এসে ছেলের কাঁধে হাত রাখেন। "কী হয়েছে, বাবা? কাকে কোথায় যেতে বলছিস?"

মা-কে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের ভয়জনিত উত্তেজনা কমাতে চেষ্টা করে অনি।

"এ কী! তাথই এত রাত্রে ছাতে কেন? তুই কি ওকে নীচে নামতে বলছিলি?"

অনি চমকে উঠে আবার তাথইদের ছাতের দিকে তাকায়। সেই মূর্তিটি আবার দেখা যাচ্ছে। একটু পিছিয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, দৃষ্টি অন্যদিকে। অনি সংক্ষেপে যা যা দেখেছে, মায়ের কাছে খুলে বলে।

"কী বলছিস! ওটা তাথই নয়! যাঃ। ভয় দেখাস না আমাকে।"

এর মধ্যে হঠাৎ পুরো পাড়া লোডশেডিং-এ ডুবে যায়। অনি মা-কে ধরে ঘরে ঢুকে ব্যালকনির দিকের দরজা বন্ধ করে দেয়। দুটি মোবাইলের টর্চ জ্বেলে আতঙ্কিত মা আর ছেলে চুপচাপ বসে থাকে।

পরের দিন সব শুনে সুদীপ বলেন, "এ তো বেশ বিপদের কথা। আমি কিন্তু আত্মা, পরলোক এসব মানি। আমাদের অফিসের বড়োবাবু মন্দার সেনদা এসব নিয়ে চর্চা করেন। উনি একবার সামন্তদার কসবার নতুন ভাড়াবাড়িতে গিয়ে আমার সামনেই বলেছিলেন, ওখানে কালো ছায়ামতো কিছু আছে। মানে কোনো দুষ্ট আত্মা আছে। শুনে আমরা খুব হেসেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন বাদেই সামন্তদা বাড়ি পালটে একটা ছোটো ফ্ল্যাটে চলে গেল। বলেছিল, সবাই কী সব দেখতে পাচ্ছে। বাড়ির রান্না-করা খাবার পচে যাচ্ছে। ফ্রিজে রাখা মাছ পচে যাচ্ছে আর বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে। ওঁর স্ত্রী আর ওই বাড়িতে থাকতে রাজি হননি। ভাবছি, সেনদাকে ডাকব। একটু দূরেই ওঁর বাড়ি। উনি সাইকেলে চলে আসতে পারবেন। সেনদার হোমিয়োপ্যাথি ডিপ্লোমা করা আছে। বলতে পারবেন, রুগি দেখতে বেরিয়েছেন।"

"ঠিক আছে। সন্ধ্যায় ওঁকে কুশলদাদের বাড়িতে নিয়ে যাও। দ্যাখো কী হয়।" অনির মা বুদ্ধি দেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বিরসবদনে সোফার একদিকে বসে কুশলসংবাদ শুনছিল। সোফার অন্য প্রান্তে তাথই বসে ছিল। তার হাতে একটা গল্পের বই। বাড়িতে কেউ কুশলের সঙ্গে কথা বলে না এবং তা নিয়ে কুশলের কিছু যায় আসে না।

তান ডাইনিং টেবিলে বসে মা-কে আলুর খোসা ছাড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করছিল। মা রাতে আলুর দম আর পরোটা করবেন। তিনি ময়দা মেখে রাখছেন।

"এই, তোদের পড়াশোনা নেই? যা, গিয়ে পড়তে বোস। রাতের খাবারটা একটু মন দিয়ে বানিয়ো। মুখে দেওয়া যায় না এমন রান্না করো আজকাল। তান, টিভি বন্ধ করে দে।" বিষ ঝরে পড়ে কুশলের গলায়।

তান গম্ভীর মুখে মায়ের দিকে তাকায়। পাপিয়া চোখের ইশারায় তাকে শান্ত থাকতে বলে। তান এবার উঠে দাঁড়িয়ে টিভি-র দিকে এগিয়ে যায় এবং টিভি বন্ধ করে দেয়। এরপরই সে বন্ধ টিভি-র কালো কাচের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। সোফার দু-প্রান্তে বসা বাবা আর দিদির মাঝখানে এলোচুলে কে বসে আছে! মা তো ওদিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানো। সে তাড়াতাড়ি পেছনে ফিরে তাকায়। না, কেউ নেই দুজনের মধ্যে। আবার কালো স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে সাদা মুখের সেই মেয়েটি বসে, যার চোখ দুটিও সাদা। তান পড়ে যাওয়ার আগেই তাথই তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে।

কুশল সামনে এসে বকতে থাকে, "কী নাটক হচ্ছে এসব? রাতে চ্যাঁচায়, টিভি বন্ধ করতে গিয়ে পড়ে যায়। চলে যা এখান থেকে।"

পাপিয়া ছুটে আসে। "ওদের নিয়ে এবার আমরা অন্য কোথাও চলে যাব।" বলে ছেলেকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে যায়।

টিভি-র কাচের ওপর তখন সোফার ওপরে বসা এলোকেশী নিঃশব্দ হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। দৃশ্যটা হঠাৎ কুশলের চোখে পড়ে। তার সমস্ত চেতনার ওপর প্রচণ্ড জোরে যেন আঘাত করে কেউ। তৎক্ষণাৎ কুশল পেছনে ফিরে তাকায়। সোফা শূন্য। ঘরে কেউ নেই। কাচের ওপর পরিষ্কার এক অশরীরীর উপস্থিতি। অথচ পেছনে তাকালে সব স্বাভাবিক! দু-হাতে মাথা চেপে ধরে কুশল। কী যেন হচ্ছে বাড়িতে। তাহলে কি তান এই মূর্তি দেখতে পাচ্ছে! হা ঈশ্বর!

ডোর বেল বেজে ওঠে। টলতে টলতে গিয়ে দরজা খুলে দেয় কুশল। বড়োবাবু মন্দার সেনকে নিয়ে সুদীপ এসেছে। সুদীপকে দেখে কুশল তাকে জড়িয়ে ধরে।

"পুরোটা না হলেও কিছুটা আমি জানি, কুশল। এইজন্যই আমি সেনদাকে ডেকে এনেছি। সর, আমাদের ভেতরে যেতে দে।" বলে সুদীপ।

কিছুক্ষণ বসার ঘরে চুপ করে বসে সবার কাছ থেকে যে যা দেখেছে, তার বিবরণ শুনতে থাকেন মন্দারবাবু।

"শোনো, তুমি যাঁর কাছ থেকে বাড়িটি কিনেছ, তাঁকে ফোন করে প্রথম মালিকের ফোন নাম্বার বা যোগাযোগ করার ঠিকানা জেনে নাও। এটা খুব জরুরি", বলেন মন্দারবাবু।

"শুভ্র চৌধুরী এখন ছেলের কাছে বেঙ্গালুরুতে থাকেন। আমি কল করছি", কুশল বলে।

"হ্যাঁ কুশল, কেমন আছ বলো।" প্রাথমিক আলাপ সম্ভাষণ সেরে শুভ্রবাবু বাড়ির প্রথম মালিক প্রশান্ত দত্তর একটি ল্যান্ডলাইন নম্বর দিলেন। সঙ্গে ঠিকানাও দিলেন।

"ল্যান্ডলাইন এখনও আছে কি না কে জানে। দ্যাখো লাক ট্রাই করে।" বলেন মন্দারবাবু।

ভাগ্য ভালো ছিল। প্রথমবারের চেষ্টাতেই একজন মহিলা ফোন ধরলেন। কুশল বিস্তারিতভাবে নিজের পরিচয় এবং কোথা থেকে ফোন নাম্বার পেয়েছে জানায়।

মহিলা বলেন, "আমি প্রশান্ত দত্তর মেয়ে প্রমীলা বলছি। আমার এটাই আশ্চর্য লাগছে, আপনারা ওই বাড়িতে এখনও আছেন কী করে? ওই বাড়িতে যা যা ঘটেছিল, সব আমি বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি।"

"আমার বড়ো বিপদ। আপনার বাবার সঙ্গে কথা বললে আমি হয়তো কিছু তথ্য পাব, যেটা আমার কাজে লাগবে।" বিনীতভাবে বলে কুশল।

"বাবা একটু অসুস্থ। তবে আমি ওঁর একটা ডায়েরির কিছু অংশ আপনাকে পাঠাচ্ছি ছবি তুলে। আপনার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ওই পৃষ্ঠাগুলিতে পেয়ে যাবেন। আপনার এই নাম্বারে হোয়াট্সঅ্যাপ আছে তো? আমি মিনিট দশেক বাদেই পাঠাচ্ছি।" ফোন কেটে দেন প্রমীলা।

একটু বাদেই এক-এক করে ডায়েরির পাতার ছবি ঢুকতে শুরু করে। ল্যাপটপে পাতাগুলি খুলে সবাই গোল হয়ে বসে নিঃশব্দে পড়তে শুরু করে—

৩০ মে, ২০১৫

আজ একসঙ্গে অনেকগুলো কথা লিখব বলে বসলাম। এটা আমার দিনপঞ্জি নয়, এটা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা।

রানাঘাট শহরে আমাদের আদিনিবাস। দু-জায়গায় দুটি জামাকাপড়ের দোকান।

আমি বাবার একমাত্র ছেলে। কাকাবাবুর তিন ছেলে। কাকাবাবু চান সম্পত্তি ভাগ করে নিতে। চার ভাই সমান ভাগ পাবে। এতে আমার বাবা বিরক্ত হন। কারণ নিয়মমতো তাঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করা উচিত। এই নিয়ে রোজ ঝামেলা শুরু হয়। কাকাবাবু অতি লোভী মানুষ। কাকিমার অকালমৃত্যুর পর থেকে তিনি প্রেতচর্চা করতেন। আজ তারাপীঠ, কাল কামাখ্যা ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর ছেলেরা ছিল আরও বেশি লোভী।

আমি বাবাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে, আমাদের ভাগে যা পড়বে তা-ই নিয়ে নাও। আমি ব্যাবসা ঠিকই দাঁড় করিয়ে দেব। ভাগ্য বিরূপ থাকলে যা যা ঘটে তা-ই ঘটে চলল। বাবা একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে মারা গেলেন। তাঁর হার্ট খারাপ ছিল ঠিকই; কিন্তু তাঁর মৃতদেহ কেমন নীল হয়ে ছিল। আমার মাথায় অন্য কিছুই ঢোকেনি; কিন্তু আজ জানি, সেই মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। বাড়ির ডাক্তার এলেন। হার্ট বিকল হয়ে মারা গেছেন বাবা—এটাই সার্টিফিকেটে লিখলেন। তাড়াতাড়ি করে সৎকার হয়ে গেল আমার মামাবাড়ির লোক এসে পৌঁছোনোর আগেই।

কাকাবাবুর বড়োছেলের বিয়ে হল। বউদি পরমা সুন্দরী। কাকাবাবুর হুকুম হল, আমার বাবা-মায়ের বড়ো শোবার ঘরটি নববধূর জন্য ছেড়ে দিতে হবে। মা প্রথমবার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত ভালো স্মৃতি ওই ঘরে। বাবার সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের গন্ধ তখনও ঘরের মধ্যে রয়ে গেছে।

পারিবারিক ঝগড়া এত বিশ্রীভাবে বাড়তে শুরু করল যে আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। মায়ের বারণ সত্ত্বেও ছোটো দোকানটি এবং বাড়ির একদিক নিয়ে বাকি সব ওদের নামে সই করে দিলাম। মাঝখানে পাঁচিল তুলে দিলাম।

ব্যাবসা ছিল আমার রক্তে। আমার কোনো বদনেশা ছিল না। মা-কে বললাম আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে। দু-বছর বাদে কঠোর পরিশ্রম করে ব্যাবসা দাঁড় করিয়ে দিলাম। আমার দোকানে তিনজন কর্মচারী রাখতে হল। আর বড়ো দোকানের মধ্যে কাকাবাবুর ছেলেরা মদ্যপান করে বংশের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিল।

বড়োবউদির সম্পর্কে এক বোন ওই বাড়িতে আশ্রিতা হয়ে এসেছে শুনলাম। তাকে নিয়ে কিছু বিশ্রী কথাও রটেছিল।

মা আমার বিয়ে দিলেন। অনুশ্রী ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। সংসারে আবার শ্রী ফিরল। বছর দেড়েক বাদে আমার কন্যা জন্মাল। মা শখ মিটিয়ে বড়ো করে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করলেন। কাকাবাবুর পরিবারের সদস্যরা এল। তাঁদের দীর্ঘশ্বাস যেন চারপাশে অকল্যাণ নিয়ে এল।

এরপরেই শুনলাম, কাকাবাবু তীর্থে গেছেন। একদিন বাদেই বড়োবউদির সেই বোন নিরুদ্দেশ হল। কিছুদিন থানাপুলিশ, তদন্ত চলল। আমি সাতে-পাঁচে থাকি না। হঠাৎ আমাদের বাড়িতে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। রাতে বাসনপত্র, মশলার কৌটো ধুপধাপ শব্দে পড়তে লাগল। বন্ধ দরজা খুলে যায়। খোলা জানালা বন্ধ হয়ে যায়। ভয় পেয়ে মা অসুস্থ হলেন। সেরা ডাক্তার দেখিয়েও কিছু সুফল না পেয়ে একদিন ওঁকে কলকাতা আনার সমস্ত বন্দোবস্ত করে বাড়ি ফিরে দেখলাম, মা না-ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন।

ব্যাবসা পড়তে লাগল। আমি যেন সবসময় একটা দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে চলেছি। একদিন অনুশ্রী দ্যাখে, মেয়ের দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়েছে এক আবছা নারীমূর্তি। ভয়ে বিবশ হয়ে অনুশ্রী মেয়েসহ কৃষ্ণনগরে বাপের বাড়িতে চলে গেল। এর কয়েক মাস বাদে একদিন দোকানে আগুন লাগল। ভেঙে খানখান হয়ে গেলাম। এত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। দোকান বিক্রি করে এবং ইনশিয়োরেন্স থেকে যা টাকা পেলাম, তার কিছুটা ব্যাংকে ফিক্সড্ করে বাকিটা দিয়ে ছোটো একটা বাড়ি করলাম কলকাতায়। বাড়িতে তালা দিয়ে এসেছিলাম। ভারী ভারী কিছু আসবাবপত্র ছাড়া সবই সঙ্গে নিয়ে এলাম।

গৃহপ্রবেশ করলাম। দু-দিন বাদে কাকাবাবু এলেন। আমরা চলে এসেছি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বাড়িটা ওঁর কাছে বেচে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। একটা কলা গাছ ও কিছু জবার ডাল সঙ্গে এনেছিলেন। সেগুলো পুঁতে দিয়ে গেলেন। একরাত থেকে পরের দিন ভোরে চলে গেলেন।

এর পরের দিনগুলি আমি ভাবতে চাই না। খুব সাধারণভাবে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম; কিন্তু এই বাড়িতেও শুরু হল সেই একই অদৃশ্য শত্রুতা। একই রকম আওয়াজ, রাতের বেলা কারও কান্নার শব্দ। আমার মেয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। হাসে। আমি তখন হাল-ছেঁড়া নৌকার মতো ভাসছি। কোনো শান্তি কি পাব না জীবনে!

বারাসতের এক বন্ধুর বাড়ির দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে এলাম। নিজের বাড়ি আমার ভাগ্যে নেই। মেয়েকে মানুষ করার কাজটি সুসম্পন্ন করতেই হবে।

একটা বেসরকারি ফার্মে চাকরির সুযোগ পেলাম। অনুশ্রী

প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, রানাঘাটের বাড়ির কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না। মেনে নিলাম। মনে মনে জানতাম, ওদের দীর্ঘশ্বাসের ফল ভুগছি সারাজীবন ধরে।

এর পরের কয়েকটি বছর আনন্দে নিরুপদ্রবে কাটালাম। অপয়া বাড়িটা বিক্রি করলাম। একটু একটু করে উঠে দাঁড়ালাম। অনুশ্রী বলল, আবার দোকান খুলতে হবে। মেয়ে পড়াশোনায় ভালো, সে যেন ইচ্ছামতো পড়ার সুযোগ পায়। কথাটা মনে ধরল। মনে পড়ল, আমার পৈতৃক বাড়িটা তো তালাবন্ধ হয়ে পড়েই আছে। এবার ওটা বিক্রি করা উচিত।

একা গেলাম। স্টেশনে নেমে কচুরি খেয়ে বাড়ি গেলাম। চাবি খুলে মায়ের ঘরে ঢুকে খুব কাঁদলাম। এরপর কাকাবাবুর বাড়ি গেলাম। নীচের দরজা খোলাই ছিল। অবাক হয়ে ভাবলাম, চারিদিক এরকম নিস্তব্ধ কেন? রংবিহীন দোতলার ফাটলে বট গাছ বেরিয়েছে! তবে ওপরে একটা গামছা ঝুলছে।

ভেতরে ঢুকে উঠোনে দাঁড়ালাম। কী বিবর্ণ চারিপাশ। একজন বৃদ্ধ পরিচারক হরনাথদা আমাকে চিনতে পেরে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, কাকাবাবুর দুই ছেলে মারা গেছেন। তাঁদের স্ত্রী-রা সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। ছোটোছেলে হলদিয়ায় চাকরি করে। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে বহু বছর আগে।

কাকাবাবু তাঁর বিছানায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শোয়া। আমি প্রণাম করতে গেলে চিৎকার করে উঠলেন, "আমায় প্রণাম করিস না খোকা। আমি তোর জীবন নষ্ট করেছি। তোর জীবনে ঘটা প্রতিটি খারাপ ঘটনার জন্য আমি দায়ী। আমি বিষাক্ত সন্দেশ খাইয়ে তোর বাবাকে মেরেছি। দাদার ওপর ছিল আমার প্রচণ্ড ঈর্ষা।"

"থাক কাকাবাবু। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।" তীব্র আঘাতে আমি উঠে পড়লাম।

"না না খোকা, বলতে দে। হাতজোড় করছি। তোকে বলে যাব বলেই যে বেঁচে আছি, বাবা। তোর ব্যাবসায় উন্নতি আর আমাদের পতন আমি সহ্য করতে পারলাম না। কালাজাদু করে এমন এক তান্ত্রিককে ধরে বললাম, তোদের পরিবারকে ধনেপ্রাণে শেষ করতে হবে। সে কাজটা করে দিলে শুধু তাকে একটি সঙ্গিনী জোগাড় করে দিতে হবে—এটাই শর্ত ছিল। বড়োবউমার বোন করবীকে অনেক টাকা দিয়ে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রাজি করিয়ে সব ব্যবস্থা করে নিজে আগের দিন চলে গেলাম। তান্ত্রিক কালাজাদুর জন্যে লোহার পেরেক, কালো ডাল, ডিম, ধুতরা ফুল, জাফরান, ময়ূরের পাখনা, আখ, কাকের পাখনা, শকুনের চোখ, প্যাঁচার নখ ও রক্ত, আরও কত কী চাইল। সব জোগাড় করে দিলাম। পরের দিন মেয়েটি পৌঁছোল আর আমি আমার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি পেয়ে চলে এলাম। রেখে এলাম তোদের বাড়িতে। ফলস্বরূপ বউদি চলে গেলেন, তোর ব্যাবসা শেষ হয়ে গেল। আমার ছেলেরা সব দুর্যোধনের মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তোরা বাড়ি ছাড়লি।

"আবার গেলাম তান্ত্রিকের কাছে। সে বলল, করবীকে সে তার বিশেষ কাজে লাগিয়েছে। প্রচুর টাকা দিয়ে সেই প্রেতিনীকেই তোদের বাড়ি গিয়ে মাটিতে পুঁতে এলাম। তোরা তারপর কোথায় গেলি, আর খোঁজ পাইনি।

"কিন্তু যে অপদেবতা স্বজনকে শেষ করতে নিজে হাতে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম, সে পাঁচিলের সীমানা মানল না। একে একে আমার ছেলেরা চলে গেল। ছোটোছেলেকে দূরে পাঠিয়ে দিলাম। নিজে আজ আট বছর শয্যাশায়ী। সবাই সেই বিদেহী আত্মার ভয়ে বাড়ি ছেড়েছে। তুই কিন্তু শেষ ট্রেন ধরে আজকেই ফিরে যাবি। এ বাড়িতে থাকিস না। চলে যা, চলে যা। আর পারলে আমাকে ক্ষমা করিস বাবা। ক্ষমা করিস।"

চলে এসেছিলাম। ইচ্ছা হয়েছিল, পুলিশে যাই। কিন্তু মরাকে মেরে কী লাভ! এভাবে পাপের শাস্তি কজন পায়? মাথা ঠান্ডা হলে কিছুদিন পরে হলদিয়ায় ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। মাসখানেক বাদে কাকাবাবুর মৃত্যুর পর পুরো বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যাঁদের জন্য, তাঁদের শোচনীয় পরিণতি দেখে পরে কষ্টই পেয়েছিলাম।

সবাই ডায়েরির পাতাগুলি পড়ে চুপ করে থাকে। মন্দার সেন উঠে দাঁড়িয়ে একটা টর্চ চেয়ে নেন।

"সবাই বাড়ির বাইরে চলে যাও। তোমাদের মেইন সুইচ কোথায় আছে, দেখিয়ে দাও। আমি অফ করে রাখব। আলো না জ্বলে ওঠা অবধি কেউ আসবে না।"

মন্দারবাবুর কথামতো সবাই সুদীপবাবুর বাড়ি চলে যান। ছেলের ঘরের ব্যালকনিতে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকেন।

বাড়ির মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে টর্চ জ্বেলে ও মাঝে মাঝে নিভিয়ে এ ঘর-ও ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর—সব জায়গা ঘুরতে থাকেন মন্দারবাবু। নাঃ। কোনো সিগন্যাল দিচ্ছে না কেউ। আবার কুশলদের বেডরুমে ঢোকেন তিনি। হ্যাঁ, এই ঘরটা একটু বেশি ঠান্ডা। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে টর্চ নিভিয়ে

চুপ করে বসে থাকেন খাটে।

সময় চলে যায়। একসময় একটু বোধহয় তন্দ্রা চলে এসেছিল। হালকা একটা শব্দে ঘুম-ঘুম ভাব চটে গিয়ে মন্দারবাবু সোজা হয়ে বসেন। দরজাটা খুলে গেছে নিঃশব্দে। উঠে দাঁড়ান তিনি। একটা ছায়ামূর্তি দরজার বাইরে দাঁড়ানো। মহিলার অবয়ব। প্রচুর চুল তার মাথায়।

"করবী! এসেছ?" বলেন মন্দার।

"চলে যা। যাঃ", বীভৎস খনখনে গলায় বলে ওঠে সে। তারপরেই প্রচণ্ড জোরে ছুড়ে মারে একটা পেপারওয়েট। মাথা না সরালে আজ মাথাটা ফেটে যেতে পারত। মন্দারবাবু দৌড়ে গিয়ে মেইন সুইচ অন করে দেন। সাদা মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। সারা বাড়ির আলো জ্বলে উঠেছে দেখে সবাই বাড়ি ফিরে আসে।

"করবী এসেছিল। কিন্তু সে ক্ষিপ্ত হিংস্র প্রেতিনী। সে আমাকে আক্রমণ করে বসল। আমার মনে হয়, সেই কালাজাদু-করা তান্ত্রিক ওকে মারাত্মক কষ্ট দিয়ে মেরেছিল। এখন ঈশ্বর ভরসা। দেখি কী হয়।"

"আমার পরিবারকে বাঁচান দাদা। এই লকডাউনে আমি নতুন কোনো জায়গায় যে উঠে যাব, সে উপায় তো নেই। আমাদের বাঁচান।" কুশলের চোখে জল আসে।

"আমি সুদীপের কাছে যা শুনেছি, তাতে কাজে লাগতে পারে ভেবে কিছু জিনিস এনেছি। বউমা, এই জায়গাটা একটু ঝাঁট দিয়ে মুছে দাও। আমি রাত জেগে কাজ করব। তোমরা বাড়ির বাইরে আসবে না। দেখি, কিছু করতে পারি কি না। জয় গুরু।"

রাত বারোটার পর পেছনের ফাঁকা একফালি জমিতে কালো কাপড় পরে হাতে-পায়ে আলতা ঢেলে কপালে সিঁদুর মেখে একটি বড়ো পিঁড়ির ওপর বসলেন মন্দারবাবু। এটা তাঁর পরিবারের প্রাচীন পূজাপদ্ধতি। অতি গোপনে তাঁদের পরিবারে এভাবে শিব ও শক্তিসাধনা হত। পরিবারের প্রতিটি পুরুষ জীবনে একবার এইভাবে পুজোয় বসতে পারে নিশ্চিত ফললাভের আশায়। আজ এই পরিবারটির ওপর এক অশুভ শক্তির প্রভাব পড়েছে। তাই তিনি জীবনে প্রথম ও শেষবারের মতো এই পুজোয় বসছেন। নিজের লাভের জন্য এই পূজা করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

চারপাশে একটি বড়ো গোল বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে সাইকেলে বাঁধা বস্তাটি খুলে পূজার সামগ্রী বার করে সাজিয়ে নিলেন সাধক। একটি ছোটো সিঁদুর-লেপা অতি প্রাচীন পিতলের ঘট সামনে রেখে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে পূজা শুরু হল। ঘি দুধ মধু চন্দন পাটকাঠি যজ্ঞের কাঠ, আরও কত কী পূজাসামগ্রী সাজিয়ে বসলেন সাধক। বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমার সঙ্গে শোনা গেল বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ। যজ্ঞের আগুন থেকে উঠে-আসা অপূর্ব এক পবিত্র গন্ধে চারপাশ ভরে উঠল।

বাড়ির মধ্যে দরজা-জানালায় যেন ঝড় বইতে লাগল। সিঁড়িঘরের দরজা একবার সশব্দে খুলে আবার সশব্দে বন্ধ হতে লাগল। ছেলেমেয়েকে আগলে ধরে খাটের ওপর বসে থাকল পাপিয়া। সবার গলায় একটি একমুখী রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে দিয়েছেন মন্দারবাবু। সুদীপরা মন্দার সেনের নির্দেশে বাড়ি ফিরে গেছে। এই একটা বন্ধন-করা ঘরের বাইরে কোনোমতেই যাওয়া যাবে না। মন্দার সেন যদি মারাও যান তা-ও কেউ দরজা খুলে বের হবে না। কথাগুলো পইপই করে বুঝিয়ে দিয়েছেন মন্দার।

ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে ডাইনিং স্পেসে ফুলদানিটা ভেঙে পড়ল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কেউ বিড়বিড় করে কিছু বলে চলেছে। রান্নাঘরে ঝনঝন করে বাসন পড়ছে। ছাতে কেউ কাঁদছে। ধুপধাপ শব্দে দৌড়োচ্ছে। আবার সব চুপ হয়ে গেল। বাইরে গমগম করে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে।

এর কিছুক্ষণ বাদে ওদের ঘরের দরজায় এসে কাতর গলায় মন্দার সেন বলেন, "কুশল, দরজা খুলে দাও। আমাকে মেরে ফেলল। জল দাও, আমাকে একটু জল দাও।" কুশল লাফিয়ে উঠে দরজা খুলতে যায়। তাথই দৌড়ে গিয়ে বাবার হাত ধরে টেনে এনে ফিসফিসিয়ে বলে, "ট্র্যাপ বাবা, ট্র্যাপ। চুপ করে থাকো।"

ধীরে ধীরে দরজার বাইরের গলাটা পালটে যেতে থাকে। কাকুতিমিনতির বদলে কর্কশভাবে চিৎকার করে কেউ, "খুলে দে দরজা। খোল। সবাইকে আমি পিষে মারব। এটা আমার বাড়ি। কাউকে থাকতে দেব না।"

ঘণ্টাখানেক ধ্যানে থাকার পর চোখ খুলে তাকিয়ে শান্ত স্বরে ডাকেন সাধক, "করবীইইই... এদিকে আয়।"

সাদা ধোঁয়ার মতো এক নারীমূর্তি দূরের অন্ধকারে এসে দাঁড়ায়।

"তোর আর এ বাড়িতে থাকা হবে না। চলে যা তুই।"

ভয়ংকর একটা ফ্যাসফেসে ক্রুদ্ধ ধাতব গলা ভেসে আসে—"আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি। ওই লোকটা মিথ্যা বলে নিয়ে গেল। একটা নরখাদক তান্ত্রিক আমাকে চরম অপমান করে নৃশংসভাবে মারল। আমি কাউকে ছাড়ব না। আমি ধ্বংস করতে জন্মেছি, ধ্বংসই করব।" বলে পাঁচিলের পাশে বড়ো জামরুল গাছটার একটা ডাল মড়মড় শব্দে ভেঙে

ফেলল। সেই বিশাল ডাল ছুড়ে মারল পূজার জায়গায়। কিন্তু সাধকের আঁকা বৃত্তের বাইরে এসে অদৃশ্য কিছুতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় বিশাল ডালটি।

"করবী, তোমার ওপর হওয়া অত্যাচারের জন্য এরা কেউ দায়ী নয়। তুমি যাও। কথা দিলাম, তোমার আত্মার চিরশান্তির ব্যবস্থা করব আমি।" শান্ত সংযত স্বরে বলেন সাধক।

খিলখিল হাসিতে গাছের গায়ে গড়িয়ে পড়ে প্রেতিনী। তারপর আবার বাড়িতে ঢুকে যায়।

এভাবে অনুরোধ-উপরোধে কাজ হবে না বুঝে সাধক উঠে দাঁড়িয়ে ছোটো থেকে নিখুঁতভাবে শেখা ত্রিকোণাসন যোগমুদ্রায় নিবিষ্টমনে গুপ্তমন্ত্র আওড়ে যান।

বাড়ির ভেতরে দাপিয়ে-বেড়ানো করবীর অতৃপ্ত আত্মা আবার ছুটে আসে। বিকট হাড়-হিম-করা শব্দে সে কাঁদে। তারপর মন্ত্রশক্তির জয় হয়। সূক্ষ্ম দেহে মাটির অতলে ঢুকে যায় করবী। যেখানে তার আধপোড়া হাড় পোঁতা আছে, তারও অনেক অনেক গভীরে। তার ওপরে আসার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেন সাধক।

ঠিক পাঁচটার সময় দীর্ঘ শাঁখের শব্দে পূজা শেষ হয়। এরপর উদাত্ত কণ্ঠে মন্দার সেন গান ধরেন, "রাই জাগো রাই জাগো শুকশারি বলে।"

এক কালরাত্রি পার করে নতুন ভোরের সূর্য যেন নতুন এক শান্ত জীবনের অঙ্গীকার নিয়ে আসে।

চায়ের কাপ হাতে মন্দার সেন বলেন, "ওই মাটির অতলে ওকে বন্দি করে দিলাম। ওর ওপরে ইট বিছানো আছে। পরে সিমেন্ট ঢেলে দিয়ো। তবে যদি এই বন্ধন ছিঁড়ে কোনোদিন ওই প্রেতাত্মা বাইরে বের হয়ে আসে, তখন ও হবে অপ্রতিরোধ্য। বাড়ি ছেড়ে তক্ষুনি চলে যেয়ো। তবে লকডাউন কাটলেই তোমাকে নিয়ে গয়ায় যাব। করবীকে মুক্তি দিতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

পাপিয়া এসে প্রণাম করে বলে, "আজ এখানেই দুটো ডাল-ভাত খেয়ে যান দাদা।"

"না না। এত সহজ না। লকডাউন উঠুক, একদিন বিরিয়ানি খাওয়াতে হবে। আজ বাড়ি ফিরে যেতেই হবে। আসি।" পূজার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে বস্তাটা আবার সাইকেলের পেছনে বেঁধে নিয়ে রওনা দেন ক্লান্ত মন্দার সেন।

রাশি রাশি কৃতজ্ঞতা নিয়ে একটি সদ্য বিপন্মুক্ত পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে। যত দূর দেখা যায়, নিঃস্বার্থ পরোপকারী সাধককে দেখতে থাকে।



নরকবলয়

সুপর্ণা নাথ



ঘুম ভাঙা আর জ্ঞান ফেরার মধ্যে ফারাক বোধহয় খুব বেশি হয় না। অনুভূতিটা অনেকটাই এক, আজ উপলব্ধি করলাম। তবে চারপাশে এতটাই অন্ধকার যে চোখ খুলেছি না বন্ধ করে আছি, সেটা বোঝা দায়। তবে বিনা চেষ্টায় আমার সব কয়টি ইন্দ্রিয় একযোগে আমাকে বুঝিয়ে দিল, আমি খুব স্যাঁতসেঁতে পিচ্ছিল গুমোট একটা পরিবেশে আছি। আর সব থেকে প্রকট যে অনুভূতি, সেটা হল বিশ্রী একটা গুমোট গন্ধ! গন্ধের ধরনটা অঘ্রাতপূর্ব। কয়েক সেকেন্ড সময় নিলাম ঘেঁটে-যাওয়া চিন্তাভাবনাগুলো একত্রিত করতে। এই অদ্ভুত পরিবেশে আসার পূর্বের স্মৃতিগুলো মনে মনে হাতড়ে নিলাম খানিক।

আর তখনই আচমকাই মাথায় এল, ''আরেহ্, দিব্য... দেবা কোথায়? আমিই বা কোথায়? এটা কোন জায়গা? আমি এখানে কেন?''

কথাগুলো মনে পড়তেই সেই বীভৎস বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাটা আরও একবার শিরদাঁড়া বেয়ে মাকড়ের মতো নেমে গেল।

শেষ যেটা মনে পড়ছিল, আমি আর দেবা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছিলাম। ও একটু পিছিয়ে পড়েছিল। ওর স্বর কানে আসছিল শুধু...

''রথী দৌড়ো, থামিস না... তোর কোনো চিন্তা নেই রে... আমি আছি... দৌড়ো।''

শেষের দিকে ওর পায়ের শব্দও পাচ্ছিলাম না শুকনো পাতার ওপরে। তবে ওর কথাগুলোয় না জানি কী একটা আশ্বাসের সুর ছিল, আমি থামিনি।

আসলে জীবনে এমন পরিস্থিতিতে কখনও পড়িনি তাই আমার মাথাও বোধহয় তাৎক্ষণিক অবশ্যকর্তব্যটা ঠিক কী, নির্ধারণ করতে পারছিল না। আমি শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে জঙ্গলের ভেতর দৌড়োচ্ছিলাম। পূর্ণিমা বোধহয় কয়েকদিন আগে গেছে বা পরে আসবে তাই ভগ্নস্বাস্থ্য চাঁদের আবছায়া আলো গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে এসে একটা ঘোলাটে আঁধার তৈরি করেছে, চোখ সইয়ে নিতে পারলে পথ দেখা যায়। সেই আলোর ভরসাটুকুতেই আমি দৌড়োচ্ছি। কিন্তু হঠাৎই সেই আলোটুকুও নিভে গেল। চোখের সামনে শুধুই কালো! আর কিছু মনে নেই।

* * * * * * * * *

টেবিলের ওপর পা তুলে মনের সুখে সুখটান দিচ্ছিলাম, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে আবার প্লট খোলে না মাথায়। টুং করে নোটিফিকেশনের শব্দে ফোনটা হাতে তুলে নিলাম। একটা মেসেজ! দিব্যপ্রভ সেনগুপ্তর মেসেজ।

স্মৃতি হাতড়ে নামটা খুঁজে বের করলাম... আরেহ্ দিব্য! আমাদের দেবা!

দু-লাইন লেখা—"কী রে লেখক, কেমন আছিস? এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি তোর বাড়ি।"

দেবার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল গত সাত বছর আগে এক বইমেলায়, হঠাৎই। ময়নাগুড়ি ছেড়েছিলাম, আমার তখন আঠারো, তারপর সেই বইমেলায় দেবার সঙ্গে একবার মোটে দেখা। তা-ও খুব কম সময়ের জন্য। বেশি কথা হয়নি সেদিন। ফেসবুকেও পাইনি ওকে খুঁজে। কিন্তু ক্লাস ফাইভ থেকে বারো ক্লাস পর্যন্ত আমরা ছিলাম হরিহর আত্মা। আমি চলে আসি কলকাতায় পড়তে। শুনেছিলাম, ও চলে যাবে দেশের বাইরে। তারপর সময়ের স্রোতে আর জীবন-জীবিকার টানে বন্ধুত্বের সম্পর্কের ওপর পলি জমে।

আর সেই দেবা আজ আমার বাড়ি আসছে! ও ঠিকানা পেল কী করে?

অপ্রত্যাশিত আনন্দের অনুভূতিটা বেশ ভালোই লাগে। চট করে উঠে নিজেকে আর বাড়িটাকে একটু গুছিয়ে নিলাম। ফুড অ্যাপ থেকে কিছু খাবার অর্ডার করে চায়ের জলটা গ্যাসে বসাতে যাব, ঠিক তখনই দরজায় সুরেলা বেল বেজে উঠল।

দরজা খুলতেই সেই পুরোনো চকচকে হাসিমুখ, সময় আর বয়সের বালি এতটুকু মলিন করতে পারেনি ওকে।

"কী রে, চিনতে পারছিস তো নাকি?"

"হা হা হা... চিনব না মানে? কতদিন পর, কোথায় ছিলি? এফবি-ইনস্টাতেও তো পাইনি তোকে?"

"সব বলব, আগে একটু জল খাওয়া তো।"

দেবা সত্যি এতটুকু বদলায়নি, ঠিক আগের মতোই আছে। প্রায় দু-ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল আড্ডা দিতে দিতে।

জানলাম, দিল্লি থেকে মাসকম নিয়ে পড়াশোনার পর কিছুদিন এখানে চাকরি করে তারপর হায়ার স্টাডিজের জন্য ইউরোপ, সেখানেই পুনরায় চাকরি। সেই সূত্রে ওই মহাদেশের বিভিন্ন ঘাটের জল খেয়েছে।

"তা হঠাৎ এই গরিব দেশে প্রত্যাবর্তন। কেন ভাই?"

"পেটের টান বলতে পারিস।"

"বলিস কী ভাই, এই পোড়া দেশে পেটের টানে!"

"আসলে একটা প্রোজেক্ট করছি, নিজের উৎসাহেই বলতে পারিস... দাঁড় করাতে পারলে ভালো কোনো চ্যানেলে বেচে দেব, অনেকদিন তো অন্যের জন্য করলাম। এবার একটু নিজের জন্য..."

"তা কী প্রোজেক্ট?"

"বিভিন্ন হন্টেড প্লেস এক্সপ্লোর করা..."

আমি ওকে মাঝপথে থামিয়ে বললাম, "ভাই, তুই কোথায় থাকিস! আজকাল youtube খুললে দেখবি, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেপিলে এমন হাজারটা চ্যানেল খুলছে। ভূতের সংখ্যা বোধহয় এখন মানুষের থেকে বেশি, সবাই ভূত ধরছে ক্যামেরায়।"

"হুম, ঠিক... শুধু youtube কেন রে বড়ো বড়ো চ্যানেলও গোস্ট হান্টিং-এর ওপর কত্ত অনুষ্ঠান বানাচ্ছে..."

"হুম, দেন? তোরটা কীসে আলাদা?"

"গুড কোয়েশ্চেন। প্রথমত, আমি থাকব একদম একা, একটা নাইট ভিশন ক্যামেরা, বড়োজোর একটা গো প্রো, আর কোনো যন্ত্রপাতি থাকবে না, কেননা ভূতকে মিটারে মাপা যায় না, আর কর্মসূত্রে ওই বড়ো বড়ো গোস্ট হান্টিং-এর অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার কল্যাণে জানি, ওই অনুষ্ঠানগুলো পুরো মেড আপ।

"গুড লর্ড! বলিস কী! বানানো?"

"একদম, পুরো স্ক্রিপ্টেড..."

"তার মানে বলাই যায় যে ভূত বলে কিছু নেই, তা-ই তো?"

"দেখ রথী, এটাই আমার আগ্রহের জায়গা, আমি নিজে জানতে চাই যে, ভূত বলে কিছু আছে কি না? আমি মনে করি, এই পৃথিবীতে যদি পজিটিভ পাওয়ার থেকে থাকে, মানে ঈশ্বর, তাহলে তাকে ব্যালান্স করার জন্য কোনো না কোনো নেগেটিভ পাওয়ারও থাকবেই, তা-ই না? দিস ওয়ার্ল্ড ইজ অল অ্যাবাউট ব্যালান্সিং, এটা আমার ধারণা। আর সেখান থেকেই এই অনুষ্ঠানের আইডিয়া, বুঝলি?

"আর থাকলেও তার আসল অনুভূতিটা কী? ভূত মানেই বিকৃতদর্শন বা সাদা শাড়ি বা ঘাড় মটকে দেয়া অথবা পজেস করা... এই যে স্টিরিয়োটাইপটা তৈরি হয়েছে, তার সত্যতা কতটা? আর তা ছাড়া হয়তো নিজেকে একটু ঝালিয়ে নেয়া...!"

"হুম, বাট কী ঝালিয়ে নেয়া?"

"না... না, তেমন কিছু না।"

দেবাকে আমার খুব অচেনা লাগছে, কী একটা রহস্যে মোড়া যেন ও।

"ও.কে.। আমাকেও সঙ্গে নে, গল্পের জন্য দারুণ একটা প্লট পাব, প্লিজ না বলিস না..."

প্রথমে মোটেও রাজি না হলেও, অতিকষ্টে প্রায় হাতে-পায়ে ধরে শেষে রাজি করালাম। বলল, "তবে আমি যা বলব, সব শুনবি আর মানবি, রাজি?"

"রাজি।"

ডেস্টিনশন ঠিক হল বেগুনকোদর। ঠিক হল বলা ভুল। ওটা বোধহয় ঠিক করেই এসেছিল ও।

তখন অবশ্য বুঝিনি এই প্রোজেক্টের পেছনে ওর কতটা রিসার্চ আছে বা এই জায়গাটা বেছে নেওয়ার আসল কারণ কী।

* * * * * * * *

যখন বেগুনকোদর পৌঁছোলাম, তখন সূর্য মধ্যগগনে। অক্টোবরের শেষ তাই রোদটুকু চামড়া সয়ে নিচ্ছে। বাই কার এসেছি তাই সময় লেগেছে একটু বেশি। ক্যামেরা, টর্চ, ল্যাপটপ, অল্প কিছু খাবার ও জল আছে সঙ্গে, আর আছে দেবার এক খেরো খাতা, চামড়া বাঁধানো, আদ্যিকালের... সারাক্ষণ হয় কিছু লিখছে অথবা পড়ছে। বার দুই জিজ্ঞেস করেছিলাম, দেখলাম, দুবারই এড়িয়ে গেল।

জায়গাটা ফাঁকা, ভূতের জন্য না, ঠা ঠা দুপুর রোদের কারণে।

"এবার?"

"চল রথী, স্টেশনের ভেতরটা দেখে আসি..."

"এখনই? এখন তো দুপুর রে!"

"তোর কি ধারণা যে রাত না হলে ভূত বেরোয় না? আসলে অন্ধকার রহস্যে মোড়া, অন্ধকার মানেই অনেক অজানার খনি। আমাদের মনের কল্পনা, ইনসিকিউরিটি, ভয়—সবকিছু তাই ওই অন্ধকারকে ঘিরে। যদি মৃত্যুর পর আত্মা এ জগতে থেকেই যায় তাহলে সে দিনের বেলা কোথায় থাকে? বল?"

বুঝলাম অকাট্য যুক্তি।

গাড়ি থেকে নেমে পা-টা একটু সোজা করে নিলাম। আসার পথে কিনে-আনা স্যান্ডউইচ আর মিষ্টি উদরপুরে পাঠিয়ে পথে নামব ঠিক হল।

খেতে যাব, ঠিক তখনই পেছন থেকে একটা ডাক শুনে পিছু ফিরলাম।

"স্যাররা কি ভূত ধরতে?"

প্রশ্নের অধিকারীর মলিন ও কালির দাগ-লাগা চেক-কাটা জামা এবং প্রায় ক্ষয়ে-যাওয়া হাওয়াই চটি বলে দিচ্ছে, মানুষটি কোনো কলকারখানায় বা শ্রমসাধ্য কোনো কাজ করেন। তবে কথাবার্তা বেশ গোছানো।

দেবা খুব মন দিয়ে লোকটিকে দেখছিল, কিন্তু কী যে দেখছিল জানি না...!

দেবা আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে এখানে ভূত আছে? বলছেন? দেখেছেন নাকি?", হালকা কৌতুক মিশিয়ে বলল ও।

লোকটির বোধহয় সেটা খুব একটা ভালো লাগেনি। দেবার কথা না-শোনা র ভান করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, লোকে বলে, এখানে আছে। এতজন কি একসঙ্গে ভুল হতে পারে? জানি না, আমি দেখিনি।"

"ওহ্ আচ্ছা।"

"তবে ওই মাস্টারের কোয়ার্টারের দিকে যেতে পারেন, ওই কুয়োতেই তো মাস্টার আর ওর বউকে ফেলে মেরেছিল, ওদিকে সন্ধের মুখে গেলে দেখা পেতে পারেন..."

কথাটা বলতে বলতেই লোকটা তাড়াহুড়ো করে হাঁটা দিল।

ব্যাপারটা কী হল বুঝলাম না, দেবা হ্যাঁচকা টানে গাড়িতে ঢুকিয়ে নিল।

"কী রে! কী হল?"

চোখের ইশারায় দেখাল, পেছনদিক থেকে এক ভবঘুরে ফকির ধরনের মানুষ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে।

ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম, টিকিট কাউন্টার ঘুরে দেখলাম, দু-চারটে কুকুর ইতস্তত ঝিমোচ্ছে।

''চল, স্টেশন মাস্টারের বাড়ির দিকটা দেখে আসি...''

''হুম, যেতে তো হবেই রে রথী, ওখানে কিছু একটা তো...''

''স্টেশন মাস্টারের ভূত?'' খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করি।

''নট শিয়োর, তবে কিছু একটা তো...''

আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম, বুঝলাম না কিছুই।

তবে এভাবে বুঝতে হবে, সেটা বুঝতে পারিনি।

* * * * * * * * *

একটু আগে দেবার বলা কথাগুলো হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিতাম, দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু পারলাম কি?

স্টেশন মাস্টারের বাড়ির আশপাশ ঘুরতে ঘুরতে দেবা বলেছিল, ''জানি না তুই বিশ্বাস করবি কি না, তবে আই ক্যান স্মেল দেম, সাইকিক বলতে পারিস আবার ঠগবাজও বলতে পারিস... আমার মায়ের মামা ছোটোবেলায় আমার কুণ্ডলী দেখে বলেছিলেন, আমি নাকি অন্যরকম, কোনো বড়ো কাজের জন্য আমার জন্ম। তবে আমার বিজ্ঞানমনস্ক বাবা-মা সেসবে কান দেননি, বড়ো হয়ে আমিও না। তবে কাজের সূত্রে বিদেশে বিভিন্ন সাইকিক মানুষজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তার মধ্যে এক মেক্সিকান বুড়ি একবার বলেছিল পাপ পরিষ্কার করতে আমার জন্ম, বড়ো কাজ করতে আমার জন্ম।

''মানে?''

আমার প্রশ্নটা শুনে খানিক স্বগতোক্তির মতো ও বলল, ''সেই মানেটা তো আমিও খুঁজতে চাই। স্টেশনে দুপুরে দেখা লোকটার কথা মনে আছে? যে বলেছিল, এদিকে কিছু পেলেও...''

''হ্যাঁ, তো!''

''হি ওয়াজ় নট অ্যালাইভ!''

''কী বলছিস! ভরদুপুরে ভূত দেখলাম?''

''আমি তো আগেও বলেছি, দিনের আলোয় ভূত থাকে না—এটা একটা মিথ, প্ল্যাটফর্মে লোকটার কোনো ছায়া পড়ছিল না, খেয়াল করেছিলি, কেন বল তো? এনার্জির ছায়া পড়ে না। বাট চোখে দেখা যায়।''

''বোঝা...''

''দেয়ালের সামনে মোমবাতি জ্বেলে দেখবি, শিখাটা চোখে দেখতে পাব; কিন্তু দেয়ালে ছায়া পড়ে কি? কেননা ওটা এনার্জি... মেটেরিয়াল বা পার্টিক্‌ল না।

''আর ভবঘুরে লোকটা আসার পর পুনরায় মাথা ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখতে গিয়ে দেখলাম তার কোনো অস্তিত্বই নেই, অত কম সময়ে কেউ কি হারিয়ে যেতে পারে?''

''হুম...''

''ও আমাদের এদিকটা আসতে বলল, তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সেটাই খুঁজছি...''

মুখে না বললেও দেবার মানসিক সুস্থতা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। যত্তসব আজগুবি... চিন্তায় ছেদ পড়ে দেবার ডাকে, পায়ে পায়ে ও কখন জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছিল, খেয়ালই করিনি।

দৌড়ে ওদিকে যেতে গিয়েই মারাত্মক একটা বিকট গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল। দেবা উত্তেজিত গলায় প্রায় চেঁচিয়ে বলছে, ''আই ওয়াজ় রাইট!''

একটু আগেও আমি দেবার কথাগুলো বিশ্বাস করছিলাম না... কিন্তু চোখের সামনে জঙ্গলের ভেতর সকালে দেখা লোকটির বাসি মড়াটা দেখার পর আমি প্রকৃত অর্থেই বাক্‌রুদ্ধ!

সেই চেক-কাটা কালির দাগ-লাগা জামা। পায়ে সেই ক্ষয়ে-যাওয়া হাওয়াই চটি। দেহটা কম করে দু-দিন এখানেই পড়ে, ফুলে উঠেছে! কিছু জায়গায় কোনো ছোটো পশুর কামড়ের দাগ! আমার যুক্তি-বুদ্ধি সব গুলিয়ে যাচ্ছে, আমি দিনের আলোয় নিজের চোখে ভূত দেখলাম! তার সঙ্গে কথা বললাম?

দেবা ক্যামেরা নিয়ে ভিডিয়ো করছে, সংক্ষেপে পুরো বিষয়টা বলে লোকটির দেহের ওপর ফোকাস করছে। ওকে দেখে অনেকটা স্বাভাবিক মনে হল, যেন এটাই ও এক্সপেক্ট করেছিল।

''দেবা, এবার কি ফিরবি? সন্ধে হয়ে আসছে তো।''

''ও মা, আসল এক্সপেডিশন তো শুরুই হল না রে।''

''মানে? এই তো... এই বডিটা...''

''ধুর, এটা তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। লোকটা বোধহয় সাপের কামড়ে মারা গেছে, কেননা গায়ে কোনো আঘাত তো দেখছি না, যে কামড়ের দাগ আছে তা হাতে আর পায়ে, সে কামড়ে মৃত্যু হয়নি। ফেরার পথে পুলিশকে ইনফর্ম করতে হবে, বুঝলি। এদিকে তো তেমন কেউ আসে না তাই কারও নজরে পড়েনি। আত্মাও তার জাগতিক শরীরের মোহ কাটাতে পারছে না তাই আমাদের হিন্টস দিল, আমার তখন থেকেই একটা সন্দেহ হচ্ছিল।''

জঙ্গলে সন্ধে আর রাতের বিশেষ ফারাক হয় না। ঝুপ করে একটা অন্ধকারের চাদর যেন জড়িয়ে নিল গোটা বনাঞ্চল।

দেবা নাইট ভিশন ক্যামেরাটা বের করল। হাতে টর্চ ছিল। ধীরে ধীরে জঙ্গলের পুবদিকে এগোতে লাগলাম, পুব-পশ্চিমটা বুঝতাম না, যদি হাতের ঘড়িতে একটা পুঁচকে কম্পাস না থাকত। জঙ্গলের একটা নিজস্ব শব্দ থাকে, ভাষা থাকে, সেটা আজ প্রথম বুঝলাম। কিট কিট করে একটানা একটা কীসের ডাক যেন চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সাবধানি পায়ের স্পর্শ পেয়ে মরা পাতাগুলোও যেন সজীব হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝেই পায়ের শব্দে ভীত সরীসৃপ সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে। আমি ভূতে ভয় পাই না, তবে এখন আমার ভয় করছে, সত্যি ভয় করছে, তবে কীসের ভয় বা কাকে ভয়, সেটা বলতে পারব না। স্বরের স্বাভাবিকতা যথাসম্ভব বজায় রেখে বললাম, "দেবা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছি?"

"বড়ো দেও বাড়ি। যদি আমি খুব ভুল না হই।"

"সেটা কী?"

"আমি নিজেও জানি না, তবে এটা জানি যে অনেক প্রশ্নের উত্তর ওখানেই পাব।"

অন্য সময় হলে হয়তো দেবার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু খানিক আগে যা ঘটেছে, তারপর আর...।

চুপচাপ ওকে অনুসরণ করতে লাগলাম। প্রায় মিনিট ছয়-সাত হাঁটার পর অপেক্ষাকৃত কম জঙ্গুলে জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে একটা ছোটো ভাঙা বাড়ি, বাড়ি বলা যায় কি না জানি না, দুটো ঘর পাশাপাশি, সামনে একফালি বারান্দা, ঘরের দেয়ালে কোনো জানলা নেই। মাথার ওপর কোনোকালে একটা টিনের চাল ছিল। সেটার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে উঠোনের একপাশে।

আমি নিজের খেয়ালেই বাড়িটার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেবা পেছন থেকে এক হ্যাঁচকা টানে আমায় আটকাল। ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই হাতের টর্চের আলোটা মাটির দিকে ফেলল। দেখলাম, ছোটো ছোটো হাড়ের টুকরো আর পাথর-নুড়ি একসঙ্গে গেঁথে একটা ছোটো মালার মতো। অনেকটা মেয়েরা হাতে যে চুড়ি পরে, সেই আকারের। এবং ভালো করে দেখার পর দেখলাম অমন অনেকগুলো মালাই চারদিকে ইতস্তত ছড়ানো।

"কী এগুলো?"

"কোনো একটা ক্রিয়া করা হয়েছে আর পশুর হাড় যখন আছে, ক্রিয়াটা অশুভ উদ্দেশ্যেই করা। তুই আমাকে ফলো করে আয়। আমি আছি তো, কোনো চিন্তা নেই।"

কাঁধের স্লিং ব্যাগ থেকে সেই খেরোর খাতাটা বের করে টর্চের আলোয় কী যেন দেখে নিল চট করে।

তারপর ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট পুঁতির মালা বের করে নিজে পরল, আমাকেও পরাল। সাবধান করে দিল, এটা যেন কাছছাড়া না করি।

বাড়ির ভাঙা বারান্দায় পা দেয়ামাত্র একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে মনে হল, আমার দেহের ওজন যেন অনেকটা বেড়ে গেছে। আর মনটা অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেছে। কীসের জন্য মন খারাপ জানি না, তবে ভীষণ মন খারাপ লাগছে। হঠাৎ দেবা শক্ত করে হাতটা ধরে বলল, "কোনো চিন্তা নেই, আমি আছি তো।"

আর মুহূর্তে সব অদ্ভুত অনুভূতি উধাও!

আমরা ঘরের ভেতর পা দিলাম। ভেঙে-পড়া মাটির ঘর। কয়েকটা ভাঙা শরা, মাটির কলশি, নারকেলের ছোবড়া ছড়িয়ে আছে।

দেবা আমার হাত ধরেই আছে, তবে মুঠোটা আরও শক্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে। দেখলাম, খুব বড়ো বড়ো করে শ্বাস নিচ্ছে। আর নিজের মনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছে।

"বুঝলি রথী, যা ভেবেছিলাম তা-ই। ও কি সম্ভব! তবে কি..."

কাঁপা গলায় বললাম, "কী রে?"

দেখলাম, আমার প্রশ্নটা ওর কানেও ঢোকেনি।

হ্যাঁচকা টানে পাশের ঘরের দিকে নিয়ে চলল। ঘরে পা দেওয়ার আগে পর্যন্ত জানতাম না যে আমার আগামী সম্পূর্ণ জীবন, বোধ, বিচার, বিশ্বাস—সব বদলে যেতে চলেছে।

* * * * * * * *

ঘরটা যেন কুচকুচে কালো। এ অন্ধকার কোনোভাবেই এই জগতের হতে পারে না। পাশের ঘরটার ভাঙা ছাদ চুইয়ে তবু কিছুটা মরা চাঁদের আলো আসছিল, কিন্তু এ ঘরে...

দেবা আর আমার দুজনের টর্চের আলো একযোগে যার ওপর পড়ল, সেই ভীষণদর্শন বস্তুটি যে কী তা বোঝার আগেই আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। কয়েক সেকেন্ড পর ধাতস্থ হয়ে বুঝলাম, ঘোর কৃষ্ণকায় একটি প্রমাণ সাইজের মূর্তি, দেখতে অনেকটা আমাদের মহিষাসুরের মতো। তবে এই মূর্তির রূপটি শতগুণ বেশি মারাত্মক।

"কী এটা?"

"দুয়ারি ঠাকুর, অসুর উপজাতির উপাস্য। তবে সত্যিকারের

দুয়ারি নয়।" মুখের দু-পাশে শ্বদন্ত, চোখটা রক্তবর্ণ। চারটি হাতের দুটিতে ঢাল-তলোয়ার। আর অন্য দুটি হাত একটি নরশিশুকে দু-হাতে ছিঁড়ছে! আর মুখে ধরা একটি রক্ত-মাখা হৃৎপিণ্ড!

এটা মূর্তি! কে এই বীভৎস মূর্তি বানাল? কেনই বা বানাল? কোমরে জড়ানো আছে একটা ছাল, আমি যদি খুব ভুল না হই, ওটা কোনো পশুর ছাল নয়। ওটা মানুষের বা কোনো পুরুষের শুকনো ছাল!

আমি এত বছরের জীবনে এরকম বীভৎস কিছু আগে দেখিনি। বিড়বিড় করে বললাম, "অসুর উপজাতি!"

"হুম, মূলত ঝাড়খণ্ডের প্রান্তিক উপজাতি, নিজেদের ওরা মহিষাসুরের বংশজ মনে করে। দেবী দুর্গা ওদের শত্রু, নবরাত্রির নয় দিন ওরা ভালো কাজ করে না, একপ্রকার গৃহবন্দি থাকে বা এককথায় অশুভ মনে করে ওই নয় দিনকে।"

"এখানে কেন?"

"আমার যেটুকু জ্ঞান আর আগের করা রিসার্চ আছে, তার বেসিসে বলতে পারি, মারাত্মক ক্রিয়া করেছে কেউ এখানে। যে করেছে, সে অসুর উপজাতিরই হয়তো মানুষ অথবা এমন কেউ, যে ওদের ধর্মটা জানে এবং একটা মারাত্মক ক্রিয়ার মাধ্যমে দেবতাকে দানবে রূপান্তরিত করেছে, আর..."

"কী আর?"

"এই জায়গাটাকে মূর্তিমান নরকের দ্বারে পরিণত করেছে, আর লোহাকে যেমন চুম্বক টানে, এই অঞ্চলটা টানে অপশক্তিকে।"

"সে কী রে! তাহলে উপায়?"

"উপায় একটা আছে, তবে কী জানিস...!"

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই একটা ছায়াশরীর হঠাৎ যেন মুহূর্তে ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা বিশ্রী বুনো গন্ধে ভরে উঠল।

বিষয়টা দেবাও লক্ষ করেছে, মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে কী যেন একটা মন্ত্র পড়তে শুরু করল। আর সঙ্গে গন্ধটা উধাও!

"রথী, জায়গাটা যতটা খারাপ ভেবেছিলাম, তার থেকে অনেক অনেক বেশি বিষাক্ত। আর এখানে ক্রিয়া কোনো এককালে হয়েছিল; কিন্তু আজও মূর্তিটা এত নতুন কী করে? কিন্তু এখানে যে কারও পা পড়েনি, সেটা তো বুঝতেই পারছিস।"

"হুম, ঠিক এটাই আমারও মনে হয়েছিল রে। চল ভাই, চলে চল, এখানে থাকতে হবে না।"

"না রে, এই খোলা নরকদ্বার বন্ধ না করে তো যেতে পারব না, ভাই। আমার আসল উদ্দেশ্যই তো... আর আমার জন্য ভাবছি না, তুই যে আমার রেসপন্সিবিলিটি। তোর সিকিউরিটির জন্যও এটা দরকার।"

"কী করবি? কীভাবে করবি? তোর সঙ্গে তো কোনো পুজোর সামগ্রীও নেই!"

"ফুল-বেলপাতা, ধূপ-ধুনো না হলে পুজো হয় না, না রে? মন্ত্রগুণ বলে একটা কথা আছে, শব্দ আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে ব্রহ্ম। সব থেকে বেশি শক্তিশালী। আর সবকিছুর ওপরে হল মনের সদিচ্ছা। আমি চেষ্টা করব, ভাই, বাকি আমার ঈশ্বর জানেন। এ যে আমার দায়... দরকার হলে..."

আমার মনে এখন হাজার প্রশ্ন, বিদেশে লেখাপড়া ও কাজ-করা চূড়ান্ত আধুনিকমনস্ক দেবা কী করে এসব শিখল! কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস বা মানসিকতা হচ্ছিল না। দেবাকে আপাদমস্তক রহস্যময় মনে হচ্ছে। তবে এখন আমি শুধু এখান থেকে বেরোতে চাই।

আমার দিকে ফিরে আদেশের সুরে বলল, "তুই চোখ বন্ধ করে উপাস্যকে স্মরণ করে যা, চোখ খুলবি না।" বলেই থুতু দেয়ার মতো ভঙ্গিতে আমার চারদিকে ঘুরে মাটিতে থুতু দিয়ে একটা গণ্ডি কেটে দিল।

"রথী, যা-ই হয়ে যাক, চোখ খুলবি না, আর এই গণ্ডির বাইরে বেরোবি না।"

দেখলাম, ও হাতের টর্চটা মাটিতে নামিয়ে এগিয়ে গেল মূর্তির দিকে, উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ চলছে, আর ম্যাজিকের মতো বদলে যাচ্ছে আমার চারপাশের পরিবেশ। চোখ বন্ধ থাকলেও বাকি ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমার চারদিকের তাপমাত্রা এখন প্রায় হিমাঙ্কের কাছে, ঠকঠক করে কাঁপছি, সঙ্গে কানে আসছে বিভিন্ন পশুর মিলিত আর্ত চিৎকার আর না-জানা কোনো ভাষার অস্পষ্ট উচ্চারণ।

প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে চোখ খুলতে; কিন্তু দেবার নিষেধ।

"রথী... বাঁচা..."

দেবার গলা না! পাশের ঘরে থেকে আসছে? আর পারলাম না চোখ বন্ধ রাখতে, চোখ খুলে দেখলাম ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার! দেবা কোথায়! কোথায় দেবার টর্চ!

"দেবা... তুই কোথায়?"

হাতের টর্চটা জ্বেলে গণ্ডি টপকালাম, আর গণ্ডির বাইরে পা দেয়ামাত্র আলোটা নিভে গেল আর হিমশীতল একজোড়া হাত ধাক্কা দিল আমায়, আছড়ে গিয়ে পড়লাম মূর্তিটির ওপর, আর সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, হাতের টর্চটা জ্বলে উঠেছে, মূর্তিটি কঠিন পাথুরে নয়... তপ্ত ধাতুর মতো তবে

নরম, ঠিক যেন জীবিত মানুষ!

মুখ তুলে দেখলাম, মূর্তির মুখে ধরা হৃৎপিণ্ডটা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে তাজা রক্ত! হাতের ধরা নরশিশুটি এখনও মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। উফ, কী পাশবিক সেই দৃশ্য।

ছিটকে সরে এলাম। মনে হচ্ছিল, খুব বেশিক্ষণ বোধহয় সজ্ঞানে থাকতে পারব না।

"দেবা... তুই কোথায়?"

কিন্তু কোথায় দেবা! সেই বিজাতীয় ভাষায় অজানা উচ্চারণের প্রকোপ বেড়েছে আরও! আলোটা পুনরায় নিভে গেছে। পেছন ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম, এ ঘরে কোনো দরজার অস্তিত্বই তো নেই! তাহলে কি আমার অন্ত এখানেই এভাবেই হবে? আমি পাগলের মতো দেবার নাম নিয়ে চ্যাঁচাতে থাকি। কিন্তু কোনো উত্তর নেই, তাহলে দেবা কি নেই! কথাটা ভাবতেই সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমি বুঝতে পারছি, এই ঘরের আঁধারে জমা হয়েছে নরক থেকে উঠে-আসা অসংখ্য অশুভ অস্তিত্ব। তাদের অদৃশ্য তপ্ত পূতিগন্ধময় শ্বাসবায়ু যেন আমার দেহের চামড়া গলিয়ে দিচ্ছে। পাগলের মতো সারা ঘরে ছুটে বেড়াচ্ছি, একটা মুক্তিপথের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই! আমি বুঝতে পারছি, কেউ বা কারা আমাকে নিয়ে খেলছে, ঠিক যেন খাঁচায় বন্দি জানোয়ার আমি!

হঠাৎ একটা স্পর্শ পেলাম ঘাড়ের কাছে... তবে কি দেবা এল! কিন্তু মুহূর্তে আমার ভুল ভাঙল, একজোড়া কঙ্কালসার পৈশাচিক হাত আমার গলায় চেপে বসেছে, চোখ বন্ধ করলাম, হা ঈশ্বর, এই তবে আমার শেষ!

শ্বাসবায়ুর জন্য বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করছে। একটু বাতাস চাই... একটু বাতাস... নাহ্ চেতন জ্ঞান আর বুঝি ধরে রাখতে পারলাম না। দেবার দেয়া পুঁতির মালাটায় টান পড়ছে, হঠাৎ মালাটা ছিঁড়ে পুঁতিগুলো ছড়িয়ে পড়তেই গলার চাপটা একটু কমে গেল, মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে পুনরায় জীবনের স্বাদ যে কত মধুর, সেটা আজ বুঝলাম।

ডান হাতের কনুইতে আচমকে হ্যাঁচকাতে কোনো অজানা পথে আমি ঘরের বাইরে ছিটকে এসে পড়লাম। আবছায়া চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিলাম।

দেবা দাঁড়িয়ে। আবছায়া আঁধারে মুখ দেখা না গেলেও ওর গলার স্বর শুনে ভরসা পেলাম।

"গলার মালাটা কই রে? আচ্ছা দাঁড়া, তুই আমারটা পর।" বলে নিজের মালাটা খুলে পরিয়ে দিল।

"কিন্তু তোর..."

"আই ক্যান ম্যানেজ, তোর বেশি দরকার।"

"এবার চল, আমি মন্ত্র বন্ধনে বেঁধে দিয়েছি, তবে কতক্ষণ আটকাতে পারব জানি না, পালাতে হবে।"

আমাদের কথার মাঝেই চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, কেউ বা কিছু একটা কী টেনে নিয়ে গেল! আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেবারও চোখ চলে গেছে ওইদিকে।

"দেবা, ওটা কী?"

"ও কিছু না। বোধহয় কোনো শেয়াল-টেয়াল হবে। ওহ্ তুই দাঁড়া, আমার ক্যামেরাগুলো ওদিকে পড়ে গিয়েছিল, নিয়ে আসছি।"

"আমিও যাব।"

"হাঃ হাঃ। কোনো চিন্তা নেই, যাব আর আসব। তোর কিছু হবে না, আমি আছি।"

সবে হয়তো মিনিটখানেক কেটেছে, তাতেই মনে হচ্ছে, যুগ যুগ কেটে গেছে। সবে দেবাকে ডাকতে যাব, দেখি ও আসছে ক্যামেরা দুটো নিয়ে, কিন্তু তার সঙ্গে ওর পেছনে আসছে এক বিশাল আকৃতির কালো ধোঁয়াটে অবয়ব, আমি বাক্‌রুদ্ধ, আঙুল তুলে শুধু বললাম, "দেবা... তোর পেছনে...।"

দেবা চেঁচিয়ে বলল, "রথী দৌড়ো, থামিস না... তোর কোনো চিন্তা নেই রে... আমি আছি... দৌড়ো।"

পাগলের মতো দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ মনে হল, পায়ের নীচে মাটি নেই! কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। চোখের সামনে শুধুই আঁধার! আর কিছু মনে নেই।

* * * * * * * *

ঘুম ভাঙা আর জ্ঞান ফেরার মধ্যে ফারাক বোধহয় খুব বেশি হয় না। অনুভূতিটা অনেকটাই এক, আজ উপলব্ধি করলাম। তবে চারপাশে এতটাই অন্ধকার যে চোখ খুলেছি না বন্ধ করে আছি, সেটা বোঝা দায়। তবে বিনা চেষ্টায় আমার সব কয়টি ইন্দ্রিয় একযোগে আমাকে বুঝিয়ে দিল, আমি খুব স্যাঁতসেঁতে পিচ্ছিল গুমোট একটা পরিবেশে আছি। আর সব থেকে প্রকট যে অনুভূতি, সেটা হল বিশ্রী একটা গুমোট গন্ধ! গন্ধের ধরনটা অঘ্রাতপূর্ব। কয়েক সেকেন্ড সময় নিলাম ঘেঁটে-যাওয়া চিন্তাভাবনাগুলো একত্রিত করতে। এই অদ্ভুত পরিবেশে আসার পূর্বের স্মৃতিগুলো মনে মনে হাতড়ে নিলাম খানিক।

আর তখনই আচমকাই মাথায় এল, "আরে! দিব্য... দেবা কোথায়? আমিই বা কোথায়? এটা কোন জায়গা? আমি এখানে কেন?"

আমার চিন্তার জাল কেটে গেল আমার ত্রাতার স্বরে,

আবারও দিব্য!

"দেবা, আমি এখানে... নীচে।"

"গর্ত বেশি গভীর নয়, দেখ, গাছের শিকড়ের ঝুরি নেমেছে, ধরে উঠে আয়, আমি টেনে তুলে নিচ্ছি।"

ওর কথামতো উঠতে গেলাম। কিন্তু মনে হল, কে বা কারা আমার পা দুটো টেনে ধরেছে। আমি দেবাকে ডাকতেই ওর হাতের স্পর্শ পেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কাছের টানটা উধাও!

"এটা কী রে, পুকুর?"

"না।"

"তাহলে?"

"বলিকুণ্ড।"

"সেটা কী?"

"পরে বলব, তুই চল, ওদিকে আর-একটু এগোলেই স্টেশন মাস্টারের বাড়ি, গাড়িটা ওখানেই আছে, গাড়িতে উঠতে পারলে আর চিন্তা নেই, ওটা এই নরক বলয়ের বাইরে।"

আপ্রাণ দৌড়ে প্রায় দশ মিনিট পরে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলাম।

গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দিলাম, দেবা বলেছিল, ওর কাঁধে লেগেছে তাই ও ড্রাইভ করতে পারবে না, ও একটু শুয়ে নেবে। তাই ও পেছনের সিটে শরীরটা এলিয়ে দিল।

"আচ্ছা, যেতে তো এত সময় লাগেনি; কিন্তু ওইটুকু জঙ্গল পার হতে এতক্ষণ লাগল কেন?"

"নরক বলয়, আমার ইষ্টদেবের কৃপা ছিল তাই তুই বেঁচে ফিরতে পারলি।"

"আমি যেখানে পড়ে গেলাম..."

"বলিকুণ্ড, বেসিক্যালি আধখাওয়া মড়াগুলো ওখানেই ফেলা হত। তাই তুই উঠে আসার সময় মনে হচ্ছিল, কেউ যেন তোর পা ধরে টানছে। কত অতৃপ্ত প্রাণ ওখানে আটকে আছে, আজও তারা জীবনের ছোঁয়া পেতে লালায়িত।"

"আচ্ছা, এই যে অসুর প্রজাতির মানুষরা, তারা কেন এই কালো জাদু করেছে? মুক্তি কী করে হবে?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইল ও...

"কী রে... উপায়...?"

"স্বেচ্ছাহুতি, যার অস্তিত্বের সঙ্গে বহু শতাব্দী ধরে এই বলয় যুক্ত, তার স্বেচ্ছাহুতি।"

কথাটার মানে বুঝিনি, তবে এখন ওকে আর বিরক্ত করতে চাই না।

আমি আর কিছু বললাম না, অনেকটা পথ... নার্ভ শক্ত রেখে পথে চোখ দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, ভূতের গল্প বোধহয় এ জীবনে আর লিখতে পারব না। এতক্ষণ ঘড়ি দেখার কথা মাথায় আসেনি, একটানা প্রায় ছয় ঘণ্টা গাড়ি চালাচ্ছি, কীভাবে করেছি জানি না। দেবা সারা রাস্তা আর কথা বলেনি, বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়।

পুবের আকাশে নববধূর গালের লালিমা ছড়িয়ে পড়ছে। ভোর হচ্ছে। রাস্তার আলো সব নেভেনি এখনও।

"আমাকে এখানে নামিয়ে দে রথী, কাছেই আমার হোটেল। তুই বাড়ি যা, রেস্ট নে।"

"আরে, তুই আমার বাড়ি চল আজ..."

"না রে, রুমে ইম্পরট্যান্ট ডকুমেন্ট আছে কিছু, আমি বিকেলে আসছি।"

অগত্যা, গাড়ি থামানোমাত্র, দেবা নেমে হাঁটা দিল।

ওর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কী যেন একটা খটকা লাগল। তবে সেটা কী... সেটা নিয়ে ভাবার মতো মানসিক বা শারীরিক বল আমার আর নেই।

বাড়ি ফিরে, স্নান সেরে অল্প একটু খেয়ে শরীর এলিয়ে দিলাম খাটে। চোখ খুললাম, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে।

ফোনটা চেক করলাম, নাহ্, দেবার কল নেই। আমি কল করতে গেলাম; কিন্তু সুইচ অফ।

ওর ক্যামেরা, ল্যাপটপ সব তো গাড়িতে ফেলেই চলে গিয়েছিল, সঙ্গে ওর স্লিং ব্যাগ আর ওই খেরোর খাতাটিও।

আমিও খেয়াল করিনি। ভেবেছিলাম, বিকেলে এসে নিয়ে যাবে।

ওর হোটেলের নাম জানতাম, গুগ্‌ল থেকে নাম্বার বের করে কল করলাম। তারা বলল, দেবা কাল চেক আউট করার পর আর ফেরেনি।

আমার মনটা কু ডাকছে...

তাড়াতাড়ি ওর ক্যামেরাটা ল্যাপটপে কানেক্ট করে ফুটেজগুলো দেখতে লাগলাম, আর মনেপ্রাণে ঈশ্বরের কাছে আকুতি করতে লাগলাম, আমার সন্দেহ যেন ভুল হয়।

কিন্তু...

একটা ফুটেজে স্পষ্ট দেখলাম, এক বিশাল আকৃতির না-মানুষ অবয়বের সামনে দু-হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে দেবা, ধীরে ধীরে শরীরটা শূন্যে উঠে গেল, সেই ধোঁয়াটে অবয়ব মুহূর্তে দু-হাতে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলল দেবার শরীরটা!

উফফ, কী পাশবিক সে দৃশ্য! আমার মাথাটা ঘুরে গেল। মাথায় একটা কথাই ঘুরতে লাগল—'স্বেচ্ছাহুতি'!

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ক্যামেরার সামনে কোনো কিছু নেই। কিছুক্ষণ পর ক্যামেরাটা কেউ তুলে নিল, দেখলাম, ক্যামেরাটা নিয়ে আমার দিকে কেউ এগিয়ে আসছে। ব্যাস, আর ফুটেজ নেই।

দেবাই তো ক্যামেরাটা কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিল। তার মানে দেবা তখন...! তাই জন্যই কি ওর গলার মালা আমায় দিয়ে বলেছিল, ওর দরকার নেই!

দেবা কি সত্যিই আমার বন্ধু দেবা! এত ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও পেল কী করে? কেনই বা 'স্বেচ্ছাবলি' বেছে নিল ও?

শুধুই কি আমাকে বাঁচাতে?

তাই কি দায়িত্ব নিয়ে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল ও?

আমার পাগল-পাগল লাগছে, কেন হঠাৎ ও দেশে এল, কেনই বা ওই অভিশপ্ত জায়গায় গেল... আর কেনই বা...!

কোথা থেকে সব জানতে পারব? হঠাৎ ওই খাতাতে নজর পড়ল, সারাক্ষণ দেবা ওতে কী সব লিখছিল।

খাতাটা খুললাম, ইংরেজি যে তারিখ লেখা, সেটা আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের।

পুরোটা পড়া যখন শেষ হল, তারপর বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল বিষয়টা আত্মস্থ করতে। যা পড়লাম তা তো রূপকথার গল্প!

জনৈক নবীন মুখুজ্জের আত্মশ্লাঘা।

ব্রিটিশ রাজের উচ্চপদে কাজ করতেন। অর্থ, এর সঙ্গে যতরকম চারিত্রিক দোষ থাকে, সেসবই তাঁর ছিল। অনেক আদিবাসী মেয়ের অপমান তিনি করেছিলেন এবং অর্থবলে সেগুলো ধামাচাপা দেন। তবে ধরতি ছিল অন্যরকম, ওর বাবা ছিল গুনিন। ধরতি যখন নবীনকে বলে সে সন্তানসম্ভবা, নবীন তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে, বিফল হয়। বেশ কিছুদিন সব চুপচাপ, হঠাৎ একদিন ধরতি নবীনকে ডেকে পাঠায় এক মন্দিরে। নবীন ভাবে, গেঁয়ো গরিব মেয়েটা ভয় পেয়েছে, নবীন যায়।

ধরতির কোলে একটা ফুটফুটে বাচ্চা। আর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি।

নবীন ব্যাপার জটিল ভেবে পালাতে যায়, কিন্তু ততক্ষণে সে বন্দি, তার চোখের সামনে ধরতি নিজের সন্তানকে হত্যা করে তার হৃৎপিণ্ডটা বের করে উৎসর্গ করে বিকরালরূপী এক দেবতাকে!

ধরতির বাবাই পুরো ক্রিয়াটা করে। নবীন মূর্ছা যায়। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, দ্যাখে, ধরতি নিজের সন্তানের রক্ত-মাখা হাতটা বুলিয়ে দিচ্ছে নবীনের মাথায়। নবীন কাকুতি করে তাকে ক্ষমা করার জন্য।

ধরতি বলে, নবীন বেঁচে থাকবে, তবে আজকের পর নবীনের বংশে পুত্র জন্মালে সে বাঁচবে না। আর এই ক্রিয়াস্থলটা হবে মূর্তিমান নরক বলয়।

নবীন নিজের ভুল বুঝে ক্ষমা চাইলে ধরতির বাবা বলে, এসব থামতে পারে, আজ থেকে একশো বছর পর রেবতী নক্ষত্রে দ্বাদশী তিথিতে যে ছেলে জন্মাবে, তার যদি কিছু বিশেষ গুণ থাকে এবং সে যদি স্বেচ্ছাহুতি দেয়, তবে এসব থামবে, নচেৎ নয়।

নবীন সবটুকু লিপিবদ্ধ করে যান তাঁর বংশধরদের জন্য।

এরপর বেশ কিছু পাতা ফাঁকা। এরপর এন্ট্রি নতুন, ডট পেনে লেখা। পড়ে বুঝলাম দেবার লেখা। লিখেছে...

''ছোটোবেলায় মামাদাদুর কথার মানে বুঝিনি, হঠাৎই মামাবাড়ির পুরোনো লাইব্রেরিতে খাতাটা পাই। ভয় পেয়ে যাই, মৃত্যুভয়। পালিয়ে যাই বিদেশ। কিন্তু নিয়তির অমোঘ টান আমায় টেনে আনল, না চেয়েও আসতেই হল। এটাই আমার ভবিতব্য। নিজের বলতে এক মামাতো দিদি, সে যোগাযোগ রাখে না।

''মৃত্যুর আগে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে কোনো আপনজনের সঙ্গে একটু... দেশে এক রথীজিৎ ছাড়া আছেই বা কে? একবার চোখের দেখা...''

আবার ফাঁকা...

গতকালের ডেট

''রথীকে কিছুতেই নিষেধ করে পারলাম না, ওর দায়িত্ব আমার। অবশ্য প্রাণাহুতি তো দেব আমি। ওর ওপর আশা করি, কোনো আঁচ আসবে না। আমি আসতে দেব না। সে নরকের দ্বার আমি বন্ধ করবই।'' আর কোনো লেখা নেই।

হঠাৎ সকালের খটকাটা পরিষ্কার হয়ে গেল... দেবা গাড়ি থেকে নেমে চলে যাওয়ার সময় ওর কোনো ছায়া তো পড়েনি! ওর বলা কথাটা মনে পড়ে গেল।

''আত্মা তো অবিনশ্বর, এনার্জি... এনার্জির ছায়া পড়ে না।''

অজান্তেই চোখের চৌকাঠ ভিজে উঠল। দেবার বলা কথাটা কানে বাজতে লাগল...

''আমি তো আছি, তোর ভয় কী?''





হের দেমন

দীপাঞ্জনা দাস

(১)

(জানুয়ারি, ২০১৪, ফ্রান্স)

এক ঢোঁকে গ্লাসের সবটুকু জল গলায় ঢেলে দিল ব্রেট। বুকের খাঁচাটা তখনও হাপরের মতো ওঠানামা করছে। সারা দেহ ভিজে উঠেছে ঘামে।

বিছানায় স্থাণুর মতো বসে ঘরের চারপাশটা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল সে। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ছে না। কেবল পশ্চিম দেওয়ালের জানলার একটা খোলা পাল্লা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে ঘরে। ঘিয়ে রঙের পর্দাটা নাচছে তালে তালে। চারিদিক নিস্তব্ধ। তবু সেই নিস্তব্ধতার বুকেই যেন কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল ব্রেট।

কিছু শোনা যাচ্ছে কি? নাহ্, এখন তো আর কিছু...

অথচ একটু আগেই সে ঘুমের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছিল কাদের ফিসফিসানি। এক অদ্ভুত ভাষায় কারা একটানা কিছু আওড়ে

যাচ্ছিল। সে ভাষা তার অজানা। সেই সঙ্গে কিছু একটা যেন চেপে বসছিল তার বুকের ওপর। দু-হাতে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরছিল তার গলা। এমনকি তার আগুনের হলকার মতো তপ্ত শ্বাস পড়ছিল ব্রেটের মুখের ওপর!

সবটাই এত বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল যে, সে জেগে উঠে কিছুতেই এটা নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না, এটা নিছকই একটা দুঃস্বপ্ন। কারণ কণ্ঠনালির ওপর চাপটা সে এখনও অনুভব করছে। অনুভব হচ্ছে একটা ভোঁতা যন্ত্রণার ভাবও। চোখে-মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া দরকার।

ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসে ড্রয়িং রুমে দেওয়ালের সামনে দাঁড়াল ব্রেট। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রবার্ট ব্রেট।

এই ড্রয়িং রুমের দেওয়াল জুড়ে সাজানো প্রচুর পেইন্টিং, আছে বিভিন্ন স্কাল্পচার, একাধিক ইজেলে ঝুলছে অসমাপ্ত-অর্ধসমাপ্ত ছবি এবং নানারকম শিল্প-ভাস্কর্যের নমুনা। সেগুলোর অধিকাংশই তার নিজের সৃষ্টি। কিন্তু ব্রেট দাঁড়িয়েছে একটি বিশেষ ছবির সামনে। ছবিটা নিঃসন্দেহে সুন্দর। কিন্তু কোনো বিশেষত্ব নেই তেমন। এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে একটি আয়নার সামনে। তার মুখের প্রতিচ্ছবি পড়েছে সেই আয়নায়। বিশেষত্ব বলতে কেবল একটাই। আয়নাটা। বা বলা ভালো, আয়নার নকশাটা। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত থাকে ওভাল শেপের আয়না, যার ধারে থাকে সুন্দর কারুকার্য। এক্ষেত্রে তেমনটা নয়। আয়নার আকার গোল। আর তার ভেতর তির্যকভাবে একটা দণ্ডের মতো চলে গেছে, ফলে আয়নার কাচটাকে ভাগ করে দিয়েছে দুই ভাগে এবং সেই নারীর প্রতিচ্ছবিও আয়নার কাচে পড়েছে দুটি। ব্রেট একদৃষ্টে চেয়ে আছে আপাতদৃষ্টিতে এই অতি সাধারণ ছবিটার দিকে। এই ছবি মাত্র দিন দুই হয়েছে, সে উপহার হিসেবে পেয়েছে।

উপহার প্রদানকারী যেমন-তেমন কেউ নয়। সে-ও এক স্বনামধন্য চিত্রকর, হেরল্ড ক্রুজ়। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রথম দশজন চিত্রকরের একজন। ব্রেট নিজেও অবশ্য তা-ই। কিন্তু সে একেবারে প্রথম সারির একজন। হেরল্ড ক্রুজ় একজন অত্যন্ত ভালো শিল্পী হলেও ব্রেটের সমগোত্রীয় নয়, এমনটাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে।

দু-দিন আগেই ব্রেটের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটা বড়ো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল শহরের বৃহত্তম শিল্প সংস্থা। সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন সব তাবড় তাবড় শিল্পী। হেরল্ড ক্রুজ়ও ছিল সেই আমন্ত্রিত অতিথিদের একজন। উপহার হিসেবে সে এনেছিল তার নিজের আঁকা এই ছবি।

এই মুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ল ব্রেটের। হেরল্ড ক্রুজ় তাকে ছবিটা উপহার দেওয়ার সময় জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর চিরাচরিত দুটি শব্দ 'হ্যাপি বার্থডে'র বদলে বলেছিল দুটো অদ্ভুত শব্দ, যার মানে সে জানে না।

সে বলেছিল, 'হের পেমন!' অবাক হয়ে ভ্রূ কুঁচকেছিল ব্রেট, কিন্তু অত মানুষের মধ্যে আর কিছু বলা হয়ে ওঠেনি।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে এই অতীব সাধারণ ছবিটা ঘরে আনার পর থেকেই ব্রেটের সঙ্গে রাত্রে ঘটছে এইরকম কিছু অবর্ণনীয় ব্যাখ্যাতীত ঘটনা। মাঝরাত্রে কাদের সমবেত ফিসফিসানিতে তার ঘুম ভাঙছে বরংবার। মৃদু পদশব্দে সে চমকে চমকে উঠছে। বাইরের শীতল আবহাওয়া সত্ত্বেও তার ঘরের তাপমাত্রা চড়ে থাকছে বহুগুণ! অথচ হিটার চলছে না। অন্ধকারে বিছানায় উঠে বসে কান পেতে শুনে তার মনে হয়েছে, সেই মৃদু অথচ স্পষ্ট পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে তার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ড্রয়িং রুমের দিকে এবং সেই শব্দ গিয়ে থেমে যাচ্ছে ঠিক এই ছবিটার সামনে গিয়েই। কেন তা বলা মুশকিল; কিন্তু সে মোটামুটি নিশ্চিত।

খানিকক্ষণ নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে আনমনা হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ এক সম্পূর্ণ অযাচিত শব্দে ভীষণ চমকে উঠে কিছুটা ছিটকে গেল ব্রেট। কে যেন ঠিক তার কানের সামনে তুড়ি বাজাল এইমাত্র! শব্দটা এখনও তার কানে বাজছে। অথচ এই বিরাট বাংলো বাড়িটায় সে ছাড়া আর কেউ নেই।

সে বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দ্রুত দেখতে লাগল ঘরের চারপাশ। বুঝতে চেষ্টা করল তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট তুড়ির শব্দটার উৎস। কিন্তু না, সারা ঘরে সে সম্পূর্ণ একা।

এবার সামনের দিকে ঘাড় ফেরাতেই সামনের মেঝের দিকে তাকিয়ে ধক করে ওঠে ব্রেটের বুক। ক্রুজ়ের উপহার-দেওয়া ছবিটার ঠিক নীচে দেওয়ালের কাছাকাছি, মেঝের উপরে দুটো পায়ের ছাপ! সেই ছাপের রং কুচকুচে কালো। আর তার আকার কোনোভাবেই মানুষের স্বাভাবিক পায়ের সঙ্গে মেলে না। পায়ের আঙুলের অবস্থান দেওয়ালের উলটোদিকে। আর সেই আঙুলের সংখ্যা মাত্র দুটো!

ব্রেটের হৃদ্‌যন্ত্র পাথরের মতো ভারী হয়ে যেতে যেতে সে বিস্ফারিত চোখে লক্ষ করল, সেই কালো পায়ের ছাপের সংখ্যা বেড়ে তিনটে হল। যেন সেই অদৃশ্য দুই আঙুলযুক্ত পায়ের অধিকারী এগিয়ে আসছে তার দিকেই।

এক-পা... আরও এক-পা...

(২)

(ডিসেম্বর, ২০১৯, কলকাতা)

"আসুন ম্যাডাম..." চওড়া হাসি হেসে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানাল বেঁটেখাটো গড়নের শ্যামবর্ণ লোকটা। নাম রবিন সামন্ত।

যাঁকে বলল, তিনি ডাক্তার মিনার্ভা গোম্‌স। 'পার্পল অর্কিড' নামক মানসিক আবাসের নবীনতমা চিকিৎসক। আজই তাঁর এখানে প্রথম দিন। ছোটো থেকেই অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছাত্রী। গৌরবর্ণা, পাতলা মুখের অধিকারিণী এই মহিলা ডাক্তারের চোখে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি সহজেই চোখে পড়ে।

রবিন সামন্ত এই আবাসের ম্যানেজার স্থানীয় একজন কর্মী। এই আবাসের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ প্রায় সবই তাঁর হাতে। কোন ডাক্তারবাবু কখন আসবেন, কখন রাউন্ড দিতে বেরোবেন, কখন চেম্বারে বসবেন, তাঁদের কখন কী প্রয়োজন, কে কফি খাবেন আর কে চা, আর কে-ই বা সেসবের ধার না ধেরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেবল ফলের রস খাবেন, সব তাঁর মাথায় ছাপা থাকে। তা ছাড়া রোগীদের কখন খাবার দিতে হবে, স্নান করাতে হবে, কার কেমন স্বভাব, কীসে কে রেগে যায় আর কীসে ঠান্ডা—সবই তাঁর নখদর্পণে।

মিনার্ভা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "ডক্টর সেনকে কি বলেছেন আমার আসার কথা?"

"হ্যাঁ, আমি জানিয়ে দিয়েছি। উনি এখন চেম্বারে বসেছেন কি না, এখুনি আসতে পারছেন না। তবে ধরুন এই... মিনিট কুড়ির মধ্যে ফ্রি হয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা। চেম্বার কি এখানে না বাইরে?"

"আসুন, আমার সঙ্গে আসুন। যতক্ষণ না ডক্টর সেন আসছেন, ততক্ষণ আপনাকে বিল্ডিংটা ঘুরিয়ে দেখাই।"

মিনার্ভা, সামন্তের সঙ্গে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। হালকা চালে হাঁটতে হাঁটতে সামন্ত চারতলা বিল্ডিংটাকে দেখিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, "এই যে একতলার উত্তরদিকের ঘরগুলো, ওগুলো সব ডাক্তারবাবুদের চেম্বার। ওগুলোর একটাতেই আপনি বসবেন। ওগুলোর বাইরের দিকেও দরজা আছে, ওদিক দিয়েই আউটডোর পেশেন্টরা সব আসবেন। মানে যাঁরা চেকআপ করাতে আসেন বা কনসাল্ট করতে আসেন, তাঁদের এই অ্যাসাইলামে আর ঢুকতে হয় না।

"আর ওই... ওই পূর্ব আর দক্ষিণদিকের যে ঘরের সারিগুলো দেখছেন, ওগুলো সব পেশেন্টদের সেল। ওরা বেশির ভাগ অস্থায়ী। এদের মানসিক সমস্যা ততটা সিরিয়াস না। মানে ওদের চিকিৎসা শেষ হলেই ওরা চলে যাবে।

"আসুন এবার এদিকে। এই ঘরগুলোর একেবারে শেষে ওই যে নীল দরজাওয়ালা ঘরটা, ওইটে আমার ঘর।"

"আর দোতলায় যাদের ঘর, তাদের কন্ডিশন কি বেশি সিরিয়াস?" জিজ্ঞেস করল মিনার্ভা।

"হ্যাঁ, মানে ওরা একটু বেশি ইয়ে, বুঝলেন না। ওদের প্রায় সবাই তিন বছরের বেশি এখানে ভরতি রয়েছে। আর তিনতলায়..."

"সেখানে কারা থাকে?" ঘাড় তুলে তিনতলায় জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দার দিকে তাকিয়ে মিনার্ভা প্রশ্ন করল।

"ওখানে রাখা হয় একেবারে আল্টিমেট কন্ডিশনের পেশেন্টদের। যারা খুব ভায়োলেন্ট। ওদের বেঁধে রাখা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। যখন-তখন অ্যাটাক করে!"

"সেরকম পেশেন্টও আছে নাকি এখানে?" সরু ভ্রূজোড়া একটু ওপরে উঠে যায় নবীনা ডাক্তারের।

"মাত্র দুজন। তবে তাদের একজনকে দেখলে চট করে তেমন মনে হবে না আপনার। বেশ সভ্যভব্য। সাহেব মানুষ কিনা! হেঁঃ হেঁঃ..."

"সাহেব?"

"হ্যাঁ, সেই সাহেবও আবার কিন্তু যেমন-তেমন সাহেব নন মোটে। খুব বিখ্যাত মানুষ! অনেক বড়ো আর্টিস্ট!"

"তা-ই নাকি? আর্টিস্ট!" অবাক হয় মিনার্ভা।

"হুমম... জগৎজোড়া নাম ছিল এককালে। সে নাম এখন আর নেই। তার বদলে নতুন একটা নাম হয়েছে। হাতকাটা সাহেব!"

"হাতকাটা সাহেব?"

"হ্যাঁ, ওঁর দু-হাতেরই কনুইয়ের নীচ থেকে কাটা!"

(৩)

"আরে এ বিজুয়া, গেরাউন্ডকে লাইটওয়া বন্দ্ কর দে!"

একতলায় ডিউটিরত বিজুয়াকে তিনতলার বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিয়ে আবারও নিজের টুলে এসে বসে পড়ল নাইটগার্ড রামদীন। আজ অ্যাসাইলামের তিনতলার ডিউটি

হরই। এখানে রোগীর সংখ্যা মাত্র দুজন। তারাও ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোয় অঘোরে। তাই সারারাতে মাত্র বার দুই উঠে তাদের ঘরে দেখে এলেই হল। বাকি সময়টা দিব্যি ঘুমিয়ে থাকো, কি রেডিয়োতে গান শোনো, কেউ দেখার নেই। এই তলায় রোগী কম বলে গার্ড মাত্র একজনই দেওয়া হয়। অবশ্য এর বেশি দরকারও পড়ে না।

টুলে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার ডান পাশের ঘর থেকে ডাক এল, "হেই! হেই ইউ, প্লিজ কাম হিয়ার... প্লিজ কাম..."

রামদীন তাকাল সেদিকে। ঘরের দরজার গারদের কাছে কাউকে দেখা না গেলেও, সে গলার স্বরের সঙ্গে ঝনঝনাৎ ধাতব শব্দও পাচ্ছিল। শব্দটা মোটেই অচেনা নয় তার কাছে। সে জানে, ওই ঘরে কোন রোগী থাকে।

টুলে বসা অবস্থাতেই সে উত্তর দিল, "কা ভৈল গোরে সাহিব? সোয়ে নহি?"

"নো, কাম হিয়ার প্লিজ..." লোকটা আবারও ডাকল তাকে। সেই ডাকে বেশ একটা আকুতি মাখা ছিল। রামদীন উঠে এগিয়ে গেল সেদিকে।

সেই ঘরের সামনে গিয়ে গারদের কাছে মাথা বাড়িয়ে তাকাল সে। সেখানে মেঝের ওপর পাতা বিছানায় বসে আছে সাদা চামড়ার একটা মানুষ। রামদীন হেসে জিজ্ঞেস করল, "কাহে বুলাতে হো গোরে সাহিব? পানি পিবে? ওয়াটার?"

"নো নো" মাথা ঝাঁকাল লোকটা, "নট ওয়াটার। দিস..." বলে সে তার কাটা হাত দুখানা তুলে দেখাল। তার হাতে বাঁধা আছে শেকল। হাতে এবং পায়ে।

হাতের শেকলখানা বিশেষ কায়দায় তৈরি। চামড়ার দুটো স্ট্র্যাপ কনুইয়ের ওপরে শক্ত করে চেপে বসে আছে; কারণ তার হাতের কনুইয়ের নীচ থেকে বাকি অংশটা আর নেই। সেই দুই স্ট্র্যাপ থেকে একটা করে লম্বা লোহার শেকল বেরিয়েছে আর সেই শেকল পিঠের দিকে একটা লোহার শক্ত দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ হাত নাড়ানোর রাস্তা বন্ধ। এমনকি লোকটার পায়েও বাঁধা রয়েছে শেকল। তাই পায়ের নড়াচড়ার সুযোগও নেই। ঝনঝন শব্দটা ওই শিকলগুলো থেকেই আসছে।

"জঞ্জির খোলেকে বোলতনি? লেকিন ও তো নহি হো সকত হ্যায়।" মাথা নেড়ে বলে রামদীন।

"নো! নো!" এবার লোকটা আরও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায়, "দিস ইজ লুজ। মেক দেম টাইটার। প্লিজ... আই বেগ অফ ইউ... প্লিজ...!"

রামদীন জানে, এই সাহেব বাংলা আর হিন্দি শুনে বুঝতে পারলেও বলতে পারে না মোটে। যা বলার ইংরিজিতেই বলে। ডাক্তারবাবুরা সবই বোঝেন, কিন্তু সে এদিকে একেবারেই কাঁচা। কেবল কয়েকটা শব্দ সে বোঝে। যেমন, "ওয়াটার, টয়লেট, ফুড—এইসব। সাহেব এর চেয়ে বেশি কাউকে কখনও কিছু বলেও না। আজকের মতো এত কথা তো নয়ই। তাই সে সাহেবের কথার একবর্ণও বুঝতে পারল না; কিন্তু ধারণা করে নিল, সাহেব নিশ্চয়ই শেকল খুলে দেওয়ার কথাই বলছে।"

"না না সাহিব, উ নহি হো সকত... যাও, সো যাও!" বলে সে আবারও ফিরে গেল নিজের জায়গায়। সাহেব তখনও "প্লিজ প্লিজ" বলে অনুনয় জানিয়ে যাচ্ছে।

রামদীন টুলে বসে হাতের তেলোয় খইনি ডলতে ডলতে ভাবতে লাগল, এই সাহেবকে কেন তিনতলার ঘরে রাখা হয়? এখানে রাখার কথা তাদের, যারা খুব বেশি পরিমাণে হিংস্র, আক্রমণাত্মক। অথচ এতদিনের কর্মজীবনেও সে কখনও সাহেবকে চেঁচিয়ে কথা অবধি বলতে শোনেনি। কেন যে সাহেবের হাত-পা শেকলে বেঁধে রাখা হয়, তা-ও সে জানে না। সাহেব খুবই ঠান্ডা মানুষ। অন্য রোগীরা অনেক সময় নার্স বা অন্য কর্মচারীর গায়ে কামড় বসাতে যায়, কী খামচে দেয়। তাদের মানসিক অস্থিতিশীলতার কথা বিবেচনা করে সকলকেই মানিয়ে নিতে হয়। ডাক্তারবাবুরা বারবার তা-ই বলেন। কিন্তু এই সাহেবকে কখনও কোনোদিন তেমনটা করতে দেখা যায়নি। মানুষটার হাত দুটোও কাটা। তবে কেন? এমন একটা মানুষকে অমন করে বেঁধে রাখে কেন?

ভাবতে ভাবতে রামদীনের মনে বেশ একটু মায়া হল। সে আবারও উঠে গেল সাহেবের ঘরের সামনে। ততক্ষণে ঘুমের ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে। সাহেব প্রায় অচেতন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। তবু ঘুমের মধ্যেই এখনও কী সব বিড়বিড় করে চলেছে।

একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে সে আবারও ফিরে আসে নিজের জায়গায়।

* * * * * * * *

দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রামদীন। কীসের যেন শব্দে আচমকা ভেঙে গেল ঘুমটা। চমকে উঠে সে এদিক-ওদিক চাইল একবার। কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কেন হচ্ছে, সেটা তখনই বুঝতে পারল না সে।

খানিক ধাতস্থ হয়ে রামদীন খেয়াল করল, অসম্ভব গরম লাগছে! হয়তো সেই কারণেই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু এই শীতকালে এমন গরম লাগা তো সম্ভব নয়। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করল সে। করিডোরের আলোগুলো সব কেমন নিবুনিবু হয়ে এসেছে। জ্বলছে, তবু তাতে অন্ধকার দূর হচ্ছে না। তবে কি ভোল্টেজের সমস্যা?

একটা ধাতব শব্দে আবারও সচকিত হয়ে উঠল সে। ও কীসের শব্দ হয়?

ঝনঝন ঝনাৎ!

উঠে দাঁড়াল রামদীন। এটা নিশ্চয়ই হাতকাটা সাহেবের ঘর থেকে আসছে। এত রাত্রে ঘুমের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও সে কি জেগে গিয়েছে?

সাহেবের ঘরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াতেই তার মনে হল, একেবারে তার কানের পিঠে বেশ জোরে কে তুড়ি বাজাল।

রামদীন রীতিমতো লাফিয়ে উঠল ভয়ে! গলার কাছে আটকে-থাকা হৃৎপিণ্ড নিয়ে সে বারবার এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল সেই হাত, যেটা এক্ষুনি তার কানের খুব... খুব কাছে তুড়ি বাজিয়ে গেল।

আওয়াজটা এতটাই স্পষ্ট ছিল যে এখনও তার কানে রেশ রয়েছে সেটার। অথচ এই আলো-আঁধারি বিরাট লম্বা করিডোরে সে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই।

ঝনঝন ঝনাৎ!

আবার সেই ধাতব শব্দ। রামদীনের মন কেন না জানি তাকে বারবার সংকেত পাঠাতে লাগল, এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে না গেলে তার সমূহ বিপদ!

তবু, মনের সেই ভাবটাকে চাপা দিয়ে দুরুদুরু বুকে সে এগিয়ে গেল হাতকাটা সাহেবের ঘরের দিকে।

প্রথমটায় ক্ষীণ আলোতে কিছুই চোখে পড়ল না তার। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর চোখ সয়ে আসতে যে দৃশ্য তার দু-চোখে ধরা দিল, তার কল্পনা হয়তো সে নিজের দুঃস্বপ্নেও করেনি কখনও!

প্রথমে সে বুঝতে পারল, প্রায়ান্ধকার কক্ষের মেঝের মাঝখানে সাহেব উবু হয়ে বসে আছে রামদীনের দিকে পিঠ দিয়ে। বসে সে কিছু একটা করছে। হাতের শেকল খোলার চেষ্টা করছে কি?

"গোরা সাহিব" বলে ডাকার জন্য সে মুখ খুলেছিল মাত্র, ঠিক তখনই, যেন তার উপস্থিতি আঁচ করেই সাহেব তার কাজ থামিয়ে মেরুদণ্ড টান করে বসল। তারপর উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে।

কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চাইল একবার। সেই চাউনি দেখে রামদীনের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। কী ভীষণ ক্রূরতা সেই মুখে!

খ্যাসখেসে কুৎসিত গলায় উচ্চারণ করল দুটো অবোধ্য কথা; 'হের পেমন!'

রামদীন গারদের কাছ থেকে পিছিয়ে এল দু-পা। আর সেই সঙ্গেই হাতকাটা সাহেব সামনের দিকে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু...

হাতকাটা সাহেবের হাতের দিকে তাকিয়ে রামদীনের ঘাড় পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল।

সাহেবের হাত আর মোটেই আগের মতো কনুইয়ের পর থেকে অসম্পূর্ণ নেই। সে দুটো এখন সম্পূর্ণ দুখানি হাত। আর সেই কনুইয়ের নীচ থেকে আঙুলের মাথা পর্যন্ত অংশের রং কুচকুচে কালো! সেই কালো অংশের ওপর জেগে রয়েছে লাল দগদগে শিরা-উপশিরা! তারা হৃৎস্পন্দনের তালে তালে স্পন্দিত হচ্ছে। আঙুলগুলো কী অস্বাভাবিকরকম লম্বা! অত লম্বা আর সরু আঙুল কি মানুষের হয়? উঁচু গাঁটগুলো স্পষ্ট হয়ে জানান দিচ্ছে হিংস্রতার। আর ওই ইগলের নখের মতো বাঁকানো ও তীক্ষ্ণ নখের সারি... কী বীভৎস!

আবারও বুকের রক্ত-জমানো স্বরে সে বলল, "হের পেমন!"

রামদীন একটামাত্র অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। ঠিক সেই সময় সমস্ত মুমূর্ষু আলো একসঙ্গে নিভে গিয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল গোটা তিনতলাকে। রামদীন হয়তো পালাবার জন্য ঘুরেও দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তার আগেই...

(৪)

"চেম্বার ঠিক মনে হচ্ছে? চলবে?" কৌতুক ভরে প্রশ্ন করলেন ড. সেন।

মিনার্ভাও মিষ্টি হেসে উত্তর করল, "দিব্যি চলবে!"

"বেশ, তোমার যা কিছু গোছগাছ করার আছে, করে নাও। তারপর তোমায় নিয়ে সব পেশেন্টের একটা সার্ভে করিয়ে আনব। তাতে তোমার একটা ধারণা হয়ে যাবে। আর

তারপর কয়েকজনের ডিটেল্‌ড রিপোর্ট দিয়ে দেব। সেগুলো ফলো করলেই... বাঃ!" ড. সেন নিজের কথা শেষ করার আগেই মিনার্ভার হাতে ধরা একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ওটা কি হাতে আঁকা?"

"হ্যাঁ।" হেসে উত্তর দিল মিনার্ভা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে দুজন কমবয়সি ছেলেমেয়ের হাসিমুখের ছবি। মেয়েটিকে দেখে সহজেই চিনতে পারলেন ড. সেন। মিনার্ভা।

"তোমার এই গুণটিও যে আছে, তা তো জানা ছিল না।" তিনি তখনও সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ছবিটির দিকে।

"না ডক্টর, আমার এই গুণ নেই একেবারেই! এই অসাধারণ গুণের অধিকারী আমার ছোটোভাই মার্টিন। এই ছবিতে যাকে আমার পাশে দেখছেন, সে। আমরা দুই ভাইবোন দুটো আলাদা শাখার সাধক বলতে পারেন। আমি সায়েন্স আর ও আর্টস। আমার ভাইটির গুণের অন্ত নেই, আর আমি একটি আস্ত বেগুন।" বলে হাসতে থাকে মিনার্ভা।

"তা-ই বুঝি? অসাধারণ আঁকার হাত তো ছেলেটির! হঠাৎ দেখলে হাতে আঁকা বলে বোঝাই যায় না। মনে হয় সাদা-কালো ছবি।"

"হ্যাঁ, ভাই ছোটোবেলা থেকেই খুব ভালো ছবি আঁকত; আর তেমনই সুন্দর হাতের কাজ। এখন আর্ট কলেজে পড়ছে।" বলতে বলতে সে ছবিটা ঝুলিয়ে দিল দেওয়ালের গায়ের ছোট্ট পেরেকে।

ড. সেন আরও হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ঘরের ভেতর একজন উর্দি-পরা ওয়ার্ডবয় ঝড়ের মতো এসে ঢুকল। তার বিভ্রান্ত চেহারা আর প্রায় ফেটে বের-হওয়া চোখ দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে এবং সেটা বেশ গম্ভীর সমস্যা।

"কী ব্যাপার? কী হয়েছে?" জানতে চাইলেন ড. সেন।

উত্তরে ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে কেবল তিনবারে উচ্চারণ করতে পারল, "তিনতলায়... শিগগির চলুন... রামদীন..."

ড. সেন এবং মিনার্ভা সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। ছেলেটিকে অনুসরণ করে তারা যখন অকুস্থলে এসে পৌঁছোল, তখন সেখানে অ্যাসাইলামের আরও অনেকে আগেই উপস্থিত হয়ে গিয়েছে। তাদের সকলের মধ্যেই কেমন একটা পাথুরে ভাব লক্ষ করল মিনার্ভা। যেন আশাতীত কোনো কিছু দেখে তারা হতবাক হয়ে থমকে গিয়েছে।

আরও এগিয়ে যেতেই ঘটনার উত্তাপটা আঁচ করতে পারল তারা একসঙ্গেই। একটি লোক মেঝেতে পড়ে রয়েছে চিত হয়ে... না না, চিত নয়, উপুড় হয়ে। আসলে তার শরীরটা উলটে রয়েছে; কিন্তু মাথাটা সম্পূর্ণরূপে ঘুরে গিয়ে সোজা তাকিয়ে করিডোরের সিলিং নিরীক্ষণ করছে! কিন্তু যে জিনিসটা সবচাইতে আশ্চর্য, সেটা হল রামদীনের হাত দুটোর অবস্থান। তার ডান হাতটা দিয়ে সে নিজের থুতনি ধরে রয়েছে আর বাঁ হাত রয়েছে ঘাড়ে। যেন মানুষটা নিজের মাথা ধরে নিজেই ঘুরিয়ে দিয়েছে ১৮০ ডিগ্রি!

মিনার্ভার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এমন অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে সে নিজেও প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে বাকিদের মতো, নিজের অজান্তেই।

ড. সেনের কথায় সংবিৎ ফিরল তার। "এসব কী? এ কেমন করে হল?" সামনে উপস্থিত বাকিদের উদ্দেশে উদ্‌বিগ্ন ও বিহ্বল স্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন শুকনো গলায় বলল, "জানি না, ডাক্তারবাবু। সকাল আটটায় ডিউটি চেঞ্জ হয়। কিন্তু আজ পনে ন-টা বেজে গেল, তবু রামদীনদা নামছে না দেখে আমিই উঠে এলাম দেখতে। ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। কিন্তু এসেই দেখি..." ঢোঁক গিলল সে, "তখন আমি দৌড়ে গিয়ে দোতলা থেকে বাকিদের ডেকে নিয়ে আসি।"

ড. সেন এবার খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন বোঝা গেল, কারণ তিনি এগিয়ে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন রামদীনের মৃতদেহের সামনে। তাঁর দেখাদেখি এগিয়ে এল মিনার্ভাও। ততক্ষণে অ্যাসাইলামের আরও কয়েকজন ডাক্তার উঠে এসেছেন সেখানে।

বৃথা জেনেও ড. সেন একবার রামদীনের হাতের কবজি তুলে দেখলেন। তারপর বললেন, "মৃত্যু হয়েছে অনেকক্ষণ। রিগার মর্টিস স্প্রেড করে গেছে। যদ্দূর মনে হচ্ছে, মিনিমাম ছ-ঘণ্টা তো হবেই। সে হিসেবে..." একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন, "ওই রাত তিনটে নাগাদ... বাট হাও? হাও ইজ ইট পসিব্‌ল?"

তাঁর কপালে গভীর ভ্রূকুটি দেখলে বেশ বোঝা যায়, ভেতরে ভেতরে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

মিনার্ভা কাছে এসে লক্ষ করল, শবদেহের নাকের কাছে কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মুখের ভাবে একটুও অস্বাভাবিকতা নেই। কেবল স্থিরদৃষ্টিতে মানুষটা তাকিয়ে রয়েছে ওপরদিকে। অথচ তার মাথাটা কী অদ্ভুতভাবে মুচড়ে একেবারে পিঠের দিকে করে দেওয়া হয়েছে! ড. সেনের প্রশ্নটাই মিনার্ভার মনেও খোঁচা দিতে লাগল, কেমন করে? কীভাবে এমন ভয়ংকর মৃত্যু হল লোকটার? কেউ কি হত্যা

করেছে তাকে? কিন্তু কে? আর কেনই বা করল? যদি করেই থাকে, তবুও এমন বীভৎস পদ্ধতিতে কেন? হত্যাকারীর দেহবল সম্বন্ধেও একটা উচ্চধারণা হল তার; কারণ প্রচণ্ড বলশালী না হলে, এমন প্রক্রিয়ায় খুন করা অসম্ভব। কিন্তু রামদীনের দু-হাতের অবস্থান তো অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে...

নিজের ভাবনাতেই ডুবে ছিল মিনার্ভা, তখনই একটা শব্দে চমকে উঠল সে। হয়তো তার সঙ্গে আরও অনেকেই। কে যেন কোথা থেকে ডুকরে কেঁদে উঠল হঠাৎ।

"৩০২ সেল... দ্যাখো তো একবার।" চট করে বললেন ড. সেন।

তাঁর নির্দেশ পেয়ে একজন ডাক্তার দ্রুতপায়ে এগোলেন সেদিকে। কৌতূহল সংবরণ না করতে পেরে মিনার্ভাও গেল সঙ্গে।

প্রশস্ত করিডোরের বাঁদিকে সারিবদ্ধ পাঁচটি ঘর। প্রথম থেকে তৃতীয় ঘরটি ৩০২। সেখানে গিয়ে ঘরের ভেতরে চোখ রেখে আরও বেশ একটা ধাক্কা খেল দুই কমবয়সি ডাক্তার।

ভেতরে যে মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে, সে এই অ্যাসাইলামের একজন রোগী, তাতে সন্দেহ নেই। ধবধবে ফরসা, লালচে চুলের মানুষটা হাউহাউ করে কাঁদছে। তার দু-হাতের কনুইয়ের নীচের অংশটা কাটা। হাতের সেই কাটা স্থান দুটি রক্তে লাল হয়ে আছে। আর মেঝের চারিদিকে চাপ চাপ রক্ত!

এই তাহলে সেই হাতকাটা সাহেব?

"মাই গড!" অস্ফুটে বলল সঙ্গী ডাক্তারটি। একবার সেলের গারদ ঠেলে দেখল সে। বন্ধ। তালা খুলতে হবে। মিনার্ভাকে সে বলল, "রামদীনের কোমরে দেখুন একটা চাবির গোছা আছে। কাউকে বলুন তাড়াতাড়ি..." তার কথা শেষ হবার আগেই নিজের কর্তব্য বুঝে মিনার্ভা অল্প ঘাড় নেড়ে ছুটে গেল যেদিকে রামদীনের দেহ পড়ে আছে।

সেলের তালা খুলে ঢুকতেই সাহেব আরও কাঁদতে লাগলেন আর বারবার ইংরিজিতে বিলাপ করতে লাগলেন, "আমার হাত কেটে দাও! কেটে ফ্যালো আমার হাত! দয়া করো! আমায় ছবি আঁকতে দিয়ো না... কেটে ফ্যালো আমার হাত দুটো..."

"ইশ্‌..." মিনার্ভা সাহেবের ক্ষতস্থান দেখে বলে ওঠে, "এমন করে কাটল কীভাবে?" তারপর চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ফার্স্ট এইড বক্স আনতে। একটি ছেলে দৌড়ে গেল নির্দেশপালনে। "নিশ্চয়ই ওর হাত ঠিকমতো বাঁধা হয়নি। দেখেছেন, চামড়ার স্ট্র্যাপ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে।" বলল সঙ্গী ডাক্তার।

"ওঁর হাত-পা কি সবসময় বাঁধা থাকে?"

"হ্যাঁ। নইলে লোকটা নিজেই নিজেকে হার্ট করে। এখনও তা-ই করেছে। হাত ছাড়াতে পেরে বকলসের পিন দিয়ে কী বিশ্রী করে হাতটা কেটেছে দেখুন!"

"টিটেনাস দিতে হবে..."

ছেলেটি ততক্ষণে ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এসেছে। প্রথমিকভাবে ড্রেসিং করে দিয়ে মিনার্ভা ইনজেকশন হাতে নিয়েছে, তখন সাহেব বলল, "আমি ওকে বললাম, আমার হাত ভালো করে বেঁধে দিতে। ও শুনল না... শুনল না!"

"কাকে বললেন? রামদীনকে?" সঙ্গী ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

সাহেব সে কথার উত্তর না দিয়ে মিনার্ভার দিকে তাকিয়ে বিস্ফারিত চোখে বলল, "সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে! তোমরা পালিয়ে যাও! পালিয়ে যাও! থেকো না এখানে। নইলে সে আসবে... সে আসবে..."

মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষটার কথায় খুব বেশি গুরুত্ব এই মুহূর্তে দিতে ইচ্ছে করছিল না তাদের কারোই। একটু আগেই ঘটে-যাওয়া বীভৎস ও একই সঙ্গে আশ্চর্য ঘটনায় তারা দুজনেই খুব বিচলিত।

ড্রেসিং শেষ করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাহেবের হাত আরও একবার ভালো করে শেকলে বেঁধে দিয়ে তারা যখন বেরিয়ে আসছে সেই ঘর ছেড়ে, তখন মেঝের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল মিনার্ভা।

মেঝেয় ছড়ানো রক্তের দাগ তার চোখে আগেই পড়েছিল। কিন্তু তেমন ভালো করে লক্ষ করেনি। এখন সে দেখল, মেঝেয় রক্ত এমনিই পড়ে নেই। তার নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন আছে। অর্থাৎ, সেখানে রক্ত দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে!

(৫)

নিজের ঘরের বিছানায় পা দুটো কম্বলে ঢেকে একটা নীলচে ফাইল হাতে তার হলদে হয়ে-আসা পাতায় চোখ ডুবিয়ে বসে আছে মিনার্ভা। চওড়া কপালে গভীর ভ্রূকুটি। একবার সে নিজের মনে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, "মোস্ট ইন্টারেস্টিং..."

সেই সময় ঘরের দরজার কাছ থেকে আরও একজনের স্বর শোনা গেল, "আগে বললে তো কোল্ড কফিই বানিয়ে দিতে পারতাম!"

"কী?" প্রথমটায় খেয়াল করে উঠতে পারল না মিনার্ভা।

"সেই এক ঘণ্টা আগে কফি দিয়ে গিয়েছি, সেটার দিকে একবারও দেবী দৃষ্টি দেননি! শীতল শরবত হয়ে গিয়েছে পড়ে থেকে থেকে। তাই বলছি, ঠান্ডা করেই যদি খেতে হয় তো কোল্ড কফিই দিতাম তোকে।" চোখ দিয়ে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা ঠান্ডা কফির কাপের দিকে ইশারা করল মার্টিন।

"ইশ্..." মিনার্ভা নাক কুঁচকে হাসল, "একদম মনে নেই রে, সরি!"

"কী অত পড়ছিস বল তো মন দিয়ে? ভ্রূ দুটো কুঁচকে তো একেবারে সেকেন্ড ব্র্যাকেট করে বসেছিলি!" বলতে বলতে মার্টিন দিদির বিছানায় উঠে বসল।

"কাজের প্রথম দিনই যে এমন অভিজ্ঞতা হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি!" দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে আপশোশ প্রকাশ করল মিনার্ভা।

"ও হ্যাঁ, পুরোটা তো শোনাই হল না! তারপর, পুলিশে খবর দিয়েছিল ওরা?"

"অবভিয়াসলি! ইট'স অ্যান আনন্যাচারাল ডেথ। খুবই আশ্চর্যজনক মৃত্যু। এবার বেশ ক-দিন জেরায় জেরায় জেরবার করে তুলবে!" ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল সে।

"আচ্ছা, এবার কী নিয়ে এত ভাবছিস তা-ই বল। কীসের ফাইল ওটা?"

"একজন পেশেন্টের ফাইল। যার কথা তোকে বললাম..."

"যে ওই হাত কেটে রক্ত দিয়ে মেঝেতে আর দেওয়ালে আঁক কেটেছে?"

"হ্যাঁ। সেই যাকে ওখানকার সবাই হাতকাটা সাহেব বলে। লোকটার জীবন খুবই বৈচিত্র্যময়!"

"এটা ওই ফাইলে লেখা আছে?" মার্টিন ফাইলের দিকে ইশারা করে ভ্রূ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"এটায় একটা ব্রিফ কেস হিস্ট্রি আছে। সেটা পড়েই বুঝতে পারছি। শোন, বলি..." সোজা হয়ে বসে মিনার্ভা বলতে লাগল, "ভদ্রলোকের জন্ম ইন্ডিয়াতেই। মুম্বই। মা ভারতীয়, বাবা আমেরিকান। জন্মের দু-বছরের মাথায় সপরিবারে চলে যায় ফ্রান্সে। ব্রটআপ, এডুকেশন সব ওখানেই। কিশোর বয়স থেকেই শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনে শিল্পচর্চা এবং পরবর্তীকালে চিত্রশিল্পী হিসেবে সুনাম অর্জন। একসময় খ্যাতির তুঙ্গে পৌঁছে যান! ২০১৪ সালে একটি খুনের মামলায় প্রথমবার পুলিশের খাতায় সন্দেহের তালিকায় নাম ওঠে। এরপর থেকে ওই বছরের ভেতর আরও বেশ কয়েকটি খুনের মামলায় সন্দেহের তালিকায় নাম ছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে সেই সন্দেহ টেকেনি। বলতে গেলে তখন থেকেই ভদ্রলোকের মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে।"

"আচ্ছা! তারপর?" মার্টিনের ভ্রূ-তেও এবার খাঁজ দেখা গেল। মনে হল, তার মনে কিছু একটা দাগ কেটেছে।

"তারপর সেই সিম্পটমসের একটা বর্ণনা দিয়েছে। তিনি নিজেকে সত্যি সত্যিই দোষী ভাবতে শুরু করেন। তিনি মনে করতে থাকেন, তাঁর ছবি আঁকার জন্যই এইসব হচ্ছে। এই যে সুনাম, অর্থ—এসব কিছুই থাকবে না এবং তিনিও একসময় খুন হবেন। সবসময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন, কারও সঙ্গে মিশতেন না, ছবি আঁকাও প্রায় ছেড়েই দেন। এমনকি তিনি নিজের সমস্ত আঁকার সরঞ্জাম, তুলি, রং, ইজেল—সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। কিন্তু তবুও এক-একসময় হাতের সামনে যা-ই পেতেন তা-ই দিয়ে যেখানে-সেখানে ছবি আঁকতেন। ছবি নয়, বলা ভালো, আঁকিবুকি কাটতেন। কিন্তু তার পরক্ষণেই যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে সেগুলোকে মুছে ফেলতে উদ্যত হতেন। যে জিনিসে আঁকতেন, সেই জিনিস হয় পুড়িয়ে ফেলতেন, নয় ভেঙে ফেলতেন। এমন করে বাড়ির দেওয়াল, মেঝে শাবলজাতীয় জিনিস দিয়ে ভেঙেছেন আঁকার পর; বিছানার চাদরে এঁকে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। একবার নিজের বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এমন আরও অনেক রীতিমতো ধ্বংসাত্মক কাজ তিনি করেন। তখন তিনি ঠিক করেন, সব ছেড়েছুড়ে মায়ের দেশ ইন্ডিয়ায় চলে আসবেন। কিন্তু তিনি মুম্বইতে না গিয়ে আসেন এই শহরে। কিছুদিন পরিস্থিতি স্বাভাবিকও হয়েছিল। কিন্তু আবারও সেই একই রকম সমস্যা শুরু হয়। তারপর নিজেকে ছবি আঁকার থেকে বিরত রাখতে একদিন..."

"একদিন তিনি নিজের দুই হাত কেটে ফেলেন! ভালোমানুষের মতো পরিচিত এক বন্ধুর কারখানায় গিয়ে, সেখানকার মেশিনে নিজের দুই হাত ঢুকিয়ে দেন সম্পূর্ণ সজ্ঞানে! তা-ই তো?"

"তুই জানলি কেমন করে?" মিনার্ভা অবাক হয়ে তাকায় ভাইয়ের দিকে।

"এই শিল্পীর নাম কী বল তো?" মার্টিন যেন উত্তেজনায় কাঁপছে, "ডোন্ট সে, ইট'স হেরল্ড ক্রুজ়!"

"হ্-হ্যাঁ... তা-ই তো। পুরো নাম ফ্রান্সিস হেরল্ড ক্রুজ়।

কিন্তু...”

কথা শেষ করতে পারল না মিনার্ভা। মার্টিনের চেপে রাখা উত্তেজনা যেন এবার উপচে বেরোল। সে লাফিয়ে উঠে বলল, “মাই গড! তুই জানিস তুই কার কথা বলছিস? ইট'স দ্য গ্রেট হেরক্রুজ়! একজন লিভিং লেজেন্ড! যাকে বলে কিংবদন্তি! এঁর আঁকা ছবি কত হাজার ডলারে বিক্রি হয়, তোর কোনো আইডিয়া আছে?”

“না মানে... বিখ্যাত আর্টিস্ট এটা ড. সেন বলেছিলেন, কিন্তু এতটা যে...”

“একটা সময় ছিল, যখন লোকটা সব্বাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল খ্যাতিতে। পৃথিবীর প্রথম দশজন সেরা চিত্রশিল্পীর মধ্যে ইনিও ছিলেন একজন। ধীরে ধীরে পয়লা নম্বরের দিকেও এগিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়েই শুরু হয় বিশ্ব জুড়ে পরপর শিল্পীদের রহস্যমৃত্যু ! আর তারপর থেকেই লোকটা কেমন যেন হারিয়ে গেল। আর আজ সেই মানুষটার কী দুরবস্থা! এখানকার এক বেনামি বেসরকারি মেন্টাল অ্যাসাইলামের খুপরিতে শেকল-বাঁধা অবস্থায় পচে মরছে! ছি ছি ছি...” আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল সে।

“লোকটা কিন্তু নিজেই এসেছিল এখানে। আই মিন, নিজেই তার চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ভরতি হতে এসেছিল। কেস হিস্ট্রি দেখে এবং যথেষ্ট ডেঞ্জারাস অ্যাকটিভিটি দেখে তাকে রেখে দেওয়া হয় এখানে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, সে নিজেই স্ট্রিক্টলি বলেছিল তার হাত বেঁধে রাখার কথা, যাতে সে কোনোভাবেই ছবি না আঁকতে পারে। মাসে মাসে মোটা টাকা আসে অ্যাসাইলামের অ্যাকাউন্টে। টাকাপয়সার নাকি কোনো অভাব নেই মানুষটার! বলতে গেলে ওর নির্দেশমতোই ওকে রাখা হয়।”

মার্টিন ঝট করে ঘুরল মিনার্ভার দিকে। বলল, “দিদি, আমার এই একটা রিকোয়েস্ট তোকে রাখতেই হবে! আমাকে একবার... শুধু একবার হেরক্রুজ়ের সঙ্গে দেখা করতে দে। মানুষটাকে দেখে আমি আমার জন্ম সার্থক করি। দিদি প্লিজ... তুই জানিস না, আমাদের কলাবিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বা যাদের আর্টসে আগ্রহ আছে, তাদের কাছে হেরক্রুজ়ের কীরকম ক্রেজ়!”

“বেশ, আমি চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে, আমার একবার কথা বলা দরকার লোকটার সঙ্গে...”

(৬)

(মে, ২০১৪, ফ্রান্স)

ঠোঁটের ফাঁকে নিভে-যাওয়া চুরুটটা আবারও জ্বালিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন শেরিফ গ্যাব্রিয়েল শ্যোলোভেট। গাড়ির দরজা সশব্দে বন্ধ করে সরু চোখে তাকালেন সামনের পেল্লায় বাড়িটার দিকে। প্রাসাদের ছাঁচে তৈরি বাড়িটার সামনে বিরাট সাজানো শৌখিন বাগান। সেখানে ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে শ্বেতশুভ্র পরিদের মূর্তি। সব মিলিয়ে বাড়ির মালিকের রুচির পরিচয় মেলে সহজেই।

এবার একজনকে ছুটে আসতে দেখা গেল বাড়ির ভেতর থেকে। সে গ্যাব্রিয়েলের সামনে এসে স্যালুট ঠুকে বলল, “ইভনিং স্যার! আসুন...”

“কী অবস্থা ভেতরের?” প্রশ্ন করল গ্যাব্রিয়েল।

“খুব খারাপ... ভয়ংকর অবস্থা, স্যার!” ঢোঁক গিলল হেনরি, গ্যাব্রিয়েলের সহকারী, “এমন সাংঘাতিক কাণ্ড এত বছরের পুলিশি জীবনে অন্তত আমার চোখে পড়েনি!”

“একবারে তিন তিনটে বিশেষণ ব্যবহার করে ফেললে দেখছি! ঘাবড়ে গিয়েছ মনে হচ্ছে...”

মুখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে হেনরি বলল, “আপনি একবার ভেতরের অবস্থাটা যদি দেখেন স্যার, আপনিও বুঝবেন, আমি কেন এমন করছি।”

“বেশ, চলো দেখি...” বলে সে পা বাড়াল মোরাম-বিছানো রাস্তা ধরে; “কেউই কি বেঁচে নেই?” হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল সে।

“একটাও জীবিত প্রাণ নেই, স্যার।”

ততক্ষণে তারা পৌঁছে গেছে বাড়ির ভেতর। বাইরের ঘর পেরিয়ে ড্রয়িং রুমে পা রাখতেই এতদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুলিশজীবন সত্ত্বেও একবার গা-টা শিউরে উঠল তার।

মেঝের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কতকগুলো শব। এগুলো মানুষের নয়, কুকুরের।

গুনে দেখল গ্যাব্রিয়েল। পাঁচ। আর পাঁচটি কুকুরই অত্যন্ত শৌখিন প্রজাতির। জীবিতাবস্থায় এরা মানুষের মনে যতটা আনন্দ আর ভালো-লাগা উদ্রেক করত, এখন ঠিক ততটাই ভয়মিশ্রিত ঘৃণা টেনে আনছে। কারণ তাদের সকলেরই মাথাগুলো শরীর থেকে আলাদা হয়ে পড়ে আছে এদিক-ওদিক। কোন মাথা কোন শরীরের, সেটা বুঝে উঠতে বেশ সময় লেগে যায়। মেঝে ভেসে-যাওয়া রক্ত শুকিয়ে চটচটে হয়ে আছে।

কুকুরপ্রেমী গ্যাব্রিয়েল এই দৃশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করতে

পারল না। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে বলল, ''বাকি ঘরের কী কন্ডিশন?''

''আসুন আমার সঙ্গে...'' বলল হেনরি।

হেনরির সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে সে আরও তিনটি দেহ দেখতে পেল সে। এগুলো অবশ্য মানুষের।

দুজন মহিলা এবং একটি শিশু। তাদের প্রত্যেকেরই কণ্ঠনালি কেউ বা কারা কোনো ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত নির্মমভাবে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ফালা করে দিয়েছে! ফলে হাঁ হয়ে রয়েছে তাদের গলার ওই অংশ। ছিন্ন শিরা-ধমনি দেহের সবটুকু শোণিত উগরে দিয়ে এখন নিস্পন্দ হয়ে স্পষ্ট ধরা পড়ছে চোখে।

দুজন মহিলার মধ্যে যার বয়স ত্রিশের কোঠায়, তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে হেনরি বলল, ''এ হল ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী, এমিলি ড্যালিয়ার। অপরজন এই বাড়ির পরিচারিকা, জেনি। আর ওই বাচ্চাটা, প্যাট্রিক ড্যালিয়ার এবং এমিলি ড্যালিয়ারের পুত্র।''

''বয়স তো বছর দশেকের বেশি হবে না।'' মন্তব্য করল গ্যাব্রিয়েল।

''হ্যাঁ স্যার, খুবই নৃশংসভাবে মারা হয়েছে।''

''আর মি. ড্যালিয়ার? তিনি কোথায়?''

''ওপরে, বেডরুমে...''

মার্বেলের সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে তারা দুজন প্রমাণাকারের শোবার ঘরে উঠে আসতেই নৃশংসতার সকল সংজ্ঞা-ছাপানো একখানা দৃশ্যপট তাদের চোখের সামনে ধরা দিল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটি পুরুষের মুণ্ডহীন দেহ। দেহের দু-দিকে ছড়ানো হাত দুটিতে ধরা রয়েছে দুটি জিনিস। ডান হাতে ধরা রয়েছে একটি বেশ বড়ো সাইজের মাংস কাটার ছুরি, যার ফলাটা শুকিয়ে-যাওয়া রক্তে কালচে রং ধারণ করেছে এবং বাঁ হাতের মুঠিতে ধরা রয়েছে একটি মাথা। কাটা মাথা। সেই মুঠিতে চুল খামচে-ধরা মাথাটা আর কারও নয়, সেই ব্যক্তির নিজেরই। অর্থাৎ প্রথিতযশা শিল্পী ও ভাস্কর প্যাট্রিক ড্যালিয়ার।

''কী মনে হচ্ছে, স্যার?'' হেনরির কথায় সংবিৎ ফিরল গ্যাব্রিয়েলের। এমন বীভৎস দৃশ্য দেখে তার মুখে কথা জোগাচ্ছিল না।

''হ্যাঁ? ও... বডির অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে, লোকটা নিজের মাথা নিজেই কেটেছে। কিন্তু... দিস ইজ় ইম্পসিব্‌ল! একটা মানুষ কখনোই এমনভাবে ছুরিজাতীয় জিনিস দিয়ে কেটে নিজের মাথা দেহ থেকে একেবারে আলাদা করে দিতে পারে না। এ অসম্ভব!''

''আমিও তো সেটাই ভাবছি স্যার; কিন্তু লোকটা যেভাবে, আই মিন, যেমন শক্ত হাতে ছুরি আর মাথাটা ধরে রয়েছে, তাতে কিন্তু...''

হেনরির কথা শেষ হবার আগেই গ্যাব্রিয়েল এগিয়ে গেল মুণ্ডহীন দেহটার দিকে। না, ঠিক দেহটার দিকে নয়, দেহের মাথার... বা বলা ভালো, গলার দিকের দেওয়ালে ঝোলানো একটা পেইন্টিং-এর দিকে। ছবিটার দিকে মন দিয়ে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর সে নিজের মনেই বলে উঠল, ''যা ভেবেছি, ঠিক তা-ই...''

''কী ব্যাপার, স্যার? ওই ছবিতে কিছু আছে নাকি?'' হেনরি জানতে চায়।

''এই ছবিটাও হেরক্রুজ়ের আঁকা। এই দ্যাখো, ছবির কোনায় সিগনেচার।''

''আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, স্যার, যে আজ পর্যন্ত যে ক-টা আর্টিস্টের মৃত্যু হয়েছে এমন অদ্ভুতভাবে, তাদের সব্বার ঘরে কেন এই লোকটারই আঁকা ছবি থাকে?''

''শুধু ঘরে থাকে বলছ কেন হেনরি? প্রত্যেক শিল্পীর দেহ পাওয়া গিয়েছে ঠিক ছবিটার সামনে! ব্যাপারটা কি নিতান্তই কাকতালীয়? কিন্তু এতটা সমাপতন হয় কী করে?'' ঘরের যেটুকু স্থানে রক্তের ঢেউ লাগেনি, সেই জায়গায় অল্প পায়চারি করতে করতে গ্যাব্রিয়েল নিজের মনেই যেন টুকরো সূত্রগুলো সাজাতে লাগল, ''বিগত পাঁচ মাসে পরপর সাতজনের মৃত্যু। সাতজনই জগৎখ্যাত শিল্পী। মৃত্যুগুলো যেমন অদ্ভুত, তেমনই মর্মান্তিক। অথচ সব ক-টাই আত্মহত্যা! অন্তত অটোপ্সি রিপোর্ট তা-ই বলেছে। কিন্তু এমন আত্মহত্যা কখনোই কেউ শোনেনি, তাই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। হেনরি, প্রথম কেসটা কবে হয়েছিল, তোমার মনে আছে?''

''হ্যাঁ স্যার। জানুয়ারিতে। পনেরোই। শিল্পী রবার্ট ব্রেট।''

''ইয়েস। নিজের বাংলোর ড্রয়িং রুমে কাউচে বসে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, সেই সময় লোকটি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ছিল। এইরকম অবস্থায় কেউ যদি নিজের গায়ে আগুন লাগায়, তখন সে জ্বলুনি আর যন্ত্রণায় পাগলের মতো ছোটাছুটি করে বাঁচার জন্য। সেই সঙ্গে চিৎকারও করে। অথচ রবার্ট ব্রেট একই জায়গায় ঠায় বসে ছিল। একচুল নড়েনি নিজের জায়গা থেকে। যেন একটা মূর্তি; যার কোনো অনুভূতি নেই, সংজ্ঞা নেই, বোধ নেই। সম্পূর্ণ সচেতন একজন মানুষ কখনোই গায়ে আগুন লাগার পরে অমন শান্ত হয়ে একই স্থানে বসে

থাকতে পারে না। লোকটার দেহ কোনো কিছু দিয়ে বাঁধাও ছিল না, সেরকম কোনো ট্রেস আমরা পাইনি। তবে?"

"ওই লোকটার ডেডবডিও যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে দেওয়ালে ঝুলছিল এই হেরক্রুজ় নামের শিল্পীর আঁকা ছবি! যদিও বডির প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না; সবই জ্বলে কয়লা হয়ে গিয়েছিল, তবু বোঝা যাচ্ছিল, সে কাউচটাকে ওই ছবির দিকে ঘুরিয়ে বসেছিল। অর্থাৎ গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার সময় তার মুখ ছিল ছবির দিকে। মনে হয় যেন... যেন..."

হেনরিকে ইতস্তত করতে দেখে গ্যাব্রিয়েল নিজেই বলে, "যেন ছবিটাকে দেখতে দেখতে বা ছবিটাকে দেখিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেছে, যেন নিজেকে উৎসর্গ করছে, তা-ই তো?"

"হ্-হ্যাঁ স্যার... মানে ব্যাপারটা খুব ইয়ে... তবু..." হেনরি খানিকটা দ্বিধা কাটিয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "মানে আপনি দেখুন, সব ক-টা বডিই কিন্তু আমরা ওইভাবে পেয়েছি। কিন্তু খামোখা লোকগুলো একটা ছবির প্রতি নিজেকে কেন... তা ছাড়া ছবিগুলো কিন্তু একরকমও নয়। আলাদা আলাদা। আর খুব সাধারণ; বিশেষ কিছুই নেই।"

"বিশেষ কিছু থাকলেও সেটা আমাদের চোখে পড়ছে না। আরও ভালোভাবে লক্ষ করতে হবে। কিন্তু আমি ভাবছি আরেকটা কথা। এই হেরক্রুজ়ের ছবি সব ক-টা ক্রাইম স্পটে আছে অথচ লোকটার কী স্ট্রং অ্যালিবাই! কোনোভাবেই লোকটার বিরুদ্ধে কোনো এভিডেন্স জোগাড় করতে পারছি না। কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, এইসব ঘটনার পেছনে কোনো না কোনোভাবে হেরক্রুজ় জরিত।"

"ওর কি কোনো মোটিভ আছে, স্যার?"

"কী বলছ হেনরি? মোটিভ নেই! এদের সব্বাই যে হেরক্রুজ়ের প্রতিদ্বন্দ্বী! বিশ্বের প্রথম সারির শিল্পী এরা। প্রথম দশজনের মধ্যে এদের নাম থাকে। সেই সঙ্গে অবশ্য হেরক্রুজ়ের নামও থাকে, তবে সে একটু পেছনের দিকেই। বাকিরা সবাই তালিকায় তার আগেই..."

"হেরক্রুজ় কত নম্বরে স্যার?"

"আর্টের ব্যাপারে তেমন জ্ঞান নেই আমার, কিন্তু তদন্তের খাতিরে একটু চর্চা করে যা জেনেছি, হেরক্রুজ় আছে নয় নম্বরে..." হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল গ্যাব্রিয়েলের মাথায়। "মাই গড! ব্যাপারটা আমার মাথায় আগে আসেনি কেন?"

"কী স্যার? কী আসেনি?"

গ্যাব্রিয়েল ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে চেঁচিয়ে বলে গেল, "এরপর কার পালা, সেটা জানতে হবে। ওই সেরা শিল্পীর তালিকাই বলে দেবে আমাদের। চাইলে এখনও তাকে বাঁচাতে পারি আমরা! শিগগির এসো আমার সঙ্গে, কুইক!"

হেনরি একটু থমকে গিয়েছিল গ্যাব্রিয়েলের আকস্মিক আচরণে। তাই রেসপন্স করতে একটু দেরি হল তার। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় একবার দেওয়ালে ঝুলতে-থাকা ছবিটার দিকে তাকাল সে।

এক ঘোড়সওয়ার তার তরোয়াল উঁচিয়ে রেখেছে, বিজয়ের ভঙ্গিতে। তার পেছনের দৃশ্যপটে ঘন নীল রাতের আকাশ। সেই আকাশে জ্বলজ্বল করছে গোল রুপোলি চাঁদ। ঘোড়সওয়ারের উদ্যত তরোয়াল চাঁদের ওপর দিয়ে তির্যকভাবে অবস্থান করছে। যেন সেটি চাঁদকে মাঝখান থেকে তির্যকভাবে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

(৭)

"সুপ্রভাত, মি. ক্রুজ়! আমায় চিনতে পারছেন তো? সেই যে আপনার হাতের ড্রেসিং করে দিলাম আগের দিন। বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন আপনি...", বলতে বলতে মিনার্ভা হেরক্রুজ়ের সামনে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসল, "আমি ডক্টর মিনার্ভা গোম্‌স।"

প্রত্যুত্তরে সামনের মানুষটা একবার মুখ তুলে চাইল মিনার্ভার দিকে। ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

মিনার্ভা আবারও সপ্রতিভ স্বরে বলল, "আমি শুনলাম, আপনি খুব বড়ো একজন আর্টিস্ট! আমি যদিও আর্টের ব্যাপারে তেমন কিছু বুঝি না, তবে আমার ছোটোভাইয়ের থেকে আপনার ব্যাপারে শুনেছি। ওর আবার আর্টের দিকে খুব ঝোঁক। ভীষণ ভালো আঁকে..." কথাবার্তা সে ইংরিজিতেই বলছে। রোগীকে সহজ করে তুলতে তার সঙ্গে ভাব করে নেওয়াটা কতটা যে জরুরি, সেটা একজন সাইক্রিয়াটিস্ট হিসেবে মিনার্ভা খুব ভালোভাবেই জানে।

"আঁকে?" এই প্রথম অপরদিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

মিনার্ভা দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ... আঁকে তো! আঁকে, স্কাল্পচার বানায়, আরও কত কিছু তৈরি করে..."

এবার কেবল মাথা নাড়ল সাহেব।

"আপনার নাম তো ফ্রান্সিস হেরল্ড ক্রুজ়, তবে সবাই যে আপনাকে হেরক্রুজ় বলে ডাকে?"

"ভক্তরা দিয়েছিল নাম... হেরল্ড ক্রুজ় থেকে হেরক্রুজ়... পরে ওই নামেই সই করতাম ছবিতে..." একটু যেন আনমনে, খানিক টেনে টেনে উচ্চারণ করল কথাগুলো সাহেব।

সাবজেক্টের দিক থেকে রেসপন্স আসছে। খুশি হল মিনার্ভা।

"বেশ সুন্দর তো। বাই দ্য ওয়ে, আপনি ভারতে কবে এসেছিলেন?", গল্পচ্ছলেই কাজের কথা পাড়ল মিনার্ভা।

"২০১৬..."

"এটা কত সাল জানেন?"

একটু বিরতির পর উত্তর এল, "২০১৯।"

"বাঃ! একদম ঠিক।", সাবজেক্টের কথাবার্তায় তেমন অসামঞ্জস্য লক্ষ না করে সে আরও উৎসাহিত হল, "আচ্ছা, ভারতে আসার সময় আপনি একাই এসেছিলেন নাকি আরও কেউ ছিল?"

"ছিল... হার্বার্ট... আমার চাকর... আরেকজন ছিল... জনাথান... ও আমার সঙ্গে আসেনি... পালিয়ে গিয়েছিল..."

"পালিয়ে গিয়েছিল? কেন?"

সাহেব এবার মুখ তুলে চাইল মিনার্ভার দিকে। এক টুকরো বাঁকা হাসি বিঁধিয়ে বলল, "আমার এখানকার ঠিকানায় আমার চাকর হার্বার্ট থাকে, ওকে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করবে..."

"কেন, আপনি বলবেন না?"

উত্তরে সাহেব কেবল দু-পাশে মাথা নাড়ল।

একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে মিনার্ভা আবারও কথা শুরু করল, "বেশ... কিন্তু আপনি কেন নিজেকে এমন করে আঘাত করেন বলুন তো? আপনার নিজেরই তো কষ্ট হয়, ব্যথা পান, তা-ই না? আপনি শুনেছি বন্ধুর চামড়ার কারখানায় গিয়ে, সেখানকার যন্ত্রে নিজের দুটো হাত ঢুকিয়ে দেন। আর আজ দেখুন আপনার কী অবস্থা! আর তো ছবিও আঁকতে পারেন না!"

"না!" সাহেবের স্বর যেন একটু চড়ল, "আমি ছবি আঁকব না... ছবি আঁকব না..."

"কেন? ছবি আঁকতে আপনার ভালো লাগে না?"

আগের কথায় হেরক্রুজ়ের মুখে একটা ক্ষোভের ছায়া পড়েছিল। এই প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছায়া সরে গিয়ে তার মুখে দেখা দিল একটা করুণ ভাব। সে গভীর স্বরে কতকটা নিজের মনেই বলল, "লাগে তো... খুব ভালো লাগে... রং-তুলিতে আমার প্রাণ আটকে থাকে... ছবি আঁকা তো আমার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা!"

"তবে? তবে কেন এমন করলেন?"

হেরক্রুজ় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, "লোভ..."

"কীসের লোভ?"

সেই কথার উত্তর না দিয়ে হেরক্রুজ় বলল, "আমার হাত দুটো কেটে ফেলবে?" সাহেবের কথার মধ্যে যেন একটা বুকভাঙা আর্তি ছিল।

"কেন কেটে ফেলব? ছি!", খুব নরম সুরে বলল মিনার্ভা।

"নইলে যে আমি আবার ছবি এঁকে ফেলব... আর ছবি আঁকলেই..."

"ছবি আঁকলেই?"

"ও আসবে...", চোখ গোল করে খসখসে গলায় বলল হেরক্রুজ়।

মিনার্ভা লক্ষ করল, সাহেবের চোখে-মুখে একটা আতঙ্কের গ্রহণ লাগছে যেন।

"কে আসবে?"

"সেই যাকে আমি ডেকেছি... আরাধনা করেছি... লোভের বশে... লোভ! লোভ! লোভ!", বলতে বলতে সে এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকিয়ে ছটফট করতে লাগল।

মিনার্ভা উঠে গিয়ে সাহেবের দুই কাঁধে হাত রেখে ভরসা দেবার ভঙ্গিতে বলল, "শান্ত হন... কিচ্ছু হয়নি... আমাকে বলুন, কীসের ভয় আপনার? কার জন্য আর ছবি আঁকেন না?" সাহেব ত্রাস মিশ্রিত দৃষ্টিতে মিনার্ভার দিকে চেয়ে বলল, "আমি ছবি আঁকলে আবার আসবে মৃত্যু... গিলে খাবে মানুষকে... ওরা নিজেরাই শেষ করবে নিজেদের... ঠিক ওদের মতো..."

"কাদের মতো?", ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মিনার্ভা।

"সেই যাদের আমি ছবি দিয়েছিলাম... ব্রেট... রবার্ট ব্রেট... হান্স ক্লার্ক... অ্যাবিলিও বাস্টিন... মারকাস বাস্টিন... স্যান্ডার লারস... পিয়েত্রো গ্রেচ... প্যাট্রিক ড্যালিয়ার..."

"এরা কারা?"

সাহেব হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল। এমন আকস্মিক ভাব পরিবর্তনে মিনার্ভা একটু চমকালেও, সামলে নিল। সন্তর্পণে শুইয়ে দিল সাহবকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "আমায় না বললে, আমি বুঝব কেমন করে? আচ্ছা থাক। আপনি শান্ত হন। আমি আবার পরে আসব..."

সাহেবের কান্নার দমক একটু কমল বটে; কিন্তু তখনও সে ফোঁপাচ্ছে আর বিড়বিড় করে বলছে, "আমায় ছবি আঁকতে দিয়ো না... দিয়ো না... ছবিগুলো নষ্ট করে ফ্যালো... কেটে ফ্যালো আমার হাত দুটো..."

(৮)

মার্টিন ঘরে ঢুকে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলল, "দিদি, এক কাপ কড়া করে চা দে-না প্লিজ়। বড্ড মাথা ধরেছে।"

"হাত-মুখ ধুয়ে বোস। চা দিচ্ছি।" বলে মিনার্ভা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

মার্টিন ওয়াশরুমে না গিয়ে তার ক্লান্ত শরীরটা ছড়িয়ে দিল সোফার ওপর। সোফার সামনের কাচের টি-টেবিলের ওপর ছড়ানো রয়েছে কিছু কাগজপত্র, ফাইল আর একটা ডায়েরি। মিনার্ভা কাজ করছিল এতক্ষণ। ডায়েরিটা খোলা অবস্থাতেই রয়েছে তখনও। পাতার ওপর রাখা খাপ-খোলা একটা পেন। মিনার্ভা লেখার মাঝপথেই উঠে গিয়েছে মার্টিনের জন্য দরজা খুলে দিতে। ডায়েরির খোলা পাতায় কিছু লেখা রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল মার্টিন।

১৬/১২/২০১৯

(সাবজেক্ট- ফ্রান্সিস হেরল্ড ক্রুজ়)

সিম্পটমস- নিজেকে আঘাত করা ও কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা। বিশেষ করে নিজের হাতের প্রতি। ছবি আঁকতে চায় না (ভয় পায়?)। মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কথাবার্তা, বিলাপ।

প্রশ্ন- ১) জনাথান পালিয়ে গিয়েছিল কেন?
২) 'লোভ'? কীসের?
৩) ছবি আঁকতে চায় না কেন?
৪) ছবি আঁকলে কে আসবে?
৫) 'তাকে' এত ভয় কেন?
৬) কার আরাধনা করেছে?
৭) ওই সাতজন কারা?
৮) 'ওরা নিজেরাই শেষ করবে নিজেদের'—এই কথার অর্থ কী?

"এই নে চা..." মিনার্ভা কাপ এগিয়ে দেয়।

মার্টিন কাপ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তোকে তো ডাক্তার বলেই জানতাম। গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিস কবে থেকে?"

মিনার্ভা উত্তর দেয় না, কেবল হাসে।

"এসব কী প্রশ্ন লিখেছিস?" আবারও প্রশ্ন করে মার্টিন।

"এগুলো খটকা... আজ লোকটার সঙ্গে কথা বললাম, বুঝলি। সেই কনভার্সেশন থেকে এই প্রশ্নগুলো মাথাচাড়া দিচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিকমতো খোলসা হচ্ছে না। লোকটাকে যতটা রহস্যময় প্রথমে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি তার চেয়েও ঢের বেশি রহস্যময়!"

"বাপ রে বাপ! তুই তো একেবারে ফেলুদা স্টাইলে কথা বলছিস রে! কেসটা কী, একটু ঝেড়ে কাশ তো, হেরক্রুজ়কে নিয়ে এতটা মেতে উঠলি যে?"

মিনার্ভা গুছিয়ে বসল। নিজের চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে বলল, "দেখ, লোকটার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, তার বাস্তব জ্ঞান রয়েছে। স্মৃতিশক্তিও দুর্বল নয়। কথা বলার ভঙ্গি প্রথমটায় বেশ স্বাভাবিক ছিল। শান্ত, পরিমার্জিত। ভায়োলেন্সের চিহ্নমাত্র নেই। সামান্য যা নড়বড়ে ভাব ছিল, অমনটা আমাদের আশপাশের বহু মানুষের মধ্যেই দেখা যায়; বরং বেশিই দেখা যায়। তা ছাড়া লোকটা এতগুলো বছর একটা আধো-অন্ধকার ঘরে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় বন্দি হিসেবে কাটাচ্ছে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে।"

"মানে তুই বলতে চাইছিস, হেরক্রুজ় পাগল না?"

"সেটা কেমন করে বলি? মানসিক অসুস্থতা না থাকলে কেউ নিজেকে এমন বিশ্রীভাবে আঘাত করে? নিজের হাত নিজে কেটে ফ্যালে? অসুস্থ না হলে কেউ ওভাবে বিলাপ করে না অকারণে। লোকটা আঁকতে ভালোবাসে আজও, তবু আঁকতে চায় না। ভয় পায়। ছবি আঁকতে ভয় কীসের? আর ছবি আঁকার কথা তুলতেই তার কথার মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিতে শুরু করে। তার আগে পর্যন্ত যথেষ্ট ঠিকঠাক। কেবল ছবি আঁকার বেলাতেই কেন?" মিনার্ভা নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবনায় ডুব দিল।

"হেরক্রুজ় তোকে ঠিক কী বলেছে বল তো?" মার্টিন আবারও দিদিকে ভাবনার মেঘ থেকে নামিয়ে আনে।

মিনার্ভা সবিস্তারে বলে তার আর হেরক্রুজ়ের কথোপকথন।

সব শুনে মার্টিন জিজ্ঞেস করে, "ওই সাতটা নাম কী ছিল, মনে আছে?"

"হ্যাঁ, আছে তো। আমি নীচে নেমে এসে সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরিতে লিখে ফেলেছিলাম। ডায়েরির আগের পাতাটা উলটে দেখ, লেখা আছে..."

পাতা ওলটাল মার্টিন। পরপর লেখা নামগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিজের মনেই অস্ফুটে বলল, "মাই গুডনেস!"

"কী হল? এই নামগুলো জানিস তুই? চিনিস এদের?"

মার্টিন বড়ো বড়ো চোখ করে বলল, "এঁদের চেনে না, এমন শিল্পপ্রেমী দুনিয়ায় আছে কি না সন্দেহ!"

"এরা কি সবাই আর্টিস্ট?"

"পৃথিবীর সেরা দশজনের সাতজন! আর এঁদের নিয়েই সজ থেকে কয়েক বছর আগে সারা বিশ্ব তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল!"

"কেন? শিল্পকর্মের জন্য..."

"না না না..." মিনার্ভার কথা শেষ করতে দেয় না মার্টিন, "সৃষ্টির জন্য নয়, ধ্বংসের জন্য!"

"হেঁয়ালি করিস না ভাই, স্পষ্ট করে বল!" অধৈর্য হয় সে।

"মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে পরপর সাতজন বিশ্বসেরা শিল্পী আশ্চর্যজনকভাবে মারা যান! আর সেই মৃত্যুগুলো ছিল বীভৎস! অথচ বলা হয়েছিল, তাঁরা নাকি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু অমন ভয়ংকর আত্মহত্যা কেউ কখনও করেছে বলে জানা যায় না। শুনলে সুইসাইড বলে বিশ্বাসই হতে চায় না। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এঁদের প্রত্যেকের বডির কাছে ছিল হেরক্রুজের আঁকা ছবি। ইন ফ্যাক্ট, তারা সবাই ওই ছবিটার সামনেই সুইসাইড করে!"

"হ্যাঁ, একটু একটু যেন মনে পড়ছে। এরকম কিছু একটা সেই সময় কানে এসেছিল বটে। সেটা তো আই গেস ৪-৫ বছর আগের কথা।"

"এগজ্যাক্টলি! আর তখন প্রথম সন্দেহ যায় হেরক্রুজের ওপর... অবভিয়াসলি!"

"দ্যাট'স হাও হি বিকেম দ্য সাসপেক্ট..."

"ইয়েস, সিস্টার। কিন্তু কোনো পোক্ত এভিডেন্স পাওয়া যায়নি হেরক্রুজের বিরুদ্ধে। তাঁকে অনেকবারই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়; কিন্তু শুধুমাত্র ক্রাইম স্পটে তাঁর আঁকা ছবি পাওয়া গেছে—এই অজুহাতে তো আর কাউকে গ্রেফতার করা বা শাস্তি দেওয়া চলে না! যেখানে লোকটার অ্যালিবাই ছিল মজবুত। ছিল আই উইটনেসও!"

"তার মানে এই সময় হেরক্রুজের ওপর দিয়ে প্রচুর মানসিক ঝড় যায়। ইনভেস্টিগেটররা তো খুব একটা মসৃণ পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করেন না। তাঁদের ব্যবহার বেশ রাফ হয়। আসলে পেশাগত কারণে করতে হয়; কিন্তু তাতে অপর পক্ষের মানসিক অবস্থার বেশ অবনতিও ঘটে। সবাই ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারে না।"

"আরেকটা জিনিস তুই ভুলে যাচ্ছিস, দিদি। বিশ্বের সেরা দশজন শিল্পীর তালিকায় কিন্তু হেরক্রুজের নামও ছিল। টু বি প্রিসাইস, হেরক্রুজ ছিল নয় নম্বরে।"

"মানে তুই বলতে চাইছিস, হেরক্রুজও ওইভাবে মারা যেতে পারত?"

"অসম্ভব তো নয়। নইলে বেছে বেছে ওই দশজনের মধ্যেই সাতজন মারা গেল কেন? আর ঠিক সিরিয়ালি। কেউ আগে-পরে নয়..."

"তার মানে এই ধারণা থেকে এসেছিল ভয়। প্যানিক। একটু একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি মনে হয়। কিন্তু ভাই, সাতজনের পর তো আরও দুজনের মারা যাওয়ার কথা ওই তালিকা অনুযায়ী। তাঁরা তো মনে হয় মারা যাননি?"

"না। তাঁরা এখনও দিব্যি বেঁচে আছেন। শেষ মারা গিয়েছিলেন প্যাট্রিক ড্যালিয়ার। তারপরেই হঠাৎই এই মৃত্যুলীলা বন্ধ হয়ে যায়। গোটা বিশ্ব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। শুনেছিলাম, এই কেসের যিনি তদন্তকারী অফিসার ছিলেন, তাঁরই দক্ষতায় বাকি শিল্পীরা রক্ষা পান। কী যেন ছিল লোকটার নাম... কী যেন... হ্যাঁ! গ্যাব্রিয়েল শ্যেলোভেট।"

"বাট হাও?"

"একটা ডকুমেন্টারিতে দেখেছিলাম, তিনি নাকি বাকি শিল্পীদের কাছে খোঁজ নেন, তাঁদের ঘরে হেরক্রুজের আঁকা ছবি আছে কি না? তাঁরা সকলেই জানান, আছে। তাঁদের সবাইকেই হেরক্রুজ নিজের হাতে আঁকা ছবি উপহার দিয়েছিলেন। আরেকটা বিষয় তাঁরা বলেছিলেন, কিন্তু জানি না তাতে কতটা সত্যতা আছে।"

"কী বিষয়?"

"তাঁরা বলেছিলেন, হেরক্রুজের উপহার পাওয়ার পর থেকেই তাঁদের বাড়িতে আর জীবনে বিভিন্ন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে থাকে। কিছু আনন্যাচারাল বা সুপারন্যাচারাল ব্যাপার। তাঁদের সবার বয়ান মোটামুটি এক। সবাই রাতে কুৎসিত দুঃস্বপ্ন দেখেন। মাঝরাতে শুনতে পান কাদের সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ আর ফিসফিসানি। বাড়ির তাপমাত্রা অস্বাভাবিকরকম বেড়ে যেত। কেউ কেউ ঘুমের ঘোরে বারবার ওই ছবির সামনে চলে যেতেন। অথচ তাঁদের কারোই স্লিপ ওয়াকিং-এর অভ্যেস নেই। ছবিটা নিয়ে তাঁরা ভয়ে ভয়ে থাকতেন।

"গ্যাব্রিয়েল শ্যেলোভেট এইসব জানতে পেরে তাঁদের অবিলম্বে ওই ছবিগুলো নষ্ট করে দিতে বলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হাজার চেষ্টা করেও সেই ছবিগুলো তাঁরা নষ্ট করতে পারেননি। তখন একেবারে যাকে বলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয় ওই ছবিগুলো থেকে যতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে সপরিবারে। তাঁরাও তা-ই করেন। ফলস্বরূপ অদ্ভুতভাবে, তাঁদের কারোই প্রাণহানি ঘটেনি। এমনকি তাঁরা

এটাও জানান যে, ওই ছবি থেকে দূরে যাওয়ার পর থেকেই তাঁদের সঙ্গে হয়ে-আসা সব অলৌকিক কাণ্ডেরও অবসান ঘটেছে। এরপর ওই ছবিগুলো পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। মোট ন-টা ছবি। তার মধ্যে যেগুলো প্রথম সাতজনের, অর্থাৎ যাঁরা মারা গিয়েছেন, সেগুলো নষ্ট করে ফেলতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাকিগুলো, অর্থাৎ অষ্টম ও দশমজনের (নবমজন হেরক্রুজ় নিজে) ছবি কিছুতেই নষ্ট করা সম্ভব হয়নি। সেগুলো এখনও সবার নাগালের বাইরে কোথাও সংরক্ষিত আছে। গ্যাব্রিয়েল এই ব্যাপারটা অফিসিয়ালি রিপোর্ট করতে পারেননি। কারণ এতে কোনো বাস্তব প্রমাণ ছিল না। অলৌকিক কোনো গল্প তো রিপোর্ট করা যায় না। তাই সেই সাত শিল্পীর রহস্যজনক মৃত্যু আজও অমীমাংসিত হিসেবেই ধরা হয়।"

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে মার্টিন থামল শ্বাস নিতে। মিনার্ভা বলল, "ছবিগুলো তুই দেখেছিস?"

"নাহ্। কয়েকটা দেখেছিলাম। দাঁড়া, ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখি।" বলে সে নিজের ল্যাপটপটা টেনে নিল।

ঠিক সেই সময় মিনার্ভার ফোন বাজল। সেটা রিসিভ করে কানে ধরে রাখল কিছুক্ষণ। একটু হুঁ-হাঁ করে রেখে দিল। সেই সঙ্গে তার ভ্রূ-র মাঝে সৃষ্টি হল একটা গভীর খাঁজ!

"কী ব্যাপার রে? কার ফোন?"

"ড. সেন। রামদীনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে। তার হাতের অবস্থা আর অবস্থান, সারভাইক্যাল বোনের কন্ডিশন আর বডির পজিশন থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সে নিজেই নিজের মাথা ধরে ঘুরিয়ে দিয়েছে পেছনে। অর্থাৎ এটা খুন নয়, আত্মহত্যা!"

(৯)

"নমস্কার! আমার নাম ডক্টর মিনার্ভা গোমস্। আমি পার্পল অর্কিড অ্যাসাইলামের একজন সাইক্রিয়াটিস্ট। পেশেন্ট হেরল্ড ক্রুজের ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই। আপনি কি হার্বার্ট?"

সামনে তখন বছর ষাটের এক পশ্চিমি চেহারার লোক দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার ধূসর চোখে উদ্‌বেগ ফুটিয়ে বলল, "কেন? স্যারের কি কোনো বিপদ হয়েছে?"

"বিপদ হবার কি কোনোরকম সম্ভাবনা আছে?" মিনার্ভা উলটে প্রশ্ন হানে।

একটু যেন অপ্রস্তুত হয় হার্বার্ট, "না মানে, হতেও তো পারে। নইলে আপনি হঠাৎ... ইশ্, আপনাকে বাইরেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি, এক্সট্রিমলি সরি! আসুন ডক্টর, ভেতরে আসুন।"

মিনার্ভা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে একটু অবাক না হয়ে পারল না। বাড়ির চারিদিকে বৈভবের ছাপ স্পষ্ট। দামি আসবাব, কার্পেট, শৌখিন ঘর সাজাবার জিনিস, এমনকি জানলার পর্দাগুলো পর্যন্ত নিজেদের উচ্চমানের পরিচয় দিচ্ছে। হার্বার্টের পোশাকও যথেষ্ট দামি ও রুচিশীল বলেই মনে হয়।

সোফার নরম গদির মধ্যে অর্ধেক ডুবে গিয়ে মিনার্ভা বলল, "মি. ক্রুজের কাছ থেকেই আপনার ব্যাপারে জানতে পারি। তাই কয়েকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে এসেছি।"

"নিশ্চয়ই। তার আগে আপনাকে কফি দিতে বলি।" বলে হার্বার্ট একবার ভেতর ঘর থেকে ঘুরে এল। তারপর মিনার্ভার মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, "দয়া করে বলুন, স্যার ভালো আছেন তো?"

"এখন ভালো আছেন তবে, দু-দিন আগে ছিলেন না।"

"কেন? কী হয়েছিল তাঁর?" উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় তার স্বরে।

মিনার্ভা তাকে হেরক্রুজের নিজের হাত কেটে ফেলার কথা এবং কান্নাকাটি করার কথা জানায়; কিন্তু রামদীনের মৃত্যুর কথাটা ইচ্ছে করেই গোপন করে যায়।

সব শুনে হার্বার্ট বলে, "স্যার হাত ছাড়িয়ে হাত কেটে ফেলে কিছু লিখেছিলেন কি? মানে আঁকিবুকি কাটা বা ওইরকম কিছু...?"

মিনার্ভা অবাক হয়; কিন্তু সেই ভাবটা লুকিয়ে বলে, "হ্যাঁ, তা একটু করেছিলেন রক্ত দিয়ে। কিন্তু এই কথা বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

হার্বার্ট ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, "সর্বনাশ! ছবি এঁকেছেন? আমরা পইপই করে বারণ করেছিলাম, যাতে যা-ই হয়ে যাক-না কেন, স্যার যেন কোনোভাবেই ছবি আঁকতে না পারেন! তিনি ছবি আঁকলেই..."

"আঁকলেই?"

একটু থেমে যেন দ্বিধা কাটিয়ে সে বলে, "আঁকলেই কারও না কারও মৃত্যু নিশ্চিত! এবং সেই মৃত্যু পৈশাচিক মৃত্যু!" হার্বার্ট একটু চুপ করল। যেন কিছু একটা মনে করে শিউরে উঠল ভেতর ভেতর। তারপর আবার বলল, "যত তাড়াতাড়ি পারেন, সেই আঁকাগুলো নষ্ট করে ফেলুন। যেখানে যেখানে তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে আঁক কেটেছেন, একেবারে মুছে ফেলুন! একটুও যেন ছাপ না থাকে। নইলে সর্বনাশ হবে!"

"সেগুলো মুছে ফেলা হয়েছে।"

"যাক... তাহলে ঠিক আছে। কারও কিছু হয়নি তো?"

মিনার্ভাকে চুপ করে থাকতে দেখে হার্বার্ট শুকনো স্বরে বলল, "বুঝেছি... কার বলি নিল?"

"আমাদের সিকিউরিটি গার্ড, রামদীন। অদ্ভুতভাবে মারা গেছে। কিন্তু এক মিনিট... বলি নিল মানে? 'বলি' কথাটা বলছেন কেন?"

"কারণ আছে, ডক্টর।"

"কী কারণ? আমার ভীষণ আশ্চর্য লাগছে পুরো ব্যাপারটা। মি. ক্রুজ় তো না হয় মানসিকভাবে অসুস্থ, তিনি এসব বলতে পারেন। কিন্তু আপনি কেন বলছেন? আপনিও দেখি বলছেন, হেরক্রুজ় ছবি আঁকলেই সর্বনাশ হবে! একটা মানুষের ছবি আঁকার সঙ্গে কারও মৃত্যুর কী সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"এই পৃথিবীতে আজও এমন অনেক কিছু ঘটে, যার ব্যাখ্যা নেই। স্থূল ব্যাপারগুলো আমাদের চোখে পড়ে, সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু সেগুলো ঘটে চলে প্রতিনিয়ত, সকলের চোখের আড়ালে। আমার-আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারে না।"

"আপনার কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কী বলতে চাইছেন, দয়া করে স্পষ্ট করে বলুন।"

"বললে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?"

"আগে শুনে দেখি, তারপর না হয় বিচার করব।"

"বেশ। বলছি তবে..." ততক্ষণে একটি এ দেশীয় লোক ট্রে-তে করে কফি আর পেস্ট্রি রেখে গিয়েছে সামনের টেবিলে। লোকটির চেহারা দেখে সহজেই অনুমেয়, সে এ বাড়ির ভৃত্যস্থানীয়।

মিনার্ভার অবাক ভাব লক্ষ করেই হয়তো হার্বার্ট বলল, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, যে নিজেই একজন চাকর, সে এতটা অবস্থাপন্ন হয় কেমন করে?"

এই প্রশ্নে মিনার্ভা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, "না মানে..."

"খুব স্বাভাবিক। আসলে স্যার আমার জন্য যা ব্যবস্থা করে রেখেছেন, এসব তারই ফলস্বরূপ। মাস গেলে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকা আসে, তাতে অন্তত চার-পাঁচটা পরিবার হেসে-খেলে চলতে পারে! এই বাড়িটাও আমাকে তিনিই দান করেছেন।" তারপর হুঁঃ জাতীয় আক্ষেপের শব্দ করে দু-দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "বিশ্বস্ততার প্রতিদান। কিন্তু তাঁকে দেখুন। কোথায় কোন এক কালকুঠুরিতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন!"

"কেমন বিশ্বস্ততার কথা বলছেন?"

"এই যে আমি হাজারো দুঃসময়ে প্রভুকে ছেড়ে যাইনি। তিনি যখন যা বলেছেন, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ভয় পেয়ে পালিয়ে যাইনি। বিশ্বস্ত আমি আজও আছি। আপনি হয়তো জানেন না, স্যার অ্যাসাইলামের খাবার খান না। ওঁর খাবার যায় এখান থেকে। ওসব বিশ্রী সস্তা খাবার নয়, পুষ্টিকর ও উপাদেয়। প্রত্যেক মাসে দামি পোশাক যায়। কিন্তু এর বেশি আর কিছুই করতে পারি না মানুষটার জন্য..." একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হার্বার্টের বুক ভেঙে।

"কীসের ভয়ে পালিয়ে যাবার কথা বলছেন? মানে যেমনটা জনাথান গিয়েছিল?"

হার্বার্টের মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দিল, "জনাথানের কথা শুনেছেন তবে?"

"তেমন কিছু না, শুধু নামটাই শুনেছি। হেরক্রুজ় শুধু বলেছিলেন, সে তাঁর সঙ্গে ভারতে আসেনি; পালিয়ে গিয়েছিল। শুধু আপনি এসেছিলেন।"

"হ্যাঁ, মিথ্যে বলব না। এই ক্ষেত্রে শুধু বিশ্বস্ততা নয়, কাজ করেছিল অনেকটা লোভও। স্যার আমাদের তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য প্রচুর টাকা মাইনে দিতেন। আমি সেই লোভ উপেক্ষা করতে পারিনি। জন পেরেছিল।"

"আচ্ছা, এবার আমাকে পুরোটা সবিস্তারে বলুন।"

"হ্যাঁ বলছি।" নিজের কফির কাপে একটা বড়ো চুমুক দিয়ে হার্বার্ট শুরু করল।

(১০)

"আমার কথা আশা করি, মিনার্ভা আপনাকে বলেছে?" পার্পল অর্কিড অ্যাসাইলামের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে উঠতে ম্যানেজার রবিন সামন্তকে কথাটা বলল মার্টিন।

"হ্যাঁ, বলেছেন বই-কি! আপনি মিনার্ভা ম্যাডামের ভাই—এটা শুনেই আমি বলেছি এনি টাইম চলে আসতে। একজন পেশেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চান, এ আর বড়ো কথা কী? আর তা ছাড়া এই হাতকাটা সাহেবের সঙ্গে কেউ তো দেখা করতে আসে না। এত বছরেও কেউ আসেনি। এমনকি তাঁর যে চাকরটার সঙ্গে প্রথম দিন এসেছিলেন, সে-ও আসে না। সাহেব নিজেই অবশ্য না করে দিয়েছেন..."

মার্টিন বুঝল, রবিন সামন্ত লোকটা কথা একটু বেশি বলে। তবে খুব অমায়িক।

সে বলল, "হেরক্রুজ় আমার সঙ্গে দেখা করবেন তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন করবেন না? মানুষটা এমনিতে শান্তশিষ্ট। তা-ও বলি, বেশি কাছাকাছি যাবার দরকার নেই, বুঝলেন। অসুস্থ মানুষ তো, কখন কী মাথায় চাপে, বলা যায় না।"

"আসলে এই মানুষটা আমার একজন আইডল! তাই আর লোভ সামলাতে পারিনি দেখা করার।"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই... আপনিও তো শুনেছি শিল্পী মানুষ। তা একজন একালের শিল্পী সেকালের শিল্পীর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, এ আর আশ্চর্য কী? হেঁঃ হেঁঃ..." বলতে বলতে তিনি নিজেই হেরক্রুজ়ের সেলের গারদের তালা খুলে দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি কথা বলুন। আমি দশ মিনিট পর আপনাকে নিয়ে যাব'খন। আর যদি কিছু দরকার-টরকার হয়, তবে আমায় ডাক দেবেন না হয়..."

সামন্তর কথা শেষ না হতেই নীচতলা থেকে কার হেঁড়ে গলায় ডাক শোনা গেল, "ও রবিনদা! শিগগির এসো ইদিকে! ১০২-এর পেশেন্ট আবার হাত-পা ছুড়ছে! খিস্তি কচ্চে গো!"

"অ্যাঁই দেকেচ! আমার হয়েছে যত জ্বালা!" তারপর মার্টিনের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি কথা বলুন, আমি যাই দেখি, ওদিকে আবার কী হল..." বলতে বলতে হন্তদন্ত হয়ে সামন্ত প্রস্থান করল।

সে চলে গেলে এবার মার্টিন নিজেই গারদ ঠেলে প্রবেশ করল ভেতরে। টিমটিমে আলোতে ঘরের ভেতরে আলো-আঁধারির খেলা। তার মধ্যেই সে দেখতে পেল ঘরের মাঝখানে মেঝেতে বিছানো একটা আধময়লা বিছানায় বসে-থাকা মানুষটাকে।

ফরসা, ধারালো চেহারার মানুষটাও তখন তার শ্যাওলা রঙের চোখ তুলে চেয়ে আছে মার্টিনের দিকেই। তার কনুই থেকে কাটা হাত দুটো বাঁধা রয়েছে শেকলে।

মার্টিন শান্তভাবে পরিচয় দিল নিজের। তারপর বলল, "আপনার কাজের আমি একজন ভক্ত... কী যে ভালো লাগে... সেই প্রথম থেকে ফলো করি আপনাকে..." বলতে বলতে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল, "যখন শুনলাম, আপনি এখানে আছেন... এত কাছে! তখনই ঠিক করি, যেভাবে হোক আপনার সঙ্গে দেখা করবই!"

"হের পেমন!" হঠাৎ বলে উঠল হেরক্রুজ়।

"সরি?" মার্টিন বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেল প্রথমটায়।

হেরক্রুজ় তার দিকে তাকিয়ে আছে স্পষ্ট চোখে। তার ঠোঁটের কোণে ঝুলছে একটা মৃদু হাসি।

"বোসো..." হেরক্রুজ় বলল।

তার প্রিয় শিল্পী তার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে কাছে এসে বসতে বলছে দেখে মার্টিন তাড়াতাড়ি এসে বসল হেরক্রুজ়ের সামনে। বসেই গরগর করে বলে যেতে লাগল হেরক্রুজ়ের কোন ছবিটা তার কতটা ভালো লেগেছিল, কোন ভাস্কর্যের কাজ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল ইত্যাদি...

হেরক্রুজ় সেসব শুনেও শুনছিল না। সে শুধু মার্টিনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে না জানি কী নিরীক্ষণ করছিল!

একসময় নিশ্চুপতা কাটিয়ে মার্টিনের কথার মাঝখানেই হেরক্রুজ় কেটে কেটে বলে উঠল, "তু-মি শিল্-পী?"

"হ্যাঁ মানে, শিল্পচর্চা করি, তবে এখনও নিজেকে পুরোদস্তুর শিল্পী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে..."

হেরক্রুজ় কী বুঝে মৃদু মাথা নাড়ল। তারপর আবার টেনে টেনে জিজ্ঞেস করল, "ছবি আঁকতে... ভালোবাসো...?"

"ভীষণ..."

"ছবি আঁকতে না পেলে কষ্ট হয় না?"

"হয় তো। ছবি না এঁকে থাকতেই পারি না।"

"তাহলে একবার ভাবো তো, আমার কতটা কষ্ট হয়? কতদিন হয়ে গেল ছবি আঁকিনি..." হেরক্রুজ়ের বুক থেকে যেন একটা হাহাকার বেরিয়ে এল।

মার্টিন কী বলবে বুঝতে পারল না। তার বড্ড মায়া হতে লাগল মানুষটার জন্য। এত বড়ো একজন শিল্পী, ছবি আঁকাই যার ধ্যানজ্ঞান, সে আজ কত বছর হয়ে গেল রং-তুলি হাতে তোলেনি।

হেরক্রুজ় আবার বলল, "একটু আঁকতে দেবে আমায়? শুধু একবার আঁকব... দেবে আমায় আঁকতে?" কী প্রবল আকুতি মাখা মানুষটার স্বরে!

মার্টিনের বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে উঠল। সে নরম সুরে বলল, "কোথায় আঁকবেন? আমি তো আজ স্কেচবুক বা কাগজ কিছুই সঙ্গে আনিনি..."

"তোমার জামার বুকপকেটে ওটা কলম, না?"

মার্টিন নিজের পকেট থেকে বের করল ঘন নীল রঙের কলমটা। বেশ বড়ো সাইজের একটা কলম। সে বলল, "হ্যাঁ, এই কলমটা আমার বাবা আমায় দিয়েছিলেন। আমি সবসময়ই এটা কাছে রাখি।"

"ওটা দিয়ে আমি যদি একবার ছবি আঁকি, তোমার কি আপত্তি আছে?"

"না না, মোটেই না। কিন্তু আপনার হাত দুটো তো..."

"একটিবার খুলে দাও না... বড়ো যন্ত্রণা হয়... এরা এত শক্ত করে বেঁধে রাখে..."

মার্টিন একটু ইতস্তত করল। তারপর মনে করল, যে মানুষটার কনুইয়ের পর থেকে হাতের বাকি অংশটাই নেই, সেই মানুষটা কী-ই বা করতে পারবে? সে শুনেছে হেরক্রুজ়ের মোটেই আক্রমণ করার প্রবণতা নেই। আর যদি বা করে, একজন বলিষ্ঠ যুবক হয়ে একজন বার্ধক্যের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো প্রতিবন্ধী মানুষকে কি আটকাতে পারবে না? আর তা ছাড়া মানুষটা তার ওই কাটা দু-হাত দিয়ে কেমন করে ছবি আঁকে, তা দেখতেও তার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল!

সে একবার পেছন ঘুরে দেখে নিল, সেলের বাইরে কেউ আছে কি না। তারপর ধীরে ধীরে খুলে দিল হেরক্রুজ়ের হাতের চামড়ার স্ট্র্যাপ দুটো।

হাত দুটো মুক্ত করে হেরক্রুজ় তৃপ্তির হাসি হেসে আধবোজা চোখে আবার উচ্চারণ করল, "হের পেমন!"

"এই কথাটার মানে কী?" জানতে চায় মার্টিন, "আমি আসার পরেও আপনি কথাটা আরেকবার বলেছিলেন।"

হেরক্রুজ় কেমন এক অদ্ভুত হাসি হাসল। বলল, "সে আমার প্রভু..."

"জেসাস?"

"না!" একটু যেন কঠিন শোনায় তার স্বর, "আমি যিশুকে ত্যাগ করেছি। আমি খ্রিস্টান নই..."

"তবে? কোন প্রভুর কথা বলছেন আপনি?"

হেরক্রুজ় স্বর খাদে নামিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, "আমার প্রভু... পেমন...!" চোখের গাঢ় সবুজ মণি দুটো যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল তার। "প্রভু নিজের প্রভুর জন্য ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছিল। আমিও তাই আমার প্রভুর জন্য ত্যাগ করেছি ঈশ্বরকে।" আবারও জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে বলল হেরক্রুজ়।

মার্টিন এই কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারল না। তার মনে হল, মানুষটা এবার অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে। তবু সে একবার জিজ্ঞেস করল, "পেমন কোথাকার দেবতা? তার নাম তো আগে শুনিনি কখনও..."

"আমি শিল্পী, আমার প্রভু শিল্পের দেবতা। তাই আমি তাঁর অনুগামী হয়েছি..." উত্তর দিল হেরক্রুজ়।

"শিল্পের দেবতা? তা হবে... আমি জানি না..." মার্টিন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে। হেরক্রুজ়ের চোখের ভাষা যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকছে তার কাছে।

"কই দাও... দাও দেখি কলমখানা..." হেরক্রুজ় এবার বেশ সরলভাবেই বলল।

"হ্যাঁ, এই নিন... কিন্তু আঁকবেন কোথায়?"

"তোমার হাতখানা আমায় দাও... তাতেই আঁকি..." আলতো হাসে হেরক্রুজ়।

মার্টিনের প্রিয় শিল্পী তারই হাত চাইছে ছবি আঁকার জন্য? এ কি কোনো স্বপ্ন নাকি সত্যিই এই সৌভাগ্য তার হতে চলেছে?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাত বাড়িয়ে দেয় সে। অবাক হয়ে দ্যাখে, হেরক্রুজ় কাটা দু-হাতের সাহায্যে অদ্ভুত কায়দায় ধরেছে নীল কলমটা। সেইভাবেই সে মার্টিনের হাতের পাতায় আঁকতে শুরু করল। কলমের তরল কালি রং ধরাতে লাগল তার চামড়ার ওপর।

হেরক্রুজ় আঁকতে আঁকতে উচ্চারণ করতে লাগল, "হের পেমন! হের পেমন!"

মার্টিনের কেমন যেন ঘোর লাগছিল। কেমন নেশা-লাগা কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, "ও কীসের ছবি আঁকছেন হেরক্রুজ়?"

হেরক্রুজ় মুখ তুলে ধূর্ত শেয়ালের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমার মুক্তির..."

মার্টিন বলতে চাইছে অনেক কিছু, কিন্তু বলে উঠতে পারছে না। যেন কেউ ভেতর থেকে টেনে ধরে রেখেছে তার জিভ।

সে শুনতে পেল, হেরক্রুজ় বলে চলেছে, "পেমন যেমন আটজনের মধ্যে সেরা, আমি তেমন দশের মধ্যে। দু-হাজার সৈন্যদল যাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাঁর ক্ষমতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে কি?"

হেরক্রুজ়ের আঁকা শেষ হয়েছে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মার্টিনের দিকে।

মার্টিন কোনোরকমে জিজ্ঞেস করল, "আপনার মুক্তি মানে? কীসের থেকে মুক্তি চান?"

হেরক্রুজ় একটু উদাস গলায় বলল, "জানো, যারা আমার পাপের জন্য মারা গিয়েছে, তারা আজও আসে আমার কাছে। কেউ কৈফিয়ত চায়। কেউ হাত পেতে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কেউ আবার চিৎকার করে কাঁদে। আমি এগুলো আর সহ্য করতে পারি না। এবার আমার মুক্তি চাই..."

মার্টিন এবারও স্পষ্ট করে কিছু বুঝল না। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েও যেন পারছে না। তার মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।

হেরক্রুজ় হঠাৎ আদেশের স্বরে বলল, "যাও। তোমার কাজ শেষ হয়েছে। যাও, চলে যাও এবার!"

মার্টিন কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল। নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই যেন তার। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল গারদের দিকে।

তখন আরেকবার পেছন থেকে হেরক্রুজের গলা পাওয়া গেল, ‘‘শোনো!’’

মার্টিন ফিরে তাকাল।

কেমন এক বিশ্রী হাসি হেসে হেরক্রুজ় বলল, ‘‘যদি কখনও তুড়ির শব্দ পাও, অথচ কেউ তোমার আশপাশে নেই, তবে সাবধান...!’’

মার্টিন কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এল সেল থেকে। তার ঘোর-লাগা ভাবটা কাটেনি এখনও। তার মনে রইল না, সে হেরক্রুজের হাতের বাঁধন খুলেছে; কিন্তু আর বন্ধ করেনি। বুকপকেটে তার প্রিয় কলমটাও নেই।

সে দম-দেওয়া পুতুলের মতো নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। অর্ধেক সিঁড়ি নামতেই উলটোদিক থেকে উঠে-আসা রবিন সামন্তর মুখোমুখি হয়ে গেল সে।

সামন্ত সপ্রতিভ স্বরে বলল, ‘‘অ্যাঁই দেখো, আমারই দেরি হয়ে গেল। আপনি দেখি নিজেই নেমে আসছেন! যাক গে, ওই সেলের তালা দশ মিনিট পরে দিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। সাহেব তো এমনিতেই বাঁধা থাকেন। তার চেয়ে বরং চলুন, আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসি।’’

সামন্তর কথায় যেন মার্টিনের চটকা ভাঙল। মাথার ভেতরটা এতক্ষণে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে। কিন্তু একটু আগের ঘটে-যাওয়া কিছু ঘটনা তার যেন কেমন স্বপ্নের মতো লাগছিল।

নিজের মনের ভাব যতদূর সম্ভব সংযত রেখে সে সামন্তর সঙ্গে নামতে লাগল নীচে। নামতে নামতে সামন্ত অনর্গল কথা বলে চলছিল। মার্টিন সেসব কিছুই শুনছিল না। তার মাথার ভেতরটা এখনও তালগোল পাকাচ্ছে।

একেবারে গেটের কাছে এসে তারা দেখল, এর মধ্যেই কখন বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

সামন্ত বলল, ‘‘এঃ, সেই আবার নিম্নচাপ! আপনার সঙ্গে ছাতা আছে নাকি?’’

মার্টিন বলল, ‘‘দরকার হবে না। আমি এমনি চলে যাব।’’

সামন্ত প্রতিবাদ করে বলে, ‘‘বলেন কী! শীতকালের বৃষ্টি। গায়ে লাগলে অসুখ করবে যে। দাঁড়ান, আমি আমার ছাতাটা আপনাকে দিয়ে দিই। ওটা মাথায় দিয়ে যান। পরে একসময় মিনার্ভা ম্যাডামের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন'খন। আপনি দাঁড়ান...’’ বলে রবিন সামন্ত নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মার্টিন বাইরে চেয়ে দেখল, বৃষ্টি বেশ জোরেই পড়ছে।

সামন্ত করিডোর ধরে বেশ খানিকটা তফাতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘কে?’’

‘‘কী ব্যাপার, সামন্তবাবু?’’ মার্টিন জানতে চাইল।

‘‘আপনি কিছু শুনতে পেলেন না?’’

‘‘কই না তো? কী শুনব?’’

‘‘আমি তো পষ্ট শুনলাম...’’ বলে একবার অ্যাসাইলামের ফাঁকা একতলার করিডোরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। রোগীরা যার যার নিজের ঘরে; তারপর আবার বলল, ‘‘কে যেন আমার কাছে এসে তুড়ি বাজাল!’’

‘‘তুড়ি?’’

‘‘হ্যাঁ... একেবারে কাছ থেকে এল আওয়াজটা। অথচ আপনি তো কত দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। আবার আপনি বলছেন যে, আপনি শোনেননি...’’ তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, ‘‘ও হয়তো আমারই শোনার ভুল। যাক, আপনাকে ছাতাটা এনে দিই...’’

(১১)

‘‘স্যার ক্রুজ় ছিলেন একজন গোঁড়া খ্রিস্টান।’’ হার্বার্ট সামনের টেবিলের কফির কাপ নামিয়ে রাখল প্রায় নিঃশব্দে। ‘‘ছিলেন বলছি, তার কারণ আছে। তাঁর শিল্পপ্রেম নিয়ে আর নতুন করে কিছু বলব না। আশা করি, আপনি জানেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ছিল ভীষণরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা! তিনি প্রায়ই সন্ধের পর নেশার ঘোরে আমায় আর জনকে মনের কথা বলে ফেলতেন। বলতেন, তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী স্বীকৃতি তিনি পাননি। তাঁর আরও অনেক যশ, মান আর খ্যাতি পাওয়ার কথা। অন্যান্যরা তাঁর চেয়ে কম যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বেশি জনপ্রিয়।

‘‘তখন ২০১২-র মাঝামাঝি সময়। ‘বিশ্ব শিল্প সংস্থা’ প্রত্যেক তিন বছর অন্তর দশজন শিল্পীর নাম প্রকাশ করেন তাঁদের শিল্পের মান ও জনপ্রিয়তার নিরিখে। এই তালিকায় স্থান পেতে এবং তালিকার প্রথমদিকে থাকার ও সর্বোপরি তালিকার প্রথম স্থানে থাকতে সারা বিশ্বের শিল্পীদের মধ্যে একটা গোপন ঠান্ডা লড়াই চলতে থাকে। কারণ একবার সেই তালিকার সেরা হতে পারলে এক ধাক্কায় তাঁর মান ও শিল্পের দাম আকাশ ছুঁয়ে ফেলে।

‘‘সেই বছর তাঁদের তালিকা প্রকাশ পায়। হেরক্রুজ় নিশ্চিত ছিলেন, সেই তালিকায় তাঁর নাম থাকবে; কিন্তু তাঁর অবস্থান নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। সেরা না হলেও অন্তত প্রথম তিনজনের মধ্যে তাঁর নাম আসবে, এমন ধারণা তিনি মনে

মনে পোষণ করছিলেন। কিন্তু যখন তালিকা প্রকাশ পেল, হেরক্রুজ় একেবারে ভেঙে পড়লেন! তাঁর নাম ছিল সেই ন-নম্বরে। আটজন শিল্পী তাঁকে পেছনে ফেলে আগে বেরিয়ে গেল। এটা তিনি একেবারে সহ্য করতে পারলেন না।

''তখন তিনি দ্বিতীয় রিপুর বশবর্তী হয়ে ঘরে রাখা জেসাসের সমস্ত মূর্তি, ছবি ভেঙে ফেললেন। জ্বালিয়ে ফেললেন পবিত্র বাইবেল। আমি আর জন অনেক চেষ্টা করেছিলাম তাঁকে বিরত করার, কিন্তু হেরক্রুজ় তখন চণ্ডাল রূপ ধারণ করেছেন।

''এই পর্যন্তও ঠিক ছিল। কিন্তু এরপর তিনি যে সিদ্ধান্ত নিলেন, সেটাই তাঁর জীবনে কাল ডেকে এনেছিল। এর কয়েকদিন পর থেকেই তিনি গোপনে কোথাও যেতে শুরু করেন। সম্ভবত তিনি কোনো নিষিদ্ধ দলের সদস্য হয়েছিলেন। তখন ঘরে আসতে থাকে বিভিন্ন অদ্ভুত অদ্ভুত সব বই আর সরঞ্জাম। দিনরাত তিনি বাংলোর ভূগর্ভস্থ একটা ঘরে এসব নিয়ে পড়ে থাকতেন।

''তাঁর খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন হয়। দিনের বেলা তিনি খেতেন না এবং রাতে কেবল আমিষ খাবার খেতেন। সেটাও যতটা সম্ভব কম সেদ্ধ করে দিতে হত। ধীরে ধীরে তিনি কাঁচা খাবারই খাওয়া শুরু করেন। মানে কাঁচা মাংস আর মদ। স্যালাড বা স্যুপ ছুঁয়েও দেখতেন না। আমি আর জন পালা করে তাঁর সেই ঘরে খাবার দিতে যেতাম। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের চেহারা দেখলে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে যায়! যত রাজ্যের সৃষ্টিছাড়া জিনিসের ভিড় সেখানে। কাকের মৃতদেহ, বিভিন্ন প্রাণীর হাড়, মড়ার মাথার খুলি, বিচিত্র আকৃতির ধাতু ও পাথরের পাত্র, এমন আরও কত কী...

''আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেম, হেরক্রুজ় শয়তানের আরাধনা শুরু করেছেন। নিজের আত্মা বেচে দিয়েছেন ডেভিলের চরণে।

''সেই ঘরের মেঝেয় আর চার দেওয়ালে আঁকা একটা বিশেষ চিহ্ন আমরা দেখি। একটা বৃত্ত, তার মধ্যে দিয়ে তির্যকভাবে চলে গিয়েছে একটা সরলরেখা, দণ্ডের মতো। তাতে বৃত্তটা দুটো বাঁকা অর্ধবৃত্তে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম সেটা শয়তানকে আহ্বানের জন্য আঁকা বিশেষ কোনো চিহ্ন। তার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ঢঙে প্রায় কয়েকশোবার লেখা 'হের পেমন'।

''ওই কথার যে কী অর্থ, তা আমাদের বোধগম্য হয়নি।

''এইসব দেখে ভয় পেয়ে জন আর সেই ঘরে যেতে চায় না। তখন আমিই স্যারের খাবার দিতে যেতাম। সেই সঙ্গে আমার আরও একটা দায়িত্ব বাড়ল। নির্দিষ্ট কয়েকদিনের তফাতে তাঁকে এনে দিতে হত জীবন্ত গবাদি পশু। তিনি সেগুলোর বলি দিতেন। তারপর সেই রক্ত আর মাথা উৎসর্গ করতেন শয়তানের পায়ে। এমনকি সেই রক্তে আমি স্যারকে স্নান করতেও দেখেছি। সেই রক্তস্নাত অবস্থায় তিনি সেই ঘরে উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে নাচতেন! আর কেবল কখনও ফিসফিস করে, আবার কখনও চিৎকার করে আওড়াতেন ওই দুটি শব্দ—হের পেমন! হের পেমন!

''কী ভয়ংকর, কী বীভৎস সেই দৃশ্য! ভাবলে আজও আমার রক্ত জল হয়ে আসে।

''এইসব প্রক্রিয়া শুরু হবার কয়েকদিন পর থেকেই বাড়িতে শুরু হয় অশুভ কাণ্ডকারখানা। স্যার পাখি পুষতে ভালোবাসতেন। দুটো বিশাল খাঁচায় থাকত অনেক রংবেরঙের পাখি। একদিন সকালে উঠে দেখি, দুই খাঁচার সমস্ত পাখি কোনো অজানা কারণে মরে পড়ে আছে।

''এরপর থেকে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সব গাছপালা, এমনকি ঘাস অবধি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বাগানের কাঠবেড়ালিগুলো মরে পড়ে থাকত মাটিতে। আমরা অনেকবার দেখেছি, বাড়ির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ঝুপ ঝুপ করে পাখিগুলো মরে ঝরে পড়ত। রোজই বাগান, ছাদ থেকে মরা পাখি পরিষ্কার করতে হত আমাদের।

''সবসময়ই আমরা বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য কিছুর উপস্থিতি টের পেতাম। রাতের বেলা উৎসহীন কান্নার শব্দ, ফিসফিসানির শব্দ তো নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

''জনাথান রোজই পালাই পালাই করত। আমি কোনোরকমে ধরে রেখেছিলাম তাকে। কিন্তু যেদিন ওর পোষা বেড়াল দুটো একসঙ্গে হঠাৎ মরে গেল, তখন তাকে আর রাখা গেল না। সে পালিয়ে গেল।

''আমি কিন্তু কামড়ে পড়ে রইলাম। মালিক ততদিনে আমার মাইনে বাড়িয়ে প্রায় পাঁচগুণ করে দিয়েছেন। সেই লোভ আমি ছাড়তে পারলাম না।

''এইভাবে প্রায় এক বছর কাটল। একদিন হেরক্রুজ় তাঁর সেই পাতালঘরে চেয়ে পাঠালেন রং-তুলি আর ইজ়েল। আমি দিয়ে এলাম। তখন তিনি দশ দিন ধরে ন-টা ছবি আঁকলেন। সব ক-টা আলাদা আলাদা।

''সেই ন-টা ছবি আমার সাহায্যে বের করে আনলেন বাইরে। আমিই সেগুলো কাগজ দিয়ে মুড়ে পরিপাটি করে প্যাকিং করে দিলাম।

''পাতালঘরে তালা পড়ল। এরপর মাস ছয়েকের মধ্যে

ফ্রান্স আর ফ্রান্সের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ন-জন শিল্পীকে তাঁর আঁকা ওই ছবিগুলি একটা করে উপহার দিলেন। তাঁদের আটজন ছিলেন ওই তালিকার হেরক্রুজ়ের আগে থাকা শিল্পীরা আর বাকি একজন তাঁর পরের।

"সব ছবি দিয়ে আসার পর স্যার ফিরে এসে বললেন, 'এবার আমার বিশ্বসেরা হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। আমায় নয় নম্বরে রাখা? দেখি, কে আমায় এক নম্বর থেকে টলাতে পারে?'

"এরপর অবিশ্বাস্যভাবে স্যারের কাছে ছবির অর্ডার আসতে থাকে। আর তাঁর আঁকা ছবিগুলো বিক্রি হতে থাকে সোনার দামে! ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছোতে থাকেন তিনি। ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে সম্পত্তি! তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে হেরক্রুজ় তাঁর দু-তিনজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি পেলেন। স্যারের ঐশ্বর্য আরও বেড়ে উঠল। আমাকেও তিনি বঞ্চিত করেননি। দু-হাতে তখন টাকা ওড়াতাম আমি। বন্ধুমহলে হিংসের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম।

"কিন্তু এই সুখ আমাদের সইল না বেশি দিন। এর দিনকয়েক পর থেকেই শুরু হল শয়তানের আসল খেলা!"

(১২)

সারাটা রাস্তা মার্টিনের মাথায় কেবল একটাই শব্দ ঘুরছিল। 'পেমন... পেমন...'

কে এই পেমন?

ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে ল্যাপটপ খুলে বসল সামনে। ঘরে এখন কেউ নেই। মিনার্ভা খুব সম্ভবত হার্বার্টের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি অ্যাসাইলামে যাবে। আজ তার রাতের ডিউটি।

ল্যাপটপ খুলেই সে ইন্টারনেটে খুঁজতে চেষ্টা করল 'পেমন' নাম দিয়ে। একটু খুঁজতেই প্রথমে চোখে পড়ল একটা ছবি। উটের ওপর অধিষ্ঠিত একজন মানুষ, তার মাথায় বেশ বড়ো ও রাজকীয় মুকুট; পুরুষ হলেও, তার মুখের গড়ন কিছুটা মেয়েলি। এ ছাড়া বেশ কিছু তথ্যও চোখে পড়ল তার।

পেমন নরকের আট রাজার একজন। এরা হল পেমন, বেলেথ, পুরসন বা পুরসঁ, আস্মোডাই, ভাইন, বালাম, জ্যাগন এবং বেলিয়াল। এদের মধ্যে পেমন হল প্রধান।

মার্টিন এবার হেরক্রুজ়ের 'পেমন যেমন আটজনের মধ্যে সেরা, আমি তেমন দশের মধ্যে' কথাটার মানে একটু বুঝতে পারল।

পেমনের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ১৭শ শতকে লেখা কোনো এক অজ্ঞাত লেখকের 'লেসর কি অফ সলোমন' নামক বইতে।

পেমন ছিল লুসিফার বা স্বয়ং ডেভিল, অর্থাৎ শয়তানের সবচাইতে বড়ো অনুগামী। লুসিফারকে যখন স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়, তখন সে-ও লুসিফারের সঙ্গে স্বর্গ ত্যাগ করে, ঈশ্বরের বিপথগামী হয়।

"প্রভু নিজের প্রভুর জন্য ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছিল। আমিও তাই আমার প্রভুর জন্য ত্যাগ করেছি ঈশ্বরকে।" হেরক্রুজ়ের বলা কথাটার বেশ সংযোগ খুঁজে পেল সে। তা ছাড়া লুসিফার যেমন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল বলে তার ক্ষোভ ছিল, হেরক্রুজ়ও তেমন বিশ্ব শিল্প সংস্থার সেরা দশের তালিকায় প্রথম তিনজনের স্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন বলেই তাঁর দাবি।

লুসিফার ও পেমন দুজনেই প্রথমে ছিলেন দেবদূত বা এঞ্জেল অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগামী।

হেরক্রুজ়ও তা-ই। প্রথম জীবনে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ছিলেন বলেই মার্টিন জানে।

পেমনকে দুষ্টের দেবতা বা 'গড অফ মিসচিফ' বলা হয়ে থাকে। সে শিল্প ও বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী।

হেরক্রুজ় বলেছিলেন, "আমি শিল্পী, আমার প্রভু শিল্পের দেবতা। তাই তাঁর অনুগামী হয়েছিলাম।" মিল পাচ্ছে মার্টিন।

পেমনের পদতলে দু-হাজার বিদেহী আত্মা বা স্পিরিটের সৈন্যদল আনত। তারা পেমনের হুকুমের দাস।

"দু-হাজার সৈন্যদল যার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাঁর ক্ষমতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে কি?" হেরক্রুজ়ের সেই উক্তি মনে পড়ে।

পেমন তার আরাধনাকারীকে অথই ঐশ্বর্যের অধিকারী করে দিতে পারে। দিতে পারে অগাধ সম্পত্তি আর বৈভবের মালিকানা! এ ছাড়া কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীও হয়ে ওঠে সেই অনুগামী। যেমন মৃত ব্যক্তিদের আত্মাকে চোখে দেখতে পাওয়া, তাদের সঙ্গে সংযোগস্থাপন ইত্যাদি।

তবে যে হেরক্রুজ় বললেন, "যারা আমার পাপের জন্য মারা গিয়েছে, তারা আজও আসে আমার কাছে।" সেটা কি এর দিকেই ইঙ্গিত করছে? সে-ও কি এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত?

পেমন তার ওপরেই নিজের দৃষ্টি দেয়, যে মানসিকভাবে ভীষণ দুর্বল ও ভেঙে পড়েছে। মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট

মানুষের ভেতর খুব সহজেই পেমনের আগমন হয়।

পেমন তার অনুগামী দু-হাজার বিদেহী সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যবহার করে কিছু শব্দ আর চিহ্ন। তার মধ্যে প্রধান শব্দ হল ট্রাম্পেটের শব্দ এবং অনেকগুলি চিহ্নের মধ্যে একটি হল একটি বৃত্তের মধ্যে দিয়ে তির্যকভাবে চলে যাওয়া একটি সরলরেখা, যা বৃত্তটিকে ভাগ করে দুটি সমান অর্ধবৃত্তে।

মার্টিনের হঠাৎ কী মনে হতে আরেকটা উইন্ডো খুলে সেখানে খুঁজতে চেষ্টা করল সেই ছবিগুলো, যেগুলো সেই সাত মৃত শিল্পীর ঘরে পাওয়া গিয়েছিল। হেরক্রুজ়ের হাতে আঁকা সেই উপহার-দেওয়া ছবিগুলো।

খানিকক্ষণ খুঁজতে বেশ কয়েকটা ছবি পেয়েও গেল সে। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করতেই মিলটা ধরা পড়ল তার চোখে। সব ক-টা ছবিতেই কায়দা করে লুকোনো আছে সেই চিহ্ন।

কোনোটায় আয়নার নকশা, কোনোটায় এক রাজার মুকুটের কারুকাজ, কোথাও এক ঘোড়সওয়ারের তরোয়াল আর চাঁদের অবস্থান, আবার কোনোটায় এক ন্যুব্জ বৃদ্ধের যষ্টি ও তার ভিক্ষাপাত্রের আকার; সবকিছুর মধ্যেই ওই চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

মার্টিন এবার ঝট করে মোবাইলটা বের করল পকেট থেকে। একটা ছবি সে মিনার্ভার কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিল। যেবার হেরক্রুজ় সেলের মধ্যে নিজের হাত কেটে মেঝেতে আঁক কেটেছিল, সেটার ছবি তুলে রেখেছিল মিনার্ভা। হয়তো পরে দেখে, তা থেকে কিছু অনুধাবন করতে।

সেই ছবি খুলে চোখের সামনে ধরতেই মার্টিন দেখল, রক্ত দিয়ে সে এঁকেছে ওই একই চিহ্ন। আর বারবার করে লিখেছে একটা কথা—'হের পেমন! হের পেমন! হের পেমন!' লেখার কায়দাটা ঠিক মধ্যযুগীয় ছাঁচে। হয়তো তাকে আহ্বান করার এটাই পদ্ধতি।

কারণ কিছুক্ষণ আগেই হেরক্রুজ়ের সঙ্গে কথা বলার সময় সে বারবার এই কথাটা উচ্চারণ করেছে।

হের পেমন! হের পেমন!

মার্টিন নিজের ভাবনায় এতটাই মশগুল ছিল যে হঠাৎ ফোন বেজে উঠতে সে প্রায় চমকে লাফিয়ে উঠেছিল। নিজেকে সামলে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সে দেখল, মিনার্ভার ফোন আসছে। সেটাকে রিসিভ করে কানে দিতেই মিনার্ভার অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠ শোনা গেল ওপাশ থেকে।

(১৩)

মিনার্ভা প্রায় ডুবে রয়েছে হার্বার্টের কথায়। সে শুনে চলেছে তার অত্যদ্ভুত বর্ণনা।

"একদিন রাত্তিরে আমি ঘুমিয়ে আছি আমার ঘরে। স্যারও অনেক রাত অবধি কাজ করে বিছানায় গিয়েছেন। গভীর রাত। হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার শুরু করলেন তিনি! পাগলের মতো সারা ঘর দাপদাপি শুরু করলেন আর চ্যাঁচাতে লাগলেন। জ্বলে গেল! জ্বলে গেল! পুড়ে গেল! যেন তাঁর সারা গায়ে কেউ আগুন জ্বেলে দিয়েছে, এমন জ্বলুনি শুরু হল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'হার্বার্ট, আমার গায়ে বরফজল ঢালো! আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে! অসহ্য যন্ত্রণা!' অথচ কিচ্ছু নেই। তাঁর দেহের কোথাও আগুনের চিহ্ন নেই।

"আমি করলাম কী, বাথটাবে বরফ-গলা জল দিয়ে স্যারকে শুইয়ে দিলাম তার মধ্যে। তা-ও তাঁর চ্যাঁচানি থামে না। জ্বলুনি কমে না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এমন চলল। শেষে একসময় তিনি একেবারে ঝিমিয়ে পড়লেন। যন্ত্রণা কমল। আমি তাঁকে তুলে নিয়ে, গা মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

"পরের দিন তিনি জেগে উঠে আর কোনো অস্বাভাবিকতা অনুভব করলেন না। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খবর পেলাম, শিল্পী রবার্ট ব্রেট গত রাতে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ঠিক সেই সময়, যখন হেরক্রুজ়ের শরীর অকারণেই জ্বলে যাচ্ছিল!

"এরপর কয়েকদিন সব শান্ত। তারপর এক রাতে, আমি যথারীতি ঘুমিয়ে আছি। স্যার তাঁর স্টুডিয়োতে বসে ছবি শেষ করছেন একটা।

"হঠাৎ হুড়মুড় করে কিছু পড়ে যাবার শব্দে আমি চমকে জেগে উঠলাম। দৌড়ে স্টুডিয়োয় গিয়ে দেখি, স্যার চেয়ার উলটে পড়ে আছেন মেঝেয় আর বুক খামচে ধরে ছটফট করছেন। শ্বাস নিতে পারছেন না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কেবল তাঁর বুকে মালিশ করলাম খানিকক্ষণ। তাতেও ফল হয় না দেখে দরজা-জানলা সব খুলে দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে লাগলাম দিশেহারা হয়ে।

"আরও খানিকক্ষণ তড়পানির পর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকলাম। কিন্তু ততক্ষণে স্যারের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার এসে তাঁর জ্ঞান ফেরালেন। সামান্য কিছু ওষুধ লিখে বিশ্রাম করার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। কারণ তখন হেরক্রুজ় একেবারে সুস্থ।

"সেই দিনের পরও খবরের কাগজে দেখলাম একটা মৃত্যুসংবাদ। হান্স ক্লার্ক। সেই তালিকার দ্বিতীয় শিল্পী। গত রাতে তিনি নাকি অদ্ভুত পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করেছেন। বাড়ির পেছনের ইয়ার্ডে গর্ত খুঁড়ে নিজের বাগ্‌দত্তাসহ নিজেকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছেন মাটিতে মুখ গুঁজে। শেষ পর্যন্ত ফুসফুসে বাতাসের অভাবে মারা গিয়েছেন দুজনেই। আনুমানিক সময় যা বলা ছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, গত রাতে হেরক্রুজের যখন শ্বাসকষ্ট হয়, তার সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে!

"এইভাবেই কিছুদিন পর পর এক-একজন করে শিল্পী মারা যেতে লাগলেন। আর তাঁদের মারা যাবার সময়ে ঘড়ি ধরে ঠিক ওই মুহূর্তে হেরক্রুজকে সহ্য করতে হত তাঁদের মৃত্যুযন্ত্রণা! সে যে কী কষ্ট, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যন্ত্রণায় দাবড়াতেন রীতিমতো। তখনই তিনি অনুভব করলেন, কত বড়ো পাপ তিনি করেছেন! আর সেই পাপের শাস্তিই তাঁকে ভোগ করতে হচ্ছে।

এই সময় মৃত শিল্পীদের প্রত্যেকের ঘরে হেরক্রুজের আঁকা ছবি পেয়ে তাঁকে বারবার হেপাজতে নেওয়া হতে লাগল। নিজের অপরাধবোধ তাঁকে দিনরাত কুরে কুরে খেতে লাগল।

"এবার তিনি দেখতে শুরু করলেন সেই মৃত শিল্পীদের। তাঁদের প্রতিহিংসাপরায়ণ বিদেহী স্যারের মনে অমানুষিক ভীতির সঞ্চার করতে লাগল। তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন।

"এর মধ্যে হল কী, যে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার এই শিল্পীদের মৃত্যু রহস্যের তদন্ত করছিলেন, তিনি কিছু একটা আঁচ করে অষ্টম ও দশম স্থানে থাকা শিল্পীদের উপহার-দেওয়া ছবি দুটি তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। ফলস্বরূপ কোনো ক্ষতি হল না তাঁদের। তাঁরা রক্ষা পেয়ে গেলেন।

"এদিকে নিজের বলি না পেয়ে শয়তান পাগল হয়ে উঠল। সে রোজই প্রায় হেরক্রুজকে দিয়ে আঁকিয়ে নিত ছবি বা বলা ভালো সেই বিশেষ চিহ্ন, যার মাধ্যমে শয়তান আসা-যাওয়া করে। স্যার বারবার বলতেন, শয়তান তার গ্রাস পায়নি! এবার তার চাই অগুনতি বলি! আর তাই সেই অগুনতিবার হেরক্রুজকে সহ্য করতে হবে অমানুষিক মৃত্যুযন্ত্রণা। ভয় পেতে লাগলেন, ছবি আঁকলেই আহ্বান জানানো হবে শয়তানকে। আর সে এলে কেউ মারা যাবে ঠিক। ছবি আঁকার পরেই হেরক্রুজের যখন সংবিৎ ফিরত, তখন তিনি সেই আঁকা যেভাবে হোক নষ্ট করে ফেলতেন। কখনও খসিয়ে ফেলতেন দেওয়াল, ভেঙে ফেলতেন মেঝে। নিজেকে ছবি আঁকা থেকে বিরত রাখতে তিনি পুড়িয়ে ফেললেন সব আঁকার সরঞ্জাম। যত দিন যাচ্ছিল, তিনি আরও উগ্র আর উন্মাদ হয়ে উঠছিলেন। শেষে আমার পরামর্শেই তিনি চলে এলেন ফ্রান্স থেকে এই সুদূর ভারতবর্ষে। বাকিটা আশা করি, আপনি জানেন।" থামল হার্বার্ট।

মিনার্ভা কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। এত ব্যাপার একসঙ্গে হজম করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। বেশ কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে মিনার্ভা জিজ্ঞেস করল, "আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, একটা ছবি কেমন করে কারও মৃত্যুর কারণ হতে পারে?"

"বুঝতে পারলেন না? ওই ছবিগুলো ছিল শয়তানের আসা-যাওয়ার একটা পথ বা গেটওয়ে। ওই ছবিগুলো কাজ করত একটা পোর্টাল হিসেবে। ফলে যার বিনাশের জন্য ওই ছবি আঁকা, তার সঙ্গে শুরু হত বিভিন্ন অলৌকিক ও ব্যাখ্যাতীত ঘটনা। অবশেষে একদিন শয়তানের প্ররোচনায় সে নিজের ও তার পরিবারের ভয়ানকভাবে প্রাণ নিত বা বলা ভালো, শয়তান তাকে দিয়ে করিয়ে নিত।

"ভগবানের পথ থেকে সরে গিয়ে শয়তানের পথ অবলম্বন করলে প্রথমে হয়তো অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তার পরিবর্তে হারাতে হয় তার কয়েকশো গুণ! অশুভ পথের ফলাফল কখনও শুভ হয় না।

"হেরক্রুজ় ঈশ্বরের বিপথে হেঁটে, নিষিদ্ধ প্রথা অবলম্বন করে বিশ্বসেরা শিল্পীর তালিকায় প্রথম তিনজনের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন বটে; কিন্তু তার বদলে তিনি পেয়েছেন নারকীয় যন্ত্রণা! আজ অগাধ ধনসম্পত্তির মালিকানা সত্ত্বেও তার কানাকড়িও ভোগ করতে পারেন না। একটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে খাঁচায় বন্দি পশুর মতো জীবন কাটাতে হয়। হায় নিয়তি..." ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল হার্বার্ট, "এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে যে আত্মহত্যা করে নিজেকে মুক্তি দেবেন, সেই উপায়ও নেই। থাকলে আমি নিজে তাঁকে সাহায্য করতাম। তাঁর এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না।"

"দেখুন, আত্মহত্যা কোনো সলিউশন হতে পারে না। একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি কখনোই এটাকে সমর্থন করতে পারি না; কিন্তু তবু, কৌতূহলবশে আমি প্রশ্ন করছি, হেরক্রুজের কাছে আত্মহত্যা করারও উপায় নেই, এই কথা বলছেন কেন?"

করুণভাবে হেসে হার্বার্ট বলল, "যে পাপ হেরক্রুজ় করেছিলেন, তার দু-রকম পরিণতি হতে পারে। এক, এই মৃত্যুলীলা বন্ধ করা এবং হেরক্রুজ় এখন যেমন যন্ত্রণাময়

জীবন কাটাচ্ছেন, সেটাই চালিয়ে যাওয়া, যদ্দিন না প্রাকৃতিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। দুই, নিজেকে এই নরকযাতনা থেকে মুক্তি দিতে শয়তানকে অন্য একটা পথ খুলে দেওয়া, যাতে সে তার বলি নির্বিবাদে গ্রহণ করে যেতে পারে একের পর এক।'

"আরেকটু খোলসা করে বলুন প্লিজ..."

"দেখুন, যদি ওই ছবির মাধ্যমে বাকি দুই শিল্পীর প্রাণও যেত, তবে হয়তো এত সমস্যা হত না। হেরক্রুজ় তাঁর অপরাধবোধে ভুগতেন এবং মানসিকভাবে যন্ত্রণা পেতেন আমৃত্যু, তা ঠিক। কিন্তু শয়তানের কাছে মানত-করা বলি সে পেয়ে যেত। কিন্তু সেই পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছবি দুটিও গোপন হেপাজতে রয়েছে, যার নাগাল পাওয়া আর সম্ভব নয়।

"তাই হেরক্রুজ় এখন নিজেকে চিরমুক্তি প্রদান করতে চাইলে তার উপায় একটাই, আবার সেই চিহ্ন এঁকে শয়তানের জন্য দরজা খুলে দিতে হবে এবং সেই দরজা খুলে রেখে যদি তিনি নিজেকে শেষ করে দেন, তবে তাঁর মুক্তি। কিন্তু তার ফলে আবারও শুরু হয়ে যাবে ভয়ংকর মৃত্যুর তাণ্ডব। শয়তানের জন্য পথ না খুলে তিনি নিজেকে শেষ করতে পারবেন না। শয়তান তাঁকে সেটা করতেই দেবে না!

"হেরক্রুজ় চান এখনকার মতোই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে। আর কারও প্রাণহানি তিনি চান না। কিন্তু শয়তান চায় ফিরে আসতে। তার জন্য শয়তান তাঁকে সবসময় কুপ্ররোচনা দিতে থাকে। স্যারের মনের মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এই নিয়ে। কখন কে জিতে যায়, বলা মুশকিল! তাই তো এত কঠোর নিয়মব্যবস্থা।"

"কিন্তু সেই চিহ্ন এঁকে শয়তানের জন্য পথ তো তিনি অনেকবারই খুলেছিলেন। এমনকি অ্যাসাইলামের মধ্যে দু-দিন আগেই তা-ই করেছেন, তবে কেন...?"

"তা করেছিলেন বটে, তবে ছবি আঁকার পর তো আর আত্মহত্যা করার কোনো উপায় ছিল না। কীভাবে করবেন? আর সেই চিহ্ন আঁকা থাকলে, মানে না মুছলে কারও না কারও মৃত্যু অনিবার্য! সেই মৃত্যু মিছিলও চলবে অবাধে। তখন প্রত্যেকবার মৃতের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা ভোগ করবেন হেরক্রুজ়। তাই তো তিনি ছবি আঁকতে ভয় পান। আঁকলেও সেগুলো নষ্ট করার জন্য পাগল হয়ে ওঠেন। তা ছাড়া এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যেখানে-সেখানে এঁকে আত্মহত্যা করলে তো হবে না। তার জন্য শর্ত আছে..."

"কী শর্ত?"

"সেই চিহ্ন এঁকে কাউকে দান করে যেতে হবে। আর সেই গ্রহীতাকে অবশ্যই হতে হবে কোনো শিল্পী!"

(১৪)

"হ্যালো ভাই, তুই কোথায়?" প্রায় চেঁচিয়েই প্রশ্নটা করে মিনার্ভা।

"বাড়িতে। কেন, কী হয়েছে?", মার্টিন কিছুটা হকচকিয়ে যায়।

"তুই অ্যাসাইলামে যখন এসেছিলি, রবিন সামন্তর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, হয়েছিল তো। তিনিই তো আমাকে হেরক্রুজ়ের সেলে নিয়ে গেলেন। আবার ফেরার সময় বৃষ্টি পড়ছিল বলে আমায় নিজের ছাতা দিয়ে দিলেন।"

"ওঁকে কি তোর খুব ডিস্টার্বড মনে হয়েছিল কোনোভাবে? মানে তোকে কি তেমন কিছু বলেছিলেন?"

"কই না তো! বরং তাঁকে তো আমার বেশ হাসিখুশি আর আমুদে লোক বলে মনে হল। ব্যাপার কী বল তো? তুই এইসব জিজ্ঞেস করছিস কেন?"

"জিজ্ঞেস করছি, তার কারণ আছে। রবিন সামন্ত কিছুক্ষণ আগেই সুইসাইড কমিট করেছে! উফ, কী বীভৎস! এমন ভয়ংকরভাবে কেউ কীভাবে..."

"হোয়াট?", সোফা ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল মার্টিন, "ইম্পসিব্‌ল! এত প্রাণবন্ত একটা লোক, একটু আগেও আমার সঙ্গে কত কথা বললেন... সেই মানুষটা এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা সিদ্ধান্ত কীভাবে..."

"আমার মনে হয়, তুই ওখান থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি কাজটা করেন। লোকটা... লোকটা..." মিনার্ভা যেন শিউরে উঠল বলতে গিয়ে, "লোকটা টেবিলের ওপর চেয়ার তুলে, তার ওপর দাঁড়িয়ে চলন্ত সিলিং ফ্যানের ব্লেডের মাঝখানে নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে! পুরোনো দিনের ভারী ব্লেডের পাখা..." গলা শুকিয়ে আসছে তার, "ঘরের দেওয়াল, মেঝে সব জায়গায় রক্ত আর মগজের ছিন্ন অংশগুলো ছড়িয়ে লেগে রয়েছে! কী নারকীয় দৃশ্য! আমি সহ্য করতে পারছি না, ভাই। আত্মহত্যার এ কেমন পৈশাচিক পদ্ধতি!" গলা কাঁপছে তার।

মার্টিন যেন একেবারে প্রস্তরবৎ হয়ে গিয়েছে। মিনার্ভাকে এখন হয়তো তার কিছু ভরসার কথা বা সান্ত্বনা দেওয়া

উচিত ছিল, কিন্তু সে কোনো কথাই বলতে পারছে না। সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে দরজার কাছে জল ঝরার জন্য মেলে-রাখা ভিজে ছাতাটার দিকে।

ঠিক তখনই কানে চেপে-রাখা ফোনে সে শুনতে পেল ওই পারে কিছু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। সেই সঙ্গে মিনার্ভার প্রায় চেঁচিয়ে বলা—"কী বলছেন আপনি! এটা কেমন করে সম্ভব?"

"হ্-হ্যালো দিদি...", মার্টিন উদ্‌বেগের কারণ জানার জন্য বলে।

তখনও শোনা যাচ্ছে মিনার্ভা ও আরও কয়েকজনের স্বর। "সুইসাইড করেছে মানে? কেমন করে করল? ওর হাত তো বাঁধা থাকে..."

উত্তরে সমবেত কিছু স্বর শোনা গেল। ঠিক কী বলল, তা বোঝা গেল না। তার পরিপ্রেক্ষিতে মিনার্ভা বলল, "খুলে দিয়েছে? কে খুলে দিয়েছে? আর সুইসাইড করল কেমন করে?"

আবারও অন্যদিক থেকে কেউ কিছু একটা বলল। তা শুনে মিনার্ভা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠে বলল, "পেন কোথা থেকে পেলেন উনি? পেশেন্ট নিজের প্রতি কতটা ভায়োলেন্ট, তোমরা জানো না? মানুষটা সবার চোখ বাঁচিয়ে মাত্র একটা পেন দিয়ে নিজের গলায় বিঁধিয়ে দিল এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে আর সেটা তোমরা এখন জানতে পারলে!"

একটা তীব্র আতঙ্ক মার্টিনের বুকে থাবা চালিয়ে দিল। সে বারবার ফোনে জানতে চাইল, "হ্যালো দিদি, কী হয়েছে? কী হয়েছে ওখানে?"

কিছুক্ষণ আরও এলোমেলো কথাবার্তার পর মিনার্ভা তার উদ্দেশে ফোনে বলল, "ভাই, সর্বনাশ হয়েছে! হেরক্রুজ়... হেরক্রুজ়ও আত্মহত্যা করেছে। কীভাবে কী হয়েছে, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি... আমি তোকে পরে ফোন করছি।" বলেই সে ফোন কেটে দিল।

মার্টিন আর কিছু বলার সুযোগই পেল না। বলার হয়তো কিছু ছিলও না। কারণ ওই পেন যে কার? কে সেটা হেরক্রুজ়কে দিয়েছে আর কে-ই বা তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে, সেটা মার্টিনের থেকে বেশি কেউ জানে না।

সে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল আবার নিজের জায়গায়। এই শীতেও তার কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হঠাৎ এত গরম লাগছে কেন? ঘরের তাপমাত্রাটা যেন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে...

মার্টিন আবার তাকাল ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে। সেখানে লেখা—পেমন তার আসার সময় বিশেষ শব্দের মাধ্যমে সংকেত জানায়। সাধারণত জিভ দিয়ে মুখের তালুতে ঠেকিয়ে 'ক্লিক' জাতীয় যে শব্দ করা হয় এবং এ ছাড়া তুড়ির আওয়াজের মধ্য দিয়েও সে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়।

তাই কি হেরক্রুজ় বলেছিল, "যদি কখনও তুড়ি বাজানোর শব্দ পাও, অথচ কেউ তোমার আশপাশে নেই, তবে সাবধান...!"

সেখানে আরও লেখা, পেমন তার অনুগামী বা অন্য যে-কোনো ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে যা খুশি করিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে।

তাই কি সে হেরক্রুজ়কে দিয়ে বারবার আঁকিয়ে নিত তার নিজস্ব চিহ্ন? আর তাই কি... সেই একইভাবে হেরক্রুজ়ও মার্টিনকে প্রভাবিত করে খুলিয়ে নিয়েছিল নিজের হাতের বাঁধন। আর তার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল মার্টিনের হালকা অথচ শক্ত ধাতুর তৈরি পেনটা! আর কি সেই একই কারণে পেমনের প্ররোচনায় হেরক্রুজ় তার হাতে এঁকেছে...

ভাবতে ভাবতে মার্টিন নিজের হাত তুলে ধরল নিজের চোখের সামনে। তার বাঁ হাতের পাতায় তখন হেরক্রুজ়ের আঁকা চিহ্নটা স্পষ্ট নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে।

একটা বৃত্ত... তার মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে একটা সরলরেখা... তির্যকভাবে... বৃত্তটা ভাগ হয়ে গিয়েছে দুটো বাঁকা অর্ধবৃত্তে...

উফ, কী ভীষণ গরম এই ঘরের বাতাস! যেন আগুনের হলকা বইছে। বাড়ির মধ্যে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। বাইরে থেকেও কোনো শব্দ আসছে না। যেন গোটা শহরটাকেই গ্রাস করেছে কালনিদ্রায়!

হঠাৎ চোখের সামনে কালো পর্দা ফেলে দিয়ে বাড়ির সব ক-টা বিজলি বাতি নিভে গেল একসঙ্গে। মার্টিনের চোখের সামনে থেকে সরে গেল ওই বিশেষ চিহ্নটাও।

আঁতকে উঠে সে বারকয়েক অন্ধকারেই ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল এদিক-ওদিক। নাঃ, বোধহয় সাধারণ পাওয়ার কাট।

একটু ধাতস্থ হতে মার্টিন জোরে শ্বাস টানল বারকয়েক।

ঠিক তখনই সব নীরবতা ভেঙে মার্টিনের কানের কাছে... খুব কাছে কে যেন জোর শব্দে তুড়ি বাজিয়ে গেল। সেই তুড়ির স্পষ্ট শব্দ ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল নির্জন গোটা বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে।





আমার ছোটোবেলাটা কেটেছে পুরুলিয়া জেলার এক ছোট্ট শহরে, উল্লা বেগমের কাছে। বাবা-মা দুজনেই ডাক্তার, দুজনেই সবসময় ব্যস্ত। শুধু ব্যস্তই নয়, সরকারি চাকরির সুবাদে অনেকগুলো বছর দুজনে রাজ্যের দুই প্রান্তে ছিটকে যেত। তাই আমাকে দেখাশোনার জন্য সর্বক্ষণের একজন অভিভাবকের মতো কেউ থাকাটা খুব দরকার ছিল। আমার নিজের দিদা বা ঠাকুমার সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক ছিল না। মা ও বাবা ছিল ক্লাসমেট। দুজনের জাতের কী সব গরমিল ছিল, তাই এই বিয়েতে দু-পক্ষের কোনো পরিবারই সম্মতি দেয়নি। বাবা ও মা দুজনেই খুব একগুঁয়ে জেদি ছিল, পরিবারের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে দুজনে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে। বিয়ের পরেও ওই জেদের কারণেই কোনো পক্ষই কাছাকাছি আসার বা ব্যবধান কমানোর কোনো চেষ্টা করেনি। নবদম্পতি অভিভাবকহীন নিঃসঙ্গ যৌথ জীবন শুরু করে। আমার জন্মের সময় মাতৃকালীন লম্বা ছুটিতে মা-কে থাকতে হয় বাবার কর্মস্থলে, মুর্শিদাবাদ জেলার কোনো এক ছোটো শহরে। প্রসব করানোর ব্যাপারে একটু চিন্তা থাকলেও আর কোনো উপায় ছিল না। বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ির পাট তো নেই। ভ্রূণের অবস্থান নিয়ে কী সব নাকি সমস্যা ছিল। শেষমেশ গর্ভাবস্থার অষ্টম মাসেই এক জটিল অস্ত্রোপচার করে আমাকে মা-র গর্ভ থেকে ছুরি-কাঁচি চালিয়ে উৎপাটিত করে ফেলতে হয়। জন্মকালে আমার ওজন ছিল স্বাভাবিকের অনেক কম। একে তো অনভিজ্ঞ জননী, তার ওপর অপরিণত সদ্যোজাত। মাথার ওপর অভিভাবিকা বলতেও কেউ নেই। এই বিপদের সময় একরকম নিজে থেকেই মা ও শিশুর দেখভালের ভার নেয়, বাবার অফিসের সাফাইকর্মী, সাদাত-উল্লা, তার বিধবা নিঃসন্তান চাচি। কাছের কোনো গ্রামে থাকত। বুড়ি নাকি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের কোনো শাখাপ্রশাখার সাক্ষাৎ উত্তরসূরি।

কে জানে কত বয়স! হাড় জিরজিরে কঙ্কালের মতো চেহারা, শণের নুড়ির মতো চুল, পিঠটা বেঁকে গেছে, মাজায় একটা

হাতের ভর দিয়ে হাঁটত। চোখদুটো মনে হত, অক্ষিকোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবে। সামনের দুটো দাঁত ছিল লম্বা, ঠোঁটের বাইরে ঝুলে থাকত। ও দুটো বাদ দিলে আর বাকি দাঁত অবশিষ্টও ছিল না। তবে শরীর যেমনই অপলকা হোক, খুব কাজের ছিল সে। বিশেষ করে ধাত্রীবিদ্যায় অসম্ভব পারদর্শী। দুর্বল প্রসূতির ও সদ্যোজাত শিশুর জন্য কতরকম যে ঘরোয়া টোটকা, সুস্বাদু পথ্য, মালিশের পদ্ধতি, উপকরণ জানা ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। অসুখবিসুখে দূর দূর থেকে অনেকে ওর কাছে আসত শিকড়বাকড়, জড়িবুটি নিয়ে যেতে। সে সময়ে পাড়াগাঁয়ে বেশির ভাগই ঘরেই প্রসব হত। সেক্ষেত্রে প্রসূতির অবস্থা শক্ত-জটিল হয়ে উঠলে প্রসব করাতেও ডাক পড়ত ওর। তবু খুব ঠেকায় না পড়লে চট করে কেউ কাছে ঘেঁষত না ওর। যদিও সকলে ওকে সামনাসামনি উল্লা বেগম বলে ডাকত, কিন্তু আড়ালে ডাকত ডাইনি বলে। ও নাকি নানারকম তুকতাক, বশীকরণ, ডাকিনী বিদ্যা জানত। পয়সা দিলে তাবিজ, ঝাড়ফুঁক, বাণ মারা, জিন ছাড়ান করে দিত। পাড়াগাঁয়ে হঠাৎ কোনো অপমৃত্যু হলে প্রথমেই দায় চাপত উল্লা বেগমের ঘাড়ে, যদিও এসবের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি কখনও। ওকে চটিয়ে, ওর পয়সা ফাঁকি দিতে গিয়ে নাকি একাধিক জোয়ান ছেলে মুখে রক্ত উঠে মরেছে, অন্তত এমনটাই গল্প চালু ছিল। লোকে ভয় পেত ওকে, সহজে ঘাঁটাত না। তাই এ ব্যাপারে মা-কে সতর্ক করেছিল অনেকে। এদিকে আমার মা ও বাবা দুজনেই ছিল, যাকে বলে অবিশ্বাসী। ওরা এসব কথা হেসে উড়িয়ে দিল। মা বলল, যতসব বাজে কথা। ঝাড়ফুঁক করবে না তো কী করবে! গরিব মানুষ, পেট চালানোর একটা উপায় চাই তো। এদিকে ডাইনি বলে অপবাদ থাকায় কেউ অন্য কোনো কাজও দেয় না। ও বেচারা যায় কোথায়! সেই বুড়ি তার হাতের গুণে সেই অকালে ভূমিষ্ঠ দেড় কেজি ওজনের আমিকে তিন মাসে নাদুসনুদুস গ্ল্যাক্সো বেবি বানিয়ে দিয়েছিল। কাজেই মা-র তখন আমার ব্যাপারে ওর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা। আমার ওপর ওই ক-মাসেই একটা অন্ধ অধিকারবোধ জন্মে গিয়েছিল তার। এমনকি মা-কেও ওর চোখের আড়ালে আমাকে ধরতে দিত না। উল্লা বেগমের তত্ত্বাবধানে মা-কে ওর সামনে বসে আমাকে স্তন্যপান করাতে হত, যাতে মা কোনোভাবেই ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ না পায়। কী সব গাছের ছাল-মূল দিয়ে তাবিজ বানিয়ে দিয়েছিল গোটা পাঁচেক, কোন সুড়া পড়ে গা বেঁধে দিয়েছিল আমার, কিছুতেই পয়সা নেয়নি।

মা-র কাছে এগুলো ছিল পুতুলখেলার মতো, মা বলত, "আহা, বুড়ির তিন কূলে কেউ নেই, যদি এসব করে একটু মায়া বাড়ায়, ক্ষতি কী!" মাস ছয়েক পর ছুটি ফুরোলে যখন মা-র নিজের কাজের জায়গায় ফিরে আসার সময় হয়ে গেল, মা উল্লা বেগমকে অনুরোধ করে সঙ্গে যেতে, অবশ্যই টাকার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করেনি মা। উল্লা বেগম একটু দোনামনা করে রাজি হয়ে যায়। মা কাজে যোগ দেওয়ার পর আমার দেখভাল উল্লা বেগমই করত। বাড়িতে কোনো গুরুজন না-থাকায় আস্তে আস্তে একজন অভিভাবকের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল উল্লা বেগম। হ্যাঁ, আমিও মা-র দেখাদেখি ওকে উল্লা বেগম বলতাম।

জীবনের প্রথম সাত বছর পুরুলিয়া জেলার এই পাহাড় ও অরণ্যের ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট শহরেই কাটিয়েছি আমি। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে বাঁধানো পিচের রাস্তার ওপারে অনেকটা ফাঁকা জায়গা একটু একটু করে মিশে গিয়েছিল অরণ্যে। বনের লম্বা গাছের মাথা ছাড়িয়ে, ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যেত ধূসর ধূম্র পাহাড়। সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে লাল আভায় রাঙিয়ে থাকত পাহাড়ের চূড়া, পাহাড়তলির বিস্তৃত বনাঞ্চল। সামনের মাঠে, সারি সারি পলাশ গাছের মাথা আগুন হয়ে থাকত বছরের কয়েকটা মাস। বাকি সময়টা কখনও বর্ষার ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটে শাল-মহুয়ার দীর্ঘ দেহ সাপের ফণার মতো দুলে উঠত, কখনও কাশ ফুলে ঢেকে যেত মাঠ, মা-র উঠোনে যত্নে লাগানো শিউলি গাছ ফুলে ভরে যেত, ঝাঁজালো মিষ্টি বাস উঠত।

শীতকালে শুকনো পাতায় হলুদ-খয়েরি হয়ে যেত সামনের রাস্তা, পায়ের চাপে মুড়মুড় মুড়মুড় শব্দ হত। বিকেলে সামনের মাঠে একটা মহুয়া গাছের তলায় উল্লা বেগম আমাকে কোলে নিয়ে বসে কত কী গল্প শোনাত। পাকা মহুয়া ফল ছড়িয়ে থাকত মাটিতে, ও নিজের মুখে পুরে দিত একটা একটা, আমি বায়না করলে কখনও কদাচিৎ আমাকেও এক-আধখানা খেতে দিত। ভালো না, কষা। আমি থু থু করে ফেলে দিতাম। উল্লা বেগম গল্প বলে যেত। সে গল্পের কোনো মাথামুণ্ডু নেই, আগাগোড়া নেই, একটার ঘাড়ে আরেকটা চেপে বসেছে। আবছা মনে আছে এক নতুন শাদি-হওয়া ফুটফুটে বেগমজানের কিস্‌সা। দুশো বছরের পুরোনো নবাব হাভেলিতে তার সমবয়সি শাহজাদিদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ঝাঁপ-ফেলা চোরকুঠুরির দরজায় পা পড়ে যায়। অন্ধকারে চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছিল। তখন কলঙ্ক রটেছিল, কোন বান্দার সঙ্গে

পালিয়েছে। পরে সে মেয়ের কঙ্কাল পাওয়া যায়, সে অবশ্য অনেক বছর পরে। উল্লা বেগম, নাকি তার মা, নাকি নানিমা—কেমন করে যেন জড়িয়ে যায় সেই গল্পে। অবাধ্য বিবিকে শাসন করতে চোরকুঠুরিতে বন্ধ করে রেখেছিল কোন শৌহর, সেই বিবিই খুঁজে পেয়েছিল তার পূর্বনারীর কঙ্কাল। গল্প চলে—কোন বেগমের শাদির পরদিন হিরের নাকছাবি হারিয়ে যাওয়ার কাহিনি। হঠাৎ সে গল্প মোড় নিয়ে ঘুরে এসে পড়ে পঞ্চাশ বছর আগের এক বিবাহবাসরে, সেই নাকছাবি পাওয়া যায় নতুন কনের পালঙ্কের ফাঁকে, ছেঁড়া জাজিমের তুলোর ভেতর। সেই নতুন কনে উল্লা বেগম কি না তা-ও বোঝা যায় না। কখনও আবার এক তরুণীর গল্প, যার স্বামী অন্য রমণীতে আসক্ত। কীভাবে বশীকরণ মন্ত্রে সে স্বামীর মন ফিরল, কিন্তু সে মরদের পা দুটো গেল পঙ্গু হয়ে, বিছানায় বন্দি পড়ে রইল সমস্ত জীবন, সেই কিস্‌সা। সেখানেও উল্লা বেগম ঢুকে পড়ে, কী করে কে জানে! বুঝতে পারছেন নিশ্চয় যে ওই বয়সে এসব গল্প বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না, উল্লা বেগম নিজের মনে বকবক করে যেত, ওই গুনগুন শব্দটার ঝিম-ধরানো, ঘুম-পাড়ানো সুর আমার অবোধ শৈশবের প্রতিটি গা শিরশির সন্ধ্যার সঙ্গে অজান্তে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে। মা রেগে যেত, বলত, ছেলেমানুষকে কী সব আজেবাজে বলে যাচ্ছ, ভালো গল্প বলো-না! উল্লা বেগম বিড়বিড় করে বলত, গল্প নয়, গল্প নয়, সত্যি কথা, ডাক্তারদিদি, বিশ্বাস হয় না তোমার! উল্লা বেগম এখানেও ওর জটিবুড়ি, শেকড়বাকড়, চালপড়ার পসরা সাজিয়ে বসেছিল। মা রেগে যেত খুব, নিজে ডাক্তার হয়ে অসুখ সারানোর এইসব অলৌকিক মাম্বো-জাম্বো মা একেবারেই বিশ্বাস করত না। কিন্তু যা-ই করুক, আমার ওপর ওর সতর্ক যত্নের কোনো ত্রুটি হয়নি কখনও।

বিপদ এল অন্যদিকে। এখানে আসার পর থেকেই মা অনেক চেষ্টা করেছে কলকাতায় বা বাবার কাজের জায়গায় ট্রান্সফার নেওয়ার। বাবাও চেষ্টা করেছে মা-র কাছাকাছি চলে আসার জন্য। উঁচু মহলে চেনাজানা না-থাকায় শুধু অনুরোধ-উপরোধে বা নিয়ম দেখিয়ে এসব কাজ হয় না, ওদেরও হয়নি। শেষ অবধি মা হতাশ হয়ে একটু দূরের একটা মিশনারি স্কুলে আমাকে ভরতি করে দেয়, আমার বয়স তখন চার বছর। ষোলোআনা সংসারী হয়েও বাউন্ডুলের একাকী জীবনযাপন করতে করতে বাবাও তখন ক্লান্ত। আমাদের কাছে আসা অনেক কমিয়ে দিয়েছিল, মাসে খুব বেশি হলে একবার কি তা-ও নয়। এলেও আগের মতো হাসি-মজায় কাটত না সময়টা, বরং মা-র সঙ্গে শুধু ঝগড়া, তর্ক, কথা কাটাকাটি হত। বাবা মা-কে চাকরি ছেড়ে বাবার কাছে চলে আসতে জোর করত। মা রাজি ছিল না। এখানে তখন হাসপাতালটা বেশ বড়ো হয়েছে। মা প্রথম থেকে জড়িয়ে আছে বলে এখানকার সব দায়িত্ব মায়ের ওপর। সবাই মা-কে খুব সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। মা-র নিজস্ব চেম্বারে রোগীর ভিড়ও উপচে পড়ে। মা এসব এককথায় ছেড়ে কেনই বা যাবে! বাবা কেন চাকরি ছাড়বে না! সুতরাং অশান্তি বাড়তে লাগল। একসময় বাবা হাল ছেড়ে দিল। আসা আরও কমিয়ে দিল। এলে মা-র সঙ্গে আরও অশান্তি, আরও ঝগড়া। শেষে তীব্রতা এমন হল যে বাবা এলেই আমি উল্লা বেগমের কাছে লুকিয়ে থাকতাম। দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের রাগে ফেটে-পড়া কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম, আর উল্লা বেগমের বুকে মুখ গুঁজে, কানে দু-হাত চাপা দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতাম ভয়ে।

একদিন বাবা এল অনেক রাতে। চুল এলোমেলো, মুখে একটা কেমন গন্ধ, টলছে, ভালো করে দাঁড়াতে পারছে না। বাবা এলে আগে আমি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতাম, এখন আর সাহস হয় না। ভেতরের ঘরের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছি, বাবা কেমন জড়ানো গলায় বিচ্ছিরিভাবে চ্যাঁচাচ্ছে। একটা কাগজ বারবার মা-র মুখের কাছে নাচাচ্ছে। মা-ও রাগে ফেটে পড়ছে, যা মুখে আসছে বলছে। এইভাবে চলতে চলতে একসময় বাবা মা-র চুলের গোছা বাম হাতের মুঠিতে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ডান হাতে একটা সজোরে চড় মারল মা-র গালে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মা-কে, মা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, মাথা ঠুকে গেল খাটের বাজুতে, কপাল কেটে রক্তে ভেসে গেল মুখ। আমি চিৎকার করে উঠলাম। উল্লা বেগম পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়ে গেল শোয়াতে। আমি ভয়ে বালিশে মুখগুঁজে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম। বেগম তার শক্ত কাঠের মতো আঙুলগুলো আমার চুলের ভেতর বিলি কেটে দিতে লাগল।

পরদিন যখন আমার ঘুম ভাঙল, বাবা চলে গেছে। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ ভারী কুচকুচে ঝুম হয়ে আছে। সাইক্লোনের মতো উদ্দাম ঝোড়ো হাওয়া বইছে। সকালবেলাতেও কেমন সন্ধের ছায়া-ছায়া অন্ধকার কালো ঝুলের মতো থোকা থোকা হয়ে আছে ঘরের ভেতর। এত বেলা হয়ে গেছে, আমাকে কেউ ডাকেনি। উঁকি মেরে দেখি, মা খোলা চুলে ডান গালে হাত দিয়ে পুবের বারান্দায় মেঝেতে

বসে আছে। বাঁদিকের গালটা ফোলা, কপালে কালশিটে পড়া। কাছে যেতে সাহস হল না। রোববার, মা-র আজ ডিউটি নেই, আমারও স্কুল নেই। মুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে বসে কম্পাসটা বের করে খাতায় আঁকিবুকি করছিলাম। আমাকে তখনও কিছু খেতে দেয়নি কেউ।

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি, উল্লা বেগম বাবা-মা-র শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটা চিরুনি ও রুমাল নিয়ে কী যেন করছে, বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছে নিজের মনে। আমার খিদে পেয়েছে খুব। উল্লা বেগম আমার খাবার না দিয়ে কী সব করছে! ভাবছি, মা-র কাছে গিয়ে নালিশ করব, এমন সময় উল্লা বেগম ঘরে এল। এক হাতে একটা অ্যালবাম, অন্য হাতে একটা নীল বটুয়া। আমার কাছে এসে অ্যালবামটা সামনের টেবিলে রেখে একটা টুল টেনে বসল। তারপর বটুয়া খুলে একটা সুন্দর কারুকাজ-করা পাথর-বসানো রুপোর একটা সরু কৌটো, অনেকটা ময়ূর পালকের মতো দেখতে, বার করল। আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলল, "মুন্নি, একে বলে জাদু সুর্মা। চোখে পরলে চোখের জুলুস বাড়ে, নজরের ধার বেড়ে যায়, হিরার মতো কাটতে পারে জিন্দা জওয়ানকে।"

আমার গাল টিপে দুই চোখে টানা টানা কাজল পরিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে গেলাম, একে তো এখন সকালবেলা, সাজের সময় নয়। তার ওপর কখনও এভাবে মোটা করে আমাকে সুর্মা পরায়নি কেউ। স্কুলেও বারণ আছে, মা-ও পছন্দ করে না বেশি সাজগোজ। সুর্মা পরিয়ে বেগম অ্যালবামের ভেতরে চিহ্ন দিয়ে রাখা একটা ছবির পাতা খুলে আমার সামনে ধরল। আমার চেনা ছবি, বাবা দাঁড়িয়ে আছে দার্জিলিঙের এক হোটেলের লনে, একা। মা-র তোলা ছবি—স্যুট, বুট, সানগ্লাস-পরা বাবাকে একেবারে সাহেবের মতো দেখাচ্ছে। মা-র খুব প্রিয় ছবি এটা। উল্লা বেগম কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, "মুন্নি, দেখ ভালো করে, দেখ এদিকে। বাবাকে দেখ, আশ মিটিয়ে, দু-চোখ ভরে দেখ, জান খুশ করে। পলক না ফেলে দেখে যা, ভেবে নে, বাবাকে তুই ভালোবাসিস, খুব ভালোবাসিস, বাবা যেন তোকে ছেড়ে কোথাও না যেতে পারে।" খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার চোখ-মুখ। আধো অন্ধকারে উল্লা বেগমের নুয়ে-পড়া দেহ যেন খাড়া হয়ে আকাশ স্পর্শ করেছে, অথচ ওর মুখ আমার মুখের খুব কাছে। চোখ দুটো যেন ওর সরু পাতলা কঙ্কালের মতো মুখটা ছেড়ে, গভীর অতল অক্ষিকোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, সাপের মতো অপলক দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টিকে আটকে রেখেছে, আমিও পলক ফেলতে পারছি না। ওর মণির রং পালটে হয়ে গেছে সবুজ, নাকি নীল, নাকি ছাই। ও মন্ত্র পড়ার মতো কী সব বলে যাচ্ছে বিড়বিড় সুর করে, সাপ খেলানোর সময় এইভাবে সুর করে শিস দেয় সাপুড়েরা—উল্লা বেগমের অন্য হাতে একটা ছেলে-পুতুল, তুলো ন্যাকড়ায় গড়া, কালো কোট-প্যান্ট পরা, মাথায় সত্যিকারের চুল, ওগুলো বোধহয় বাবার চিরুনি থেকে নিয়েছে এইমাত্র, পুতুলের গলায় বাবার একটা রুমালের টুকরো জড়ানো। পুতুলটার বুকে কয়েকটা পিন ফোটানো। আমি না চাইলেও আমার দৃষ্টি এসে পড়েছে সেই ছবির ওপর, চোখ সরাতে পারছি না। উল্লা বেগমের হাড়ের মতো শক্ত আঙুল আমার গাল টিপে ধরেছে, ফিসফিস স্বর আমার কানে কানে কী সব বলে যাচ্ছে, আমি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি, ঘুম-ঘুম লাগছে। হঠাৎ কানে এল মা-র গলার তীব্র আওয়াজ, উল্লা বেগম, কী করছ তুমি! ছেড়ে দাও, মুন্নিকে ছেড়ে দাও। জ্ঞান হারাতে হারাতে বুঝতে পারলাম, মা আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

এর ঠিক সাত দিন পর বাবা মারা যায়, মৃত্যুর কারণ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। এরপর একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি উল্লা বেগম নেই, তার সেই পুরোনো মরচে-ধরা কালো লোহার ট্রাংকটাও নেই। মা যদিও কোনোরকম কুসংস্কার, ভুডু, ব্ল্যাক ম্যাজিক, আত্মা, পরমাত্মা—কিছুই মানত না, যতবার বাবার মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠেছে, মা 'অতিরিক্ত মদ্যপান ও ধূমপানের ফলে আর্টারি ব্লকেজ ও হার্ট অ্যাটাক'ই এর কারণ হিসাবে বলেছে বরাবর, তবু। তবু সারাজীবন বাবার কথা বললেই মা কেমন অপরাধীর মতো মুখ নামিয়ে নিত। চোখে চোখ রেখে কখনও এই নিয়ে আলোচনা করত না। উল্লা বেগমের কথা আর কখনও আলোচনা দূরে থাক, উচ্চারণও হত না বাড়িতে, ওটা যেন এক নিষিদ্ধ বিষয় ছিল। এই ঘটনার খবর পেয়ে সব মতবিরোধ ভুলে আমার দাদু ও মামা এসে মা-কে ওদের কাছে নিয়ে যায়। মা চাকরি ছেড়ে কলকাতা চলে আসে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করে। আমার অবশিষ্ট শৈশব মামার বাড়িতেই কেটেছে।

উল্লা বেগমকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কী করে আবার মনে পড়ল তা-ই বলার জন্যই এই অবতরণিকা। আমি এখন এমবিবিএস করে এমডি-র জন্য তৈরি হচ্ছি। পড়াশোনার সুবিধা ও কিছুটা স্বাধীনভাবে থাকার জন্য একটা সিঙ্গল সিটেড পিজি হস্টেলে থাকি। শিগগির বিয়ে করব আমার ক্লাসমেট রাহুলকে। সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমাদের প্রেম। সবাই জানে, খুশি মনেই মেনে নিয়েছে সবাই। প্রায়ই আমরা

একসঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাই। এই গত সপ্তাহেই ঘুরে এলাম সিকিমের এক পাহাড়ি গ্রাম থেকে। শুধু রিল্যাক্স করার জন্য দুটো দিন। বৃষ্টির দাপটে প্রায় সারাদিন ঘরবন্দি থাকতে হয়েছে।

রাহুল এবার হুজ্জতিটা বেশিই করেছে। বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে, অসাবধানতায় কখন কী হয়ে যায়! রাতে শুয়ে এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ফোনে টুং করে মেসেজ ঢুকল একটা। রাহুলের নম্বর। কী আবার বার্তা দিল ছেলেটা! কালই তো দেখা হবে। বিরহ আর সইছে না! বেশ বড়ো মেসেজ। পড়তে লাগলাম। খুব দুঃখের সঙ্গে রাহুল জানিয়েছে যে ও এ বিয়েটা করতে পারছে না। ওর বাবার বন্ধুর মেয়ে ঋতির সঙ্গে এনগেজমেন্টটা এক মাস আগেই হয়ে গেছে, আমাকে বলতে একেবারে ভুলে গিয়েছিল কাজের চাপে।

যা-ই হোক, ও জানে, আমি স্পোর্টিংলি নেব ব্যাপারটা। ওরা পরের মাসে রেজিস্ট্রি করেই ইউরোপে যাচ্ছে, একসঙ্গে এমডি করতে। আঙ্কলই সব ব্যবস্থা করছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার পৃথিবীটা দুলে উঠল। রাহুল সব জেনেশুনে সিকিমে... লোকে যেমন এসকর্টদের ব্যবহার করে...। আমি ছুটে গিয়ে বেসিনে বমি করলাম, জল উঠে এল শুধু পেট থেকে। ঘেন্নায় কেন্নোর মতো কুঁকড়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে গর্ভস্থ বৃত্তাকার ভ্রূণের মতো বিছানায় পড়ে রইলাম। এবং হিক্কা তুলে শুকনো কান্না কাঁদতে কাঁদতে কখন একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম। স্বপ্নে উল্লা বেগম এল। সেই কঙ্কাল অবয়বে করোটি মুখমণ্ডল। অতলশূন্য অক্ষিকোটর, অপলক সর্পদৃষ্টি। সাপের মতোই বাঁকা ন্যুব্জ শরীর। এক হাতে সেই জাদু সুর্মা, অন্য হাতে ন্যাকড়ার একটা পুতুল, পুতুলটা দেখতে অনেকটা রাহুলের আদলে। আমার কানে কী সব গূঢ় কথা সাপ-খেলানো সুরে বলে গেল, চুলে ওর শক্ত হাড়ের আঙুলগুলো দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে। মগজে গেঁথে গেল সেই সুর, সেই কথা।

সকালে উঠে আমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারটা খুলতেই সেই পাথর-বসানো রুপোর সুর্মাদানিটা হাতে এল, যদিও এখন কলঙ্ক পড়ে কুচকুচে কাল। আমি জানতাম, প্রায় কুড়ি বছর আগে পুরুলিয়ার ছোট্ট এক শহরে হারিয়ে-যাওয়া জিনিসটা মাত্র বছরখানেক আগে আসা এই পিজি হস্টেলের রুমেই পাওয়া যাবে। আমার দেরাজে খুঁজলে রাহুলের পুরোনো টি-শার্টও কয়েকটা পাওয়া যাবে আমি জানি, বহুবার আমার এই ঘরে ও রাত কাটিয়েছে। রাহুলের মাঝে মাঝে চুল ঠিক করার অভ্যাস। ফলে সিকিমে গিয়ে রাহুলকে আমার একটা ছোটো চিরুনি দিয়েছিলাম সবসময় ব্যবহার করতে। সিকিম থেকে ফেরার পর সেটা আমার ব্যাগেই আছে, আর ব্যবহারও করা হয়নি, ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেটাতে রাহুলের চুলও পাওয়া গেল। আর ছবি? ফোন ভরতি সেল্‌ফি আছে ওর, সেল্‌ফি তোলা রাহুলের একটা নেশা।

আজও আকাশ কালো হয়ে আছে, ঝমঝম বৃষ্টি, দমকা হাওয়া, সোঁদা গন্ধ উঠেছে ভেজা মাটির। এখন কিছু খাওয়া যাবে না। উপবাসে থেকে পুতুলটা বানাতে হবে আগে। স্বপ্নে শোনা উল্লা বেগমের সেই সাপ-খেলানো অদ্ভুত একটানা ঝিমঝিম সুর, কে জানে, কোথা থেকে ভেসে আসছে এই বর্ষার সকালে, নাকি আমিই শিস দিয়ে জাগিয়ে তুলছি ওই অজানা সুর, ফিসফিস করে বলে যাচ্ছি অদ্ভুত কিছু শব্দরাজি, যাদের অর্থ আমি নিজেই জানি না! ফোনটা সামনে রেখে আয়নার মুখোমুখি বসলাম আমি, জাদু সুর্মাদান হাতে নিয়ে।







ব্যাখ্যাহীন

দেবমাল্য চট্টোপাধ্যায়

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)



কথায় বলে, তাবিজ-কবচ-মাদুলি-আংটি, নির্দিষ্ট আচারবিধি মেনে, আপন আপন ইষ্টদেবতার নামে ধারণ করলে, অনেক প্রকার বাধাবিপত্তিই নাকি কেটে যায়। সঠিক উপায়ে ঈশ্বরসেবায় নাকি ইষ্টলাভ হয়। অভিশাপ, কুদৃষ্টি, মারণ উচাটন ইত্যাদি-প্রভৃতির হাত থেকে চিরমুক্তি মেলে। ঈশ্বরই সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ভূতপ্রেত জিন-পিশাচের মতো অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে পারেন। কাটাতে পারেন আপদ-বিপদ অকল্যাণ। অনেকেই কথাগুলো বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি করি না। যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রতিও আমার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই। কারণ বিশ্বাস এমনই এক অনুভব, যা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত।

যে বিশ্বাসে মানুষের মঙ্গল হয়, তাদের নিজের প্রতি আস্থা রক্ষিত হয়, অন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে সদিচ্ছা জোগায়, তেমন বিশ্বাসকে আমি অন্ধবিশ্বাস বলে দূরে সরিয়ে দিতে পারি না। হ্যাঁ, এ কথা মিথ্যা নয় যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নই। আমি প্রকৃতিতে বিশ্বাসী। তবে এটাও সত্য যে, আমি প্রেতযোনিতে অবিশ্বাস করি না।

জীবনে আমার এই অনুভবের কথা আমি কাউকে ভরসা করে বলতে পারিনি শুধুমাত্র এইজন্যে নয় যে তাঁরা আমার কথা অবিশ্বাস করবেন। আশঙ্কা আমার অন্যত্র। যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করেন যে, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু প্রেতযোনিতে করেন, এটা কীভাবে সম্ভব? অশুভ শক্তি যদি থেকেই থাকে, তবে শুভ শক্তিও নিশ্চয়ই আছে! হ্যাঁ, অস্বীকার করছি না।

আছে নিশ্চয়ই, তবে তাকে আমি ঠিক ঈশ্বর বলেও মেনে নিতে পারি না। তাকে আমি প্রকৃতি হিসাবেই দেখি। প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করি, কারণ তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি বহুবার। অনুভব করেছি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে। নিশ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার মতোই তা আমার কাছে সত্য।

কিন্তু তথাকথিত ঈশ্বরকে বা তার তেমন সক্রিয় উপস্থিতিকে, আমি অন্তত তেমনভাবে কোনোদিন প্রত্যক্ষ করিনি। উপলব্ধি করিনি সেই মহান শক্তির অপরিসীম ক্ষমতা। আমার ভবঘুরে জীবনে বহু মন্দির-মসজিদ-দেবালয়ে গিয়েছি। ঘুরেছি বহু তীর্থক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি কোনো জায়গাতেই খুঁজে পাইনি।

যেটুকু ভালো, যেটুকু শুভ কিছু বোধ করেছি, তা খুঁজে পেয়েছি এই প্রকৃতির কোলেই এবং শুধুমাত্র জীবের মধ্যেই। জানি না সেই উপলব্ধিই আসলে ঈশ্বরকে অনুভব করা কি না। যদি তা-ই হয়, তবে তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তথাকথিত ঈশ্বরে এবং তাঁর নামে ধারণ করা তাবিজ-কবচ-মাদুলিতে আমার বিশ্বাস কোনোদিনই ছিল না। আজও নেই। তাই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা তথা তার সপক্ষে যুক্তি আমি কোনোদিনই কাউকে বলতে যাইনি। প্রকৃতির ওপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস নিয়েই, আজও বেঁচে আছি।

তথাপি অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আস্থা রাখেন তাঁদের ইষ্টদেবতায়। ঠিক যেমন অভয়বাবু। ভালোনাম অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও ভালোনাম তান্ত্রিক ও জ্যোতিষগুরু শ্রীমান অভয়চরণ শাস্ত্রী। সাক্ষাৎ শ্রীভৃগু (আদি)-র শিষ্য ও মানসপুত্র। সম্পর্কে আমার বড়োজ্যাঠাইমার দাদা।

একবার এক পরিজনের দুর্ঘটনায় অপমৃত্যুতে, দোষ কাটাতে আমাদের পুরোনো পৈতৃক বাড়িতে তিনি এসেছিলেন। সমস্ত বিধি সমাপ্ত করে সামান্য চা-মিষ্টি সহযোগে চলছিল তাঁর আলোচনা। শান্তির জলের মাহাত্ম্য কী! বিপত্তারিণীর তাগার গুরুত্ব কতখানি! প্রেতবাধা কীভাবে দূর করা যায়! এই সমস্তই ছিল তাঁর আলোচ্য বিষয়। তিনি একাই বক্তা। বাকি আমরা চ্যালাচামুণ্ডারা সব শ্রোতা। আমার বয়স তখন বছর বারো। কথায় কথায় তিনি প্রেতযোনি দর্শনের কথা তুললেন, "অপঘাতে মৃত্যুর পরে মৃতের আত্মা নাকি সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি পান না। এই পৃথিবীতেই তা আটকে থাকেন। ঘুরে বেড়ান আমাদের চারপাশে। তাঁর ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে। বারে বারে তিনি সেই প্রচেষ্টাই করেন। তাঁর এই সাময়িক অবস্থানের জন্যে তিনি খুঁজে নেন অন্ধকার ঘরের কোণ বা বাড়ির আনাচকানাচ। যদি সেই মৃতের মৃত্যুকালীন কোনো ক্ষোভ বা বিদ্বেষ থেকে থাকে, তবে অকস্মাৎ এই অপমৃত্যুতে তিনি একই সঙ্গে যন্ত্রণা ও ক্রোধের বশবর্তী হন। ঘটিয়ে ফেলতে পারেন কোনো অনিষ্ট। এই ধরনের আত্মারা কিছু ক্ষেত্রে তখন আর মুক্তিও চান না। আজন্মকাল এই প্রেতযোনিতেই রয়ে যেতে চান। এঁরাই তখন অশুভ আত্মা বা ইভিল স্পিরিটে পর্যবসিত হন। ইংরেজিতে এঁদেরকেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে পল্টারগাইস্ট বা উপদ্রব সৃষ্টিকারী আত্মাও বলা হয়ে থাকে। এঁরাই দিন অথবা রাতের বিশেষ কিছু সময় বা মুহূর্তে মানুষের কাছে দৃশ্যমান হন। মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে ভয় পান। তাই শ্রাদ্ধশান্তির সময় নির্দিষ্ট নিয়মবিধি মেনে দোষ কাটাতে হয়। প্রেতবাধা খণ্ডন করতে হয়। তবেই আত্মা এই বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়। সঠিকভাবে মুক্তিলাভ করে। বিলীন হয় পরমাত্মার সঙ্গে। কথাগুলো অভয়বাবুর বলার মুনশিয়ানায় খুব একটা অযৌক্তিক শোনাচ্ছিল না।

সে সময় আমার সে বয়সও নয় যে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে, বিজ্ঞানের নিক্তিতে মেপে গ্রহণ বা বর্জন করব। একজন দ্বাদশবর্ষীয় বালকের কাছে যে-কোনো গুরুজনের মুখনিঃসৃত গুরুগম্ভীর কথাই সত্য বলে পরিগণিত হয়। অভয়বাবুর কথায় আমারও নিশ্চয়ই তেমনটাই হত। কিন্তু হয়নি। কারণ ততদিনে আমার অপরিপক্ক মনে প্রেতযোনি সম্পর্কে এক অদ্ভুত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, এবং কেন হয়েছিল—আজ সে কাহিনিই বলব আপনাদের।

বয়স তখন আমার বড়োজোর সাড়ে চার কি পাঁচ। প্রাইমারি স্কুল পরিত্যাগ করে সেকেন্ডারি স্কুলে সদ্য ভরতি হয়েছি। প্রাইমারি স্কুলে থাকাকালীন বসন্ত রোগে বেশ কিছুদিন ভোগার ফলে দেহ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। স্বাস্থ্যও ভেঙে গিয়েছিল। প্রায়শই ঘুসঘুসে জ্বরে ভুগতাম। জিভে ছিল জন্মের অরুচি। নিরালা দুপুরে একাকী, কখনও বা ভরসন্ধ্যায় নির্বান্ধবে, অথবা গভীর রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে কেমন যেন গা ছমছম করত। সারা গায়ে কাঁটা দিত।

কিছু যে দেখতে বা শুনতে পেতাম তা নয়। শুধু মনে হত, বিছানার পাশে, সোফায়, চেয়ারে, ঘরের আনাচকানাচে অন্ধকারে, বেশ কিছুজন নীরবে উপস্থিত থেকে নির্নিমেষ ও নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমায় দেখছে।

এদিকে ঘরে বা সে স্থানে আলো থাক বা না থাক, আমি কাউকেই দেখতে পেতাম না। এবং ঠিক এই ব্যাপারটাই আমার মনে এক অদ্ভুত শিরশিরানি জাগাত। সঠিকভাবে সে

উপলব্ধি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সবকিছু হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা যায়ও না। কিছু উপলব্ধি আছে, যা শুধুমাত্রই অনুভব করা যায়, অন্যকে বোঝানো যায় না।

আমার সেই দিনগুলোর অনুভবটা ঠিক তেমনই ছিল। তাই কাউকে বলতেও পারতাম না কিছু। এদিকে বয়স তখন আমার এতটাই কম যে নিজের কল্পনাশক্তিও তেমন প্রখর হয়নি, যার জোরে মানসপটে কিছু একটা এঁকে ফেলা যায়। তাই যেটুকু অনুভব করেছি তা আমার নিজের কাছে অতি স্পষ্ট এবং চন্দ্র-সূর্যের মতোই সত্য। প্রায়শই লক্ষ করতাম যে এমন অনুভব হলে, দেহ সেই সময়টায় ভীষণ দুর্বল হয়ে যেত। মনে হত, এই বুঝি গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ব। এদিকে চোখ বুজে চেষ্টা করেও দেখেছি বহুবার, একবিন্দুও ঘুমোতে পারিনি। শুধু মনে হয়েছে যে, আমার এই বন্ধ চোখের ওপারে এমন বেশ কতকগুলো চোখ রয়েছে জাগ্রত, যাদের আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারা আমায় শ্যেনদৃষ্টিতে দেখছে। প্রতিদিন নিয়ম করে এমনটা হত না। এমন হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময়ও ছিল না। তবে ঘটত প্রায়শই, এবং ঘটত একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।

ঠিক এমনই এক অবস্থায় একদিন এক অভূতপূর্ব ঘটনার সম্মুখীন হলাম, যা চিরকাল আমার মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে রয়ে গেল। তখন, এখনকার দিনের মতো মাইক্রো ফ্যামিলির এত চল ছিল না। একটি বাড়িতেই দাদু-দিদা, ছেলেমেয়ে, নাতিপুতি নিয়ে ভরভরন্ত ঢালাও সংসারই বেশি চোখে পড়ত।

আমাদের পরিবারটিও ঠিক ততটা বৃহৎ না হলেও, আয়তনে খুব ছোটোও ছিল না।

তা ছাড়া হপ্তান্তে প্রায়শই দূরে থাকা কোনো না কোনো পরিজন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হত। শনি ও রবি এই দুই দিন বাড়িতে বেশ একটা ছোটোখাটো উৎসবের আমেজ চলে আসত। তেমনই এক শনিবারে আমার ছোটোকাকা একটি ইম্পোর্টেড ভিসিআর নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হলেন। উনি থাকতেন বহরমপুরে। ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যাবসা করতেন। এমন একটি আশ্চর্য বস্তু দেখে সকলেই যারপরনাই অভিভূত। কারণ তখন সিডি বা ডিভিডি-র কথা কেউ ভাবতেই পারত না।

থাকার মধ্যে ছিল এই ভিসিআর/ভিসিপি, যেটায় কালো রঙের বৃহৎ ক্যাসেট ঢুকিয়ে টিভি-তে নিজের পছন্দের সিনেমা দেখা যেত। সিনেমার এই বৃহৎ আকৃতির ক্যাসেট যেমন কিনতে পাওয়া যেত, ঠিক তেমনই ভাড়াও পাওয়া যেত।

আমাদের বাড়ির দোতলার কমন হলঘরটায় একটি রঙিন টিভি ছিল, অস্কার কোম্পানির। সারা বাড়িতে ওই একটিমাত্রই টিভি ছিল।

সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় পালা করে এবং দলবদ্ধভাবে সকলে সেই টিভি দেখত। কারও একার পছন্দ বা অপছন্দ সেখানে গুরুত্ব পেত না। তবে ছোটোকাকা যেদিন তাঁর নতুন ভিসিআরটি আমাদের দেখাতে নিয়ে এলেন, সেদিন কিন্তু সকলের মধ্যেই সমান উৎসাহ দেখা দিল। ঠিক করা হল যে রাতে মাংস-ভাতে ভূরিভোজ করার পর, সকলে মিলে ভিসিআরে সিনেমা দেখা হবে।

সিনেমা দেখা বলতে তখন যতটুকু ওই দূরদর্শনে দেখায় ওই, নতুবা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে টিকিট কেটে দেখা, যা বাড়ির মহিলাদের ক্ষেত্রে বড়ো একটা সম্ভব হত না। তাই স্বভাবতই ভিসিআরের মতো একটি যন্ত্র সামনে পেয়ে তাঁরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। চটজলদি ফরমাশ হয়ে গেল, কোন ছবির ক্যাসেট ভাড়া করে আনা হবে। ছোটোকাকা এক কাপ চা খেয়েই দৌড়োলেন বউদিদের হুকুম তামিল করতে।

আমাদের ভাইবোন তিনটেকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দেওয়া হল, যাতে আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। এদিকে আমরাও জেদ ধরে রইলাম যে বড়োদের সঙ্গে বসে আমরাও সিনেমা দেখব। প্রথমে বায়না, তারপরে কান্নাকাটি। বকাঝকাতেও যখন কোনো ফল হল না, তখন ছোটোকাকাই ব্যাপারটাতে মায়েদের রাজি করালেন, "যাক গে যাক, ওরা ছোটো মানুষ, একদিন যদি একটু দেখলই না হয়, কী বা হবে? এমনিই একসময় ঘুমিয়ে পড়বে ঠিক।"

আমরা একপ্রকারে অনুমতি পেয়ে গেলাম ঠিকই, কিন্তু গেলে কী হবে, আমি বাদে বাকি দুজনেই খাওয়াদাওয়ার পর আধ ঘণ্টাও আর জেগে থাকতে পারল না। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল। তবে আমি কিন্তু জেগে রইলাম। জানি না কেন সেদিন আমার একবিন্দুও ঘুম আসছিল না। তা কি শুধুমাত্র সিনেমা দেখার উত্তেজনায় না অন্য কিছু, তা আমার সঠিক জানা নেই। তবে কিছুটা উত্তেজনা তো ছিলই, কিন্তু সেটা বললেও সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না। সত্য বলতে গেলে বলতে হয় যে এই উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত শিহরন কাজ করছিল ভেতরে। অনেকটা সেই অনুভূতিটার মতো। মনে হচ্ছিল যেন অদৃশ্য কিছু একটা অপেক্ষা করে আছে সেদিন আমার জন্যে।

সকলের মাঝে, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর নীচেও বোধ

করেছিলাম যে, সকলের অলক্ষে কিছু তো আছে, যা আমায় নজরে রাখছে। প্রতীক্ষা করছে কোনো এক অমোঘ সন্ধিক্ষণের। একবার আমি চোখ বুজলেই, আচমকা সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপরে।

তাই বায়না, কান্নাকাটি, হুটোপাটিটা যখন থেমে এসেছিল, তখন সিনেমা দেখার অনুমতি মেলার পাশাপাশি এই অনুভূতিটাও যেন একেবারে বুকের মাঝে চেপে বসেছিল।

সেদিন রাত্রে প্রায় এগারোটার কাছাকাছি সময় দোতলার বৃহৎ হলঘরে মা, কাকিমা, জেঠিমারা সকলে জমায়েত হয়েছিলেন। ছোটোকাকা বাদ দিয়ে বাড়ির অন্য পুরুষরা কেউই সেদিন এই আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা যে যার ঘরে চলে গিয়েছিলেন। হয়তো অফিসের ধকলে ক্লান্ত ছিলেন সকলে। বাকি ভাইবোনেরা ততক্ষণে তাদের বাবাদের সঙ্গে যে যার ঘরে নিদ্রারত। আমি শুধু মায়ের কোলে শায়িত এবং সম্পূর্ণ জাগা। এত বড়ো হলঘরে শুধুমাত্র একটি নীল বর্ণের নাইটল্যাম্প জ্বলছিল।

ভিসিআরের প্লে বাটনটি টিপে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এর আগের মুহূর্ত পর্যন্তও বাড়িতে যেটুকু আনুষঙ্গিক কোলাহল ছিল, তা-ও সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ্যের মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেল। সম্ভবত কোনো হিন্দি ছবি চালানো হয়েছিল। স্পষ্ট করে মনে নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, তা কোনো হরর বা থ্রিলার গোত্রীয় নয়। সকলের দৃষ্টি টিভি-র পর্দায় নিবদ্ধ। সারা ঘরে শুধু ছায়াছবির সংলাপ ও আবহসংগীতের শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো শব্দ নেই।

সিনেমার গল্প বোঝার মতো বয়স তখন আমার ছিল না, তাই শুধুমাত্র টিভি-র পর্দায় সচল ছবিগুলো দেখছিলাম, আর মনের মধ্যে অনুভব করছিলাম সেই শিরশিরানি বোধটা।

ঘরে আলো-আঁধারির মাঝে বারে বারে অনুভব করছিলাম সেই অদৃশ্য নজরদারি। এদিকে হলঘরে বাড়ির বেশির ভাগ সদস্যই সে সময় উপস্থিত। এইভাবেই কাটল ঘণ্টাখানেক।

মাঝে মা বারকয়েক আমায় ঘুমিয়ে পড়ার কথা বলেছেন।

আমিও যে সে চেষ্টা করে দেখিনি এমনটা নয়। কারণ ততক্ষণে সিনেমা দেখার জন্য যেটুকু উত্তেজনা ছিল, তার সবটাই প্রশমিত। ভালোও লাগছিল না আমার, নিজের কাছে সম্পূর্ণ অবোধ্য এই চলচ্চিত্রের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পারছিলাম না ঘুমোতে।

চোখ দুটো বন্ধ করলেই সেই অনুভূতিটা আরও মাত্রাতিরিক্ত হয়ে চারপাশ থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছিল। ঠিক এমনই সময়, ছায়াছবির ঘটনাপ্রবাহে একটি বিশেষ দৃশ্য পরিবেশিত হল।

দৃশ্যটি অনেকটা এই প্রকার, 'একটি তরুণীকে কয়েকটি লুম্পেন তাড়া করেছে কোনো এক দুরভিসন্ধিতে। তরুণীটি প্রাণপণে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে সে প্রবেশ করেছে একটি অরন্যে। সেখানে ছুটতে গিয়ে সে বারে বারে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জলকাদায় ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। আবার কোনোরকমে উঠে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে। অরণ্যের শাখাপ্রশাখা ও শিকড়ে আঁচড় লেগে তার পরিধেয় সবকিছু ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। এদিকে লুম্পেন গোষ্ঠী ক্রমশই তাদের বেগ বৃদ্ধি করে শিকারের থেকে দূরত্ব কমিয়ে আনছে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধাওয়া করার পর অবশেষে তরুণীটি খুব বিশ্রীভাবে একটি বিশাল বনস্পতির শাখাপ্রশাখা ও অসংখ্য ঝুড়ির নাগপাশের জালে আটকা পড়ে গেল। অতএব লুম্পেন গোষ্ঠী তাদের কাঙ্ক্ষিত শিকার অবশেষে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল।'

সমগ্র দৃশ্যটি স্বভাবতই মর্মান্তিক। যদিও সেই সময় শ্লীলতাহানি, যৌন অত্যাচার বা ধর্ষণের মতো নারকীয় অপরাধ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও কোনো ধারণা বা জ্ঞান ছিল না। সে বয়সে থাকার কথাও নয়। তবুও সেই মেয়েটির ওই ভয়, যন্ত্রণা, বারে বারে ভূলুণ্ঠিত হওয়া, এবং সর্বশেষ, অরণ্যের শাখাপ্রশাখার জালে আটকে পড়া, আমার মনে এক বিষাদের ছবি এঁকে দিচ্ছিল।

সিনেমাটিতে লুম্পেন গোষ্ঠী সেই হতভাগিনিকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যে ঠিক কী করেছিল শেষমেশ তা আমি বুঝতে পারিনি, তবে সর্বশেষ দেখেছিলাম যে, মেয়েটির অচেতন দেহ। শ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ। বন্ধ দু-চোখের কোলে কাজল ঘেঁটে আছে। সারাদেহে ছিন্নভিন্ন সিক্ত বস্ত্র ও তাতে কাদামাটিতে মাখামাখি।

সেই বয়সে এমন কঠিন দৃশ্য নিশ্চয়ই আমার মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই ভয়ে, অব্যক্ত যন্ত্রণায় মায়ের কোল ঘেঁষে এসে দু-চোখ বুজেছিলাম।

সেই অবস্থাতেই কানে এসেছিল মায়ের কণ্ঠস্বর, "এবার ঘুমো, অনেক রাত হয়েছে, এসব ছবি বাচ্চারা দেখে না।" তবু আমি ঘুমোইনি।

ঘুমোতে পারিনি, কারণ চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মনের মধ্যে অনুভব করলাম, হলঘরের দরজার সামনের সিঁড়িতে, যেটি একতলায় নেমে গেছে, সেখানে কারও উপস্থিতি। হলঘর থেকে সিঁড়ির একটি ধাপও চোখে পড়ে না, কারণ দরজা থেকে বেরিয়েই একটি ছোটো প্যাসেজ, যেটা একেবারে সমকোণে (ইংরেজির L) বেঁকে তারপর সিঁড়ির

প্রথম ধাপ। তাই সিঁড়িতে কেউ উঠলে বা নামলে তা ঘরের থেকে দেখা সম্ভব নয়।

তবু আমি চোখে না দেখলেও, মনে মনে অনুভব করছিলাম, কেউ যেন সিঁড়ি বেয়ে খুব ধীর পদক্ষেপে উপরে উঠে আসছে। কোনো শব্দও পাইনি যে এমনটা মনে হবে। তা ছাড়া ঘরে তখনও ছায়াছবির শব্দই মুখরিত। তবুও অনুভব করছিলাম, কেউ আসছে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলাম ওই আলো-আঁধারিতে মাখা ছোট্ট প্যাসেজটার দিকে। তখনও আমি মায়ের কোলে শায়িত। প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে এক-একটি ঘণ্টার মতো কাটতে লাগল।

একভাবে চেয়ে রইলাম সেদিকে। এমনভাবে ঠিক কত সময় কেটেছে জানি না, মায়ের ধমকে চমকে উঠলাম, ''তুই ঘুমোসনি? আমি সব দেখছি কিন্তু!''

ভয়ংকর চমকে উঠলাম মায়ের এমন ভয়ংকর ভারী ও সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠস্বরে। তবে মায়ের দিকে তাকানোর সুযোগ পেলাম না, কারণ ততক্ষণে আমার আবার চোখ চলে গেছে ওই প্যাসেজটার দিকে, যেখানে আলো-আঁধারিতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটি প্রাণীকে, যে তার দুই হাতে ও পায়ে ভর দিয়ে প্রায় বুকে হেঁটে চলে এসেছে প্যাসেজটার প্রায় মাঝামাঝি, এবং ঠিক এই প্রাণীটিকেই টিভি-র পর্দায় আমি মিনিটকয়েক আগে দেখেছি। পরনে সেই একই রকম ছিন্নভিন্ন পোশাক, জলকাদা-মাখা অপরিচ্ছন্ন দেহ। একরাশ অবিন্যস্ত সিক্ত চুল ও সারাদেহে যত্রতত্র রক্তের ছোপ। শুধু পার্থক্য হল, টিভি-র পর্দায় দেখা সে হতভাগিনির চোখের কোলে কাজল ঘেঁটে ছিল। এবং প্যাসেজে যাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তার সম্পূর্ণ মণিহীন অক্ষিকোটরের কোল উথলে ঘন কালচে কোনো তরল দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সেটা কি কাজল, নাকি উষ্ণ শোণিতস্রোত তা আমি আজও সঠিকভাবে বলতে পারি না।

ভয়ংকর আতঙ্কে এবার মায়ের দিকে ফিরে চাইলাম, দেখলাম, সে সরাসরি আমারই দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু তার অক্ষিকোটরও শূন্য, এবং সে চোখের কোল বেয়েও নেমে আসছে সেই একই কালচে তরলের ধারা...

সেদিন রাতে এতটাই কান্নাকাটি করেছিলাম যে তারপরে যে ঠিক কী ঘটেছিল তা আমার খেয়াল নেই। শুধু মনে আছে যে মা আমায় কোলে নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন, এবং আমার ঠাকুরদা ছোটোকাকার ওপর খুব রাগারাগি করেছিলেন এই সমস্ত কুরুচিপূর্ণ সস্তার হিন্দি ছায়াছবি দেখার জন্য। পরে বাড়ির লোকের মুখে শুনেছি যে সেদিন নাকি আমি ভয়ংকর চিৎকার করে উঠেছিলাম।

তবে ঘুমের মধ্যে নয় কিন্তু। কারণ সেদিন সেখানে উপস্থিত সকলেই দেখেছে যে আমি চিৎকার করার আগে পর্যন্ত একবারও ঘুমোইনি। এদিক-ওদিক দেখছিলাম। বিশেষ করে ওই আলো-আঁধারিতে ঢাকা বাইরের প্যাসেজটার দিকে।

সকলে এটাই মেনে নিয়েছিল যে শিশুমনে কোনোভাবে সিনেমার ভায়োলেন্সই সেদিন বিকৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলস্বরূপ আমার হ্যালুসিনেশন ও আর্তনাদ। যদিও আমি তাঁদের আমার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শিশুমুখে আধো ভাষায় বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার বক্তব্যের সমর্থনে সেদিন আর কেউই এগিয়ে আসেননি। অথবা হয়তো আমিই তাঁদের বোঝাতে অসমর্থ হয়েছিলাম। তাই তাঁরা তাঁদের যুক্তিতেই অনড় ছিলেন শেষমেশ। উপরন্তু তাঁরা এমনটাও দাবি করেন যে সে রাতে মা আমায় বারকয়েক ঘুমোতে বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমার আর্তনাদ করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে তিনি আমায় কোনোপ্রকারে কোনো ধমকধামক বা ভর্ৎসনা করেননি। এবং সেখানে উপস্থিত বাকি সকলেই নাকি এর সাক্ষী।

বাড়িতে নারায়ণ শিলা ছিল, আর আমার গলায় পরানো ছিল রুপোয় বাঁধাই-করা বাঘনখ। সেই প্রথমবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর কালীবাড়ি থেকে মা এনে আমায় পরিয়েছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনোপ্রকার আধিভৌতিক বা অলৌকিক কোনো কিছু ঘটারও সম্ভাবনা নেই। আমি একঘর আপনজনের মাঝে ছিলাম, এবং আমার মায়ের কোলে শায়িত অবস্থায়। সুতরাং এমতাবস্থায় আমার ওপর সিনেমার কুপ্রভাব ছাড়া আর কোনো কিছুকেই তাঁরা দায়ী করতে পারছিলেন না সেদিন। কিন্তু একমাত্র আমিই সেদিন মন থেকে জানতাম যে সিনেমার কোনো প্রভাব নয়। সিনেমা শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই আমার সেই অনুভূতিটা জাগ্রত হয়েছিল, যা কোনোদিন আমি ভাষায় কারও কাছে প্রকাশ করতে পারিনি।

তবুও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত বয়সে এসে, সকলের কাছে সেদিন রাতের আমার কার্যকলাপের কাহিনি শ্রবণ করে, নিজেই এক অদ্ভুত ধোঁয়াশায় পড়ে গিয়েছিলাম, 'তবে কি সবটাই আমার মনের ভুল, বা স্বপ্ন? অথবা সিনেমার কুপ্রভাব? নাকি সেদিন যা অনুভব করেছিলাম তা নিখাদ সত্য?'

ভূতপ্রেত বস্তুটা আসলে ঠিক কী, তার কোনো সঠিক সংজ্ঞা আমার কাছে সে সময় ছিল না। নিজে যা অনুভব

করেছি, তা-ই আমার কাছে সত্য।

বাল্যকালে খারাপ স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছি বহুবার, তবে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এমন স্বপ্ন আমি এর আগে কোনোদিন প্রত্যক্ষ করিনি, এবং এর পরবর্তীতেও কোনোদিন নয়। তাই একে নিছক স্বপ্ন বলেও মেনে নিতে পারিনি।

এরপর প্রেতযোনি দর্শন আমার বহুবার হয়েছে। নিজের মতো করে ব্যাখ্যাও খুঁজে নিয়েছি সে সমস্ত ঘটনার। কিন্তু সেই বাল্যবয়সে হওয়া আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কোনো ইতিবাচক ব্যাখ্যা কোনোদিন খুঁজে পাইনি। তাই মনের ধোঁয়াশা আজও কাটেনি।

ধোঁয়াশা অবশ্য একটা আমার পরিবার-পরিজনদের কাছেও রয়েছে। এবং তা যদি না থাকত, তবে আজ এ কাহিনি আমার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ত না।

আর পাঁচজনের মতো হয়তো আমিও একদিন মেনে নিতাম যে, ঘটনাটা নিছক একটা হ্যালুসিনেশন ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না।

কিন্তু মেনে নিতে পারছি না এই কারণেই যে, সেদিন রাত্রে ওই ঘরে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বচক্ষে যে, ঝকঝকে তকতকে একটি বাড়ির সিঁড়িতে কী করে এত জল-কাদা-মাটি এল, এবং কোথা থেকে? যেখানে বাইরে কোথাও বৃষ্টিবাদলা হয়নি সেদিন। পরিবারে এমন কেউ নেই, যে বাইরের জুতো পরে দোতলায় উঠে আসবে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে সেই জলকাদার দাগ অনেকটা কেউ হেঁচড়ে বুকে হেঁটে আসার মতো, যা একতলার মূল দরজার সম্মুখ থেকে দোতলার প্যাসেজের মাঝবরাবর বিস্তৃত ছিল।

তাই পরিবারের যুক্তিতে আমার মনে যতই ধোঁয়াশা সৃষ্টি হোক-না কেন, সেদিন সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালক হিসাবেও অভয়বাবুর সমস্ত কথা বিশ্বাস করাটা কঠিন হচ্ছিল।

বিশ্বাস করতে পারিনি তাঁর প্রেতযোনি সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও যুক্তি। কারণ এ পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটনাও ঘটে, যা শুধুমাত্রই একটি প্রশ্নচিহ্নের মতো ব্যাখ্যাহীন হয়েই রয়ে যায় চিরকাল। উত্তর মেলে না কোনোদিন।





বিরাজেশ্বরী

আত্রেয়ী দত্ত



(১)

"শোনো বাবা, নবপুরের ওই যে শিবলিঙ্গ, তা কিন্তু খুব জাগ্রত। লোকে বলে, বাবার অনুমতি ছাড়া ওই মন্দিরে কেউ ঢুকতে পর্যন্ত পারে না। বাবার কপালে আছে একটা নীলকান্তমণি..." শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে গল্প বলিতেছিলেন কান্তিডিহির জমিদারবাড়ির পুরোহিত ঠাকুর শ্রী শরৎপতি ভট্টাচার্য, শ্রোতা আমি। জমিদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহপর্ব মিটিয়াছে অনেকক্ষণ, তাঁহাকে বলা হইয়াছিল আহার করিয়া নেওয়ার জন্য, তবে ঠাকুর আপাতত বাহির হইয়াছেন তাঁহার কন্যাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য, রাত হইয়াছে, আগে তাহাকে দুটি খাওয়াইয়া তাহার পর খাইবেন। তবে কন্যার জন্য ঠাকুরের বিশেষ চিন্তা নাই, তাঁহার স্বল্পভাষী, অতি শান্ত কন্যাটির এই আলয়ে সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান কোনটি, তাহা তিনি জানেন। তিনি বাহির হইতেই সঙ্গ লইলাম আমি, এই মানুষটির সাহচর্য যতটুকু পাই, তাহাতেই দ্রব হইয়া যায় আমার একাদশ বৎসরের মনটি। কত কী জানেন ঠাকুর, আমার বোধ হয়, আমাদের ইস্কুলের মাস্টারমশাইও এত কিছু জানেন না, জানিলেও এমন চমৎকার করিয়া বলিতে পারেন না। আজ সারাদিনে বিবাহকার্যের প্রস্তুতির মধ্যে যখনই

সময় পাইয়াছেন, আমাকে নিকটের একটি গ্রামের এক শিব মন্দিরের ইতিহাস শুনাইয়াছেন। এখন পুনর্বার আমার অনুরোধে সেই কাহিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ কী দেখিয়া অস্ফুট এক আর্তনাদ করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া গেলেন।

আমি অবাক হইয়া দেখিলাম, ছোঁ মারিয়া একখানি ক্ষুদ্র জীবকে শিব মন্দিরের চাতাল হইতে তুলিয়া লইলেন তিনি, তর্জন করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরী! কী করলি এটা!"

তাঁহার এতখানি ক্রুদ্ধ হইবার কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে কী করিয়াছে আমিও দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা ক্রোধিত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। এই মেয়েটিকে দেখিলেই আমার কেন জানি বোধ হয়, কুমারেরা ইহার মুখ দেখিয়াই মা দুর্গার মুখ গড়েন। আমার ধারণা, বাকিদেরও তাহাই বোধ হয়, সেইজন্যই গ্রামের অন্য সকল বালিকার তুলনায় আদরও একটু বেশি পায় ঈশ্বরী, কাহারও গৃহে নিতকনে হইবার উপযুক্ত বালিকা না থাকিলে তাহাকেই নিতকনে সাজানো হয়। সে বিশেষ কিছুই করে নাই এখন, খেলিতে খেলিতে নিজের গলার মালাটি শিবলিঙ্গে পরাইয়া দিয়াছে শুধু, তাহা ভালো করিয়াছে, নানা কাহিনি শুনিয়া তাহার মতো শিব ঠাকুরকে আমারও ভারী পছন্দ। বাপের ক্রোধের কারণ সম্ভবত সে-ও বুঝিতে পারেনি, দেখিলাম, তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি আরও বড়ো হইয়া গেল, কোনোমতে বলিল সে, "আমি তো শিব ঠাকুরকে সাজাচ্ছিলাম বাবা। দ্যাখো, আজ কেউ শিব ঠাকুরকে মালা পরায়নি। তাই তো আমি আমার মালা ঠাকুরকে দিলাম।" ঠিক কথা, যথার্থ কথা। আজ সকলে ফুল লইয়াছে, মালা পরিয়াছে, অথচ ব্যস্ততায় শিব ঠাকুরকেই ভুলিয়া গিয়াছে। তবে তাহার এমন সহজ বিশ্লেষণেও মুগ্ধ হইলেন না পুরোহিত ঠাকুর। পরিবর্তে ঈশ্বরীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দ্রুত আসিয়া আমার সম্মুখে পা ভাঁজ করিয়া বসিয়া চুপিচুপি বলিলেন, "বাবা, যা দেখলে, কাউকে বোলো না কিন্তু। মনে থাকবে?"

আমি মনে মনে দুঃখই পাইলাম। ঈশ্বরীর এমন মহানুভবতার কথা, হুঁশিয়ারির কথা সকলকে বলিলে সকলে তাহার কত-না প্রশংসা করিত। তবে পুরোহিত ঠাকুরের কথা না শুনিলে যদি তিনি আর গল্প না বলেন, যা রাগিয়া গিয়াছেন! আমি ভয়ে ভয়ে ঘাড় হেলাইলাম, "বলিব না।" বলিও নাই। শুধু যখন ঈশ্বরীর হাত ধরিয়া ঠাকুর গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, আমি আড়াল হইতে ইশারা করিয়া বলিয়াছিলাম, সে খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করিয়াছে। সে কী বুঝিয়াছিল জানি না, তবে তাহার চোখ দুখানি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিয়াছিল, আর ঠোঁটে সম্ভবত সামান্য হাসি...

(২)

"কী হয়েছে ওর পায়ে?"

বাঘা কুকুরটির একেবারে কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া-থাকা মেয়েটি হঠাৎই চমকিত হইয়া আমার দিকে চাহিল, এতক্ষণ মন দিয়া বাঘার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিবার কারণে সম্ভবত সে আমাকে ঠিক লক্ষ করেনি। আমি দুই-একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া লইলাম। আপাতত আমি চলিয়াছিলাম আমার জ্যাঠামশাইয়ের পরিবারের দুর্গাপূজার কলাবউ স্নানে, সকলের চোখ এড়াইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আমাকে কেহ কিছু বলিবে এ বিষয়ে আমি চিন্তা করি না, আমার এই অষ্টাদশ বৎসরের জীবন আমাকে অন্তত আমার পরিবারের নিকট নিতান্তই অবাধ্য আখ্যা দিয়াছে, উহাতে আমার বিশেষ সমস্যা হয় না। তবে ভয় হয়, আমার সম্মুখের এই বালিকাটি যেন আমার হঠকারিতার জন্য কোনো বিপদে না পড়ে। ইতিপূর্বেই কলাবউ স্নানের দল তাহার বয়সি কন্যাকে গৃহের বাইরে আসিতে দেখিয়া অবাক চোখে চাহিয়াছে, বয়স্থা গৃহবধূরা মুখ ফিরাইয়া লহিয়াছেন, অধিক ক্ষতি আর অভিপ্রেত নয়। আমার হইতে সামান্য সরিয়া-বসা বালিকাটির দিকে চাহিয়া আমি নিম্নস্বরে বলিলাম, "এইভাবে বাঁধলে ওর পা জন্মেও ঠিক হবে না। দেখি ওকে, তাড়াতাড়ি..."

মেয়েটি ভাবিল কী যেন, যেন বুঝিয়া লইল আমাকে ভরসা করা সম্ভব কি না। তাহার পর উঠিয়া সম্মুখের দুইচালা বাড়িটির দোর ধরিয়া দেখিতে লাগিল আমি কী করি। বুঝিতে পারিতেছিলাম, এ কার্য সে আপন হাতে করিলেই স্বস্তি পাইত, কিন্তু গৃহের বাইরে বেশিক্ষণ অবস্থান করা তাহার পক্ষে অসুবিধাজনক, অপরদিকে গ্রামের সকলের প্রসাদ পাইয়া বেশ বড়োসড়ো আকৃতির, তদুপরি আহত বাঘাকে গৃহে লইয়া যাইবার সাধ্যও নাই তাহার। দ্রুতহাতে গাছের ডাল বাঁধিয়া বাঘার পায়ে ব্যান্ডেজ করিয়া দিলাম আমি, "চটপট... এসে দেখে যাও!"

ছুটিয়া আসিল মেয়েটি। সতর্ক দৃষ্টিতে ব্যান্ডেজটি পরীক্ষা করিল, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া আমার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইল একবার। চোখ দুটির পানে একটিবার মাত্র চাহিয়াই আমার বোধ হইল, অমন চোখ আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই, অন্তত পক্ষে কোনো নারীশরীরে দেখি নাই। পড়াশুনা

সূত্রে শহরে নিত্য যাতায়াতের সুবাদে বহু চোখের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে আমার। তবে এই ঈষৎ বাদামি চোখ দুটিতে লজ্জা নাই, প্রগল্‌ভতাও বিন্দুমাত্র নাই, কেবল একজন কৃতজ্ঞ মানুষ, তাহার সদ্য উপকারী একজন মানুষের দিকে যেমনভাবে চাহিতে পারে, তাহার অধিক কিছু নাই ইহাতে। মুহূর্তের জন্য আমার মাথাখানি কেমন ঘুরিয়া আসিল, এবং সঙ্গে এ-ও স্মরণ হইল, মস্তিষ্কে এমন আন্দোলন আমার এই প্রথম নয়।

(৩)

"কী হল, আর কত দেরি হবে? বেলা তো দুপুর হয়ে এল।" কর্ণপটহ বিদ্ধ করিয়া বাজিয়া-চলা ঢাকগুলির মধ্য দিয়াই নিজের গম্ভীর গলার স্বরটিকে সকলের কানে পৌঁছাইয়া দিলেন কান্তিডিহির দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার শ্রীশেখরনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, আমার জ্যাঠামশাই। তাঁহার এহেন আকস্মিক উপস্থিতিতে তটস্থ হইয়া একে অপরের পানে চাহিয়া-চলা মানুষগুলিকে ঠেলিয়া আসিয়া দুই কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল ভুতি ডোম—ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া জমিদারবাবুর কানের কাছে মুখ আনিয়া চেঁচাইয়া কহিল, "এ হইব না কত্তা, এ কাঠ জ্বলব না, সকাল থিকা কীভাবে না কীভাবে খাইটা মরলাম উঃ! বিশ্বাস না হইলে আপনে যারে ইচ্ছা জিজ্ঞাস করেন!"

জিজ্ঞাসা করিবার তেমন অবকাশ ছিল না। গতকাল মধ্যরাত্রে ভ্রাতার চাকর আসিয়া সংবাদ দিবার পর হইতে বড়ো দুশ্চিন্তায় আছেন জ্যাঠামশাই। এবারের পূজা আশ্বিনের প্রথম ভাগে, প্রায় পুরা আষাঢ় শুষ্ক কাটাইয়া এতদিনে আকাশের বোধ হইয়াছে, একটু বৃষ্টি হইলে মন্দ হইত না, বিগত তিন দিন ধরিয়া উন্মাদিনী ঝরনার মতো ঝরিয়া যাইতেছে তাই। কিন্তু কাজ তো ফেলিয়া রাখা চলে না। জ্যাঠামশাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে গত রাত্রে, হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ মৃত্যু—তাহার দাহকার্য এতক্ষণে সম্পন্ন নিশ্চয়। নিয়ম অনুসারে একই চিতায় দাহ করিবার কথা পতি পত্নীকে... সে যখন হইলই না, এতখানি বিলম্ব হওয়াও কাম্য নয়। আবার বিপদ তো কম নয়, একবার সরকার বাহাদুরের ঘরে সংবাদ পৌঁছাইলে বাড়িসুদ্ধ লোকের কোমরে দড়ি পড়িবে, আর তাহার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কাজে বাধা পড়িবে—এই ছেলেটি না বাঁচিয়া থাকিতে শান্তি দিয়াছিল, না দিতেছে মরিয়া। তা-ও কী ভাগ্য চারিদিকে গাছপালায় ভরা কুশি নদীর বালির চর একখানি আছে তাঁহার জমিদারিতে, গাঁয়ের বাহির হইতে কেহ টের পাইবে না গাঁয়ে কী ঘটিতেছে। আর থাকিল গ্রামবাসীদের কথা, তাহাদের ট্যাঁ-ফোঁ করিবার সাহস নাই তাঁহার বিরুদ্ধে, আর... তেমন ইচ্ছাও নাই। গাঁ-ঘরে এমন আমোদ সচরাচর হয় না, তা-ও আবার যেমন-তেমন বিষয় নয়, এই ভাঙাইয়া সমগ্র গ্রামের মানুষের সৌভাগ্যের জোগান হইয়া যাইবে—ইহাতে কি তাহারা আপত্তি করিতে পারে! বন্দোবস্ত তো তাহারাই করে দিল, এখন শুধু... গলা একটু নামাইয়া বলিলেন জ্যাঠামশাই, "ও ভুতি, তোরা তো অনেক কায়দাকানুন জানিস, দেখ-না এ কাঠ যদি শুকোনোর কোনো ব্যবস্থা করা যায়! ভালো বকশিশ দেব..."

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই লাফাইয়া উঠিল ভুতি, "ওভাবে হয় না বাবু, ভোজবাজি নাকি যে এমন স্যাঁতা কাঠ শুকায়ে ফেলব! আমার সোজা কথা, এ কাঠ জ্বলতি সময় লাগব—আপনের যদি তর না সয়, মাইয়াডারে গায়ে কেরাচিন ঢাইলা এমনিই জ্বালায়া দ্যান গা যান! আর তা-ও লাগব না, যা আফিম গেলাইসেন তাইতেই না..."

দাঁতে দাঁত চাপিয়া চুপ করিয়া গেলেন জ্যাঠামশাই। নাহ্, আজ কিছু অঘটন ঘটাইয়া সমস্যা বাড়াইবেন না আর, এই ডোমের পো-কে পরে দেখিয়া লইবেন। আসল লোককেই চুপ করাইয়া দিলেন... অবশ্য ভুতি ব্যাটা একখানা ভালো কথা বলিয়াছে, উপায় না পাইলে তেমনই... উহাতে কি ধর্মরক্ষা হইবে? একবার নিজের বাম পাশে চাহিলেন জ্যাঠামশাই। এইসব বিষয়ে যে বিধান দিতে পারিত, সে, অর্থাৎ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ঈশ্বরীর বাপ বর্তমানে পড়িয়া আছে তাঁহার দুই পাইকের কাঁধের উপর। লোকটির বাঁ হাতটি অন্তত দুই জায়গায় ভাঙিয়াছে, চাপ চাপ রক্তে লাল হইয়া আছে পরনের সবুজ ফতুয়া হইতে মাথার ধবধবে সাদা চুলগুলি, একটি চোখ বন্ধ প্রায়। লোকটির শাস্ত্রজ্ঞান ভালো, পূজা-অর্চনা মন দিয়া করিত, কেন যে এই অতি পুণ্যের নিয়মগুলিই মানিতে রাজি হইল না! সে যাক, অপর একটি পুরোহিত আসিয়াছে ইতিমধ্যেই, তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া এখন ঠিক করিতে হইবে কী করা যায়। নিজের গৃহে পূজার নামে ভাড়া করিয়া আনা ঢাকিদের বাজাইয়া যাওয়ার ইঙ্গিত করিয়া জমিদারবাড়ির দিকে পা বাড়াইয়াছিলেন জমিদারবাবু, পা-সহ গোটা শরীরই স্তব্ধ হইয়া গেল ঠিক ঘাড়ের পাশ হইতে ভাসিয়া-আসা একটি ঠান্ডা উচ্চারণে, "জ্যাঠামশাই!"

কড়কড় করিয়া বাজ পড়িল কোথাও। দুই দুইবার চমকাইয়া উঠিবার ধাক্কাটি সামলাইতে না পারিয়া পিছন ফিরিয়াই প্রায়

আমার ঘাড়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন জ্যাঠামশাই, "বি...বিরাজ!"

মুহূর্তের মধ্যে আমি দেখিলাম, কুশিচরের প্রত্যেকের মুখ আমার দিকে, কয়েকটি পল সমস্ত চুপ। তাহার পরেই প্রচণ্ড এক কোলাহল শুরু হইল, যে যাহার মতো ছুটিতে লাগিল এদিক-ওদিক, ঢাকিরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বাজনা থামাইয়া দিল। আমি একবার নিজের হাত-পাগুলি বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম। সারা শরীর কর্দমাক্ত, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবির রং কী ছিল, সে কেহ আমাদের ইউনিভার্সিটির আতশকাচ আনিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারিবে না। আমার চোখ-মুখের অবস্থাও সম্ভবত বিশেষ ভালো নয়, অনেকদিন না-ছাঁটানো রুক্ষ চুল হু হু করিয়া উড়িতেছে বাতাসে। এই অবস্থায় হঠাৎ কাউকে ভূতের মতো কুশিচরে আবির্ভূত হইতে দেখিলে যে কারোই হৃৎকম্প জাগিবার কথা, এমন হুড়মুড় করিয়া পলায়নও খুব স্বাভাবিক। ওহ্ হ্যাঁ, আর একটি কারণও আছে বটে। যাহার অকালমৃত্যু উপলক্ষ্যে সতীদাহের এই মহাপুণ্যের আয়োজন, আমিই জমিদার মহাশয়ের সেই ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীবিরাজমোহন মুখোপাধ্যায়।

জ্যাঠামশাইকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া আমি একটু সরিয়া আসিলাম। আমার শ্বশুরমশাই, মাটির মানুষটি মাটিতেই লুটাইতেছেন, পাইক দুটি ভয় পাইয়া উহাকে ভূতের আহারের জন্যই বোধহয় ফেলিয়া পলাইয়াছে। উহাকে ধরিয়া তুলিয়া একটি গাছের গুঁড়িতে পিঠ দিয়া বসাইয়া জ্যাঠামশাইয়ের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। উনি এখনও পলাইতে পারেন নাই, আমার সম্মুখে ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিয়া চলিতেছেন, দেখিয়া মনে হইতেছে, উনি পলাইবার চেষ্টা করিলেই আমি উঁহার ঘাড় মটকাইব। এইবার আমার খারাপ আর বিরক্ত দুইই একসঙ্গে বোধ হইল, সামান্য গলা তুলিয়া বলিলাম, "কী হল আপনাদের? আমায় দেখে কি ভূত মনে হচ্ছে?"

অস্বাভাবিক রকমের নরম স্বরে হইলেও মুখ খুলিলেন জ্যাঠামশাই, "বি...বিরাজ... তুমি... এখানে..."

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, "এবারের মতো স্বর্গযাত্রা হল না জ্যাঠামশাই। কুলাঙ্গারকে ক্ষমা করবেন, কত লোক একটু পুণ্যি করবে বলে এসেছিল, আমি ফিরে এসে সকলের আশায় জল ঢেলে দিলাম!"

জ্যাঠামশাইয়ের কণ্ঠ আবার কাঁপিয়া উঠিল, "কিন্তু... ইয়ে, মানে কাল রাতে তোমাদের বাড়ি থেকে চাকর এসে..."

"বলল আমি মরে গেছি?"

"ইয়ে... আসলে বাবা, নরহরি তোমাদের এতদিনের চাকর, সে যে ভুল খবর দেবে, আমি ভাবতেও পারিনি। ওই ব্যাটাচ্ছেলের যে কী অবস্থা করব আমি... এই কে আছিস... ও বাবা... সে-ও তো নেই... তাকে তো আবার আমি একখানা জরুরি জিনিসের ফর্দ দিয়ে ভিন গাঁয়ে পাঠালুম, এখানে ক-টা জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল না কিনা..."

বাধা দিলাম আমি, "না জ্যাঠামশাই, নরহরিদাদা ভুল খবর দিয়েছে বটে, তবে সে যা জানত, তা-ই বলেছে। আমার বাড়ির সকলেই জানত, আমি হৃদ্‌রোগে মারা গেছি, গাঁয়ের কবিরাজও তা-ই বলেছিল—নাড়িজ্ঞানটুকুও সঠিক না থাকলে যা হয় আর কী! এমনকী আমাকে শ্মশানে অব্দি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কী ভাগ্যিস রাস্তাতেই জ্ঞান ফিরে আসে আমার", তাঁহার হতবাক মুখখানি দেখিয়া আবার হাসি আসিল আমার, "আপনার বিশ্বাস না হলে আমাদের গাঁয়ে লোক পাঠিয়ে খবর নিতে পারেন।"

"না না তা নয়!" দ্রুত বলিলেন জ্যাঠামশাই, "কিন্তু এসব কী বলছ হে বিরাজ! এমনও হয়! তোমাদের ওখানে কোবরেজ তো যথেষ্ট নামকরা, এমন একটা কাজ করে ফেলল! যদি সত্যি তোমায় জ্বালিয়ে দিত!"

"কী আর বলি জ্যাঠামশাই", মাথা নত করিলাম আমি, "পাশের গাঁয়েই ডাক্তার ছিল জানেন, অথচ দেখুন আমার বাপ-মা-কে! শিবরাত্রির সলতে বলতেন না আপনারা আমায়... এদিকে..."

"আঃ বিরাজ, বড়োদের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন করতে নেই, জানো না? ওসব কালাপানি পার-হওয়া ডাক্তার, ওরা ছুঁলেই মরণ, বুঝলে? ভোলানাথের কৃপায় তুমি যে আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ, সে শুধু ওই গোরুর মাংস-খাওয়া ডাক্তার তোমায় ছোঁয়নি বলে!" এতক্ষণে নিজের বাদশাহি মেজাজখানি কিছু হইলেও ফিরিয়া পাইয়াছেন জ্যাঠামশাই, "তা তুমি ভালো আছ, অতি সুখবর, এখানে তো আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, চলো, বাড়িতে হাত-পা ধুয়ে দুটি খেয়ে নেবে। তোমার জেঠিমা তোমায় দেখলে বড়ো খুশি হবেন। ওরে কে কোথায় আছিস..."

হাঁক পাড়িলেন জ্যাঠামশাই। বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পরও কাহারও সাড়া মিলিল না। তিনি এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে বলিলেন, "আসলে বাবা, তুমি যেভাবে এলে, তাতেই সকলে ভয় পেয়ে..."

"বাবা বিরাজ..." কখন যে গাছের তলায় নির্জীব হইয়া পড়িয়া-থাকা মানুষটি হুঁশ ফিরিয়া পাইয়াছেন, আমি লক্ষ্যও

করি নাই। লক্ষ যখন হইল, ততক্ষণে আমার শ্বশুরমশাই প্রায় বুকে হাঁটিয়া আসিয়া আমার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়াছেন। কোনোরকমে উঁহাকে দু-হাতে ধরিয়া তুলিলাম আমি, "বাবা... না না ছিঃ... এ কী..."

"আঃ!" চমকিত হইয়া বাবার হাত দুটি ছাড়িয়া দিলাম। তাহার পর চিৎকারের কারণ বুঝিয়া উঁহার বাম হাতখানি সাবধানে হাতে তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলাম একবার। অদ্ভুতভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে হাতটি, কত ব্যথাই না পাইয়াছেন! কোনোক্রমে নিজের ডান হাতে আমার বাম হাতটি আঁকড়াইয়া কাঁপা গলায় বলিলেন বাবা, "বিরাজ... তুমি যে আজ কী বাঁচান বাঁচালে বাবা, তুমি নিজে জানো না।"

বাবার গালের রক্তচিহ্নগুলি চোখের জলে ধুইয়া যাইতেছে ধীরে ধীরে, বোধ হইতেছে, এই মুহূর্তে আমাকে বক্ষে জড়াইয়া কাঁদিতে পারিলে একটু শান্তি পাইতেন মানুষটি। জ্যাঠামশাইয়ের দিকে আমার চোখ পড়িয়া গেল একবার, "সব জানি বাবা। তবে আমি তো এসে গেছি, এবার একটু শান্ত হন!" একটু ইতস্তত করিয়া যোগ করিলাম আমি, "বাবা... ঈশ্বরী..."

আমার দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিয়াও কিছু বলিলেন না জ্যাঠামশাই। বাবা যেন এতক্ষণ কোন ঘোরে ছিলেন, হঠাৎই সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন, "তাই... তাই তো! আমার মা... আমার মা কোথায়? ঈশ্বরী..."

বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকাইতেছিলেন বাবা। জ্যাঠামশাই গলাখাঁকরানি দিলেন একবার, "মেয়ে তোমার ঘরেই আছে, দ্যাখো গে..."

বাবা প্রায় ছুটিয়া আমার শ্বশুরবাড়ির দিকে চলিয়া গেলে আমি ফিরিলাম জ্যাঠামশাইয়ের দিকে, "বলছি... একটা নিবেদন আছে।"

জ্যাঠামশাইয়ের ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবটি এতক্ষণে পুরোপুরিই মুছিয়া গিয়াছে। এখনকার আকাশের মতোই গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "বলে ফ্যালো।"

"জ্যাঠামশাই, আপনি তো জানেন, বাবার ইচ্ছা ছিল, এ বছর মায়ের পুজোর পরেই বউকে বাড়ি নিয়ে আসার। তাই... আমি আজ এখানেই আসব শুনে বলে দিলেন যেন একেবারে ওকে নিয়েই ফিরি। আপনার আপত্তি নেই তো?"

"বাবা! তোমার বাবা মত দিল অবশেষে! ধনুক-ভাঙা পণ করে বসেছিলেন তো, ওই মেয়ে নাকি ঘরে নেবেন না, হুঁহ্! অবশ্য তুমি আর দ্বিতীয় বিয়ে করবে না বলে যেমন জেদ ধরে বসেছ, তোমার মতো ঢ্যাঁটা ছেলের কাছে তো বাপ-মা-কে হার মানতেই হয়! বংশপ্রদীপেরও তো একটা ব্যাপার আছে! তা এই জলকাদার মধ্যে যাওয়ার কী আছে? দু-দিন থেকে যাও, ভালো খাওদাও, পুজো দ্যাখো, তারপর শান্ত হয়ে না হয়..."

"ক্ষমা করবেন জ্যাঠামশাই। বাবাকে আমি তা-ই বলেছিলাম, তিনি বললেন, আগামী দিন চারেক নাকি যাত্রার শুভযোগ নেই। আর এমনিই তাঁদের যা মনের অবস্থা হয়েছিল, আমিও খুব বেশি দিন তাঁদের চোখের আড়াল থেকে আর কষ্ট বাড়াতে চাইছি না। আর বেশি পথও তো না..."

"যাক, বাপ-মায়ের কথা মনে পড়েছে এই অনেক! তা যাও, তুমি বউ নিয়ে আজই রওনা হয়ে যাও! নাহ্... পয়মন্ত মেয়ে বলতে হবে, স্বামীকে চিতা থেকে তুলে আনা যে-সে কথা তো নয়! তা... তুমি যখন সুস্থ, পুজোও তো শুরু হবে আমাদের কারও তো এখন পুজোবাড়ি ছেড়ে নড়ার জো নেই, চাট্টি লেঠেল দিয়ে দিই সঙ্গে?"

আমি উত্তর দেওয়ার পূর্বেই ঠিক আমার পাশে কাশির শব্দ শুনিলাম। ফিরিয়া দেখি, বাবা কখন আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, মানুষটিকে যেন এতক্ষণে একটু শান্ত লাগিতেছে। জ্যাঠামশাইকে উদ্দেশ করিয়া নতমুখে বলিলেন তিনি, "কর্তা, মায়ের আমার জ্ঞান ফিরেছে, পথও মনে হচ্ছে চলতে পারবে। আপনার যদি অনুমতি থাকে, এদের দুটিকে আমিই শ্বশুরঘরে পৌঁছে দিই? পাইক-বরকন্দাজও লাগবে না, এখন যাত্রা করলে দিনমানেই পৌঁছে যাব সব।"

দুই-একবার সঙ্গে পালকি দেওয়ার কথা বলিয়া অবশেষে পালকির অভাব সম্পর্কিত সমস্যা উল্লেখ করিয়া থামিয়া গেলেন জ্যাঠামশাই, খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটা শরিকি মকদ্দমা চলিতেছে কলিকাতার আদালতে, সেক্ষেত্রে খুড়তুতো ভাইয়ের বন্ধুকৃত্য হিসাবে তাঁহার ছেলের বউকে পোড়াইয়া মারায় জ্যাঠামশাইয়ের যতখানি আগ্রহ থাকিবে, তাঁহাকে সসম্মানে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে যে তত থাকিবে না, সে বলাই বাহুল্য। আমাকে কয়েকটি সাধারণ কুশল প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার গৃহে আমার আহারগ্রহণ ও মাতৃদর্শনের আবশ্যকতা উল্লেখ করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন তিনি। তিনি চোখের আড়াল হইতেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমি, "সত্যি বলুন বাবা, এই শরীরে আপনি যেতে পারবেন আমার সঙ্গে? ঈশ্বরীর সে সামর্থ্য আছে তো? রাস্তা কিন্তু আপনি যত কম বললেন, তত কম নয়।"

"আমি জানি বাবা। কিন্তু উপায় নেই যে আমাদের। দেরি করলে সত্যি সত্যি দেরি হয়ে যাবে অনেক..."

আমি মানুষটার মুখের পানে চাহিলাম একবার। কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলাম আমরা, জমিদারবাড়ির ঠাকুরদালানটি অস্পষ্ট দৃশ্যমান হইতেছে এখান থেকে, সম্ভবত অলংকার পরানো হইতেছে মা-কে। প্রায় কিছুই বোঝা যায় না, তা-ও বাবা চাহিয়া রহিলেন দেবীপ্রতিমার দিকে—ওই বোধহয় নথ পরানো হইল, ওই টিকলি, ওই সোনার টিপ। একখানি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডাক দিলেন বাবা, "এসো বিরাজ।"

বাড়ির বাখারির বেড়া ঠেলিয়া আমাকে লইয়া প্রবেশ করিলেন বাবা। পথে আসিতে শুনিতেছিলাম, বাড়িতে গ্রামসুদ্ধ মেয়ে-বউয়ের ভিড়, সকলে ঈশ্বরীর পায়ের ধুলা, উহার মাথার সিঁদুর, পায়ের আলতা লইতে চায়। তবে আমি গিয়া দেখিলাম, বাড়ি অনেক ফাঁকা হইয়া আসিয়াছে, আমার ঈশ্বরী হঠাৎই দেবত্ব হইতে মনুষ্যত্বে নামিয়ে আসিয়া সকলকে বড়ো হতাশ করিয়াছে। একটু পরিষ্কার হইয়া আসিলাম আমি, গাঁয়ের বয়স্থা বধূরা আমাকে ভিতরে লইয়া গিয়া সম্ভবত খুবই দ্রুতহস্তে প্রস্তুত করা ঈশ্বরীর ঘোমটা সরাইয়া দিলেন। ঈশ্বরী একবার বোধ করি তাকাইবারও চেষ্টা করিল আমার দিকে, পারিল না ঠিক করিয়া। উহার চোখের তারা দুটি এখনও বেশ ছোটো হইয়া রহিয়াছে, আফিমের ঘোর কাটেনি সম্পূর্ণ। এই এক বৎসরেই সে মাথায় অনেকখানি লম্বা হইয়াছে, আর সম্ভবত একটু রোগাও, নাকি সুন্দর মুখখানি এই কয়েক ঘণ্টার অত্যাচারেই শুকাইয়া অমন কাঠ হইয়া গিয়াছে? এতক্ষণ সম্ভবত পুণ্যের লোভে উহার মাথায় কৌটা কৌটা সিঁদুর ঢালিয়াছিলেন এয়োরা, সারা মুখে মাখিয়াছিল তা—এখনও টকটক করিতেছে তাহার সম্পূর্ণ মুখখানি। আমার হঠাৎ একখানি দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল।

* * * * * * * *

দুই হাত জোড় করিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছেন কান্তিডিহির পুরোহিত ঠাকুর, "কর্তা, আমার মেয়েটা... আমি তো বলেছিলাম, এ বিয়ে আমি দেব না, আমার মেয়ে চায় না, আপনারা ওকে তুলে নিয়ে এলেন। এখন ওর একটা ব্যবস্থা করুন দয়া করে..." আমি, ঊনবিংশ বৎসরের যুবকটি তখন, দেখিতেছিলাম এক লগ্নভ্রষ্টা কন্যার পিতাকে। আমার ঠাকুরদাদার বড়োদাদা ঠিক করিয়াছিলেন, নিজের বড়োছেলের গ্রামের কোনো মেয়েকেই নিজের ত্রয়োদশ বিবাহ করিবেন। বহু সন্ধানের পর তাঁহার পুত্র তাঁহার গৃহের নিত্যপূজার পুরোহিতের লক্ষ্মীমন্ত সুলক্ষণা কন্যাটিকেই তাঁহার জন্য পছন্দ করিলেন। মেয়েটির বয়স বেশি, পাত্রস্থ করিবার বেলা যায়—এই অজুহাতে প্রায় অপহরণ করিয়া আনা হইয়াছিল তাহাকে। তবে সেই বিবাহও হইল না, বিবাহের আসরেই অসুস্থ হইয়া পড়েন স্বয়ং পাত্র, বর্তমানে উঠানে শায়িত রহিয়াছে তাঁহার সদ্যোমৃত দেহটি। চারিদিকে শোকের আবহ, কান্না, তাহার মধ্যে ওই লগ্নভ্রষ্টা মেয়েটির কথা অন্তত এ বাড়ির কাহারও স্মরণে নাই। ইতিপূর্বে সত্যই এ বিবাহ সংবাদ শুনিয়া পৃথক কিছু বোধ হয়নি আমার, বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়াও নয়। আজ এই মুহূর্তে সকল পরিস্থিতি যেন আমার ঘাড় ধরিয়া হঠাৎ মনে করাইয়া দিল, মূর্খ, যাহা হৃদয়ে চাহিয়াছ এতদিন, মুখে তো প্রকাশ করিতে পারোনি—শুধু সেই দুর্বলতাটুকুর জন্যই একটি অতি মূল্যবান রত্ন আজ হাতছাড়া হইতে বসিয়াছিল! তাহার কথা একবাক্যে মানিল আমার সকল সত্তা, তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আজ ভোলানাথ এই নির্বোধ যুবকটির উপর করুণা করিয়াই মেয়েটির একটি আপাত সর্বনাশ ঘটাইয়া তাহার মঙ্গলের একটিমাত্র পথ খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে তিনিও আর তাহার জন্য কিছু করিতে পারিবেন না। ঈশ্বরী আজিকার পরও সুখের জীবন লাভ করিতে পারে, সে আর পারিবে না। কোথা হইতে আমার মনে কী দুঃসাহসের উদয় হইল কে জানে, আজও ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়, নিঃসংকোচে গিয়া আমার ব্যস্ত পিতাঠাকুরকে বলিয়াছিলাম সেদিন, "ওই মেয়েটিকে যদি আমি বিয়ে করি? এখনও তো দাহকার্য হয়নি। যদি প্রায়শ্চিত্ত করে..."

পিতা বজ্রাহতের মতো চাহিয়াছিলেন আমার দিকে। আমার শ্বশুরমশাই ঠিক আজিকার মতোই আমার পায়ে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আমি ব্যস্ত হইয়াছিলাম তাঁহাকে সামলাইতে, আজিকার মতো। আমাদের পিছনে যে ঠিক কত ঝড় বহিয়া গিয়াছিল, তাহা সঠিক বর্ণনা করিতে পারিব না, আমার সেইভাবে স্মরণে নাই। শুধু বলিতে পারি, গ্রামের সকলের অনুরোধে পিতাকে এ বিবাহ দিতে হইয়াছিল। সে বিবাহসভায় আমার বিদ্রোহ-পরবর্তী একটি কথাই অন্তরে আছে আমার, সিঁদুরদানের পরে সারা মুখে সিঁদুরের গুঁড়া মাখিয়া ঈশ্বরীর মুখখানি এমনই দেখাইতেছিল, আজিকার মতো...

(৪)

বিদায়কালে আমার শ্বশুরালয়ের প্রতিবেশিনীরা ঈশ্বরীকে বক্ষে জড়াইয়া বড়ো কাঁদিলেন, অমন সুন্দর কোমলহৃদয়া সুলক্ষণা মেয়েটিকে তাঁহারা ভালোবাসিতেন, পুণ্য অপেক্ষা অধিক না হইলেও বাসিতেন। সকলের অনুরোধে সামান্য আহার করিয়া যখন অবশেষে বাহির হইলাম, বেলা দ্বিপ্রহর পার হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যভাগ অবধি অনেকে সঙ্গে আসিলেন, তাহার পর বিদায় জানাইয়া ফিরিয়া গেলেন। গাঁয়ের সীমানায় পা রাখিয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার কোনদিকে বিরাজ?"

আমি কিছু অবাক হইলাম। বাবা ইতিপূর্বে আমাদের গৃহে কয়েকবার গিয়াছেন জামাইষষ্ঠী-শীত-দোলোৎসবের তত্ত্ব পৌঁছাইতে, পথ ভুলিয়া যাওয়ার তো কথা নয় তাঁহার! যদিও প্রশ্নটি তিনি না করিলেও উত্তর আমাকে করিতেই হইত, "বাঁদিকের পথ নেব বাবা। আমাদের বাড়ির সোজা রাস্তায় এখন যাওয়া চলবে না। সে বড়ো জলকাদা, ঈশ্বরী অসুস্থ, সে সহজে চলতে পারবে না। এখানে বনজঙ্গল আছে বটে, তবে সামনে বড়ো সড়কপথ হচ্ছে তো, মাঝে মাঝে সাহেবদের মোটরগাড়ি যায়, তাই রাস্তা ভালো আছে বেশ।"

বাবা ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিলেন। পূর্বে বহুবার তাঁহার কাছে বসিয়া যে প্রকার তাঁহার সহিত আলাপ করিতাম, আজ পথিমধ্যে তাহাই পুনর্বার আরম্ভ হইল। মহাভারতের দ্রোণপর্বে গুরু-দ্রোণের মৃত্যু বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার ইতিপূর্বেও তর্ক হইয়াছে, আজ যেন কথাচ্ছলে সেই আগুনে ঘৃতাহুতি হইল। আমার মতে দ্রোণবধ অনৈতিক হত্যা বই কিছু নয়। বাবা মানিবেন না, তাঁহার মত, তাহা যুদ্ধনীতিরই অংশবিশেষ। তিনি তাঁহার মতের সপক্ষে বহু শ্লোকার্থ করিয়া আমার যুক্তি খণ্ডন করিতে লাগিলেন, আমিও বিপরীত শ্লোক ব্যবহারে পরবর্তী যুক্তি সাজাইতে লাগিলাম। শেষ অবধি যদিও বোধ হইল, আমিই পরাজিত হইতেছি, কারণ তাঁহার ন্যায় বিপুল জ্ঞান আমার নাই। ঈশ্বরীর মুখখানি গলা পর্যন্ত ঘোমটায় আবৃত, তবে আমি নিশ্চিত, সে আমাদের সকল কথা শুনিতেছে। বড়ো ইচ্ছা করিতেছিল, এ বিষয়ে তাহার মত কী, তাহা জানিয়া লই। আশা রাখি তাহার মতও আমার মতেই মিলিত, সে-ও পণ্ডিতকন্যা, তাহার সাহায্য পাইলে আমি অবশ্য জিতিয়া যাইতাম। সুযোগ করিয়া ঠিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

এমন সকল আবোল-তাবোল ভাবিতে ভাবিতে পথ হাঁটিতেছিলাম আমি, বোধ করি, মস্তিষ্কে এই বনাকীর্ণ ভূমি হইতে কুরুক্ষেত্রের ধূলিধূসরিত প্রান্তরেই উপনীত হইয়াছিলাম। হঠাৎ অনুভব করিলাম, কে যেন অগ্নিতপ্ত হাতে শরীরের সমস্ত জোর দিয়া আমার পাঞ্জাবির আস্তিন খামচাইয়া ধরিল। অন্যমনস্ক আমি কোনোমতে নিজেকে সামলাইয়া স্থান-পাত্র মাথায় তুলিয়া দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিলাম ঈশ্বরীকে, "এ কী... ঈশ্বরী... বাবা..."

বাবাও ততক্ষণে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে পক্ষীশাবকটির মতো ক্রোড়ে টানিয়া নিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন, তবে পারিলেন না, সে সামর্থ্য তাঁহার নাই বর্তমানে। সামান্য লজ্জাবোধ করিয়াই নিজের অকৃতকার্য হাত দুখানি সরাইয়া লইলেন তিনি। চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে শান্ত করিয়া ঈশ্বরীকে পথিমধ্য হইতে সামান্য সরাইয়া একটি গাছের নীচে বসাইলাম। এতক্ষণ তাহার যৎসামান্য হুঁশ ছিল, পিতার সম্মুখে আমার হস্তবন্ধনে তাহার অস্বস্তি দেখিয়াই সে আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু তাহাকে বসাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বৃক্ষের গুঁড়িতে মাথা হেলাইয়া নিমেষে নিদ্রা যাইল সে। আমি অসহায় দৃষ্টিতে বাবার দিকে চাহিলাম, "বাবা..."

দেখিলাম, সন্তানের ভবিষ্যৎ লইয়া ব্যাকুল পিতার দৃষ্টি তখন উক্ত কারণজাত কঠোরতায় পরিণত হইয়াছে, "না বিরাজ, এখানে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করা চলবে না। আমি নিজে সুস্থ থাকলে আমার মা-কে কোলে করে নিয়ে যেতাম। তোমায় দিয়ে যে আর কী কী করাব..."

"এভাবে বলবেন না বাবা, ঈশ্বরী আমার দায়িত্ব..." দেবতুল্য গুরুজনের সম্মুখে মিথ্যা বলিয়া ছোট্ট জিভ কাটিলাম আমি—ঈশ্বরী আমার দায়িত্ব হইলে এখানে ছুটিয়া আসিবার মানসিকতা আমার হইত কি না, সে বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ সন্দেহ পোষণ করি। বাবা কী বুঝিলেন কে জানে, সামান্য হাসিলেন মাত্র, "তুমি যাও, ঈশ্বরী মা-র কাছে বোসো বাবা। সেই কখন দুটি মুখে দিয়ে বেরিয়েছে, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই! ওর কাছে চিঁড়ে আছে, একটু জলের ব্যবস্থা করা গেলেই... তুমি বোসো, আমি দেখছি। একটু জল পেলে হয়তো মেয়েটা সুস্থ হবে সামান্য... অনেকটা পথ না এখনও?"

আমি ঊর্ধ্বে-নিম্নে মস্তক দোলাইলাম। বাবা আর প্রশ্ন না করিয়া জলের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন। আমি নিঃশব্দে আসিয়া ঈশ্বরীর পাশে বসিয়া পড়িলাম। গাছের গুঁড়িটিতে পিঠ দিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল সে। উহার ক্লান্ত মুখখানি দেখিয়া বড়ো মায়া হইল আমার, প্রকৃত অর্থেই তাহার উপর দিয়া যে ঝঞ্ঝা চলিতেছে, তাহাতে আমি নিতান্ত অত্যাচারই

যোগ করিতেছি। কিন্তু কী করা, এই কিশোরীকে ইহজন্মের মতো সামান্য সুখ দিবার জন্য এই কষ্টখানি যে না দিলেই নয়।

আমি উহার পাশে সামান্য সরিয়া আসিলাম। ঘুমের ঘোরে কী জানি হইল তাহার, সামান্য নড়িয়া উঠিয়া হঠাৎই আমার কাঁধে মাথা রাখিল সে। একটি মুহূর্তে বোধ করিলাম, তাহার শরীরের উষ্ণ ওম আমার প্রতিটি শিরায় শিরায় ছুটিয়া ফিরিতেছে, তাহার দুই-একটি চূর্ণ কুন্তল হাওয়ায় উড়িয়া আসিতেছে আমার মুখে, পোষা পাখিটির কোমল পালকের মতো। তাহার মাথাখানি আরও যত্নে আমার কাঁধে টানিয়া লইয়া দুই চোখ বন্ধ করিলাম আমি। বোধ করিলাম, সারাজীবনে দুই হাত বাড়াইয়া, কিছু ভিক্ষা মাগিয়া, কিছু পরিশ্রম করিয়া, কিছু চুরিও করিয়া যত সময় কুড়াইয়া লইয়াছি, তাহা যদি এমনভাবে বসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিতাম, কী সুখই না হইত!

কিছুকাল পরই ঈশ্বরী হঠাৎই চমকাইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার পর লজ্জায় লাল হইয়া গেল। সে উঠিয়া পড়িতে যাইতেছিল, আমি তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম, "শেষে কি গাছপালাকে ভয় পাবে? কাকে দেখে পালাচ্ছ? কেউ নেই তো!"

সে এদিক-ওদিক দেখিয়া বলিল, "যদি কেউ আসে? যদি বাবা এসে পড়েন!"

আমি হাসিলাম, "কেউ দেখবে না বলেই তো এই পথে এলাম। আর বাবার কথা? যখন হোঁচট খেয়ে আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে, বাবা দেখেননি?"

"ইশ্! এমন করেছি বুঝি! মোটেই নয়। বরং তুমি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে আমায় ফেলে দিয়েছ।" লজ্জা শিকায় তুলিয়া এইবার চোখ পাকাইল সে। সে বলিয়া দিয়াছে, ইহার উপর আর কথা হইতে পারে না, দোষ নিশ্চয় আমার। আমি হাসিয়া তাহার হাতের উপর হাত রাখিলাম। সে সরাইয়া লইল না। দুটি-একটি পাখি ডাকিতেছে বনমধ্যে, হাওয়া বহিয়া যাইতেছে ঈশ্বরীকে স্পর্শ করিয়া, পাতায় পাতায় বোল তুলিয়া। বেশ খানিকক্ষণ এহেন নীরবতার পর আমি বলিয়া উঠিলাম, "আচ্ছা ইশু..."

"হুঁ?"

আমি উহার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইলাম, "খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে না?"

ঈশ্বরী বড়ো অবাক হইল আমার প্রশ্ন শুনিয়া। যেন খুব স্বাভাবিক যে কাজটি তাহার করিবার কথা ছিল, তা তাহার করা হয়নি—এখন স্মরণে আসিতেছে। খানিকক্ষণ আকাশের পানে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর দিল সে, "না তো!"

"এ কী! একটুও ভয় পাওনি?"

"নাহ্", সামান্য থামিয়া যোগ করিল ঈশ্বরী, "ভয় পাওয়ার কথা মনে পড়েনি।"

বালিকার উত্তর শুনিয়া বড়ো একখানি নিশ্বাস নির্গত হইয়া গেল আমার বুক হইতে, "আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছিলে?"

ঈশ্বরী উত্তর দিল না, হঠাৎই তাহার মৃগনয়ন দুখানি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আর উত্তর দিবার প্রয়োজন পড়িল না। পরিবর্তে আমিই শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া লইলাম, "এ কী ইশু! না... এখন তো অন্তত আমি আছি তোমার কাছে, এখন কেঁদো না!"

সে আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিয়া হঠাৎই আমাকে জড়াইয়া ধরিল। এত আমি আশা করিনি। প্রতিবছর দুর্গাপূজা দেখিবার নাম করিয়া চলিয়া আসিতাম জ্যাঠামশাইয়ের গৃহে—একখানি গোটা দিন কাটাইতাম শ্বশুরের ভিটায়, ঈশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ কমই হইত, তাহা সত্ত্বেও, আমার পিতৃতুল্য মানুষটির সহিত সময় কাটাইতে, তাঁহার নিকট কিছু শাস্ত্রনির্ভর, অথচ অতি যুক্তিযুক্ত কথা শুনিতে আমার বড়ো ভালো লাগিত—আজিকালের যুগে এমনভাবে ভাবিতে বড়ো কাহাকেও দেখি না। তা গত বৎসর পূজার সময়, স্মরণে আছে, খিড়কির দোরে আলো জ্বালাইতে গিয়াছিল ঈশ্বরী, আমি তাহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। সে কিয়ৎক্ষণের জন্য চমকিত হইয়া নিজেকে ছাড়াইয়া হাতের প্রদীপ আমার দিকে ফিরাইয়া ধরিয়াছিল, তাহার মুখের হাসি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, আমার দুষ্টামি সে ধরিয়া ফেলিয়াছে। কিয়ৎক্ষণের সাক্ষাৎ, ক্ষণিকের সোহাগ, তাহাতেই সে আমার স্পর্শ বেশ চিনিয়াছিল। এই তিন বছরে তাহাকে যত বুঝিয়াছি, অকারণ লজ্জা পাওয়ার মেয়ে সে নয়, তবে এইভাবে আমাকে নিজের হৃদয়ের এতখানি কাছে টানিয়া লইতেও তাহাকে এই প্রথমই দেখিলাম। এখানে আসিবার সময়ও তাহার আরাধ্য ভোলানাথকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে ঈশ্বরী, তবে তাহার ভাগের আশীর্বাদটি দেখিতেছি তিনি তাহার পরিবর্তে আমার জন্যই তুলিয়া রাখিয়াছিলেন—এখন সুযোগ বুঝিয়া অন্তত এই একটি দিনের জন্য আমার দুটি হাত সুখে, স্বস্তিতে ভরিয়া দিতেছেন তাই।

কতক্ষণ এইভাবে আমার বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়াছিল ঈশ্বরী, তাহা আমার স্মরণে নাই, নিতান্ত স্বার্থপরের মতো

আমি তাহাকে থামাইবার চেষ্টাই করিনি। কিছুক্ষণ পর নিকটে পদশব্দ শোনা যাইতে লাগিল। বুঝিলাম, বাবা আসিতেছেন, আমরা দুইজন যাহাতে তাঁহার নমিত্তই এই সজোর পদশব্দ। ঈশ্বরী দ্রুত চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যথার্থই অনুমান করিয়াছিলাম, বাবাই আসিলেন, তবে তাঁহার হাতে জলের পাত্র নাই, যে প্রকার গম্ভীর মুখে তিনি প্রস্থান করিয়াছিলেন, অপর প্রকার গাম্ভীর্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের অধিক নিকটে না আসিয়াই আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন তিনি। আমি সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে নিম্নস্বরে বলিলেন, "বিরাজ, এই পথে যাতায়াত আগের তুলনায় সামান্য বেড়েছে, একটা নতুন মুদি দোকানও বসেছে তাই, তুমি হয়তো জানতে না। ঈশ্বরীকে নিয়ে সেখানে একবার যাওয়া সম্ভব কি? আর কিছুই নয়, তাহলে মেয়েটা আরাম করে চোখে-মুখে একটু জল দিতে পারত... আসলে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বয়স্ক, তার উপর চোখে দেখতে পান না, তাই আমি আরও জিজ্ঞাসা করছিলাম..."

প্রকৃতপক্ষেই এমন দোকানের কথা আমি জানিতাম না। তবে যখন দুইজন বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন মানুষ এই নির্বান্ধব স্থানে দোকান চালাইতেছেন, বাবার প্রস্তাবের বিষয়ে অতিরিক্ত ভাবনা না-করাই বাঞ্ছনীয়। প্রায় তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম আমি, "চলুন বাবা, সমস্যা হবে না।"

বাবা দেখিলাম, তা-ও অপেক্ষা করিতেছেন। এইবার আমারই অবাক লাগিল সামান্য, এমন হিসাব কষিয়া প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়ার কারণ কী তাঁহার? একবার সংশয় হইল, বাবা কি জাতপাতের কথা ভাবিতেছেন? তাঁহার এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিচার নাই জানি, বা তাঁহার কন্যা ভিন্ন একমাত্র আমিই জানি। তবে কি আমার কথা ভাবিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছেন? আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চাহিয়া সামান্য হাসিলেন বাবা, "ভুল করছ বিরাজ, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। বেশ, এসো।"

বাবা আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। দোকান বেশি দূরে নয়, গাছপালার আড়ালের জন্য চোখে পড়েনি। বৃদ্ধ দোকানি আমাদের জন্যই বসিয়া ছিলেন। আমাদের বসাইয়া মাজা ঘটিতে জল, রেকাবিতে বাতাসা আনাইয়া দিলেন, তাহার পর নিজেই আমাদের জন্য ফলার গুছাইতে বসিলেন। তাঁহার স্ত্রী ঈশ্বরীকে আদর করিয়া তাঁহাদের কুটিরের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। আমাদের জন্য চিঁড়া, দই, মর্তমান কলা, চিনি সহযোগে ফলার সাজাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন দোকানি, "বাবাঠাকুররা তো শুনলাম বকুলপুর যাবেন, না?"

বাবা উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বৃদ্ধের কৌতূহল এত সহজে মিটিল না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, "বাবাঠাকুর শুনলুম মেয়েকে জামাইয়ের ঘরে রাখতি যাস্যেন? তা মেয়েকে পূজার সময় তো ক-দিন বাপের ঘরেই রাখতি পারতেন!"

আমি বলিলাম, "কথা তো ঠিকই বলেছেন জ্যাঠা, আসলে কী জানেন, বড়ো তাড়াহুড়া করে হয়ে গেল সব। বাবা হঠাৎ করেই আদেশ দিলেন ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে আসার জন্য, পুজোয় বাড়ি ফাঁকা লাগছে। তাই কাল রাতে বেরিয়ে আজই..."

"এ কী শুনলুম, দাঁড়ান দাঁড়ান", অবাক হইয়া অন্ধ চোখেই যেন আমাকে খুঁজিয়া বার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন বৃদ্ধ, "জামাইবাবা কী কইলেন, কাল রাতে আইলেন? আমি যে শুনলুম কুশি নদীর ওইটুকখানি জল ফুইলা বিরিজ ভাইঙা চুর! আজ সকালে বৃষ্টি একটুক ধরেছে দেখে লোক আইল রাস্তা তৈরির কিছু জিনিস সরায়ে নিতে, আমার দোকান থেকে দুই পয়সার মুড়ি কিনল, তাদের কাছেই যেন শুনলুম... তা আপনি যে গেরাম দিয়াই আসুননে, বিরিজ তো টপকাতেই হবে। ওই ভাসাভাসি জল ডিঙায়ে আইসেন জামাইবাবা! কী জাদুটাদু জানেন নাকি হ্যাঁ!" সরল এক টুকরা হাসিতে ভরিয়া গেল বৃদ্ধের মুখখানি।

ওঁর কথার রকম শুনিয়া বাবাও হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন, "তা এই সামান্য কাজের জন্য ওকে আর জাদু জানতে হবে কেন! সকল জাদুকরের সেরা জাদুকর ওই যে উপরে বসে, তিনি চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে, এমনই তো সোজা কথা, নয় কি? কী বলেন?"

"তা ঠিক, তা ঠিক! আজ দুগ্গাপঞ্চমী, বাবার মা-কে মর্ত্যে ছেড়ে যাওয়ার দিন, আজকের দিনে জামাইবাবু আমার মা দুগ্গার দেখা পেলেন, এ কি তাঁর ইচ্ছা ছাড়া হয় গো? জয় বাবা ভোলানাথ!" কপালে জোড়হাত স্পর্শ করিলেন দোকানদার, তাঁহাকে দেখিয়া আমরাও। বৃদ্ধ কথা বলিতে পছন্দ করেন, বাবাকে পাইয়া খুশি হইয়া আরও আলাপ জমাইয়া বসিলেন। আমি উঠিয়া পড়িলাম, সকলে মিলিয়া বসিয়া থাকিলে যাওয়া আর ঘটিবে না, বাবার আহত শরীর যতখানি বিশ্রাম পায়, তত মঙ্গল—তাই নিজেই সামান্য অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আসিলাম, পথ কোনদিকে চলিতেছে, অবস্থাই বা কীরূপ। পথ চিনিতে যে আমার ভুল হইতেছে না, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ নিশ্চিত হইলাম। ফিরিয়া যখন আসিলাম, বাবা ততক্ষণে ফলার শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, দোকানদার

ও আমার শত আপত্তি সত্ত্বেও কাঁসার বাটি দুটি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফিরাইয়া দিলেন বৃদ্ধের হাতে, ''এবার যে যাওয়ার সময় হল! আমার মা-টিকে যদি একটু...''

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া খবর পাঠাইলেন অন্দরে। তাঁহার স্ত্রী যখন ঈশ্বরীর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলাম, তাহার নিষ্প্রাণ চোখ দুখানি ছলছল করিতেছে, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই সেগুলি যে কী জাদু দেখিয়া বসিয়াছে, তাহা আমার ঈশ্বরীই জানে! বুক ভাঙিয়া দীর্ঘশ্বাস আসিল আমার—দুর্ভাগ্য তাহার, দুর্ভাগ্য আমার, তাহার সকলের হইতে আপন যাহাদের হওয়ার কথা ছিল, তাহার শ্বশুরকুলেরই কেবল এ জাদু দেখিবার সৌভাগ্য হইল না, তাঁহারা তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া আরও বড়ো কোনো জাদু দেখিবার ইচ্ছা করিয়া বসিলেন।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইয়া আবার শুরু হইল পথ চলা। প্রথমে বিশেষ সমস্যা হইল না, সামান্য বিশ্রাম পাইয়া ঈশ্বরী এখন অনেকখানি সুস্থ, অপর পক্ষে বাবার হাতখানি প্রায় অসাড় হইতে বসিলেও, সৌভাগ্যবশত পা দুখানি অক্ষতই রহিয়াছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভোলানাথের কৃপায় সব ঠিকই রহিল। তবে যেইমাত্র সূর্যদেব আমাদের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় জানাইয়া চলিয়া গেলেন, বহুক্ষণের সুযোগের অপেক্ষার্থী বরুণদেব দখল করিলেন তাহার মঞ্চ। সূর্যের শেষ কিরণটুকু মিলাইয়া যাইতে-না যাইতে দেখিলাম, মুহূর্তে গতকালের মতো আবার আকাশ কুচকুচে কালো হইয়া উঠিল, চতুর্দিক হইতে দমকে দমকে মত্ত বাতাস ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল। বাবা চিন্তিত মুখে আমার দিকে চাহিলেন, ''আর কতদূর যেতে হবে?''

বুঝিলাম, আমার দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে আরও অধিক চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। তাঁহাকে মিথ্যা বলিতে পারিলাম না আমি, ''এখনও বেশ দূর বাবা।''

তিনি যেন আমাদের প্রবোধ দেওয়ার জন্যই দৃঢ় মুখে সামান্য ঘাড় হেলাইলেন, তাহার পর পূর্বের মতোই আমাদের অগ্রে অগ্রে হাঁটিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামিল মুশলধারে, ঝোড়ো হাওয়ার দাপট ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে, পাশের মানুষ কিছু কহিলে কথা স্পষ্ট শোনা যায় না। হাওয়ার দমকের মধ্যেই ভাসিয়া আসিল বাবার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর, ''বিরাজ, কিছুক্ষণ কি থেমে যাওয়া যায়?''

আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম, ''না বাবা, সময়ে পৌঁছোতে পারব না তবে। আজকের মধ্যে সেখানে পৌঁছোনো বড়ো প্রয়োজনীয়। আর-একটু কষ্ট করে...''

বাবার উথালপাতাল কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম পুনর্বার, ''তুমি যখন বলছ, তবে তা-ই হোক বিরাজ। মনে রেখো, ঈশ্বরী কিন্তু তোমার দায়িত্ব।''

আমি আবার মনে মনে জিভ কাটিলাম, এবার বাবাও ভুল বলিয়া ফেলিলেন। প্রকৃতপক্ষে... হঠাৎই প্রচণ্ড একটি আর্তনাদ শুনিয়া চকিতে চাহিয়া দেখিলাম, দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে ঈশ্বরী, দুই হাতে নিজের ললাটখানি চাপিয়া ধরিয়া পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া আছে সে। স্মরণ হইল, বিগত বেশ খানিকক্ষণ তাহার মুখ হইতে একটিও শব্দ শুনিনি, বৃষ্টির জল মাথা স্পর্শ করিলেই তাহার মাথা যন্ত্রণা করে ইহা আমারও অজানা নয়—সম্ভবত দন্তে দন্ত চাপিয়া সকল যন্ত্রণা গলাধঃকরণ করিয়া রহিয়াছিল সে, এইবার তাহার ধৈর্যের বাঁধও ভাঙিয়েছে। বাবা ছুটিয়া গেলেন তাহার কাছে, ''ঈশ্বরী, মা আমার, অনেক সয়েছিস তো তুই, আর-একটু সয়ে নে, খুব শিগগিরই কিছু ব্যবস্থা হবে। বিরাজ... তুমি বলো, আমি ওকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছি না তো?''

সময়ের সহিত ধীরে ধীরে সমস্ত আত্মবিশ্বাস হারাইতে-বসা মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব, তত দৃঢ়তার সহিতই আমি বলিলাম, ''না বাবা, মিথ্যা নয়। ওর ঈশ্বর আছেন, বাবা আছেন, আমরা কেউ ওর কোনো ক্ষতি হতে দেব না।''

ঈশ্বরী কিছু শুনিতে পাইতেছে কি না বুঝিতে পারিলাম না, চিত্রার্পিতের মতো সেই তখন হইতে একইভাবে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সে। আমি একবার বাবার দিকে চাহিলাম, একবার আপন হাতখানির দিকে চাহিলেন তিনি, তাহার পর ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বড়ো কষ্ট লাগিতেছিল বাবাকে দেখিয়া, আজ, এই অবস্থায় তাঁহার কোনো সেবা করিবার সুযোগ অবধি হইল না আমার। আমি আর বিলম্ব না করিয়া প্রায় আমার বুকের সহিত ঈশ্বরীর শীতল হইতে-থাকা শরীরখানি মিশাইয়া লইলাম, প্রকৃতির বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন একখানি পরীক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই যেন ওই পরিস্থিতিতেও যাত্রা আরম্ভ হইল পুনর্বার। বুঝিতে পারিতেছিলাম, ঈশ্বরীর আর একটি পা-ও নিজে চলিবার শক্তি নাই, তাহার পা দুটি আমার আকর্ষণে মাটিতে প্রায় ঘষিয়া চলিতেছে, নীলবর্ণ ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে, যেন তাহার মতো সর্বংসহা মেয়েও তাহার ভোলানাথকে উদ্দেশ করিয়াই প্রশ্ন করিতেছে, আর কি এগোতেই হইবে? না, ভোলানাথ তাহাকে উত্তর করিলেন না, পরিবর্তে আমার মতো এক নিষ্ঠুর জীব তাহাকে প্রাণপণে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তাহার যে উপায়ান্তর নাই, এ পৃথিবীতে এই এখন তাহার

একটিমাত্র পথ...

কতক্ষণ তাহাকে বক্ষে লইয়া এমনভাবে পথ চলিয়াছি, আমার নিজেরও স্মরণ নাই। এক-একবার করিয়া বোধ হইতেছিল, এই বুঝি সব শেষ হইয়া গেল, ভগবান এই অধমকে যতটুকু অধিকার দিয়াছেন তাঁহার প্রাণের রতনটিকে অক্ষত রাখিবার, এই বুঝি তাহা ফিরাইয়া লইলেন। আমার চোখে সকল কিছু ধীরে ধীরে প্রকৃতির বর্ণ অপেক্ষাও ধূসর হইয়া আসিতেছে তখন, সমস্ত শক্তি শেষ হইবার মুখে, হঠাৎই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম আমি, আপনা হইতেই যেন তারস্বরে রব তুলিয়া ফেলিলাম, "এসে গেছি... পেয়ে গেছি, বাবা... ওই যে..."

বাবাও সম্ভবত আমার মতো সকল আশা ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, আমি না বলিলে হয়তো আমার চিৎকারের লক্ষ্যটিও অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেন। আমার কণ্ঠস্বরে হঠাৎই চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন তিনি। আমি হাতের ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলাম, "ওই যে... ওইদিকে..."

এতক্ষণে বাবা লক্ষ করিলেন, জঙ্গলপথ ছাড়িয়া একখানি গ্রামের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি আমরা, এবং জঙ্গল ও গ্রামের ঠিক মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া আছে ছোট্ট একখানি অতি ছিমছাম মন্দির। আমি অগ্রসর হইয়া কিছু পরীক্ষা করিলাম, তাহার পর সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিলাম পুনর্বার, "পথ শেষ বাবা। আজ রাতের মতো এই আপনাদের থাকার জায়গা।"

ইতিমধ্যে বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে সামান্য। বাবার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, "কিন্তু এ যে তালা-দেওয়া বিরাজ। তুমি তালা খুলতে পারবে? মেয়েটাকে একটু শুকনো জায়গায় শোয়াতে পারলে সত্যিই ভালো হত..."

আমি বলিতে বাধ্য হইলাম, "সে সৌভাগ্য বোধহয় হবে না বাবা। তবে... একবার চেষ্টা করি। আপনি ঈশ্বরীকে একটু ধরবেন? আপনার হাত..."

"ও নিয়ে ভেবো না, পারব আমি... দেখি...", বাবা সেই অচল হাতেই সযত্নে বুকে তুলিয়া লইলেন কন্যাকে, সামান্য একটি আর্তনাদ বাহির হইল তাঁহার মুখ হইতে, তাহা সত্ত্বেও কন্যাকে মাটিতে রাখিলেন না। তালায় হাত রাখিয়াই অবাক হইয়া হাঁক দিলাম আমি, "বাবা, আসুন একটু।"

বাবা ঈশ্বরীকে লইয়া আমার নিকট সরিয়া আসিলেন, "হয়েছে?"

আমি কিয়ৎক্ষণ আপন হাতে খোলা দরজাটির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, হয়ে গেল... কিন্তু কী করে যে হল, হওয়ার তো কথা ছিল না। সে যা-ই হোক বাবা, আপনি আসুন শিগগির করে... দেখি, ওকে আমায় দিন।"

(৫)

ভিতরে আসিয়া বহুক্ষণ পর শুষ্ক মাটি পাইলাম পায়ে। মন্দিরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দরজার দিকে মুখ করিয়া বিরাজমান ভোলানাথ, একখানি বৃহদাকৃতির ঘৃতের প্রদীপ মৃদুভাবে জ্বলিতেছে তাঁহার সম্মুখে, দুই-একটি পূজার সরঞ্জাম ইতস্তত ছড়াইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরীকে একধারে শোয়াইয়া দিলাম সযত্নে। সন্ধান করিয়া আরেকটি মাটির প্রদীপ ও কাপড়ের খণ্ড মিলিল, তাহা দিয়াই তাহার হাতে-পায়ে সেঁক করিলাম। ক্লান্ত অসুস্থ শরীরে সামান্য আরাম পাইয়া সে যেন মুহূর্তেই ঘুমাইয়া পড়িল। আমি কিছুক্ষণ তাহার আর্দ্র মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া রইলাম, একদৃষ্টে, তাহাকে ছাড়িয়া উঠিতে একবিন্দুও ইচ্ছা হইতেছিল না, ভবিষ্যতে কখনও হইবে—এ সম্ভাবনাও দেখিতেছিলাম না। তবুও, বিলম্বে হইলেও স্মরণে আসিল, শুধু আমরা দুইজনে নাই এইখানে। কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া ঈশ্বরী হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লক্ষ করিলাম, বাবার আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। তিনি বসিয়া আছেন শিবলিঙ্গের সম্মুখে, ভ্রূ দুটি অতিশয় কুঞ্চিত। আমি উঠিয়া গিয়া তাঁহার পাশে বসিতে হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বিরাজ... এই কি তবে..."

আমি হাসিলাম, "হ্যাঁ বাবা, এই নবপুরের বিখ্যাত শিব মন্দির। দেখুন শিবলিঙ্গের কপালে।"

দুজনেই দেখিলাম, শিবলিঙ্গের গাত্রে যেখানে ভগবানের নয়ন অঙ্কিত হইয়াছে, সেখানে তৃতীয় নয়নের স্থানে ঝকঝক করিতেছে একখানি বৃহৎ নীলকান্তমণি। বাবা একদৃষ্টে তাহার দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিয়া বলিলেন, "শুনেছি স্বয়ং ভোলানাথের বাস এ মন্দিরে। তাঁর অনুমতি ছাড়া এ মন্দিরের দরজা খোলা অসম্ভব, সেই কারণেই এমন রত্ন মন্দিরে থাকলেও কারও কোনো ভয় নেই।" ক্রমে বাবার মুখেও বড়ো বিষণ্ণ একখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল, "আজ সকাল থেকেই বারবার প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছি বিরাজ, ভোলানাথ আমার ঈশ্বরী মা-র সহায়। শুধু যদি..."

বাবা চুপ করিয়া গেলেন মধ্যপথেই। তাঁহার সারা শরীরে কর্দমের ছিটা, পরনের পোশাক মলিন, মাথার চুলগুলি কিঞ্চিৎ জট পাকাইয়া গিয়াছে—সকল মিলিয়া এই আলো-অন্ধকারে

তাঁহাকে বড়ো অদ্ভুত দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ পর আবার সাড়া পাইলাম, "তুমি যাও বাবা, গিয়ে বোসো। আমি একটু বাবার কাছে থাকি।"

শিবলিঙ্গের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন তিনি। আমি তাঁহাকে ভোলানাথের সহিত একা ছাড়িয়া মন্দিরের একটি কোণে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার সম্মুখে কিছু দূরে ছোট্ট বালিকার ন্যায় দুই হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইতেছে এখন ঈশ্বরী, প্রদীপের আলোকে তাহার মুখখানি মা দুর্গার ঘাম-তেল-মাখা মুখের মতো লাগিতেছে, কোঁকড়া চুলগুলি কিছু বিস্রস্ত হইয়া মুখের চারপাশ ঘিরিয়া রাখিয়াছে। স্মরণে আসিল, এই নবপুরের শিব মন্দিরের বহু কাহিনি বাবার সম্মুখে বসিয়া আমরা শুনিয়াছি। বহু যুগ পূর্বে ছোট্ট নবপুর গ্রামের বাসিন্দারা হঠাৎই একযোগে স্বপ্ন পান, বাবা ভোলানাথ তাঁহাদের বলিতেছেন, গ্রামের উত্তরে ভূমির নীচে অবস্থান করিতেছেন তিনি, তাঁহার ইচ্ছা, গ্রামবাসীরা তাঁহাকে ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠা করুন। তাঁহারা ঘুম ভাঙিয়া একযোগে ছুটিয়া যান, বাবাকে খুঁজিয়া তাঁহাকে ভূমির উপরে আনেন, মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকদিনের মধ্যেই। কিন্তু সহজ সরল মানুষগুলি চিন্তায় পড়িয়া যান, তাঁহারা এ শিবলিঙ্গ রক্ষা করিবেন কী করিয়া, বাবা যে ধরাধামে আসিয়াছেন শুধু পুণ্যার্থী নয়, দুষ্কৃতীদের চোখেও লোভনীয় হইয়া—তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে অতি ভক্তিমানেরও চোখ প্রথমে পড়িবে তাঁহার ললাটের নীলকান্তমণিটির দিকে। তাঁহাদের দুঃস্বপ্ন সত্য হইল একদিন, শুরু হইল পরস্পর আক্রমণ—চোর, ডাকাত, অসাধু ব্যবসায়ী অবধি। তবে তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, এই গ্রামের একটি মানুষেরও ক্ষতি হয় না সে আক্রমণে, সে তঞ্চকতায়, শিবলিঙ্গেরও না—হয় শুধু আক্রমণকারীদের। বাবার বিগ্রহ, বা গ্রামবাসীদের কেশাগ্রমাত্র যাহারা স্পর্শ করিয়াছে, শোনা যায়, সকলেরই অনতিবিলম্বে আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে। তবে এ কাহিনিতে লজ্জার বিষয় আছে একটি, যে গল্প বাবা আমাকে কখনও শোনাননি, অনেকখানি বড়ো হইয়া এ তথ্য আমার জ্ঞাতসারে আসে। নবপুরের মানুষ, তাঁহাদের ঈশ্বর, সকলের বিরুদ্ধের কলঙ্কের সঙ্গে আমার নিজের বংশও জড়িত। আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ শ্রীচন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় লাঠিয়াল ডাকাত পাঠাইয়াছিলেন মণি লুঠ করিবার জন্য, পরদিন সকালে তাঁহার আপন কক্ষে তাঁহাকে মৃত্যুপথগামী অবস্থায় পাওয়া যায়, অতিকষ্টে নাকি তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পর তাঁহার বংশের কেহ নবপুরে পা রাখিলে তাহার সর্বনাশ হইবে। তাহার খানিকক্ষণ পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহার উত্তরপুরুষদের কেহ কেহ পুনর্বার আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে নবপুরে, চন্দ্রনারায়ণের ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল। সেই অভিশাপের কথা স্মরণে রাখিয়াই শুধু আমি কেন, আমার পরিবারের কেহই কখনও এই গ্রামে পদার্পণের ধৃষ্টতা দেখাননি, কান্তিডিহি হইতে নবপুর আসিবার পথও খুব ভালো নয়, গ্রামবাসীরাও কেহ আসে না তাই। তবে দেবমাহাত্ম্যের এ কাহিনি বহুশ্রুত হইয়া যাওয়ার কারণে এ গ্রামের হদিশ আমার জানা ছিল। আজ, এই একটি রাতের মধ্যে আমি যে ঈশ্বরী ও তাহার পিতাকে এখানে টানিয়া আনিলাম, তাহার কারণ...

পিঠে হাতের স্পর্শ পাইয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, বাবা আমার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। সস্নেহে আমার মাথায় তাঁহার উষ্ণ হাতখানি বুলাইয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন তিনি। দেখিলাম, ধীরে ধীরে মানুষটির চোখ দুটি সেই সকালের মতো আর্দ্র হইয়া আসিতেছে, দুটি ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, যেন কোনো রাজা আপন প্রিয় পুত্রটির অন্যায়ের দণ্ডবিধান করিতেছেন। আমার কিঞ্চিৎ অস্বস্তিবোধ হইল এবার, নিম্নকণ্ঠে একবার ডাকিলাম, "বাবা?"

বাবা চমকিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, তাহার পর শিবলিঙ্গের দিকে চাহিলেন আরও একবার। দুটি হাতে হাত ঘষিয়া যেন নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া বড়ো রহস্যময় কণ্ঠে বলিলেন, "বিরাজ, তুমি যখন ছোট্টটি, তখন থেকেই পুজো বলো বা কোনো অনুষ্ঠান, আমি বসে থাকতাম, সেই মিষ্টি ছোট্ট ছেলেটা কখন আসবে, কখন আমায় প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে দেবে, আবার আমার হাতে হাতে কাজ করবে বলে বায়নাও ধরবে। ভোলানাথের কৃপায় লেখাপড়া কিছু হয়েছিল, ভাবতেও শিখেছিলাম টুকটাক, তবে মনে হত, সবই বৃথা যায়। ঈশ্বরীকেও সব শিখিয়েছি, সে আমার বড়ো বাধ্য ছাত্রী—তাতেও যেন আশ মিটত না, জানো, আসলে নিজের পেটের মেয়ে তো, তার তো এমনিতেই সব অধিকার, এতে শিক্ষাদানের নতুন করে মর্ম কী থাকল—এসবই উলটোপালটা সব মাথায় ঘুরত..." বাবা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "সে আশ খানিকটা তুমি মিটিয়েছিলে বাবা। তোমার মতো দ্বিতীয় আরেকটি ছেলে আমি দেখিনি। তারপর... আমার ঈশ্বরীকে বিয়ের পর যখন তুমি আমায় হঠাৎ বাবা বলে ডাকলে, ডাকার কথা তো ছিল না, তুমি অত বড়ো বাড়ির ছেলে, ও ডাক আমি আশা করিনি। তা-ও তুমি ডাকলে... আর সেই মুহূর্ত থেকে আমার

বাবার হৃদয়ে তোমার আর ইশুর স্থান কখনও আলাদা ছিল না। তোমাকে কখনও আমি আমার ছেলের থেকে কম কিছু ভাবিনি বাবা...”

যেন নিজেকে সামান্য সংবরণ করিলেন বাবা, তাহার পর আমার দিকে ফিরিলেন, “শেষবেলায় তাই ছেলেটাকে একটু দু-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছি বাপ হয়ে। তোমার চলে যাওয়ার খবর যখন পেলাম কাল, মেয়েকে নিয়ে এমন চিন্তায় পড়েছিলাম, তোমার জন্য দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারিনি। ভোলানাথ বোধহয় তাই এই ব্যবস্থা করলেন। পুত্রশোক কি কোনো মানুষ এড়িয়ে যেতে পারে বাবা?”

আমি খানিকক্ষণ মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রইলাম। বিশেষ আশ্চর্য আমি হইনি। সন্দেহ আমার বহুক্ষণই হইয়াছিল, তবে নিশ্চিত ছিলাম না। নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিলাম, “আপনি বুঝতে পেরে গেছেন, না?”

বাবা আঙুল দিয়া আমার পাশের দেওয়ালের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, সেখানে দীপালোকে একটি... একটিমাত্র ছায়া পড়িয়াছে। বাবা বলিলেন, “বাবা, তোমার গাঁয়ের কবিরাজের নাড়িজ্ঞান না থাক, আমার কিন্তু স্পষ্ট আছে। আজ যখন কুশিচরে তোমার হাত জড়িয়ে ধরেছিলাম, তখনই টের পেয়েছি। তুমি খাবার মুখে দিতে পারোনি, দুবারই কিছু না কিছু ছল করে ফেলে দিয়েছ, তা-ও দেখেছি। আর-একটা জিনিস বোধহয় তুমিও লক্ষ করোনি বিরাজ, তুমি যে গাছের পাশ দিয়ে যাও, তার পাতা কালচে হয়ে যায়, বিড়াল-কুকুর কেঁদে উঠে পথ ছেড়ে দেয়, জলে ঘূর্ণি আসে হঠাৎই। করোনি না?”

আমি নিরুত্তর রহিলাম, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করাও অপ্রয়োজনীয়। বাবাই আবার বলিলেন, “তুমি যে ঈশ্বরীকে বাঁচানোর জন্য কী কী সহ্য করেছ, সে শুধু তুমি জানো বাবা, আমার বোঝারও অতীত তা। তোমায় যে কৃতজ্ঞতা জানাব, সে ভাষাও নেই আমার। ভোলানাথ তোমার...” বাবার গলা আবার বুজিয়া আসিল। খানিকক্ষণ মানুষটাকে নীরবে কেঁদে যাওয়ার সময়টুকু দিয়া আমি বলিলাম, “বাবা... আপনাকে কিন্তু আরও অনেক শক্ত থাকতে হবে। আমার যেটুকু করার আমি... আর তো বেশিক্ষণ... মানে আপনি বুঝতেই পারছেন...”

বাবা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, “না বিরাজ... আর আমি আটকাব না তোমায়। শুধু বলে দাও, যার জন্য এত কিছু, তার ভবিষ্যতের জন্য কী ভেবেছ? তুমি যা করবে, ঈশ্বরীর ভালোর জন্যই করবে, তাই কোনো প্রশ্ন করিনি এতক্ষণ, কিন্তু তুমি যখন থাকবে না, তোমার পরিকল্পনার পরের ধাপের দায়িত্ব যে আমাকেই নিতে হবে...”

যে পরিকল্পনা সাজাইয়া আনিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবায়ন অপেক্ষা তাহার বিবরণ দেওয়া হঠাৎই আমার পক্ষে কঠিনতর হইয়া পড়িল। তা-ও... ভাবিয়া দেখিলাম, বাবাকে নিজমুখে যে সংবাদ দিতে হইবে ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইতে তো বাঁচিয়াছি। আরও খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম, “যা ভেবেছি, তাতে আপনার সাহায্য তো লাগবেই বাবা। আমি যা করেছি, আপনাকে তার থেকে অনেক বেশি কিছু করতে হবে। আপনাকে হয়তো আপনার বিশ্বাসের বিপক্ষে যেতে হবে বাবা।”

বাবা অধৈর্য হইয়া বলিলেন, “তুমি কী বলতে চাইছ, নিঃসংকোচে বলো বাবা। যা প্রয়োজন হবে আমার ঈশ্বরীর জন্য, ওর এই বুড়ো বাপ করবে।”

আমি উঁহার ডান হাতখানি দুই হাতে তুলিয়া লইলাম হঠাৎই, “মিথ্যে বলতে হবে বাবা। রাশি রাশি, অজস্র মিথ্যে বলতে হবে। পারবেন তো?”

বাবা আরও অবাক হইলেন, “তুমি কী বলছ, আমি...”

“বাবা, কয়েকটা দিন আপনাদের এই নবপুরে এদের আশ্রয়েই থাকতে হবে, তবে মিথ্যে পরিচয়ে। আপনার কোনো ভয় নেই, এখানে অন্তত আমাদের বংশের কেউ আসতে সাহস করবে না।”

“কিন্তু ঈশ্বরীর পরিচয়, তা কী বলব আমি বিরাজ? সে সদ্যবিধবা, এখনও তার এয়োস্ত্রীর বেশ ঘোচেনি, তার বৈধব্যপালনের ব্যবস্থা করতে গেলেই তো সকলে জেনে যাবে। তারা যদি খবর দেয় কান্তিডিহিতে? সেখানের মানুষের এখানে আসা বারণ, এখানের মানুষের তো সেখানে যাওয়া নয়। আর পুণ্যের লোভে মানুষ কী কী করতে পারে, আশা করি, তুমি বুঝেছ বাবা।”

আমি আরও কিছু সময় দিলাম নিজেকে, তারপর বলিলাম, “বৈধব্য পালন যদি সে না করে বাবা? একমাত্র সেই উপায় তাকে রক্ষা করার।”

বাবা যেন আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, “বৈধব্য পালন করবে না মানে?”

আমি তাঁহার হাতখানি আরও শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিলাম, “সব থেকে কঠিন মিথ্যেটা আপনাকে এখানেই বলতে হবে বাবা। বাবা, বলতে পারবেন না সে আপনার কুমারী মেয়ে, তার বিবাহ হয়নি এখনও?”

“বিরাজ, তুমি ভেবেচিন্তে কথা বলছ তো? সে তোমার

বিধবা স্ত্রী, আমি বলব সে কুমারী মেয়ে...?"

"বলবেন বাবা। হ্যাঁ, এখানকার মানুষও হয়তো ছি ছি করবে একটু, তবে মাত্র তো ক-টা দিন, আপনারা একটু সুস্থ হয়ে তাকে নিয়ে শহরে চলে যান। সেখানে গিয়ে ঈশ্বরীর নতুন করে সংসার পেতে দিন বাবা। আপনি বাবা হয়ে চান, আপনার মেয়ে তিনটিমাত্র বছর সংসারসুখ পাক, তার লাল শাড়ি পরা, আমিষ খাওয়া ঘুচে যাক? সইতে পারবেন তো? আমি এ জন্মের জন্য যে সুখটুকু তাকে দিতে চাই, আপনি চান না বাবা? ঈশ্বরীর লক্ষ্মীশ্রী যে সংসারে পড়বে, তাকে আলো করে রাখবে, এ আপনি মানেন না?" একনিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া চলিলাম আমি। বুঝিলাম, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, সে এ জন্মের জন্য, আগামী সাত জন্মের জন্য অন্য কারও হইয়া যাইবে, সে কথা মুখেও বলিতে, কিন্তু আমি জানি, সে সুখী হইবে। যে সুখ তাহাকে আমি দিতে পারিলাম না, অন্য কেহই না হয়...

বাবাকে বড়ো অস্থির দেখাইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি, বাতাসের বেগে চিন্তা করিয়া চলিতে হইতেছে তাঁহাকে। বেশ খানিকক্ষণ পর বলিলেন তিনি, "আমি চাই, বিরাজ মেয়েটা আমার সুখী হোক... তবে তুমি যা বলছ... আচ্ছা, আমি যদি বলি, সে সধবা? তাহলে হয় না?"

"বলতে পারেন বাবা, তবে... একদিন তো আজ আমি যেখানে চলেছি, আপনাকেও যেতে হবে। ভোলানাথের কৃপায় ঈশ্বরী বাঁচলে তখন তার কী হবে? আমি কিন্তু আজ তাকে শুধু চিতার আগুন থেকে উদ্ধার করতে আসিনি বাবা, এসেছি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ থেকে তাকে যতখানি সম্ভব আরাম দিতে। আপনি যদি..."

বাবা একটি হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিলেন, "বেশ, তুমি যা বলছ, তা-ই হবে। ওর এ জীবন তোমার দেওয়া বিরাজ, একবার নয় তা-ও, দু-দুবার। তুমি যা চাও, ঈশ্বরীর জীবন তেমনই হবে।"

আমি মাথা নত করিলাম, "দয়া করে এভাবে বলবেন না বাবা। এ জীবন শুধু ঈশ্বরীর, ও যাতে ভালো থাকে তাই... ঈশ্বরী!"

বাবা বোধহয় অন্যমনস্ক হইয়া পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের পথ খুঁজিতেছিলেন, আমার অস্ফুট আর্তনাদে চমকিত হইয়া আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরী উঠিয়া বসিয়া আমাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সে কখন জাগিয়াছে, কী কী জানে সে, কিছুই আমরা জানি না! বাবার মুখ হইতেও নির্গত হইল আতঙ্কিত কিছু টুকরা শব্দ, "ঈশ্বরী... মা... আমরা..."

ঈশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর এক-পা এক-পা করিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুল খুলিয়া পড়িয়াছে, শাড়ির অঞ্চল লুটাইতেছে মাটিতে, তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, একটি মর্মরমূর্তিতে যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রাণ দিয়াছে কোনো জাদুকর। তাহার পরই, আমাদের অবাক করিয়া দিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় সে কথা বলিয়া উঠিল, "আমি একটু ওঁর সঙ্গে কথা বলব বাবা?"

মেয়ের এই অদ্ভুত আচরণে অবাক পিতা কী যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর নিজেকে সংবরণ করিয়া সরিয়া গেলেন। ঈশ্বরী মাথা তুলিয়া চাহিল আমার দিকে, একফোঁটা জল নাই তাহার চোখে। আমি কম্পিত স্বরে ডাকিয়া উঠিলাম, "ইশু... তুমি..."

তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, যন্ত্রের মতো কাটা-কাটা স্বরে ভাসিয়া আসিল একটি-দুটি কথা, "জানো, সেবার যখন আমার বিয়ে ঠিক হল, সেই যখন তুমি আমায় বিয়ে করলে গো, তখন বাবাকে একবারমাত্র বলেছিলাম, বাবা, আমি তো বিয়ে করতে চাই না। বাবা সঙ্গে সঙ্গে না করে দিয়েছিল। এবার বাবার কী হল বলো তো? বাবা আমায় কিছু জিজ্ঞাসাই করল না। বাবা এমন করল? বলো-না!"

আমি সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিলাম, "বাবাকে ভুল বুঝো না ইশু। আমাকেও না। আমরা যা করছি, তোমার ভালোর জন্যই... আমি মানছি, তোমার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে সময়..."

ঈশ্বরী উন্মাদিনীর মতো হাসিয়া উঠিল। তাহাকে দেখিয়া আমার কেমন ভয় করিতে লাগিল, "হুঁ... সময়... আচ্ছা, হ্যাঁ গো... এখন যদি আমার ঘুম না ভাঙত, তুমি তো চলে যেতে তা-ই না? তারপর বাবা আমার সঙ্গে অন্য কারও বিয়ে দিয়ে দিতেন! আমায় জিজ্ঞাসা না করেই? তোমায় দেখলেই বাবা সব ভুলে যায়। সেবার... শুনলাম, আমার বুড়ো পাত্র নাকি মারা গেছে, চারদিকে কত শোরগোল। আমি কত আশা করে বসে আছি, বাবার সঙ্গে বাড়ি যাব। হঠাৎই শুনলাম, বাবা আবার বর পেয়েছেন আমার জন্য, নতুন বর। তুমি থাকলেই..."

আমি বলিলাম, "এ ছাড়া যে তোমায় ভালো রাখার আর কোনো উপায় দেখিনা ইশু। আমাদের এ সমাজে যে এখনও নারীর রক্ষাকর্তা হিসাবে একজন পুরুষের নামটুকু অন্তত প্রয়োজন, আমরা যতই বিদ্রোহ করি। তুমি তো কিছুটা জানো এ সমাজকে, পুরুষের সহায় ছাড়া যে একটা মেয়ের সুস্থভাবে

বেঁচে থাকার কথা ভাবাও কতটা ছেলেমানুষি, তা তুমি বোঝো না ঈশ্বরী?"

ইশু হাসিল, "মানে আমায় সুস্থভাবে বাঁচানোর জন্য আবার একজনকে আমাকে বিয়ে করে আমায় উদ্ধার করতে হবে তা-ই না? কেন গো? মেয়েমানুষের ধুতরোর বীজ বড়ো অস্ত্র, তুমি জানো না?"

"ইশু!" এ নির্বোধ বালিকাকে সামান্য ধমকাইয়া উঠিলাম আমি, "তুমি এতক্ষণে সবই বুঝেছ, আর ছল করব না আমি। আমি কেন ফিরে এসেছি তা-ও বুঝেছ নিশ্চয়ই? ঈশ্বরী, তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী। এক তোমায় পাওয়াটুকু ছাড়া এ জন্মটা আমার নিতান্তই বৃথা গেল, আমি চাই, আমার অর্ধাঙ্গে এ পৃথিবীর যে রূপ-রস-গন্ধ আমি উপভোগ করতে পারিনি, তা তুমি অন্তত করো। তারপর... পরপারে আবার দেখা হবে আমাদের। তখন..."

ঈশ্বরী থামাইয়া দিল আমাকে, "পরপারে! কপালে থাকলে তো আমি তো অন্যের নামের সিঁদুর নিয়ে যাব। সহ্য হবে তো?"

মনে বলিলাম, "কখনও নয়।" মুখে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, "হবে।"

সে তাকাইল আমার চোখের দিকে, "সত্যি হবে?"

আমি আর উত্তর দিতে পারিলাম না। কথা ঘুরাইয়া বলিলাম, "দ্যাখো ইশু, আমি জানি, তুমি শাস্ত্রের কথা ভাবছ। শাস্ত্র কিন্তু স্পষ্ট বলে, বিধবা দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে, তোমার বাবার কাছে তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ! বিদ্যাসাগর মশাইও তো লড়াই চালাচ্ছেন, বিধবাবিবাহ আইন পাশ হবে খুব শিগগিরই, আর এতে কোনো দোষ..."

হঠাৎই হাউ হাউ করে কাঁদিয়া ফেলিল ঈশ্বরী, "সমাজ, শাস্ত্র? বিদ্যাসাগর মশাই আমার মাথায় থাকুন, তাঁর জন্য কালকের দিনে বহু বহু সব হারানো মেয়ে বেঁচে যাবে গো! কিন্তু আমায় যে বাঁচানো যাবে না ওভাবে। ওগো, তুমি বোঝো না কেন, এ জন্মে, পরের সাত জন্মে আমি তোমায় ছাড়া কোনো মানুষকে স্বামী বলে ভাবতে পারব না? যার মন কখনও বিয়ে জিনিসটা বোঝেইনি, তার হঠাৎ একটা বর হল। তারপর কী হল, বোঝো না তুমি? বুঝবে না যখন, শুধু বর হয়ে থাকতে পারতে! কেন আমায়...", কান্নার দমকে জড়াইয়া আসিতেছে তাহার গলা, "তুমি বলতে না, আমি শুধু তোমার দায়িত্ব নই, বোঝা নই, তবে এখন কেন..."

উহার আর্দ্র ঠোঁটে আঙুল রাখিলাম আমি, "ইশু... পাগলি মেয়ে। নও তুমি শুধু আমার দায়িত্ব। দায়িত্বে মানুষ ফিরতে পারে না ইশু, অন্তত আমার মতো সাধারণ মানুষ তো না। পারে শুধু..."

আমি কথা শেষ করিতে পারিলাম না, তবে বোধ হইল, সে বুঝিল। সজল চোখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে আমি যা চাই, আমায় করতে দাও, তুমি চাও, আমি বাঁচি, আমি বাঁচব, অন্য কেউ নষ্ট না করে ফেলা অব্দি বাঁচব। তবে... তুমি আর যা চাও, তা আমাকে করতে বোলো না।"

আমি তাহাকে ছাড়িয়া পিছাইয়া আসিলাম। স্পষ্ট বুঝিয়াছি যে কথা, সে বলিতে পারিল না, যে কথা না বুঝিয়াই বহু মানুষ পাশাপাশি থাকিয়া জীবন পার করিয়া দেয়, তাহা সে অন্তরে বুঝিয়াছে—তাহার কথার অন্যথা সে হইতে দেবে না। তাহার পিতা, তাহার স্বামী তাহাকে চিরকাল বলিয়াছে, নিজের মন সকলের আগে, তাহারা তো আজ হঠাৎই কিশোরীর হৃদয় হইতে সে কথা মুছিয়া দিতে পারে না। তবে আমি কী করি এখন? কাহার ভরসায় রাখিয়া যাই তাহাকে? নিজে যে সারাজীবন ছায়া হইয়াও তাহাকে প্রহরা দিব, সে উপায়ও নাই, বড়ো কম আমার সময়, বড়ো কম... ঘরের প্রতিটি কোণে উত্তর খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম আমি, হঠাৎই বোধ হইল, একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এক খণ্ড নীল বিদ্যুৎ আমার চোখের সামনের বাতাস কাটিয়া চলিয়া গেল—দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া লইলাম আমি। তাহার পর একটু ধাতস্থ হইয়া দেখিলাম, অদ্ভুতভাবে সরাসরি কোনো আলোর প্রতিফলকের অস্তিত্ব ছাড়াই ভোলানাথের কপালের নীলকান্তমণি হইতে কিরণ আসিয়া পড়িতেছে আমার চোখে, কৃষ্ণবর্ণ পাথরে সাদা খড়িমাটিতে আঁকা তাঁহার বড়ো জীবন্ত দুই চোখে একরাশ ভরসা ও আশ্বাস, তাঁহার ঈশ্বরীর জন্য, কিছু হয়তো তাঁহার বিরাজের জন্যও। ওই চোখেই একটি মুহূর্তে উত্তর মিলিয়া গেল আমার, ঈশ্বরীকে রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, "ইশু, তুমি ছেলেমানুষ নও। বেশ করে ভেবেচিন্তে বলছ, তোমার মন ঠিক জানে? এ সিদ্ধান্ত কিন্তু আর বদলানো যাবে না।"

সে দৃঢ় প্রত্যয়ে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিল, "বলছি।"

"বেশ ঈশ্বরী, কোনো মানুষকে এ জন্মে গ্রহণ করতে হবে না তোমাকে। জীবনে প্রথম বরমাল্য দিয়েছিলে যার গলায়, তিনিই তোমার সহায় হন। ইশু, তাতে তোমার আপত্তি হবে না তো?"

ঈশ্বরী হতবাক হইয়া চাহিয়া রইল, সে বুঝিতে পারে নাই। আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে ভোলানাথের সামনে লইয়া আসিয়া দাঁড় করাইয়া দিলাম, "এ জন্মের জন্য তোমার

ভোলানাথকে তোমায় দিয়ে গেলাম। এ জীবনটা তাঁর সেবা করে কাটাতে পারবে?"

সে বলিল, "পারব। কিন্তু সে কীরকম?"

"বলছি। সিঁদুর আছে সঙ্গে?"

সে উত্তর করিল না, শুধু তাহার সিক্ত পুঁটুলিখানি হইতে সিঁদুরের কৌটা বাহির করিয়া আনিয়া দিল। আমি তাঁহার ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া বেশ কিছুটা গলিত সিঁদুর লইয়া তাহার কপালে লেপিয়া দিলাম। সে অবাক হইল না, সে ক্ষমতা বোধহয় তাহার নাই আর। শুধু সেই বড়ো বড় দুটি চোখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল সে। সে দৃষ্টির মায়া ত্যাগ করিয়া বাবা ভোলানাথের সেই শান্ত দুইখানি চোখে চোখ রাখিয়া আমি বলিলাম, "ঈশ্বরী, স্বয়ং ভোলানাথ তোমায় গ্রহণ করলেন এই মুহূর্ত থেকে, তোমার প্রতি যদি আমার কোনো অধিকার থাকে, তোমার অনুমতি নিয়ে আমি তাঁকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্প্রদান করলাম। আজ তাঁর ইচ্ছে না থাকলে মুখোপাধ্যায় বংশের অভিশাপগ্রস্ত সন্তান এই মন্দিরে পা-ও রাখতে পারত না, তা-ও অশরীরে—আমার মন বলছে, তাঁর মত আছে। তিনি তোমায় দেখে রাখবেন ইশু, আমি ঠিক জানি।"

আরেকবার, এই শেষবারের মতো তাহাকে একবার দেখিয়া লইলাম আমি। তাহার কপালে একটিমাত্র চুম্বন করিয়া বলিলাম, "ইশু, তোমায় কখনও আমার পায়ে হাত দিতে দিইনি, মনে আছে? তোমার স্বামীদেবতা হওয়ার ইচ্ছা নেই আমার, যোগ্যতাও নেই। যে তোমার দেবতা হওয়ার যোগ্য, সে-ই দেবতা হোক।"

সে কী বলিল, কেমনভাবে আমার দিকে চাহিল, আর দেখা হইল না আমার। দুটি চোখ বন্ধ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া ভোলানাথের দিকে অগ্রসর হইলাম আমি। আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিলাম তাঁকে, "এ জন্মের মতো ও তোমার। ওকে তুমি দেখে রেখো। তবে মনে রেখো, আমার কিন্তু এখনও অধিকার আছে তার উপর। না...", মাটিতে মুখ স্পর্শ করিয়াই হাসিয়া ফেলিলাম আমি, "তুমি ভুলো না। তবে ওই পাগলিটাকে দিয়ে এ সিদ্ধান্ত যখন নিইয়েই নিলে, ওকে ভুলিয়ে দিয়ো।"

পদশব্দে বোধ করিলাম, বাবা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "মিথ্যেতে একটু রদবদল হবে বাবা।"

বাবা ঘাড় নাড়িলেন, তিনি সমস্ত শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন। আর ঈশ্বরীর দিকে ফিরিলাম না আমি, ফিরিলে কী হইবে, আমি জানি। স্থাণুর মতো তাহাকে দাঁড় করিয়া রাখিয়া বাবার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। দরজাখানি বন্ধ হইয়া যাইতে যাইতে শুধু শুনিতে পাইলাম, ধীরে ধীরে আকুল কান্নায় ভাঙিয়া পড়িতেছে ঈশ্বরী, যে কান্না ওর বহুক্ষণ আগে কাঁদিয়া লইবার কথা ছিল, আমার আবদার পূরণ করিতে গিয়া যাহাকে সে এতক্ষণ চুপ করাইয়া রাখিয়াছিল বলপূর্বক, সে সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া গ্রাস করিতেছে তাহাকে। তাহার ক্রন্দনধ্বনিকে ক্রমে মৃদু করিয়া দিয়া সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল দরজাখানি।

আমি বাবাকে প্রণাম করিলাম, "এবার আমায় যাওয়ার অনুমতি দিন।"

বাবা দুই হাতে আমাকে টানিয়া লইলেন বক্ষে। তাহার পর বলিলেন, "বাবা, সেদিন যখন ইশু লগ্নভ্রষ্টা হল, মন খুব চাইছিল, মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ি চলে যাই, থাকি বাপে-ঝিয়ে—শুধু সমাজের ভয়ে সকলের পায়ে পড়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার সৌভাগ্য, না, ইশুর সৌভাগ্য বলব না, ওর বাপের সৌভাগ্য সেদিন তোমায় পেয়েছিল। সেদিন আমি যা পারিনি, তুমি আজ তা করে দেখালে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু ছলে যে! ভোলানাথ সত্যিই স্বেচ্ছায় সহায় হলেন কি না, স্পষ্ট জানা হল না তো! ভোলানাথের সঙ্গে ছল করলাম বাবা।"

বাবা আমার মাথায় হাত রাখিলেন, "তুমি স্বচ্ছন্দে যাও বাবা। যদি তা ছলনা হয়ে থাকে, বাপ হয়ে সে দায় আমি নিলাম।"

আমি হাসিলাম শুধু একটু, "উঁহু, আমি নিলাম।"

তাহার পর ফিরিয়া চলিলাম, যেখান হইতে আসিয়াছি সেইখানে। আর পিছনে ফিরিয়া চাহিলাম না।

* * * * * * * *

নবপুরের মন্দিরের সম্মুখে আজ বড়ো ভিড়। সমগ্র নবপুর যেন উঠিয়া আসিয়াছে, ছেলে-বুড়া কেহ বাকি নাই। এ গ্রামের একটি বিধবা মেয়ের দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছে, নূতন জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল, এ হট্টগোল তাহার পরিচিত নয়। কিছু কাজে তাহার শহরে যাওয়ার ছিল, তবে এহেন ভিড় দেখিয়া কৌতূহলে আর সময়ের জ্ঞান রহিল না। ভিড়ের একজনের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিল সে, "হ্যাঁ কাকা, কী হয়েছে?"

চোখ মুছিয়া উত্তর দিলেন মানুষটি, "ঈশ্বরী মা চলে

গেলেন আজ বাবা।"

সাধিকা ঈশ্বরী মায়ের নাম শুনিয়াছিল জামাই, তবে সাক্ষাৎ লাভ হয়নি, তাহার বিবাহ কন্যার মাতুলালয় হইতে হইয়াছিল, তবে জানিয়াছিল, বিবাহের পূর্বে ঈশ্বরী মা কন্যা ও পাত্রকে বহু আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এই দেবীস্বরূপা নারী সম্বন্ধে সে কত কী শুনিয়াছে স্ত্রী-র কাছে, ভগবান মহাদেব নাকি স্বয়ং তাহাকে নিজের সেবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ হইতে সে প্রায় পঞ্চাশটি বৎসর আগে। একদিন ভোরে মন্দিরের দ্বার খুলিতে আসিয়া নবপুরের মানুষ আবিষ্কার করেন, যে মন্দিরে এ গ্রামের বাসিন্দা ভিন্ন কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে ভগবানের চরণে লুটাইয়া আছে একটি পরম সুলক্ষণা বালিকা, সিঁথিভরা সিঁদুর তাহার। গ্রামের বউ-মেয়েরা দল বাঁধিয়া আসিয়া মেয়েটিকে সেবা করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই হইতে দেবের নিজের পছন্দ-করা মানুষটিকে প্রাণ দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা। ঈশ্বরী মা-র বাপ নাকি বাঁচিয়াছিলেন তখনও, তাঁহার মুখেই শুনেছিলেন সকলে—সে এক অবাক কাণ্ড। তিনি তাহার আগের রাতে তাঁহার কুমারী মেয়েটিকে লইয়া অন্য গ্রামে চলিতেছিলেন, ঝড়বৃষ্টিতে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে এই মন্দির চাতালে আসিয়া উপস্থিত হন, ঝড়ের আক্রমণে শরীরও অসুস্থ তখন। মন্দিরের দরজা খুলিতে না পারিয়া অন্যত্র সামান্য আশ্রয় খুঁজিতে গিয়াছিলেন মেয়েকে বসাইয়া, ফিরিয়া আর মেয়েকে খুঁজিয়া পাননি। পরদিন প্রভাতে এমন ঘটনা! তিনি কখনও দেবীর আশপাশে যাননি আর, এই গ্রামেই থাকিতেন আমৃত্যু, খবর রাখিতেন দেবীর। দেবী থাকিতেন মন্দিরে, নিজের সমস্ত যত্ন ঢালিয়া তাঁহার দেবের পূজা করিতেন, একটি মুহূর্তেও যেন তাহার অন্যথা হয়নি। আর শুধু তা-ই বা কেন, দেবী যে গ্রামের মানুষদেরও আপনার সন্তানের মতো দেখিতেন, সকলের আপদে-বিপদে সমস্ত করিতেন, তাহা বুঝি কিছু নয়? তাঁহারাও তাই যথাসাধ্য করিতেন। দুষ্ট লোকেরা বহু কথা রটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল দেবীর নামে, ভোলানাথের আশীর্বাদে তাহাদের কঠোর হাতে দমন করিতে পারিয়াছেন নবপুরের মানুষ। আহা, কেমন ভালোমানুষটিই না ছিলেন দেবী, রোজ যাইয়া ঢেঁকিতে পাড় দিতেন, গ্রামের মেয়ে-বউদের জন্য শাক বাছিয়া রাখিতেন, কেহ আপত্তি করেনি, দেবীর বাবা নাকি বলিতেন, ঈশ্বরের সেবিকার কখনও সাধারণ মানুষের দান গ্রহণ করা উচিত নয়। আরও কত গুজব আছে তাঁহার নামে, তিনি নাকি তন্ত্রসাধনা করিতেন। কত বিষয়েই না চমৎকার জ্ঞান ছিল তাঁহার, সাধুসন্ন্যাসীরা আসিলে তাঁহাদের নিকট দেশ-বিদেশের গল্প শুনতে খুব পছন্দ করিতেন, কত মানুষ আসিত তাঁহার আশীর্বাদ লইতে। বিনয়ী মানুষটি বলিতেন, ভোলানাথের আশীর্বাদ পাইলেই আমার আশীর্বাদ করা। সত্যিই তো, মানুষ তো নন, দেবী...

জামাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া তখন চোখ মুছিতেছেন পাশের গ্রামবাসীটি। দেবী চলিয়া গেলেন ভাবিয়া জামাই কষ্টই পাইল, এই মা-কে কখনও দর্শন করা হয়নি, আজ তাঁহার মৃতদেহের সামনে দিয়া যাইতে হইবে! ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল সে, "মহাদেবের যোগ্য সেবিকা ছিলেন শুনেছি।"

"ঠিক বলেছ বাবা, ঠিক বলেছ", বলিলেন অপর লোকটি, "মহাদেব এখানে বড়ো জাগ্রত, তেমনই ছিলেন তাঁর সেবিকাটি। আহা, আর কখনও মা আমার হাসিমুখে বলবেন না, এসেছেন, দুটো পেসাদ মুখে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু। আর..."

কণ্ঠ পুনর্বার আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার। জামাই বলিল, "আর কী কাকা, আমার কপাল, সাধিকাকে তো দর্শন হল না, আমার পরিবার বোধহয় এখনও জানেন না এ খবর, জানলে বড়ো কষ্ট পাবেন। তা চলুন, একবার আপনাদের মন্দির দর্শন করে যাই। মন শান্ত হচ্ছে না নইলে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অবশ্যই... এসো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

হাঁটিতে হাঁটিতে প্রশ্ন করিল জামাই, "আচ্ছা কাকা, কী নামে যেন অধিষ্ঠান করেন এখানে মহাদেব? বহু যুগ আগে নাকি কী স্বপ্ন পেয়েছিলেন আপনারা..."

মন্দিরের দিকে চাহিয়া কপালে হাত ছোঁয়াইলেন গ্রামবাসীটি, "নিজে থেকে এসে আমাদের গ্রামে বসেছিলেন বাবা, তাই নাম বিরাজেশ্বর। হ্যাঁ, তা বহুদিন আগের কথাই সে..."



আলোতে আঁধার নামে

অর্ক পাত্র



দরজা বন্ধ করে বাড়িটার ভেতর ঢুকে এলাম আমি। হাতের প্যাকেটটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলাম। রাতের খাবার আছে তার মধ্যে।

সবে রাত সাড়ে আটটা। এরই মধ্যে গোটা মোহনপুর গ্রাম যেন চুপ করে গেছে। তা ছাড়া এই বাড়িটা গ্রামের একপ্রান্তে বলে দিনের বেলাতেও এদিকে লোকজনের আনাগোনা বেশ কম। এমন এক অজগাঁয়ে এসে থাকার কারণ আর কিছুই নয়—সারস্বত সাধনা। ভেবেছিলাম, কলকাতার বাইরে কোথাও নিরিবিলিতে কয়েকটা দিন কাটালে যদি নতুন প্লট মাথায় আসে। ব্যাপারটা সুপ্রতিমকে জানাতে ও এই জায়গাটার সন্ধান দিয়েছিল। ও জানিয়েছিল, মোহনপুরে আসলে ওদের পৈতৃক নিবাস ছিল। বছর সাতেক আগে ও গাঁয়ের সমস্ত পাট চুকিয়ে ওরা সপরিবারে কলকাতা চলে আসে, তারপর থেকে আর কোনো যোগাযোগ নেই। ওখানে কেবল থাকার মধ্যে ওর জেঠুর তৈরি দোতলা বাড়িটি এখনও অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে। আপাতত সেই বাড়িতেই আস্তানা গেড়েছি আমি।

"তা, সবই যখন বিক্রি করে দিলি, বাড়িটা বাদ রাখতে গেলি কেন? ভবিষ্যতে আমি গিয়ে যাতে কয়েকটা দিন কাটাতে পারি?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

"না রে, ব্যাপারটা আসলে অন্যরকম", সুপ্রতিম জানিয়েছিল, "বাড়িটা ছিল জেঠুর খুব প্রিয়। বাবার মুখে শুনেছিলাম, জেঠু নাকি নিজের হাতে বাড়িটার প্ল্যান তৈরি করেছিলেন। বোধহয় রিসার্চের সুবিধার জন্যই অমন নিরিবিলিতে বানিয়েছিলেন বাড়িটা। একলা থাকতেন, বিয়ে-থা করেননি, কেবল একজন কেয়ারটেকার গোছের লোক দু-বেলা এসে রান্নার কাজটুকু করে

দিয়ে যেত। ভদ্রলোক সারাদিন তাঁর গবেষণা নিয়েই থাকতেন। সে সময় বৈজ্ঞানিক মহলে যথেষ্ট খাতিরও ছিল তাঁর। তো, সেই গ্রাম ছেড়ে চলে আসার সময় পরিবারের একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বাড়িটাকে আর বিক্রি করতে পারিনি। আমারও ওদিকে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। জানি না এখন সেটা বেদখল হয়ে গেছে কি না।"

ওর কাছে এমন একটা জায়গার বর্ণনা শুনে আমি আর বেশি দেরি করিনি। বাড়িটার চাবি হস্তগত করে আজ সকালেই গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে মোহনপুর পৌঁছোতে পৌঁছোতে পাক্কা চার ঘণ্টা লেগে গেল। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে পথনির্দেশ চেয়ে বাড়িটার সামনে যখন পৌঁছোলাম, তখন বিকেল নামছে। বাড়িটার ভেতর প্রবেশ করার আগে বাড়ির বাইরেটা একবার ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম।

ছোটোখাটো দোতলা বাড়ি। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে। অসংখ্য আগাছা, ঝোপঝাড়, লতাপাতা এসে ভিড় জমিয়েছে বাড়িটাকে ঘিরে। চারিদিকে অবহেলা আর অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। স্থানীয় একজনকে ডেকে নীচের তলার একটা ঘর পরিষ্কার করিয়ে কয়েকদিন কাজ চালানোর মতো করে নিয়েছি আমি। ইলেকট্রিসিটি না থাকলেও বাড়িতে একটা ছোটো জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। প্রায় নিশ্চিত ছিলাম, সেটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু সামান্য মোছামুছি করে কেরোসিন ঢেলে সেটা চালু করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। সিঁড়ির নীচ থেকে এখন সেটারই একটানা আওয়াজ ভেসে আসছে।

এখন কী করা যায় ভাবছি, মনে পড়ল, দোতলার ঘরগুলো খুলে দেখা হয়নি। আসলে সারাদিনের জার্নিতে এত টায়ার্ড ছিলাম যে, বিকেলের দিকে একটু চোখ আটকে এসেছিল। তাই ওপরের তলাটা আর ভালো করে দেখা হয়নি।

টর্চটা হাতে নিয়ে সিঁড়িতে পা বাড়ালাম। উঠতে উঠতে মনে পড়ল, আমার হাতে চাবির গোছাটা দিতে দিতে সুপ্রতিম আচমকা প্রশ্ন করেছিল, "আচ্ছা, তুই ভূতে বিশ্বাস করিস?"

"পুরোপুরি অবিশ্বাসও করি না। কিন্তু কেন বল তো?" থতোমতো খেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"না, এমনিই মনে হল। ওই বাড়ির দোতলার জেঠুর ল্যাব কাম স্টাডিতে জেঠুকে একদিন মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ঘুমের মধ্যেই হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সকালে কেয়ারটেকার লোকটি ডাকাডাকি করে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে শেষে দরজা ভেঙে দ্যাখে, জেঠু খাটের ওপর নিথর হয়ে পড়ে আছেন। ঘটনাটা এখনও আমাদের ভাবায়, জানিস। অমন শক্তসমর্থ মানুষটার এমন হবে, কেউ ভাবিনি আমরা। তারপরই তো ওখানকার সব পাট চুকিয়ে কলকাতা চলে আসা হয়।"

সেদিন এ পর্যন্ত বলে ও থেমে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম, কিছু একটা বলতে গিয়েও চেপে গেছে। এ নিয়ে আমিও আর কথা বাড়াইনি।

দোতলায় উঠতেই লম্বা প্যাসেজ। অন্ধকারে ঢাকা। টর্চের আলোয় সুইচবোর্ডটা চোখে পড়তে সুইচগুলো অন করে দিলাম। কিন্তু প্যাসেজের একটা আলোও জ্বলল না। অগত্যা টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখতে লাগলাম। সমস্ত মেঝেটা প্রায় ইঞ্চিখানেক পুরু ধুলোতে ঢেকে আছে। বেশ কিছু জায়গায় সিলিং থেকে চাঙড় মাটিতে খসে পড়েছে।

প্যাসেজের একদিকে লাগোয়া মোট তিনটে ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে প্রথম যে ঘরটা, সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। দরজা তালাবন্ধ। চাবি সঙ্গেই ছিল,সেটা লাগিয়ে মরচে-ধরা তালাটা খুলতে বেশ কসরত করতে হল। তারপর পাল্লা দুটো ধরে অল্প চাপ দিতে দীর্ঘ সাত বছর পর আবার সেটা শব্দ করে খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ও একঝলক দমকা বাতাস আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা ভ্যাপসা গন্ধে নাক বুজে এল প্রায়। প্রাথমিক অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে সুইচবোর্ড খুঁজে নিয়ে আলোগুলো জ্বালতে দুটো বাল্‌ব টিমটিম করে জ্বলে উঠল। ধুলো-জমা বাল্‌বের ঘোলাটে আলোয় ঘরের পরিবেশটা কেমন যেন অপ্রাকৃতিক মনে হচ্ছিল। টর্চ অন রেখে ঘরের ভেতরটা ভালো করে জরিপ করে নিলাম।

ঘরটা আয়তনে বেশ বড়ো। একঝলক দেখেই বুঝতে পারলাম এটাই সুপ্রতিমের জেঠুর ল্যাব কাম স্টাডি। এককোণে একটা টেবিলে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি রাখা। কাছে গিয়ে তার মধ্যে কয়েকটা চিনতেও পারলাম—বুনসেন বার্নার, বকযন্ত্র, টেস্ট টিউব, গ্যাস সিলিন্ডার ইত্যাদি। কয়েকটি পাত্রে নীলচে গুঁড়োজাতীয় একটা পদার্থ চোখে পড়ল। অন্য যন্ত্রপাতিগুলোকেও স্কুলের ল্যাবরেটরিতে দেখেছিলাম; কিন্তু এখন সেগুলোর নাম মনে পড়ল না আমার। ঠিক তার পাশের দেয়ালে একটা ছোটো বেসিন। আর-একটু ভালো করে লক্ষ করতে অবাক হয়ে দেখলাম, একটা যন্ত্র থেকে কয়েকটা সরু নল সোজা দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করেছে। একটি নল ওয়াল বরাবর ওপরে উঠে ইলেকট্রিকের তারের সমান্তরালে গিয়ে বাল্‌ব দুটোকে কানেক্ট করেছে। তাজ্জব ব্যাপার!

জিনিসগুলোর একটু দূরে একটা সিঙ্গল বেড। সেটার দিকে চোখ পড়তে মনে পড়ে গেল, ভদ্রলোককে এখানেই ঘুমন্ত

অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সেই ঘুম আর কখনও ভাঙেনি। চট করে বিছানার ওপরটা একবার দেখে নিলাম। এখন সেখানটা ফাঁকা।

ঘরে অন্যান্য আসবাব বলতে একটা কাঠের চেয়ার, একটা তেপায়া টেবিল, একটা ছোটো টুল। অন্যদিকের দেয়ালে একটা বইয়ের র‍্যাক। কিছু বই আর ম্যাগাজিন এখনও যথাস্থানে বিরাজ করছে। নাম দেখে বুঝলাম বেশির ভাগই বিদেশি বইপত্র। সেগুলোর ওপর ধুলোর মোটা আস্তরণ পড়েছে। দেয়ালের অপর প্রান্তে মেঝে থেকে প্রায় সাত ফুট উঁচুতে একটা কুঠুরি। সম্ভবত মালপত্র স্টোর করে রাখার জন্যই বানানো হয়েছিল সেটা। ওটার কাঠের পাল্লাটা এখন বন্ধ।

অনেকক্ষণ ঘরের বদ্ধ পরিবেশে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম আমি। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল। হঠাৎ এতক্ষণ যে ব্যাপারটা খেয়াল করিনি, সেটা খেয়াল করতেই আশ্চর্য হয়ে জাতীয় কিছুও চোখে পড়ল না আমার। যে ঘরে কেমিস্ট্রির এক্সপেরিমেন্ট হয়, সেখানে ওই একটি দরজা ছাড়া বাতাস চলাচলের আর কোনো পথ নেই! ভারী অস্বাভাবিক তো!

টর্চটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে আরও একটা জিনিস চোখে পড়তে চোখ আটকে গেল আমার। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চাকতি পড়ে আছে যেন। কাছে এগোতে বুঝতে পারলাম চাকতি নয়, একটা গোল ঢাকনা। আরও ভালো করে দেখার জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। হাত দিয়ে খানিকটা ধুলো সরাতে সেটার ওপর অসংখ্য ছোটো ছিদ্র চোখে পড়ল। ঘরের মাঝে কেউ যেন ইঞ্চি তিনেক ব্যাসার্ধের একটা গর্ত করে তার ওপর এই ঢাকনাটা বসিয়ে দিয়েছে। একটু ভেবে সেটা সরানোর চেষ্টা করলাম। সহজেই হাতে উঠে এল সেটা, আর আমার চোখের সামনে একটা অন্ধকার গহ্বর উন্মুক্ত হয়ে গেল। টর্চের আলো ফেলে গর্তের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। আলো পড়তেই কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। সেখানটায় কিছু না থাকলেও, গর্তটা মেঝে থেকে কিছুটা নেমে টানেলের মতো একদিকে বাঁক নিয়েছে। মেঝে লক্ষ করে তাকাতে মনে হল, সেটা চলে গেছে যন্ত্রপাতিগুলো যেখানে রাখা আছে, সেদিকে। কী মনে হতে আমি মাথাটা নামিয়ে আনলাম গর্তের মুখটার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। কারণ এইমাত্র একটা অচেনা গন্ধ নাকে এসেছে আমার—খুব ক্ষীণ, তবু বুঝতে পেরেছি সেটা ঝাঁজালো অথচ সুমিষ্ট! এক ঝটকায় মাথা সরিয়ে নিলাম। তাড়াতাড়ি ঢাকনাটা আগের মতো বসিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। গর্তটা ঠিক কী উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল, বুঝতে পারিনি। কিন্তু ওসব আমি আর ভাবলাম না, কারণ আর এক মুহূর্তও এ ঘরে থাকতে ইচ্ছা করছে না আমার।

তবু, ঘর থেকে বেরোনোর আগে মনে হল, কুঠুরিটাও একবার দেখে নিই। জানি কিছু থাকবে না, তা-ও। সেইমতো চেয়ার ও টুল বসিয়ে একটু কসরত করে তার ওপর উঠে দাঁড়ালাম। পাল্লাটার আংটা ধরে একটু টান দিতেই সেটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। জমে-থাকা কবেকার গরম বাতাস আমাকে ছুঁয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সেটা সামলে নিয়ে ভেতরে আলো ফেলতেই চমকে উঠলাম।

ছোটো একটা কুঠুরি। পেছনদিকটা বীভৎসভাবে ঝুল-ময়লায় কালো হয়ে আছে। টর্চের আলোতে ভেতরের জমাট অন্ধকার সামান্যই দূর হতে পেরেছে। কিন্তু আমার চমকে ওঠার কারণ অন্য। সামনেই পড়ে রয়েছে একটা ডায়েরি! হাত বাড়িয়ে সেটা টেনে নিলাম। এমন একটা জায়গায় সেটা কে রেখেছে, কেনই বা রেখেছে—কোনো সদুত্তর খুঁজে পেলাম না। পাল্লাটা বন্ধ করার আগে খেয়াল করলাম, এখানেও একটা বাল্‌ব ঝুলছে, কানেকশন এসেছে দেয়ালের ভেতর দিয়ে। এবং নীচের মতো এখানেও একটা সরু নল এসে যুক্ত করেছে। বাল্‌বটা জ্বলছে না।

ঘরের বাইরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। দরজাটা আর বন্ধ করলাম না। এতে যদি ভেতরের গুমোট ভাব কিছুটা হলেও কাটে। অন্য ঘর দুটো কাল সকালে দেখা যাবে। ডায়েরিটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটা ব্যাপারে খটকা লাগল আমার। ঘরটায় যেন আরও কী একটা অস্বাভাবিক জিনিস চোখে পড়েছে, কী যেন... অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না। যা-ই হোক, ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব না দিয়ে নীচে চলে এলাম। চোখে-মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিতে হবে। মাথাটা ভার ভার লাগছে।

* * * * * * * *

সেইরাতে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। একটা সি-বিচে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। আকাশে গোল থালার মতো চাঁদ। চারপাশ কেমন থমথমে। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এ কী দেখছি আমি! দেখলাম সমুদ্রে জলরাশির চিহ্নমাত্র নেই! বিচটা সমুদ্রের দিকে কিছু দূর প্রসারিত হয়ে নেমে গেছে কোন পাতালের দিকে। তারপর শুধুই অন্ধকার—যত দূর চোখ যায় আদিম আদিগন্ত অন্ধকার। মাটি যেন দু-ফাঁক হয়ে গিলে নিয়েছে সাগরের সমস্ত জলরাশিকে। সেদিক থেকে আসছে না পরিচিত ঢেউ ভাঙার শব্দ কিংবা নোনা বাতাস।

ঠিক এমন সময় শুনতে পেলাম একটা শব্দ, না, ঠিক শব্দ

নয়—একটা ডাক। অমানুষিক গলায় কেউ যেন গর্জন করছে, একটানা, দীর্ঘ ব্যবধানে। আমার সর্বাঙ্গ ভয়ে অবশ হয়ে গেল। ডাকটা আসছে ওই নিকষ অন্ধকারের বুক চিরে। জলহীন ক্রমশ বাড়ছে শব্দটার তীব্রতা। মহাসমুদ্রের কোন অতল গহ্বর থেকে কিছু একটা বা কেউ একটা উঠে আসছে মাটির ওপরে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। অনুভব করলাম, সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। জানালার দিকে চোখ পড়তে চাঁদটাকে দেখতে পেলাম। রুপোলি আলোয় ভেসে যাচ্ছে বাইরেটা। আমি জীবনে এমন দুঃস্বপ্ন দেখিনি। সেই রাতে আর ভালো ঘুম হল না।

* * * * * * * *

পরদিন দুপুরের খাওয়া সেরে গতকাল পাওয়া ডায়েরিটা নিয়ে বসলাম। চামড়ায় বাঁধানো লাল ডায়েরিটা মাঝারি আয়তনের। প্রথম পাতাতেই এর মালিকের নাম লেখা রয়েছে। ভদ্রলোকের নামটা সুপ্রতিমের মুখে আগেই শুনেছিলাম, এখন নিশ্চিত হলাম ডায়েরিটা ওর জেঠুরই।

অন্যের পার্সোনাল ডায়েরি পড়া উচিত হবে কি না একটু ইতস্তত করে, শেষমেশ পড়া আরম্ভ করলাম। রোজনামচাজাতীয় কিছু লেখা নেই সেখানে। ডায়েরির হলুদ হয়ে-যাওয়া পাতাগুলো জুড়ে বিচিত্র সব কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, জটিল ফর্মুলা, অ্যাটমিক স্ট্রাকচার প্রভৃতির বিবরণ রয়েছে। ভাষাটা ইংরেজি হলেও গোপনীয়তার খাতিরে লেখার মধ্যে মধ্যে একটা কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়েছে। সেটা ডিসাইফার করতে পারলাম না। বেশ কিছু পৃষ্ঠায় একটা অচেনা কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের নাম ও সংকেত লাল কালিতে হাইলাইট করা। আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল—কয়েকটা পাতায় লাল কালিতে পেন্টাগ্রাম আঁকা হয়েছে। একজন বৈজ্ঞানিকের ডায়েরিতে এটা কেন রয়েছে, ভেবে পেলাম না।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে ডায়েরির শেষ দুটো পাতা। ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভে অনেকটা বিজ্ঞাপনের প্রোমোশনের ঢঙে কয়েকটা লাইন লেখা আছে সেখানে। শেষের আগের পৃষ্ঠার লেখাটা এইরকম— ''আপনার কি রাতে ভালো ঘুম হয় না? প্রায় দিনই আপনাকে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে বিছানায় যেতে হয়? কিংবা আপনি কি Oneirophobia-তে ভুগছেন? তাহলে এই লেখা আপনার জন্য।

''আমার বাড়ির দোতলার স্টাডিরুমটি হয়ে উঠতে পারে আপনার ঘুমের আদর্শ জায়গা। আমার আবিষ্কৃত 'সম্নোস্কোপ' আপনাকে এনে দিতে পারে আদরের ঘুম। উক্ত ঘরের দরজা ভালোভাবে লক করে, ঘরের সব ক-টি আলো জ্বেলে উক্ত যন্ত্রটি মাথায় লাগিয়ে খাটে শয়ন করলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার চোখে নেমে আসবে শান্তির সুখনিদ্রা। বিনা খরচে, বিনা পরিশ্রমে।"

একদম শেষ পাতাতে যন্ত্রটির একটি স্কেচ, চালু করার পদ্ধতি এবং সেটি ঘরে কোথায় খুঁজলে পাওয়া যাবে, তার নির্দেশ দেওয়া। তার ঠিক নীচে তিনটে বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে বলা হয়েছে—ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করে রাখা, ঘরের সব আলো জ্বলছে কি না নিশ্চিত হওয়া এবং শোয়ার পরে একবারও খাট থেকে না-নামা—এর একটিরও অন্যথায় সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বিফলে যাওয়ার সম্ভাবনা। সবার শেষে ভদ্রলোকের স্বাক্ষর।

ডায়েরি বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম। মনের ভেতর মিশ্র অনুভূতির ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। শেষের লেখাগুলো সত্যি কি না যাচাই করে দেখার উপায় একটাই—নিজের ওপর পরীক্ষা করা। সত্যি বলতে কী, আমি নিজেই অনিদ্রার পেশেন্ট। রাতে ভালো ঘুম হয় না। গতকাল রাতে দেখা দুঃস্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। উফ, হরিব্‌ল। সব মিলিয়ে মনস্থির করলাম, যা করার, আজ রাতেই করব।

কী ভেবে মোবাইলটা তুলে নিয়ে গুগ্‌ল-এ ভদ্রলোকের নাম লিখে সার্চ করতে তাঁর প্রোফাইলটা বের হল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম জায়গাটায়। তাঁর গবেষণাটা ছিল মূলত ঘুম ও স্বপ্ন নিয়ে। এক সময়ের বেশ নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন। অনেকগুলো গ্রন্থও রচনা করেছেন। দেখতে দেখতে একটা জায়গায় এসে থেমে গেলাম। সেখানে লেখা আছে—ছাত্রছাত্রীদের আধিভৌতিক ও অলৌকিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার অভিযোগে কর্মজীবনের মাঝপথে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর থেকেই বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে আসে।

কী মনে হতে আমি আবার সার্চবারে গিয়ে ডায়েরিতে পাওয়া অচেনা কেমিক্যালটার নাম টাইপ করলাম। সঠিকভাবে জিনিসটার কোনো হদিস না মিললেও কয়েকটা সূত্র থেকে মনে হল, সেটা গ্যাসীয় হলেও হতে পারে। বলা বাহুল্য, যন্ত্রটা সম্পর্কেও কোনো তথ্য মিলল না।

আর সময় নষ্ট না করে আমি গাত্রোত্থান করলাম। কয়েকটা দরকারি কাজ এই বেলা সেরে ফেলতে হবে। আজকের রাতটার কথা ভেবে বেশ অ্যাডভেঞ্চার টাইপ ফিলিং হচ্ছে। সঙ্গে এ-ও বুঝতে পারছি, ঘরটা আমাকে টানছে।

* * * * * * * *

আজ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসতেই একটা হুলো বেড়ালকে দেখতে পেলাম। চোখে আলো পড়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সেটা বিরক্ত হয়ে প্যাসেজের অন্ধকার কোনায় সেঁধিয়ে গেল। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্ধকারে মিশে-থাকা গাছপালাগুলোর একটা আউটলাইন চোখে পড়ল। আকাশে চাঁদ থাকলেও সে জায়গাটায় আলো এসে পৌঁছোচ্ছে না।

দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলাম। লক্ষ করলাম আলোর জোর আগের দিনের তুলনায় অনেকটা বেশি। আরও কী একটা যেন বদলে গেছে মনে হওয়ায় চারপাশে তাকাতেই সেটা ধরতে পারলাম। বন্ধ কুঠুরির ভেতরের আলোটা আজ জ্বলছে, পাল্লার নীচের ফাঁকটুকু দিয়ে সেই আলোই আমার চোখে এসে পড়ছে। বাদবাকি সব একই রকম আছে। দরজাটা লক করে টর্চটা টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। আজ আর এটার দরকার পড়বে না। ঘরটা আজ যথেষ্ট আলোকিত হয়েছে।

ডায়েরির নির্দেশমতো ঘরের এককোণে রাখা যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই 'সম্নোস্কোপ' পাওয়া গেল। জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম। দেখতে অনেকটা হেডফোনের মতো। মোটামুটি হালকা, ওয়্যারলেস, রং-পিচব্ল্যাক। ওপরের দিকে দুটো বাটন। একটা বাটন প্রেস করে কয়েক সেকেন্ড ধরে থাকতেই ঠিক তার পাশে একটা নীল আলোকবিন্দু ফুটে উঠল। যাক, মেশিনটা ঠিক আছে তাহলে।

রাত এখন প্রায় ১১টার কাছাকাছি। ডিনার হয়ে গেছে, সুতরাং ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া হাতে আর কাজ নেই আপাতত। যন্ত্রটা যদি সত্যিই কাজ করে, তবে সেটাকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। এখানে পড়ে থাকলে এমনিই নষ্ট হয়ে যাবে।

বিছানাটা ঝাড়তে ঝাড়তে মনে পড়ল, ভদ্রলোক ঠিক এই জায়গাতেই শুয়ে মারা গিয়েছিলেন। শরীরটা শিরশির করলেও সেটা দ্রুত কাটিয়ে উঠে খাটে টানটান হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে আলোর তেজ আর খানিকটা বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে ঘরের তাপমাত্রাও। এই ব্যাপারটা ভেবেই বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। ঘরে একটুও আলো থাকলে আমি ঘুমোতে পারি না। অথচ ডায়েরিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া আছে সব আলো জ্বালিয়ে রাখার। যা-ই হোক, চোখ বন্ধ করে আমি ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম।

বারবার মনে হচ্ছিল, ঘরটায় কোথাও যেন গোলমাল আছে—খুব বড়োসড়ো গোলমাল। আমার মনের মধ্যে কী একটা হিসেব মিলছে না, ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে চলেছে।

কতক্ষণ কেটেছে জানি না। হঠাৎ একটা মিহি শব্দ কানে এল। সেটা আসছে যন্ত্রটার ভেতর থেকে। আমি কানে চেপে ধরে মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম। একটা চাপা খসখস আওয়াজ, যেন কেউ পা ঘষে ঘষে হাঁটছে। কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না আমার। চোখ খুলতেই কিন্তু তীব্র আলোয় চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে গেল। হলুদ আলো আগুনের শিখার মতো গিলে খাচ্ছে সমস্ত ঘরটাকে। ঘরের উষ্ণতাও অস্বাভাবিকরকম বেড়ে গেছে। ওই পুরোনো বাল্‌ব দুটো যে এত আলো বের করতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। আমি দরদর করে ঘামছিলাম। ওদিকে খসখসে আওয়াজটা কিন্তু একনাগাড়ে হয়েই চলেছে। ভীষণ অসহ্য লাগছিল আমার। ধুর, যতসব পাগল বিজ্ঞানী নিয়ে কারবার। মনে হল, এখনই এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই। পরে বুঝেছিলাম, তখন যদি সেটাই করতাম, আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হত।

ঠিক এই সময় সিলিং-এর দিকে চোখ পড়তে চোখ আটকে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিন ঘর থেকে বেরোনোর পর খটকার কারণটা বুঝতে পারলাম। এই ঘরে কোনো ভেন্টিলেটর নেই। শুধু তা-ই নয়, ওই একটি দরজা বাদে বাতাস চলাচলের আর কোনো পথই নেই, অথবা থাকলেও তা আমার অজানা। ব্যাপারটা কাল খেয়াল করলেও পরে মনে পড়েনি। সুতরাং এই মুহূর্তে একটা বন্ধ ঘরে আমি একা শুয়ে আছি।

এর মধ্যে কখন জানি একটা চেনা মিষ্টি গন্ধ আস্তে আস্তে ভরিয়ে তুলছিল ঘরটাকে। চেনা বলছি, কারণ গন্ধটা আমি গতকালই পেয়েছিলাম। সম্ভবত এখনও ঘরের মধ্যিখানের ওই ছিদ্রপথেই আসছে সেটা। কোনো গ্যাস কি? মুহূর্তে মনে পড়ে গেল ডায়েরিতে পাওয়া সেই অচেনা কেমিক্যালটার কথা। আর কোনো সন্দেহ নেই পদার্থটা গ্যাসীয়। কিন্তু কীভাবে তৈরি হচ্ছে গ্যাসটা? ঘরটা আর-একবার ভালো করে লক্ষ করতে বিদ্যুচ্চমকের মতো এতক্ষণ জমে-থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর মাথায় ঝিকিয়ে উঠল। তীব্র আলো, বাল্‌বের সঙ্গে লেগে-থাকা সরু নল, গ্যাস সিলিন্ডার, বায়ুরুদ্ধ ঘর—সব যেন এক সুতোয় গেঁথে যাচ্ছে।

ঘরের আলোগুলো জ্বললে উৎপন্ন তাপ আসলে এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয় ওই নলের মাধ্যমে, আর সেই তাপে কাজ শুরু করে যন্ত্রগুলো। এক নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পৌঁছোলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় ওই গ্যাস। গ্যাসের নির্গমনপথ মেঝের তলা দিয়ে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে একটি গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে ঘরটা। একটু দূরে রাখা মেশিনগুলো

নিজে থেকেই চালু হয়ে গেছে।

হয়তো এই গ্যাসীয় পদার্থটিও ভদ্রলোকের 'আবিষ্কার'। হয়তো এই গ্যাসই শরীরের কোনো ক্ষতি না করে ঘুম নামিয়ে আনবে আমার চোখে। কিন্তু তা-ই যদি হয়, কানে লাগিয়ে-থাকা যন্ত্রটার কাজ কী বুঝতে পারলাম না।

মিষ্টি গন্ধটা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। বোধহয় সেটার প্রভাবেই আমার দেহ-মন অবসন্ন হয়ে আসছে। এক নেশাতুর আবেশ সাপটে ধরেছে আমার চেতনাকে। কানের ভেতর থেকে আওয়াজটা যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে।

হঠাৎ ঘরের ভেতর একটা জোরে খুটখুট শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। শব্দটা অনুসরণ করে তাকাতে যা দেখলাম, তাতে শরীরের সব রক্ত যেন নিমেষে হিম হয়ে গেল। কুঠুরির পাল্লাটা এখন খুলে গেছে। আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে একটা মানুষ... না, ঠিক মানুষ নয়, মানুষের মতো দেখতে একটা প্রাণী! কারণ তার মুখ আর ওপরের অংশ মানবশরীরের মতো হলেও হাত আর পায়ের জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য tentacles—ওহ্ ঈশ্বর! প্রাণীটার দেহের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টাও আমি আর করব না! শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার সামনে কয়েক মিটারের ব্যবধানে থাকা জীবটা কখনোই এ পৃথিবীর নয়, হতে পারে না!

এবার দেয়াল বেয়ে নামতে শুরু করেছে প্রাণীটা। ও আমার দিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে মনে হল, আমার শিরদাঁড়ার নীচে কেউ এক খাবলা বরফকুচি ছড়িয়ে দিয়েছে! এই মুখ আমি আগেও দেখেছি, তবে সামনাসামনি নয়, ছবিতে। আজ দুপুরে ভদ্রলোকের প্রোফাইলে তাঁর ছবির স্থানে এমনই একটা মুখ আমি দেখেছিলাম। নিষ্পলক, শীতল দৃষ্টিতে এখন সেই মুখ চেয়ে আছে আমার দিকে। নিমেষের মধ্যে একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। যে যন্ত্রটা এতক্ষণ পরে আছি, সেটার কাজ আসলে অন্য। কিছুক্ষণ আগে এই ডিভাইস থেকেই সিগন্যাল পাঠিয়ে কোন নরক থেকে কোন অলৌকিক পথে ডেকে এনেছি এই জীবটাকে! অর্থাৎ সাত বছর আগে ডায়েরিতে রেখে-যাওয়া এক মারণ ফাঁদে পা দিয়েছি আমি!

এতক্ষণে প্রাণীটা মেঝে ছুঁয়েছে। জালে জড়িয়ে-যাওয়া শিকারের দিকে মাকড়সা যেভাবে এগিয়ে যায়, তেমনি ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে সে। চলার সময় একটা খসখস আওয়াজ হচ্ছে। এখনও জানি না তার উদ্দেশ্য ঠিক কী, কিন্তু সেটা যে ভালো নয় তা আমি একপ্রকার নিশ্চিত।

এই জীবন্ত(!) বিভীষিকার হাত থেকে পালাতে হবে আমাকে... পালাতেই হবে। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। হাত-পা-সহ আমার সমগ্র দেহটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে! পা নাড়ানোর চেষ্টা করেও কোনো সাড় পাচ্ছিলাম না। প্রাণীটা আরও কাছে চলে এসেছে। আমাকে এখনই কিছু একটা করতে হবে! আমি মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলাম। দেহের সমস্ত জোর একত্রিত করে কান থকে যন্ত্রটা খুলে ছুড়ে মারলাম প্রাণীটার দিকে। বোধহয় সে কিছু আঁচ করেছিল। একটা অমানুষিক গোঙানির মতো চিৎকার করে ও একলাফে ছিটকে এল বিছানার কাছে। ছোড়া জিনিসটা মেঝেতে লেগে ধাতব আওয়াজ করে গড়িয়ে গেল দরজার দিকে।

আমি অসহায়ের মতো পড়ে থাকলাম খাটের ওপরে। দেহে আর একটুও বল পাচ্ছি না। সব অনুভূতিও লোপ পেয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। খুব ঘুম পাচ্ছে। চোখের সামনে হালকা কুয়াশা জমছে। তারই ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম আমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের জায়গাটা ফাঁকা। রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে সেখান দিয়ে, রাঙিয়ে দিচ্ছে বিছানার চাদর। আঙুলসহ একখণ্ড মাংস দাঁতে ছিঁড়ে নিয়েছে প্রাণীটা, তার মুখ নড়ছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু একটুও ব্যথা লাগছিল না আমার। খুব ক্ষীণভাবে মনে হল, প্রাণীটার সম্পূর্ণ মানুষের রূপ ফেরত পেতে গেলে একটা মানবদেহ প্রয়োজন...

শেষবারের মতো চোখের পাতা ভারী হয়ে নেমে আসার আগে ঝাপসা বুঝতে পারলাম, প্রাণীটা কামড় বসানোর জন্য আবার হাঁ করেছে। ওর হাঁ-করা মুখের ভেতরে লম্বা জিভটা কালো রঙের। তার ডগাটা চ্যাপটা হয়ে আচমকা ছুঁচোলো হয়ে গেছে—অনেকটা সাপের ফণার মতো... তারপর আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

* * * * * * * *

সেই রাতে আবার একটা স্বপ্ন দেখলাম। এবার আর দুঃস্বপ্ন নয়। একই সি-বিচে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। আকাশে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বিশ্বচরাচর। সমুদ্র আগের মতোই জলশূন্য। কিন্তু আমার আর একটুও ভয় করল না। আমি পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছি সেদিকে। আর কোনো ডাক ভেসে আসছে না ঠিকই, কিন্তু আমি জানি, ওখান থেকে আমাকে কেউ আহ্বান করছে। অনেকটা যাওয়ার পর একসময় পায়ের তলার মাটি শেষ হয়ে এল। আমি দাঁড়ালাম না। আমার শরীর একটু একটু করে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল।



পুন্নি পুকুর

রাজেশ্বরী সুর



(নলিনী)

পুকুরের পেছনে পুবের আকাশ আরও ফরসা হয়ে আসছে। এবার ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে নলিনীর। এখনও পুন্নি আসছে না কেন, আর দেরি হলে যে বেঘোরে ধরা পড়ে যাবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের ঝোপটা সামান্য নড়ে ওঠে। জমাট অন্ধকারের মধ্যে থেকে পুন্নি এগিয়ে এসে ওর হাতের মুঠোয় গুঁজে দেয় কাগজে মোড়া পুরিয়াটা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পুকুরঘাটের খিড়কি রাস্তা দিয়ে বাড়ি ঢুকে পড়ে নলিনী। ঘরে ব্রজবিহারী ঘুমে এখনও অচৈতন্য। তবে আর খানিকক্ষণের মধ্যেই আস্তে আস্তে জেগে উঠবে গোটা ভটচাজ বাড়ি। আন্দাজে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে ঢকঢকিয়ে কাগজ-মোড়া ওষুধটা গলায় ঢেলে দেয় নলিনী। তারপর আবার শুয়ে পড়ে ব্রজর পাশে। তবে অভ্যাসবশত কান দুটো সজাগ রাখে দরজার দিকে। অনেক সময় এরকম ভোররাতেও দরজায় মৃদু টোকা পড়েছে, কখনও মাঝরাত্তিরে, কখনও ভরদুপুরে। এমনকি মাসের ওই পাঁচ-সাত দিনেও রেহাই মেলেনি। মা গো! এতে বাড়ির রাধামাধব অপবিত্র হন না বুঝি? ঘেন্নায় গা গুলিয়ে ওঠে নলিনীর, মুখে জল কাটতে থাকে। তা-ও চোয়াল শক্ত করে শুয়ে থাকে ভোরের সূর্য ওঠার অপেক্ষায়।

(সুজাতা)

টাইপিং আর শর্টহ্যান্ডের এই সেন্টারটা বাড়ি থেকে একটু দূরে হয় ঠিকই, কিন্তু এখান থেকে কোর্স করে একবার সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে যে-কোনো অফিসে রিসেপশনিস্ট বা সেক্রেটারির চাকরি বাঁধা। সুজাতার এই এক জেদ, কলেজ পাসের পর আগে একটা চাকরি, তারপর বিয়ে। এখন মেয়েদের চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকার দিন শেষ। ওদের ব্যাচেই তো প্রায় জনা কুড়ি মেয়ে আছে। তা ছাড়া মাসিও কিছু বলে না ওকে। মা-বাপ-মরা একমাত্র আদুরে বোনঝি বলে কথা। ছোটোবেলার কথা সেভাবে মনেও নেই সুজাতার। জ্ঞান হবার পর থেকে সবকিছুই মাসি।

আজ ক্লাস শেষ হতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। জুন মাসের দমকা কালবৈশাখী। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়া আর ধুলো। বাসে আজ আর উঠতে পারবে না কিছুতেই। মাসি বাড়িতে চিন্তা করবে। শেডের তলায় দাঁড়িয়ে এবার অধৈর্যভাবে হাতঘড়ি দেখে সুজাতা। তারপরেই পাশে চোখ যেতেই চমকে ওঠে। আরে, এই ছেলেটা এখানেও? দিন দুয়েক সেন্টারেও দেখেছে আশপাশে ঘুরঘুর করতে। ফলো-টলো করছে নাকি? সামান্য বিরক্ত হয় ও। দেখে তো ভদ্র বাড়ির ছেলেই লাগছে। মনস্থির করে নিয়ে কড়া চোখে তাকায় এবার। তাতে ছেলেটা স্পষ্ট নার্ভাস হয় খানিক। খানিকক্ষণ চুলে হাত চালিয়ে শেষমেশ বলে, "ইয়ে, দেখেছেন কী বৃষ্টি? বাড়ি যাওয়া মুশকিল হবে আজ।"

"সে তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আপনি কি আমায় ফলো করছেন নাকি?"

"অ্যাঁ? না না, মানে, বৃষ্টি পড়ছে বলে শেডের তলায়... মানে..."

"তা-ই? আপনার ব্যাগ থেকে ওটা কীসের ডাঁটি উঁকি মারছে? আর আগের দিন সেন্টারে কী করছিলেন? সেদিন তো বৃষ্টি পড়ছিল না। ইয়ারকি পেয়েছেন? দাঁড়ান, পুলিশ ডাকছি।"

"আরে ম্যাডাম! শুনুন শুনুন। আমি চোরছ্যাঁচোড় নই। আগের দিন সেন্টারে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ওখানেই আপনাকে প্রথম দেখি। আর তারপর..."

"তারপর?"

"না মানে, বৃষ্টি তো ধরে এসেছে সামান্য। চলুন, আপনাকে বাস স্ট্যান্ড অবধি এগিয়ে দিই। যেতে যেতে বলছি।"

"বেগরবাই দেখলে কিন্তু..."

"পুলিশ ডাকবেন। জানি। চলুন। লেডিজ ফার্স্ট।"

(নলিনী)

পুন্নির ওষুধটা প্রায় এক হপ্তা হল খেয়েছে, এখনও কাজ হল না কেন? এদিকে ঘেন্নায় যে সারাক্ষণ ওর গা রি রি করছে। কতদিনে দূর হবে এই পেটের পাপ? পুন্নি আগে বলত, "ও কথা বলিসনি ভাই। ভগবানের দান, রাধামাধবের আশীর্বাদ। পাপ কেন হবে?"

"তোর আর কী? দু-দিনের জন্যে বাপের বাড়ি আসিস। আবার কলকাতায় চলে যাবি। আমি তো একা হয়ে যাব।"

"তুই যাস না বাপের বাড়ি? তা ছাড়া আমি আসব তো আবার। তুইও কলকাতায় গেলে আসিস আমার বাড়ি। আর এসব বলিস না। মেনে নে।"

মেনে নিতে হবে? এরপরেও আরও মেনে নিতে হবে নলিনীকে? কোনোরকম খোঁজখবর না নিয়েই বড়োমেয়েকে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে এত দূরে পাঠিয়ে দিল মা-বাবা, মেনে নিয়েছে। বর ভালো করে কথা বলা তো দূর, দিনের পর দিন বিছানায় কাঠের পুতুলের মতো ঘুমোয়, তা-ও মেনে নিয়েছে। শাশুড়ি বহুদিন গত তাই সারাদিন সংসার, সঙ্গে রাধামাধবের সেবার কাজ, সেসব হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। কিন্তু জলখাবার দিতে গিয়ে দেবর হাত চেপে ধরল যেদিন, সেদিন আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। দৌড়ে পালিয়েছে। দুপুরে বাবামশাই আসতেই তাকে পুরোটা খুলে বলেছে। আর অবাক হয়ে দেখেছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ককে কীভাবে বিনা দ্বিধায় "বাচ্চা ছেলে, বোঝে না" বলে চালিয়ে দিয়েছেন বাবা, এমনকি ওর নির্বাক স্বামী ব্রজবিহারীও। বহুবার জিজ্ঞেস করেও উত্তর মেলেনি।

উপরন্তু ফলস্বরূপ পরের দিন দুপুরেই নিস্তব্ধ বাড়িতে দরজা খোলা পেয়ে দেবর শ্যামল নিজের জান্তব প্রতিহিংসা মিটিয়েছে নির্ভয়ে। চাকরবাকররা আদৌ কে কী দেখেছে, ও জানে না। বাবা-ছেলে সেদিন দূরের যজমান বাড়ি গিয়েছিল, ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে নলিনী। কাঁদতে কাঁদতেই চোখের কোণ দিয়ে দেখেছে, ব্রজবিহারী ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে রোজকার মতো ধর্ম আলোচনাসভায়। তা-ও বাবামশাই সান্ত্বনাস্বরূপ এসে মাথায় হাত রাখলেন। তারপরেই একবুক ঘেন্না নিয়ে হতবাক হয়ে নলিনী দেখেছে, দু-বেলা পদাবলি

পাঠ করা, কণ্ঠিধারী বাবামশাইয়ের হাতের সান্ত্বনার ভাষা বদলে গেছে চোখের নিমেষেই।

"তোমার বাবা বিশ ভরি সোনা কম দিয়েছিলেন, বউমা, তার ওপরে এরকম কালো কুচ্ছিত মেয়ে। এই অবস্থায় সেখানে ফিরে গেলে তোমার বাকি দুই বোনের কী হবে বলো তো? ধরে নাও রাধামাধবের সেবা... দেবদাসী বোঝো...?"

এরপর অন্ধকার ক্রমশ ঘিরে ধরেছে বোবা নলিনীকে, দিনরাত আরও ভেসে গেছে ঘেন্নায়। তাই মাসিক বন্ধ হতেই একরকম জোর করেই ওষুধ আনিয়েছে ওর পুকুরঘাটের সই কবিরাজকন্যা পুন্নিকে দিয়ে।

(সুজাতা)

নাহ্, এবারেও হয়েই গেল। বাথরুমে দাঁড়িয়ে নিজের তলপেটে একটা জোরে চিমটি কাটে সুজাতা। তারপর শাওয়ারের তলায় কাঁদতে বসে। খানিক পর আওয়াজ পেয়ে নিখিল আলগোছে দরজা ঠেলে ঢোকে। প্রথমে একটা তোয়ালে নিয়ে যত্ন করে ওর গা-মাথা মুছিয়ে দেয়। তারপর খুব নরম গলায় ডাকে, "কী গো, কান্নাকাটি শুরু করলে আবার?"

"এ মাসেও..."

"তো কী, পরের মাসে ঠিক হবে। ডক্টর সেন তো বলেইছেন, এখনও অনেক সময় আছে আমাদের হাতে।"

"আমি কিন্তু পুজোয় যাব না রিষড়ার বাড়িতে..."

"আরে, ছোটোপিপি বলে অনেক কিছু, ছাড়ো-না। বিয়ের সবে পাঁচ বছর হয়েছে আমাদের সু... এত চিন্তা কোরো না... প্লিজ..."

"আর পাঁচ বছর ধরেই তোমার দুই পিসি মিলে আমায় অপয়া বলে যাচ্ছে, নিখিল। সেই বিয়ের দিন বরযাত্রীর গাড়ি উলটে যাওয়া থেকে, বিয়ের পরের মাসেই তোমার ওইরকম বাস অ্যাক্সিডেন্ট, তার পরের বছরেই তোমার সরকারি চাকরি চলে যাওয়া..."

"আমি কিছু বলেছি তোমায় কোনোদিন? দুজনে মিলে কি এত কিছু পেরিয়ে আসিনি? বাইরের লোক কে কী..."

"তোমার ফ্যামিলির লোক..."

"আর আমি? কেউ নই তোমার? পরের হপ্তাতেই আমরা যাব আবার ক্লিনিকে। আর ফেরার পথে তোমার মাসির বাড়িতে ঘুরে আসব, কেমন? খুশি? এই সু... আজকে কেমন সেই প্রথম দিনের মতো বৃষ্টি হচ্ছে দ্যাখো... আবার পুলিশ ডাকবে নাকি?"

"সবেতে ইয়ারকি তোমার নিখিল, যাও তো, ছাড়ো আমায়..."

স্বামী-স্ত্রী দুজনে খুনশুটিতে মত্ত না থাকলে দেখতে পেত, বাথরুমের দরজার পাশ থেকে একটা কালো ছায়া সাঁত করে সরে গিয়ে অঝোর বৃষ্টির বারান্দায় মিলিয়ে গেল।

(নলিনী)

আজ নলিনী ঠিক করে ফেলেছে, দরজা খুলবে না। তাতে যদি দরজা ভেঙে যায়, যাবে। ও নিজের শোবার ঘর ছেড়ে কোথাও যাবে না। দেখাই যাক, পাশে শোয়া ব্রজবিহারী আজকে কী করে। এ বাড়ির লোকজন কত দূর অমানুষ, তার শেষ ও দেখে ছাড়বে। একমাত্র বন্ধু পুন্নিও ওকে ঠকিয়েছে, আট মাসের ভরাভরতি পোয়াতি পেট ওর এখন। ভেতর ভেতর মরে গিয়ে একবুক ঘেন্না নিয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছে ও। তাতেও কোনো ছাড়ান দেয়নি এই অমানুষগুলো। স্বামীও নির্বিবাদ, যেন ঘরের নির্জীব খাট, আলমারির মতো নলিনীও থাকে এখানে, এই অবধি। শুধু বাড়ির পুরোনো ঝি হরিদাসী তা-ও যত্নআত্তি করে ওর। মাঝেমধ্যে দুধটা, ফলটা তুলে দেয় জোর করে পাতে। মাঝরাতে যথারীতি হালকা টোকা পড়ল। নলিনী শুনেও চুপচাপ শুয়ে রইল। টোকা যখন প্রায় ধাক্কাধাক্কিতে পৌঁছেছে, ব্রজ উঠল। তারপর দরজা খুলে বলল, "আঃ শামু, কী করছিস এত রাতে?"

"বউদি কই?"

"ঘুমোচ্ছে, যা বলার বলিস কাল সকালে।"

"আমার এখনই দরকার।"

"যা বলছি... ওর শরীর ভালো নেই।"

"কী ব্যাপার, আজ এত গলা বেরিয়েছে যে? গৌরদার খবরটা বাবাকে দেব নাকি? রোজ কত ধম্ম আলোচনা হয় তোমাদের, সেটা বলব নাকি? সারা চকবাজার জানে, গৌরকিশোর আর তোমার কী চলে... চলো চলো, সরো দিকি..."

নলিনীর চোখে ততক্ষণে জল বাঁধ ভেঙেছে। শরীরের ওপর শ্যামলের ওঠাপড়া সহ্য করতে করতে শুনল, "হঠাৎ দাদার ওপর এত মন গলেছে দেখছি? তুমি জামাকাপড় খুলে ওর পাশে শুয়ে থাকলেও ও ক্লীবলিঙ্গই থাকবে, বুঝেছ? শুধু

বাবার বিশাল সম্পত্তির লোভে পড়ে আছে এ বাড়িতে। কিন্তু আমার মতো করে কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না... কেউ না... কেউ না...”

(সুজাতা)

ছোটো থেকেই সুজাতা কাঁদে খুব কম। আর মাসি ওকে একঝলক দেখেই বুঝে যায় ওর মন খারাপ। আজকেও পাশে বসেই বলল, “আজ রাতে থাকবি দুজনে আমার কাছে?”

“না মাসি, কাল অফিস দুজনেরই।”

“এত চিন্তা করিস না পাগলি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি তো...”

“আমার সঙ্গে তুমি ও বাড়িতে যাবে মাসি? চলো-না... ক-দিন থেকে আসবে। চলো-না প্লিজ...”

“আরে, জামাই কী ভাববে!”

“কিচ্ছু না। চলো তুমি। একা বাড়ি আঁকড়ে অনেক পড়ে থেকেছ।”

“আরে, থাকি কি আর সাধে... সে অনেক ব্যাপার।”

“তুমি যাচ্ছ, ব্যাস। এক হপ্তার জন্যে গুছিয়ে নাও, আর তোমার সুমতিকে বলে দাও কিছু লাগলে পাশের বাড়ি থেকে আমার ল্যান্ডলাইনে ফোন করে নিতে।”

পরদিন সকালে ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকেই অবশ্য মাসির ভুরু কুঁচকে যায়।

“ফ্রিজ খারাপ নাকি রে তোদের?”

“না তো।”

“কীরকম পচা গন্ধ ছাড়ছে। পাচ্ছিস না?”

“না তো। আচ্ছা শোনো, আমি বেরোই। তুমি রেস্ট নাও। রান্নার লোক আসবে, যা খাবে, তাকে দিয়ে বানিয়ে নিয়ো।”

বিকেলে ফিরে সুজাতা তো হাঁ। পুরো ডাইনিং টেবিল ভরতি নানা লোভনীয় রান্নার পদ। মাসিকেও একটু ক্লান্ত আর শুকনো লাগছে।

“এ কী! তুমি এত রান্না কেন করতে গেলে?”

“নিখিল কোথায়?”

“ফিরবে খানিকক্ষণের মধ্যেই। কেন?”

“তোরা একসঙ্গে ফিরিস না কেন?”

“মানে? আমাদের অফিস তো আলাদা...”

“না, চেষ্টা করবি একসঙ্গে ফেরার কাল থেকে।”

“কেন? কিছু হয়েছে...”

বলতে বলতে কারেন্ট গেল। এখন মাঝে মাঝেই লোডশেডিং-এর বহর চলে কলকাতায়। নতুন কিছু না। তাড়াতাড়ি মোমবাতি জ্বালিয়ে সুজাতা রান্নাঘর থেকে ডাইনিং টেবিলে এসে দেখে মাসি নেই।

“মাসি? কই গেলে?”

সাড়া পায় না। মোমবাতি নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে দ্যাখে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ। চোখ দুটো হালকা লাল।

“কী হল? এখানে কী করছ? কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার বলো তো?”

“তুই যা এখান থেকে, আসছি আমি। নিখিল আসছে, খুলে দে। ঘর থেকে তুলো আর আয়োডিন নিয়ে আয়।”

বলতে বলতেই কলিং বেল বেজে ওঠে। মোমবাতির মৃদু আলোতেও সুজাতা দেখে নিখিলের কপালে জমাট-বাঁধা রক্ত আর প্যান্টের হাঁটুর কাছটা টকটকে লাল। ওর গলা দিয়ে একটা চাপা চিৎকার বেরিয়ে আসে অজান্তেই।

(নলিনী)

দরজা খুলে পুন্নি তো হাঁ। অঝোর বৃষ্টিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে পূর্ণগর্ভা নলিনী। গায়ের শাড়ি জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, পা খালি, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে-মুখে গাঢ় কালির ছাপ।

“তুই? কী করে এলি?... এভাবে? আয় আয়...”

জামাকাপড় ছেড়ে খানিক ধাতস্থ হয়ে নলিনী দুই রক্তচক্ষু তুলে তাকায় সদ্যবিধবা পুন্নির দিকে।

“শেষমেশ তুইও আমায় ঠকালি, পুন্নি? কী ওষুধ দিলি আমায়?”

“আমায় ক্ষমা কর সই। ভগবানের আশীর্বাদকে এভাবে নষ্ট করতে নেই। তোর মধ্যে একটা ওইটুকু প্রাণ... প্রাণ আমরা দিতে পারি না, প্রাণ নেবার আমরা কে?”

এবার খলখল করে বাইরে বাজের আওয়াজ ছাপিয়ে প্রেতিনীর মতো হেসে ওঠে নলিনী—“প্রাণ?? দুটো ইতর জানোয়ার আমায় ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে দিনের পর দিন, পুন্নি! যন্ত্রণায় ছটফট করেছি আমি, নিজের রক্তের মধ্যে শুয়ে! সেটা প্রাণ নয়, সেটা পাপ। আর দেখ, সেই পাপে তুইও বছর না ঘুরতেই বিধবা হলি! কেমন মজা! থাক এবার বাঁজা মেয়েছেলে হয়ে...বেশ হয়েছে! হি হি... বেশ হয়েছে!”

“শোন সই, লক্ষ্মীটি আমার, মাথা ঠান্ডা কর। তুই থাক এখানেই। চল, আমরা দুজনে মিলে মানুষ করি তোর সন্তানকে

তোকে আর কারও কথা শুনতে হবে না। আর ফিরে যেতে হবে না।”

“আমার বাচ্চা তুই পালবি কেন? এই সুযোগে নিজের বাঁজা নাম ঘোচাবি বলে? সে আমি হতে দেব না, মনে রাখিস। এই বাচ্চাকে আমি নিজের হাতে শেষ করে যাব। তারপর মরতে হয় মরব, পরোয়া নেই। ভটচাজ বাড়িকে নির্বংশ করে তবে ছাড়ব।

“নিজের বাচ্চাকে তুই নিজের হাতে...”

“বাচ্চা নয়, পাপ! পাপ! ঘেন্না! মা গো! ওয়াক...”

হড়হড় করে বমি করে দেয় নলিনী মেঝের ওপরেই। তারপর বমির দমকের মধ্যেই চিৎকার করে ওঠে। ওর উরু বেয়ে নামতে থাকে রক্ত সমেত গর্ভজল। মুহূর্তখানেক হতভম্ব হয়ে যায় পুন্নি, তারপর ছুটে নিয়ে আসে কিছুটা নরম কাপড়। খুব আস্তে আস্তে শুইয়ে দেয় সইকে মাটিতে। খানিকক্ষণের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় ফুটফুটে মেয়ে। তাড়াতাড়ি আরও নরম কাপড় আনতে যায় পুন্নি আর গরম জল আনতে বলে চাকরকে। ফিরে এসে দ্যাখে মেঝে ফাঁকা, কেউ নেই। মেঝেতে রক্ত-মাখা পায়ের ছাপ দেখে শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যায় পুন্নির। তারপর কী শুনতে পেয়ে দুড়দাড়িয়ে ছাদে ছোটে। ন্যাড়া ছাদের একদম ধারে ক্রন্দনরত নবজাতিকাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে নলিনী। পুন্নির পায়ের আওয়াজ শুনেই পেছন ফিরে গর্জে ওঠে, চোখ দুটো ধকধকিয়ে জ্বলছে।

“কাছে আসবি না পুন্নি, ছুঁবি না আমায়। আমাদের সই পাতানোর দিব্যি দিলুম তোকে। পুণ্যিপুকুরের দিব্যি।”

“আমি তোর পায়ে পড়ি, সই, ওইটুকু বাচ্চাকে মারিস না। সরে আয় এদিকে লক্ষ্মীটি। দয়া কর আমায়।”

“আমায় করেছিলি তুই দয়া? সবাই মিলে আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছিল যখন, তখন সোয়ামির সোহাগে মজে ছিলি। একবারও খবর নিয়েছিলি আমার? দূর হ তুই, দূর হয়ে যা। কাছে আসবি না। যা বলছি...”

“সরে আয় বলছি, তোকে আর ফিরতে হবে না ওখানে। এখানে থাকবি, আমার কাছে। সরে আয়... আয়...”

বলতে বলতে পুন্নি এক হাতে বাচ্চার পা, আরেক হাতে নলিনীর আঁচল ধরতে যায়। এক ঝটকা মারে নলিনী, আর পিছল ছাদে টাল সামলাতে না পেরে সোজা নীচে পড়ে যায়। হতভম্ব পুন্নি এক হাতে রক্ত-মাখা শাড়ির টুকরো, আর অন্য হাতে ওলটানো সদ্যোজাতিকার পায়ের গোছ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রস্তরবৎ। আর কান-ফাটানো বাজের আওয়াজে দিগন্ত তোলপাড় করে আরেক প্রস্থ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে পুরোনো কলকাতার বুকে।

(সুজাতা)

“তুমি এখানেই থেকে যাও মাসি। আমি আর ক-দিন পরেই অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নেব, অনেক ছুটি পড়ে আছে। নিখিল বেরিয়ে গেলে আমি তো একা, বলো...”

“তার চেয়ে বরং দুজনেই আমার কাছে চল।”

“নিখিলের মা-বাবা আসবে সামনের মাসেই, আবার ফিরতে হবে। তুমি থেকে যাও প্লিজ। আর আজকেই আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবে। যেদিন থেকে এসেছ, তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে আরও।”

“আমার চিন্তা করিস না মা, নিখিলকে চোখে চোখে রাখ...”

“হ্যাঁ আগের দিন সেই স্কুটারে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে ফিরল অফিস থেকে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম খুব। আমি বোধহয় সত্যি অপয়া, জানো?”

“এসব একদম ভাববি না এই অবস্থায়। বুঝলি? তোর ভেতরে যে তিলে তিলে বেড়ে উঠছে, সে এখন তোর সবকিছু। আমরা সবাই মিলে তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব, তোর কিচ্ছু হবে না। আমি আছি তো।”

“রাতে তুমি আজকে আমার কাছে থাকো মাসি, কেন জানি বড্ড ভয় করে।”

“দুর পাগলি! এখন শো দিকি চুপচাপ। আমি পাশের ঘরেই আছি। জামাই বেচারা কতক্ষণ ধরে বাইরের ঘরে পায়চারি খাচ্ছে।”

সেরাতে সুজাতার ঘুম ভেঙে যায় অস্বস্তিতে। ড. সেন বলেছেন প্রথম তিন মাস খুব সাবধানে থাকতে, তাই বিছানা থেকে পা টিপে টিপে নামে। বাইরে আজ কাকজ্যোৎস্না, ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। বাথরুম ঘুরে এসে শুতে যাবে, দ্যাখে, নিখিল উঠে খাটের ওপর চুপচাপ বসে আছে। কী হল আবার? খারাপ স্বপ্ন-টপ্ন দেখল নাকি? কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকে, “কী হয়েছে নিখিল?... নিখিল?... এই শুনছ...”

উত্তরে এবার নিখিলের গলা দিয়ে একটা বিজাতীয় জান্তব আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

“আজ তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না! তোকে তোর

পেটের বাচ্চা সমেত গলা টিপে মারব, নির্বংশ হবি...”

বলেই খাট থেকে লাফিয়ে উঠে তড়িৎ গতিতে নিখিল দানবীয় শক্তিতে দু-হাতে সুজাতার গলা টিপে মেঝেতে ঠেসে ধরে। নিশ্বাস নেবার জন্য প্রথমে চার হাত-পা দাপায় সুজাতা। তারপর আস্তে আস্তে ওর চারদিক অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। নিখিলের হাত দুটো কী ঠান্ডা! হঠাত শুনতে পায়, সজোরে কিছু একটা বলতে বলতে মাসি ঘরে ঢুকছে। ঢুকেই আলো জ্বালিয়ে নিখিলকে লক্ষ্য করে কিছু একটা ছুড়ে মারে। একটা পাশবিক চিৎকার সমেত সুজাতাকে ছেড়ে নিখিল ছটফট করে ওঠে। এবার সমস্ত বাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। ধীরে ধীরে নিখিলের দেহ থেকে কিছু একটা বেরিয়ে বাইরের চাঁদের আলোয় ছায়ায় ঘুরপাক খেতে থাকে ঘরে। তারপর সুজাতার তলপেটের ওপর এসে স্থির হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মেঝেতে অচেতন। কালো ছায়াটা এবার বিশাল বড়ো হতে হতে ঘরের সিলিং ছুঁয়ে ফেলে। মাসি প্রাণপণ চিৎকার করে ওঠে, “ও তোর নিজের মেয়ে, নলিনী, তোর নিজের রক্তমাংসে গড়া একটা প্রাণ। ওকে ছেড়ে দে, ও মা হবে।”

মেঝের ওপর অচৈতন্য নিখিলের গলায় সেই চেনা খলখল জান্তব হাসি—“প্রাণ! আবার ওইসব শুরু করলি পুন্নি? তোর মুখে মানায় সেসব কথা? নাকি মা হবার শখ মেটেনি এখনও? ভটচাজ বংশকে শেষ করেই কিন্তু তোর পালা, মনে রাখিস। তোর ওই বুড়ো কোবরেজ বাপের জড়িবুটি ঝেড়ে আর ক-দিন আমায় ঠেকিয়ে রাখবি? হি হি... দেখ, কী করি তোদের সব ক-টাকে...”

কথা শেষ হবার আগেই আবার রক্ত-জল-করা চিৎকার আসে ছায়ার দিক থেকে। পুন্নি হাতের কাঁসার ঘটি থেকে কিছু একটা নিয়ে ছড়াতে থাকে সারা ঘরে, মূর্ছিত নিখিল-সুজাতার গায়ে...

অলৌকিক ছায়া এবার ছটফটিয়ে ওঠে।

“আহ্... আহ্... কী এটা?”

“আদিগঙ্গা মজে গিয়ে যে পুণ্যিপুকুর, যার ছায়া-মাখা ঘাটে বসে আমরা দুজন গল্প করেছি, সই পাতিয়েছি দিনের পর দিন, তার জল। তুই একটা আপাদমস্তক ঘেন্নায় গড়া ছায়া, নলিনী, আর কিছুই না। একমাত্র ভালোবাসাই তোর শত্তুর। তুই বেঁচে থাকতে তোকে যত ভালোবেসেছিলাম, এতদিন যত ভালোবেসেছি তোর মেয়েকে, তার অনাগত সন্তানকে, সব মিশে গেছে এই জলে। তাই তোর গা পুড়ে যাচ্ছে। তুই পুড়ে যা, নলিনী, ভালোবাসার আগুনে পুড়ে যাওয়াই সব ঘেন্নার নিয়তি, পুড়ে যা তুই... পুড়ে যা... পুড়ে যা...”

ছায়া ছোটো হতে হতে মিলিয়ে যায় এবার। স্নিগ্ধ চাঁদের নরম আলোয় ভেসে যায় ঘর। এবার হাঁপাতে হাঁপাতে খাট ধরে মেঝেতে বসে পড়ে কম্পিত পুন্নি।

(শেষটুকু)

“যাদের পিণ্ডদান করতে চান, তাদের নাম এই কাগজে লিখুন মা।”

“নিখিল, একটু ধরো প্লিজ তিন্নিকে। এত বড়ো নদী প্রথমবার দেখে হাঁ হয়ে গেছে তোমার মেয়ে।”

সাদা কাগজে গোটা গোটা করে পাশাপাশি দুটো নাম লেখে সুজাতা। নলিনী ভট্টাচার্য, পূর্ণিমা কবিরাজ। তারপর ঠাকুরমশাইকে কাগজটা দেয়।

“গোত্রটা লিখে দিন মা। এঁরা কি একই গোত্রের? কোনো সম্পর্ক আছে কি? তাহলে একবারেই পুজো হয়ে যাবে।”

“পুণ্যিপুকুর। ওটাই দুজনের গোত্র। লিখে নিন।”



নিখুঁত একটি দেহ

সৌম্য সাহা



সাত্যকির জ্ঞান যখন ফিরল, তখনও একটানা যান্ত্রিক শব্দ করে চলেছে গাড়ির ইনডিকেটর। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়েই মাথার যন্ত্রণাটা টের পেল সে। ও যে বেঁচে আছে, এটাই আশ্চর্যের। এয়ারব্যাগ... গাড়ির এয়ারব্যাগ সময়মতো খুলে যাওয়াতে বড়োরকম আঘাত লাগেনি ওর।

কোনোরকমে বেলুনের মতো ফোলা এয়ারব্যাগ কাটিয়ে গাড়ির দরজা খুলল সাত্যকি। সিট বেল্ট খুলে দরজার বাইরে পা ঝুলিয়ে দিল। ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে ওর মুখে। খানিকটা সুস্থ বোধ হল। কপালের একটু ওপরে চুলের ভাঁজে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারল, কেটে গেছে।

আচমকা ধাক্কা লাগাতে সিট থেকে বেশ খানিকটা লাফিয়ে উঠেছিল ওর শরীর, তখনই মাথাটা গাড়ির ছাদে লেগে থাকতে পারে। এ ছাড়াও গিয়ারবক্সের পাশে আর স্টিয়ারিং-এর তলায় ধাক্কা লাগার জন্য বেকায়দায় কনুই ও হাঁটুতে চোট লেগেছে।

হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দু-হাতের তালুতে মাথাটা রেখে খানিকক্ষণ ঝুঁকে বসে থাকল সাত্যকি। কিছুটা ধাতস্থ হতেই চিন্তাটা মাথায় এল—ও কি সত্যিই চাপা দিয়েছে কোনো পশুকে? কথাটা মাথায় আসতেই গাড়ি থেকে নামল সাত্যকি। ধীরে ধীরে গাড়ির জানলা ধরে সামনের দিকে এগোতে থাকল।

ওর স্পষ্ট মনে আছে, রাস্তার বাঁদিকের ঝোপ থেকে ছুটে এসেছিল একটা আবছায়া শরীর... তখন ওর গাড়ির স্পিডও বেশি ছিল না। ও ভেবেছিল, কোনো জানোয়ার হয়তো দৌড়ে রাস্তা ক্রস করতে যাচ্ছে, তাই ব্রেক কষে নিজের বাঁদিকেই স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। রাস্তার ধারের মাইলস্টোনে ধাক্কা লাগে। আর গাড়ির থেকে দূরত্ব এতটাই কম ছিল যে, প্রাণীটার চাপা পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এখনও হয়তো মাইলস্টোন আর গাড়ির মাঝে ওটার পিষে-যাওয়া মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যাবে।

আজ পূর্ণিমা। তবে আকাশে মেঘ আছে, মেঘ সরে গেলে খানিকটা চাঁদের আলো হয়তো পাওয়া যেত। সাত্যকির পকেটে

মোবাইল নেই। গাড়ির ড্যাশ বোর্ডে রাখা ছিল, অ্যাক্সিডেন্টের সময় ছিটকে গিয়ে থাকবে। তাই আলো জ্বালানোর কোনো উপায় নেই। কেবলমাত্র ইনডিকেটরের একঘেয়ে হলুদ আলো জ্বলছে আর নিভছে। যেন জঙ্গুলে রাস্তার অন্ধকারের কাছে সে একটা উপহাসের বিষয়। গাড়ির বাঁদিকের হেডলাইট পুরোপুরি ভেঙে গেছে। ডানদিকেরটাও অন্ধকার। দুটো ছোটো ছোটো এক্সট্রা লাইট রয়েছে, সেগুলোই জ্বলছে। সেই কৃত্রিম আলোর মেলবন্ধনে গাড়ির তোবড়ানো বনেট আর ভাঙা মাইলস্টোনের ফাঁকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সাত্যকি... একটা হাত! মানুষের হাত! একটা মানুষের হাত বেরিয়ে আছে সামনের চাকার পাশ দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত একটা মানুষকে চাপা দিয়ে মারল ও! কিন্তু সাত্যকি হলফ করে বলতে পারে—যে প্রাণীটা ওর গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেটা কখনোই স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে না। কিন্তু যার হাত বেরিয়ে আছে গাড়ির তলা থেকে, সেটাও তো কোনও পশুর হাত নয়... খুব ভালো করে বোঝা না গেলেও তাতে পাঁচ আঙুলের আভাস স্পষ্ট। আচ্ছা, লোকটা কি বেঁচে আছে?

সাত্যকি পাল্‌স দেখার জন্য একটু ঝুঁকে হাত বাড়াল... কবজি স্পর্শ করতেই ওর আঙুলে মৃদু স্পন্দন অনুভব করল। অর্থাৎ লোকটা বেঁচে আছে! কিন্তু বেঁচে থাকলেও নিশ্চয়ই গুরুতরভাবে জখম হয়েছে।

এতক্ষণ অন্য কোনো গাড়ি বা মালবাহী ট্রাকও যায়নি এই রাস্তায়, আর এত রাতে এই অরণ্য-ঘেরা রাস্তায় কোনো সাহায্যের আশা করাও বোকামো। তাই লোকটার প্রাণের আশা থাকলেও সেটা যে খুব ক্ষীণ, সেটা সাত্যকি বুঝতেই পেরেছে। কিন্তু এভাবে তো লোকটাকে ফেলেও রাখা যায় না।

নীচু হয়ে বেড়িয়ে থাকা থাকা হাতটা ধরে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে টানতে লাগল সাত্যকি। লোকটার শরীর বেশ ভারী, সাত্যকি নিজেও মানসিকভাবে বেশ দুর্বল। তবুও সমস্ত শক্তি এক করে হ্যাঁচকা টানতেই শরীরটা সড়সড় করে বেরিয়ে এল গাড়ির তলা থেকে।

সাত্যকি হাঁপিয়ে উঠেছিল। চোখ বন্ধ করে রাস্তার ওপর বসে জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস নিল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে শরীরটা যেখানে পড়েছিল, সেদিকে তাকাল। তাকাতেই বুঝতে পারল, কত বড়ো ভুল সে করে ফেলেছে...

গাড়ির ইন্ডিকেটরের হলুদ আলোর বৃত্ত ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তার ওপর। আর সেই আলোয় দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির তলা থেকে টেনে-আনা মৃতপ্রায় শরীরটা...

না, ঠিক দাঁড়িয়ে নেই... বলা ভালো, দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে দেহটাকে তুলে ধরেছে সে... ঠিক যেমন করে কোনো দু-পাবিহীন ভিখিরি হাতের ওপর ভর দিয়ে শরীর টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এটা কী করে সম্ভব... তবে কি গাড়ির চাকায় ওর পা দুটো কেটে গেছে? কিন্তু তাহলে তো রক্তের চিহ্ন থাকবে... কই, ওর শরীর থেকে তো রক্ত পড়েছে না?

আর বেশি কিছু ভাবতে হল না সাত্যকিকে। বিস্ফারিত চোখে ও দেখতে পেল, হাতের ওপর ভর করে আস্তে আস্তে প্রাণীটা ওর দিকেই আসছে... ইনডিকেটরের আলোয় ক্রমশ অপার্থিব প্রাণীটার সিল্যুয়েট বড়ো হচ্ছে... সাত্যকি পালাচ্ছে না কেন? ওর উচিত এক্ষুনি ছুটে পালানো... কিন্তু ওর চোখ আটকে গেছে প্রাণীটার কাঁধের ওপর... সেখানে মাথা নেই...

তার বদলে আছে একদলা মাংসপিণ্ডের মতো কিছু একটা... আর তার ঠিক মাঝখানে আছে একজোড়া বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখ... যেন দুর্ঘটনার স্পট থেকে উঠে এসেছে বীভৎসভাবে বিকৃত কোনো মানুষের মৃতদেহ!

তবে সেই চোখে নৃশংসতার চিহ্নমাত্র নেই... রয়েছে... কিছু খুঁজে পাওয়ার উল্লাস... কী খুঁজে পেয়েছে সে?...

* * * * * * * *

গল্পটা এখানেই থেমে গেল, তার বদলে হেডফোনে ভেসে এল গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ, শোনা গেল একটা সতর্কবার্তা—

"বিধিসম্মত সতর্কীকরণ! কোনোরকম অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এতক্ষণ যা শুনছিলেন, তাতে বর্ণিত চরিত্রের নামের সঙ্গে জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তির নামের মিল থাকলে সেটি সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয়। গল্পে বর্ণিত স্থান, কাল, পাত্র সবকিছুই লেখকের কল্পনাপ্রসূত। প্লট তৈরির খাতিরে কিছু কিছু জায়গার আসল নাম ব্যবহার করা হয়েছে, বাস্তবে সেই সমস্ত জায়গার সঙ্গে অলৌকিক কোনো কিছুই জড়িয়ে নেই। আশা করি, শ্রোতারা খোলা মনে আমাদের উপস্থাপনাটি গ্রহণ করবেন।"

এই সর্তকবার্তার পর অনলাইন রেডিয়ো চ্যানেলে শুরু হল আবহসংগীত—রহস্যময় গিটারের টুংটাং। গিটার স্ট্রিং-এ এলোমেলো আঙুল চলছে, আর অন্য হাতে তারের বাঁধন ক্রমশ আলগা করে দেওয়া হচ্ছে, বেসুরো সুর ঠিক লয়ে পড়ে তৈরি করছে ঘুম ভাঙার শব্দ। অবশেষে সেই ঘোর-লাগানো সুর মিলিয়ে গেল এক অলৌকিক দীর্ঘশ্বাসের শব্দে... হালকা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুরু হয়েছে এবার, আর

তার সঙ্গে এক তরুণ, পুরুষকণ্ঠ। রেডিয়ো জকির সতর্ক কণ্ঠস্বর— "নমস্কার, আমি করঞ্জাক্ষ। প্রতিরাতের মতো আমি চলে এসেছি নতুন এক রোমহর্ষক গল্প, ক্ষমা করবেন, এক রোমহর্ষক ঘটনা নিয়ে, যার কিছুটা এইমাত্র শোনালাম আপনাদের। তবে বিশ্বাস করুন, এখানেই কিন্তু শেষ নয় ঘটনাটা, আসলে শেষ বলে কিছু কি আছে?... নাকি যা ঘটে চলেছে তা পর্যায়ক্রমে ঘটেই চলবে... আর সেই সঙ্গে আবর্তিত হতে থাকব আমরাও...

"যাক গে, আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আজ রাতের অপবিত্র আলোচনায় ফিরে যাই। আমাদের পৃথিবীতে এমন কিছু আছে, যাদের আমরা লৌকিক বা অলৌকিকের মধ্যে ফেলতে পারি না... এমন কিছু সত্তা, যাদের উৎপত্তি ঠিক কোথায়, সেটাও সঠিকভাবে বলতে আমরা অপারগ। অথচ তারা আছে, তাদেরই কেউ কেউ হয়তো ভাগ বসিয়েছে আমাদের বাস্তুতন্ত্রে।

"মাঝেমধ্যে সেই সমস্ত অপবিত্র সত্তা হানা দেয় আমাদের সহজ সরল জীবনে... এদের উদ্দেশ্য যে কী তা আমরা জানি না, তবে বিশ্বাস করুন, এদের মুখোমুখি হওয়ার থেকে স্বয়ং শয়তানের সম্মুখীন হওয়াও বোধহয় ভালো... তাই আমার অনুরোধ, আজকের প্রোগ্রামের পুরোটা শুনবেন... আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব এইসব এনটিটির সম্বন্ধে আপনাদের অবগত করতে এবং কী করে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়, সেটাও বলে দিতে... অতএব সঙ্গে থাকুন..."

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ, এরপর শুরু হল মন-কেমন-করা ভায়োলিনের সুর... সেই সঙ্গে করঞ্জাক্ষর রহস্যময় কণ্ঠস্বর—

"যাঁরা শহরে বাস করেন অথবা যাঁরা শহরতলির নিরুত্তাপ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে অক্সিজেন হয়ে ওঠে এক টুকরো সবুজ... তাই সামান্য ছুটিছাটা পেলেই অনেকেই পাড়ি জমান এ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের মালভূমি অধ্যুষিত মিশ্র অরণ্যের উদ্দেশে।

"কিংবা যে সমস্ত তরুণ-তরুণীর শিরায় শিরায় বইছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, তারা মাঝে মাঝে আউটিং-এর জন্য ছুটে যায় 'অ্যারিজোনা'র খোঁজে... না, আমি কোনো ভ্রমণকাহিনি শোনাতে আসিনি আপনাদের। এসেছি আপনাদের সা-ব-ধা-ন ক-র-তে... বেশ কিছুদিন হল ফাঁকা হাইওয়ের আশপাশে এক নাম-না-জানা অস্তিত্বকে বিচরণ করতে দেখা গেছে। বিশেষ করে যদি সেই হাইওয়ের কোনো অংশ বিক্ষিপ্ত পর্ণমোচী অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যায়।

"এখন, কেবলমাত্র এইরকম বিশেষ জায়গাতেই এই সত্তার দেখা কেন পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে কোনোরকম তথ্য আমরা দিতে পারব না। এমনকি অন্য কোনো জায়গায় দেখা গেছে কি না, সে বিষয়ে কোনো রেকর্ডও নেই আমাদের কাছে। তাই আপাতত রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের ওই মালভূমি অঞ্চলটিকেই উক্ত সত্তার 'habitat' ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই এলাকার সর্বত্রই যে তার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে এমনটা নয়। জনবসতি যেসব এলাকায় আছে, সেখানে এরা হানা দেয় না। তবে রাতবিরেতে একাকী ভ্রমণকারী অথবা হাইওয়ে ধরে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ঘরছাড়া কোনো বেপরোয়া ড্রাইভার হয়ে ওঠে এদের পছন্দের শিকার!

"ঠিক যেমন আমাদের আজকের গল্পের প্রোটাগনিস্ট 'সাত্যকি বোস' ওই সত্তার কবলে পড়েছেন। এদের actually দেখতে কেমন, সেটাও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে, এদের অ্যাপিয়ারেন্স বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম হতে পারে এবং পুরোটাই নির্ভর করছে, তারা কীরকম দেহে আশ্রয় নিচ্ছে তার ওপর। না না, যা ভাবছেন তা নয়, এরা কোনো প্যারাসাইট বা মানুষের ঘাড়ে চাপা সাদামাটা বিদেহী নয়। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও সরল প্রকৃতির অপসত্তা... এদের একমাত্র উদ্দেশ্য একটা স্বাভাবিক আশ্রয়ের খোঁজ করা। তবে বিশ্বাস করুন, এদের থেকে দূরে থাকাই ভালো। কেন? শুনতে হলে সঙ্গে থাকুন। কথা দিচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর।"

মোবাইলের ভলিউম কিছুটা কমিয়ে দিল প্রদ্যুম্ন। এখন একটা বিজ্ঞাপন শুরু হয়েছে—সায়েন্স ফিকশন জঁরের ওপর একজন আনকোরা লেখকের বই প্রকাশিত হয়েছে, তারই প্রচার চলছে। এই অনলাইন রেডিয়ো চ্যানেলটার সন্ধান সে পেয়েছে এই মাস তিনেক হল। ফেসবুকে একটা ভৌতিক সাহিত্যচর্চার গ্রুপে একজন পোস্ট করেছিল লিংকটা। সেখান থেকেই শোনা শুরু। প্রথম প্রথম যে গল্পগুলো পাঠ করা হত, সেগুলো বেশ নভিস বলে মনে হত প্রদ্যুম্নর কাছে। বিশেষ করে একটা গল্প শুনেছিল... কী যেন নাম... হ্যাঁ, মনে পড়েছে... 'সে খাবার খেতে আসে'।

ওই গল্পে বলা হয়েছিল, এমন কিছু সত্তা যারা, কোথাও ফেলে-রাখা খাবার বা খাবারের অবশিষ্টাংশের গন্ধে হানা দেয় বাড়িতে বাড়িতে... কিন্তু তাদের খিদে সহজে মেটে না... ফলে আশপাশে থাকা একাকী মানুষ হয়ে ওঠে তাদের শিকার... এইরকমই কিছু একটা ছিল গল্পের বিষয়বস্তু।

যা-ই হোক, প্লট খানিকটা প্রেডিক্টেবল হলেও, গল্প সাজানোয় বেশ মুনশিয়ানা দেখিয়েছিল করঞ্জাক্ষ। এমনভাবে অডিয়ো

রূপান্তর করেছিল, যেন সে কোনো গোপন সংবাদ পাঠ করে শোনাচ্ছে, যেন এই ক-দিন আগেই ঘটে গেছে ঘটনাটা। সেজন্য কমেন্ট সেকশনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল প্রদ্যুম্ন।

তবে আজকের গল্পে এক অভিনব বিষয় তুলে ধরেছে করঞ্জাক্ষ—এমন এক 'entity' যে কিনা হাইওয়ের আশপাশে বিচরণ করে এবং আক্রমণ করে গাড়ির ড্রাইভার বা কোনো একাকী পথিকদের... তবে এরা কোনো প্যারাসাইট নয়, শুধুমাত্র আশ্রয়ের সন্ধান করে। বেশ ইন্টারেস্টিং স্টোরিলাইন।

আর শ্রোতারা অডিয়ো স্টোরির প্রতি সব থেকে বেশি আকর্ষণ অনুভব করে, যখন তারা গল্পের বিবরণের সঙ্গে তাদের পারিপার্শ্বিক মিল খুঁজে পায়। প্রদ্যুম্নর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। এই মুহূর্তে সে রয়েছে শহরের কোলাহল থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার দূরে শাল, পলাশে ঘেরা এক নির্জন কটেজে।

প্রদ্যুম্ন রায়, এক নামি নিউজ চ্যানেলের অ্যাঙ্কার আর সেই সঙ্গে ওই চ্যানেলের পক্ষ থেকে পাবলিশ-হওয়া একটা পপুলার ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। দিনকয়েকের ছুটিতে বেরিয়ে পড়েছে লেখালেখির কনটেন্টের সন্ধানে। প্রতিবারের মতো এবারেও সফরসঙ্গী ওর প্রিয় মারুতি সুজুকি অল্টো। অবশ্য এবারের প্ল্যান ছিল অন্যরকম। ও ঠিক করেছিল, সোজা চলে যাবে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে ঝাড়খণ্ডের কোনো অভয়ারণ্যে, সবুজের মাঝে কাটিয়ে আসবে ক-টা দিন। সেইমতো, গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সে। রাত্রিকালীন ভ্রমণ ওর কাছে নেশার মতো। এবারেও তার অন্যথা হয়নি।

কিন্তু সব পরিকল্পনাই আচমকা বদলে ফেলতে হয়। এনএইচ-১৪ ধরে আসার সময় জানতে পারে, কন্সট্রাকশনের জন্য সীমান্ত পার করার রাস্তা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওকে যদি যেতেই হয় তবে, প্রায় চোদ্দো কিলোমিটার পিছনে গিয়ে ঘুরপথে অন্য রাস্তা ধরতে হবে। তা-ও প্রায় এক ঘণ্টার ব্যাপার, রাতও হয়েছে।

তাই প্রদ্যুম্ন ঠিক করে, এখানেই কাছাকাছি যদি কোনো ফরেস্ট বাংলো কিংবা হোটেল পাওয়া যায়, তবে সেখানেই রাত কাটিয়ে পরের দিন আবার পথে বেরোবে। সেইমতো আশপাশের ধাবাগুলোতে খোঁজ করতেই এই কটেজটার সন্ধান পায় প্রদ্যুম্ন। অবশ্য এখনও এই জায়গাটা অফিসিয়ালি চালু করা হয়নি। আপাতত দুটো কটেজ এবং অদূরে দু-একটা ছোটো ঘর রয়েছে, সেগুলো সম্ভবত বাবুর্চি আর কাজের লোকেদের জন্য। দ্বিতীয় কটেজটা সম্ভবত ফাঁকা।

নতুন তৈরি হলেও এখানকার ব্যবস্থায় কোনো খামতি নেই। সুসজ্জিত ঘর, সময়ে ডিনারও দিয়ে গেছে... তা ছাড়া কেয়ারটেকার ছেলেটিও বেশ কাজের। বলে গেছে, রাত্রে কোনো দরকার পড়লে রিসেপশনের নম্বরে কল করতে... কাউন্টারের পাশের একটা ঘরেই থাকে... সুতরাং কোনো অসুবিধা নেই।

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে রেডিয়োর প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, খেয়াল নেই প্রদ্যুম্নর। ভলিউমটা বাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল ও। মোবাইলের স্পিকার থেকে ভেসে আসছে করঞ্জাক্ষর গলা...

"...বিগত কয়েকদিন ধরে বেশ কিছু অস্বাভাবিক পথদুর্ঘটনার খবর আসে আমাদের কাছে। কিন্তু দুর্ঘটনার স্পটে ভিকটিমের সম্পূর্ণ মৃতদেহ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কখনও তাদের হাত কিংবা পা অথবা বিকৃত মাথা প্রভৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু ভিকটিমের 'ধড়'-এর চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি।

"উপরি-উক্ত ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিচিত এক প্যারানর্ম্যাল ইন্সটিটিউট তদন্ত শুরু করে। তাঁদের গবেষণায় উঠে আসে একটা রহস্যময় অস্তিত্বের কথা। যার কথা আপনারা শুনে এসেছেন বিরতির আগে পর্যন্ত। এবার ওই সত্তার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

"গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, জীবন্ত প্রাণীদেহের ওপর এরা আক্রমণ করে না। এমনকি একাধিক জীবন্ত মানুষের বসবাস যেখানে, সেখান থেকে এরা দূরে থাকতেই পছন্দ করে। এদের প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের মৃতদেহ।

"সম্ভবত এরা মানুষের মৃতদেহকে 'আশ্রয় প্রদানকারী খোলস'-এর মতো ব্যবহার করে থাকে—অনেকটা 'সন্ন্যাসী কাঁকড়া'দের শামুক বা ঝিনুকের শেল ব্যবহার করার মতো।

"তাই মানুষের মৃতদেহ পাওয়ার জন্য এরা এক অভিনব পথ আবিষ্কার করেছে—হাইওয়ে দিয়ে ছুটে-চলা কোনো গাড়ির ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পার করে, যার ফলে গাড়ির ড্রাইভার অন্যমনস্ক হয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং পাওয়া যায় মানুষের টাটকা মৃতদেহ। কিন্তু এখানেই ঘটে যায় হিসেবের গরমিল... তীব্রগতিতে ছুটে-আসা গাড়ির দুর্ঘটনায় চালকের বা অন্য কোনো যাত্রীর দেহ অবিকৃত থাকাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়।

"হয়তো কোনো দেহের একজোড়া হাত থাকে না বা হয়তো দুটো পা-ই বাদ যায়। আবার কোনো কোনো দেহের

মাথাও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং কোনোবারই সম্পূর্ণ অবিকৃত দেহ লাভ করা সত্তাটির পক্ষে সম্ভব হয় না।

"স্বাভাবিকভাবেই, হাতবিহীন দেহ কিংবা চারটি ইন্দ্রিয়ের অনুপস্থিতি সত্তাটির জীবনধারণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

"ফলে সে এক অপার্থিব খোঁজ শুরু করে—নতুন অবিকৃত মৃতদেহের খোঁজ। এইবার হয়তো কাঙ্ক্ষিত দেহ খুঁজে পাবে তারা—যেন এই 'শিশুসুলভ' বিশ্বাসে তারা ঘটাতে থাকে বীভৎস অ্যাক্সিডেন্ট। আর এইভাবেই নারকীয় পরিকল্পনার শিকার হতে থাকে হতভাগ্য মানুষেরা। আমরা এদের নাম দিয়েছি 'The living body' বা 'জীবন্ত ধড়'।

"সুতরাং আমি আবারও বলছি... সাবধানে থাকুন। হাইওয়ে বিশেষ করে অরণ্যের বুক চিদ্দে যে নির্জন রাস্তা চলে গেছে, সেইসব লোভনীয় 'অ্যাডভেঞ্চার' ত্যাগ করুন... একান্ত প্রয়োজনে লেট নাইট ড্রাইভিং করলে চোখ-কান খোলা রাখুন, মনে রাখবেন, সত্তাটি সক্রিয় হয় কেবলমাত্র গভীর রাত থেকে শেষ রাত পর্যন্ত।

"আর শুনতে থাকুন গল্পের পরবর্তী অংশ... কারণ আমরা জানি না একটা সম্পূর্ণ অবিকৃত মৃতদেহ দখল করলে এদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে... তবুও... কি...ছু... সম্ভা...ব...না..."

করঞ্জাক্ষর কথাগুলো ক্রমশ ফিকে হতে থাকল। কখন যে প্রদ্যুম্নর চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে তা ও নিজেও জানে না। যদিও করঞ্জাক্ষর প্রোগ্রাম জমে উঠেছে... তা-ও ওর যেন একটু ঘুম দরকার। স্বাভাবিকই, গতকাল সারারাত ড্রাইভিং করতে হয়েছে, শরীরটাও যেন বেশ খানিকটা দুর্বল... গতকাল থেকে। তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না। ওদিকে মোবাইল থেকে তখনও ভেসে আসছে রেডিয়ো জকির গলা...

(২)

রাত এগারোটা বেজে দশ মিনিট। জঙ্গলের নিয়ম অনুযায়ী এখন কেবলমাত্র ঝিঁঝিদের অধিকার আছে একটানা শব্দ করে যাওয়ার। কোনো যান্ত্রিক শব্দ তো দূরেই থাক, নিশাচর পাখিদের করুণ সুর ও বিরল হয়ে এসেছে।

এমন সময় কটেজের রিসেপশন কাউন্টারের ফোনটা বেজে উঠল রাত্রির নিস্তব্ধতা খানখান করে। প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সেই শব্দটা।

কিছুক্ষণ পর, কাউন্টারের পাশের একটা ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল একটা বছর চব্বিশের ছেলে। অর্জুন এই নির্মীয়মাণ কটেজের অস্থায়ী কেয়ারটেকার। ফোনের আওয়াজে ওর সতর্ক ঘুম ভেঙে গেছে। তাড়াহুড়ো করে রিসিভারটা তুলতে গিয়ে ওর হাত লেগে, ডেস্কের ওপর থাকা একটা পিতলের ফুলদানি সশব্দে মেঝেতে পড়ে খানিকটা গড়িয়ে গেল। যাক গে, পরে তুললেও হবে, আগে ফোনটা রিসিভ করা দরকার। কোনোরকমে ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে ফোনটা ধরল—

"নমস্কার, বনবীথি কটেজ..."

ফর্ম্যালিটি বজায় রেখে জিজ্ঞেস করল অর্জুন। কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর এল না। তার বদলে কিছু অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়া গেল...

এ কী রে বাবা! কানেকশনের গোলমাল নাকি?

"হ্যালো!... হ্যালো!.." নাহ্... কোনো শব্দ নেই।

এই ফোনে, এখানকার বোর্ডাররা ছাড়াও মাঝে মাঝে কটেজের মালিক কিংবা সেক্রেটারির ফোনও আসে। হয়তো রাতবিরেতে তাদের পরিচিত কোনো গেস্ট আসবেন বা অন্য কোনো সংবাদও আসতে পারে। তাই অর্জুনকে বলা রয়েছে, ফোন এলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ধরে... এইরকম ছোটো ছোটো তৎপরতার ওপর নির্ভর করছে তার চাকরির ভবিষ্যৎ।

কিন্তু পাঁচ মিনিট কেটে যাওয়ার পরও ফোনের ওপার থেকে কোনো উত্তর এল না। ফোনটা রাখতে যাবে, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল অর্জুনের, ফোন থেকেই কি?

না, ফোন থেকে নয়। শব্দটা আসছে ওর ঠিক পিছন থেকে। কেউ এসে নিঃশব্দে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না... অনবরত একটা মৃদু কটকট শব্দ হচ্ছে। কে? অর্জুন আস্তে আস্তে মাথাটা ঘোরাল...

কাউন্টারের ডেস্কে জ্বলতে-থাকা ল্যাম্পের মৃদু আলো ওর শরীরে বাধা পেয়ে একটা ছায়ার সৃষ্টি করেছে আর সেই আবছা আলোয় একজন মানুষের শরীর এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক ওর পিছনেই!

অস্পষ্ট হলেও বোঝা যাচ্ছে, লোকটার ঘাড় বারবার একদিকে কাত হয়ে পড়ছে... আর বাঁ হাত দিয়ে লোকটা চেষ্টা করছে ঘাড় সোজা করতে... যেন নিজে থেকে মাথা সোজা করে রাখতে পারছে না এবং প্রতিবার ঘাড় সোজা করতে গিয়েই কট...কট...কট... করে আওয়াজ হচ্ছে।

"কে? কে ওখানে?" ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

কোনো উত্তর নেই...

এতক্ষণে অর্জুন বুঝতে পেরেছে, আগন্তুক কোনো স্বাভাবিক মানুষ নয়... বলা ভালো জীবিত কেউ নয়।

অর্জুন এক-পা এক-পা করে সরতে লাগল। ল্যাম্পের আলো থেকে ওর ছায়াটা সরে যাচ্ছে। লোকটা এখনও স্থির। আর একটু সরতে পারলেই অর্জুন দৌড়ে পালানোর খানিকটা পথ পাবে... আর একটু...

কিন্তু এখানেই ভুল হয়ে গেল... অর্জুন সরে যাওয়াতেই ল্যাম্পের হলুদ আলো গিয়ে পড়ল লোকটার মুখে... আর তখনই যেন অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে পড়ল সে... সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত তুলে চালিয়ে দিল অর্জুনের মাথা লক্ষ্য করে... ক্ষণিকের জন্য অর্জুন দেখতে পেল, লোকটার হাতে ধরা রয়েছে সেই পিতলের ফুলদানি... তারপর সব অন্ধকার।

* * * * * * * *

প্রদ্যুম্নর মোবাইল বেজে উঠতেই ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। হাতঘড়িতে দেখল রাত বারোটা বাজতে দু-মিনিট বাকি। এই সময় কে ফোন করছে?

মোবাইল স্ক্রিনে ওদের ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র এডিটর মিস্টার ব্যানার্জির নাম দেখা যাচ্ছে। স্ট্রেঞ্জ! এত রাতে ওর বস ফোন করছে? কী ব্যাপার...

প্রদ্যুম্ন ফোনটা রিসিভ করতেই স্পিকার দিয়ে ভেসে এল মি. ব্যানার্জির কণ্ঠস্বর—"হ্যালো... প্রদ্যুম্ন..."

"ইয়েস স্যার... স্পিকিং..."

"আমি খুবই দুঃখিত প্রদ্যুম্ন, কিন্তু তোমায় কাল একবার আমাদের হেডকোয়ার্টারে আসতেই হবে by any means… it's urgent…"

"কিন্তু স্যার, আমি তো এখনও কলকাতায় পৌঁছোইনি... ভেবেছিলাম কাল..."

আমি কিছুই করতে পারব না। তুমি এই কয়েকদিন আগে আমায় একটা এডিটোরিয়াল মেইল করেছিলে মনে আছে? Something 'মেতহাজোড়ার জঙ্গলে' এই শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। ওটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে, বেশ কিছু controversial comments and mails আসছে। আমদের সিনিয়র এডিটর-ইন-চিফ কাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন..."

"কিন্তু স্যার, তাহলে তো আমায় আজ রাতেই বেরিয়ে পড়তে হয়..."

"সে যেটা better option তোমার কাছে, দ্যাখো কী করবে। But কাল তোমায় কিন্তু আসতেই হবে, okay? Good night…"

ওপার থেকে কেটে গেল ফোনটা। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল প্রদ্যুম্ন। ছোটোনাগপুর অঞ্চলের একটা ফোকলোরের ওপর ভিত্তি করে একটা লেখা সে দিয়েছিল বটে, সেটা ছাপাও হয়। কিন্তু সেটা প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল, কই, এতদিন তো চিফ এডিটরের ফোন আসেনি... আজ হঠাৎ কী হল?

যাক গে, বেশি ভেবে লাভ নেই, সেই যেতেই হবে যখন।

ফোন কেটে দেওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞাপনের আভাস ভেসে আসছে স্পিকার থেকে। রেডিয়ো শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, খেয়াল নেই। ফোনটা অফ করে ট্রাভেল ব্যাগে জামাকাপড় গোছাতে লাগল প্রদ্যুম্ন।

এখন বাজে ওই বারোটা দশ। এখন গাড়ি ছাড়লে ভোরের দিকে কলকাতা পৌঁছোতে পারবে। বাথরুমে গিয়ে শেভিং-এর সরঞ্জামগুলো কিটব্যাগে ভরার সময় একবার প্রদ্যুম্নর চোখ গেল বেসিনের ওপরে দেওয়ালে টাঙানো আয়নায়।

এলইডি-র পরিষ্কার আলোয় নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে সে—বড্ড প্রাণহীন একটা মুখ... চোখের তলাটা কালো হয়ে গেছে, চামড়াটাও কেমন যেন ফ্যাকাশে... আর... চোখেও কী যেন একটা পরিবর্তন এসেছে।

যা-ই হোক, চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে বেডরুমে ফিরে এল সে। ব্যাগ গোছানো শেষ করে বেডসাইড টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা ফোনের রিসিভার তুলে রিসেপশনে ফোন করল, যে ছেলেটি এই কটেজের দেখভাল করে, তাকে ডেকে চাবি আর ঘরদোর দেখিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু অনেকবার রিং হয়ে গেল, কেউ ধরল না। তবে কি ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে?

একটা বড়ো ট্রাভেল ব্যাগ আর একটা সাইড ব্যাগ নিয়ে কটেজের রিসেপশনে এসে প্রদ্যুম্ন দেখতে পেল কাউন্টার ফাঁকা... একটা টেবল ল্যাম্প জ্বলছে শুধু।

প্রচণ্ডরকম চুপচাপ চারিদিক।

কেয়ারটেকার ছেলেটি বলেছিল বটে, ডিনারের আয়োজন শেষ করেই রাঁধুনি আর দুজন চাকর যে যার ঘরে চলে যায়; সে-ই একমাত্র কটেজে থাকে। রাতের বেলা দরকার হলে ওকে ডাকতে। কিন্তু কোথায় গেল ছেলেটা? কী যেন নাম... ধুত্তোর, মনে পড়ছে না...

"ভাই... ভাই জেগে আছ?..."

গলা তুলে দু-একবার হাঁক পাড়ল প্রদ্যুম্ন। নাহ্, কোনো সাড়াশব্দ নেই। বেশ অবস্থা তো! এদিকে রাত হয়েছে

অনেক। এখনই গাড়ি ছাড়লে তবে ভোর চারটে নাগাদ কলকাতা পৌঁছোনো যাবে... তারপর ঘুমিয়ে ফ্রেশ হয়ে অফিস যাবে। এমনটাই প্ল্যান করেছে প্রদ্যুম্ন। কিন্তু এখানে তো মনে হচ্ছে, সারারাত এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

তার থেকে চাবিটা রেখে চলে গেলেই তো হয়। ভাড়া আগাম দেওয়া আছে। সুতরাং সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, ঘরের চাবিটা রিসেপশন কাউন্টারে রেখে বেরিয়ে এল প্রদ্যুম্ন।

নিশুতি রাত এখন। বিশেষ করে এরকম জঙ্গুলে এলাকায়। নুড়ি-বিছোনো সরু রাস্তা ধরে ওর গাড়ি যেখানে রাখা ছিল, সেখানে গেল সে।

বাদামি বর্ণের অলটো গাড়িটা ঘুমিয়ে রয়েছে যেন। 'রিমোট কি'-তে চাপ দিতেই গাড়ির ইনডিকেটর দুবার জ্বলে থেমে গেল।

প্রদ্যুম্ন লাগেজ দুটো গাড়ির ব্যাকসিটে তুলে দিল, আবার কষ্ট করে পিছনের ডিকি খোলার ইচ্ছে করল না ওর, তারপর চালকের আসনে বসে, রিয়ার ভিউ মিররটা ঠিক করে নিল, আর তখনই গাড়ির ইন্টেরিয়রের হালকা আলোয়, আয়নার কাচে নিজের মুখটা... আবার চোখ দুটো নজরে পড়ল ওর। কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য মনে হল।

"কলকাতায় ফিরে একবার ড. হালদারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে..."

নিজের মনে বিড়বিড় করে গাড়ি স্টার্ট করল প্রদ্যুম্ন।

(৩)

মালভূমির সীমান্তে যেখানে সমতলের সঙ্গে ঈষৎ উচ্চভূমির আভাস পরিলক্ষিত হয়, সেখানে এক ধরনের মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের এই শেষ সময়, বর্ষা ঢোকার মুখে—

অতিরিক্ত শুষ্কতার জন্য ঠোঁটের চামড়া ফাটে না অথচ বাতাসে জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য না-থাকার দরুন ঘামও হয় কম। এ ছাড়া এই সমস্ত এলাকায় রাতের আকাশে মেঘেদের এমন নৈসর্গিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা শহরবাসীর কাছে দুর্লভ, আর পূর্ণিমার রাত হলে তো কথাই নেই।

আজ কিন্তু পূর্ণিমা নয়। অথচ চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। রাস্তার দু-পাশের গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে বিক্ষিপ্ত জ্যোৎস্না, সরের মতো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তা জুড়ে। প্রদ্যুম্নর গাড়ির যান্ত্রিক আলো এগিয়ে চলেছে সেই মায়াবী পরিবেশ কাটিয়ে।

এমন চন্দ্রাহত রাতে গাড়ি চালানোর যে কীরকম অনুভূতি, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রদ্যুম্নর মানসিক অবস্থাও এখন সেরকম। একটা অন্যরকম ভালো-লাগা জন্মেছে এই জায়গাটার প্রতি। সেটা ঠিক কী জন্য তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ট্যুরিস্টদের বিশেষ আনাগোনা নেই, শান্ত নিঝুম পরিবেশ, হয়তো সেইজন্য। এ ছাড়াও যে কটেজটায় ও ছিল, সেটাও বেশ।

প্রদ্যুম্ন ভাবল, জায়গাটায় বেশ ভালো 'ফরেস্ট স্টে' তৈরি করা যাবে। নামটাও বেশ ইউনিক... কী যেন?..

অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না প্রদ্যুম্ন। এই কিছুক্ষণ আগেই ও চেক আউট করল, কতক্ষণ হয়েছে? আধ ঘণ্টা? এর মধ্যেই কটেজের নামটা বেমালুম ভুলে গেল?

একবার মনে হল, গাড়ি ঘুরিয়ে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে দেখে আসে... সত্যিই... সত্যিই জঙ্গলের ভেতর আছে তো কোনো... কটেজ?

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, যদি সে চিনে যেতে না পারে অথবা যদি রাস্তা হারিয়ে ফ্যালে? তাহলে তো আরও বিপদ!

ক্রমশ একরাশ বিরক্তি জমা হতে থাকল নিজের ওপর। কী হচ্ছে এসব? ওর মতো তুখোড় নিউজ পার্সোনালিটি, সফল লিখিয়ের আচমকা স্মৃতিভ্রম হল?

নাহ্, অ্যামেশিয়ার ধাত তো ওর কোনোদিন ছিল না... আর শুধুমাত্র সিগারেট ছাড়া আর অন্য কোনো মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি ওর নেই, সুতরাং সুরাপান বা ড্রাগজাতীয় কিছুর প্রভাবে ভুল হওয়ার তো কথা নয়... তবে?

প্রদ্যুম্ন গাড়ি থামাল। ওর এখন প্রয়োজন একটু খোলা বাতাস... আর নিকোটিনের কড়া মিশেল।

গাড়ি থেকে নেমে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে চোখ বন্ধ করে এই গত দু-দিনে ঠিক কী কী হয়েছে, মনে করার চেষ্টা করল প্রদ্যুম্ন—

...গত পরশু সন্ধে নাগাদ বেরিয়েছিল... রাত ন-টার সময় একটা লাইন হোটেলে ডিনার করল... তারপর সিঁথি নদীর ব্রিজ পেরিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ের উদ্দেশে গাড়ি ছোটায়... এই তো... মনে পড়ছে... তারপর, কী একটা কারণে, হ্যাঁ... কন্সট্রাকশনের জন্য মেইন রোড বন্ধ ছিল... তাই একটু ঘুরপথে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তা দিয়ে আসতে হয়েছিল... আর তারপর... কটেজের সন্ধান পায়...

না না না... এর মাঝেও কিছু একটা ঘটেছিল... কিছু একটা...

প্রদ্যুম্ন অনেক চেষ্টা করল মনে করার, কিন্তু বারবার এই জায়গাতেই এসে আটকে গেল। কিছু একটা হয়েছিল ওই রাস্তা ধরে আসার সময়... কিন্তু মনে পড়ছে না কেন? ঠিক যেন কেউ ব্লটিং পেপার দিয়ে বিগত স্মৃতির কিছু কিছু আবছা করে দিয়েছে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে গাড়িতে উঠে এল প্রদ্যুম্ন। মোবাইল অন করে গুগল্ ম্যাপ খুলল। ও এখন ঠিক কোথায় আছে, সেটা দেখা দরকার। ম্যাপের জিপিএস অন করে 'location' চেক করতে যাবে এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটল, একটা ছোট্ট নোটিফিকেশন এসেছে মোবাইল স্ক্রিনে। তাতে লেখা আছে—'additional charges will be deducted from main balance.'

আশ্চর্য, নেট ব্যালেন্স শেষ? নাহ্, রিচার্জ তো করিয়েছিল এই মাসের শুরুতে।

প্রদ্যুম্ন ব্যালেন্স চেক করার জন্য নির্দিষ্ট নাম্বার কোড ডায়াল করে কল বাটন প্রেস করল, আর কিছুক্ষণ পর যে তথ্যগুলো স্ক্রিনের ওপর ফুটে উঠল, তাতে বেশ খানিকটা অবাকই হল সে—

ব্যালেন্স দেখানোর সময় সবসময় আগে মোবাইল নম্বরটা লেখা থাকে... কিন্তু এখানে যে নম্বরটা দেখাচ্ছে, সেটা একটা নতুন নম্বর... আর মেইন ব্যালেন্স দেখাচ্ছে তেত্রিশ টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা... কোনো নেট ব্যালেন্স নেই।

স্ট্রেঞ্জ! এই ক-দিনের মধ্যে কি কারও সঙ্গে ফোন পালটাপালটি হয়ে গেছে?

কী মনে হতে কনট্যাক্ট খুলল সে। ওর অফিসের কলিগ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের নম্বর নিশ্চয়ই সেভ করা থাকবে।

নাহ্... একটাও চেনা নাম চোখে পড়ল না... শুধুমাত্র কাস্টমার কেয়ার আর সিম কোম্পানির নানারকম নম্বর।

স্ক্রল করতে করতে একটা নামে ওর চোখ আটকে গেল—একটা কনট্যাক্ট সেভ করা আছে, 'my original number' এই নামে।

নম্বরটা দেখে চিনতেও পারল প্রদ্যুম্ন,

...৯... ০... হুম... এই তো... লাস্টে... ২... ৫... ৪

এটাই তো... নিজের ফোন নম্বর।

মনে পড়েছে, কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সময় প্রত্যেকবার নিজের ব্যবহারের মোবাইলটা বাড়িতে মায়ের কাছে রেখে আসে, আর নিজে নিয়ে আসে একটা 'স্পেয়ার ফোন'।

তাতে ওর ব্যবহারের মোবাইল নম্বরটাই সেভ করা থাকে... একান্ত প্রয়োজন না হলে সে বাড়িতে ফোন করে না। আর মা-কেও বলা থাকে সেই কথা।

যেহেতু আর কারও কাছে এই মোবাইলের নম্বরটা নেই তাই বেড়াতে এসে অযথা ফোন আসে না... এবং শুধুমাত্র কম টাকার টক-টাইম রিচার্জ করানো থাকে... নেট ব্যালেন্স না-থাকার দরুন সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানি থেকেও দূরে থাকা যায়...

কিন্তু তা-ই যদি হয়, তবে অফিস থেকে এই নম্বরে ফোন এল কী করে?

ওর সিনিয়র মি. ব্যানার্জি কী করে ওকে ফোন করতে পারলেন?

তবে কী বাড়ির মোবাইলে প্রথম ফোন করছিলেন, তারপর মায়ের কাছ থেকে ওর নম্বর পান? কল লিস্ট চেক করলেই বোঝা যাবে...

এবারে কিন্তু হতাশ হতে হল প্রদ্যুম্নকে... ওর রিসেন্ট কল লিস্টে কেবলমাত্র সিম কোম্পানি থেকে আসা স্প্যাম কলগুলো ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু ওর স্পষ্ট মনে আছে, অনলাইন রেডিয়ো চলাকালীন ওর ফোনে...

এবার গলাটা বেশ শুকিয়ে গেল প্রদ্যুম্নর, ওর যদি ইন্টারনেট ব্যালেন্সই নেই তাহলে আজ রাত্তিরে অনলাইন পডকাস্ট শুনছিল কী করে?!

একটা সম্ভাবনা মাথায় আসতে, মোবাইলের ফাইল ম্যানেজার ওপেন করল প্রদ্যুম্ন। দু-একটা তোলা ছবি আর পিডিএফ ফাইল ছাড়াও একটা ভিডিয়ো ফাইল খুঁজে পেল সে। ফাইলটা রয়েছে ব্লুটুথ ফোল্ডারের মধ্যে, ডেট দেখাচ্ছে—২ মে।

আজ মে মাসের সাত তারিখ, অর্থাৎ পাঁচ দিন আগে অন্য কোনো ডিভাইস থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এই মোবাইলে।

অডিয়োটা ওপেন করতেই একটা চেনা গলা ভেসে এল—আরজে করঞ্জাক্ষর গলা... একটা গল্প শোনাচ্ছে সে...

গল্পটা চেনা। আজকেই যে গল্পটা শুনছিল প্রদ্যুম্ন...

এবার অনেকটা পরিষ্কার হচ্ছে সবকিছু। দেজা ভু... একে একে মনে পড়ছে সব—

২ মে-র আগের রাতে করঞ্জাক্ষর প্রোগ্রাম স্ক্রিন রেকর্ড করে রেখেছিল প্রদ্যুম্ন, তারপর সেটা ট্রান্সফার করে নেয় এই মোবাইলে... ভেবেছিল, পরে কোনো একসময় শুনবে। আর এই রেকর্ডিং চলাকালীন এসেছিল অফিসের ফোন... ওর বসের কথাগুলোও রেকর্ড হয়ে যায় সেই সঙ্গে... তাই

আজকে যখন রেকর্ডিংটা শুনছিল, তখন আবার ফোন কলটাও পুনরায় শুনতে পায় এবং ও মনে করে, ওর অফিস থেকে ফোন এসেছে... সেইমতো কথাও বলতে থাকে সে, যেন সত্যিই ওর সিনিয়রের সঙ্গেই কথা বলছে...

নিজের মনে হেসে ফেলল প্রদ্যুম্ন। সত্যি কি ও পাগল হয়ে যাচ্ছে?

বাজে রকমের ভুল বোঝাবুঝিতে এতটা হয়রান হতে হল।

কিন্তু একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে এতটা বাড়াবাড়ি রকমের ভুল? না না, কলকাতায় ফিরে ভালো কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নেবে প্রদ্যুম্ন...

ও গাড়ি স্টার্ট করার জন্য চাবি ঘোরাল। গাড়িটা সামান্য পিছিয়ে বাঁদিকে কাটাতে হবে... কারণ সামনের রাস্তাটা একটু অমসৃণ।

রিভার্স গিয়ারে সেট করে একটু পিছোতেই কীসে যেন ধাক্কা খেল গাড়ির চাকা।

নাহ্, পিছনে তো কোনো গাছ নেই, তবে কি কোনো রাতচরা জানোয়ার?

প্রদ্যুম্ন গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দিকে যেতেই বুঝতে পারল, কী একটা যেন সড়সড় করে ঢুকে গেল গাড়ির তলায়!

প্রথমে চমকে উঠলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল প্রদ্যুম্ন। এবার আর স্মৃতিশক্তি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। মনে পড়ে গেল করঞ্জাক্ষর বর্ণনা। হ্যাঁ, মিলে যাচ্ছে, ও এখন রয়েছে বড়ো বড়ো গাছে ঘেরা এক নির্জন রাস্তায়। একদম সেই গল্পটার মতো একটা প্রাণী ঢুকে পড়েছে গাড়ির তলায়...

নাহ্, আত্মরক্ষা করার মতো কিছু একটা হাতে রাখা দরকার। পিছনের ডিকিতে স্টিলের 'নাট স্প্যানার' আছে, গাড়ি পাংচার হলে চাকা খুলতে কাজে লাগে। ওটা বের করে নিলে হয়। প্রয়োজনে কাজে আসবে।

প্রদ্যুম্ন গাড়ির ডিকি খুলল 'নাট স্প্যানার' বের করার জন্য। জমাট-বাঁধা অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আলো প্রয়োজন। মোবাইলের টর্চ জ্বেলে ডিকির ভেতর আলো ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেল পিছনের দিকে... এ কী দেখছে সে!

গাড়ির ডিকির ভেতর শোয়ানো রয়েছে একটা মৃতদেহ!

হাত-পা ভাঁজ করে কোনোরকমে ঢোকানো হয়েছে মৃতদেহটা... ওটার মাথা, ঘাড়ের সঙ্গে অস্বাভাবিক কোণ সৃষ্টি করে বেঁকে আছে প্রদ্যুম্নর দিকে.. মোবাইলের আলো পড়েছে প্রাণহীন মুখের উপর... মুখটা চেনা...

জঙ্গল-ঘেরা কটেজের সেই বেপাত্তা কেয়ারটেকার ছেলেটার মৃত মুখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে...

একটা আতঙ্কের ড্যালা প্রদ্যুম্নর গলা থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়েও আটকে গেল... ও প্রায় বসে পড়ল রাস্তার ওপর। হাতে ধরা মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট পড়েছে বেশ খানিকটা নিচু হয়ে আর তাতে গাড়ির তলাটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—

একটা প্রাণী অনেক কষ্টে বেরিয়ে আসছে গাড়ির তলা থেকে। গতি ক্ষীণ, কিন্তু সে বেরিয়ে আসছে।

ওই তো পুরোপুরিভাবেই বেরিয়ে এসেছে...

একটা 'ধড়'! আজকের শোনা গল্পের 'জীবন্ত ধড়'! হয়তো আজ রাতেই কোনো ভাগ্যহীনের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে শরীর দখল করেছে সে... তারপর শুরু করেছে নতুন, আরও ভালো দেহের সন্ধান।

এ... এ অসম্ভব... হতে পারে না... গল্পের মনগড়া অস্তিত্ব বাস্তবে কীভাবে আসতে পারে! নিশ্চয়ই প্রদ্যুম্নর ব্রেন সেলগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে...

এইরকম নানা কথা বলে নিজের মনকে প্রবোধ দিলেও, বর্তমানে ঘটতে-থাকা অলৌকিক নাটকের সামান্যতম পরিবর্তন ঘটল না:—

মাথা নেই, হাত-পা নেই, শুধুমাত্র একটা সচল 'ধড়'... ঠিক যেন একটা চামড়ায় মোড়া পাশবালিশ।

শরীরটা একবার সংকুচিত হচ্ছে আর প্রসারিত হচ্ছে; ক্রমশ বেঁকে যাচ্ছে গাড়ির খোলা ডিকিটার দিকে।

এরপর প্রদ্যুম্ন যা দেখল, তাতে ওর সমস্ত বিজ্ঞানচেতনা, যুক্তি, তর্ক এসবের বাঁধন ভেঙে গেল...

কেঁচোর মতো বুকে ভর দিয়ে, হাত-পা-বিহীন দেহটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে মৃতদেহটার দিকে... আর ওর মাথাটা যেখানে থাকার কথা, সেখান থেকে বেরিয়ে ঝুলে আছে মাংসল উপবৃদ্ধি...

ভয়ে-আতঙ্কে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড় হল প্রদ্যুম্নর, যখন ওই মাংসল মাথাটা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ওর দিকে তাকাল... সেখানে এখন জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ, মানুষের চোখের মতো। সেদিকে তাকিয়ে প্রদ্যুম্নর মনে পড়ল তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শোনা করঞ্জাক্ষর কিছু ভাসা ভাসা কথা—

"এরা মানুষের মৃতদেহকে 'আশ্রয় প্রদানকারী খোলস'-এর মতো ব্যবহার করে থাকে...

"...আমরা জানি না একটা সম্পূর্ণ অবিকৃত মৃতদেহ দখল

করলে এদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে...”

শেষের কথাটা মনে পড়তেই শিরদাঁড়া কেঁপে উঠল প্রদ্যুম্নর। যেভাবেই হোক-না কেন, ওর গাড়িতে এই মুহূর্তে একটা অবিকৃত মৃতদেহ রয়েছে... ওটার সন্ধানেই এগোচ্ছে জীবন্ত শরীরটা।

এরপর ঠিক কী হবে!

বিস্ফারিত চোখে প্রদ্যুম্ন দেখল, দুই চোখবিশিষ্ট মাংসপিণ্ডটা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে মৃতদেহের নাক ও একটু হাঁ হয়ে থাকা মুখ দিয়ে। সম্পূর্ণটা ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ‘থপ’ করে দেহটা পড়ে গেল রাস্তার ওপর, অর্থাৎ পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন আশ্রয় পেয়ে গেছে অপার্থিব সত্তাটি। সে সন্ধান পেয়েছে নিখুঁত একটা দেহের, যে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপস্থিত।

ধীরে ধীরে মৃতদেহটা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। একবার সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সেই সময় ওটার মাথায় নজর গেল প্রদ্যুম্নর। চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে সেখানে।

চলমান মৃতদেহ মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে ওর দিকে। তবে কি এবার ওকেও মেরে ফেলবে? ভয়ে, আতঙ্কে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গেছে প্রদ্যুম্ন। অগ্রসরমান মৃতদেহ এখন ওর থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে... হঠাৎ এক হাত দিয়ে নিজের মাথাটা ধরে ওপরদিকে তুলল সে...

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা আবার ছ্যাঁত করে উঠল প্রদ্যুম্নর। এই ধরনের মুখ আগেও একবার দেখেছে ও... কোথায়? বাথরুমে বেসিনের ওপর টাঙানো আয়নায়... নিজের প্রতিচ্ছবি... একই রকম পাংশু মুখ, ফ্যাকাশে চামড়া আর চোখে...

তখন যেটা বুঝতে পারেনি, এখন সেটা স্পষ্ট... চোখের কনীনিকার নির্জীব উপস্থিতি। মোবাইলের জোর আলোতেও এই চোখের কনীনিকার সংকোচন হচ্ছে না... যেমনটা হয়নি বাথরুমের আলোতে প্রদ্যুম্নর নিজের চোখে।

হঠাৎ একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল প্রদ্যুম্ন। ওর বুকের কাছটায়। এতটাই তীব্র যে ওর বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভুলে গেল। পরনের শার্ট একটানে ছিঁড়ে বুকের কাছে আলো ফেলতেই কালশিটের মতো জমাট-বাঁধা রক্তের দাগ দেখতে পেল। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় কিছু মুছে-যাওয়া স্মৃতি—

কটেজের সন্ধানে আসার সময় একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তা ধরেছিল প্রদ্যুম্ন। ফাঁকা রাস্তায় ওর গাড়ির গতিবেগ কখন ষাট ছাড়িয়ে যায়, সে খেয়াল ছিল না। কিন্তু আচমকাই ওর গাড়ির একদম সামনে দিয়ে দৌড়ে যায় একটা আবছায়া শরীর... ফলে জোরে ব্রেক কষতে বাধ্য হয় প্রদ্যুম্ন।

জোর গতিতে থাকা গাড়ি হঠাৎ থেমে যাওয়াতে তীব্র ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয় আর সিট বেল্ট না-পরার জন্য প্রদ্যুম্নর বুকের পাঁজর সোজা গিয়ে লাগে স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে...

গুরুতর আঘাতের কারণেই ওর হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয় এবং প্রদ্যুম্ন পরিণত হয়... নিখুঁত একটি মৃতদেহে এবং প্রথমবারের মতো ওর শরীরের দখল নেয় ওই নারকীয় সত্তা। তারপর পুনরুজ্জীবিত করে তোলে ওর মৃতদেহকে।

ওই কটেজে যেটুকু সময় কাটিয়েছে ও, তার সমস্ত স্মৃতি, চিন্তাভাবনা... সব নিয়ন্ত্রণ করেছে ওই সত্তা।

সেজন্যই ওর মন এবং স্মৃতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে বারবার... কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা মনে থেকেছে... বেশ কিছু ভুলেও গেছে... যেমন কটেজের নাম, কেয়ারটেকারের নাম ইত্যাদি।

আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার... প্রদ্যুম্নর মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ওই বুদ্ধিমান সত্তা—

স্ক্রিন রেকর্ড করা ‘ফোন কল’-কে আসল মনে করিয়ে, আজ রাতের মধ্যেই বেরিয়ে পড়া; ঠিক জঙ্গুলে অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি থামানো—একে একে সব হিসেব মিলে যাচ্ছে।

আর ওই খুন? খুনটা কে করল তবে?

আর কিচ্ছু ভাবতে পারল না প্রদ্যুম্ন। ওর মৃত শরীরের সম্পূর্ণ দখল চলে গিয়েছে দ্বিতীয় সত্তার কাছে। আপাতত এখন ওর প্রয়োজন নেই... কারণ যে কাজের জন্য ওর দেহকে বাঁচিয়ে রাখা, সে কাজ হয়ে গেছে...

আরও একটা টাটকা মৃতদেহ জোগাড় হয়ে গেছে।

অবশ্য নিজের জন্য নয়... ওদের নিজস্ব জগতে বসবাসকারী অন্য আরেকটি অস্তিত্বের জন্য। ‘যারা’ কিনা সম্পূর্ণ শরীর পেয়ে গেলেও খোঁজ করতে থাকে আরও একটা শরীরের।

এখন প্রদ্যুম্নর বাঁ হাত উঠে এসেছে মাথার কাছে... একদিকে কাত হয়ে-যাওয়া মৃত মাথাটা সোজা করে ধরার জন্য। কেয়ারটেকার অর্জুনের মৃতদেহও এখন অনেকটা স্বাবলম্বী। তারা দুজনে ধীরে ধীরে চলে যায় জঙ্গলের গভীরে। নতুন শরীরে ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগবে।

তারপর শুরু হবে খোঁজ, বড়ো অপার্থিব খোঁজ... আশ্রয়ের খোঁজ... নিখুঁত একটি দেহের খোঁজ।



আয়না

উজ্জ্বল চ্যাটার্জী



"আসব, ডাক্তারবাবু?"

"আসবেন বই-কি। আসুন। বসুন। বলুন সমস্যাটা কী?"

লোকটা বসল।

ডাক্তারবাবু খেয়াল করলেন, সামনের গদিতে ডুবে যেতে যেতে লোকটার ভুরু কুঁচকে গেল। ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন না, লোকটা বসার সময়ে ভুরু কুঁচকোল কেন? হতে পারে, এইরকম নরম গদিতে বসার অভ্যাস নেই। নেই কেন, সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

ডাক্তারবাবু জরিপ করতে শুরু করলেন লোকটাকে। মুখে না-কাটা দাড়ির আভাস, খুব টেনশনে থাকা মুখ। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে আসেনি লোকটা। পরনে ডোরাকাটা ইস্তিরিছাড়া হাফস্লিভ শার্ট আর একটা জিন্‌সের প্যান্ট। কবজিতে ঘড়ি নেই। চেহারাও, এই লোকটার একেবারেই ইমপ্রেসিভ নয়। তবে, গলায় বা হাতের খোলা অংশে একটাও আংটি, চেন বা মাদুলিটাদুলি কিছু দেখা যাচ্ছে না, যেটা এই ধরনের অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই ডাক্তারবাবু দেখে থাকেন। হাতের পুরোনো মডেলের কম দামি মোবাইলটাকে আঁকড়ে ধরে থাকা দেখে লোকটার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কারও মনে যদি প্রশ্ন জাগে, দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু, ডাক্তারবাবুর জাগল না। জাগল না, তার কারণ দুটি। এক তো, লোকটার জিন্‌স

আর জুতোটা পরিষ্কার না হলেও খুব দামি ব্র্যান্ডের। দ্বিতীয় কারণটা হল, তিনি ভালোভাবেই জানেন, তাঁর কাছে মধ্যবিত্তরা আসে না। তাঁর ফিজ বেশি। অস্বাভাবিক রকমেরই বেশি। এবং সেটা অগ্রিম দিতে হয়।

তা ছাড়া, লোকটার হাতে একটা বড়ো খাম। উনি জানেন, তাতে বিভিন্ন ব্যয়বহুল পরীক্ষার রিপোর্ট আছে। ওঁর সঙ্গে দেখা করার আগে, এই পরীক্ষাগুলো করিয়েই আসতে হয়। লোকটা যখন সামনে এসে বসেছে, তখন নিশ্চিন্তে বলা যায়, এইসব পর্ব পার করে, তবেই এসে বসেছে। পার না করলে, এখন লোকটা ডাক্তারবাবুর জুনিয়রদের ডিঙিয়ে ভেতরে আসতে পারত না। আগে পারত। একটা সময় ছিল, উনি নিজেই লিখতেন এইসব পরীক্ষার প্রেসক্রিপশন। তাতে একটা ভিজিট বেশিও পাওয়া যেত। আজকাল লেখেন না। আজকাল এটা অসিতের হাতেই ছেড়ে রেখেছেন।

ডাক্তারবাবুর চেম্বারে উত্তম আর অসিত, জুনিয়র ডাক্তার দুজন, বছর এক-দেড় মাত্র, পুরোপুরি ডাক্তারের তকমা পেয়ে এখানে যোগ দিয়েছে।

এখনকার নিয়মে, রোগীকে প্রথমে উত্তমের কাছে বসতে হয়। সে প্রশ্ন করে করে রোগীর কেস হিস্ট্রি বানায়। তারপর রোগীকে যেতে হয় অসিতের কাছে। সে এই পরীক্ষাগুলোর কথা লেখে।

এই যে ডাক্তারবাবু নিজের হাতে এই কাজগুলো করেন না, তাতে ক-টা টাকা কম পেলেও সুবিধে আছে। বড়ো ডাক্তারদের সহকারীরা অ্যাপ্রেন্টিস হলে চলেনা। তাতে মান যায়। ছোটোখাটো ব্যাপারে বা জরুরি ভিত্তিতে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন করারও ক্ষমতা থাকতে হয়। তা ছাড়া, পরিশ্রম কিছু বাঁচে। একই সঙ্গে বোঝানো যায়, ডাক্তারবাবুটা চশমখোর নয়, কারণ জুনিয়র ডাক্তারদের ভিজিট অনেকটাই কম হয়। এইটা বোঝবার দায় অবশ্য রোগীদের ওপর ফেলে না রেখে বোঝানোর দায়িত্ব দিয়েছেন রিসেপশনিস্ট শিবানীকে। সে খুব গুছিয়ে পেশেন্ট পার্টিদের এটা বুঝিয়ে থাকে। তবে, আজ শিবানী একটু আগেই চলে গেছে। ডাক্তারবাবু ভাবলেন, এই কথাটা একে কেউ বুঝিয়েছে কি?

ডাক্তারবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

না বোঝালেও সত্যিই কি কিছু এসে যায়? এই ধরনের লোকগুলো যেমনই হোক, যা-ই ভাবুক, তাঁর কিছু এসে যায় না। যতদিন রোগীদের মনে হবে, এই ডাক্তারের কাছে গেলে সুফল পাওয়া যাবে, ততদিন ভিড় কমবে না তাঁর চেম্বারে। আসলে, কিছুতেই বোধহয় কিছু এসে যায় না।

কিন্তু, পয়সার অভাব নেই, এমন একটা লোক এইরকম সাজে এসেছেই বা কেন? ডাক্তারবাবুর হঠাৎই মনে হল. লোকটা সম্ভবত বাড়ির লোককে জানাতে চায় না, সে এখানে এসেছে। তাই বাড়ির লোকের কৌতূহল থেকে বাঁচতে এই ভেক।

এর থেকে অবশ্য লোকটার ভুরু কুঁচকোনোর কারণ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না ডাক্তারবাবু। তিনি আবার ভাবতে থাকলেন।

এমনও হতে পারে, কী বলবে, সেটা ঠিক করতে পারছে না। লোকটা যেরকম সামান্য উশখুশ করছে, তাতে মনে হতে পারে, কী বললে ঠিক হবে, ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু, এটাও ঠিক গ্রহণযোগ্য মনে হল না তাঁর কাছে। ডাক্তারের কাছে আসার আগে একটা লোক যথেষ্ট তৈরি হয়ে আসে। কী কী বলবে, সে ব্যাপারে আগের থেকেই একটা ছক কাজ করে। শেষবেলায় অনেকে অবশ্য গুলিয়ে ফেলে। কিন্তু, তাদের ভুরু কুঁচকোয় না এভাবে। আজকে, এটাই তার শেষ পেশেন্ট একে ছেড়ে দিলেই বাড়ি যাওয়া যাবে।

কিন্তু মনে হচ্ছে না, সেটা খুব জলদি হবে।

ডাক্তারবাবু ক্লান্ত স্বরে আবার বললেন, "বলুন।"

"বলব?"

ডাক্তারবাবু এবার অত্যন্ত বিরক্তভাবে সামনের দিকে তাকালেন। তাঁর ঘুম পাচ্ছে। চেম্বার শেষ হওয়ার মুখে রোজই পায়। সারাদিন একটানা একঘেয়ে পরিশ্রমের পর ঘুম পাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এই সময় এইরকম একটা ফালতু প্রশ্ন যথেষ্ট বিরক্তি উদ্রেককারী। একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে একটা লোক আসেই তার সমস্যার সমাধান খুঁজতে। অর্থাৎ, তার রোগের কথা বলে, সেটা থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কথা না বলে সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয় তাহলে, বারবার বলব বলব করার মানে কী হয়? ডাক্তারবাবুর ইচ্ছে করল, খুব কড়া ভাষায় এই কথাগুলো বলে দিতে।

কিন্তু, ডাক্তারবাবু কিছু বললেন না। এই চেয়ারে বসে বলাও যায় না। তিনি শুধু বিরক্ত হলেন, আর চেয়ে থাকলেন সেই লোকটার দিকে, এই মুহূর্তে তাঁর সামনে মধ্যবয়সি যে লোকটা অত্যন্ত অনিশ্চয়তার সঙ্গে মাথা নিচু করে বসে আছে।

বিরক্ত হলেও, ডাক্তারবাবু অবশ্য অবাক হলেন না। তাঁর কাছে যারা আসে, তাদের খুব একটা আত্মবিশ্বাস থাকে না. প্রাথমিক দর্শনে তাদের অধিকাংশকেই এইরকমই দেখায়।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আপনার সঙ্গে কেউ আসেননি?’’

প্রশ্নটায় লোকটিকে অপ্রতিভ দেখাল। খুব একটা সংশয়ের সঙ্গে মাথা নাড়ল। ডাক্তারবাবুর বুঝতে অসুবিধে হল না, এই সংশয়টা, সঙ্গে কেউ আসা বা না-আসা নিয়ে নয়। তিনি উত্তরটাকে কেমনভাবে নেবেন, সংশয়টা সে ব্যাপারে।

ইন্টারকমটা এই সময়ে বাজল। উত্তম। শিবানী আগেই চলে গেছে, ওরা দুজনও চলে যাবে কি না জিজ্ঞাসা করতেই ফোন। উত্তম সবে বিয়ে করেছে, তা ছাড়া বেশ রাতও হয়েছে। আটকে রাখা উচিত হবে না। ডাক্তারবাবু চাবিটা দিয়ে ওদের চলে যেতে বললেন।

ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, অসিত এসে চাবি দিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু আরেকবার দেখলেন লোকটাকে। এবার কিন্তু লোকটাও তাকাল তার দিকে। ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন লোকটার চোখের রং সামান্য ধূসর। আর সেই ধূসর চোখে প্রতীয়মান স্পষ্ট দ্বিধা। এই দ্বিধাটারও মানে বুঝতে অসুবিধে হল না তাঁর। লোকটা ভাবছে, তিনি সারাতে পারবেন কি না।

ডাক্তারবাবু নিজেকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কি এই লোকটাকে সারাতে পারবেন? পারবেন কি না, ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন না। না বুঝতে পেরে একটা হাই উঠল তাঁর।

ডাক্তারবাবু লোকটার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানেন ওর নাম অরিন্দম নিয়োগী। উত্তমের তৈরি কেস হিস্ট্রি তাঁর সামনেই রাখা। তবু জিজ্ঞাসা করলেন। এইরকম আরও কয়েকটা প্রশ্ন তিনি করবেন। সহজ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে রোগীর আত্মবিশ্বাস ফেরত আসে। তখন রোগীর চিকিৎসাটা সহজতর হয়।

লোকটা অবশ্য এই সহজ প্রশ্নের জবাব দিতেও একটু সময় নিল। মাথাটাথা চুলকে জবাব দিল, ‘‘আমাকে সবাই আলুবাবু বলে ডাকে।’’

নামটা শুনে হয়তো ডাক্তারবাবুর একটু হাসি আসা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁর হাসি এল না। তিনি বিরক্তভাবে লোকটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। লোকটা আবার সামান্য উশখুশ করে নিল। তারপর তেলতেলে হাসিমুখে জবাব দিল, ‘‘আসলে আমার নাম অরিন্দম নিয়োগী। ওই অরিন্দমটা আলুর দম আর তার থেকে...’’

লোকটা একটু হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু খুব জমল না হাসিটা।

ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, ‘‘আপনার বাড়িতে কে কে আছে?’’

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আলুবাবু নামের লোকটা স্পষ্টতই ধন্দে পড়ে গেল।

অনেকটা সময় চুপ করে থেকে সামনে একটু ঝুঁকে এল। তারপর কোনো গুহ্য তথ্য জানতে চাওয়ার মতো নিচুস্বরে ডাক্তারবাবুকেই প্রশ্ন করল, ‘‘আপনি ঠিক কী জানতে চাইছেন? আমার বাড়িতে এখন কে কে থাকে, না কাদের থাকার কথা ছিল?’’

ডাক্তারবাবু অবাক হলেন না। মানসিক রোগীদের কাছে এই ব্যবহার অস্বাভাবিক নয়। তিনি নরমভাবে বললেন, ‘‘আগে বলুন কার কার থাকার কথা?’’

আলুবাবু নামের লোকটা খুব খুশি হয়ে উঠল হঠাৎ। যেন খুব মনের মতো প্রশ্ন হয়েছে।

খুশি-খুশি মুখে সে বলল, ‘‘আমার ভাইবোন কেউ নেই, মা-বাবাও গত হয়েছেন বহুদিন। একটা ছেলে আছে, সে আমাকে পছন্দ করে না। তাই কোনোরকমে একটা চাকরি জোগাড় করে, এখান থেকে চলে গেছে।’’

‘‘কোথায়?’’ ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

‘‘ভাবায়। ওখানকার বৈজ্ঞানিকদের একটা উইং-এর হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট।’’

এবার সত্যিই একটু চমকালেন ডাক্তারবাবু। ‘ভাবা ইন্সটিটিউট’ দেশের সর্বোচ্চ বিজ্ঞানবিদদের স্থান। সেখানকার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের চাকরি নাকি ‘কোনোরকমে’ জোগাড় করেছে আলুবাবুর ছেলে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যে চমকেছেন, আলুবাবুকে সে কথা একেবারেই বুঝতে দেওয়া যাবে না। ডাক্তারবাবুরা চমকে গেলে এইসব মানসিক রোগী হয় খুব আনন্দ পায়, নয় ভেঙে পড়ে। কোনোটাই কাম্য নয়।

ডাক্তারবাবু অন্য কথায় চলে গেলেন, ‘‘আপনাকে পছন্দ করে না, জানলেন কী করে?’’

‘‘আমি জানি।’’

‘‘আপনার স্ত্রী-কে পছন্দ করে?’’

‘‘নাহ্।’’ প্রশ্নটা শুনে লোকটা উদাস হয়ে গেল, ‘‘আসলে, আমাকে বা আমার স্ত্রী-কে কেউই পছন্দ করে না। ছেলের দোষ নেই।’’

‘‘তা, পছন্দ করে না কেন? সেটা জানেন?’’

‘‘সত্যি বলতে, আমাদের দুজনের কেউই ঠিক পছন্দ হওয়ার মতো লোক নই। বড্ড মুখরা মহিলা কাত্যায়নী। আর আমি তো গুরুত্বহীন লোক একটা। সেটা আমি জানিও। কখনোই কোনো ব্যাপারে আমাকে কেউ শামিল করে না।

বেশির ভাগ লোকই আমাকে প্রথম থেকে তুমি করে কথা বলে। একটু কম বয়স যখন ছিল, তুইও বলত অনেকে।"

"আপনি প্রতিবাদ করে দেখেছেন কখনও?"

"নাহ্! করে কী হবে? আমি তো জানি, ব্যক্তিত্বহীন লোক একটা আমি। আমাকে খামোখা আপনি বলতে যাবে কেন?"

"কিন্তু, আমি তো আপনার সঙ্গে আপনি করেই কথা বলছি..."

"তা-ই তো! তা, আপনারও বলার দরকার নেই। তুমি বা তুই যা কিছু বলতে পারেন।"

"বললে আপনি খুশি হবেন?"

"না। মোটেই না। কিন্তু মেনে নেব। আমি তো ওইরকমই একটা লোক। তা-ই না?"

"না, থাক। আপনি করে কথা বলাটা খারাপ কিছু নয়। আপনি বলে যান। আমি শুনছি। যা মনে আসে। খুলে বলুন সব।"

"কী বলব?"

"আপনি যা বলছিলেন। আপনার বাবা-মা নেই। ছেলে আপনার সঙ্গে থাকে না।"

"হ্যাঁ। একটা ব্যক্তিত্বহীন বাবা আর ঝগড়াটে মায়ের সঙ্গে থাকতে যাবেই বা কেন? আমি ওকে দোষ দিই না।"

"বিয়ে করেছে ছেলে?"

"ঠিক বলতে পারব না। নেমন্তন্ন তো করেনি।"

এই প্রশ্ন আর উত্তরটাকে ডাক্তারবাবু কেস হিস্ট্রিতে নোট করলেন।

"আর কে থাকে?"

"একটা বেড়াল, পুচকু নামে। খুব বুদ্ধি, জানেন।"

"কীরকম?"

"ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমরা বুঝি।"

"ও!"

"আর থাকে কাত্যায়নী।"

"আপনার স্ত্রী?"

"হ্যাঁ। তবে সত্যি বলতে, বাড়িতে ও একাই থাকে। আমাদের থাকা-না-থাকা সমান।"

"আর?"

"আর কে? আর তো কারও থাকার কথা নয়। তা-ই না?"

"কিন্তু, আছে তো? আপনিই তো বললেন।"

আলুবাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। তারপর একটা গোপন কথা বলার মতো করে বললেন, "বলেছি, না? হ্যাঁ, আরও একজন থাকে। কিন্তু, আপনি বিশ্বাস করবেন কি?"

"বলে দেখুন-না একবার।"

আলুবাবু ফিসফিস করে বললেন, "একটা আয়না।"

"আয়না?"

"হ্যাঁ। আমার শোবার ঘরে। আর সেই আয়নার ভেতর আর-একটা আমি।"

ডাক্তারবাবু চোখ সরু করে তাকালেন। চোখ সরু করে তাকিয়ে তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন, আলুবাবু কি তাঁর নিজের প্রতিবিম্বকে অন্য মানুষ ভাবছেন?

ভাবলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ আলুবাবু, অর্থাৎ সামনে যিনি বসে আছেন, তিনি সম্ভবত একজন মানসিক রোগী। যদিও এখনই সেটা নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই আমিটা আপনার প্রতিবিম্ব নয়?"

আলুবাবুর অভিব্যক্তিতে নজরে পড়ার মতো একটা পরিবর্তন দেখা দিল। অস্বাভাবিক জোর দিয়ে আলুবাবু বললেন, "না।"

ডাক্তারবাবু জোর করলেন না। বোঝা যাচ্ছে, এটা রোগীর সংবেদনশীল বিন্দু। আস্তে আস্তে জানা যাবে। কথা ঘুরিয়ে তিনি বললেন, "আপনার স্ত্রী-র কথা বলুন।"

আলুবাবু বলার আগে একটু চুপ করে থেকে নিজেকে গুছিয়ে নিলেন। ততক্ষণ ডাক্তারবাবু অপেক্ষা করতে থাকলেন। একটুক্ষণ পরে মুখ খুললেন আলুবাবু, "আপনাকে তো আমি বলেছি, আমার বউয়ের নাম কাত্যায়নী। বলেছি না?"

"বলেছেন।"

"কাত্যায়নীর নাম কাত্যায়নী কে রেখেছিল—এ নিয়ে আমার মনে প্রশ্নের অন্ত না থাকলেও আজ অবধি সাহস করে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারিনি। আমার বউ ছাড়া, আজ অবধি কাত্যায়নী নামে আর কোনো মেয়ের মুখোমুখি হইনি আমি। এমনকি কানায়-ঘুষোয় শুনিওনি সেরকম নাম আর কারও। বইয়ে অবশ্য পড়েছি। পুরোনো দিনের লেখকদের লেখা অনেক গল্প-উপন্যাসের নায়িকা, সহনায়িকা বা ঝিয়ের নাম কাত্যায়নী হত। আজকাল হয় না। অবশ্য ঝি কথাটাও উঠে গিয়ে তার জায়গায় কাজের মেয়ে শব্দটা জাঁকিয়ে বসেছে। আরও আধুনিক জনগণ মেইড, হেল্পিং হ্যান্ড, ডোমেস্টিক হেল্প—এইসব গালভরা নামে ডাকছে, কিন্তু সে শুধু ডাকবার জন্যই। আসলে ঝি মানে ঝি-ই হয়, সে তুমি যে নামেই ডাকো। কাত্যায়নীর ক্ষেত্রে অবশ্য সেটা খাটে না। যে-কোনো নামে তাকে ডাকা চলে না। তার কাত্যায়নী নাম ছাড়া অন্য

নামে ডাকলে তুলকালাম করে ছাড়বে।"

"ডেকে দেখেছেন নাকি কখনও?"

"অবশ্যই। চেষ্টা কি করিনি ভাবছেন? করেছিলাম। সত্যি বলতে, ফুলশয্যার রাতেই করেছিলাম। কিন্তু, সুবিধে করে উঠতে পারিনি। আসলে, কাত্যায়নী বিয়ের রাতে একটাও কথা বলেনি তো। তাই, বিয়ের রাতে একটাও কথা না-বলা এই মেয়েছেলেটিকে আমি অ্যাসেস করতে ভুল করেছিলাম।"

"ভুল করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। সবাই বলেছিল, ফুলশয্যার রাত হল জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক রাত। শুনে শুনে, আমারও কেমন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে কথাটা সত্যি। তা, সেই রোমান্টিক রাতে গদগদ হয়ে সবে বলেছি, আমার খুব ইচ্ছে তোমার একটা নতুন নাম দিই। কেটি নামটা তোমার কেমন লাগে? ব্যাস, ফুলশয্যার নিকুচি করে চোখ পাকিয়ে নববধূ বলে উঠল, কেন রে ড্যাকরা? আমাকে কাটির মতো লাগে? 'ড্যাকরা' শব্দটাও এর আগে আমি কখনও কাউকে বলতে শুনিনি। নিজের উদ্দেশে তো নয়ই। তা, আমার বুঝতে তখনও বাকি ছিল। তাই ড্যাকরাকে পাত্তা না দিয়ে তেলতেলে হাসি নিয়ে নবপরিণীতা স্ত্রী-কে বোঝাতে গিয়েছিলাম, কী যে বলো? কাঠি হতে যাবে কেন? কেটি নামটায় বেশ একটা বিলিতি ছোঁয়া... আর কিছু বলতে হয়নি। ঘর মাথায় করে কাত্যায়নী কেঁদে উঠেছিল, ও মা গো!! কোথায় যাব গো-ও-ও? আমার চরিত্তির নিয়ে সন্দ করছে গো-ও-ও। বলে, বিলেতের লোক নাকি আমাকে ছুঁয়েছে গো-ও-ও। তা, সে আওয়াজ ক্রমশ এতই বাড়তে থাকে, অনতিবিলম্বে দরজা ধাক্কানো শুরু হয়। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দরজা খুলে দিতেই আত্মীয়স্বজনের ঢল নামে ঘরের ভেতর। বেশির ভাগেরই ধারণা, প্রথম রাতে অতিচাহিদার প্রত্যাখ্যানে আমি হয়তো নতুন বউকে খুব ঠ্যাঙাচ্ছি। আমি চিমসে যাই।"

"সে কী? তারপর?"

"তবে, জনগণের ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। কারণ, কাত্যায়নী ঘরে এত লোক দেখে, এবার তাদের নিয়ে পড়ে, "কেমন লোক গা তোমরা? ছি ছি, লজ্জাও নেই? একটা মেয়ের ফুলশয্যার ঘরে এমন ঢুকে পড়তে আছে?"

আলুবাবু থামলেন। ঘরের চারদিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি অবান্তর কথা বলছি?"

কেস হিস্ট্রির শেষে ক-টা সাদা পাতা লাগানো থাকে ফাইলে। ডাক্তারবাবু তাতে নোট নিচ্ছিলেন। সেটা থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মনে হচ্ছে?"

আলুবাবু আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারি না আজকাল।"

"কবে থেকে?"

"কবে থেকে কী?"

"এই যে বুঝতে পারেন না বলছেন, সেটা কবে থেকে?"

"জানি না। এই যখন ডিরেক্টর সাহেব আমাকে চেম্বারে ডেকে বললেন, আমার ভিআরএস নেওয়া উচিত, তখন জানলাম।"

"কী জানলেন?"

"জানলাম, আমার মাথা কাজ করছে না, অবান্তর কথা বলি। কিন্তু তখন জানলেও, সমস্যাটা তো আরও পুরোনো তা-ই না?"

"আপনার তা-ই মনে হল? না, উনি বললেন?"

"উনিই বললেন, কিন্তু, আমারও মনে হল।"

"কেন মনে হল?"

আলুবাবু আবার চুপ করে গেলেন। তারপর আবার সামনে একটু ঝুঁকে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, "তাহলে তো অনেক কথা বলতে হয়।"

"বলুন।"

"সময় লাগবে।"

"লাগুক।"

"কাত্যায়নীকে আমি যে খুব ভয় পেতাম, সেটা কি আমি বলেছি?"

"না, বলেননি। কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি।"

"সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু সেই কাত্যায়নীও একবার খুব ভয় পেল।"

"কেন?"

"পুচকুকে দেখে। খুব ভয় পেল। এত ভয় পেল..."

আলুবাবু চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখে ভয় ফুটে উঠল। ডাক্তারবাবু সেটা পরিষ্কার দেখতে পেলেন।

"ছেলে তখন সবে ভাবা ইন্সটিটিউটে চাকরি নিয়ে নাসিক গেছে। বাড়িতে আমি, কাত্যায়নী আর পুচকু। এমন সময়ে ঘটল প্রথম ঘটনাটা। সেদিন আমি সুন্দরবন থেকে ফিরছি। বেশ রাতই হয়ে গেছে।"

"সুন্দরবন?"

"হ্যাঁ। সুন্দরবনেরও উপান্তে। একটা ফ্যাক্টরির ক-টা ইলেকট্রিক্যাল টাওয়ার ইরেকশনের ইন্সপেকশনের ব্যাপার ছিল।"

"আপনি ইন্সপেক্টর ছিলেন?"

"না। আমি একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তখন ইরেকশন ডিপার্টমেন্টকে হেড করি। জিএম পরে হয়েছিলাম। প্রোজেক্টটায় একটু সমস্যা হয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, ডিপার্টমেন্টাল হেড হিসেবে জবাবদিহির দায়িত্ব আমারই ছিল। খুব ঝড় গেছে সেদিন।"

আলুবাবু জিএম হয়েছিলেন শুনে ডাক্তারবাবু আবার একটু অবাক হলেন। আলুবাবুকে দেখে তাঁর কখনোই মনে হয়নি, তিনি এমন একটা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠান করতে পারেন। তবে, ডাক্তারবাবু সেটা বুঝতে দিলেন না মোটেই।

তিনি কণ্ঠস্বর অবিকৃত রেখে প্রশ্ন করলেন, "সমাধান হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। সমাধান করে আসতে আসতেই তো দেরি। বেল বাজাইনি। আমার কাছে বাড়ির দরজার একটা চাবি ছিল। তা-ই দিয়ে দরজা খুলে দেখি কেউ নেই। এমনটা হবার কথা নয়। দেরি করার অপরাধে আমাকে সাতকথা শোনাবার জন্য কাত্যায়নীর তখন বসার ঘরেই অপেক্ষা করার কথা। সোজা শোবার ঘরে এলাম। এসে দেখি..."

"কী?"

"দেখি, কাত্যায়নী বিছানার ওপর কুঁকড়ে বসে। এক্কেবারে কোণঠাসা অবস্থা। চোখ দুটো ভয়ে বড়ো বড়ো, ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চোখ আয়নার দিকে। আয়নার ঠিক সামনে পুচকু।"

আলুবাবু থামলেন। তাঁর মুখ ভয়ার্ত। এসি-র মধ্যে বসেও কপালে অল্প ঘাম বিজবিজ করছে যেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর? আপনি কিছু দেখলেন?"

"নাহ্! আমাকে দেখে পুচকু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল।"

"বেড়াল হাসল?"

"কী জানি? আমার সেরকমই মনে হয়েছিল।"

"তারপর?"

"আমার কী করা উচিত, আমি তখন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, কাত্যায়নীকে আমার জড়িয়ে ধরা উচিত। অন্য কেউ হলে, এ অবস্থায়, নিজের বউকে নিশ্চয় তা-ই করত। কিন্তু, আমি কাত্যায়নীকে ভয় পেতাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, জড়িয়ে ধরলে কাত্যায়নীর প্রতিক্রিয়া কী হবে।"

"কী প্রতিক্রিয়া হতে পারত?"

"জানি না। শুধু বলতে পারি, ভয় পেয়েছিলাম। ভীষণ ভয়। কিন্তু, কাত্যায়নী তখন আরও ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আঙুল তুলে আয়নাটা দেখাল। আমি সেদিকে দেখলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওই অবস্থাতেই কাত্যায়নী বলল, পুচকু..."

"পুচকু?"

"হ্যাঁ। পুচকু। কাত্যায়নীর অবস্থা দেখে আমারও ভয়-ভয় করছিল। তাই আমি শুনতে চাইলাম না। কাত্যায়নীকে শুইয়ে দিয়ে, একটু দুধ গরম করে তার মধ্যে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে কাত্যায়নীকে খাইয়ে দিলাম। কাত্যায়নী ঘুমিয়েও পড়ল।"

"আপনার বাড়িতে ব্র্যান্ডি থাকে?"

"তখন থাকত, প্রতিরাতেই ড্রিঙ্ক করতাম সে সময়ে। সব ধরনের লিকারই রাখতাম তখন।"

"তারপর?"

"পরদিন সকালে, যখন আর ভয়ের ব্যাপার ছিল না, আমি প্রশ্ন করলাম কাত্যায়নীকে। কাত্যায়নী যা বলল, আমার বিশ্বাস হল না মোটে।"

"কী বলল?"

"বলল, ও আয়নার সামনে পুচকুকে সামনের ডান পা-টা তুলতে দেখেছে। আর আয়নাতেও পুচকুর মতোই একটা বেড়াল।"

"দাঁড়ান মশাই। আয়নায় যাকে আপনার স্ত্রী দেখেছেন, সে পুচকু নয়?"

"না।"

ডাক্তারবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "সেটা কী করে বোঝা গেল?"

"কারণ, কাত্যায়নী বলল, পুচকু যখন ডান পা-টা তুলছিল, আয়নার ভেতরের বেড়ালটাও ডান পা-ই তুলছিল।"

"তা-ই তো তুলবে।"

আলুবাবুকে অসহায় লাগল, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না। পুচকু যদি ডান পা তোলে, আয়নার ভেতরের বেড়ালটার তো বাঁ পা তোলার কথা, তা-ই না?"

এবার ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন।

"আপনি নিজে একবার দেখলেন না?"

"দেখলাম তো। অনেকক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাত, বাঁ হাত, এমনকি দু-একবার বাঁ পা, ডান পাও তুলে দেখলাম। কিচ্ছু বুঝলাম না। সব ঠিক আছে।"

"তাহলে হয়তো আপনার স্ত্রী ভুল দেখেছিলেন।"

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আলুবাবু বললেন, "সেদিন মঙ্গলবার ছিল। আর ঠিক পরের মঙ্গলবার ছেলে অফিস থেকে ফোন করে জানায়, সে এইমাত্র কনফার্মড হল। পরের

দিন খবর আসে, পুচকু গতকাল গাড়িচাপা পড়েছে।"

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন না। না বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "মারা গেল?"

ঘোলাটে চোখে আলুবাবু তাকালেন, "হ্যাঁ। আমি হিসেব করে দেখলাম, ছেলের কনফার্মেশন আর পুচকুর মারা যাওয়ার সময়টা এক, বিকেল চারটে।"

পুচকুকে ডাক্তারবাবু দেখেননি, কাত্যায়নীকেও তিনি চেনেন না, কিন্তু, আলুবাবুর বর্ণনা শুনে তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সবটা দেখতে পাচ্ছেন।

যদিও আলুবাবুর আতঙ্কগ্রস্ত চেহারা, কপালের বিজবিজে ঘাম দেখলে তাঁকে অবিশ্বাস করা কঠিন, তবু ডাক্তারবাবুর বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আলুবাবু হাঁপাচ্ছিলেন। দম নিতে থামলেন একটু। তারপর বললেন, "ক-দিন কাত্যায়নী খুব কান্নাকাটি করল। ওর রাগারাগি কমে গেল। কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। আমার পক্ষে অবশ্য সেটা ভালোই হল। সারাক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকতে হত না। কিন্তু, যে কথাটা ও বলত, তাতে আমার ভয় করত।"

"কী বলত?"

"বলত, পুচকু নাকি এ বাড়িতেই আছে। শুধু ঘর পরিবর্তন করেছে। সে নাকি এখন আয়নার ভেতরে থাকে। সে নাকি কাত্যায়নীকে ডাকে।"

"কাত্যায়নী, ইয়ে, মানে আপনার স্ত্রী যেত?"

"পুচকুর কাছে? আয়নার ভেতরে?"

"হ্যাঁ?"

"না। আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলত, ওর ভয় করে।"

"ভয় করে কেন?"

"যদি আর ফিরতে না পারে।"

"ও! তারপর?"

"আস্তে আস্তে আমাদের ভয়টা কেটে গিয়েছিল। আগের মতোই চলছিল সব।"

আলুবাবু একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন?"

"করছি।"

খুব খুশি হয়ে উঠলেন আলুবাবু। বললেন, "করুন। আমি মিথ্যা বলছি না।"

"তারপর?"

"এরপরে বছর তিন-চার আর কিছু বুঝতে পারিনি। শুধু, কাত্যায়নী আর রাগ করত না। এটুকুই ফারাক। তা, সেটা আমার ভালোই লাগত। সমস্যা যখন আমার মন থেকে প্রায় মুছে গেছে, তখনই আবার সেই দিনটা এল।"

"কোন দিনটা?"

"আমি তখন বেশ কিছুদিন জিএম হয়েছি। শুধু ট্যুর আর ট্যুর। বাড়িতে থাকতেই পারি না প্রায়। বছর দুয়েক বাকি থাকতে ভিআরএসের অফার এল। লুক্রেটিভ অফার। নিয়ে নিলাম। রিটায়ারমেন্টের পর সব টাকা পেয়ে গেলেও গ্র্যাচুইটির টাকাটা নিয়ে গোল বাধল।"

"কেন?"

"কোম্পানি বলছিল, কয়েকটা কাগজ আমি জমা দিইনি।"

"দেননি?"

"দিয়েছিলাম। ওটা কোম্পানির কথা। আমি মামলা করলাম। তবে টাকার খুব একটা অসুবিধে তো ছিল না। তাই, ভিআরএসের পরে কাত্যায়নীকে নিয়ে ফরেন ট্রিপ করে এলাম একটা।"

আলুবাবু একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন, "সেদিন মামলার রায় বেরোল। আমার সলিসিটর ফোন করে জানালেন, আমি জিতেছি। গ্র্যাচুইটির টাকা তো পাবই, আরও বেশি টাকা পাব ক্ষতিপূরণ বাবদ। অফিসের লিগ্যাল হেড আমার সলিসিটরকে জানিয়েছেন, অফিস আর মামলা করতে ইচ্ছুক নয়, তারা এই রায় মেনে নেবে।"

"সে তো ভালোই হল। হল না?"

"ভালো কী বলছেন? চমৎকার। আমি ভাবলাম, একটু ক্লাবে যাই, সেখানে লিগ্যাল হেডও আসেন, আমার বন্ধুস্থানীয়। সরাসরি কথা হয়ে যাবে।"

"গেলেন?"

"গেলাম তো। গিয়ে দেখলাম, লিগ্যাল হেড অনেক আগেই এসেছেন। খুব জমল সেদিন। বেশ কয়েকটা ড্রিঙ্ক নেওয়ায় ফিরতে অনেকটাই দেরি হল। এসে বেল বাজালাম। বেলটা বাজল না, নাকি নেশার ঘোরে আমিই শুনতে পেলাম না, কে জানে? যা-ই হোক, ঠিক সেদিনের মতো দরজা খুলে চলে গেলাম শোবার ঘরে। দেখি, বাঁ হাতে চুল ধরে ডান হাতে কাত্যায়নী চিরুনি চালাচ্ছে। সাধারণত আমি কাত্যায়নীকে খুব ভয় পাই। কিন্তু, সেদিন ভয় করল না। গুলাবি চোখে আমার ভীষণ ইচ্ছে হল ওকে জড়িয়ে ধরে খুশখবরটা শোনাতে। কাছে গিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু, আয়নার দিকে তাকাতেই হাড় হিম হয়ে গেল।"

"কেন?"

"দেখলাম, আয়নায় কাত্যায়নীর প্রতিবিম্বটাও ডান হাতে চুল আঁচড়াচ্ছে। আর খাটের ওপর বসে পুচকু সেটা দেখছে।"

"আপনার খাটের ওপর?"

"না, আয়নার ভেতরে। আমি ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে আমাদের ঘরে খাটের দিকে তাকালাম। কেউ নেই।"

"পুচকু?"

"নেই। আবার আয়নার দিকে তাকালাম। সেখানে আছে। আমার অবস্থা দেখে পুচকু খুবই মজা পাচ্ছে, মুচকি মুচকি হাসছে।"

"এই নিয়ে আপনি দ্বিতীয়বার বললেন, বেড়াল হাসছিল।"

আলুবাবু অপ্রকৃতিস্থের মতো চেঁচিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হাসছিল। হাসছিলই তো। আমি নিশ্চিন্ত, ওটা হাসি। পুচকু হাসছিল।"

ডাক্তারবাবু একটু ভয় পেলেন। সবাই চলে গেছে। তিনি এখন একা। আলুবাবু যদি ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠেন, কিচ্ছু করবার থাকবে না।

ডাক্তারবাবু কথা ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার স্ত্রী-র কথা বলুন।"

"তার ঠিক এক হপ্তা পরে কাত্যায়নী মারা যায়।"

"সে কী! কীভাবে?"

"বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে। ভাগ্যিস আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম না। খুন, আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা তা-ই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। পুলিশ খুব টানাটানি করেছিল আমাকে নিয়ে।"

"আপনি কোথায় ছিলেন তখন?"

"অফিসে। ভাগ্যিস। সেদিনই ঝামেলাটা পুরোপুরিভাবে মিটল। অনেক সইসাবুদ করতে হয়েছিল।"

"সেদিনও কি মঙ্গলবার ছিল?"

আলুবাবু অবাক বিস্ময়ে বললেন, "আমি কি সে কথা এর মধ্যে বলেছি?"

"না। বলেননি।"

"কিন্তু, আপনি ঠিক বলেছেন। এক্কেবারে ঠিক। সেইদিনও মঙ্গলবারই ছিল। বিকেল চারটে। বিকেল চারটেয় আমার হাতে এমডি চেকটা তুলে দিলেন। আর ঠিক সেই সময়েই..." আলুবাবু চোখ বুজলেন।

"সেই সময়েই কি?"

"কাত্যায়নী মারা যায়।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। এই যে আপনি বললেন, আপনার স্ত্রী এখনও আপনার বাড়ি থাকে?"

"থাকে তো। তবে ঠিক আমার বাড়িতে বলা যায় না। নাকি বলা যায়? ও থাকে আয়নার ভেতরে।"

"আয়নার ভেতরে! আপনি দেখেছেন?"

"আপনাকে যেমন দেখছি, ঠিক সেইভাবে। রোজ। শোবার ঘরে এলেই দেখতে পাই। আমায় ডাকে। আমার ভয় করে। আমার মনে হয়, একবার আয়নার ভেতরে গেলে আর ফিরতে পারব না। কিন্তু, কাত্যায়নী ছাড়বে না। ও আমাকে ছাড়বে না, নিয়ে যাবেই। শুধু একটা ভালো খবরের অপেক্ষা, তারপরেই ও আমাকে নিয়ে যাবেই। আমি যেতে চাই না ডাক্তারবাবু। আপনি আমাকে বাঁচান।"

"ভালো খবর মানে?"

অধৈর্যভাবে আলুবাবু বললেন, "আহ্! বলছি না, যেদিন কেউ আয়নার ভেতরে চলে যায়, সেদিন কোনো ভালো খবর আসে?"

ডাক্তারবাবু খুব ভালো বুঝতে পারছিলেন অবস্থাটা। আলুবাবু যে বদ্ধপাগল হয়ে গেছেন, সে ব্যাপারে তাঁর আর কোনো সংশয় নেই। ডাক্তারবাবু হিসেবে মনের মধ্যে একটা দায় অনুভব করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, অসহায় উন্মাদ শরণাগত ব্যক্তিটির প্রতি যেন তাঁর একটা অবশ্যকর্তব্য আছে। তিনি যেন চাইলেই এঁকে সারিয়ে তুলতে পারেন, এমন একটা বোধ তাঁর মধ্যে কাজ করছিল।

আলুবাবু গুঙিয়ে উঠলেন, "আয়না, ওই আয়নাটা যদি না থাকত..."

ঠিক। আয়না। ডাক্তারবাবু নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিলেন সবকিছুর মূলে ওই আয়নাটা। ওটাই কোনো কারণে প্রভাব ফেলেছে আলুবাবুর মনে। ওটাকে হঠাতে হবে। ওটাকে হঠাতে পারলেই, আলুবাবুর আধাসংকটের অবসান। কিন্তু কথাটা বলা মোটেই সহজ নয়। তাঁর ভয় করছিল। একলা ঘরে একটা বদ্ধপাগল মানুষ অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে।

ডাক্তারবাবু আলুবাবুকে বললেন, "চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ভয়-পাওয়া শিশুকে অভয় দেবার পর মায়ের দিকে শিশু যে দৃষ্টিতে তাকায়, আলুবাবুর চোখে অবিকল সেই দৃষ্টি দেখতে পেলেন ডাক্তারবাবু। আলুবাবুর মাথায় হাত রেখে ডাক্তারবাবু বললেন, "আজ আপনি যান। শিগগিরই আমি আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসব আপনার স্ত্রী-র সঙ্গে। তাঁকে বুঝিয়ে বলব, এরকম করতে নেই।"

''কাল?''

''না। কাল তো রোববার, রোববারে আমি বেরোই না। আমি পরশু চেষ্টা করব।''

''কথা দিচ্ছেন?''

''হ্যাঁ।''

আলুবাবুর মুখে গভীর প্রশান্তি। ডাক্তারবাবু বললেন, ''এখন বাড়ি চলুন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। এই ফাঁকে আপনার বাড়িটাও চিনে নেওয়া যাবে।''

বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়লেন আলুবাবু।

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

ডাক্তারবাবুর কিন্তু কথার খেলাপ হল। সেদিন হল না। তার পরদিন চেম্বার যাওয়ার পথে কড়া নাড়লেন আলুবাবুর দরজায়। আলুবাবু ঘরেই ছিলেন। দরজা খুলে দিতে, তাঁকে দেখে চমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। মাত্র দু-দিনে এ কী চেহারা হয়েছে আলুবাবুর? বিস্ফারিত চোখ এদিক-ওদিক ঘুরছে, মনের অন্তর্নিহিত ভয় যেন বেরিয়ে আসছে চোখ দিয়ে। ফ্যাকাশে রক্তশূন্য মুখ। চলার শক্তি যেন নেই।

তাঁর হাত ধরে তাঁকে ভেতরে টেনে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন আলুবাবু। কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না ডাক্তারবাবু। তাঁর ভয় করছিল। পাগলা যদি খেপে গিয়ে চড়াও হয়... আসাটাই ভুল হয়ে গেছে, ভাবলেন ডাক্তারবাবু।

''না।'' হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন আলুবাবু, ''কিচ্ছু ভুল হয়নি আপনার। আয়নাটা দেখতে এসেছেন। হি হি, ঠিক দিনেই এসেছেন। আজ মঙ্গলবার। আজকেই তো দেখবেন। হি হি, দেখুন। দেখতেই হবে। আসুন। দেখে যান।''

ডাক্তারবাবু একবার ভাবলেন, পালিয়ে যাবেন কি না। কিন্তু, দরজাটা...

''পালানো এত সোজা, ডাক্তারবাবু?''

আলুবাবু খপ করে ধরে নিলেন ডাক্তারবাবুর হাত, যেন মনের কথা পড়তে পারছেন।

সরু সরু আঙুল যেন এঁটে বসেছে ডাক্তারের কবজিতে। একটা রোগা প্যাংলা অসুস্থ লোক যে অসম্ভব গায়ের জোরে একটা ঘরের দিকে হিড়হিড় করে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন, তা অস্বাভাবিক। ডাক্তারবাবু বেশ বুঝতে পারছিলেন, এই শক্তির বিপক্ষে লড়াই করা তাঁর কর্ম নয়।

শোবার ঘরে নিয়ে এসে, আলুবাবু ডাক্তারবাবুকে দাঁড় করিয়ে দিলেন একটা পুরোনো আমলের ড্রেসিং টেবিলের সামনে। বিশাল একটা আয়না লাগানো তাতে। এত বড়ো আয়না আজকের ড্রেসিং টেবিলে থাকে না।

হি হি করে হেসে উঠলেন আলুবাবু।

বিস্ফারিত চোখে ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন, আলুবাবুর প্রতিবিম্বটাও ডান হাতে ধরে আছে ডাক্তারবাবুর দক্ষিণ হস্ত।

জোর করে হাত ছাড়াতে গেলেন ডাক্তারবাবু, পারলেন না। আঙুলগুলো এঁটে বসেছে তাঁর কবজিতে। অসহায় চোখে তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন। উলটোদিকে একটা বক্স খাট। তারও প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়। ডাক্তারবাবু দেখলেন আয়নার ভেতরে খাটের ওপর একটা লোমওয়ালা ধবধবে সাদা বেড়াল। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পেছন ফিরলেন ডাক্তারবাবু। খাট ফাঁকা। আবার আয়নার দিকে তাকালেন। বেড়ালটা মুচকি হাসছে ডাক্তারবাবুর অবস্থা দেখে। আলুবাবুও হেসেই চলেছেন। মাথায় যেন ঘা মারছে সেই হাসি।

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারছিলেন, তাঁর আর কিছু করার নেই। একটা খবর আসবে। আসার কথা নয়। তাঁর জীবনে এমন কিছু উত্থান-পতন সম্প্রতি ঘটেনি যে কোনো খবর আসতে পারে। তা ছাড়া, তাঁর কোনো খবর আলুবাবুর বাড়িতে কীভাবে আসতে পারে? তবু তিনি জানেন... ভয়ংকরভাবে... নিশ্চিতভাবে তিনি জানেন... একটা ভালো খবর এখনই আসবে। আর...

অসহায়ভাবে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই অবাঞ্ছিত ভালো খবরটার জন্য।



ঝিঁবুঁটি

সঞ্চারী চক্রবর্তী চ্যাটার্জী



পলাশপুর জায়গাটা ভারী সুন্দর। একটা শান্ত নদী বয়ে চলেছে, তাকে ঘিরেই এই ছোট্ট গ্রাম। যেদিকে চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে দিনে দুটো ট্রেন। একটা সকালে, আরেকটা বিকেলে। আমি এখানে একাই থাকি। অনেকদিন হল। নিজের মতো নিজে থাকি, রান্না করি, খাই, ঘুমোই। এই বেশ ভালো আছি আমি। কেউ এখানে আমায় জ্বালাতন করে না। উঠতে-বসতে কেউ কথা শোনায় না। শহরে থাকতে পাড়া-প্রতিবেশীর আমাকে নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিল না।

"এত বড়ো মেয়ে, এখনও বিয়ে দিচ্ছেন না, আর কবে দেবেন?"

"ছোটোমেয়েটার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, একে বিয়ে দেবেন কী করে?" এই এক ঘ্যানঘেনে প্রশ্নে আমার বাবা-মায়ের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

আমিই যেন ওদের জীবনের একমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ। এদিকে আমার ধনুকভাঙা পণ, আমিও পড়াশোনা শেষ না করে বিয়ে করব না। বাবা-মা অনেক বুঝিয়েছেন, "বিয়ে করে নে, বয়স বেড়ে গেলে জৌলুস চলে যাবে।"

হা হা। আমার আবার জৌলুস। আমি জানি আমি বাজে দেখতে। কালো, মোটা, নাক-মুখ চোখা নয়। সবাই বলে আমি আমার বাবার মতো দেখতে। যমকালো। আমার বোনকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। ফরসা, লম্বা। নিয়মিত যোগব্যায়াম আর ডায়েট করে। পড়াশোনাতেও ভালো। সবাই বাবা-মা-কে বলে, আপনাদের দুই মেয়ে একদম বিপরীত তা-ই না? আমার অসহ্য লাগে। আরে, পৃথিবীতে সবাইকে সুন্দর আর পড়াশোনায় ভালো হতে হবে নাকি? আশ্চর্য তো? সবাই সুন্দর হলে কুৎসিত কে হবে? সবাই ফার্স্ট-সেকেন্ড হলে লাস্ট কে হবে? এটাই কেউ বোঝে না।

ছোটো থেকে এই এক কথা শুনে আসছি, "পিউ, তুই এত মাথামোটা কেন রে? প্রত্যেকটা ক্লাসে দুই থেকে তিন বছর করে থাকিস।"

"তোর বোনকে দেখ, তোর থেকে কত ছোটো হয়ে এখন তোকে টপকে তোর থেকে উঁচু ক্লাসে পড়ে।"

"তোর দ্বারা কিস্‌সু হবে না। ওয়ার্থলেস মেয়ে একটা।"

"একটু হলুদ মাখ মুখে, দেখ যদি রংটা একটু খোলে।"

"সবসময় টাইট ব্রা পরে থাকবি বুঝলি? বুকটা নিটোল হবে। মেয়েদের তো ওটাই আসল।"

হুহ্! মেয়েদের ওইটাই আসল। কী কথা। ওইটার তলায় যে একটা নরম তুলতুলে মন আছে, সেটার খবর কয়জন রাখে শুনি? সর্বক্ষণ এইসব শুনে যে সেটায় ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয়, তার খবর কে রাখে?

রাতদিন এইসব শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে আমি এখানে চলে এসেছি। এখানে দুই কামরার একটা বাড়িতে থাকি আমি। এটা আমার বড়োঠাকুমার বাড়ি। বড়োঠাকুমা বলতে বাবার সৎমা। আমার ঠাকুরদা এঁকে আগে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর হঠাৎ ঠাকুমা অর্থাৎ আমার বাবার নিজের মা এবং বড়োঠাকুমার আপন মায়ের পেটের বোনের রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়েন। বিয়ের বছর ঘোরার পরেও সন্তান হচ্ছে না—এই অপবাদ দিয়ে বড়োঠাকুমাকে এখানে রেখে যান আমার ঠাকুরদা। বড়োঠাকুমা অনেক কেঁদেছিলেন, দাদুর পায়ে অব্দি ধরেছিলেন। দাদু কোনো কথা শোনেননি। বড়োঠাকুমার এই অজ্ঞাতবাসে মানিয়ে নিতে প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হয়েছিল। পরে অবশ্য এই জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। ঠিক যেমন এখন আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কী শান্ত পরিবেশ, কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না। তা যা বলছিলাম। কী বলছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, আমার বড়োঠাকুমার কথা। বড়োঠাকুমাকে আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি। দাদু-ঠাকুমা বরাবরই শহরে সংসার করেছেন। এক ছেলে অর্থাৎ আমার বাবাকে নিয়ে খুব গর্ব করতেন। আমার বাবা অধ্যাপক ছিলেন। রিসার্চ স্কলার। অসম্ভব ভালো পড়াশোনায়। সেখানে বাবার মেয়ে হয়ে কী করে যে আমি এমন হলাম, কে জানে? বাবা তাঁর কলেজের কোনো অনুষ্ঠানে আমায় নিয়ে যেতেন না। লজ্জা পেতেন। বাবার আশা ছিল, আমি বড়ো হয়ে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হব।

কিন্তু আমি কী করব বলুন তো, আমার যে মাথায় কিছুই ঢোকে না। পুরো ফাঁকা মাথার ভেতরটা। কত মুখস্থ করার চেষ্টা করি, কিছুতেই কিছু মনে থাকে না।

একবার রাগ করে কী করেছিলাম জানেন?

বইয়ের পাতাগুলো কুটিকুটি করে একটা ডেকচিতে গরম জলে ফুটিয়েছিলাম। তারপর সেটা গ্লাসে ঢেলে, ঠান্ডা করে, মিইয়ে-যাওয়া পাতার টুকরো সমেত সেই জল ঢকঢক করে গিলে ফেলেছিলাম। বাবা সেদিন খুব মেরেছিল। এমন মেরেছিল যে আমার হাতের আঙুলগুলো অনেকদিন নাড়াতে পারিনি। লাঠি দিয়ে মেরেছিল হাতে, পায়ের গাঁটগুলোতে। অসহ্য যন্ত্রণা থেকে জ্বর এসে গিয়েছিল আমার। কেউ আমার কোনো পরিচর্যা করেনি। বোন দরজার আড়াল থেকে দেখত আর মিটিমিটি হাসত। আমি মার খেলে ও খুব আনন্দ পেত। হাসলে ওর গালে টোল পড়ত, কোনার দিকের গজদাঁতটা বেরিয়ে পড়ে ওকে যেন আরও মোহময়ী করে তুলত। আমার যদিও ওকে একটুও সুন্দর লাগত না, কেমন যেন রাক্ষসীর মতো হাসিটা। ওর চোখ দুটোতে সবসময় হিংসার আগুন জ্বলতে দেখতে পেতাম আমি।

সেদিন যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখেছিলাম, বাবা আমার সাধের হারমোনিয়ামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। দাউদাউ করে জ্বলছে আমার প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটা। বাবা এক-এক করে আমার স্বরলিপির খাতাগুলো তাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছেন। আগুনের সেই গনগনে আঁচে বাবাকে একজন অধ্যাপক নয়, মনে হচ্ছিল নরকের আগুন থেকে উঠে-আসা সাক্ষাৎ শয়তান।

আচ্ছা, বাবা হারমোনিয়ামটা পোড়ালেন কেন? আমি তো গানটা বেশ ভালোই গাইতাম, অন্তত পাড়া-প্রতিবেশী তা-ই বলত। সবাই বলত, মেয়েটার লেখাপড়ায় মাথা না থাকলে কী হবে, গানটা দারুণ গায়। আমি তো পারতাম গাইতে। ওই একটা জিনিস করতেই আমার অসম্ভব ভালো লাগত। আনন্দ হলে গাইতাম, দুঃখ হলে গাইতাম, কান্না পেলে গাইতাম। সুরের থেকে বড়ো বন্ধু আর কেউ ছিল না আমার।

সাত দিন ভুগে ওঠার পর আবার পড়াশোনা করতে শুরু করলাম। বাবা আর নতুন বইখাতা কিনে দিলেন না। বোন ততদিনে মাস্টার্সের ফাইনাল ইয়ার আর আমি এদিকে মাধ্যমিকের গণ্ডিও পেরোতে পারিনি, প্রাইভেটে পরীক্ষা দিচ্ছি। এই বয়সে আর স্কুলে যাওয়া যায় না। বোনের বইখাতাগুলোই ট্রাংক থেকে বের করে ঝেড়ে-মুছে পড়তে শুরু করলাম। কালো অক্ষরগুলো আবার কেমন যেন হিজিবিজি হয়ে আমার চোখের সামনে ডিগবাজি খেতে শুরু করল।

আমার পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যেত রাস্তার উলটোদিকে নরেশদার চায়ের দোকান। প্রতিদিন সকাল সাতটায়, ইস্ত্রি-করা রঙিন শার্ট-প্যান্ট পরে, ধোপদুরস্ত হয়ে দোকান খুলত নরেশদা। ওর দোকানে ঘুগনি, ব্রেড-অমলেট থেকে শুরু করে আদা চা, লেবু চা, লিকার চা, মশলা চা—সব পাওয়া যেত। আর পাওয়া যেত প্রজাপতি বিস্কুট, যা দেখে আমার মনেও প্রজাপতি উড়ত।

ওর দোকানে ট্রানজিস্টারে বাজত, 'দেখা হ্যায় পহেলিবার সাজন কি আঁখো মে পেয়ার'।

আমি জানালার পর্দা ফাঁক করে সেদিকে তাকাতাম। চোখাচুখি হলেই ও হাত দিয়ে নিজের কপালের সামনে আসা চুলগুলো সরাত আর আমার বুক ধড়াস করে উঠত।

এর মধ্যেই বাবা কোথা থেকে একজন সরকারি কেরানিকে নিয়ে এলেন আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য। বোনকে সেদিন মাসির বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। বোন সামনে থাকলে আমাকে আর কেউ পছন্দ করবে না। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম সেদিন। আজ যদি লোকটা আমাকে পছন্দ করে বিয়েও করে নিল, কে বলতে পারে বিয়ের পর আমার বোনকে দেখে তার আপশোশ হবে না? তারপর সে যদি আমার ঠাকুরদার মতো আমায় ছেড়ে দিয়ে আমার বোনকে বিয়ে করে ফ্যালে, তখন? সত্যি, বাবা এত লেখাপড়া করেও কেন এত বোকা? আমি বুঝতে পারি না।

তা সেই ভদ্রলোক এলেন। আমায় আপাদমস্তক দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ বেশির ভাগ সময়েই আমার স্তনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার মনে হয়, উনি বুঝতে পেরেছিলেন শরীরের স্থূলতা অনুযায়ী আমার স্তন দুটি বেশ ছোটো আর আমি সেটা ঢাকবার জন্য প্যাডযুক্ত ব্রা পরে রয়েছি। সেদিন রাজকীয় ভোজ সেরে সেই পাত্র ও তাঁর বাড়ির লোক চলে গেলেন, বলে গেলেন, পরে জানাবেন। এক সপ্তাহ পরেও কোনো খোঁজখবর না পেয়ে বাবা নিজেই ফোন করলেন। পাত্রপক্ষ জানালেন, আমাকে তাঁদের পছন্দ হয়নি, বাবা চাইলে ওঁরা আমার ছোটোবোনের ব্যাপারে ভেবে দেখতে পারেন। মা অবাক চোখে বসার ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। সেখানে যে সোফাটায় সেদিন আমি বসেছিলাম, তার মাথার ওপরেই ঝুলছিল বোনের গজদাঁত বের করা, গালে টোল-ফেলা মনোমুগ্ধকর হাসিওয়ালা একটা ছবি। মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

মিনমিন করে বললেন, "এই ছবিটা আমি তো সরিয়ে ফেলেছিলাম, এটা আবার কে লাগাল এখানে?"

আমি জানতাম, কে রেখেছিল। আমি বোনের হাসিমুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ঠোঁটে হাসি থাকলেও সেদিন ওর দুই চোখে ছিল আমার জন্য একরাশ করুণা। তারপর আর বেশি দিন শহরে থাকিনি। চলে এসেছিলাম এই পলাশপুরে। কেউ বাধা দেয়নি বাড়ি থেকে। সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। শুধু আসার সময় একমাত্র একজনের চোখেই দেখেছিলাম বিষাদের ছায়া। সেদিন তার চায়ের দোকানের ট্রানজিস্টারে বাজছিল, 'না জাও সইয়াঁ, ছুড়াকে বইয়াঁ'।

এখানে বইখাতাগুলো নিয়ে এসেছিলাম আমি। কিছুই মাথায় না ঢুকলেও মাঝে মাঝে পাতা উলটে-পালটে দেখি আর গান গাই। একদিন পাশের ঘরটা পরিষ্কার করতে করতে একটা জিনিস পাই আমি। আমার বড়োঠাকুমার হাতে লেখা একটা ডায়েরি। রাতে খেয়ে উঠে ওটা নিয়ে বসলাম। পড়তে পড়তে আমি কেমন যেন অবশ হয়ে পড়লাম। এ তো আমারই জীবনকাহিনি লেখা ডায়েরির প্রতিটি পাতায়। বড়োঠাকুমাকেও পদে পদে অপদস্থ হতে হত তাঁর রং-রূপের জন্য। ঠাকুমারও কোনোদিন পড়ায় মন বসত না আর সব থেকে বড়ো কথা হল, ঠাকুমাও আমার মতো গান গাইতে ভালোবাসতেন।

একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম এখানে থাকতে থাকতে। এই বাড়ির পেছনের বেদেদের বস্তির মানুষের সঙ্গে ঠাকুমার খুব ভাব জন্মেছিল। ঠাকুমা ওদের থেকে অনেক টোটকা শিখেছিলেন। সেগুলো কাজে লাগিয়ে অনেক মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা করে গ্রামে বেশ নামও করেছিলেন তিনি। সবাই তাঁকে বদ্যি বুড়ি ডাকত। অনেকের অনেক পুরোনো রোগ নাকি তিনি সারিয়ে তুলেছিলেন। ডায়েরির পাতায় পাতায় লেখা রোগের নাম, তার লক্ষণ আর তার চিকিৎসাপদ্ধতি। আমার বেশ মজা লাগছিল পড়তে।

এইভাবেই পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল আমার। সেখানে লেখা ছিল, ঝিকুটের কর্মক্ষমতা

বৃদ্ধির উপায়।

ঝিকুট? সেটা আবার কী?

মানে না বুঝেই পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে বুঝলাম ঝিকুট হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ককে কী পদ্ধতিতে উর্বর করা যায়, সেই পদ্ধতি লেখা রয়েছে এখানে। মনে হল, আরে, এ তো আমার জন্যেই লেখা। চটপট পদ্ধতি পড়ে ফেললাম। পড়ার পরেই কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠল আমার। দৌড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে হড়হড় করে বমি করে ফেললাম। এ কি সম্ভব নাকি?

কিন্তু আমার মাথায় যেন গেঁথে বসে রইল বিষয়টা। কিছুতেই মাথা থেকে বের করতে পারলাম না। দু-দিন পর নিজের মনকে শান্ত করলাম। না, আমি এই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করব। যা হয় হবে। সকালবেলা বেদেপাড়ায় গেলাম। সেখানে সবাই খুব মান্যগণ্য করত আমায়, আমি বড়োঠাকুমার নাতনি বলে, সেখানকার একজন বিশ্বস্ত অল্পবয়সি ছেলেকে সব কথা খুলে বললাম। বিশু নাম ছেলেটার। দরকারে-অদরকারে আমার অনেক কাজ করে দেয় সে। ভারী ভালো ছেলে। আমার খুব ন্যাওটা। এই ছেলের নাকি ছোটোবেলা এমন এক মারণব্যাধি হয়েছিল যে বাঁচার কোনো আশা ছিল না। আমার ঠাকুমা তখন নানা ধরনের জড়িবুটি বেটে তাকে খাওয়ান। ছেলেটি যমের মুখ থেকে ফিরে আসে। সেই থেকে ও আর ওর পুরো পরিবার আমার ঠাকুমা আর তার পরিবারের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ছেলেটিকে বলতেই দেখলাম, সে রাজি হয়ে গেল।

আমায় ফিসফিস করে বলল, ''আইজ রাত্যে জাগি থাইকবেন, শেষরাতের দিক্যে আমি জিনিসটো আনি দুব।''

বিশু নিজের কথা রেখেছিল। শেষরাতে আমি বারান্দায় বসে আছি। পুব আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারা। রাত্রির একটা নিজস্ব শব্দ রয়েছে আর রয়েছে একটা আলাদা গন্ধ। আমি মন দিয়ে অনুভব করতে চাইছিলাম সেই রাত্রির কালো রং। আমার কানে ভেসে আসছে নিরন্তর নদীর জলের ছলাতছল শব্দ আর নিরবচ্ছিন্নভাবে ডেকে-চলা ঝিঁঝি আর ব্যাঙের কনসার্ট। হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খানখান করে ডেকে উঠল এক রাতজাগা পাখি আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দার গ্রিলের ওপারে এসে দাঁড়াল আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা এক ছায়ামূর্তি। আচমকা বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভালো করে দেখে তার অবয়ব চিনতে পারলাম। এটা বিশু। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে একটা ছোটো মোড়ানো কচুপাতা আমার দিকে এগিয়ে দিল সে।

ফিসফিস করে বলল, ''ইটাকে তু জুত করি ঝাল মশলা দিই বানায় খা।''

ঠিক তখনই দূরে কোথায় যেন হুক্কাহুয়া শব্দে শিয়াল ডেকে উঠল। আমি চমকে উঠলাম, পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে বিশুর থেকে নিলাম পাতাটা। উফফ, কী গরম জিনিসটা, ভেতরে কিছু একটা যেন দপদপ করছে মনে হচ্ছে। নাকে একটা আঁশটে, কাঁচা রক্তের গন্ধ ধাক্কা মারল। গা-টা গুলিয়ে উঠল আমার। পাতাটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম, সারারাত জাগার ফলে বোধহয় ঘুম এসে যাবে তাড়াতাড়ি। কিন্তু নাহ্, এল না ঘুম। বাকি রাতটা বিছানায় ছটফট করতে লাগলাম। এপাশ-ওপাশ করতে করতেই জানালা দিয়ে একসময় দেখলাম, পুব আকাশ লাল হল। ভোর হচ্ছে তার মানে। আমি উঠে পড়লাম। কাঁপা-কাঁপা হাতে ফ্রিজের দরজা খুলে বের করলাম জিনিসটা। আমার বুকে হাতুড়ি পিটছে যেন। পাতার মোড়ক খুলে সিংকের মধ্যে রাখলাম। দেখেই গা গুলিয়ে উঠল আমার। জল দিয়ে ভালো করে ধুলাম। কড়াইতে তেল গরম করলাম। অন্যান্য দিনের থেকে গোটা গরমমশলা ফোড়নটা একটু বেশিই দিলাম। তারপর পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচালংকা দিয়ে বেশ কষিয়ে রান্না করলাম, ওপরে ছড়িয়ে দিলাম গাওয়া ঘি আর গরমমশলার গুঁড়ো। খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছিল। আমার এখন আর ভয় বা ঘেন্না কোনোটাই করছে না। আমি আমার মনকে বুঝিয়েছি, আমি কোনো অন্যায় করছি না। যুগ যুগ ধরে প্রাণীকুল এইভাবেই বেঁচে আছে। আমার মন সেটা বিশ্বাস করেছে।

আমি একটা বিষয় লক্ষ করেছি, জানেন?

আপনার মন আপনাকে প্রথমে একটা বাস্তবসম্মত কথা বলবে, আপনি যদি সেটাকে একবার পাত্তা না দিয়ে মনকে বুঝিয়ে ফেলতে পারেন যে আপনি যেটা করছেন বা ভাবছেন, সেটাই ঠিক—ব্যাস, তবে কেল্লা ফতে। আপনার আর কোনো চিন্তা নেই, এবার আপনি যেটা চান, ঠিক সেটাই মন বলবে।

একটা খুন্তি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখলাম সেদ্ধ হয়েছে কি না। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, হয়ে গেছে।

একটা প্লেটে চামচ দিয়ে কিছুটা তুলে নিয়ে আয়েশ করে চেয়ারে বসলাম। আমি একটা অতীব সুস্বাদু বস্তু খাচ্ছি, বুঝলি মন? এতে কোনো ঘেন্না নেই। একটা চামচ দিয়ে কেটে আমি মুখে দিলাম।

আহা! কী অপূর্ব স্বাদ, তুলতুলে নরম। মুখে দিলেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

সত্যি, বড়োঠাকুমার ডায়েরিটা না পড়লে জানতেই পারতাম না এত সুস্বাদু খেতে হয় 'শৃগাল ঝিকুট'।

এরপর এটাই আমার রোজকার নিয়ম হয়ে গেল। বিশু একদিন ছেড়ে একদিন আমাকে এনে দিতে লাগল শিয়ালের ঘিলু বা ঝিকুট। শিয়ালের যে মারাত্মক বুদ্ধি হয়। ওর বুদ্ধিগুলো এবার আমার মাথায় চলে আসবে। ভাবতেই মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে আমার। আমি এবার এক চান্সেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সব পাস করে যাব। হয়তো ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ারও হয়ে যেতে পারি। বাবা, মা, বোন অবাক হয়ে যাবে, আর কেউ আমায় মাথামোটা বলবে না।

প্রায় তিন-চার মাস খাওয়ার পরেও যখন কোনো উন্নতি হল না আমার মস্তিষ্কের, তখন আমি মুষড়ে পড়লাম।

বিশুর একটা কথা খুব মনে ধরল আমার। বেশি মশলা দেওয়ার কারণে হয়তো ঘিলুর খাদ্যগুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি তখন বিশুর পরামর্শমতো গরম জলে ঘিলু সেদ্ধ করে খেতে লাগলাম। তাতেও কোনো লাভ হল না। উলটে আশপাশের গ্রাম থেকে শেয়ালের সংখ্যা এতই কমে আসতে লাগল যে বিশুর পক্ষে সপ্তাহে তিনটে করে শিয়ালের ঘিলু সাপ্লাই দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

বিশুর সঙ্গে আবার পরামর্শ করলাম। এবার বিশু আমায় আরেকটা বুদ্ধি দিল। বিশু বলল ওইসব শিয়ালের ঘিলু খেয়ে কোনো লাভ নেই, আমার মানুষের ঘিলু খাওয়া উচিত।

আমার এই কথাটা বেশ লাগল। ঠিকই তো বলেছে বিশু, পৃথিবীতে সব থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী হল মানুষ। কিন্তু মানুষের ঘিলু পাওয়া কি চারটিখানি কথা? আমি আর বিশু বিকেলের ট্রেনে শহরে যাই। কলকাতার বেশ্যাপাড়া সংলগ্ন জায়গায় আমি গিয়ে দাঁড়াই। কেউ না কেউ আমার কাছে আসে, তাকে নিয়ে সস্তার লজে চলে আসি। তারপর সে মেতে ওঠে আমার সঙ্গে আদিম খেলায়। বেশ জমে ওঠে খেলাটা। দুই-একদিন এমন খেলার পর তার যখন আমার নেশা ধরে যায়, তখন একদিন তাকে আমার বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসি। বাড়িতে খেলাটা জমে ভালো। বিশু লুকিয়ে থাকে পাশের ঘরে।

এমনভাবে খেলতে খেলতে চরম উত্তেজনার মুহূর্তে সে যখন আমার ওপরে উপগত হয়ে দুর্দম গতিতে আমায় নিষ্পেষণ করতে থাকে, ঠিক তখনই শ্বাপদের মতো সন্তর্পণে ঘরে ঢোকে বিশু। অতি সাবধানে পেছন থেকে তার নলির ওপর আড়াআড়ি চালিয়ে দেয় ছুরিটা। লোকটা কাটা পাঁঠার মতো মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে একসময় থেমে যায়। গলা দিয়ে একটাও শব্দ বেরোয় না। বিশু পাকা হাতে লোকটার মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে নেয়, তারপর কায়দা করে মাথার খুলিতে বাড়ি মেরে সেটা ফাটিয়ে নিখুঁত হাতে বের করে আনে ঘিলুটা। আমি চটজলদি সেটা একটা বাটিতে তুলে নিই। বিশু তারপর দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ভরে ফ্যালে একটা টিনের বাক্সে। ঘরটা মুছে, পরিষ্কার করে, বডি স্প্রে-র বোতলটা ফাঁকা করে ফেলি। শেষরাতে বিশু স্যুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে যায় নিঃসাড়ে। একটা গোটা মানুষ হঠাৎ করেই নেই হয়ে যায়। স্যুটকেসের ভেতরের কাটা শরীরটা নিয়ে বিশু কী করে তা নিয়ে আমি কোনোদিন আগ্রহ প্রকাশ করি না। যা পারে করুক গে, আমার কী?

ডোবায় ফেলে দিক, জঙ্গলে পুঁতে দিক অথবা রান্না করে নিজেই খেয়ে নিক—আমার কী? আমার ঘিলু পেলেই হল।

এইভাবেই একদিন বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় গিয়ে মারাত্মক বৃষ্টিতে রাস্তায় আটকে পড়লাম। কোথায় যাই, কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে মনে এল বোনের বাড়ি তো কাছেই। ওর বাড়ি গেলে কেমন হয়?

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। উঠলাম ওর বাড়ি। খুব বড়োলোক স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ওর। স্বামী অর্ধেক দিন ট্যুরে থাকেন, ওকে সোনাদানায় মুড়ে রেখেছেন একেবারে। আমি সেই রাতটা ওর বাড়ি কাটিয়ে পরের দিন ফিরে যাব বললাম। অনেক রাত অব্দি ও গল্প করল আমার সঙ্গে। বেশির ভাগই ওর সুখের গল্প, স্বামী সোহাগের গল্প। ওর চোখে স্পষ্ট অহংকারের ছাপ। শেষরাত্রে যখন ও ঘুমিয়ে পড়ল, ওর সুখী-সুখী মুখটার ওপর কাচের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছিল ঠিক টোলের জায়গাটা। এবার আর বিশু নয়, আমিই চালিয়ে দিলাম আলতো করে ছুরিটা ওর নরম তুলতুলে গলার নলি বরাবর।

আজ সকালে বাড়ি ফিরেছি। বড্ড ক্লান্ত। কাল রাতে বোনের বাড়ি এত খেয়েছি যে তার ঢেকুর এখনও উঠছে কিছু খাব না ঠিক করলাম। ট্রেনের জার্নিতে গা দিয়ে ঘামের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আমি স্নান ঘরে ঢুকলাম। এবার শুধু ঘিলু নয়, আরও দুটো জিনিস কেটে নিজের সঙ্গে রেখেছিলাম আমি। স্নান সেরে নগ্ন অবস্থায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করছিলাম। বোনের কাটা স্তনট নিজের বুকের ওপর রাখলাম। বড়ো বিসদৃশ লাগছে দেখতে কালো শরীরে ফরসা দুটো রক্তাক্ত স্তন।

''না রে, তোকে ঠিক মানাচ্ছে না।''

কে?

কে বলল কথাটা? আমি পেছন ফিরে দেখলাম। কই, কেউ তো নেই?

মনের ভুল হয়তো আমার।

এবার টেবিল থেকে তুলে নিলাম ওর গালের চামড়াটা। নিজের গালের ওপর ফেলে দেখলাম।

কিন্তু এ কী! আমার গালে টোল পড়ছে না কেন? খুব রাগ হল আমার। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম আমি। কেন? কেন? কেন বড়োঠাকুমার টোটকা কাজ করছে না আমার ওপর?

আয়নায় দেখলাম, আমার মাথার পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা মুখ। পেছন থেকে দুটো হাত আমায় জড়িয়ে ধরেছে। তার হাত দুটো আড়াআড়িভাবে আমার বুকের ওপর রাখা। সেই মুখটা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, ''দিদি, তুই হাজার চেষ্টা করলেও আমার মতো সুন্দর হতে পারবি না। তুই কুৎসিত ছিলিস, আছিস আর সারাজীবন কুৎসিতই থাকবি। আর আমি মৃত্যুর পরেও সবার মনে সুন্দর হয়েই বেঁচে থাকব। হা হা হা।''

আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

খাটের ওপর তখন বড়োঠাকুমার লেখা ডায়েরির 'ঝিকুটের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়' পাতাটা পতপত করে উড়ছে।

যার শেষে ছোট্ট করে গোটা গোটা অক্ষরে ঠাকুমা লিখে গেছেন—'সাবধান! ঝিকুটের অতিরিক্ত সেবনে মানসিক বিকৃতি অনিবার্য।'









“ইজ দেয়ার এনিবডি হিয়ার?”

অন্ধকার ঘরটার চারদিকে একবার ভয়ে ভয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাঁপতে-থাকা গলায় প্রশ্নটা করলেন মিসেস বেইলি।

কিন্তু কোনো উত্তর এল না। শুধু নিস্তব্ধ ফাঁকা ঘরটার নৈঃশব্দ্য যেন ওঁর কথাটাকেই প্রতিধ্বনিত করে ফিরিয়ে দিল। মিসেস বেইলির হাতটা এখনও ছুঁয়ে আছে কাঠের টেবিলের উপর রাখা উইজা বোর্ডের হার্ট শেপের প্ল্যানচেটটার উপর।

টেবিলটা এবার যেন সামান্য একটু নড়ে উঠল! মিসেস বেইলি বুঝতে পারলেন, উনি ছাড়াও এই ঘরে আরও একজনের আবির্ভাব ঘটেছে এই মুহূর্তে। কিন্তু তাকে চোখে দেখা যায় না। ছোঁয়াও যায় না। তবে তার উপস্থিতি খুব ভালো করেই অনুভব করা যায়। ভয়ার্ত গলায় উনি আরও একবার জিজ্ঞেস করলেন, “ক্যান ইউ হিয়ার মি? আপনি কি আমায় শুনতে পাচ্ছেন?”

পুনরায় সেই একই ধরনের নীরবতা ঘিরে ধরল মিসেস বেইলিকে। তবে এইবার চারদিকের জানালা-দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও টেবিলের উপর রাখা জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাটা হঠাৎ করে কেন জানি কেঁপে উঠল। তার সঙ্গেই শুরু হল একটা অদ্ভুত বিরক্তিকর ঘ্যাসঘেঁসে আওয়াজ। কোনো কিছু যেন অনবরত ঘষা খেয়ে চলেছে!

চমকে উঠলেন মিসেস বেইলি! এটা কীসের আওয়াজ? মনে তো হচ্ছে যেন বাঁদিকের দেওয়ালটা থেকে আসছে।

শব্দটা অনুসরণ করে সেইদিকে তাকাতেই ওঁর চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এটা উনি কী দেখছেন! দেওয়ালের হুকে টাঙানো ক্যালেন্ডারটা নিজের থেকেই ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করেছে। ক্রমশ সেই দোলনের গতি বেড়ে চলেছে। বেড়েই চলেছে।

এ... এ... এ কী! ক্যালেন্ডারটা তো এবার হুকের চারিদিকে বনবন করে ঘুরতে শুরু করল।

বিস্মিত চোখে মিসেস বেইলি দেখতে পেলেন, ক্যালেন্ডারের মধ্যে ইংরেজি শব্দের বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে আজকের তারিখটা... 13th May, 1994... Friday...

হ্যাঁ, Friday the 13th... এই রাতটার জন্যই তো এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন মিসেস বেইলি। আজ ওঁর স্বপ্নপূরণ

হবে! ওঁর এত বছর ধরে বয়ে-চলা একটা কৌতূহলের নিরসন হবে আজ। উনি পুনরায় মনোনিবেশ করলেন উইজা বোর্ডের দিকে।

''আপনি কি আমায় শুনতে পাচ্ছেন? পারলে... অনুগ্রহ করে আমার কথার জবাব দিন।''

মিসেস বেইলির হাতে ধরে-রাখা কাঠের প্ল্যানচেটটা এবার সামান্য কেঁপে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে নিজের থেকেই এগিয়ে যেতে থাকল উইজা বোর্ডের ঠিক ডানদিকের উপরের কোণটার দিকে। এইবার সেই কোণ থেকে আবার এগিয়ে চলল বাঁদিকের কোণের দিকে। তারপর সামান্য গতি বাড়িয়ে সেটা আবার নেমে আসতে লাগল নীচের কোণটার দিকে। এইবার আরও দ্রুতগতিতে ছুটে চলল উইজা বোর্ডের চতুর্থ কোণের দিকে। একবার... দুবার... তিনবার... বারংবার একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলল। হাতের প্ল্যানচেটটাকে শক্ত করে চেপে ধরেও তাকে থামাতে পারলেন না মিসেস বেইলি। অদ্ভুত এক ক্ষমতাবলে ওঁর হাত সমেত প্ল্যানচেটটা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলতে লাগল উইজা বোর্ডের কোনায় কোনায়...

এ...এ...এটা কী হচ্ছে! বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল মিসেস বেইলির কপাল জুড়ে। উনি আগেই শুনেছিলেন, প্ল্যানচেটের এইভাবে উইজা বোর্ডের কোনায় কোনায় ঘুরে বেড়ানোর অর্থ হচ্ছে শয়তানের আবির্ভাব!

মারাত্মক এক ভয়ে, আতঙ্কে মিসেস বেইলি তাড়াতাড়ি হাতে ধরা প্ল্যানচেটটা বোর্ডের উপর থেকে তুলে নিয়েই ছুড়ে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেতে। আর পরক্ষণেই ওঁর মনে হল, 'ওহ্ মাই গড! এটা আমি কী করলাম? ফাদার বলেছিলেন, কোনো অবস্থাতেই যেন কাঠের প্ল্যানচেটটা মাটিতে না পড়ে... তাহলে শয়তানের জন্য এই পৃথিবীর দরজা মুক্ত হয়ে যাবে। আর আমি কিনা সেই ভুলটাই করলাম! এইবার কী হবে..?''

আসন্ন ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কায় সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল মিসেস বেইলির। উনি তাড়াতাড়ি হৃদয়ের আকৃতির ছোটো কাঠের টুকরোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে এনে উইজা বোর্ডের উপর রেখে দিলেন। তারপর নিষ্পলক ভীত চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে।

কিছু সময় অতিবাহিত হল। কাঠের প্ল্যানচেটটা এখনও স্থির জড়পদার্থের মতোই পড়ে আছে বোর্ডের উপর। এক মিনিট... দু-মিনিট... তিন মিনিট করে করে প্রায় মিনিট দশেক সময় এইভাবে অতিবাহিত হল। গভীর রাতের থমথমে নীরবতায়, মিসেস বেইলি প্রতিমুহূর্তে যেন নিজের হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলেন।

একটা সময় উনি যখন একটু নিশ্চিন্ত হলেন যে আর কিছু ঘটবে না হয়তো। ঠিক এমন সময় ঘড়ঘড় করে একটা যান্ত্রিক শব্দ তুলে হঠাৎ নড়ে উঠল প্ল্যানচেটটা। আর তারপরেই বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল বোর্ডের উপর লেখা ইংরেজির '0' অক্ষরটার দিকে। এরপর '9'... '8'... '7'... '6'... '5'...

সারা শরীরের রক্ত যেন এক লহমায় জমাট বেঁধে গেল মিসেস বেইলির! মনে পড়ে গেল ফাদারের সেই সাবধানবাণী...

প্ল্যানচেট যদি কখনও উলটো নাম্বার কাউন্ট করা শুরু করে, তার অর্থ বুঝে নিতে হবে, শয়তান তোমাকে তার বশে করে নিয়েছে... অথবা বশ করার চেষ্টা করছে। আর এই দুই ক্ষেত্রেই জীবনহানির সম্ভাবনা প্রবল মাত্রায় থাকে।

ভয়ে নিশ্বাসটা কেমন যেন বন্ধ হয়ে এল মিসেস বেইলির। ওঁরও কি তাহলে এখন জীবনসংশয় হতে চলেছে? উনি কি তাহলে এখন মারা যাবেন? অন্ধকারের মধ্যেই ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে পাগলের মতো ছুটে চললেন মিসেস বেইলি। নিজের জোরালো নিশ্বাসের শব্দকে ছাপিয়েও উনি শুনতে পেলেন, এক অদৃশ্য পায়ের শব্দ ক্রমশই যেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে ওঁর দিকেই।

না না... এক নয়, দুজনের এগিয়ে আসার শব্দ পাচ্ছেন উনি... নাহ্, দুজনও ঠিক নয়... এ তো তিনজনের পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে...

এ...এ...এ কী...! তিনও তো নয়... এ...এ যে চার... পাঁচ... ছয়... সাত... উফফফ...

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মিশে-থাকা একটা ভিড় ক্রমশ যেন চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে লাগল মিসেস বেইলিকে।

দরজার কাছে পৌঁছেই কাঁপতে-থাকা হাতে কোনোমতে লকটা খুলে ফেললেন উনি। এইবার শুধু বাইরে বেরোনোর অপেক্ষা, তাহলেই উনি মুক্তি পেয়ে যাবেন এই অদৃশ্য শয়তানগুলোর হাত থেকে। প্রতিমুহূর্তেই পায়ের শব্দগুলো যেন আরও... আরও কাছে এগিয়ে আসছে ওঁর।

নাঃ... আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। একটানে দরজার পাল্লাটা খুলে ফেললেন মিসেস বেইলি।

আহঃ...! একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল ওঁর গলা থেকে। এইবার এই অভিশপ্ত বাংলো ছেড়ে পালিয়ে যেতে আর কোনো বাধাই রইল না। তাড়াতাড়ি দরজার বাইরে পা

রাখতে গেলেন মিসেস বেইলি, আর ঠিক তখনই উনি অনুভব করলেন, কেউ বা কারা ওঁকে যেন শক্ত করে পিছনদিক থেকে চেপে ধরেছে! আর শুধু চেপেই ধরেনি... ধীরে ধীরে ওঁকে আবার টেনে নিয়ে চলেছে সেই অন্ধকার ঘরটার ভিতরদিকে। মারাত্মক এক বিভীষিকায় দরজাটাকেই দুই হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করতে লাগলেন মিসেস বেইলি, ''হেল্প... হেল্প... প্লিজ সামবডি হেল্প মি...''

কিন্তু গভীর রাতের নির্জনতা, আর এই ফাঁকা জনবিরল পরিবেশ উপেক্ষা করে সেই চিৎকার কারও কানে গিয়েই পৌঁছোল না। মিসেস বেইলি খুব ভালোই বুঝতে পারলেন, ওঁর সামান্য শক্তির দ্বারা উনি আর বেশিক্ষণ ওদের প্রতিহত করতে পারবেন না। ধীরে ধীরে দরজার উপর ওঁর হাতের বন্ধন আলগা হতে লাগল। এবং একটা সময় সেই হাত ফসকে গিয়ে মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন মিসেস বেইলি। ওঁর চোখের সামনেই পুনরায় দরজাটা আবার ধড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। একটা গুমোট শ্বাসরোধকারী অন্ধকারে ভরে উঠল ঘরটা।

বুকে ভর করে মাটিতে পড়ে-থাকা মিসেস বেইলি হঠাৎ অনুভব করলেন, ওঁর পা দুটো ক্রমশই যেন নিজের থেকে হাওয়ায় ভেসে উঠছে। উনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, ওঁর দুই পা এই মুহূর্তে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রয়েছে একাধিক হাত, কিন্তু তাদের কাউকেই উনি দেখতে পারছেন না। এর থেকে বেশি কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক প্রচণ্ড টানে উনি মাটিতে ঘষতে ঘষতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেন ঘরের ভিতরের জমাট কালো অন্ধকারের দিকে।

তার কিছুক্ষণ পরেই সমগ্র ডাকবাংলোটা কেঁপে উঠল এক মর্মভেদী আর্ত চিৎকারে...

''আ...আ...আ...আ...আ...''

* * * * * * * *

বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মি. ধৃতিমান মুখার্জির লাল রঙের বিএমডব্লিউ গাড়িটা যখন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস রোডকে ডানদিকে রেখে বাঘগোরা রোড ধরে এগিয়ে চলল, ঘড়িতে তখন বিকেল চারটে বেজে পনেরো মিনিট। সূর্য ডোবার সময় এখনও হয়নি। তবে একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘন মেঘে আকাশ এখনও কালো করে রয়েছে। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তেই হয়তো আবার ঝমঝমিয়ে নেমে আসতে পারে। রাস্তাঘাটে প্রয়োজনের তুলনায় আলোর পরিমাণ বেশ কমে এসেছে। গাড়ির ড্রাইভার বিনয় তামাং, গাড়ির হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে খুব সন্তর্পণেই এগিয়ে চলছিল পথ দিয়ে।

সময়টা শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। বর্ষা এখনও পুরোপুরি বিদেয় নেয়নি বঙ্গ থেকে। তার মধ্যে এইসব এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই হয়ে থাকে।

পিছনের সিটে বসে-থাকা ধৃতিমানবাবু গাড়ির বন্ধ কাচ দিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হঠাৎ উৎফুল্ল গলায় বলে উঠলেন, ''তোমাদের বলেছিলাম না, এ সময়টা বেশ বৃষ্টি হয় এদিকটায়। যখন-তখন আকাশ কালো করে ঝুপ করে নেমে আসে। তবে মেঘ কেটে গেলে সেই বৃষ্টি থামতে বেশি সময় লাগে না। আর এটাই হল এই জায়গাটার আসল মজা।''

ধৃতিমানবাবুর বয়স আটষট্টি ছুঁইছুঁই। কিন্তু এখনও নিয়মিত শরীরচর্চা আর যোগব্যায়াম করার কারণে ওঁকে দেখে বয়সের আন্দাজ করাটা বেশ মুশকিল হয়। স্ত্রী গত হয়েছেন আজ তা-ও প্রায় বছর পাঁচেক হতে চলল। বর্তমানে দুই ছেলে... অর্থাৎ অংশুমান আর গৌরব, একমাত্র মেয়ে তিতির, আর বড়ো ছেলের বউ নীহারিকা এবং আট বছরের নাতি শুভমকে নিয়েই ওঁর সংসার। তার মধ্যে আবার বাড়ির সব থেকে খুদে সদস্যের সঙ্গে ওঁর সখ্যও সবচেয়ে বেশি।

শুভমকে বাড়ির সকলে আদর করে রিকু বলে ডাকে। রিকু এতক্ষণ গাড়ির সামনের সিটে নিজের বাবার পাশে বসে একমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। দাদাইয়ের মুখে ওই কথাটা শোনামাত্রই ও মুখ ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে খুব কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করল, ''দাদাই, আমরা কি তাহলে এখন চেরাপুঞ্জি যাচ্ছি? আমি বুকসে পড়েছি, সেখানেই নাকি সব থেকে বেশি বৃষ্টি হয়।''

''না দাদুভাই... এটা চেরাপুঞ্জি নয়। এই জায়গাটার নাম হল কার্সিয়াং। আর আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেটা এখান থেকে আরও তিরিশ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম... নাম মহলদিরাম।''

''গ্রাম...! ইউ মিন টু সে ভিলেইজ?'' রিকুর মুখটা হঠাৎ করে কেমন যেন কুঁচকে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিরক্তি-জড়ানো গলায় ও বলে উঠল, ''দাদাই, আমরা গ্রামে কেন যাচ্ছি? এর থেকে তো কোনো হিল স্টেশনে গেলে বেশি মজা হত।''

নিজের নাতির কথায় এবার হেসে ফেললেন ধৃতিমানবাবু। তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, ''বাইরের হিল স্টেশন

তো অনেক দেখলে দাদুভাই। এবার তোমায় আমি আমাদের পশ্চিমবাংলার হিল স্টেশন দেখাব। দেখবে, নেহাত মন্দ লাগবে না।"

রিকু মহা আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "আহা কী মজা, আমরা হিল স্টেশনে যাচ্ছি।"

বছর তিনেক আগে, মহলদিরাম ফরেস্টের থেকে মাইল দুয়েক দূরত্বে একটা পরিত্যক্ত সাহেবি বাংলো কিনেছিলেন ধৃতিমানবাবু। ইচ্ছা ছিল, ঘন বর্ষায় যখন সমগ্র উত্তরবঙ্গ ঢেকে যাবে গাঢ় সবুজের আড়ালে, তখন ওই চা-বাগান আর অরণ্যে ঘেরা সাহেবি বাংলোয় এসে দিনকয়েক পরিবার নিয়ে কাটিয়ে যাবেন সেই সবুজের মাঝে। সেই আশায় বাংলোটিকে পুনঃসংস্করণও করিয়েছিলেন ধৃতিমানবাবু। কিন্তু বিগত দু-বছরে আসব আসব করেও ওঁর এখানে আসা হয়ে ওঠেনি। এই বছর তাই একপ্রকার জেদের বশেই মহলদিরামে ঘুরতে আসার প্রোগ্রামটা ঠিক করেছিলেন উনি। যদিও ছোটোছেলে গৌরব বিজনেস ট্যুরে দেশের বাইরে থাকায় সে আসতে পারেনি। তবে গৌরব ছাড়াই পরিবারের বাকি সকল সদস্যকে নিয়ে ধৃতিমানবাবু চলে এইবার চলে এসেছেন কার্সিয়াঙের পাহাড়-ঘেরা ছোটো গ্রাম মহলদিরামে।

গাড়িটা যখন বাঘগোরা রোড ধরে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে এসে ছোট্ট একটা বাঁক নিয়ে অপেক্ষাকৃত সরু একটা রোডে উঠল... বাইরের দৃশ্যাবলি তখন অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগের রাস্তার মতো এই জায়গাটায় লোকজনের বসবাস একদমই নেই। ফাঁকা পথের দুই ধার ঘিরে আছে ঘন জঙ্গলে। আর সেই জঙ্গলের দৈত্যাকার গাছের সারিরা দুইপাশ থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রায় ঢেকে ফেলেছে উপরের আকাশটাকে। দিনের আলোর প্রাচুর্য এখানে বড়োই কম। পথের নিস্তব্ধতা আর নীরবতা এখানে অদ্ভুত এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে গোটা পথ জুড়ে।

বৃষ্টি-ভেজা জানালার ঘোলাটে কাচে মাথা রেখে, কানে হেডফোন গুঁজে, একমনে এতক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল তিতির। ধৃতিমানবাবুর এই কন্যাটি সদ্য আটাশ পেরিয়েছে কিছুদিন আগে। বিয়ে-থা এখনও করেনি। ভালো করে বলতে গেলে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছাই ওর নেই। ধৃতিমানবাবুও অবশ্য এই বিষয় নিয়ে খুব বেশি জোরাজুরি করেন না ওকে। হয়তো একমাত্র মেয়ে বলেই অপত্যস্নেহটা একটু বেশি।

এই রাস্তায় ঢোকার পর থেকেই কোথা থেকে যেন একটা নাম-না-জানা পাখির অদ্ভুত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। তিতির হেডফোনটা কান থেকে নামিয়ে ভালো করে শোনার চেষ্টা করল সেই ডাক। কিন্তু কোথা থেকে যে আসছে, ও বুঝে উঠতে পারল না। জঙ্গলের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ ওর চোখ পড়ল রাস্তার ধারে লাগানো একটা সাইনবোর্ডের উপর। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ছ্যাঁত করে উঠল।

ও ঠিক দেখল তো? আরও একবার ঘুরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল সাইনবোর্ডটাকে।

হ্যাঁ... ও একদম ঠিকই দেখেছে! কোনোই ভুল হয়নি ওর। সাইনবোর্ডের উপর ইংরেজি হরফের বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে...

"ডাওহিল রোড।"

এই নামটা...! এই নামটা বড্ড চেনা ওর। কিন্তু কোথায় যে শুনেছে...

ডাওহিল... ডাওহিল... ডাওহিল..

'ডাওহিল' শব্দটা নিজের মনেই বার তিনেক বিড়বিড় করল তিতির। কিন্তু নাঃ... কিছুতেই মনে করতে পারছে না কোথায় শুনেছে ও এই নাম। রাস্তার পাশের ঘন জঙ্গলটার দিকে আরও একবার ভালো করে তাকাল ও। আর সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত একটা আতঙ্কে বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল ওর।

উফফ... এই জঙ্গলটাকেও যে ওর প্রচণ্ড চেনা বলে মনে হচ্ছে! আর শুধু চেনা নয়... কেন জানি মনে হচ্ছে, এই জঙ্গলের ভিতরে ও আগে কখনও ঢুকেছে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? এই জায়গায় তো ও এর আগে কখনও আসেইনি। তবে...?

নিজের মনেই গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল তিতির। অন্ধকার হয়ে-থাকা এই জঙ্গলটাকে ও যতই দেখছে, ততই যেন একটা অদ্ভুত টান অনুভব করছে ওর প্রতি। কিন্তু কেন? কীসের এই আকর্ষণ? মাথার ভিতরটা কেমন যেন তোলপাড় করে উঠল ওর। ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না, ওর এইরকম অদ্ভুত অনুভূতি হওয়ার পিছনে কারণটা কী থাকতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনবরত একই ভাবনায় ডুবে থাকার পর, আচমকা একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলে গেল তিতিরের মাথায়। ওর মনে পড়ে গেল... কোথায় শুনেছে ও এই নামটা। কেন এত চেনা লাগছে এই জঙ্গলটাকে।

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে এক বন্ধুর মুখে তিতির প্রথমবার শুনেছিল উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ জঙ্গল ডাওহিল ফরেস্টের নাম। তারপর বেশ কয়েকদিন ইউটিউব আর

গুগ্‌ল ঘেঁটে এই জঙ্গল সম্পর্কে অনেক তথ্যই জোগাড় করেছিল ও। ও জেনেছিল, এই জঙ্গলের আনাচকানাচে, গভীর রাতের অন্ধকারে এখনও নাকি লুকিয়ে থাকে পরলোকের ভয়ংকর সব বাসিন্দা। তারা সন্ধের পর একে একে সব বেরিয়ে আসে এই ডাওহিল রোডের ধারে। তখন যদি কোনো অচেনা পথিক বা কোনো গাড়ি ভুলবশত এই পথ দিয়ে যায়, তাহলে তাদের ভুলিয়েভালিয়ে এই জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যায় সেই অশরীরীরা।

তারপর...! তারপর হয় সেই পথিক চিরতরে হারিয়ে যায় এই পৃথিবীর বুক থেকে, অথবা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় এই জঙ্গলেরই ভিতর।

বিজ্ঞান যদিও এই অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনায় এখনও বিশ্বাস করে না। কিন্তু তবুও মানুষ হারিয়ে যাওয়ার এই অদ্ভুত রহস্যের কিনারা করার জন্য বেশ কয়েকবার সরকার থেকে কয়েকটি দল পাঠিয়েছিল এই জঙ্গলে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কিছুই। তাদের সকলকেই প্রায় নিরাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে এই জঙ্গল থেকে। এই অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটার কোনো কারণই কেউ খুঁজে পায়নি আজ অবধি।

তবে কারণ থাক আর না-ই থাক, রহস্য কিন্তু এখনও সেই একই জায়গায় থেকে গেছে। না হয়েছে এর কোনো মীমাংসা। আর না পাওয়া গেছে কোনো সমাধানসূত্র।

''আচ্ছা, এটাই কি সেই ডাওহিল ফরেস্ট, যেটাকে এখনও লোকেরা হন্টেড ফরেস্ট বলে?''

মোবাইলের গানটা অফ করে একটু ইতস্ততভাবেই ড্রাইভার বিনয়ের উদ্দেশে প্রশ্নটা করল তিতির। কিন্তু বিনয় কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই তিতিরের পাশে বসে-থাকা ধৃতিমানবাবুর বড়োছেলের বউ নীহারিকা বিস্মিত গলায় বলে উঠল, ''ওহ্‌ মাই গড। কী বলছ তিতির? এটা হন্টেড ফরেস্ট?''

তিতির নীহারিকার ভীত মুখটার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, ''হ্যাঁ বউমণি... আমি তো তা-ই শুনেছি।''

হঠাৎ সামনের সিট থেকে হো হো করে হেসে উঠল অংশুমান। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, ''তিতির... তুই আর বদলালি না... সারাক্ষণ নেটে বসে যত রাজ্যের আজগুবি সব ভূতের খবর পড়বি। তারপর যেখানেই যাবি, সেখানেই ভূত খুঁজে বেড়াবি।''

দাদার কথায় তিতির এবার একটু বিরক্ত হয়ে কিছু বলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ড্রাইভার বিনয় তামাং হঠাৎ বলে উঠল, ''ম্যাডাম কিন্তু ভুল কিছু বলেননি দাদাবাবু। এই জঙ্গলে সত্যিই কিছু আছে। খুব খারাপ এই জঙ্গল। কত লোকের যে জীবন নিয়েছে, আর কত লোক যে এখান থেকে বেপাত্তা হয়ে গেছে... তার আপনারা কিছুই জানেন না।''

''হোয়াট রাবিশ! কী যা-তা কথা বলছ এসব? কী আছে এই জঙ্গলে? ভূত?''

''তাদের ভূত বলে, নাকি কোনো খারাপ আত্মা বলে... তা তো জানি না দাদাবাবু। তবে এইটা জানি, তারা মানুষের ক্ষতি করে। খুউউব ক্ষতি...''

বিনয় একটু থেমে আবার বলল, ''আর শুধু এই জঙ্গলে কেন? আপনারা যে বাংলোটা কিনেছেন, সেখানেও তো...''

কথাটা বলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে গেল বিনয়। ও যেন এতক্ষণ ধরে এই কথাটা চেপে রাখতে চাইছিল, কিন্তু হঠাৎ করে ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছে। অংশুমান এবার একটু বিরক্ত হয়েই বলল, ''উফফ... আবার কী হল? থামলে কেন? বলো কী বলছিলে?''

''থাক দাদাবাবু... এসব কথা এখন বাদ দিন। গাড়িতে মেয়েমানুষ আছে, বাচ্চাও আছে... ওরা ভয় পেয়ে যাবে।''

অংশুমান এইবার বেশ ঝাঁজালো গলাতেই বলল, ''সেসব নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি যা বলছিলে, সেটা বলো।''

অংশুমানের আদেশ শুনেও বিনয়ের ইতস্তত ভাবটা যেন কিছুতেই যেতে চাইল না। ও বুঝে উঠতে পারছিল না, কথাগুলো বলা আদৌ ঠিক হবে কি না। ধৃতিমানবাবু বিনয়ের মনের ভাবটা বুঝতে পেরে খুব শান্ত গলায় বললেন,

''বিনয়... তুমি যেটা বলতে চাইছিলে, সেটা নিশ্চিন্তে বলো... এখানে কেউ তোমায় কিছু বলবে না।''

বছর চল্লিশের বিনয় এবার যেন নিজের মনে একটু সাহস পেল। গাড়ির স্টিয়ারিংটা শক্ত করে ধরে, সামনের রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ও বলতে শুরু করল, ''বড়োবাবু... আমার কথা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, তবুও বলছি... এখন আপনারা যে বাংলোটাতে যাচ্ছেন, সেটা একদম ঠিকঠাক নয়। বহুত খারাপ খারাপ কথা শোনা যায় ওটার সম্পর্কে।''

''খারাপ কথা! কীসের খারাপ কথা?'' অবাক হয়ে গেলেন ধৃতিমানবাবু।

''এই বাংলোটা আসলে একজন ইংরেজ সাহেবের ছিল। নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তবে শোনা যায়, নিজের ফূর্তির জন্য ওই সাহেব এটা বানিয়েছিল। কিন্তু পরের দিকে ও এটাকে একটা অন্য কাজে ব্যবহার করতে শুরু করল।''

"অন্য কাজ! কী কাজ সেটা?" গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা করল অংশুমান।

"তখনকার দিনে যে বা যারাই স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিত, সাহেব লোক লাগিয়ে তাদের পুরো পরিবারকেই ধরে নিয়ে আসত নিজের বাংলোতে। তারপর সেখানে ওদের প্রথমে খুব নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত, আর এরপর ওদের মরদেহগুলো পুঁতে দিত ওখানকার জমিতেই। এরকম কত যে মরদেহ পোঁতা আছে ওই বাংলোর জমিতে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এমনকি আমি এটা পর্যন্ত শুনেছি যে এই ডাওহিল জঙ্গলের মাটির নীচেও নাকি ওই সাহেব অনেক স্বদেশির লাশ কবর দিয়েছিলেন।"

"তারপর?" পিছনের সিট থেকে একটু কৌতূহলী গলাতেই জিজ্ঞেস করল তিতির।

"সাহেবের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলেছিল বেশ কয়েক মাস ধরে। তারপর হঠাৎ একদিন সকালে সাহেবের বেয়াড়া তাকে চা দিতে গিয়ে দেখল, সাহেবের বিছানা খালি পড়ে আছে। সেখানে কেউ নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি হল কয়েকদিন ধরে। কিন্তু ওই সাহেবের কোনো হদিশই আর পাওয়া গেল না। রাতারাতি একটা মানুষ যে আচমকা কোথায় হারিয়ে গেল... সেটা সবার কাছে অজানাই থেকে গেল।

এই ঘটনার প্রায় মাস ছয়েক পরের কথা... ওই ইংরেজ সাহেবের এক নিকট আত্মীয় থাকত কলকাতায়। নাম জর্ডন সাহেব। সেই জর্ডন সাহেব একদিন নিজের স্ত্রী, আর তার পুত্রসন্তানকে নিয়ে হঠাৎ করে এসে থাকতে শুরু করল এই মহলদিরামের বাংলোয়। দিনকয়েক সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু তারপর একদিন সকালে হঠাৎ করে জর্ডন সাহেবের পুরো পরিবারটাই নিখোঁজ হয়ে গেল ওই বাংলো থেকে। অনেক খানাতল্লাশির পর সেইবার ওদের খোঁজ পাওয়া গেল ঠিকই। কিন্তু তখন আর ওরা কেউই জীবিত অবস্থায় ছিল না। ওদের তিনজনেরই মরদেহ উদ্ধার করা হল এই ডাওহিল জঙ্গলের তিনটে গাছ থেকে... ঝুলন্ত অবস্থায়!"

কথাটা শোনামাত্রই বিস্মিত গলায় নীহারিকা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, কেন এমন ঘটছিল, তার কি কোনোই কারণ জানা যায়নি?"

এর উত্তরে বিনয় বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "এখানকার লোকেরা বলে, ওই নিষ্ঠুর সাহেব যেসব নিরপরাধ মানুষকে বিনা দোষে হত্যা করেছিল, তাদের বিদেহী আত্মাই নাকি ওঁর উপর এই প্রতিশোধটা নিয়েছিল। এমনকি শুধু ওঁর উপরেই নয়... জর্ডন সাহেব, তার পরিবার কিংবা এখানে আসা সব অপরিচিত মানুষের উপরেই ওরা নাকি সেই একই কারণে প্রতিশোধ নেয়। আর তাই জন্যই বলছিলাম..."

বিনয়ের কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই এইবার চিৎকার করে উঠল অংশুমান।

"কী কী কী... কী বলতে চাইছ তুমি? যে আমরাও এখানে অপরিচিত, তাই আমাদের উপরেও ওরা প্রতিশোধ নেবে... তা-ই তো? হোয়াট রাবিশ! শোনো, তোমার এই গালগপ্প না তুমি অন্য কোথাও শুনিয়ো, বুঝলে? তা ছাড়া তুমি যে ঘটনাগুলো বললে, সেগুলো তো সবই পুরোনো কথা। তার সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্কটা কোথায় শুনি?"

"আপনি শুধু শুধুই আমায় ভুল বুঝছেন দাদাবাবু। আপনাদের মিথ্যে ভয় দেখিয়ে আমার কী লাভ বলুন?"

"লাভক্ষতি জানি না... তুমি হয়তো আমাদের ভয় দেখিয়ে মনে মনে আনন্দ পাচ্ছ... ভাবছ এরা কত ভিতু... তাই তোমার আজগুবি কথাগুলো এত মনোযোগ দিয়ে শুনছে।"

"উফফ দাদা, এসব কী বলছিস তুই? উনি কেন মিছিমিছি আমাদের ভয় দেখিয়ে আনন্দ পেতে যাবেন?"

দাদার কথায় প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল তিতির। কিন্তু তাতে ফল হল উলটো। অংশুমান নিজের বোনের দিকে ঘুরে তাকিয়ে ঝাঁজালো গলায় বলল, "দেখ তিতির, যেটা বুঝিস না, সেটা নিয়ে বড়োদের মুখের উপর একদম কথা বলিস না। তা ছাড়া তোর তো এগুলো ভালো লাগবেই। সারাক্ষণ তো এই নিয়েই পড়ে থাকতে ভালোবাসিস তুই।"

ধৃতিমানবাবু এইবার বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ওঁর মনে হল, অংশুমান যেন প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই রাগ করছে। ওকে এবার থামানো দরকার। উনি ধমকের সুরে বলে উঠলেন, "আঃ... এসব কী হচ্ছে অংশু? বিনয়কে তো আমিই বলতে বলেছি। তুমি খামোখা ওকে কেন বকছ? তোমার শুনতে ইচ্ছা না হয় শুনো না। তবে কথার মাঝখানে আর বাধা দিয়ো না।"

বাবার কথার এইবার আর কোনো জবাব না দিল না অংশুমান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুপ করে গিয়ে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল ও। গাড়ির বাইরে তখন পুনরায় টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। তবে গাঢ় কালো মেঘের ঘনঘটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি এই বৃষ্টি, ভারী বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে।

জানালার কাচ দিয়ে তখন দূরের জঙ্গলটা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলছিল পিছনদিকে। ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না

কিছুই। মেঘলা বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দুর্ভেদ্য সেই জঙ্গলের সবকিছুই ঢেকে গিয়েছিল গাঢ় অন্ধকারে।

ধৃতিমানবাবু বিনয়ের উদ্দেশে বললেন, ''কী হে, থেমে গেলে যে বড়ো... বলো তারপর যেটা বলছিলে।''

বিনয় এবার কেমন যেন একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। গাড়ি চালাতে চালাতেই আড়চোখে ও একবার অংশুমানের দিকে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করল, ''মহলদিরামে এখন আপনারা যে ইংরেজ সাহেবের বাংলোটা কিনেছেন, ওঁর নাতনি একবার এসেছিল সেখানে। এটা তা-ও প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার কথা। উনি এসেছিল ওঁর দাদুর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজে বের করতে।''

''কারণ খুঁজে বের করতে এসেছিল? তা-ও আবার এত বছর বাদে? স্ট্রেঞ্জ!'' বিস্ময় প্রকাশ করল তিতির।

''হ্যাঁ ম্যাডাম। কিন্তু, একরাত ওই বাংলোতে থাকার পরেই, দ্বিতীয় দিন সকালে ওই মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল এই ডাওহিল জঙ্গলেই। ঝুলন্ত অবস্থায়।

এবার আপনারাই বলুন, যে জায়গায় এতগুলো মানুষ রহস্যময়ভাবে খুন হয়েছে, নিখোঁজ হয়েছে... সেই জায়গাটাকে কি ভালো জায়গা বলা যায়?''

বাইরে থেকে ঘনঘন ভেসে আসছে মেঘের গর্জন। আর তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে জল পড়ার ঝমঝম শব্দ। বিনয়ের কথার মাঝেই কখন যে হালকা বৃষ্টি ভারীতে পরিণত হয়েছে, তা কেউই খেয়াল করেনি। তবে গাড়ির বাইরে এখন যতই আওয়াজ হোক-না কেন, গাড়ির ভিতরে কিন্তু একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কারও মুখেই কোনো কথা নেই। অংশুমানকে বাদ দিয়ে সকলের চোখে-মুখেই ফুটে উঠেছে একটা উৎকণ্ঠার কালো ছাপ।

কী হবে? কী ঘটতে চলেছে ওই বাংলোতে? এই প্রশ্নই তখন সবার মনে তোলপাড় করে চলেছে।

* * * * * * * *

ধৃতিমানবাবুদের গাড়িটা যখন বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন বৃষ্টি থেমে গেলেও, চারিদিকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। রিকু গাড়ি থেকে নেমেই বাংলোটাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল, ''মাম্মা দ্যাখো, সেদিন আমরা যে হরর মুভিটা দেখছিলাম, পুরো সেই বাড়িটার মতোই দেখতে।''

নীহারিকা গাড়ি থেকে ব্যাগটা নামাতে নামাতে রিকুকে একটা বকা দিয়ে বলল, ''আঃ রিকু... কী হচ্ছে এসব? দুষ্টুমি করে না একদম।''

তবে ওকে বকা দিলেও, নীহারিকারও কেন জানি মনে হল, খুব একটা ভুল কথা বলেনি রিকু। সত্যিই বাড়িটার দিকে একঝলক তাকালেই হলিউড মুভির সেই হন্টেড হাউসগুলোর কথাই মাথায় আসে। বড়ো লোহার ফটক... তারপরেই একটা নুড়ি-ঢালা পথ সোজা চলে গেছে বাড়ি অবধি। পথের দু-ধারে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। সেই লনের চারপাশে আবার পাইন গাছের সারি। কালচে লাল ইটের তৈরি বাংলো, আর তার উপর টালি-দেওয়া ছাদটা ঢাল হয়ে নেমে গেছে দুইপাশে। সামনের দেওয়ালে একটা গ্যাবল রুফও করা আছে। যেটা দেখতে অনেকটা ঠিক ইংরেজির 'A' অক্ষরের মতো। ছাদের মাথায় রয়েছে একটা চৌকোনা আকৃতির চিমনি। যেটা দেখলেই বোঝা যায়, বহুকাল আগে এখান থেকে নির্গত হত ফায়ারপ্লেসের কালো ধোঁয়া। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আকাশমুখী সেই চিমনিটার দিকে চোখ পড়তেই নীহারিকার বুকটা কেন জানি হঠাৎ ছমছম করে উঠল।

গেটের বিহারি দারোয়ান ওদের ব্যাগপত্রগুলো তুলে ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ''কিচ্ছু ভাববেন না সাহাব... আমি আর চামেলি ইখানেই থাকি। আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। নিজের বিবি বলে বলছি না সাহাব, চামেলি সত্যি খুব ভালো রান্না করতে পারে। একবার খেলে সারাজীবন মনে থাকবে... আরে ও চামেলি... কহাঁ হ্যায় রে তু... জলদি আ... দেখ, সাহাবলোগ আ গ্যয়া হ্যায়।''

ভিতর থেকে আওয়াজ এল... ''জি আয়ি..''

তারপরেই একজন বছর তিরিশেকের মহিলা ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে নীহারিকা আর তিতিরের হাত থেকে ব্যাগগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই হাসিমুখে বলল, ''আইয়ে আইয়ে মেমসাব... অন্দর আইয়ে... আপনাদের জন্য আগে থেকে সব তৈয়ারি করেই রেখেছি।''

বাংলোর ভিতরে পা রাখামাত্রই সেখানকার অন্দরসজ্জা দেখে সকলেরই মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

আহা! কী অপূর্ব এই বাংলোটা। বাইরেটা দেখে যতই রহস্যময়, আর গা-ছমছমে মনে হোক-না কেন, ভিতরটা দেখলে সত্যিই চোখ ফেরানো দায়। কী নেই এখানে?

মাথার উপর ঝুলছে বিশালাকার ঝাড়বাতি। চারিদিকে সুন্দর করে সাজানো সব অ্যান্টিক আসবাবপত্র। বেলজিয়াম কাচের দেওয়াল আলমারিতে থরে থরে রাখা বিদেশি পাইপ আর স্কচের বোতল। এমনকি ঘরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত সজ্জিত করা আছে নানা রকমের অসাধারণ সব তৈলচিত্রে।

সাহেব যে খুবই শৌখিন আর আমুদে মানুষ ছিলেন, সেটা এই ঘরে পা দেওয়ামাত্রই যে কেউ বলে দিতে পারবে।

হলরুমের ঠিক মাঝখান থেকেই একটা তেল চকচকে বার্নিশ-করা কাঠের সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে দোতলায়। আর সেই সিঁড়ির গাঁ ঘেঁষেই রয়েছে ইটালিয়ান মার্বেলে তৈরি ফায়ারপ্লেস। পাশে রাখা রকিং চেয়ারটা দেখে সহজেই বোঝা যায়, সে সময় শীতের রাতগুলোতে এই চেয়ারে বসেই ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনে নিজের শরীরকে উত্তপ্ত রাখতেন সাহেব।

নীচতলার ঘরগুলোর মধ্যে একটা ঘর নিজেদের থাকার জন্য বেছে নিল অংশুমান। ধৃতিমানবাবুও পছন্দ করলেন নীচতলারই অপর একটা ঘর। কিন্তু কেন জানি তিতিরের একতলার রুমের চাইতে বেশি মনে ধরল দোতলার রুমগুলো। অবশ্য এর পিছনে একটা কারণ আছে, আর তা হল তিতির বরাবরই একটু ছিমছাম পরিবেশে থাকতে ভালোবাসে। খুব ঘিঞ্জি জায়গা ওর কোনোকালেই পছন্দ নয়। দোতলার ঘরগুলো একতলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত খোলামেলা আর ফাঁকা। নীচের মতো এখানে অত আসবাবপত্র বা বাহারি জিনিসের আধিক্য ছিল না। তাই প্রথম দেখাতেই তিতিরের মন টেনে নিল দোতলার ঘরগুলো।

* * * * * * * *

সারাদিনের গাড়ি জার্নির ধকলে সকলেই আজ বেশ ক্লান্ত হয়ে ছিল। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে তাই একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছিল সবাই। স্বাভাবিকভাবেই ঘুম আসতে কারোই খুব একটা দেরি হল না।

ঘড়ির কাঁটা সময় দেখাচ্ছে রাত বারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নীহারিকার। ঘরের বাইরের হলরুমে কে যেন দশ সেকেন্ড অন্তর অন্তর একটা 'ধপ' 'ধপ' শব্দ করছে।

এত রাতে কে এমন শব্দ করছে? বাবা কি তবে ঘুমোননি? কিন্তু কেন? ওঁর কি শরীর খারাপ লাগছে?

চিন্তিত মুখে পাশে ঘুমিয়ে-থাকা অংশুমানকে ডাকতে গেল নীহারিকা। আর সঙ্গে সঙ্গেই ও যা দেখল, তাতে ও মারাত্মক চমকে উঠল।

এ কী! রিকু গেল কোথায়?

অন্ধকার ঘরে নাইটল্যাম্পের নীলাভ আলোয় ও পরিষ্কার দেখতে পেল, অংশুমান আর ওর মাঝে থাকা বালিশটা একদম খালি পড়ে আছে। সেখানে রিকু নেই।

এত রাতে রিকু না বলে বাইরে চলে গেছে! এমনটা তো ও কখনও করে না। মারাত্মক এক দুশ্চিন্তায় তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল নীহারিকা। হলরুমের দিক থেকে মৃদু একটা খিলখিল হাসির শব্দ আসছে ওর কানে। এই আওয়াজ ওর চেনা। এটা রিকুর হাসির শব্দ। খুব খুশি হলে ও এইভাবেই হাসে।

কিন্তু এত রাতে ও কার সঙ্গে হাসছে?

কৌতূহলবশত হলরুমের দিকে এগিয়ে গেল নীহারিকা। এখান থেকে ধপধপ আওয়াজটা যেন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আরও কয়েক পা এগোতেই নীহারিকা দেখতে পেল, হলরুমে একটা মৃদু আলো জ্বলছে।

আরে... ওই তো রিকু! হাতে একটা ফুটবল নিয়ে ড্রপ খাইয়ে কার দিকে যেন ছুড়ে দিচ্ছে। আর পরমুহূর্তেই সেই বলটা আবার ড্রপ খেয়ে ওর হাতে ফিরে আসছে। কার সঙ্গে খেলছে ও?

হলরুমে রিকুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই নীহারিকার নজরে পড়ল, ওর থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরত্বে দরজার সামনে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। হাইট প্রায় রিকুরই সমান। আবছা অন্ধকারে ছেলেটার সারা শরীর দেখতে পাওয়া গেলেও, মুখটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। এত রাতে হলরুমের ভিতর আরেকটা অপরিচিত বাচ্চা ছেলেকে দেখে বেশ আশ্চর্য হল নীহারিকা। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, ''তোমার নাম কী?'' কিন্তু কোনো উত্তর এল না।

ও আবার জিজ্ঞেস করল, ''তোমার বাড়ি কোথায়?'' এইবারেও সেই একই নিস্তব্ধতা।

মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত সন্দেহ হল নীহারিকার। ও এবার বেশ রাগ দেখিয়ে বলল, ''কে তুমি... উত্তর দাও বলছি... বলো কে তুমি?''

আগের দুইবারের মতো এইবারেও ছেলেটা যখন একইভাবে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল, তখন ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে গেল নীহারিকা। ছেলেটার সামনে গিয়ে, ওর মুখের দিকে তাকাতেই বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল নীহারিকার। দরজার অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে...

রিকু!

বিদ্যুৎ গতিতে পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নীহারিকা। সেখানেও বল হাতে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে রিকু!

এটা কী করে সম্ভব? দু-দুটো রিকু কী করে হতে পারে? মাথার ভিতর সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল

নীহারিকার। ও দুজনের মধ্যে অমিল খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনোই অমিল খুঁজে পেল না। পার্থক্য বলতে শুধু এটাই নজরে পড়ল যে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা রিকুর মুখটা বড্ড বেশি ফ্যাকাশে, আর চোখগুলো কেমন যেন ঘোলাটে আর স্থির। অনেকটা ঠিক মরা মাছের মতো।

নীহারিকার এই মুহূর্তে ঠিক কী করণীয় তা ও বুঝে উঠতে পারছিল না।

অংশুমানকে কি একবার ডাক দেওয়া উচিত?

কথাটা চিন্তা করতেই হঠাৎ ও নিজের হাতে একটা হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করল। তারপরেই ও খেয়াল করল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা রিকু ওর হাত ধরে ওকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের বাইরে... ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে। অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ও নিজেকে যেন আটকে রাখতে পারছে না। কোনো এক অদ্ভুত আকর্ষণে নিজের সমস্ত বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এক-পা এক-পা করে নীহারিকা বেরিয়ে এল বাংলোর বাইরে। তারপর ধীরে ধীরে মিশে যেতে থাকল গভীর রাতের অন্ধকারের মধ্যে।

বল হাতে দাঁড়িয়ে-থাকা রিকু চিৎকার করে বলল, "মাম্মা যেয়ো নাআআআ... ওখানে ভূত আছেএএএ..."

কিন্তু নীহারিকার তখন শ্রবণশক্তি, বোধশক্তি সবই লোপ পেয়েছে। কোনো ভয়ংকর এক সম্মোহনী ক্ষমতার দ্বারা চালিত হয়ে ও যেন বাহ্যিক জগতের কোনো কিছুই আর উপলব্ধি করতে পারছে না।

রিকু বেশ কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বল হাতে নিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে ছুটে গেল নিজের বাবার কাছে।

"পাপা... জানো তো মাম্মাকে ভূত ধরে নিয়ে গেছে।"

"হোয়াট?"

ঘুম-জড়ানো চোখে ছেলের মুখ থেকে এরকম একটা কথা শুনে চমকে উঠল অংশুমান। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রিকুকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে চলল বাংলোর গেটের দিকে।

"নীহারিকা... নীহারিকা... কোথায় তুমি?"

কোনো জবাব এল না। রাতের অন্ধকারের মাঝেও অংশুমান দূর থেকে দেখতে পেল, বাংলোর লোহার গেটের একটা পাল্লা খোলা পড়ে আছে।

"নীহারিকা কি তবে এত রাতে গেটের বাইরে চলে গেছে?"

মারাত্মক ভয়ে, আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় পেটের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল অংশুমানের। তাড়াতাড়ি গেট লক্ষ্য করে ছুটে গেল ও। কিন্তু কোথায় নীহারিকা? গভীর রাতের শুনশান ফাঁকা রাস্তায় কোনো জনমনিষ্যি তো দূর, একটা পশুপাখি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে গেল কোথায় ও? কোনো বিপদ হল না তো? কেউ কি তুলে নিয়ে গেল ওকে? নাকি অন্ধকারে পথ হারাল?

নানারকম খারাপ চিন্তা যখন অংশুমানের মাথায় দুর্ভাবনার ঢেউ তুলছে, ঠিক তখনই ওর কানে এল একটি নারীকণ্ঠের ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। চমকে উঠে সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘুরে তাকাতেই ও দেখতে পেল, একজন মহিলা গেটের পাশে মাটিতে বসে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে।

আরে, এটা তো নীহারিকা! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল অংশুমান। দৌড়ে গিয়ে দুই হাতে ওকে জড়িয়ে ধরতেই নীহারিকা চিৎকার করে কেঁদে উঠল,

"অংশুউউউউ... তুমি আমার রিকুকে খুঁজে এনে দাও... ও আমায় ছেড়ে কোথায় চলে গেল এই অন্ধকারে..."

"এসব তুমি কী বলছ নীহারিকা! আমাদের রিকু তো আমাদের সঙ্গেই আছে... ও আবার কোথায় যাবে আমাদের ছেড়ে?"

"না না না... আমি জানি, তুমি আমায় মিথ্যা বলছ... আমি নিজে দেখেছি ওকে চলে যেতে... তোমার পায়ে পড়ি অংশু, আমার রিকুকে তুমি ফিরিয়ে এনে দাও..."

"উফফফ... তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? রিকু কোথাও যায়নি... ও আমাদের সঙ্গেই আছে... বিশ্বাস হচ্ছে না তো আমার কথা? তাহলে নিজের চোখেই চেয়ে দ্যাখো..."

রিকুর হাতটা টেনে ওকে নীহারিকার দিকে এগিয়ে দিল অংশুমান। নিজের ছেলেকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে খুশিতে, আনন্দে ওকে বুকে জড়িয়ে পাগলের মতো কেঁদে উঠল নীহারিকা।

অংশুমান সস্নেহে নীহারিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "অনেক রাত হয়ে গেছে... চলো, ঘরে চলো..."

বিছানায় শোয়ামাত্রই আজ ঘুম এসে গিয়েছিল তিতিরের। অন্যদিন হলে ও ঘুমের আগে বই পড়ে কিংবা মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে। কিন্তু আজ সেসবের কোনো কিছুই দরকার পড়েনি ওর। সারাদিনের ধকলে এতটাই ক্লান্ত হয়েছিল যে বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কখন যে চোখ দুটো বুজে গিয়েছিল, ও নিজেও টের পায়নি। কতক্ষণ এইভাবে ঘুমিয়ে ছিল তা-ও জানা নেই। হঠাৎ কানের কাছে একটা মৃদু ফিসফিস শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল তিতিরের। ও শুনতে

পেল, কেউ যেন খুব মিহি সুরে বলছে, ''তিতির... তিতির... তিতির...''

এত রাতে আবার ওর নাম ধরে কে ডাকাডাকি করছে? একটু বিরক্ত হয়েই চোখটা মেলে তাকাল ও।

কিন্তু এ কী! ঘরটা অন্ধকার কেন? একটু আগেই তো শোয়ার আগে ও নাইটল্যাম্পটা জ্বালিয়ে শুয়েছিল। তাহলে হঠাৎ কী হল? লাইটটা কি কেটে গেল?

বেশ অবাক হয়েই বালিশের পাশে রাখা মোবাইলটার দিকে হাত বাড়াল তিতির। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

কে এটা! ওর বিছানায় ওর সঙ্গে এটা কে শুয়ে আছে?

অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও, ও পরিষ্কার অনুভব করতে পারল, এই মুহূর্তে ওর ঠিক পাশেই কেউ একজন শুয়ে রয়েছে। আর ওর হাতটা রয়েছে সেই ব্যক্তিরই শুকিয়ে কাঠ হয়ে-যাওয়া শক্ত শরীরের হিমশীতল বুকের উপর। মারাত্মক এক বিভীষিকায় থরথর করে কেঁপে উঠল তিতির।

তীব্র গতিতে খাট থেকে নেমে পড়ল ও। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই দেওয়াল হাতড়ে কোনোমতে ছুটে গেল দরজার দিকে। দরজার ঠিক পাশেই ঘরের লাইটের সুইচগুলো। ভয়ে-আতঙ্কে পাগলের মতো সব ক-টা সুইচই অন করে দিল ও। এবার আলো জ্বলে উঠল।

কিন্তু এ কী! এটা কী করে সম্ভব? ও ছাড়া তো ঘরের ভিতর আর কেউই নেই! বিছানা তো একদম খালি পড়ে আছে। ও কি তাহলে ঘুমের চোখে ভুল ভাবল? কী জানি...

দেওয়ালে লাগানো বড়ো ঘড়িটায় সময় দেখাচ্ছে রাত দুটো বেজে পনেরো মিনিট। তার মানে ভোর হতে এখনও অনেক দেরি আছে। লাইটটা জ্বালিয়ে রেখেই আবার বিছানায় ফিরে এল তিতির। ও যখন আবার শুতে যাবে, ঠিক তখনই ওর নজরে পড়ল, বিছানার উপর বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে লেগে রয়েছে কাদামাটি। তার সঙ্গে রয়েছে দু-একটা ঘাসপাতার টুকরোও।

তার মানে তো এখানে কেউ এসেছিল। কিন্তু সে এখন আর নেই। তাহলে ও গেল কী করে? দরজা-জানালা তো সবই ভিতর থেকে বন্ধ। তারপরেও মানুষটা এইভাবে উধাও হয়ে গেল?

তিতির যখন শুয়ে শুয়ে এই কথাগুলোই চিন্তা করছিল, ঠিক তখনই ওর ঘরের আলোটা হঠাৎ করে দপদপ করতে শুরু করল... আর কিছুক্ষণ পরেই সেই আলো একেবারে নিভে গিয়ে সমস্ত ঘর ঢেকে গেল গাঢ় অন্ধকারে। এবার বেশ চমকে উঠল তিতির। ও বুঝে উঠতে পারল না ওর সঙ্গে এসব কী ঘটে চলেছে।

তাড়াতাড়ি নিজের বিছানা ছেড়ে নেমে ঘরের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করল তিতির। কিন্তু বাইরে বেরোনোর আগেই ও অনুভব করল, অন্ধকারের মধ্যে একটা বরফের মতো ঠান্ডা হাত এসে শক্ত করে চেপে ধরেছে ওর ডান হাতটাকে। সেই হাতের স্পর্শ পাওয়ামাত্রই তিতিরের সারা শরীরের রক্ত যেন এক লহমায় গলে জল হয়ে গেল। ও আবার শুনতে পেল, কেউ যেন ওর কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলছে, ''তিতির... তিতির... এদিকে এসো... এসো আমার সঙ্গে..''

উফফ... কী অদ্ভুত আর কী অবিশ্বাস্য মায়াবী সেই ডাক। শুনলেই সমস্ত মন-মস্তিষ্ক ক্রমশ যেন নেশাতুর হয়ে পড়ে। এই ডাকের আকর্ষণ উপেক্ষা করা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তিতিরও সেই আবেশে আবিষ্ট হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলল অন্ধকারের মধ্যেই।

দরজার পাল্লাটা যেন আগের থেকেই তৈরি হয়ে ছিল, ও সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেটা নিজের থেকে খুলে গেল। ঘরের তুলনায় বাইরের করিডোরের অন্ধকারটা অনেকটাই ফিকে। কোথা থেকে যেন একটা মৃদু আলো এসে পড়ছিল সেখানে। তিতির সেই আলো-আঁধারিতে ঢাকা করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। কয়েক পা চলার পরেই একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও। এই ঘরটার ভিতর থেকে খুব মোলায়েম সুরে ভেসে আসছে একটা পিয়ানোর শব্দ। কেউ যেন তার অন্তরের চেপে-রাখা ব্যথাটাকে উজাড় করে ঢেলে দিতে চাইছে পিয়ানোর করুণ সুরের মাধ্যমে।

আলতো হাতে ধাক্কা দিতেই একটা মিহি শব্দে খুলে গেল দরজাটা। ঘরের ভিতরে খুব সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে। তিতির ধীরে ধীরে প্রবেশ করল সেই ঘরে। যেইমাত্র ও ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড একটা শব্দে বাইরে থেকে ধড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। বুকটা কেঁপে উঠল তিতিরের। ও তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ওর সীমিত শক্তিতে দরজা খোলা তো দূরের কথা... সামান্য ফাঁক পর্যন্ত হল না। ভয়ে-আতঙ্কে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার করতে লাগল তিতির, ''কেউ আছওওও... আমি এই ঘরে বন্ধ হয়ে গেছিইইই... প্লিইইইজ কেউ এসে দরজাটা খুলে দিয়ে যাও...''

কিন্তু বাইরে থেকে ওর চিৎকারের কেউ কোনো জবাব

দিল না। ও চেষ্টা করে যেতে থাকল, "বাবাআআআ... দাদাআআআ... বউমণিইইই... তোমরা কি কেউ শুনতে পাচ্ছ আমার কথা... প্লিইইইজ আমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওওও..."

কিন্তু ওর সব চেষ্টা, সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হতে লাগল। বাইরে থেকে কারোই কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল তিতিরের। ও এখন কী করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। ওর মনে হল, এই বদ্ধ ঘরের ভিতর ও হয়তো দম বন্ধ করেই মারা যাবে এইবার।

হঠাৎ ও আবার সেই ডাক শুনতে পেল... " তিতির... তিতির..."

মারাত্মক রাগে দরজার থেকে মুখ ঘুরিয়ে পিছনদিকে তাকাল তিতির। চিৎকার করে বলল, "কে তুমি??? কী চাই তোমার আমার কাছে? কেন করছ আমার সঙ্গে এরকম?"

এর উত্তরে শুধু একটাই কথা ওর কানে এল... "মৃত্যু আজও সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি..."

তারপরেই আবার সেই পিয়ানোর করুণ সুরটা বেজে উঠল ঘরের ভিতর থেকে। তিতিরের এইবার কেন জানি মনে হল, এই ঘরে এমন কেউ আছে, যে ওকে কিছু বলতে চায়। হয়তো এমন কোনো কথা... যেটা এর আগে ও কাউকে বলে উঠতে পারেনি। কিংবা তার হয়তো এমন কোনো প্রশ্ন আছে, যার উত্তর একমাত্র ওর কাছেই আছে।

কিন্তু কী সেই প্রশ্ন?

তিতির এবার ঘরটার চারিদিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখল। খুব বড়োসড়ো না হলেও, একদম ছোটোও নয় ঘরটা। আসবাবপত্র প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। শুধু ঘরের মাঝামাঝি রাখা আছে একটা পিয়ানো, যার ঢাকনাটা এখন খোলা অবস্থায় আছে। দেখে মনে হল, কেউ যেন একটু আগেই বাজিয়ে গেছে এটা। এ ছাড়া জিনিসপত্র বলতে একটা কাঠের টেবিল, একটা চেয়ার আর একটা দেওয়াল আলমারি, যার মধ্যে ঠাসা রয়েছে ইংরেজি বইপত্র। টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। কে যে কখন এটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে তা জানা নেই। তবে এই মোমবাতিটাই হল এখন এই ঘরের একমাত্র আলোর উৎস।

কৌতূহলবশত টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তিতির। এটা কী রাখা আছে টেবিলের উপর? একটা চৌকোনা কাঠের বোর্ড, তার উপর আবার একটা কাগজ রাখা আছে পেন দিয়ে চাপা দেওয়া। কাগজটার মধ্যে আবার কী সব যেন লেখা রয়েছে ইংরেজিতে। কী লেখা আছে, সেটা দেখার জন্য কাগজটা হাতে তুলে নিতেই বোর্ডটার উপর চোখ আটকে গেল তিতিরের।

আরে, এটা তো একটা উইজা বোর্ড! অবাক হয়ে গেল ও। তার মানে এখানে প্ল্যানচেট করা হয়েছিল? কিন্তু কে করেছিল? আর কেনই বা করেছিল? ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে তিতির যতদূর জেনেছিল, তাতে ও জানত, উইজা বোর্ড একবার ব্যবহার করার পর সেটাকে সাতটা টুকরো করে ভেঙে মাটিতে পুঁতে দিতে হয়। নইলে ভয়ংকর বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই বোর্ডটা তো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। তাহলে কি এটা ব্যবহার করা হয়নি? নাকি ব্যবহারের পর এটাকে আর ভাঙা হয়নি?

অবাক বিস্ময়ে পাশের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল তিতির। ওর মাথার ভিতর তখন হাজারো প্রশ্নের ঝড় সবকিছু তোলপাড় করে দিচ্ছে। হঠাৎ ওর নজর পড়ল হাতের কাগজটার দিকে। মোমবাতিটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে, অত্যন্ত কৌতূহল সহকারে সেটা পড়তে শুরু করল ও।

কাগজটায় ইংরেজিতে যা লেখা আছে, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়...

হাই, আমার নাম শার্লট বেইলি। বয়স তিরিশ বছর। আমি পেশায় একজন সাংবাদিক, এবং আমার বর্তমান ঠিকানা... ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহর।

আজ দিনটা ১২ মে, ১৯৯৪ সাল। আর আমি যখন এই লেখাটা লিখতে বসছি, তখন ঘড়িতে সময় রাত দশটা বেজে পাঁচ মিনিট। এর মানে আমার হাতে এখনও আরও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। আর আমি চেষ্টা করছি, এই সময়ের মধ্যেই আপনাদের কাছে যতটা সম্ভব সত্যি ঘটনাগুলো তুলে ধরার। তাতে হয়তো আপনারা যাঁরা আমার এই লেখাটা পড়বেন, তাঁদের বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে।

যা-ই হোক, লেখাটা বিস্তারিতভাবে শুরু করার আগে আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই, আমার দেশ ইংল্যান্ড হলেও বর্তমানে আমি রয়েছি ভারতবর্ষের দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত ছোট্ট একটি গ্রাম... মহলদিরামে। আর ঠিক এই মুহূর্তে আমি বসে আছি সেই গ্রামেরই একটি নির্জন পরিত্যক্ত বাংলো বেইলি ভিলাতে।

এবার হয়তো আপনাদের অনেকের মনেই এই প্রশ্নটা আসছে যে আমি এখানে কেন এসেছি, কিংবা আমার এখানে আসার পিছনে উদ্দেশ্য কী? সেইসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে, আমি আজ আপনাদের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানিয়ে রাখতে চাই। হয়তো আজ রাতের পর এই সুযোগ

আমি আর কখনও পাব না। তাই আপনাদের সুবিধার্থে বলে রাখি, এই যে বেইলি ভিলার নাম আপনারা শুনলেন, তার মালিক হলেন মি. জেমস বেইলি। আর তিনি সম্পর্কে আমার ঠাকুরদা হন। যদিও বর্তমানে তিনি এখন আর নেই। কারণ মি. বেইলি বহুকাল আগেই এই বাংলো থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। আর কোথায় নিখোঁজ হয়েছেন তা কেউ জানে না।

যাক, এইসব প্রসঙ্গে আমি না হয় একটু পরে আসছি। তার আগে বরং একটা অন্য খবর দিয়ে রাখি। আজ থেকে প্রায় বছর চারেক আগে আমি একজন বাঙালি এনআরআই-কে বিয়ে করি। তার নাম মি. শুভংকর ব্যানার্জি। আমাদের লাভ ম্যারেজ হয়েছিল। এক বছরের ভালোবাসা, তারপর বিয়ে। শুভংকর ওর পুরো পরিবারের সঙ্গে বহুদিন ধরে ইংল্যান্ডেই থাকত। তবে ওর কিছু কাছের রিলেটিভস আছে, যারা এখনও ইন্ডিয়াতে থাকে। আর সেইজন্যই গত বছর আমরা সবাই মিলে এখানে ঘুরতে এসেছিলাম। ওর রিলেটিভদের সঙ্গে আমাকে ও দেখা করাতে নিয়ে এসেছিল। ওটাই ছিল আমার প্রথম ইন্ডিয়া ট্যুর। তবে ইন্ডিয়াতে তার আগে না এলেও, খুব ছোটোবেলা থেকেই এই দেশ সম্পর্কে আমি অনেক কথাই জানতাম। বিশেষ করে বাবার মুখ থেকে বহুবার শুনেছিলাম আমার ঠাকুরদা জেমস বেইলির কথা, আর শুনেছিলাম মহলদিরামের একটা বাংলো বাড়ি, 'বেইলি ভিলা'র গল্প। সেইসব গল্প শুনে শুনে ছোটোবেলা থেকেই আমার শিশু-হৃদয়ে এই বেইলি ভিলা সম্পর্কে আলাদা একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। মনে মনে ভাবতাম, যখন বড়ো হব... তখন একাই আসব এই বেইলি ভিলাতে... খুঁজে বের করার চেষ্টা করব আমার হারিয়ে-যাওয়া ঠাকুরদাকে।

এরপর আগের বছর আমরা যখন এখানে এলাম, তখন আমিই প্রথম শুভংকরকে বলেছিলাম মহলদিরামে আসার কথাটা। আমার এখনও মনে আছে, ও খুব হেসে হেসে বলেছিল, "এখানে আমার দাদুশ্বশুরের বাড়ি আছে জানতাম না তো। একবার তো তাহলে যেতেই হবে।" সত্যিই শুভংকরের মতো এত ভালো মনের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

সেইদিন আমরা যখন সবাই মিলে গাড়ি করে বেইলি ভিলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম, তখনও আমরা ঘুণাক্ষরেও বুঝিনি, কী ভয়ংকর ঘটনা আমাদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করে আছে। যদি বুঝতাম, তাহলে হয়তো ওখানে যাওয়া দূরের কথা, ওই জায়গার নামটাও আমি মুখে আনতাম না।

আমার আজও খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে... সেদিন ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল, পাশে বসে ছিল শুভংকর। পিছনের সিটে ওর বাবা, মা আর আমি বসেছিলাম। আর আমার কোলে ছিল এক বছরের ফুটফুটে মেরি... আমাদের একমাত্র কন্যাসন্তান।

আমরা যখন ডাওহিল জঙ্গলের রাস্তাটা ক্রশ করছিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। হঠাৎ সামনের কাচে দেখতে পেলাম... আমাদের গাড়ি যাওয়ার ঠিক রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে প্রায় জনা কুড়ি পঁচিশেক রক্ত-মাখা মানুষ। তার মধ্যে নারী, পুরুষ, বাচ্চা, বড়ো, বুড়ো... সকলেই আছে। তাদের প্রত্যেকেরই ঘাড়গুলো একদিকে কাত করা, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে আর স্থির, মুখের মধ্যে ফুটে উঠেছে ভয়ংকর এক নৃশংসতা। আমরা এর থেকে বেশি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, আচমকা দেখলাম, ওরা ছুটে আসতে লাগল আমাদের চলন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে।

ওরা যখন একদম সামনে চলে এল, আমাদের ড্রাইভার তখন ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল জঙ্গলের দিকে। রাস্তার ঢাল বেয়ে গাড়ি দ্রুত গতিতে গড়িয়ে চলল জঙ্গলের অভিমুখে। আমি বুঝতে পারছিলাম, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ধাক্কা খেতে চলেছি একটা বড়ো গাছের সঙ্গে। হঠাৎ আমার মনে হল, যে করেই হোক মেরীকে বাঁচাতে হবে। জানি না কোন শক্তি সেদিন আমার মধ্যে কাজ করেছিল, আমি চলন্ত গাড়ি থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম মেরিকে নিয়ে। আমার চোখের সামনেই গাড়িটা প্রচণ্ড শব্দ করে একটা বিরাট গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে ভেসে-আসা ওদের মর্মান্তিক আর্তনাদ তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। এরপর ধীরে ধীরে আমার চোখটা ক্রমশ ভারী হয়ে এল।

কিন্তু সম্পূর্ণ চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে সেদিন আরও একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখেছিলাম আমি...

একজন লোক মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছে, দাপাদাপি করছে, আর ওকে সেই রক্ত-মাখা মানুষগুলো পা ধরে টেনেহিঁচড়ে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে! লোকটা নিজেকে বাঁচানোর জন্য বারবার ওদের কাছে হাতজোড় করে বলছিল... দয়া করে আমায় মেরো না... প্লিজ আমায় ক্ষমা করে দাও। কিন্তু তাতেও ওদের মনে সামান্য দয়াটুকু আসছিল না। ওরা জোর করে লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গিয়েছিল জঙ্গলের ঘন অন্ধকারের মধ্যে।

এরপর আমি আর কিছু দেখতে পাইনি সেইদিন। আমার চোখ দুটো কখন যেন নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তবে ওইটুকু মুহূর্তের জন্য দেখলেও, আমি সেদিন লোকটাকে ঠিক চিনতে পেরেছিলাম। উনি আর কেউ নন, আমার ঠাকুরদা মি. জেমস বেইলি ছিলেন।

হসপিটালে চোখ খুলে পরে জানতে পেরেছিলাম, গাড়ি থেকে সেদিন চারটে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তার মধ্যে তিনজন পুরুষ আর একজন মহিলা। বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি ওই চারজন কে কে ছিল। শুধু সৌভাগ্যের বিষয় এটাই যে মেরিকে সেদিন একদম অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে ওই দুর্ঘটনায় ওর কোনোরকম ক্ষতি হয়নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পর একটু সুস্থ হয়েই আমি মেরিকে নিয়ে ফিরে এলাম ব্রিস্টলে। সেখানে একা একাই নিজের মেয়েকে নিয়ে শুরু করলাম নতুন জীবন। কয়েক মাস বেশ ভালোভাবেই কেটে গেল আমাদের। কিন্তু অসুবিধাটা শুরু হল তার পর থেকে।

একদিন রাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম আমি, হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম... কিছু রক্ত-মাখা ভয়াবহ মূর্তি আমার ঠাকুরদা মি. বেইলিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আর উনি চিৎকার করে আমায় বলছেন, "শার্লট, প্লিজ হেল্প মি... আমি আর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না... প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে আমার... দয়া করে আমায় মুক্তি দাও..."

ওঁর ব্যথায় কাতর করুণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। তারপর সারারাত আর দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি আমি। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতায় ডুবে থেকে সমগ্র রাত বিনিদ্রভাবে কাটিয়েছিলাম আমি।

পরের দিন অবশ্য কর্মব্যস্ততার মাঝে গত রাতের ওই স্বপ্নের কথা আমি একদমই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন রাতেও ওই স্বপ্ন ফিরে এল আমার চোখে। সেই একই চিৎকার, সেই একই অনুরোধ, সেই একইভাবে চমকে ওঠা... তারপর সেই একই রকম রাত জাগা।

এরপর আমার সঙ্গে প্রতিরাতেই ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে শুরু করল। আর আমিও প্রতিটা রাত নির্ঘুম চোখে জেগে বসে কাটাতে লাগলাম। এইভাবে কয়েকদিন চলার পর আমি ক্রমশ অসুস্থ হতে শুরু করলাম। ইনসোমনিয়া রোগ দেখা দিল আমার। অনেক ডাক্তার, অনেক সাইকাট্রিস্টকে দেখালাম... বহু ঘুমের ওষুধ খেলাম। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল পাওয়া গেল না। এরপর ধীরে ধীরে ওই স্বপ্ন শুধু রাত নয়, দিনের বেলাতেও আমার চোখের সামনে হ্যালুসিনেশনের মতো ভেসে বেড়াতে শুরু করল। আমি ক্রমশই যেন পাগল হয়ে উঠতে লাগলাম। কী করব... কোথায় যাব... কীভাবে মুক্তি পাব ওই স্বপ্নের হাত থেকে... তার কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সারাক্ষণ একটা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটতে লাগল আমার। সর্বক্ষণ মনে হত, এই বুঝি চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটা যন্ত্রণাকাতর মানুষের অসহায় করুণ মুখ।

এইভাবে যত দিন গড়াতে লাগল, আমিও যেন নিজের মেজাজ হারাতে থাকলাম। কাউকেই তখন আর সহ্য হত না আমার। কারও কোনো কথাই ভালো লাগত না। এমনকি কখনো কখনো মেরিকে দেখলেও গা জ্বলে উঠত।

আমার যখন এইরকম একটা মানসিক দুর্বিষহ অবস্থা, সেই সময় আমার এক বন্ধু আমায় সেন্ট নিকোলাস চার্চের ফাদার হেনরিকের খোঁজ দিল। সেদিন বিকেলেই ছুটে গেলাম ওঁর কাছে। আমার সব কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার পর ফাদার আমায় যা বললেন তা হল...

ব্রিস্টলে থেকে আমার পক্ষে নাকি এই স্বপ্ন থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কারণ উনি বুঝতে পেরে গেছেন, আমার বাঙালি এনআরআই-কে বিয়ে করা, বিয়ের পর ইন্ডিয়াতে ঘুরতে যাওয়া, সেখানে গিয়ে বেইলি ভিলা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করা, আর রোজ রাতে স্বপ্নে এসে মি. বেইলির কাতর অনুরোধ করা... এই সবকিছুই একটা সূত্রে গাঁথা। আসলে কেউ চাইছে, আমি যেন ওখানে আরও একবার যাই। হয়তো বহুদিন ধরে কারও কোনো অব্যক্ত কথা জমে আছে যা, সে আমাকেই বলতে চাইছে। তাই তো বারংবার সে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমার যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করছে। ফাদার হেনরিক নিশ্চিত যে একমাত্র ওখানে গেলেই আমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব। তার সঙ্গে মুক্তি পাব এই যন্ত্রণাদায়ক স্বপ্ন থেকে।

আমি আজ সেই উত্তর খুঁজতেই উপস্থিত হয়েছি এই বেইলি ভিলায়। এখানে আসার আগে ফাদার হেনরিক আমায় একটা উইজা বোর্ড দিয়েছিলেন, যার ব্যবহার আমি করতে পারব 13th May রাত 12.01-এর পর। কারণ ওই তারিখটা পড়েছে শুক্রবার... অর্থাৎ Friday the 13th।

আর ফাদার হেনরিকের কথা মতে এই Friday the 13th এমন একটা রাত, যখন ইহলোকের বাসিন্দারা খুব সহজেই পরলোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

আজ 12th May। আর এখন আমার ঘড়িতে সময় হয়েছে রাত ১১টা বেজে ৫১ মিনিট। তার মানে আমার

হাতে আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে। আমি জানি না এরপর আমার সঙ্গে কী ঘটতে চলেছে। তবে খুব যে ভালো কিছু ঘটবে না, তার আভাস আমি এখন থেকেই পাচ্ছি। আমি এই অন্ধকার বদ্ধ ঘরে অনুভব করতে পারছি তাদের উপস্থিতি। প্রতিমুহূর্তে তারা যেন নিঃশব্দে নজর রাখছে আমার উপর। হয়তো ওরাও আমার মতোই অপেক্ষা করছে এই শেষ দশ মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার। আর তারপরেই....

যাক, এরপর যা-ই ঘটুক... তাতে যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহলে হয়তো এই রাতের বাকি ঘটনাগুলো আপনারা আর জানতে পারবেন না। তবে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আমার আগের ঘটনাগুলো লিখে রেখে গেলাম। যদি কেউ কখনও সত্যিই এই বেইলি ভিলার আতঙ্ক শেষ করতে পারে... তবে আমার থেকে খুশি আর কেউ হবে না।

ভালো থাকবেন আপনারা। শুভরাত্রি...

কাগজটা সম্পূর্ণ পড়া শেষ করে, সেটা পুনরায় উইজা বোর্ডটার ওপর রেখে দিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল তিতির, 'তার মানে এই শার্লট বেইলিই হল সেই ইংরেজ সাহেবের নাতনি, যার কথা ড্রাইভারদাদা আজ গাড়িতে আসার সময় বলছিল। আর এর অর্থ এই দাঁড়াল যে মিসেস বেইলি তাহলে সেই রাতে মারা গিয়েছিলেন... এবং পরদিন ওঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল ডাওহিল জঙ্গলে। কিন্তু, এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে, মেরির কী হল? সে কি তার মায়ের সঙ্গে ইন্ডিয়াতে এসেছিল? তবে মিসেস বেইলির লেখাতে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন মেরির কথা থাকলেও, ইন্ডিয়াতে আসার পর ওর আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাহলে কি ওকে ইংল্যান্ডেই কারও কাছে রেখে এসেছিলেন মিসেস বেইলি? কী জানি... হয়তো তা-ই।'

তিতিরের মনের মধ্যে যখন এইসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল... ঠিক তখনই নিজের অজান্তে ওর চোখ চলে গেল পূর্বদিকের জানালাটার দিকে। সেই জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সরু সুতোর মতো দিনের আলো দেখা যাচ্ছিল। আশ্চর্য হয়ে গেল তিতির। আরে, ভোর হয়ে গেছে!

দরজার দিকে তাকাতেই ও দেখতে পেল, দুটো পাল্লা খুলে ফাঁকা হয়ে রয়েছে। তার মানে ওকে সারারাত এখানে আটকে রাখার কারণটা তাহলে সম্পূর্ণ হয়েছে।

ধীরে ধীরে তিতির সেই ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। বড্ড ক্লান্ত লাগছে ওর। এখন গিয়ে একটু শুতে হবে।

* * * * * * * *

গতকাল সারাটা দিন ভালো রকমের বৃষ্টি হওয়ার পর আজ দিনের আলোটা বেশ ঝলমলিয়েই উঠেছে।

ধৃতিমানবাবু লনে রাখা বেতের চেয়ারটায় বসে সকালের গ্রিন টি-তে চুমুক দিচ্ছিলেন, আর তার সঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন আজকের সংবাদপত্রে। এমন সময় বাংলোর বিহারি কাজের লোক বিনোদ এসে বলল, "সাহাব... থানার বড়োবাবু এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

খবরের কাগজটার থেকে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই ধৃতিমানবাবু দেখতে পেলেন, দুজন পুলিশের ইউনিফর্ম-পরা লোক হাসিমুখে ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে গোলগাল লম্বাচওড়া চেহারার যে লোকটা একটু আগে আগে হাঁটছেন... তিনি যে এখানকার থানার বড়োবাবু, তা আর আলাদা করে বলে দিতে হয় না।

"গুড মর্নিং... মিঃ মুখার্জি... আশা করি, ডিসটার্ব করলাম না?"

হাতের পেপারটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রেখে ধৃতিমানবাবুও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, "ভেরি গুড মর্নিং অফিসার। আরে না না... ডিসটার্ব কেন করবেন? ছুটি কাটাতে এসেছি। সারাদিন ফাঁকাই তো বসে আছি..."

লনের তিনটে চেয়ারে তিনজন মুখোমুখি বসার পর ধৃতিমানবাবু বিনোদকে আরও দু-কাপ চা দিতে বলে বললেন, "তা বলুন অফিসার... হঠাৎ এখানে আসার পিছনে কোনো বিশেষ কারণ?"

গোলগাল চেহারার পুলিশ অফিসারটি ঈষৎ হেসে বললেন, "তা একটু আছে বই-কি... তবে সেসব কথা বলার আগে নিজেদের পরিচয়টা একটু দিয়ে নি, তাহলে আপনার সুবিধা হবে। ইনি হলেন মহলদিরাম থানার সাব-ইন্সপেক্টর রজত বোস... আর আমি হলাম ওই থানার বড়োবাবু অখিলেন্দু গড়াই।"

নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হলে অখিলেন্দুবাবু আবার বললেন, "দেখুন মি. মুখার্জি... আমি সোজা কথার মানুষ, তাই সোজাসাপ্টা কথা বলতেই ভালোবাসি। কোনোরকম রাখঢাক করে কথা বলাটা আমার আবার ঠিক পোষায় না। আপনি যে এই 'বেইলি ভিলা' ডাকবাংলোটা কিনেছেন, তা আপনি জানেন কি, এটার সম্পর্কে কত বাজে বদনাম আছে? না জানলে বলে দিই। এই বাংলোটায় আজ

অবধি যারাই থেকেছে, হয় তারা মারা গেছে, নয় নিখোঁজ হয়ে গেছে। দু-এক রাতের বেশি এখানে কেউই কাটাতে পারেনি। শুধুমাত্র এই বাংলোটার জন্যই, মহলদিরামের এই চত্বরটা লোকেদের মনে মারাত্মক এক ভয়ের সৃষ্টি করে রেখেছে। এমনকি আপনি জানেন কি না জানি না, এই আতঙ্কের চোটে সন্ধ্যার পর এই রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল পর্যন্ত করে না এখন। মাঝেসাঝে কখনও যদি কোনো অপরিচিত লোক সন্ধ্যার পর ভুল করে এই রাস্তায় ঢুকেও পড়ে... তাহলে তাদের সঙ্গেও এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যে পরের দিন তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায় ডাওহিলের জঙ্গলে।"

অখিলেন্দুবাবুর কথা শুনে ধৃতিমানবাবু এবার একটা স্মিত হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, "পুলিশ হয়ে আপনিও তাহলে এইসব ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন?"

"মিঃ মুখার্জি, একটা কথা ভুলে যাবেন না... পুলিশরাও কিন্তু আফটার অল মানুষই হয়। আর তারা যদি ভগবানে বিশ্বাস করতে পারে, তাহলে তাদের ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করতে বাধাটা কোথায়? তা ছাড়া মহলদিরামে কয়েক বছর থাকার সুবাদে আমি কিন্তু বেশ কয়েকবার প্রমাণও পেয়েছি যে এই বাংলোটা সম্পর্কে লোকের মনে যে ধারণা রয়েছে তা অমূলক নয়। তবে যাক সে কথা। আমার কর্তব্য ছিল আপনাকে এই বাংলোটা সম্পর্কে সবকিছু জানিয়ে রাখা, সেটা আমি করেছি। এইবার আপনার যেটা ভালো মনে হয়, আপনি করবেন।"

চামেলি এসে টেবিলে দু-কাপ চা, কিছু স্ন্যাকস আর বিস্কুট রেখে দিয়ে গেল। অখিলেন্দুবাবু তার থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে, চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, "বেইলি ভিলায় এর আগে যাঁরাই এসে থেকেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই বাংলোর মালিক, মি. বেইলির নিকট আত্মীয়। এখানকার মানুষের ধারণা, যেহেতু মি. বেইলি এককালে প্রচুর মানুষের পরিবারকে এখানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল তাই মৃত্যুর পর সেইসব মানুষের অতৃপ্ত আত্মাই এখন তার বদলা নিচ্ছে। তারাই ইচ্ছাকৃত মি বেইলির পরিবারের মানুষগুলোকে এখানে টেনে নিয়ে আসে, তাদের হত্যা করার জন্য। এবং এটা তারা ততদিন পর্যন্ত করবে, যতদিন না মি. বেইলির সম্পূর্ণ পরিবার এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

একটু থামলেন অখিলেন্দুবাবু। তারপর একটা নিষ্পলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধৃতিমানবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বললেন, "মি. মুখার্জি... আমি কি এটা ধরে নিতে পারি যে আপনার পরিবারের সঙ্গে মি. বেইলির পরিবারের কোনোরকম সম্পর্ক নেই?"

প্রশ্নটা শুনে ধৃতিমানবাবু এক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এ আপনি কী বলছেন অফিসার? আমার সঙ্গে ওঁর পরিবারের কী করে সম্পর্ক হতে যাবে? আমি তো ওঁর নামটাও এখানে আসার পরে শুনলাম।"

"ওহ্... আই সি। আচ্ছা মি. মুখার্জি, আমি কি একবার আপনার পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে পারি? অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো।"

"নো নো... নট অ্যাট অল... আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

অখিলেন্দুবাবুকে বাংলোর হলরুমে ডেকে এনে তিতির, অংশুমান আর রিকুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ধৃতিমানবাবু। অখিলেন্দুবাবু ওঁর এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য চেপে গিয়ে বেশ হাসিমুখে বললেন, "আসলে বিখ্যাত শিল্পপতি ধৃতিমান মুখার্জির পরিবারের সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য তো আর সবার হয় না। তাই যখন শুনলাম, আপনারা সবাই ছুটি কাটাতে এখানে এসেছেন... তাই আর লোভ সামলাতে পারলাম না। সকাল সকাল চলে এলাম। তা কালকের রাত কেমন কাটল আপনাদের? কোনো অসুবিধা হয়নি তো?"

অংশুমান আর তিতির একসঙ্গেই প্রায় জানাল... না, তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।

অখিলেন্দুবাবু এবার ঘাড় ঘুরিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা বিনোদ আর চামেলিকে একবার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর গলার স্বরটা বেশ উঁচু করে বললেন,

"কী রে ব্যাটা... তোরা কবে এসেছিস এখানে?"

বিনোদ একটু ঘাবড়ে গিয়ে কাঁচুমাচু গলায় বলল, "আমরা কাল সকালে এসেছি বাবু। পরশু রাতে ফোন এসেছিল... বড়ো সাহাব নিজের পরিবার নিয়ে এখানে ঘুরতে আসছেন। আমি আর চামেলি যেন ওঁদের খেয়াল রাখি। তাই কাল সকালেই এখানে চলে এসেছি।"

"বুঝলাম। তা... তোদের কাল রাতে কোনো অসুবিধা হয়েছিল?"

"না বাবু! কোনোই অসুবিধা হয়নি।"

"আচ্ছা বেশ বেশ।"

অখিলেন্দুবাবু এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ধৃতিমানবাবুর উদ্দেশে বললেন, "আজ তাহলে আসি মি. মুখার্জি। কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই জানাবেন। এই কার্ডে আমার নাম্বার দেওয়া রয়েছে।"

অখিলেন্দুবাবু নিজের নাম-লেখা কার্ডটা ধৃতিমানবাবুর

হাতে দেওয়ামাত্রই সাব-ইন্সপেক্টর রজত হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা, উনি কে?"

ওখানে উপস্থিত সকলেই রজতের দৃষ্টি অনুসরণ করে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকাল। গায়ে শাল জড়িয়ে তখন ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে নীহারিকা।

"উনি হলেন আমার বড়োছেলের স্ত্রী নীহারিকা।" বললেন ধৃতিমানবাবু।

এবার রজত হঠাৎ করে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল, "মি. মুখার্জি, যদি কিছু মনে না করেন, তবে কি আমি জানতে পারি... উনি কি বাঙালি?"

অবশ্য রজতের এই অদ্ভুত প্রশ্নটা করার পিছনে একটা কারণ ছিল, সেটা হল... তিরিশ বছর বয়সি নীহারিকাকে প্রথমবার দেখলে অনেকের পক্ষেই বোঝা অসম্ভব যে ও বাঙালি। ওর নীলাভ চোখ, হালকা বাদামি চুল, গোলাপি-সাদা গায়ের রং আর লম্বাটে, ত্রিকোণাকৃতি মুখের আদল দেখে বেশির ভাগ মানুষই ওকে বিদেশি মেম বলে ভুল করে।

তাই রজতের মুখে এই প্রশ্নটা শুনে ধৃতিমানবাবু একটুও অবাক হলেন না। মৃদু হেসে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ... উনি ষোলোআনাই বাঙালি.."

"ওঁর সঙ্গে কি একটু কথা বলা যেতে পারে?" গম্ভীর গলায় কথাটা জিজ্ঞেস করলেন অখিলেন্দুবাবু।

ধৃতিমানবাবু এবার কিছু বলার আগেই অংশুমান নীহারিকাকে ডাক দিল। নীহারিকা সামনে এসে দাঁড়ানোমাত্রই অখিলেন্দুবাবু হাতজোড় করে বললেন,

"আপনাকে এইভাবে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত নীহারিকা দেবী। আসলে আজ তো সেরকম একটা ঠান্ডা পড়েনি... আর আপনি এইভাবে শাল জড়িয়ে আছেন দেখে..."

"আমার জ্বর হয়েছে।" খুব ধীর গলায় উত্তর দিল নীহারিকা।

"ওহ্! শরীর খারাপ নিয়েই ছুটি কাটাতে এসেছেন বুঝি?"

"নাঃ... কাল আসার সময় বৃষ্টিতে ভিজেছি।"

কপালের ভ্রূজোড়া সামান্য একটু কুঁচকে গেল অখিলেন্দুবাবুর।

"নীহারিকা দেবী... আমি যতদূর জানি, আপনারা কাচবন্ধ এসি গাড়িতে এসেছেন... তারপরেও ভিজে গেলেন...!!"

নীহারিকা এবার একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "না মানে ইয়ে... মানে এখানে এসে নামার সময় বৃষ্টির জল একটু মাথায় পড়েছিল। আর আমার আবার ঠান্ডার বাতিক আছে।"

অখিলেন্দুবাবু এবার একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, "ওহ্ বুঝলাম। যাক, সাবধানে থাকবেন একটু।" তারপর ধৃতিমানবাবুর দিকে ঘুরে বললেন, "আজ তাহলে আসি মি. মুখার্জি। আবার দেখা হবে। Have a nice day."

অখিলেন্দুবাবুরা বেরিয়ে গেলেন। ওঁদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ধৃতিমানবাবু একটা স্মিত হাসি হাসলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন,"নীহারিকা সত্যিই বাঙালি কি না, তার প্রমাণ নিয়ে গেলেন।"

* * * * * * * *

দুপুরের পর থেকেই বাইরের আবহাওয়াটার বেশ অবনতি হয়েছে। সকালের রোদ ঝলমলে নীলাকাশ এখন ঢেকে গেছে ধূসর কালো মেঘে। তার সঙ্গে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় সব লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে চারিদিকে। যদিও বৃষ্টি এখনও নামেনি। তবে মেঘের গর্জন জানান দিচ্ছে, তার আগমনের আর বেশি দেরি নেই।

খাটের পাশের জানালাটা খুলে একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল তিতির। হঠাৎ রিকু এসে ঢুকল সেই ঘরে। ওর চোখে-মুখে একটা বিরক্তির ছাপ। তিতির অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে রিকু? মুড অফ? মা বকেছে বুঝি?"

রিকু মুখটাকে আরও গম্ভীর করে নিয়ে বলল, "সেই সকাল থেকে এয়ারগান নিয়ে ঘুরছি। একটাও পাখি আসছে না। সঅঅব দূরের গাছে গিয়ে বসে আছে।"

"ওহ্... এইজন্য তাহলে আমার রিকু দ্য সুপারম্যানের রাগ হয়েছে? এইবার বুঝলাম। তা হাতে যদি বন্দুক দ্যাখে... তাহলে পাখিরা আসবে কেন শুনি? ওদের বুঝি ভয় করে না?"

রিকুর রাগ যেন এবার আরও ফেটে পড়ল।

"কেন... আমি তো বন্দুক লুকিয়ে রেখে ওদের খাবারও দিয়েছিলাম। একটা পাখিও তো সেই খাবার খায়নি।"

হঠাৎ তিতিরের মনে হল... কথাটা তো সত্যিই! আজ সকাল থেকে ও নিজেও তো একটা পাখিও দেখতে পায়নি এই বাড়িতে। এমনকি একটা কাক পর্যন্ত এসে বসেনি। এদিকে আশপাশের সব গাছ পাখিতে ভরে আছে। এটা কী করে সম্ভব? এই বাড়িতে তো গাছপালাও নেহাত কম নেই। তাহলে পাখিরা কেন আসে না এখানে? আর শুধু পাখিই কেন... কুকুর, বিড়াল, গোরু, ছাগল.. কোনো প্রাণীকেই তো ও দেখতে পায়নি এই বাংলোর ভিতর।

কথাটা চিন্তা করতেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন ছমছম

করে উঠল তিতিরের। পশুপাখিদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে অনেক সজাগ হয়, এটা ওর ভালো করেই জানা। তাহলে কি এই বাংলোর অস্বাভাবিকতা এখানকার পশুপাখিরাও অনুভব করতে পারে? ওরা কি তবে বুঝতে পারে যে এই বাংলোতে মানুষ ছাড়াও এমন খারাপ কিছু রয়েছে, যা সাধারণত থাকা উচিত না?

তিতিরের সর্বাঙ্গ দিয়ে এই দিনেদুপুরেও একটা শিরশিরানি ভাব খেলে গেল। ও রিকুর মাথার চুলগুলো সামান্য একটু ঘেঁটে দিয়ে হাসিমুখে বলল, ''আচ্ছা রিকু, তুই এখন বরং নীচে গিয়ে ভিডিয়ো গেম খেল। কাল সকালে তুই আর আমি দুজনে মিলে যাব পাখি শিকারে। দেখি... কেমন না এসে থাকে ওরা।''

''আচ্ছা... আমি তাহলে বাগানে গিয়ে মেরি গো রাউন্ড চড়ি গিয়ে।''

রিকু নীচে চলে গেলে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল তিতির। কাল রাতের ওই ঘরটায় আরও একবার যেতে হবে ওকে। দেখতে হবে, যে কাগজটা আর উইজা বোর্ডটা গতকাল ওই ঘরে ছিল... সেটা এখনও ওখানে আছে কি না।

ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াতেই বেশ অবাক হল তিতির। আজ এই দরজাটা বন্ধ করে কেউ তালা লাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তালাটার সঙ্গে চাবিটাও ওখানে ঝুলছে। কেউ যেন ইচ্ছাকৃতই চাবিটা ওখানে রেখে দিয়ে গেছে। সে হয়তো আগে থেকেই জানত, তিতির এই ঘরে আবারও আসবে। তাই তিতিরের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।

কিন্তু কে করছে এমন... আর কেনই বা করছে? কী চাইছে সে তিতিরের কাছ থেকে?

গত রাতের তুলনায় ঘরের ভিতরটা আজ অনেক বেশি স্বচ্ছ আর আলোকিত হয়ে রয়েছে। যদিও জানালাগুলো সব কালকের মতোই বন্ধ, তবু খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঢুকে-পড়া দিনের আলোয় ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবটা অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতেই তিতিরের চোখে পড়ল, গতকালের সেই উইজা বোর্ড আর কাগজের টুকরোটা এখনও একই জায়গাতেই পড়ে আছে।

এক মুহূর্তও দেরি না করে সেই দুটোকে হাতের মধ্যে তুলে নিল তিতির। তারপর তাড়াতাড়ি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে, দরজা বন্ধ করে, আবার সোজা ফিরে এল নিজের ঘরে।

থানার বড়োবাবু অখিলেন্দু সোম নিজের চেয়ারে বসে বেশ মনোযোগ সহকারে একটা ফাইল দেখছিলেন। হঠাৎ সাব-ইন্সপেক্টর রজত এসে ওঁর মুখোমুখি চেয়ারটায় বসল। অখিলেন্দুবাবু ফাইল থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, ''কিছু বলবে?''

রজত কেমন যেন একটু ইতস্তত বোধ করছে দেখে, হাতের ফাইলটা বন্ধ করে, অখিলেন্দুবাবু ওর দিকে একদম সোজা হয়ে বসলেন।

''বলো... কী বলবে?''

''ইয়ে মানে... বলছি কী স্যার, আজ সকালে বেইলি ভিলায় আপনি কি কোনো আঁশটে গন্ধ পেয়েছিলেন?''

''আঁশটে গন্ধ??? কই না তো!'' ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেল অখিলেন্দুবাবুর।

''আমি পেয়েছি স্যার.. একটা বিচ্ছিরি আঁশটে গন্ধ।''

''তাহলে হয়তো কোনো মাছটাছ রান্না হচ্ছিল।''

''না স্যার... এটা মাছের আঁশটে গন্ধ নয়। আসলে ওই বাড়িতে তখন আমাদের সামনে এমন কেউ একজন দাঁড়িয়ে ছিল... যে কিনা আগে থেকেই মৃত... এটা তারই শরীরের গন্ধ।''

''হোয়াট!'' চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন অখিলেন্দুবাবু। তারপর কোনোমতে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, ''তু...তুমি কী করে জানলে এসব?''

রজত সামান্য হেসে বলল, ''ছোটোবেলা থেকেই গাঁয়ে-গঞ্জে মানুষ স্যার। তার উপর আমার ঠাকুরদা আবার এককালে নামকরা ওঝা ছিলেন। এইসব গন্ধ আমার খুব ভালো করেই চেনা। যাক, সেসব কথা এখন বাদ দিন স্যার। আপনি বলুন এইবার আমাদের কী করা উচিত? আজ রাতে আবার পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। আর আমি যতদূর জানি, এইসব রাতে দুষ্টু আত্মাদের ক্ষমতা খুব বৃদ্ধি পায়। আমার মন কেন জানি বলছে, মি. মুখার্জিদের পরিবারে আজ রাতে খুব বড়ো একটা বিপদ ঘনিয়ে আসতে চলেছে।''

অখিলেন্দুবাবু সামনের টেবিলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা গভীর নিশ্বাস নিলেন। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বললেন, ''হুমমম।''

* * * * * * * * *

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে-না হতেই আকাশ ভেঙে তুমুল বৃষ্টি এল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হল এলোপাথাড়ি ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। মাঝে মাঝে তীব্র বিদ্যুতের ঝলকানি আর প্রচণ্ড বাজ পড়ার শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠছিল

গোটা বেইলি ভিলাটা।

নিজের ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখছিলেন ধৃতিমানবাবু। মাঝেমধ্যে নিজের মনেই বলে উঠছিলেন, "গতিক সুবিধের নয়। আজ রাতে ঝড়জল থামবে বলে তো আর মনে হয় না।"

হঠাৎ দরজার সামনে থেকে একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পেলেন ধৃতিমানবাবু।

"সাহাব... এই ল্যাম্পটা রেখে গেলাম। ঝড়ের জন্য বিজলির তার ছিঁড়ে গেছে। কখন কারেন্ট আসবে, তার কোনো ঠিক নেই।"

চামেলির কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন ধৃতিমানবাবু। একটু বিরক্তির সুরেই উনি বললেন, "সে কী! কারেন্ট নেই তো ইনভার্টার কী হল? এইভাবে অন্ধকারে থাকা যাবে নাকি?"

"ওটাও মনে হয় বিগড়েছে সাহাব। উয়ো বহুত চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই ঠিক হল না। মনে হয়, মিস্ত্রি ডাকতে হবে।"

চামেলি চলে গেল। ধৃতিমানবাবু একটু হতাশ হয়েই নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়লেন।

নাঃ... এখান থেকে কাল ফিরে যেতেই হবে। সবাই বারংবার এত কিছু বলছে এই বাংলোটা নিয়ে, সবার কথা উপেক্ষা করাটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। শুধু নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এতগুলো মানুষের জীবনে বিপদ ডেকে আনা মোটেও উচিত কাজ হচ্ছে না আমার।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ধৃতিমানবাবুর গলা দিয়ে।

সারা দুপুর ধরে শার্লট বেইলির লেখাটা বেশ কয়েকবার খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছে তিতির। তার সঙ্গে ইন্টারনেট ঘেঁটে শিখে নিয়েছে উইজা বোর্ডের ব্যবহার প্রক্রিয়াটাও। অনেক চিন্তাভাবনা, অনেক বিচার-বিবেচনা করার পর তিতিরও হয়তো এবার অল্প অল্প বুঝতে পেরেছে যে ওকে আসলে কী করতে হবে।

আজ 12th August, বৃহস্পতিবার। আজকে রাত ১২টার পরেই আসবে সেই অভিশপ্ত তারিখ... Friday the 13th।

তাই যা করার, আজ রাত ১২টার পরেই করতে হবে। এতে জীবনের ঝুঁকি যেমন আছে, আবার সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। যা করতে হবে, মাথা ঠান্ডা রেখে করতে হবে। সামান্য একটু ভুল অনেক বড়ো বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে এইসব কিছু করার আগে দাদার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল তিতির। একে তো বাইরে এত ঝড়বৃষ্টি, তার মধ্যে কারেন্টটাও আজ নেই। মোমবাতি হাতে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিতির। কিন্তু অন্ধকারের জন্য ও খেয়াল করতে পারল না, ওর ঘরের কাঠের দেওয়াল আলমারিটার একটা পাল্লা খোলা পড়ে আছে। আর সেই পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাসি মড়ার মতো একজোড়া ঘোলাটে চোখ তখন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সন্ধে সাড়ে সাতটা... বাইরের আবহাওয়া এখনও সেই একই রকম আছে। ঝড়ের দাপট কিছুটা কমলেও, একনাগাড়ে মুশলধারায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে। চামেলি কিচেনে দাঁড়িয়ে একমনে রাতের রান্নার জোগাড় করছিল। হঠাৎ দরজায় ও কারও পায়ের আওয়াজ পেল। বেইলি ভিলার এই কিচেন রুমটা বাংলোর একদম পিছনদিকে আলাদা একটা ঘর। এর সঙ্গেই অ্যাটাচ করা আছে সার্ভেন্টদের রুম। চামেলি আর বিনোদ সেই রুমেই থাকে। পায়ের আওয়াজ শুনে চামেলি বুঝল, বিনোদ এসেছে। ও রান্না করতে করতেই একটু ব্যস্ত গলায় বলল, "থোড়া পেঁয়াজ কট দিজিয়ে তো জলদি..."

কোনো উত্তর এল না। শুধু একটু পরেই একটা জোরালো খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজ চামেলির কানে আসতে লাগল।

ক-টা পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে এত আওয়াজ? বেশ অবাক হল ও। তবে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকায় এই ব্যাপারটায় অতটা আর গুরুত্ব দিল না।

একটু পরেই হঠাৎ চামেলির মনে হল, কেউ যেন একদম ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হিমশীতল নিশ্বাস ও নিজের ঘাড়ের কাছে অনুভব করল।

কে এটা? এটা তো বিনোদ নয়! তাহলে কে?

চামেলি পিছনে ঘুরে দেখার চেষ্টা করতেই, ওর যা নজরে পড়ল, তাতে ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা শিহরন বয়ে গেল। ও দেখল, বাগানের ঘাস কাটার ধারালো কাঁচিটা কে যেন একদম ওর গলার সামনে বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে! আর তার থেকে একটা শব্দ আসছে... খ্যাঁচ খ্যাঁচ... খ্যাঁচ খ্যাঁচ।

প্রচণ্ড চমকে উঠল চামেলি। ভয়ে-আতঙ্কে ও তাড়াতাড়ি সেই জায়গা ছেড়ে দূরে পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওর সম্পূর্ণ চেষ্টাই বৃথা গেল। সেখান থেকে একচুলও নড়তে পারল না চামেলি। ও বুঝতে পারল, কেউ যেন হাত দিয়ে ওর ঘাড়টা শক্ত করে পিছন থেকে চেপে ধরে রেখেছে। ক্রমশ সেই হাতের জোর বাড়ছে... বেড়েই চলেছে।

ব্যথায়, যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল চামেলি। ওর দাপাদাপিতে রান্নাঘরের একমাত্র আলোর উৎস কাচের ল্যাম্পটাও মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। তার সঙ্গেই গোটা রান্নাঘরে নেমে এল এক

নিকষকালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝেই চামেলি বুঝতে পারল, দুটো লৌহনির্মিত ধারালো ফলা ধীরে ধীরে ওর গলা আর ঘাড়ের উপর এসে চেপে বসছে।

মারাত্মক এক বিভীষিকায় চামেলির বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। নিজের আসন্ন মৃত্যুকে এত সামনে দেখে, বাঁচার জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল ও।

কিন্তু, ঠিক তখনই একটা প্রচণ্ড বাজ পড়ার শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল সমগ্র বেইলি ভিলা।

* * * * * * * *

দাদাকে খুঁজতে খুঁজতে তিতির যখন কাঠের রেলিং-ঘেরা বারান্দাটার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ওর নজরে পড়ল, অংশুমান সেখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছে। হাতে একটা স্কচের গ্লাস, আর ঠোঁটের ফাঁকে পাইপ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির কাজের লোক বিনোদ। তিতিরের কানে গেল, দাদা খুব চিৎকার ওকে বলছে, ''ভুল? এটা তোমার ভুল বলে মনে হচ্ছে? একটা দায়িত্ব তোমরা ঠিক করে পালন করতে পারো না? শুনে রাখো... আজ রাতে যদি আবার এরকম কোনো ভুল হয়েছে, তাহলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না। মনে থাকে যেন কথাটা।''

বিনোদ একদিকে ঘাড় কাত করে বলল, ''জি সাহাব।''

তিতির এসে দাদার পাশে দাঁড়াতেই বিনোদ সেখান থেকে মাথা নিচু করে চলে গেল। তিতির অবাক দৃষ্টিতে ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ''কী ব্যাপার দাদা? হঠাৎ ওকে অত বকাবকি করছিলিস কেন?''

অংশুমান গ্লাসে স্কচ ঢালতে ঢালতে গম্ভীর গলায় বলল, ''চেয়ারটা নিয়ে বোস। তোর সঙ্গে ক-টা কথা আছে।''

বৃষ্টির ছাটে বারান্দার অর্ধেক প্রায় ভিজে গিয়েছিল। একটা শুকনো জায়গা দেখে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল তিতির।

''বল কী বলবি?''

টেবিলের উপর রাখা জ্বলন্ত হ্যারিকেনটার দিকে চোখ রেখে অংশুমান একে একে গত রাতের সমস্ত ঘটনাই খুলে বলল তিতিরকে। নীহারিকার অত রাতে গেট খুলে বাইরে যাওয়ার কথা, রিকুর অপেক্ষায় রাস্তায় বসে থাকার কথা, আর বৃষ্টিতে ভিজে আজ জ্বর আসার কথা... এই সবকিছু বলার পর রাগে গজগজ করতে করতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল অংশুমান, ''সব হয়েছে এই স্কাউন্ড্রেলটার জন্য। কাল রাতে যদি গেটে তালা থাকত, তাহলে এইসব কিছুই হত না। এখন আবার ন্যাকামি করে বলতে এসেছে... ভুল হয়ে গেছে। বাস্টার্ড।''

সবকিছু শোনার পর দাদার চোখে চোখ রেখে তিতির খুব গম্ভীর গলায় বলল, ''কাল রাতে গেটে তালা থাকলেও, এরকম কিছু একটা ঘটতই।''

''হোয়াট!'' বিস্ময়ভরা চোখে অংশুমান ঘুরে তাকাল তিতিরের দিকে।

''হ্যাঁ দাদা... আমি একদম ঠিকই বলছি।''

তিতির এবার নিজের সঙ্গে ঘটে-যাওয়া গত রাতের সব কথাই অংশুমানকে খুলে বলল। এমনকি শার্লট বেইলির লেখা কাগজটার সম্পর্কেও জানাল ও। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিতির আবার বলল, ''আমার মনে হয়, যদি মি. বেইলির নিখোঁজ হওয়ার রহস্যের সমাধান করা যায়, তাহলে হয়তো এই বেইলি ভিলার আতঙ্কেরও সমাধানসূত্র পাওয়া যাবে। আর সেইজন্যই আজ রাতে আমি প্ল্যানচেটে বসব। কারণ এটাই একমাত্র রাস্তা, যার দ্বারা আমি মি. বেইলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব। তুই ভেবে দেখ দাদা... আমাদের এখানে আসা, শার্লট বেইলির লেখা কাগজ আর উইজা বোর্ড হাতে পাওয়া, আগামীকাল Friday the 13th হওয়া—এই সবকিছুই কিন্তু আকস্মিক হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে। আর সেটা আজ রাতে আমাকে জানতেই হবে।''

তিতিরের সব কথা শোনার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল অংশুমান। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, ''দেখ তিতির... তুই তো জানিস এইসব ভূত, প্রেত, আত্মা—এগুলোতে কোনোদিনই আমার সেরকম বিশ্বাস ছিল না, আর এখনও নেই। কিন্তু তুই যদি চাস প্ল্যানচেট করতে, সে করতেই পারিস। আমি তোকে বাধা দেব না। তবে একটাই শর্ত... আমি কিন্তু তোর ঘরের বাইরে থাকব। কোনো অসুবিধা হলেই তুই আমাকে ডাক দিবি।''

দাদার কথায় তিতির সম্মতি প্রদান করে 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়ল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

আজ সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছেন ধৃতিমানবাবু। কেমন যেন একটা অস্বস্তি, একটা খচখচানি ভাব উনি অনুভব করছেন নিজের বুকের ভিতর। সকালে অখিলেন্দুবাবুর বলা কথাগুলো বারংবার ঘুরেফিরে আসছিল ওঁর মনের ভিতর। এই বেইলি ভিলা নাকি সেইসব মানুষকেই এখানে টেনে আনে, যাদের সঙ্গে মি. বেইলির সম্পর্ক রয়েছে।

আচ্ছা, উনি এই বেইলি ভিলা কিনে ভুল করলেন না তো?

কে জানে, হয়তো করেছেন। কিন্তু ওঁর তো এই বাংলোটা কেনার পিছনে একটা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল। এখানে ঘুরতে আসা, এই বাংলোয় রাত কাটানো... এইসবই তো উনি একটি বিশেষ কারণের জন্য চেয়েছিলেন। তাহলে কি ওঁর সব চিন্তাধারাই ভুল? হয়তো তা-ই!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন ধৃতিমানবাবু। তারপর চোখটা বন্ধ করে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে থাকেন।

কখন যে চোখটা লেগে গিয়েছিল, উনি নিজেও বুঝতে পারেননি। হঠাৎ একটা পরিচিত গলার ডাক শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল।

"দাদাই... ও দাদাই... একটা মজার জিনিস দেখবে এসো।"

কারেন্ট এখনও আসেনি। ঘরের নিবুনিবু ল্যাম্পের আলোয় মুখটা ভালো করে দেখা না গেলেও, এই গলা ধৃতিমানবাবু খুব ভালো করেই চেনেন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন উনি।

"রিকু, এত রাতে তুমি এখানে? ঘরে ঢুকলে কী করে? দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল!"

"না না দাদাই। দরজা তো খোলাই ছিল। তুমি এবার এসো তো, একটা দারুণ জিনিস দেখাব।"

আশ্চর্য! ধৃতিমানবাবুর স্পষ্ট মনে আছে, উনি শোয়ার আগে দরজাটা দিয়ে শুয়েছিলেন। তারপরেও এত বড়ো ভুল হল কী করে? তাহলে কি ছিটকিনিটা ঠিক করে আটকায়নি? হতেও পারে। দিনে দিনে বয়স তো বাড়ছে।

খাট থেকে নেমে ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে রিকুর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ধৃতিমানবাবু। সমস্ত বাড়ি গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। এর মধ্যে কেউ জেগে আছে কি না বোঝারও উপায় নেই।

বাইরে বৃষ্টির তীব্রতায় কোনো তারতম্য ঘটেনি। অঝোর ধারায় ঝমঝম করে পড়েই চলেছে একনাগাড়ে। এই নিম্নচাপের বৃষ্টি কালকেও থামবে কি না কে জানে?

রিকু একটু আগে আগেই হাঁটছিল। আর তার পিছনে ওকে অনুসরণ করে আলো হাতে নিয়ে এগিয়ে চলছিলেন ধৃতিমানবাবু। কিন্তু রিকু এটা ওঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এটা তো বাড়ির পিছনদিক! এইদিকেই তো বাড়ির কিচেন রুমটা।

আরে, ওই... ওই তো দেখা যাচ্ছে সার্ভেন্ট'স রুমটা। ওখানেই তো বিনোদ আর চামেলি থাকে। এত রাতে রিকু ওখানে আবার কী মজার জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে? একটু বিরক্ত হয়েই ধৃতিমানবাবু বললেন, "রিকু, এটা তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়?"

রিকু কোনো উত্তর দিল না। শুধু দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল কিচেন রুমের দিকে। হঠাৎ ধৃতিমানবাবুর নজরে পড়ল, কিচেন রুমের দরজাটা খোলা আর সেখান থেকে একটা মৃদু রশ্মির আভা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অবাক হয়ে গেলেন ধৃতিমানবাবু। এত রাতে ওখানে আবার কে আছে?

কৌতূহলী হয়ে উনিও দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন সেইদিকে।

কিচেন রুমের দরজার সামনে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল রিকু। তারপর ডান হাতের তর্জনী তুলে একটা দিক নির্দেশ করল। সেই দিক অনুসরণ করে ভিতরে তাকাতেই বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন ধৃতিমানবাবু।

নীহারিকা...! এত রাতে ও এখানে কী করছে?

রিকুকে জিজ্ঞেস করার জন্য পাশে তাকাতেই ধৃতিমানবাবু দেখতে পেলেন, সেখানে কেউ নেই। উনি একাই দাঁড়িয়ে আছেন।

গেল কোথায় ছেলেটা? এইমাত্র তো এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল! মাথার ভিতর সবকিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল ধৃতিমানবাবুর। উনি কিচেনের ভিতরে ঢুকে গলা একটু ঝেড়ে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, "এত রাতে এখানে কী করছ বউমা?"

কোনো জবাব এল না। নীহারিকা পিছন ঘুরে দাঁড়িয়ে একমনে কী যেন একটা করেই চলেছে। শুধু অনবরত একটা খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। ধৃতিমানবাবু আবার একটু জোর গলায় বললেন, "কী হল, শুনতে পাচ্ছ না? আমি বলছি, কী করছ এখানে?"

এইবারও নীহারিকা কোনো উত্তর দিল না। ওকে দেখে মনে হল, ও যেন কোনো কথা শুনতেই পাচ্ছে না।

আশ্চর্য! মেয়েটা কি আমার কথা শুনতে পারছে না, নাকি ইচ্ছা করেই জবাব দিচ্ছে না? ধৃতিমানবাবুর এবার বেশ রাগ হল। উনি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন নীহারিকার পাশে। তাতে উনি যা দেখলেন, ওঁর সর্বাঙ্গ ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। ওঁর বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন সেই মুহূর্তেই ফেটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইল। উনি দেখলেন, নীহারিকা ওর ডান হাতে একটা মাংস কাটার ছুরি ধরে, আপন মনে নিজের বাঁ হাতের আঙুলগুলোকে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে চলেছে। ওর সেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে বয়ে-চলা রক্ত কাঠের টেবিল ভাসিয়ে গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।

এরকম বীভৎস একটা দৃশ্য চোখের সামনে দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না ধৃতিমানবাবু। ওঁর গলা থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল... "বউমাআআআআ..."

এইবার নীহারিকা যেন শুনতে পেল ওঁর ডাক। ধীরে ধীরে

ও মাথা ঘুরিয়ে তাকাল নিজের শ্বশুরের দিকে। নীহারিকার মুখের দিকে চোখ পড়তেই ধৃতিমানবাবুর সারা শরীরের রক্ত যেন এক লহমায় জল হয়ে গেল।

উফফফ... কে এটা? রক্তহীন, ফ্যাকাশে একটা মুখ। মরা মাছের মতো নিষ্প্রাণ, ঘোলাটে চাহনি। শুকিয়ে-যাওয়া ঠোঁটগুলোর চামড়া ফেটে ঝুলে পড়েছে। এই চেহারার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যে-কোনো মানুষের নিশ্বাসই যেন বন্ধ হয়ে আসবে। নীহারিকার এই ভয়ংকর রূপ দেখে ধৃতিমানবাবুর হাত থেকে কাচের ল্যাম্পটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। উনি ভয়ে-আতঙ্কে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যেতে চাইলেন দরজার দিকে।

ঠিক তখনই একটা ফ্যাসফেসে হিমশীতল গলায় নীহারিকা বলে উঠল, "বাবা... আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন? আমার হাতে খাবেন না আপনি? কিন্তু আজ যে চামেলি রান্না করতে পারবে না। দেখুন-না কী অবস্থা হয়েছে ওর।"

নীহারিকা নিজের আঙুল-কাটা বাঁ হাতটা তুলে ধৃতিমানবাবুর পায়ের দিকে দেখাল। কিন্তু ঘর অন্ধকার থাকার জন্য ধৃতিমানবাবু কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না, কী আছে সেখানে।

হঠাৎ বাইরে প্রচণ্ড বিদ্যুতের ঝলকানি খেলে গেল। সেই এক মুহূর্তের আলোতেই ধৃতিমানবাবু দেখতে পেলেন, ওঁর ঠিক পায়ের সামনেই পড়ে আছে চামেলির মুণ্ডুহীন মৃতদেহ। আর তার থেকে সামান্য দূরেই মুখ খুলে হাঁ করে পড়ে আছে ওর মাথাটা। গোটা ঘর ভিজে আছে কালচে লাল রক্তে।

এই নারকীয় দৃশ্য দেখার পরই ধৃতিমানবাবু অনুভব করলেন, ওঁর বুকের বাঁদিকটা ব্যথা করছে... প্রচণ্ড ব্যথা। নিশ্বাস নিতে মারাত্মক কষ্ট হচ্ছে ওঁর। উনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। ওঁকে এইভাবে ছটফট করতে দেখে এক পৈশাচিক উল্লাসে হাসতে শুরু করল নীহারিকা।

কিছুক্ষণ এইভাবে দাপাদাপি করার পর, জল ছাড়া মাছের মতো মুখটা বেশ কয়েকবার হাঁ করে, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ধৃতিমানবাবু। ওঁর চোখ দুটো ভারী হয়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে চোখের সামনে নেমে এল এক গভীর কালো অন্ধকার।

* * * * * * * *

দেওয়ালঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে রাত এগারোটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট। গত রাতের মতো তিতির আজও আবার এসেছে ওই ঘরে। পার্থক্য শুধু একটাই। গতকাল ও এসেছিল নিজের অজান্তে। কিন্তু আজ সবকিছু জেনে-বুঝে নিজের ইচ্ছাতে ও ঢুকেছে এই ঘরে।

কাঠের টেবিলটার উপর রাখা আছে উইজা বোর্ডটা। আর তার পাশে রাখা আছে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। টেবিলের পাশেই একটা চেয়ারে বসে আছে তিতির। ওর হাত ছুঁয়ে আছে উইজা বোর্ডের উপর রাখা প্ল্যানচেটটার উপর। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। নিজের মনকে শক্ত করার চেষ্টা করল ও। কোনোমতেই শার্লট বেইলির মতো ভুল করা চলবে না। এই প্ল্যানচেটের উপর শুধু ওর একার নয়, আরও বহু মানুষের জীবন-মৃত্যু জুড়ে আছে। তাই ওকে পারতেই হবে। যে করেই হোক বেইলি ভিলার এই রহস্যের সমাধান করতেই হবে ওকে।

ঢংঢং শব্দ করে দেওয়ালঘড়িটা রাত বারোটা বাজার সংকেত দিল। তার মানে আজ ১৩ তারিখ। আর শুধু ১৩ তারিখ নয়, আজ হল Friday the 13th...

তিতির উইজা বোর্ডের উপর রাখা প্ল্যানচেটটা হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে শুরু করল। মনে মনে জেমস বেইলির কথা স্মরণ করে মুখে বিড়বিড় করে বলে যেতে লাগল, "জেমস বেইলি... আপনি কি এসেছেন? এলে সাড়া দিন... আমি আপনাকে ডাকছি... শুনতে পাচ্ছেন... সাড়া দিন জেমস বেইলি... এসেছেন আপনি?"

কিছু সময় পর হঠাৎ তিতিরের অনুভব হল, প্ল্যানচেটটা যেন ওর নিয়ন্ত্রণে নেই। সেটা নিজের থেকেই এগোতে শুরু করেছে। ওটা একা একাই গিয়ে থামল বোর্ডের একদম বাঁদিকের কোণে লেখা 'Yes' শব্দটার উপর। তিতির এবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কী?"

বোর্ডের উপর প্ল্যানচেট আবার এগিয়ে চলল নিজের মতো... তারপর কয়েকটা অক্ষরের উপর গিয়ে থামল। অক্ষরগুলো হল...

J - A - M - E - S - B - A - I - L - E - Y

তিতির বুঝতে পারল, ওর ডাকে সাড়া দিয়ে এই মুহূর্তে জেমস বেইলি এসে উপস্থিত হয়েছেন এই ঘরে। তিতির আবার ভয়-জড়ানো কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আমি কি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

প্ল্যানচেট আবার আগের মতো বোর্ডের 'Yes' শব্দটার উপর গিয়ে দাঁড়াল।

গতকাল থেকে দোতলায় যে ঘরে তিতির থাকত, আজ সেই ঘরেই চিন্তিত মুখে পায়চারি করছে অংশুমান। ওর চোখে-মুখে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে একটা উত্তেজনার ছাপ। পাশেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বিনোদ। হাতের জ্বলন্ত

সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে অংশুমান বিনোদের দিকে তাকিয়ে বলল, ''তিতির হয়তো এতক্ষণে প্ল্যানচেট করা শুরু করে ফেলেছে। দেখো, আজ যেন কিছু ভুল না হয়।''

বিনোদ নির্লিপ্তভাবে বলল, ''কোনো ভুল হবে না সাহাব। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে।''

অংশুমান অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল বিনোদের দিকে... ''প্রশ্ন! তোমার আবার কী প্রশ্ন আছে?''

বিনোদ সেই একই রকম নির্বিকারভাবে বলল, ''মেমসাব তো আপনার নিজের বোন আছে। তারপরেও তাকে কেন খুন করাতে চাইছেন সাহাব?''

বিনোদের প্রশ্নে অংশুমানের চোখে-মুখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। মারাত্মক হিংস্রতায় ও চিৎকার করে বলল, ''বোন! কে বোন? কীসের বোন? আমার যখন আট বছর বয়েস, আর গৌরবের ছয়... তখন বাবা না জানি কোথা থেকে নিয়ে এল বছর দুয়েকের তিতিরকে। বাড়িতে সবাইকে জানিয়ে দিল, এই মেয়ে আজ থেকে আমাদের বাড়ির ছোটোমেয়ে। আর তার সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিল, কেউই যেন কখনও জানতে না পারে যে তিতির আমাদের বাড়ির মেয়ে নয়। এমনকি তিতিরও না।

''না না না... এই নিয়ে আমার কোনো রাগ ছিল না ওর উপর। ওকে বোনের মতোই ভালোবাসতাম আমি। কিন্তু যত বড়ো হতে থাকলাম, বুঝতে পারলাম, বাবা আমাদের দুই ভাইকে সবকিছু থেকে উপেক্ষা করে তিতিরকেই সব দিয়ে দেয়।

''বললে বিশ্বাস করবে? আমাদের বিজনেসের সিক্সটি পারসেন্ট শেয়ার রয়েছে তিতিরের নামে, আর বাকি ফর্টি পারসেন্ট আমাদের দুই ভাইয়ের নামে।

''শুধু কি বিজনেস? যেখানে যা প্রপার্টি কেনা হয়, তার বেশির ভাগটাই ওর নামে কেনা হয়। এমনকি এই যে বেইলি ভিলা... এটাও তো ওরই নামে।

''বহুদিন আগেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এই তিতির যতদিন বেঁচে থাকবে... আমরা দুই ভাই এইভাবেই অবহেলিত হতে থাকব বাবার কাছে। তাই ওকে যে করেই হোক সরিয়ে দিতে হবে এই পৃথিবী থেকে।''

গ্লাসে রাখা স্কচটা ঢকঢক করে নিজের গলায় ঢেলে নিল অংশুমান। তারপর নেশায় লাল হয়ে-থাকা চোখে বিনোদের দিকে তাকিয়ে, আবার বলতে শুরু করল, ''তুমি হয়তো ভাবছ, আমি কেন এতদিন কিছু করিনি? কেন এখানে আসার পরই ওকে মারার প্ল্যান করলাম? তার একটাই কারণ। আমি যদি কলকাতায় বা অন্য কোনো জায়গায় কাউকে দিয়ে ওকে মার্ডার করাতাম, তাহলে বিজনেসম্যান ধৃতিমান মুখার্জির মেয়ের মার্ডার কেস সল্‌ভ করতে সিবিআই ইনভল্‌ভ্‌ড হত। আর সেই ক্ষেত্রে আমার ফেঁসে যাওয়ার একটা চান্স থেকে যেত।

''তাই যেদিন আমি শুনেছি, আমরা সবাই এখানে আসছি, সেদিন থেকেই আমি প্ল্যান বানানো শুরু করে দিয়েছি। এখানে যদি ডাওহিলের জঙ্গলে তিতিরের ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়, তাহলে সবাই ভাববে এটা বেইলি ভিলার ভূতেদের কাজ। কেস সেখানেই ক্লোজ্‌ড হয়ে যাবে। আমার আর কোনো চাপ থাকবে না।

''এইজন্যই তো গাড়িতে আসার সময় টাকা খাইয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে ভূতের গল্প শুনিয়েছি। তোমাদেরও অতগুলো টাকা দিয়েছি। কিন্তু কী লাভ হল? কাল রাতে এই ঘরে এসেও কিছু করতে পারলে না তুমি। জাস্ট ইডিয়টের মতো ফিরে চলে এলে।''

এতক্ষণ চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অংশুমানের সব কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল বিনোদ। এবার ও বলল, ''সাহাব... কাল রাতে আমি আপনার কাজ করতেই এখানে এসেছিলাম। আপনার কথামতো মেমসাবের ঘরের লাইট নিভিয়ে দিয়েছিলাম। ভয় দেখানোর জন্য বিছানাতেও উঠেছিলাম। সেই কাদামাটির ছাপ এখনও বিছানার চাদরে লেগে আছে। তারপর... ''

''তারপর কী?'' বিরক্তির সুরে কথাটা জিজ্ঞেস করল অংশুমান।

''তারপর মেমসাব যখন ঘরের অন্য লাইট জ্বালাতে গেল, তখন আমি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে কাঠের ওই দেওয়াল আলমারিটার ভিতর গিয়ে লুকিয়ে গেলাম...''

এতদূর বলার পর বিনোদ আবার চুপ করে গেল। অংশুমান ব্যস্ত হয়ে বলল, ''কী হল, থামলে কেন আবার? বলো তারপর কী হল?''

বিনোদ এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দেওয়াল আলমারিটার দিকে। তারপর নিঃশব্দে সেই আলমারির একটা পাল্লা টান মেরে খুলে থমথমে গলায় বলল, ''তারপর তো এই আলমারি ছেড়ে আর বেরোতেই পারলাম না। কেউ একজন আমার গলা টিপে আমায় এখানেই মেরে দিল। দেখছেন না, এখনও তো এখানেই রয়েছি।''

''মে... মে... মেরে দিল মানে?'' চমকে উঠল অংশুমান। কথাগুলো ওর কেমন যেন জড়িয়ে যেতে লাগল।

''ক্...ক্...কী যা-তা বলছ এইসব?''

ঠিক তখনই ওর চোখ গেল কাঠের দেওয়াল আলমারিটার খোলা পাল্লাটার দিকে। সেখানে তখনও দাঁড় করানো আছে বিনোদের প্রাণহীন নিথর দেহ। ওর বিস্ফারিত দুটো চোখ, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝুলে-পড়া জিভ, আর গালের কষে লেগে-থাকা শুকনো রক্ত দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল, কেউ প্রচণ্ড শক্তিতে ওর গলা টিপে ওকে খুন করেছে। চোখের সামনে এইরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখে অংশুমানের হাত-পা-গুলো ভয়ে কেমন যেন অবশ হয়ে এল। নড়াচড়া করার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলল ও। বারবার ওর মনে হতে লাগল... বিনোদ যদি গতকাল রাতেই মারা গিয়ে থাকে, তাহলে ওর সামনে এখন যে দাঁড়িয়ে আছে... সে কে???

তখনই বিনোদ বলে উঠল, ''আপনি তো ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন না সাহাব। কিন্তু ভূত, প্রেত, আত্মা... এসব কিছু সত্যিই হয়। কাল রাতে শুধুমাত্র আপনার জন্যই আমায় মরতে হল। তাই আজ রাতে আমার হাতেই আপনাকে মরতে হবে। কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না সাহাব... কেউ না! হা হা.. হা হা.. হা হা...''

প্রচণ্ড এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বিনোদ। তার সঙ্গে এক-পা-দু-পা করে এগিয়ে আসতে থাকল অংশুমানের দিকে। ভীত-সন্ত্রস্ত অংশুমান চিৎকার করে উঠল, ''না বিনোদ না... দয়া করে আমায় তুমি ক্ষমা করো... প্লিজ মেরো না আমায়... প্লিজ প্লিইজ প্লিইইইজ...''

কিন্তু অংশুমানের সব চিৎকারই ঢাকা পড়ে গেল বিনোদের অট্টহাসির তলায়। ধীরে ধীরে সাঁড়াশির মতো দুটো শক্ত হাত চেপে বসতে লাগল অংশুমানের গলায়। ক্রমশ সেই হাতের চাপ বাড়তেই লাগল। ওর চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল বাইরে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়ল লম্বা জিভটা, তারপর একসময় গালের কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল তাজা রক্ত।

অংশুমানের হাত-পা-গুলো বেশ কিছুক্ষণ থরথর করে কাঁপার পরে একটা সময় স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর নিথর দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

* * * * * * * *

রাত বারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। তিতির উইজা বোর্ডের প্ল্যানচেটের উপর হাত রেখে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ''আমার শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে, মেরি বেইলি এখন কোথায় আছে?''

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। তিতিরের হাতের প্ল্যানচেট এখন আর নড়াচড়া করছে না। সেটা একই জায়গায় স্থির অবস্থায় রয়েছে। হঠাৎ তিতির অনুভব করল, ঘরের পরিবেশ যেন দ্রুতগতিতে শীতল হতে শুরু করেছে। তার সঙ্গেই থরথর করে কাঁপতে শুরু করল সম্পূর্ণ উইজা বোর্ডটা। একবার তো এমন মনে হল যে প্ল্যানচেটটা হয়তো মাটিতেই পড়ে যাবে। কোনোমতে সেটাকে সামলাল তিতির। কারণ ও জানত, প্ল্যানচেট মাটিতে পড়ে যাওয়া মানেই ঘরে খারাপ আত্মার আগমন ঘটে যাবে।

কিন্তু এ কী! এটা কী হচ্ছে? বোর্ডের উপর কাঠের প্ল্যানচেট আবার নিজের মতো চলতে শুরু করেছে...

10 - 9 - 8 - 7....

প্ল্যানচেট উলটো নাম্বার কাউন্ট করা মানে খারাপ আত্মা প্রায় এসে গেছে! আর এটা যদি কোনোভাবে '০'-তে পৌঁছে যায়, তাহলে তো ওকে আটকানো অসম্ভব। তিতির তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতে লাগল প্ল্যানচেটটাকে জোর করে '6 - 5 - 4 - 3' অবধি নিয়ে যাওয়ার। একমাত্র তাহলেই এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে। কিন্তু ওর সীমিত শক্তি দিয়ে ও কিছুতেই যেন পেরে উঠছিল না প্ল্যানচেটটার সঙ্গে। সেটা নিজের মতো চলতেই থাকল...

6 - 5 - 4 - 3...

দরদর করে ঘামতে থাকল তিতির। চোয়াল দৃঢ় করে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে দুই হাতে ধরে রাখার চেষ্টা করল কাঠের ছোটো টুকরোটাকে। কিন্তু সেটা এগিয়েই চলল...

2 - 1...

এবার এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটল ওই ঘরে, যার জন্য তিতির নিজেও প্রস্তুত ছিল না। ওর মনে হল, অদৃশ্য কোনো একটা হাত এসে চেপে ধরল ওর হাতটাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্ল্যানচেটটাকে টেনে নিয়ে এসে রেখে দিল বোর্ডের 'Good Bye' শব্দটার উপর। উইজা বোর্ড ব্যবহারের ভয়ংকর প্রক্রিয়া সমাপ্ত হল ওখানেই।

এতক্ষণ বুকের কাছে দলা পাকিয়ে-থাকা নিশ্বাসগুলো একটা দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এল তিতিরের গলা থেকে। কিন্তু কে করল এটা? মি. জেমস বেইলি? হয়তো তা-ই হবে। ওঁর নিখোঁজ হওয়ার রহস্য সমাধানের এখনও যে কিছুটা কাজ বাকি রয়ে গেছে।

জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিতির। অন্ধকার এই বাংলোর ভিতরটা আজ যেন বড্ড বেশি থমথমে। করিডোর দিয়ে একা হেঁটে যাওয়ার সময়

তিতির স্পষ্ট বুঝতে পারল... কেউ একজন ওর ঠিক পিছনেই পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটে আসছে। ও তাকে দেখতে পাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তার নিঃশব্দ চলাফেরা ও অনুভব করতে পারছে। নিজের অজান্তেই তিতিরের শরীরটা কেমন যেন ভারী হয়ে এল।

আচ্ছা... এখানে তো দাদার দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল। কোথায় গেল ও? নিজের মনেই প্রশ্নটা করল তিতির।.

''দাদা... দাদা... তুই কি আছিস এখানে?''

কোনো উত্তর এল না। চাপাস্বরে ও আবার জিজ্ঞেস করল, ''দাদা... তুইই কি আমার পিছন পিছন হাঁটছিস?''

এবারও সেই একইভাবে নিস্তব্ধ রইল করিডরটা। তিতিরের গা-টা এবার কেন জানি শিরশির করে উঠল। কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভয় ধীরে ধীরে চেপে বসতে লাগল ওর মনের ভিতর। হঠাৎ ও শুনতে পেল, নীচের ঘর থেকে কেউ বেশ জোরালো গলায় বলছে, ''মি. মুখার্জি... আপনারা সবাই ঠিক আছেন তো?''

এই গলা তিতিরের চেনা। আজ সকালেই ও শুনেছে এই আওয়াজ। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল তিতির। নীচে তখনও অখিলেন্দুবাবু বলে চলেছেন,

''মি. মুখার্জি... মি. মুখার্জি... কোথায় আপনারা?''

সিঁড়ি থেকে নেমেই তিতির দেখতে পেল, দুটো জোরালো আলোর টর্চ হাতে নিয়ে হলরুমে দাঁড়িয়ে আছেন থানার বড়োবাবু অখিলেন্দুবাবু আর সাব-ইন্সপেক্টর রজত।

তিতিরকে দেখামাত্রই অখিলেন্দুবাবু খুব ব্যস্ত হয়ে বললেন, ''আপনি এখানে! বাড়ির বাকি সবাই কোথায়?''

তিতির উত্তেজিত গলায় বলল, ''ওদের খোঁজ না হয় পরে করবেন। তার আগে আপনি আসুন আমার সঙ্গে। খুব দরকারি একটা কাজ আছে।''

''দরকারি কাজ!'' অবাক হলেন অখিলেন্দুবাবু।

''কী কাজ??''

ব্যস্তভাবে রজতের হাত থেকে টর্চটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, হলরুমের দরজার বাইরে বেরোতে বেরোতে তিতির বলল, ''মি. জেমস বেইলির নিখোঁজ হওয়ার রহস্য আমি উদ্ধার করে ফেলেছি। এখন শুধু দেখতে হবে, আমি ঠিক কি ভুল।''

''হোয়াট!!! এতদিন বাদে আপনি সেই রহস্যের কিনারা করেছেন? কিন্তু কীভাবে?'' চমকে উঠলেন অখিলেন্দুবাবু।

''সে কথা না হয় পরেই বলছি। তার আগে আপনারা আসুন তো আমার সঙ্গে।''

বাইরে তখনও ঝমঝম শব্দে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। সেই বৃষ্টিতেই ভিজতে ভিজতে অখিলেন্দুবাবু, রজত আর তিতির এসে দাঁড়াল বাংলোর পশ্চিমদিকের বাগানের ভিতর। হরেকরকম ফুল আর ছোটো ছোটো বাহারি গাছে সাজানো এই বাগান। তার মধ্যে আবার বাচ্চাদের খেলার জন্য রয়েছে একটা মেরি গো রাউন্ড। তিতির সেই মেরি গো রাউন্ডের উপর টর্চের আলোটা ফেলে বলল, ''আপনাদের কি একবারও মনে হয়নি, এই বাড়িতে তো মি. বেইলি একাই থাকতেন। তাহলে বাচ্চাদের খেলার জন্য এই মেরি গো রাউন্ড উনি কেন বানিয়েছিলেন?''

হতবাক হয়ে গেলেন রজত আর অখিলেন্দুবাবু! সত্যিই তো... এই কথাটা তো একবারের জন্যও মাথায় আসেনি ওঁদের। বিস্মিত গলায় অখিলেন্দুবাবু বললেন, ''কেন বানিয়েছিলেন এটা?''

''কারণ এই মেরি গো রাউন্ডটাকে টেনে যদি ম্যানহোলের ঢাকনার মতো সরানো যায়, তাহলেই এর নীচে একটা জল ভরতি কুয়ো পাওয়া যাবে।

''আসলে মি. বেইলি যখন কাউকে শাস্তি দিতেন, তখন তার হাত-পা বেঁধে দড়ি আটকে তাকে এই কুয়োর ভিতর ফেলে দিতেন। তারপর যখন সেই ব্যক্তি মারা যেত, তখন দড়ি ধরে টেনে তুলে আনতেন তার লাশ। অনেকটা ঠিক কুয়ো থেকে বালতি করে জল তোলার মতো। তারপর সেই লাশ উনি পুঁতে দিতেন নিজের বাড়িতে, কিংবা ডাওহিলের জঙ্গলে।

''মি. বেইলি এই কুয়োর কথাটা কাউকে কোনোদিন জানাননি। আসলে উনি চাননি যে সবাই জানুক, ওঁর বাড়িতে উনি কত নিষ্ঠুর একটা মরণকূপ বানিয়ে রেখেছেন মানুষের মৃত্যুর জন্য।

''কিন্তু কথায় বলে না, অত্যাচারীর শাস্তি একদিন সে অবশ্যই পায়। সেটাই হয়েছিল জেমস বেইলির সঙ্গে। উনি হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করেননি যে নিজের সাজানো বাগানেই ওঁকে কোনোদিন ওইভাবে মরতে হবে।

''মি. বেইলির হাতে মারা-যাওয়া নিরীহ মানুষদের অতৃপ্ত আত্মারা একদিন রাতে ওঁকেও তুলে নিয়ে আসে এই বাগানে। তারপর ওঁকেও সেই একইভাবে ফেলে দেয় কুয়োর ভিতর। ওঁর লাশ তবে থেকে ওখানেই পড়ে আছে। পুলিশ বা কেউই তার কোনো হদিশ পায়নি। এতদিনে অবশ্য সেই লাশ পচে-গলে কবেই জলে মিশে গেছে। কঙ্কালটা হয়তো পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তবে আমার একটা কাজ বাকি আছে এখনও।''

রজত এবার বলল, "কী কাজ?"

তিতির ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বলল, "আসুন তো, এই ঢাকনাটা সরাতে আমাকে একটু সাহায্য করুন।"

রজত আর তিতির মেরি গো রাউন্ডের একটা রড ধরে জোরে ঠেলা দিতেই, একটা ঘড়ঘড় শব্দ করে সেটা খুলে গেল। তার নীচেই দেখা গেল কালো কুচকুচে জলে ভরা একটা কুয়ো।

তিতির সেই জলের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে চিৎকার করে বলল, "মি. জেমস বেইলি... নিন, এইবার আপনি মুক্ত... আপনার পাপের শাস্তি আপনি বহুদিন ধরে পেয়েছেন... আজ থেকে আমি আপনাকে স্বাধীন করলাম।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু বৃষ্টি পড়ার একঘেয়ে ঝমঝম আওয়াজ আর কুয়োর জলে সেই বৃষ্টির ফোঁটার স্পন্দন ছাড়া বাকি সবকিছুই যেন আজ রাতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ তিতির খেয়াল করল, কুয়োর জল থেকে কী যেন একটা বাইরে বেরিয়ে আসছে। ভালো করে খেয়াল করতেই ও দেখতে পেল সেটা একটা মানুষের পচাগলা শ্যাওলা-ধরা হাত! প্রচণ্ড ভয়ে-আতঙ্কে তিতির লাফিয়ে উঠে সেখান থেকে পিছনে সরতে গেল। কিন্তু তার আগেই সেই হাত তিতিরের ডান পা চেপে ধরে ওকে কুয়োর ভিতর টেনে নামাতে শুরু করল। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও।

তিতিরের এই অবস্থা দেখে সাব-ইন্সপেক্টর রজতও মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওকে সেই হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে কুয়োর ভেতর থেকে কিলবিল করে ভেসে উঠেছে এরকম আরও অনেক অনেক হাত। তার মধ্যে একটা এসে চেপে ধরল রজতের হাতটাকে। ওকেও টেনে নামানোর চেষ্টা করতে লাগল কুয়োর কালো জলে।

এইরকম একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখে অখিলেন্দুবাবু নিজের রিভলভার বের করে ক্রমাগত গুলি চালাতে লাগলেন সেই হাতগুলোর উপর। কিন্তু কোনো লাভ হল না। বন্দুকের গুলি সেই ভয়ংকর হাতগুলোর উপর কোনো প্রভাবই ফেলতে পারল না।

ওরা টেনেহিঁচড়ে তিতিরকে প্রায় কোমর অবধি ঢুকিয়ে নিল কুয়োর জলের ভিতর। জলকাদায় মাখামাখি হয়ে-থাকা তিতির বাঁচার জন্য আর্ত চিৎকার করতে কাঁদতে থাকল, "ছাড়োওওও... ছাড়োওওওও আমায়... হেল্প... প্লিইইইজ সামবডি হেল্প মি..."

ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা ধবধবে সাদা রঙের ক্রস এসে পড়ল কুয়োর ভিতর। আর সঙ্গে সঙ্গেই কুয়োর কালো জলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। তিতির অনুভব করল এখন আর কেউ ওর পা টেনে ধরে নেই। ও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে এসে দাঁড়াল। রজতও এসে দাঁড়াল ওর পাশে। তখনও কুয়োর ভিতর তীব্র আলোড়ন হয়েই চলেছে। ভেসে আসছে মারাত্মক রকমের গর্জন।

কিন্তু কে ফেলল এই সাদা হোলি ক্রস কুয়োর ভিতর? পিছনে ঘুরে তাকাতেই তিতির দেখতে পেল, ওদের থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছেন ওর বাবা ধৃতিমানবাবু। তিতির কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজের বাবার বুকে। ধৃতিমানবাবু সস্নেহে নিজের মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "কাঁদিস না মা... কাঁদিস না... আজ তোর এই বাবাটা তোকে বাঁচাতে পারত না... যদি না তোর নিজের মা এসে আমায় সুস্থ করে তুলত। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়েছিলাম... হয়তো এতক্ষণে ওইভাবে মরেও যেতাম। কিন্তু তোর মা এসে আমায় সারিয়ে তুলল... টেনে নিয়ে এল এই বাগানে, তোকে বাঁচানোর জন্য।"

"আমার মা!" বিস্মিত মুখে বাবার দিকে তাকাল তিতির।

ধৃতিমানবাবু একটু চুপ করে থেকে, ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, "অরুণিমা ব্যানার্জি সম্পর্কে আমার নিজের পিসি ছিলেন। তাঁর ছেলে শুভংকর ব্যানার্জি আমার পিসতুতো ভাই। ওরা বহুদিন ধরেই ইংল্যান্ডে থাকত। কারণ আমার পিসেমশাইয়ের ওখানে কাপড়ের খুব বড়ো ব্যাবসা ছিল। একদিন শুনলাম, শুভংকর নাকি একজন ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছে। তার নাম শার্লট বেইলি। কোটিপতি ঘরের মেয়ে। কিন্তু সে সময় তার বাবা-মা আর কেউই বেঁচে ছিলেন না।

"যা-ই হোক, বিয়ের বছর তিনেক বাদে শুভংকররা একবার পুরো ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে এল ইন্ডিয়াতে। তখন আমিও এত বড়ো বিজনেসম্যান হয়ে উঠিনি। ছোটোখাটো ব্যাবসা করে কিছু পয়সা করেছি অবশ্য।

"সেইবারই শুভংকরের কোলে প্রথম দেখেছিলাম ওর এক বছরের মেয়ে মেরিকে। মা ইংরেজ হলেও, বাবা যেহেতু ভারতীয়... তাই মেরিকে দেখতে পুরো ভারতীয়দের মতোই হয়েছিল। আমার এখনও বেশ মনে আছে, সেইবার ওদের সঙ্গে ওই ক-টা দিন খুব হইহুল্লোড় করেই কেটেছিল আমাদের।

"এরপর এল সেই অভিশপ্ত দিন। শুভংকর ওর পুরো পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গেল ওর স্ত্রী শার্লট বেইলির দাদুর বাড়ি... বেইলি ভিলাতে। কিন্তু পথে এক ভয়ংকর দুর্ঘটনার

কবলে পড়ে ওরা সকলেই মারা গেল। শুধু বেঁচে রইল শার্লট বেইলি আর ওদের এক বছরের কন্যা মেরি।"

এতদূর বলার পর ধৃতিমানবাবু একটু থামলেন। ওঁর গলাটা কেমন যেন ভারী হয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর উনি আবার বলতে শুরু করলেন, "ওই ঘটনার কিছুদিন পর শার্লট নিজের মেয়েকে নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে গেল, নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য। এরপর কেটে গেল পুরো একটা বছর। কোনো যোগাযোগ রইল না ওদের সঙ্গে। আমরা তো প্রায় ওদের কথা ভুলতেই বসেছিলাম।

"কিন্তু এক বছর পর হঠাৎ একদিন শার্লট ফিরে এল ইন্ডিয়াতে। আর এসেই আমার সঙ্গে দেখা করল ও। ও আমায় জানাল... ওর নাকি কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে এখানে। তাই নিজের মেয়ে মেরিকে কিছুদিনের জন্য আমার কাছে রাখতে চায়। কথাটা শুনে আমি না করলাম না। কারণ ওই ছোট্ট মেয়েটাকে আমার প্রথম দিন থেকেই খুব ভালো লাগত। অদ্ভুত একটা মায়া ছিল ওর চোখ-মুখের মধ্যে।

"যা-ই হোক, এরপর শার্লট মেরিকে রেখে গেল আমার কাছে। তার সঙ্গে রেখে গেল ওর বিপুল সম্পত্তির কাগজপত্র... যেগুলো ও সব আগে থেকেই আমার নামে করে দিয়েছিল। সেদিন ও আমার হাতটা ধরে বলেছিল... যদি ওর কোনোদিন কিছু হয়ে যায়, আমি যেন ওর মেয়েটাকে দেখে রাখি। আমি ওর কাছে বহুবার জানতে চেয়েছিলাম, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও যাচ্ছে? কিন্তু ও কোনো জবাব দেয়নি। শুধু যাওয়ার আগে একটা সাদা হোলি ক্রস আমার হাতে দিয়ে বলেছিল... এটা নাকি চার্চের ফাদার হেনরিক ওকে দিয়েছে, নিজের সবচেয়ে বিপদের সময় ব্যবহার করতে। কিন্তু ওর কাছে নিজের বিপদের থেকেও বড়ো চিন্তার বিষয়, ওর মেয়ের বিপদ। তাই সেটা যেন আমি ঠিক সময় ব্যবহার করি, যখন ওর মেয়ের জীবন-মৃত্যুর সমস্যা হবে।"

ধৃতিমানবাবু আরও একবার থামলেন। তিতিরের চোখ দিয়ে তখন অনর্গল জল বয়ে চলেছে। ধৃতিমানবাবু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "তিতির... তোর মায়ের টাকাতেই আমি হয়তো এত বড়ো ব্যাবসা দাঁড় করাতে পেরেছি। কিন্তু তা-ই বলে আমি কখনও তোকে বঞ্চিত করিনি। তোর প্রাপ্যটা সবসময় তোকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এমনকি আমি এটাও ভেবেছিলাম যে এই বেইলি ভিলা হিসেবমতো তোরই বাড়ি। তাই এটাও আমি তোর নামেই কিনেছিলাম। কিন্তু তখনও বুঝিনি এই অভিশপ্ত বাড়িটা কিনে আমি শুধু আমার জীবনে নয়, তোর জীবনেও এত বড়ো বিপদ ডেকে আনছি।"

তিতির এবার হাঁটু গেড়ে সেখানেই বসে পড়ল মাটিতে। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে চলল, "এখানে সর্বক্ষণ মা আমার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকত। কোনো বিপদ, কোনো ক্ষতি আমাকে ছুঁতে পারেনি শুধুমাত্র আমার মায়েরই জন্য... আর আমি এত হতভাগ্য একটা মেয়ে যে মায়ের মুখটাও দেখতে পারলাম না এখানে।"

তিতিরের বুকটা কেমন যেন হাহাকার করে উঠল। মাটিতে আছড়ে পড়ে ও চিৎকার করে উঠল, "মাআআআআআ...."

ঠিক তখনই এই বৃষ্টির মধ্যেও একটা মৃদু হাওয়া ওকে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

* * * * * * * *

বেইলি ভিলা থেকে পুলিশের দল এসে যখন অংশুমান, বিনোদ আর চামেলির মৃতদেহ উদ্ধার করল, তখন কুয়োর আওয়াজ একদম শান্ত হয়ে গিয়েছিল। নীহারিকার মৃতদেহ উদ্ধার হল ডাওহিলের জঙ্গল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায়। রিকু কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সেদিন আমি মা-কে বলেছিলাম... মা, যেয়ো না ওখানে... ভূত আছে... কিন্তু মা আমার কথা শোনেনি।"

তিতির ওকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে, ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, "মা কোনোদিন কোথাও যায় না রে রিকু... দেখবি, মা সবসময় তোর পাশেই আছে। আর আজ থেকে তোর আরেকটা মা আছে তো... আমিই তো তোকে নিজের ছেলের মতো আগলে রাখব সারাজীবন।"

বৃষ্টি কিছুক্ষণ আগে থেমেছে। পুবের আকাশেও ফুটে উঠেছে আলোর রক্তিম রেখা। বেইলি ভিলার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রভাতের সেই প্রথম আলোয় বাংলোটার দিকে তাকিয়ে তিতির বলল, "যে বাংলোতে এত মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে, সেই বাংলো আমি চাই না বাবা। তুমি বরং এটাকে ভেঙে একটা চার্চ বানানোর ব্যবস্থা করো এখানে। সেই চার্চের নাম হবে... 'দ্য চার্চ অব শার্লট'।"

গাড়িতে উঠে বসল তিতির। ওদের গাড়ি ছুটে চলল কলকাতার পথে... নতুন শুরুর উদ্দেশে।



ঋণ

মৌমিতা ভৌমিক চৌধুরী



বাড়িটার নেমপ্লেটের সঙ্গে ডায়েরিতে লেখা ঠিকানাটা আরেকবার মিলিয়ে নিল তৃষা। হ্যাঁ, এই তো, চৌধুরী নিবাস, ৬০/৩ বামাচরণ রোড। শ্বেতপাথরের ফলকের ওপর কালো লেখা প্রায় মুছে এসেছে, কিন্তু তা-ও কষ্ট করে পড়া যায়। পুরোনো ইটের হাড়-পাঁজর বের করে মহিরুহের মতো দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। বাড়ির সামনেটায় এককালে গাড়িবারান্দা ছিল বোঝা যায়, এখন সংস্কারের অভাবে বেশির ভাগটাই ভেঙে পড়েছে। লোহার মস্ত ফটকে বোধহয় একসময় প্রহরীদের সেলাম বাজত অহরহ, এখন সে-ও এই ভরদুপুরের মতোই অলস, স্মৃতিভারাক্রান্ত।

জং-ধরা গেট ঠেলার জন্য হাত বাড়াল তৃষা। ঠিক তখনই জিনসের পকেটে সুরেলা শব্দে বেজে উঠল দূরভাষ। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল সে। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে—'মা'। নিমেষেই চোয়াল শক্ত হয়ে যায় তার। ওহ্, বুড়িটা আবার জ্বালাচ্ছে। এখনই ঘ্যানঘ্যানানি শুরু হবে। আজ সকালে বের হওয়ার সময়ও ভোম্বলদাকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে হয়ে গেছে একচোট। তার আপাত নিরীহ মা এই ভোম্বলদার ব্যাপারেই কেমন যেন রণচণ্ডী মূর্তি ধরে ফ্যালে। একেকদিন তো অশান্তি এত বেড়ে যায় যে তৃষার ইচ্ছা করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। ভোম্বলদার সঙ্গে মেলামেশাটা মায়ের একদমই পছন্দ নয়। ছেলেটা নাকি ভালো না। আরে বাবা, এখনকার দিনে লোকাল এমএলএ-র ছত্রছায়ায় থাকতে পারাটাই তো ক্রেডিট। আর ভোম্বলদার কাজগুলো যে একটু বাঁকা পথের, তাই পলিটিক্যাল শেলটার না থাকলে হবে কেন? সব থেকে বড়ো কথা, তার মতো চলনসই গোছের মেয়ের জন্য কোন এমন রাজপুত্র আসবে শুনি? এই ভোম্বলদাই যে জুটছে, সেই অনেক।

ফোনটা কেটে দিতে গিয়েও কী ভেবে কানে দেয় তৃষা।

"হ্যাঁ, বলো।"

"খেয়েছিস?" মায়ের গলায় চেনা উদ্‌বেগ।

নরম হতে গিয়েও ঝাঁজিয়ে ওঠে সে, "নাটক কোরো না তো, আমার খাওয়া-না-খাওয়ায় তোমার কী? তোমার গেলন মাথার কাছে ঢাকা দেওয়া আছে। গিলে উদ্ধার কোরো আমাকে।"

ফোন কেটে দেয় সে। আজ সকালে ভোম্বলদা আল্টিমেটাম দিয়েছে। সামনের ফাল্গুনে বিয়ের ব্যবস্থা করবে সে। আর কতদিন এভাবে চলবে? তার মা যতদিন থাকবে, সে বিয়েও করতে পারবে না। বাবা নেই, রান্না করা, বাজার করা, ঘরের কাজ থেকে শুরু করে মায়ের ওষুধপথ্যি—তৃষার ওপরেই সংসারের সব দায়িত্ব। প্রায় পঙ্গু মা-কে নিয়ে তো আর নতুন শ্বশুরবাড়িতে তোলা যায় না, আবার একলা ফেলে রেখে বিয়েও করতে পারছে না সে। কী করবে, কিছুই মাথায় আসছে না। এদিকে ভোম্বলদা চাপ দিচ্ছে বিয়ের জন্য। তার নিজেরও শখ-আহ্লাদ সব ঘুচতে বসেছে এই বুড়ির জন্য। নয় নয় করেও তিরিশের কোঠায় এসে পড়েছে সে। আর কতদিন?

একটা অসহ্য রাগ তৃষার মাথার মধ্যে শিকড়ের মতো চারিয়ে যেতে লাগল। মোবাইলটা পকেটে চালান করতে করতে লোহার বিশাল গেটটা ঠেলে এগোল সে মূল বাড়িটার দিকে। বাড়িটা ভেতর থেকে আরও প্রকাণ্ড। গেট থেকে বেশ খানিকটা হাঁটলে তবে বাড়ির দরজা। দু-পাশে বোধহয় কেয়ারি-করা শখের বাগান ছিল, অবহেলার চাদরে আজ ঢেকে গেছে সেসব। এখনও আগাছার মাঝে উঁকি মারছে কিছু শখের বোগেনভিলিয়া। 'এল' শেপের বাড়িটার পেছনের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে বাঁক নিতেই। ভাঙা ইটের পাঁজা ছড়িয়ে রয়েছে সেদিকটায়। কারও সাদা শাড়ি বোধহয় উড়ে এসে পড়েছে ছাদ থেকে। ইটের খাঁজে কিছুটা উঁকি মারছে।

তৃষা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিল, কাউকে পাওয়া যায় কি না, তখনই ওপরের বারান্দায় দেখতে পেল এক বৃদ্ধাকে। উহ্। বেজায় চমকায় তৃষা। কটকটে দিনদুপুর ভাগ্যিস। না হলে তৃষা বোধহয় এরকম জনমানবশূন্য ভূতুড়ে বাড়িতে সাদা শাড়ি-পরা বৃদ্ধাকে দেখে নির্ঘাত ভিরমি খেত। একটু সামলে উঠে প্রশ্ন করে তৃষা, "ব্যাংক থেকে আসছি। মি. সুজয় চৌধুরী কি বাড়িতে আছেন?"

বৃদ্ধা হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তৃষাকে। ইঙ্গিতে উত্তরের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলেন। বিপ বিপ শব্দ তুলে মেসেজ ঢুকল একটা। মোবাইলটা বের করল তৃষা। ভোম্বলদা।

"জিনিসটা কিনেছ তো? আজ রাতেই আসব। আর দেরি নয়..."

কাঁধে ঝোলানো বাদামি সস্তা হ্যান্ডব্যাগটা চেপে ধরে তৃষা। হ্যাঁ। জিনিসটা কিনেছে সে শেষ পর্যন্ত। ভোম্বলদাকে আজ সে খুশি করে দেবে। এ অনেক দিনের প্ল্যান তাদের। তৃষাই এতদিন এটা-সেটা বলে কাটিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু আর না। তৃষাও আর পারছে না। আজ মালটা কেনার জন্য বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরেছে তৃষা। অচেনা দেখে এই গলির মুখের ফার্মেসির ছেলেটা কেমন যেন মুখ করে প্যাক করে দিল মালটা। তৃষা যদিও স্মার্টনেস ধরে রেখেছিল আগাগোড়াই।

বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল আবার। ঢোঁক গিলে এগোল সে সিঁড়ির দিকে। এই ভিজিটটা সেরেই বাড়ি ফিরবে সে। আজ আর নয়। রাতে ভোম্বলদা আসবে। অনেক দিনের চাওয়া-পাওয়াগুলো আজ রাতে ডানা মেলবে। সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করে তৃষা।

অযত্নে হলদে হয়ে আছে সিঁড়িগুলো। তাদের আর আলাদা করে মার্বেল বলে চেনার উপায় নেই। দোতলার চক-মেলানো টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। তৃষা ওপরে উঠে আসতেই ইশারায় পুবদিকের একটা ঘরের দিকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর হাঁটা দিলেন উলটোপানে। এ কীরকম অভদ্রতা রে বাবা, ঘরটা ইশারায় দেখিয়ে দিয়েই খালাস? ঠোঁট মোচড়াল তৃষা। যাক গে, মরুক গে। তার কাজ শুধু ব্যাংকের লোন ডিউজের ইন্টিমেশনটা দেওয়া। সেটা ধরিয়ে মানে মানে পালাতে পারলে বাঁচে এই অদ্ভুতুড়ে বাড়িটা থেকে।

পায়ে পায়ে ঘরটার দিকে এগিয়ে যায় সে। শুধু একটা কাঠের কারুকাজ-করা পালঙ্ক আর একটা ভারী আলমারি। একপাশে হেলায় পড়ে আছে মেহগনি কাঠের পালিশ-চটা এক চেয়ার। বাড়িটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই ঘরটাও যেন দীনতাকে তার আভিজাত্যের আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে।

"নাও।" বসতে যাচ্ছিল তৃষা, হঠাৎ পেছন থেকে বৃদ্ধার গলা ভেসে আসায় চমকে উঠল সে। অতিরুগ্ণ নিরাবরণ হাত সাদা শাড়ির ফাঁকে বেরিয়ে আছে একটা কাঁসার গ্লাস ধরে।

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিতে গিয়ে তৃষার আঙুল ঠেকে যায় বৃদ্ধার আঙুলে।

কিন্তু সত্যি ঠেকল কি? কেমন যেন ফ্রিজের ঠান্ডা হাওয়া হাতে লাগল এসে,অনুভূতিটা আছে, কিন্তু অস্তিত্বের অনুভবটাই যেন নেই। কেন জানি না চোরা এক অস্বস্তি হতে থাকে তৃষার। কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে সে ফিরতে পারলে বাঁচে।

ব্যাগ থেকে ডায়েরি আর পেনটা বের করে শেখানো বুলি

কপচাতে শুরু করে।

"নমস্কার, আমি তৃষা, এইচএবিসি ব্যাংক থেকে এসেছি। মি. সুজয় চৌধুরীর সঙ্গে একটু দরকার ছিল, কাইন্ডলি ওঁকে কি একটু ডেকে দেওয়া যাবে?"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা।

"নাহ্, ও তো এখানে আর আসবে না। এ বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে ও। শুধু আমিই পারলাম না এখনও এ বাড়ির মায়া কাটাতে, পড়ে আছি তাই একা।"

বৃদ্ধা কাপড়ের খুঁট টেনে চোখের কোল মোছেন।

এই রে, শুরু হল রামায়ণ। ঘরে একটা জ্বালানে বুড়ি আছে। এ-ও তো দেখি সেম পিস।

মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেও, তৃষা মেকি হাসে।

"ওক্কে, তাহলে কাইন্ডলি ওঁর নিউ অ্যাড্রেস আর কনট্যাক্ট নাম্বারটা দিন প্লিজ। আমাদের ব্যাংকের তরফ থেকে ওঁর মোবাইলে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু মোবাইলটা সুইচ্‌ড অফ বলছে। আপনি বলুন একটু, আমি নোট করে নিচ্ছি।"

ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করতে যায় তৃষা।

"মোবাইল নাম্বার তো আমি জানি না। আর চাইলেই কি আর জোর করে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা যায়, মা?"

তৃষার এবার রাগ উঠতে থাকে ভেতরে ভেতরে। জ্ঞানদাত্রী সব একেকজন,উফ।

"মাসিমা, আপনি বোধহয় জানেন না, উনি ব্যাংক থেকে মোটা টাকার লোন নিয়ে রেখেছেন এই বাড়ি বন্ধক রেখে। তাই ভালোয় ভালোয় বলে দিন, উনি কোথায় আছেন। না হলে ব্যাংক এরপর স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেবে। শেষ বয়সে আপনি বাড়িছাড়া হবেন কিন্তু।"

ট্রেনিং-এর শেখানো কথাগুলো নরমে-গরমে ঠিকঠাক ডেলিভারি করতে পেরে নিজেই চমৎকৃত হল সে। মালগুলোকে এইভাবেই হ্যান্ডেল করতে হয়। সব জানে ছেলে কোথায়। টাকা গাপ করে ছেলে সরে পড়েছে আর ইনি এখন ন্যাকা সাজছেন। জানে না প্রাইভেট ব্যাংক টাকা আদায়ের জন্য কী কী করতে পারে। এরপরে যারা আসবে, তারা অন্তত বসে বসে এসব ধম্মের বুলি শুনবে না, সেটা তৃষা ভালোই জানে।

"আচ্ছা, উনি কবে এসেছিলেন এ বাড়িতে লাস্ট?"

বৃদ্ধা ফ্যাকাশে মুখটা তুললেন।

একটা কটু আঁশটে গন্ধ ভেসে আসছে খুব কাছের কোথাও থেকে।

"গতকাল রাতে।"

"আপনাকে কি কিছু বলে গেছেন, কোথায় যাচ্ছেন?"

"বলছিল নাকি অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে মার্কেটে। রেসের মাঠেও নাকি হেরে এসেছে। লোকে ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে টাকার জন্য।"

মাথা নিচু করলেন বৃদ্ধা। দু-হাতে মুখ ঢেকেছেন। বেঁকেচুরে যাচ্ছে শরীরটা, কান্নার দমক উঠছে।

তৃষা মনে মনে ভাবল, এ ব্যাটা গভীর জলের মাছ। অনেকের টাকা মেরে এখন পালিয়েছে। যাক গে, তার আর বিশেষ কিছু কাজ নেই। এবার ব্যাংকের পোষা উশলিরাই যা করার করবে। মুম্বইয়ের এই মাস্‌লম্যান পোষা কালচারটা হালফিলে এদিকেও আমদানি হয়েছে। আর কিছু রুটিন কোয়েস্‌চনস, ব্যাস। তৃষা ফ্রি তারপর।

হাতঘড়ির দিকে ঝট করে একবার চোখটা বুলিয়ে নিল তৃষা। ভোম্বলদাকে একবার কল করে নিলে কেমন হয় যে জিনিসটা সে পেয়ে গেছে। শুধু ডিটেইলসে না বললেই হবে। এ বুড়ি অত বুঝবে না।

নম্বরটা ডায়াল করল তৃষা। নেটওয়ার্ক নেই নাকি? একটা যান্ত্রিক শব্দ শুধু ভেসে আসছে ওপার থেকে। মোবাইলটা কান থেকে নামাল তৃষা। কল যাওয়ার সাইন ফুটে উঠছে, কিন্তু রিং হচ্ছে না।

"কাকে ফোন করছ? ভোম্বলদা কে?"

জোর চমকেছে তৃষা। কী করে জানল বুড়ি!

বৃদ্ধা মুখ তুলেছেন, দৃষ্টি তৃষার দিকে স্থির, চাহনিটা কেমন যেন মরা মাছের মতো লাগছে। এত দূর থেকেও নজর রেখেছে মোবাইলটায়। চমক খেলেও তৃষা নিজেকে প্রবোধ দেয়, হয়তো ইংরেজি পড়তে পারে, দেখে নিয়েছে তার স্ক্রিনে নামটা।

"আপনার জেনে কী লাভ তাতে? ভালোয় ভালোয় ছেলে কোথায় আছে বলে দিন আমাকে।" তৃষা গলা চড়াল এবার।

বৃদ্ধার ধূসর চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে লাগছে যেন।

"তুমি জানতে চাও-না ও কোথায়? সত্যি জানতে চাও?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ চাই। বলুন চটপট ন্যাকামি ছেড়ে।" তৃষার গলা দিয়ে এবার ঝরে পড়ে তীব্র অসন্তোষ।

"বেশ। তোমার যা ইচ্ছা। শোনো তাহলে। গত পরশু সন্ধ্যাবেলা সে নেশা করে আমার কাছে আসে। আমি তখন ছাদে আকাশপিদ্দিম জ্বালছিলাম। বাড়িটা প্রোমোটারকে বেচে দিতে জোর করতে থাকে সে। এ বাড়ি আমার দাদাশ্বশুরের আমলের। আমার বিয়ে, ছেলের বড়ো হওয়া, স্বামী-শ্বশুরের

গত হওয়া সব এ বাড়িতেই। কী করে সে বাড়িকে বেচে দিই বলো তো?"

পচা গন্ধটা যেন আরও তীব্রতর হয়ে উঠছে। ঘরের ভেতরে ঠান্ডাটা জমাট বেঁধে উঠছে চাপ হয়ে।

বৃদ্ধা বলে চলেছেন, "আমি যতই না করছিলাম, ওর জেদ আরও বেড়ে যাচ্ছিল। তারপর কোথা থেকে যে কী হল, ও রাগের মাথায় আমাকে দিল এক ধাক্কা। পুরোনো ছাদ, আমার ভারে একদিকের পাঁচিলটা কী করে যেন ভেঙে পড়ে গেল। ব্যাস, তার সঙ্গে নীচে পড়ে গেলাম আমিও।"

তৃষা রাগে উঠে দাঁড়ায় এবার।

"ইয়ারকি হচ্ছে? পরশু ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন আর এখন আপনি আমার সামনে বসে গল্প করছেন? আপনার কিছুই হল না?"

"কে বলল, কিছু হয়নি? আমি তো তখনই মরে গিয়েছিলাম, যখন ও আমার গায়ে হাত তুলেছিল। মায়ের মৃত্যু তো তখনই হয়ে যায়, যখন তার সন্তান তার গায়ে আঘাত করে। মায়ের মনটাই তো মরে যায় সন্তান তার জীবন নেওয়ার কথা ভাবছে এটা জানলেও, পড়ে থাকে শুধু বাইরের খোলসটা। কী তা-ই না? তুমি পারবে এরকম করতে? কোনো সন্তান কী করে পারে তার মায়ের মৃত্যুকামনা করতে, বলো তো?"

এ তো আবার কাব্য করছে দেখি। দাঁত কিড়মিড় করে তৃষা। "অনেক হয়েছে। এবার বলুন দেখি ছেলে কোথায়? এরপর কিন্তু ফল ভালো হবে না।"

"তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না, নাহ্? এসো তাহলে, আমার সঙ্গে ছাদে এসো।" বৃদ্ধার দৃষ্টি আরও সরু হয়ে আসে। ঘর-লাগোয়া ছাদের দিকে এগিয়ে যান তিনি।

তৃষার মন অকারণেই কু ডাকে। অস্বস্তিটা যেন বেড়ে গেছে আরও। এ যে ভালো পাগলের পাল্লায় পড়েছে সে। কোনোরকমে বুঝিয়েসুঝিয়ে এর থেকে ছেলের ঠিকানাটা নিয়ে এখান থেকে পালাতে হবে।

ধীরপায়ে বৃদ্ধার পেছন পেছন ছাদে আসে সে। বহু পুরোনো ছাদ, একদিকের আলশে সত্যিই ভেঙে পড়েছে। "ওই ওখানটা দিয়েই পড়ে গিয়েছিলাম আমি। যাও-না, দেখে আসো। যাও। সাবধানে যেয়ো কিন্তু।" বৃদ্ধার গলায় উদাস সুর।

কী একটা যেন ভর করেছে তৃষার ওপর। কেমন যেন একটা ঘুম-ঘুম ঝিম-ধরা ঘোরের মধ্যে দিয়ে তৃষা এগিয়ে যায় ভাঙা ধারটার দিকে। সে একদম ধারে পৌঁছে যায় প্রায়। কানের পাশে ভেসে আসে বৃদ্ধার চাপা অথচ তীক্ষ্ণ স্বর, "নীচে তাকাও।"

নীচে তাকায় সে। আর তাকিয়েই চমকে ওঠে। নীচে ভাঙা ইটের পাঁজার মধ্যে হাত-পা দুমড়ে উলটে পড়ে আছে এক বৃদ্ধা। মুখটা দেখা না গেলেও পরনের সাদা শাড়িটা তৃষার খুব চেনা। এই শাড়ির অধিকারিণীর সঙ্গেই সে এতক্ষণ কথা বলছিল। ঘোরটা এবার কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ভয়ে হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে তৃষার। কানের পাশে ফিসফিস শব্দ নিয়ে ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসে।

"আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, ভয়ে সেদিন ও পালিয়ে গেলেও পরের দিন রাতে আবার ফিরে এসেছিল, জানো, আমার লাশটা গায়েব করবে বলে। আমার ঘরের আলমারিতে বোধহয় টাকা-গয়না কিছু খুঁজছিল। আমাকে এ ঘরে দেখতে পেয়ে ভয়েই বোধহয় দৌড়ে পালাতে গেল, জানো। কিন্তু দরজাটাই ভয়ের চোটে খুঁজে না পেয়ে বোকাটা এই ছাদ থেকেই লাফিয়ে পড়ল। মা-কে কি কেউ ভয় পায়, বলো?"

ঝাপসা হয়ে-আসা চোখের কোণ দিয়ে তৃষা এবার দেখতে পেল, একটা পুরুষেরও হাত-পা দ-হওয়া মৃতদেহ পড়ে আছে অনতিদূরেই। ঠান্ডা হাওয়া একটা ঝাপটা মারছে তৃষাকে ঘিরে। অস্পষ্ট কুয়াশার চাদরে ঘিরে রয়েছে চারদিক। আঁশটে গন্ধটা নাকের ভেতর দিয়ে ঢুকে যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পেছন ফিরল তৃষা। তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে রীতিমতো। কই? কেউ কোথাও নেই। সে একা দাঁড়িয়ে ছাদে। বৃদ্ধা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ভোজবাজির মতো। মাথার মধ্যে অস্পষ্ট একটা বাঁচার ইচ্ছা ঝিলিক দিল তৃষার, পালাতে হবে, পালাতেই হবে তাকে এখান থেকে। বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে তার। কাঁপতে কাঁপতে ফেরার জন্য পা বাড়াল তৃষা, এমন সময় পেছন থেকে একদম কানের কাছে একঝলক ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে ফিসফিসিয়ে ভেসে এল বৃদ্ধার স্বর।

"পালিয়ে যাচ্ছ?" সঙ্গে ভেসে এল অপার্থিব এক হাড় হিম করে দেওয়া হাসি।

মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল তৃষার। ছাদের কিনারায় পা হড়কাল সে।

* * * * * * * *

পরদিন দুপুরে কোনো এক বাড়ির টিভি স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে সুবেশা সংবাদপাঠিকার চেহারা। "এই মুহূর্তে আমরা নজর রাখব আরও এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার দিকে। আজ সকালে পুলিশ গোবিন্দপুরের এক বাড়ি থেকে তিন-তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, এদের মধ্যে দুজন

মা-ছেলে, এবং আরেকজন একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী মায়ের মৃত্যু আগে ঘটেছে, তারপর ছেলের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ মায়ের শোকে ছেলে আত্মহত্যা করেছেন এরকমটাই মনে করা হচ্ছে।

"কিন্তু তৃতীয় এই মহিলা ব্যাংকের কাজে গিয়ে সুইসাইড কেন করলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণেই ওই তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁর মায়ের সঙ্গে গতকাল সকালে তাঁর ঝগড়া হয় তাঁর প্রেমিককে নিয়ে এবং সেই ঝগড়াই সম্ভবত হয়ে ওঠে তাঁর আত্মহত্যার কারণ। কারণ, তাঁর ব্যাগ থেকে পাওয়া গেছে একগাদা ঘুমের ওষুধ। আমরা সরাসরি চলে যাব ঘটনাস্থলে, সেখানে আছেন আমাদের প্রতিনিধি সঞ্জয় মিত্র। সঞ্জয়, তুমি ঠিক কী জানতে পারছ বিষয়টা নিয়ে?..."



চায়ের দোকান

সুতপা মন্ডল



এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ছুটছে গাড়ি; গন্তব্য বোলপুর। ড্রাইভিং সিটে বসে একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে শোভন, বছর

পঁয়ত্রিশের ঝকঝকে যুবক; মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির জুনিয়র এগজিকিউটিভ। খুব অল্প সময়েই চাকরিজীবনে উন্নতি করেছে শোভন। অসম্ভব পরিশ্রমী, মেধাবী এবং নিজের কাজে একনিষ্ঠতার জন্য অফিসের সবারই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র সে। শুধু তা-ই নয়, আজকের এই অত্যন্ত কঠিন প্রতিযোগিতার দৌড়ে, সবাই যখন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী; কে বন্ধু, কে শত্রু বোঝা দায়, সেখানে এই হাসিখুশি, মিশুকে এবং পরোপকারী ছেলেটি তার নিজের ব্যবহারের দ্বারা সকলের মন জয় করেছে।

ফোনটা বেজে উঠতেই শোভন দেখে, মা কল করেছে। কোম্পানির জরুরি কাজে বোলপুর যেতে হওয়াতে, অফিস থেকে ফিরেই, কোনোমতে ব্যাগ গুছিয়ে, সন্ধ্যাবেলাতেই বেরিয়ে আসতে হয় ওকে। মায়ের সঙ্গে বেশি কথা বলার সুযোগও হয়নি। উৎকণ্ঠিত, চিন্তান্বিত মা-কে একরাশ প্রশ্নের মুখে ছেড়ে আসতে ভালো লাগছিল না। কিন্তু উপায়ও ছিল না। খুব সকালেই বোলপুরে একটা জরুরি মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হবে। আর তাই রাতের মধ্যে না পৌঁছোলেই নয়। এরকম অবশ্য নতুন নয়, এর আগেও বহুবার এরকম শর্ট নোটিশে, শোভনকে, কোম্পানির কাজে বোলপুর বা অন্যত্র যেতে হয়েছে। এই তৎপরতার জন্য কর্তৃপক্ষও তাকে পছন্দ করে। মা জানে এ কথা, কিন্তু তা-ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করে তার ফিরে না-আসা পর্যন্ত। মায়ের কলটা রিসিভ করে শোভন।

"হ্যাঁ মা, তুমি অযথা চিন্তা কোরো না, আমি অনেকটাই চলে এসেছি; আর মোটামুটি এক ঘণ্টা। পৌঁছেই তোমাকে ফোন করব, কেমন?"

ফোনটা কেটে দেয় শোভন। মা ছাড়া তার আর কেউ নেই... না, কোনো গার্লফ্রেন্ডও নেই। তাই সে-ও বোধহয় মায়ের জন্য সবসময় চিন্তিত থাকে।

একটু যেন ক্লান্ত লাগে শোভনের নিজেকে। স্বাভাবিক, সারাদিনের অফিসের কাজ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসা, দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালানো... যদিও মাঝখানে একবার বিরতি নিয়েছে... তা-ও, শরীর তো! ক্লান্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। একটু যদি চা পাওয়া যেত!

হঠাৎ শোভনের চোখে পড়ে, রাস্তার ধার থেকে, একটু ভিতরে, আলো জ্বলছে; মনে তো হচ্ছে... চায়ের দোকান... স্পিড কমায় শোভন। এখানে চায়ের দোকান এল কোথা থেকে? এই রাস্তা দিয়ে এর আগেও, বহুবার দিনের বেলা যাতায়াত করেছে। তখন তো কোনো চায়ের দোকান চোখে পড়েনি! চায়ের দোকান কেন, আশপাশে তো কোনো জনবসতিও চোখে পড়েনি। তাহলে কি দোকানটা নতুন হয়েছে? হবে হয়তো... যাক গে। এই সময় একটু চা পেলে মন্দ হয় না।

গাড়িটা রাস্তার ধারে নিরাপদ জায়গায় লক করে শোভন এগিয়ে যায় চায়ের দোকানটার দিকে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে একটু হতাশ হল শোভন। পুরোনো, একদম লজ্‌ঝড়ে দোকান... নতুন কোথায়? দোকানের অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে, একটা ঝড় হলেই দোকান ভূমিকে আশ্রয় করবে! তাই হয়তো বন্ধই থাকে বেশিরভাগ সময়। হয়তো সেই কারণেই চোখে পড়েনি এর আগে।

সে যা-ই হোক, আলো জ্বলছে যখন, এক কাপ চা পাওয়া গেলেও যেতে পারে; দেখা যাক এগিয়ে।

কাছে গিয়ে শোভন দোকানের টিমটিমে আলোয় দেখে, একটি লোক উনানের ধারে বসে ঝিমোচ্ছে... চায়ের দোকানই বটে! শোভন একটু গলাখাঁকরানি দিতেই লোকটি জেগে উঠল। শোভনকে দেখে লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোকটিকে দেখে মনে হল, বেশ বয়স্ক, মাথার চুল সব সাদা, এমনকি চোখের পলকগুলিও সাদা! মুখটি অসংখ্য বলিরেখাপূর্ণ। পরনে ময়লা ছেঁড়া ফতুয়া আর ততোধিক ময়লা ধুতি। কিন্তু লোকটির দৃষ্টিটা কেমন যেন! এক বুভুক্ষু মানুষের সামনে হঠাৎ এক থালা পঞ্চব্যঞ্জন এলে যেমন তার লোভাতুর দৃষ্টি থালাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, লোকটি সেরকমই দৃষ্টি নিয়ে শোভনের দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করল শোভন!

"চা হবে?"... অস্বস্তি সত্ত্বেও লোকটিকে বলল শোভন।

"হ্যাঁ বাবু, নিশ্চয়ই হবে। আপনার মতো খদ্দেরের অপেক্ষাতেই তো আছি... কতদিন ধরে! কেউ তো আসে না এখানে!" শেষ কথাগুলি যেন একটু আক্ষেপের স্বরে বলে লোকটি।

"একটু তাড়াতাড়ি", শোভন বলে উঠল।

"হ্যাঁ বাবু, এক্ষুনি দিচ্ছি।"

লোকটি উনান জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপায়। কিন্তু লোকটি বয়সের কারণেই হয়তো খুব একটা চটপটে নয়। চা তৈরি হতে শোভনকে সে ডাকে, "বাবু, এই নিন চা।"

চা-ওয়ালার কাছ থেকে চা নেয় শোভন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দোকানটিতে বসার কোনো জায়গা নেই... শুধু উনানের পাশে চা-ওয়ালার বসার জায়গাটি ছাড়া।

চা-ওয়ালা বুঝতে পেরে, তার পাশের একফালি জায়গা

দেখিয়ে শোভনকে উদ্গ্রীব স্বরে বলে ওঠে, "বসুন-না বাবু, এইখানে। বসে চা খান... বসুন-না একটু!" কিন্তু ওই নোংরা জায়গাতে বসার প্রবৃত্তি হল না শোভনের। সে দাঁড়িয়েই চা খেতে লাগল... আর কেমন একটা উদাসী দৃষ্টি নিয়ে শোভনের চা খাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল দোকানি।

নাঃ, চা-টা ভালোই বানিয়েছে। চা খেয়ে ক্লান্তি যেন একনিমেষে দূর হয়ে গেল। চায়ের দাম মিটিয়ে গাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল শোভন। অনেকটা দেরি হয়ে গেছে... এখনও রাস্তা বাকি আছে বেশ কিছুটা।

"বাবু...!" চা-ওয়ালার ডাকে ঘুরে তাকায় শোভন।

"কী?"

"আবার আসবেন তো?"

"মানে?"

"না, মানে, আবার এই রাস্তা দিয়ে গেলে, চা খেতে আসবেন তো? এইখানে?"

লোকটিকে নিরুৎসাহ করতে ইচ্ছা করল না শোভনের। গরিব মানুষ, হয়তো অনেকদিন বাদে একজন খদ্দের পেল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসব বই-কি!... চলি।" লোকটির মুখে হাসি ফোটে।

শোভন গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয়।... গাড়ি এগিয়ে চলে বোলপুরের দিকে।

চায়ের দোকানে চা-ওয়ালা নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকে... চোখ দুটি তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল!

"আসতে আপনাকে হবেই বাবু... আসতে আপনাকে হবেই...!"

অফিসে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত লাগছিল শোভনের। ইদানীং... শোভন একটুতেই খুব ক্লান্তি অনুভব করে। শরীরের সেই উৎফুল্ল, প্রাণোচ্ছল ভাবটাও আগের মতো নেই। বোলপুর থেকে সেবার ফেরার পর থেকেই এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। মা খেয়াল করেছে। চেহারাটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। গালটা একটু ভেঙে গেছে, চোখের তলাতেও হালকা কালির ছোপ পড়তে শুরু করেছে। ইদানীং খাওয়াদাওয়াতেও একটা অরুচির ভাব চলে এসেছে। রাতের ঘুমটাও ঠিকঠাক হচ্ছে না। হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়... দুঃস্বপ্ন দেখে... আর বেশির ভাগ সময়ই প্রায় একই রকম দুঃস্বপ্ন... ঘন অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে কেউ যেন তাকে ডাকছে!... একটানা, একঘেয়ে ডাক!... কিন্তু, সে ডাক যেন নিশির ডাকের মতো...; আর সেই ডাককে উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতা যেন শোভনের নেই। তার অন্তরাত্মা যেন ছুটে যেতে চায় সেই ডাকের হাতছানিতে।... আর তখনই রোজ ঘুমটা ভেঙে যায়!

নাহ্! এবারে ডাক্তারই মনে হয় দেখাতে হবে! তবে এখন এক কাপ চা দরকার, কড়া করে। শরীর, মন দুটোই চাঙ্গা হবে।

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল শোভন। চা-টা আসতেই গরম গরম চায়ে চুমুক দেয় শোভন।

"ওয়াক থু!"... চা-টা মুখে দিয়েই মুখ থেকে ফেলে দেয় শোভন। "এটা একটা চা হল? অখাদ্য!... তেতো বিষ! চা বানাতেও জানো না?"

"কিন্তু, স্যার, এরকম চা-ই তো রোজ বানাই! আপনি তো আগে এই চা-ই খেতে ভালোবাসতেন! কিন্তু, আজ কী হল স্যার?"

"আবার মুখে মুখে তর্ক করছ! যাও এখান থেকে!"

লোকটি চলে যাওয়ার পর শোভনের একটু খারাপই লাগল। সে আগে কখনও এত রূঢ়ভাবে কারও সঙ্গে কথা বলেনি! কী যে হয়েছে তার! আর সত্যি কথা বলতে, ওর তো দোষও নেই। কারণ, এখন... কোনো চায়েই শোভন আর স্বাদ পায় না! এমনকি, মায়ের করা চায়েও! অথচ, চা খেতে সে খুব ভালোবাসে। আগে, দিনে বেশ কয়েকবার চা খাওয়া হয়ে যেত। আর এখন!... ভালোই লাগে না। শুধু চা কেন... কোনো খাবারেই সে আর স্বাদ পায় না সেভাবে!

বিছানায় শুয়ে আছে শোভন; শরীরটা বেশ খারাপ। খাবারে চূড়ান্ত অরুচি, কিছুই প্রায় খেতে পারছে না। চেহারাও তার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হয়েছে। সেই ঝকঝকে তরুণ শোভন কেমন যেন বুড়োটে দেখতে হয়ে গেছে এই কয়েকদিনে; এমনকি কয়েকটা চুলও পেকে গেছে। বেশ কয়েকজন ডাক্তার দেখানো হয়েছে, রিপোর্টও করানো হয়েছে একগাদা। সবাই বলছেন, সব রিপোর্ট নর্ম্যাল। কিন্তু কোনো উন্নতিই হচ্ছে না। মা তো কান্নাকাটি করছেন আর দিনরাত পুজো দিয়ে চলেছেন।

আর দুঃস্বপ্নগুলো এখন প্রায় সারারাত তাকে তাড়া করে। কোনো এক অদৃশ্য বাঁধন যেন তাকে বদ্ধ করে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে আর শোভন যেন তার হাতের পুতুলের মতো সেই অমোঘ আকর্ষণে এগিয়ে চলেছে!...

রাত তখন কত কে জানে! প্রবল অস্বস্তি নিয়ে শোভনের ঘুম ভাঙল। মোহগ্রস্তের মতো উঠে দাঁড়াল সে। মায়ের দিকে

তাকিয়ে, গাড়ির চাবি নিয়ে, পা টিপে টিপে বেরোল শোভন!

রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি, প্রবল বেগে, যেন কোনো এক অনাগত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। শোভনের চোখ দুটো অপরিসীম প্রতীক্ষায় একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে, এক উৎকণ্ঠিত তৃষ্ণা তার সারা শরীর জুড়ে!

ঘ্যাঁচ... হঠাৎ রাস্তার ধারে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ে। শুনশান এলাকা, জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। তবে কি... শোভন পৌঁছে গেছে গন্তব্যে?.. কাঁপা-কাঁপা হাতে গাড়ির দরজা খোলে শোভন। দুর্বল শরীরে এতদূর গাড়ি চালিয়ে এসে আর যেন শক্তি অবশিষ্ট নেই তার!... কিন্তু, যেতে যে তাকে হবেই! টলমল পায়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে এগোয় শোভন।

ওই তো!... ওই তো!... আলো জ্বলছে!

টলতে টলতে পৌঁছোয় শোভন। দোকানি আজ জেগে আছে,... যেন তারই প্রতীক্ষায়।

"আসুন বাবু... আসুন।" বুভুক্ষু দৃষ্টি নিয়ে বলে ওঠে দোকানি।

"এ...ক... কা...প... চা হবে? তাড়াতাড়ি?"

"নিশ্চয়ই বাবু,... আপনার অপেক্ষাতেই তো বসে আছি।"

আজ খুব দ্রুত চা বানায় দোকানি। তারপর... পরম যত্নে এগিয়ে দেয় শোভনের দিকে।

আঃ!... এক চুমুকেই যেন প্রাণটা জুড়িয়ে গেল! কবেকার তৃষ্ণার্ত বুকে যেন তৃপ্তির শীতল পরশ লাগল! কিন্তু, আর দাঁড়াতে পারছে না শোভন; শরীরে আর শক্তি নেই সেরকম।

"বসুন বাবু, এখানে বসুন।"... ফাঁকা চায়ের গ্লাস হাত থেকে নিয়ে, নিজের পাশের জায়গাটিকে দেখায় দোকানি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ চোখ দুটি যেন তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আজ আর উপেক্ষা করতে পারল না শোভন। ধীরে ধীরে গিয়ে বসল তার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল দোকানি। কিন্তু, এ কী!... এ কী হচ্ছে!

চোখের সামনে যেন সিনেমা দেখছে শোভন!... বয়স্ক সেই লোকটির চেহারা একটু একটু করে বদলাতে লাগল!... চুলের সাদা রঙের ভাব কমে কালোর জেল্লা লাগল... গালের বলিরেখা কমে গেল, হাত-পায়ের শিথিলতা দূর হয়ে, শেষ পর্যন্ত একটি মধ্যবয়স্ক লোকে পরিণত হল দোকানি!... নিজের হাত-পায়ের দিকে তাকিয়ে, মুখের ওপর হাত বুলিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে সে!

এইরকম অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে, শোভন ব্যতিব্যস্ত হয়ে, উঠে পালাতে গেল... কিন্তু... এ কী হল!.. সে উঠতে পারল না!... নাঃ, কিছুতেই সে উঠতে পারল না! মনে হল, ওই চেয়ারটির সঙ্গে সে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

"আর উঠতে পারবেন না বাবু... আমি এবার চলি।" অদ্ভুত এক প্রশান্তির হাসি মুখে নিয়ে বলে ওঠে দোকানি!

লোকটি এগোতে গেলে অস্ফুটে আওয়াজ করে ওঠে শোভন! হতভম্ব তার যেন আর কথা বলার ক্ষমতাও নেই! ঘুরে দাঁড়ায় লোকটি।

"অপেক্ষায় থাকুন বাবু... যেমন আমি এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম... কতদিন, কত মাস, কত বছর... এখন আর মনে নেই! আপনাকেও অপেক্ষায় থাকতে হবে... আবার কবে কেউ এখানে আপনার হাতে চা খেতে আসবে, তার জন্য। কবে আবার কেউ আপনার এই বসার জায়গায় এসে বসবে, তার জন্যেও অপেক্ষা করুন। তবেই আপনার মুক্তি।"

লোকটি এবার দ্রুতপদে এগিয়ে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।

চায়ের দোকানে... শোভন তখন চেষ্টা করতেই থাকে ওঠার। কিন্তু... পারে না! আস্তে আস্তে তারও চেহারার পরিবর্তন হতে থাকে! হাত-পায়ের চামড়া কুঁচকে যায়, মুখে ফুটে ওঠে বলিরেখার চিহ্ন, চুলগুলি সাদা বর্ণ ধারণ করে, শরীরের শক্তি যেন আরও কমে যায়!... নিষ্ফল চেষ্টার শেষে, ঘোলাটে চোখে একরাশ প্রতীক্ষা নিয়ে তাকিয়ে থাকে সে... সামনের অন্ধকারের দিকে!



জয়দ্রথ বধ

শুভাশিস গাঙ্গুলী



প্রদীপ্তর কথা

''সত্যি বলো দাদু, অর্জুন কি বিরাট বড়ো বীর ছিলেন? ওই বাবা যে বলে কর্ণ আরও বড়ো।''

আমার দাদু, রমারঞ্জন সামন্ত, এককালের সংস্কৃতের অধ্যাপক, হাসতেন এই প্রশ্নে। গভীর জ্ঞান থাকলে বোধহয় এরকম শিশুর মতন হাসতে পারে মানুষ।

''তোর বাবা অনেকটাই ঠিক। পুরো নয়। শোনো বাপু প্রদীপ্ত সামন্ত (দাদু গম্ভীর বক্তব্য রাখার সময় মজা করে আমার পুরো নাম বলত মাঝে মাঝে), ফাইনেস্ট কোয়ালিটির দার্জিলিং চা কি আর মাটির খুরিতে খাওয়া যায়? তার জন্য বোন চায়না লাগে। কিন্তু তাতে কি মাটির খুরির মর্যাদা বা তার তৈরির মুনশিয়ানা কিছু কমে?''

''দাদু, কী যে বলো তুমি। কিচ্ছু বুঝি না মাঝে মাঝে।''

''দাদুভাই রে। কত বড়ো বড়ো বীর ছিল মহাভারতে বল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণর বিশ্বরূপ প্রকাশের জন্য দরকার হল অর্জুনকে। এক সভা ভরতি কৌরব, ভীষ্ম, দ্রোণ সবাই মিলে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করার সময়ও তিনি প্রকট হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশিত হননি। কারণ আধার। ধর্মপক্ষে বোন চায়নার আধার ছিলেন অর্জুন। তাই না দার্জিলিং চায়ের মতন বিশ্বরূপ ফুটেছিল।''

''এর সঙ্গে কর্ণের কী...! তুমি না দাদু, এক কথা বলতে বলতে কোথায় যে চলে যাও।''

"ওরে পাগলা। কনক্লুড করছিলাম তো। অর্জুন আর কর্ণ উনিশ-বিশ। শুধু অধর্মের পক্ষে গিয়েই কর্ণ মাটি করলেন। তাই আমার চোখে বীরশ্রেষ্ঠ হল ওই সব্যসাচী।"

"সত্যি, দাদু। অর্জুনের মতো বীর হব আমি। কুরুক্ষেত্রের নায়ক।"

দাদু হাসতেন, "শুধু কুরুক্ষেত্রের? সারাজীবনে ত্যাগে, সখ্যে, ভ্রাতৃপ্রেমে, সবচেয়ে বড়ো কথা, নিষ্ঠায় অর্জুন অর্জুনই। জানিস দাদু, অর্জুন মহাপ্রস্থানের পথে কেন পড়ে গিয়েছিলেন? তিনি নাকি অহংকারী এক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন... চাইলে আমি এক মুহূর্তে এই যুদ্ধ শেষ করতে পারি। কিন্তু সাধারণ যোদ্ধার মতো আমার অস্ত্রবিদ্যার ওপর ভরসা করে লড়ব... এ উক্তিতে অহংকার ছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের 'ইতি গজ'র মতন মিথ্যাভাষণ ছিল না। অর্জুনের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়াও ছিল পাশুপাত, যা অন্য কারোই ছিল না। কিন্তু মহাকালের সহ্য হয়নি।"

"আমিও হব অর্জুনের মতন।"

দাদু হাসতেন, "নিশ্চয়ই হবি। একাগ্রতা চাই। নিষ্ঠা চাই। আর চাই যে কাজ করছি, তাকে জীবনের অঙ্গ করে ফেলা। অর্জুন মহাকাব্যের নায়ক। তাই তার প্রেক্ষাপট বিরাট। তিনিও মানানসই। তুই তোর জীবনের প্রেক্ষাপটে অর্জুন হওয়ার চেষ্টা করবি। হতেও যদি না পারিস। জানটা রাখ। নিষ্ঠাটা রাখ।"

এইসব কথোপকথন কিন্তু একদিনের নয়। এ চলতেই থাকত। এইভাবে অর্জুন, ফাল্গুনি, পার্থ ধীরে ধীরে আমার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। লোকে অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খানের ফ্যান হয়। আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে গেল অর্জুন। আরও বড়ো হয়ে পরীক্ষা দিয়ে পুলিশে যাওয়া। ট্রেনিং-এর সময় তো ট্রেনার আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি এরকম পাগলের মতো ট্রেনিং আজকাল আর কে-ই বা করে? স্মল আর্মস আর রাইফেল যখন এল, তখন তো আর কথাই নেই। রাতে আয়নার সামনে শ্যাডো চলত। খালি হাতে। যেন অদৃশ্য বন্দুকটা আছেই হাতে। আমি সত্যি সত্যি ফিল করতাম বন্দুকটা। হাতে না থাকলেও।

"অলিম্পিকে মেডেল পেতে পারতে তো তুমি।"

হাসতাম আমি।

"স্যার, অস্ত্র অভ্যাসের নিষ্ঠায় অস্ত্রধারীই অস্ত্র হয়ে ওঠে।"

ট্রেনার হাসতে হাসতে থেমে গিয়েছিলেন।

"কী বললে! কী বললে, আর-একবার বলো। এমন কথা কী করে বললে!"

"ভুল বললাম, স্যার?"

সাত্যকি স্যার ভীষণ উত্তেজিত।

"জিতে রহো বেটা। আমার যে ট্রেনার ছিল, সে এইর'ম একটা কথা বলত। বলত, সেরা বাজিয়ের যন্তর লাগে না। তার দিমাগে সুর থাকে। অর্জুনের গাণ্ডীব নিয়ে ঘুরতে হয় না। না-ধনুকও গাণ্ডীব হয়ে যায় তার কাছে। তোমার হবে, দীপ্ত। ভালোবাসা আছে তোমার।"

সে অনেক আগের সব দিন। আপাতত এসপি-আমি বসে আছি এসিপি বর্মাজির অফিসে। গত ছ-মাস ধরে ট্র্যাক করে জনিকে কর্নার করার পর তলব।

"জনির পেছনে লেগে আছ। ভালো। এই মেসেজটা পড়ো। R2-এর একটা ডিভিশন এটা পাঠিয়েছে। তারা কে, কী, কেন—এসব জিজ্ঞেস কোরো না। শুধু এটাই বলার, এরা একশো পার্সেন্ট রিলায়েব্‌ল।"

মেসেজটা পড়ে উত্তেজনায় আমার ঘাম দিতে লাগল। জনি এত ওপরের ক্রিমিন্যাল! জাস্ট একটা ড্রাগ মাফিয়া নয়।

"স্যার, জনি সারেন্ডার করবে। খবর পাঠিয়েছে। একটা শর্ত রেখেছে আমার ইনফর্মার মারফত। আমাকে একা গিয়ে ওকে আনতে হবে।"

এসিপি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

"বুঝতে পারছ?! বুঝেছ?! এটা একটা ট্র্যাপ। তুমি ঠিক পথে যাচ্ছ। একা গেলেও কভার ছাড়া যেয়ো না খবরদার!!"

"হোক ট্র্যাপ। কোনো কভার নেব না, স্যার।"

"কারও কাজে হস্তক্ষেপ করি না আমি। কিন্তু গাইড তো করতে পারি। কভার ছাড়া এটা কিন্তু সুইসাইডাল হবে।"

"না স্যার। সুইসাইড অর নট, কভার নিয়ে গেলে জনি যদি সারফেস্ড না হয় তাহলে এই সুযোগ আর আসবে না। বিশেষ করে এখন যখন জানলাম জনির অরিজিনাল লোকাস স্ট্যান্ডি, তখন কভারের রিস্ক নিতে পারি না। ইন ফ্যাক্ট, আমি এখন তো ভাবছি, আনআর্মড্ যাব কি না।"

এসিপি শিউরে উঠলেন। "স্বপ্নেও ভেবো না এটা। ইফ অ্যাট অল আনকভার্ড, অস্ত্রহীন যাওয়া স্ট্রিক্টলি নো নো।"

"ঠিক আছে, স্যার। আমি রিপোর্ট দেব।"

"বেস্ট অফ লাক।"

একটা ঘোরের মধ্যে বেরোলাম। সামনে আমার কুরুক্ষেত্র। আমার দেশবাসী আমার পুত্রসম অভিমন্যু। আমি জয়দ্রথের বিরুদ্ধে যাচ্ছি। কতবার কে জানে কতরকম চক্রব্যূহের দায়িত্বে ছিল জনি। কতশত অভিমন্যু তার ড্রাগস, টেররিস্ট অ্যাকটিভিটির কানাগলি থেকে আর বেরোতে পারেনি কে

জানে। অশিক্ষা, খিদে, ভুল-পথে-সহজ-উপার্জন, জুয়া, নেশা, লোক ঠকানোর বীরত্ব বা বিত্তের অহংকার এরকম সপ্তরথীদের চক্রব্যূহের দরজা আগলে থাকে এই জনিরা। কাল মুখোমুখি লড়াই। আমার কোনো কৃষ্ণসারথি নেই। সব অর্জুনের সে সৌভাগ্য থাকে না।

না থাক। আমার রইল তৃতীয় পাণ্ডব। আমার রইল শমীবৃক্ষের খোঁজ।

সাত্যকির কথা

বসে ছিলাম R2-এর অফিসে। আমাদের এই কাজ। জায়গামতো খবর দেওয়া। সে খবর পেয়ে কী অ্যাকশন নেওয়া হল, সেটা আমাদের দেখার কথাও নয়, দেখিও না। কয়েক বছর হল ট্রেনিং থেকে এখানে এসেছি। এই ডিভিশনটা ভালো? না ট্রেনিং? এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় ফোন। জে. বর্মা। কী মুশকিল। এদেরকে ইনফর্মেশন দেওয়াও জ্বালা।

"সাত্যকি সাহেব?"

"স্পিকিং।"

"বর্মা।"

"সে তো বুঝতেই পারছি।"

"আপনার ফেভারিট স্টুডেন্ট তো এনডেঞ্জার্‌ড। এটা মানেন তো?"

"এনডেঞ্জার্‌ড!! মানে? ইন ডেঞ্জার? কে ফেভারিট? আমি ট্রেনার ছিলাম যখন, কাউকে আলাদা করে ফেভারিট দেখিনি কোনোদিন।"

"এনডেঞ্জার্‌ড মানে এনডেঞ্জার্‌ড। এই স্পিসিসের অফিসার আজকাল পাওয়াই যায় না। আর ডেফিনিটলি হি ইজ ইন ডেঞ্জার। শর্টে বলছি, স্যার। জনিকে অ্যারেস্ট করতে আমাদের এক এসপি যাচ্ছে। একা। উইদাউট কভার। মানা করলেও শুনছে না। আপনার পেয়ারের স্টুডেন্ট ছিল। আমি তো আপনাকে এমনকি রিকোয়েস্ট করার জায়গায়ও নেই। শুধু এটুকুই বলতে পারি, আপনার উচিত মনে হলে একটু দেখবেন।"

"কী নাম?"

"প্রদীপ্ত সামন্ত।"

এক ঝটকায় অনেক কথা মনে পড়ে গেল। অনেক কথা। ইমোশন তো আমার দেখাতে নেই। বললাম, "ডেট, টাইম, ভেনু আর প্রদীপ্তর এখনকার একটা ছবি পাঠান। দেখছি।"

প্রদীপ্তর ফোন বন্ধ। ভীষণ একরোখা। যখন চিনতাম, তখন অন্তত তা-ই ছিল। গাড়ি নিলাম না। অনেক সময় গাড়ি একটা লায়াবিলিটি। চেরি ব্রিজের কাছে অব্দি ট্যাক্সিতে। এখান থেকে একদম নির্জন। এই জায়গাটা চেনা আমার। এতই নির্জন যে হঠাৎ করে প্রতিপক্ষ এসে গেলে এ শহরে নতুন, এরকম ভাব দেখাতে হবে। একটা-দুটো ভিলা গোছের বাড়ি ছাড়া গাছ অনেক। এটাই বাঁচোয়া। টাইমিং-এর কুড়ি মিনিট পর এখানে আমি। সেদিক থেকে সেফ। কারণ ওরা নিশ্চয়ই দু-আড়াইশো মিটার দেখে নিয়েছে অলরেডি, কেউ কভার করছে কি না।

একশো মিটার। ঘোলাটে একটা মেঘলা সূর্যহীন বিকেল। প্রদীপ্তকে দেখতে পাচ্ছি। দু-হাত মাথার পেছনে দিয়ে খুব নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে তল্লাশি পর্ব শেষ, নাটকের প্রথম অঙ্ক হয়ে গেছে। একটা বিস্কিট কালারের গাড়ি। খুব অর্ডিনারি। সুইফ্‌ট। জনি নামল। আশ্চর্য। সে-ও একা। এরকম হয়? জনির লেভেলের কাওয়ার্ডরা বডিগার্ড ছাড়া আসে? এত ফাঁকা যে কথাবার্তা একদম পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম।

"হাই, সামন্ত!"

"ডিটো, জনি। চলুন। যদিও এগজ্যাক্টলি জানি না কেন আপনার সারেন্ডার করা দরকার। অ্যান্ড হোয়াই মি ইজ সো লাকি টু গেট ইউ?"

জনি গাড়ির দরজা খুলে সিটের নীচ থেকে একটা 9mm পিস্তল বার করল। দূর থেকে দেখে অস্ট্রিয়ান গ্লকের মতন লাগল। কমপক্ষে সতেরোটা গুলির, দেড়শো ফুটমতো রেঞ্জ। খুব ভালো অ্যাকিউরেসি এইগুলোর। জনি খুব চিন্তিতভাবে বলল, "আমিও পাজল্‌ড। আপনি সত্যিই একা এসেছেন। আর সত্যিই ভাবছেন, আই উইল সারেন্ডার?"

"তো? আত্মসমর্পণ করবেন না? তবে কী জন্য এসেছেন? কথা বলতে?"

"উঁহু। এই সিচুয়েশনে একটাই তো উদ্দেশ্য। লিকুইডেশন।"

"ওক্কে। আমাকে মেরে লাভ?"

"টু স্ট্রাইক আ টেরর। আমার পেছনে পুলিশ লাগানোর আগে স্টেট তিনবার ভাববে। সিম্পল।"

"গ্রেট। গো অ্যাহেড দেন। আই অ্যাম আনআর্মড্‌। অলরেডি আপনার লোকেরা তো বডি সার্চ করেছে।"

এটা সিনেমা নয় যে জনি অন্তত এক মিনিটের একটা ডায়ালগ দেবে। ও স্রেফ গুলি করবে আর চলে যাবে।

ইন্সটিঙ্কটে আমি রিভলভারটা বার করলাম। কিন্তু সে অস্ত্র ধরাই রইল হাতে।

ওদিকে জনিকে আর এদিকে আমাকে একদম হতবুদ্ধি করে প্রদীপ্ত ডান হাঁটু গেড়ে বাঁ পা-টা সমকোণে রেখে বাঁ হাতটা টানটান করে ধরল। মুঠো করে। ঘুসির মতো মুঠো নয়। একটু ফাঁক আছে। কিন্তু শক্ত করা। কবজির দুটো নালি দেখা যাচ্ছে। যেন বজ্রমুঠিতে কিছু একটা ধরে আছে। ডান হাতটা বাঁ হাতের প্যারালাল। পুরোপুরি নয়। বাঁ হাতের ফোরআর্মের ভেতরের দিকের পাশাপাশি। সে মুঠিটাও অদ্ভুত। অনামিকা আর কনিষ্ঠা তালুতে লাগা। তর্জনী আর মধ্যমা তাদের থেকে কিছুটা পাশে। যেন সিগারেট ধরা। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাদের ডগার সঙ্গে লাগোয়া। এই অবস্থায় ডান মুঠিটা পিছোতে লাগল। আস্তে আস্তে। যেন শরীরের সমস্ত শক্তি লাগছে। ডান কনুই প্রসারিত বাঁ হাতের সঙ্গে সমকোণে এল। আরও পেছোচ্ছে। আরও জোর লাগছে। আরও। আরও একটু। এবার ডান মুঠি প্রায় ডান কানের কাছাকাছি। প্রদীপ্ত ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানল। বুক ভরতি দম। অপলক। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। সারা শরীরের পেশি স্থির। জনি এবার দৃশ্যতই ধন্দে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে কেউ এরকম আচরণ করে!?

প্রদীপ্ত পাথরের মূর্তির মতো। এবার সারা শরীর অনড় অবস্থায়, শুধু ডান মুঠিটা খুলল। স্প্রিং-এর মতন। মেঘলা বিকেল সামান্য আগে পরিষ্কার হয়েছে। হলুদ আবিরের মতন গোধূলিতে তখন লাল রং ঢালছেন সূর্যদেব।

বজ্রপাতসদৃশ একটা শব্দ। অপরিচিত এই নির্ঘোষকে কি টংকার বলে!

ভগবান! প্রদীপ্ত তাহলে একটা অদৃশ্য কিন্তু ভারী ধনুকে তির লাগিয়ে জ্যা টানছিল!

সেকেন্ডের ভগ্নাংশ লাগল ঘটনাটা ঘটতে। ফুট বিশেক দূরে স্বয়ংক্রিয় আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সতর্ক এবং বিমূঢ় দুশমন বুঝতেও পারল না, কী তাকে আঘাত করল।

বহু যুগ পেরিয়ে, কণ্ঠনালি ভেদ করে চলে গেল অরিঘ্ন পাশুপাত।





ফাঁদ

অভিষেক দাস



(প্রথম পর্ব)

একটু জোরেই গাড়ির ব্রেকটা কষল অমলেন্দু। আসলে গাড়ি চালাতে চালাতে এক খেয়ালে তার চোখ দুটো লেগে এসেছিল। শুধু যে সে অফিসের কাজে ক্লান্ত তা কিন্তু নয়; সম্প্রতি তার মানসিক উদ্‌বেগের এক প্রত্যক্ষ কারণ উদিত হয়েছে। একটা মারাত্মক ডিসিশন সে নিতে চলেছে। সেটার কথা ভাবতে ভাবতেই অমলেন্দুর ঘুম প্রায় প্রতিরাতেই মাঠে মারা যাচ্ছে। তা ছাড়াও অর্ধনির্লিপ্ত চোখে গাড়ি-চালানো অবস্থায় তার যেন মনে হল, গাড়ির সামনে অকস্মাৎ কে যেন চলে এসেছে। পরে অমলেন্দু বুঝতে পারল, ওটা তার নিছকই চোখের ভুল ছিল।

এখন সে ইউনিভার্সিটি রোড দিয়ে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে। এই ইউনিভার্সিটি রোডটা বরাবরই খুব নির্জন, তার ওপর আবার আজ সন্ধে হয়ে যাবার পরও কেউ স্ট্রিটল্যাম্পগুলো জ্বালায়নি। এমন সময় এখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও কোনো প্রত্যক্ষদর্শী থাকবে না।

অমলেন্দুর হৃৎস্পন্দন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্টিয়ারিং দু-হাতে জোর করে চেপে ধরে জোরে জোরে শ্বাস নেয় সে। তখনই পাশের সিটে রাখা তার মোবাইলের রিংটোনটা বেজে ওঠে। অমলেন্দু কলটা রিসিভ করে।

"হ্যালো। অমলেন্দু। আমি একটা ট্রাব্‌লের মধ্যে পড়ে গিয়েছি।"

"কী হয়েছে, পামেলা? তোমার গলার আওয়াজটা এমন শোনাচ্ছে কেন?"

"এই ঘণ্টা দুয়েক আগে বাবা হঠাৎ বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। মাথা- টাথা ফেটে সে হুলুস্থুল কাণ্ড। এদিকে মা চেন্নাইয়ে মাসির বাড়ি গেছেন। আমি ঘরে একা। পাশের ফ্ল্যাটের দুজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে বাবাকে নিয়ে আমি নার্সিং হোম এসেছি। ডক্টর এখন বাবাকে দেখছেন। মা-কে খবর দিয়েছি, যদিও তাঁর আসতে তো টাইম লাগবে। সো..."

"সো হোয়াট?"

"আমাকে বাবার কাছে থাকতে হবে। এ মুহূর্তে আমি বাবাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না।"

"আরে, আমাদের সমস্ত প্ল্যান রেডি। প্লেনের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে আর এখন তুমি বলছ যে আসতে পারবে না!"

"আসবই না তো একবারও বলিনি। আমার কাল হবে না। আমি পরশু দিনের ফ্লাইটে গ্যাংটক যাব। তুমি প্ল্যানমাফিক কালকেই গ্যাংটক চলে যাও, গিয়ে আমার জন্য জাস্ট একটা দিন অপেক্ষা করো।"

"কিন্তু-উ-উ..."

"আর কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়। এতদিন অপেক্ষা করলে আর মাত্র একটা দিন অপেক্ষা করতে পারবে না আমার জন্য? কী বলো, পারবে না?"

"ও.কে.। অ্যাজ ইউ উইশ।"

"ও.কে. দেন। আই লাভ ইউ।"

"আই লাভ ইউ টু ডিয়ার।"

ফোনটা রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অমলেন্দুর গাড়ির উইন্ডোগ্লাসে কেউ টোকা মারে। আচমকা এই টোকা মারার শব্দে অমলেন্দুর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। সে উইন্ডোগ্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় একজন মানুষের অবয়ব। উইন্ডোগ্লাসটা নামানোর পরেও মানুষটার মুখখানা স্পষ্ট বোঝা গেল না। চারিদিকের অন্ধকার যেন চাদরের মতো মানুষটাকে ঢেকে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পর হাসি-মাখা পুরুষালি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বই কিনবেন বাবু? গল্পের বই। ভালো ভালো গল্পের বই আছে।"

অমলেন্দু কিছু মন্তব্য করার আগেই মানুষটা উইন্ডো দিয়ে হাত গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে একটা বই বাড়িয়ে দেয় অমলেন্দুর দিকে। যেন সে অমলেন্দুকে বইটা একরকম জোর করেই গছাতে চাইছে। অমলেন্দু বইটা হাতে নিয়ে একটু উলটে-পালটে দেখতে লাগল। বইটার নাম 'ফাঁদ'। বই পড়া অমলেন্দুর একটা নেশা। তাই সে বইটা কিনতে চাইল।

"বইটা আমি নিচ্ছি। আচ্ছা ভাই, কত দাম বইটার?" বলে যেই না অমলেন্দু উইন্ডোর দিকে তাকাল, চমকে উঠল সে। বই বিক্রেতা মানুষটা চোখের নিমেষেই উধাও হয়ে গেছে। অমলেন্দু বার তিনেক হাঁক দেওয়ার পরও মানুষটির টিকিটিও পাওয়া গেল না। বিস্মিত হল অমলেন্দু; সে নিজের মনেই ভাবল, এ কীরকম আজব ব্যাপারস্যাপার। এই ভর সন্ধেবেলায় কেউ কেনই বা বই বিক্রি করবে? আর যদি করেও বা, বইয়ের দাম না নিয়েই সে আচমকা কেন এমন উধাও হয়ে যাবে?

না, আর এ নির্জন রাস্তাটায় থাকা চলে না। হাতের বইটা পাশের সিটে রেখে গাড়িটা স্টার্ট করল অমলেন্দু।

(দ্বিতীয় পর্ব)

গাড়িটা গাড়িবারান্দায় গ্যারেজ করল অমলেন্দু। তারপর সদর দরজার তালা খুলে যেই না বৈঠকখানার আলোটা অন করতে যাবে, অমনি আলোটা অন্য কেউ যেন অন করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা উল্লসিত মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল।

"সারপ্রাইজ...!"

চমকে উঠল অমলেন্দু। আজ তার পদে পদেই চমক। তবুও কোনোমতে মুখে একটা কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে অমলেন্দু বলল, "আরে-এ-এ শোয়েতা! তুমি এখন চলে এলে? তোমার না পরশু আসার কথা ছিল?"

শোয়েতা অমলেন্দুর আরও কাছে এসে তার দুটো হাত অমলেন্দুর দুটো কাঁধে রেখে বলল, "হুম, কথা তো ছিল। কিন্তু আমার কাজ যখন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল, তখন আর আমার বরটাকে সারপ্রাইজ দেওয়া থেকে নিজেকে আর আটকাতে পারলাম না যে।"

"সারপ্রাইজ বলে সারপ্রাইজ! এমনকি দারোয়ান সিংজিও কিছুই বলল না তোমার আসা নিয়ে।"

"আমি সিংজিকে আগেই অ্যালার্ট করে দিয়েছিলাম। নইলে সারপ্রাইজটা আর সারপ্রাইজই থাকত না। যাক গে, সেসব কথা এখন থাক। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো ডাইনিং রুমে। আমি তোমার জন্য আজ অনেক রান্না করেছি।"

"বটে! এমনিতেও আমার পেটে আজ ছুঁচোয় ডন মারছে। তুমি গিয়ে খাবারগুলো বাড়ো। ম্যায় ইউঁ গ্যয়া অউর ইউঁ আয়া।"

* * * * * * * *

ডাইনিং টেবিলে একটা চিকেন রেজালা মুখে পুরে সেটা চিবোতে চিবোতে অমলেন্দু প্রশ্ন করল, ''আচ্ছা শোয়েতা, তোমার অনিরোলজির রিসার্চের কাজ কেমন চলছে?''

''পুরোদমে'', বলল শোয়েতা। ''একটা গ্যাজেট অলরেডি আমরা ইনভেন্ট করে নিয়েছি। এখন সেটারই ট্রায়াল চলছে।''

''কেমন গ্যাজেট? মানে কাজ কী সেটার?''

''সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।''

''আর বলছিলাম যে...''

''ওয়েট আ মিনিট। আই হ্যাভ সামথিং নাইস ফর ইউ।''

এই বলে শোয়েতা ডাইনিং রুম থেকে কিচেনে চলে গেল। আর মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল এক হাতে একটা রেড ওয়াইনের বোতল আর অন্য হাতে দুটো ওয়াইন গ্লাস নিয়ে।

অমলেন্দুর চোখের দৃষ্টি একটু উজ্জ্বল হয়ে গেল।

''চিয়ার্স!''

দুজনে একসঙ্গে বলে একে অপরের ওয়াইন গ্লাসে মৃদু টোকা মেরে আস্তে আস্তে সাবাড় করতে থাকল সেই রক্তিম তরল।

* * * * * * * *

রাত বারোটা। শোয়েতা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু অমলেন্দুর চোখে বিন্দুমাত্রও ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে বিছানার পাশে টেবিলে রাখা টেবিল ল্যাম্পটার আলো অন আর অফ করছে। তার মাথায় সবকিছুই কেমন যেন গুলিয়ে আসছে।

একবার অমলেন্দু তাকায় ঘুমন্ত শোয়েতার মুখটার দিকে। তার বুকটা ক্রমশ ভারী হয়ে আসে। কিছু আবেগপ্রবণ খেয়াল তার মাথায় ঘোরাফেরা শুরু করে। আজ পর্যন্ত কী দিতে পেরেছে শোয়েতা অমলেন্দুকে? না সময় আর না সন্তানসুখ। মাসের প্রায় প্রতিটা দিনই শোয়েতা পড়ে থাকে ব্যাঙ্গালোরে। সেখানের ইন্ডিয়ান অনিরোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে কী সব ছাইপাঁশ রিসার্চ করতে থাকে। অমলেন্দু পেশায় একজন সিরিয়াল অ্যানত্রেপ্রেনিওর। তবে তার স্টার্ট-আপ কোম্পানিটা তো শোয়েতার বাবার টাকায় খোলা। এমনকি এই বাড়িটাও তো শোয়েতার বাবারই দান করা। তাই তো দাম্পত্য কলহের সময় শোয়েতা অমলেন্দুকে কড়া কথা শোনাতেও পিছপা হয় না।

এরকমভাবে মেরুদণ্ডহীনের মতো থাকতে থাকতে যখন অমলেন্দুর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই তার বিজনেস পার্টনার হিমাংশু পরিচয় করায় পামেলার সঙ্গে। বেশ মার্জিত আর শালীন মেয়ে পামেলা। সে কিছুদিনের মধ্যেই অমলেন্দুর মনে নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। সে অমলেন্দুকে দিয়েছে ভালোবাসার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক সুখও। তাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা দুজনে একসঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সেট্‌ল হবে অনেক দূরে। এবং পাতবে এক নতুন সংসার। দুজনের ছোট্ট সংসার।

না, আজ রাতে মনে হয় না আর ঘুম আসবে অমলেন্দুর। দুশ্চিন্তাগুলো বারে বারে মাথাচাড়া দিচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠে অমলেন্দু গেল ব্যালকনিতে। দু-তিনটে সিগারেট সহযোগে সেখানেই কিছুক্ষণ পায়চারি করল সে। এমন সময় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল আজ সন্ধেবেলার কথাটা, সেই বইটার কথা। ঘুম যখন আসছে না, তখন ওই বইটাই পড়া যাক!

যেই ভাবা, সেই কাজ। একটা চেয়ার টেনে টেবিলল্যাম্প অন করে টেবিলটাতে বইটাকে নিয়ে বসল অমলেন্দু। বইটার নাম আগেই দেখেছিল সে। এবার দেখল লেখকের নাম। অন্তিম গুপ্ত। কস্মিনকালেও এ নাম শোনেনি অমলেন্দু। লাল রঙের হার্ড কভারে মোড়া দেড়শো পাতার এক উপন্যাসিকা। হার্ড কভারটির উপর আঁকা রয়েছে একটা পুরুষের মুখের প্রচ্ছদ। সেই প্রচ্ছদটা খানিকটা অমলেন্দুর মুখাবয়বের সঙ্গে মিল খায়। কিন্তু এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়, আশ্চর্য ব্যাপারটা হল এই যে, অমলেন্দু যখন প্রথম বইটা দেখেছিল, তখন তো বইটার হার্ড কভারে কোনো প্রচ্ছদ আঁকাই ছিল না। যাক গে, তখন হয়তো অমলেন্দুর দেখতে ভুল হয়েছিল।

মোট তেরোটা পর্বে লেখা উপন্যাসিকাটি। তার প্রথম তিনটে পর্ব পড়তেই অমলেন্দুর মুখে হাসি ফুটে এল। গল্পের নায়কই গল্পের কথক। এই তিনটে পর্বে গল্পের কথক বর্ণনা করেছে তার সঙ্গে তার স্ত্রী-র দাম্পত্য কলহের কথা আর তার অবৈধ প্রেমের কথা। এইটুকু পড়েই কোনো এক জাদুর মন্ত্রবলে অমলেন্দুর চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে এল। বইটা পড়া বন্ধ করে টেবিলল্যাম্প অফ করে সে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায় শোয়েতার পাশে।

(তৃতীয় পর্ব)

সকাল ছয়টায় ঘুম ভাঙার পর অমলেন্দু বিছানায় দেখতে পেল না শোয়েতাকে। বোধহয় মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছে। এটাই সুযোগ। তাড়াহুড়ো করে অমলেন্দু সাজিয়ে নিল তার ট্রলি ব্যাগ আর নিজেকে। শোয়েতার জন্য কোনোরকম বিদায় চিঠি না ছেড়েই সে আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। পথে সে তার মোবাইলের সিম কার্ডটা বদলে নিল। আজ তার অনেকটাই পথ জার্নি।

মেদিনীপুর থেকে হাওড়া স্টেশন, সেখান থেকে এনএসসিবি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে সোজা বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যখন অমলেন্দু পৌঁছোল, তখন সূর্য অস্ত যায়-যায়। এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া করেই সে চলল গ্যাংটকের উদ্দেশে। গ্যাংটকের এম জি মার্গ-এ হিমাংশুর নিজস্ব একটা মোটেল রয়েছে। সেখানেই গিয়ে উঠবে অমলেন্দু। হিমাংশুর সঙ্গে সব কথা হয়ে গেছে। এক মাস আগেই অমলেন্দু আর হিমাংশু এখানে এসেছিল ছুটি কাটাতে। তখনই প্ল্যানটা অমলেন্দুর মাথায় আসে। হিমাংশু অবশ্য অমলেন্দুর সমস্ত প্ল্যানটা জানে। পামেলার ভিসা না ক্লিয়ার হওয়া পর্যন্ত তারা দুজনে হিমাংশুর এই মোটেলেই থাকবে। তারপর সব মিটমাট হয়ে গেলে তারা দুজনে পাড়ি দেবে আমেরিকায়। ওখানের ফোনিক্স শহরে থাকেন পামেলার বিধবা পিসি। পামেলাকে তিনি বেশ ভালোবাসেন। কথা আছে, তিনিই ওখানের সব বন্দোবস্ত করে রাখবেন।

বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে এম জি মার্গ প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার রাস্তা। অমলেন্দুর মোবাইলটাও আপাতত সুইচ অফ করা। তাই টাইম পাসের জন্য অমলেন্দু কাল-পাওয়া বইটাকেই বেছে নিল। সকালে ট্রলি ব্যাগ গোছানোর সময় হাতের সামনে ওই বইটা দেখামাত্রই ব্যাগে চালান করেছিল সে।

বইটার আরও দুটো পর্ব পড়ে ফেলল অমলেন্দু। কাহিনিটা এবার ক্রমশ গাঁজাখুরি হয়ে উঠছে। গল্পের নায়ক এক পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘন কুয়াশা ভেদ করে নাকি চলে যায় তার প্যারালাল ইউনিভার্সে। না, এ অখাদ্য বইটা আর পড়া যাবে না, এই ভেবে শব্দ করে বইটা বন্ধ করে দিল অমলেন্দু।

কাচের ভেতর দিয়েই পথের আশপাশের পরিবেশ একমনে দৃষ্টিগোচর করছিল অমলেন্দু। হঠাৎ রানিপুলের সামনে এসে ট্যাক্সিটা একটা বিকট শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

বুড়ো ড্রাইভার মুখে চুকচুক শব্দ করে বলল, ''লগতা হ্যায় ইঞ্জিন বিগড় গ্যয়া হ্যায় সাব।''

''আশপাশ কোই গ্যারেজ নেহি হ্যায় কেয়া?'' জিজ্ঞেস করল অমলেন্দু।

''হাঁ সাব, মগর... ইতনে রাতকো তো গ্যারেজ ভি বন্দ হো গ্যয়া হোগা।''

''এ তো আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। রাস্তায় কোনো যানবাহনও তো চোখে পড়ছে না। আব কেয়া করে?''

''জি সাব, ইহাঁ সে এম জি মার্গ সির্ফ তেরা কিলোমিটার দূর হ্যায়। তো আপ এক কাম করে, পয়দল হি...''

অগত্যা তা-ই করতে হবে। রাত মাত্র সাড়ে নয়টা মানেই যে রাস্তাঘাট এতটা শুনশান হয়ে যেতে পারে, সেটা অমলেন্দু আগে ভাবেনি। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তার যথাযথ ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্রলি ব্যাগ হাতে সে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তাটা অবশ্য ট্যাক্সি ড্রাইভারই বুঝিয়ে দিল অমলেন্দুকে।

পরিশ্রম হলেও চারপাশের শীতল শুষ্ক পরিবেশ শরীরে ঘাম জমতে দিচ্ছে না অমলেন্দুর। এমনকি ক্লান্তিও তেমন বোধ হচ্ছে না তার।

চারিদিক আস্তে আস্তে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। স্ট্রিটল্যাম্পের আলোগুলোকেও কুয়াশা আবছা করে দিয়েছে। এখনও অব্দি একটাও চোখে পড়ল না অমলেন্দুর। মনে হয়, পুরো শহরটাই বুঝি ঘুমিয়ে রয়েছে।

রাস্তার একটা জায়গায় কুয়াশাটা বেশ ঘন হয়ে ছিল। কোনোমতে এক হাতে করে কুয়াশা ঠেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে চলল অমলেন্দু। অবশেষে সে পৌঁছোল এম জি মার্গ-এ। এখান থেকে রাস্তাটা তার মুখস্থ। আলো ঝলমলে ব্যস্ত এম জি মার্গ এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা। তবে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। বিস্ময়ের ব্যাপারটা হল হিমাংশুর এভারগ্রিন মোটেলটা। অমলেন্দু যখন সেখানে পৌঁছোল, চমকে উঠল একেবারে।

অমলেন্দু স্বপ্ন দেখছে না তো? নচেৎ এই এভারগ্রিন মোটেলটা এক মাসে এতটা জীর্ণ- শীর্ণ আর পরিত্যক্ত কী করে হতে পারে?

এক মাস আগে যখন অমলেন্দু হিমাংশুর সঙ্গে এখানে ছুটি কাটাতে এসেছিল, তখন তো এই মোটেলটা রীতিমতো ভালো অবস্থাতেই ছিল। একতলা চমৎকার আট কামরার মোটেল বাড়ি ছিল এটি। মোজাইক-করা এই মোটেলের সর্বত্রই ঝলমল করত আলোয়। এখন এই মোটেলটাকে দেখে

কোনো পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। স্ট্রিটল্যাম্পের আলোয় মোটামুটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে দীর্ঘকাল এই মোটেল বাড়িটা মেইনটেইন না-করার ফলে সেটার দেওয়ালের পলেস্তারা অনেকাংশেই ক্ষয়ে গেছে। বাকি দেওয়ালের রং চটা। জানলা-দরজাগুলোর কোনোটাতে পাল্লা নেই, আবার যেগুলোর অবশিষ্ট আছে দেখে মনে হচ্ছে, তারাও শীঘ্রই তাদের কাজে ইস্তফা দিয়ে দেবে। সব মিলিয়ে এভারগ্রিন মোটেলটা পরিণত হয়েছে এক আলোচ্যুত প্রেতপুরীতে।

অমলেন্দু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সামনের রাস্তাটায়। এখন কী করবে সে? ফিরে যাবে মেদিনীপুরে? ফিরে গিয়ে শোয়েতাকে কী জবাবদিহি করবে সে? এমন সময় পিছনদিক থেকে ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

''কৌন হ্যায় বহাঁপে?''

অমলেন্দু পিছন থেকে দেখল, এভারগ্রিন মোটেলটার মুখোমুখি রাস্তার উলটোদিকের দোতলা বাড়িটার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। অমলেন্দু চেনে তাঁকে। ভদ্রলোকটার নাম পঙ্কজ পট্টনায়েক। হিমাংশুই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে। মি. পট্টনায়েক একসময় কলকাতাতেই চাকরি করতেন। এই সবে দু-বছর হল বিপত্নীক এই ভদ্রলোক গ্যাংটকে এসে রয়েছেন নিজেরই পৈতৃক ভিটাতে।

অমলেন্দু মি. পট্টনায়েককে উদ্দেশ করেই বলল, ''আমি। অমলেন্দু শিকদার। হিমাংশুর বন্ধু।''

''ওঃ বাঙালি? তা এত রাতে এখানে কী করছেন?''

''আসলে আমি এই মোটেলে এসেছিলাম কিছুদিন থাকব বলে, কিন্তু...''

''অ। দাঁড়াও তুমি। ওখানে আমি আসছি।''

এই বলে মি. পট্টনায়েক দু-মিনিটের মধ্যে তাঁর বাড়ির সদর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে এলেন। অমলেন্দু তাঁকে দেখে একগাল হেসে বলল, ''চিনতে পারছেন আমায়? এক মাস আগে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।''

''মাপ করবেন। আপনাকে তো ঠিক... চিনতে পারলাম না।''

''সে কী! এই তো এক মাস আগেই আপনার বাড়িতে এসে আমি আর হিমাংশু বিলিয়ার্ড খেলে গেলাম।''

''আচ্ছা, আপনি নেশা-পান করেছেন নাকি মশাই? আমি বিলিয়ার্ড খেলা সাত বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। আর এই মোটেলটা বিগত দশ বছর ধরে পরিত্যক্ত পড়ে আছে। এই মোটেলের মালিক এখন জেলে পচে মরছে।''

অমলেন্দুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মি. পট্টনায়েকের কোনো কথা সে ঠিকমতো বোধগম্য করতে পারছে না। শেষমেশ অমলেন্দু মন্তব্য করল, ''এবার... এবার... আমি এখন কোথায় যাব?''

মি. পট্টনায়েক এবার বিনম্র কণ্ঠে বললেন, ''রাত অনেকই হয়েছে। আপনি একটা কাজ করুন-না, আজকের রাতটা আমার বাড়িতে কাটিয়ে কাল সকাল হলেই অন্য কোনো হোটেল-মোটেলে গিয়ে উঠবেন'খন। আমার বাড়িতে মানুষ বলতে মোটে দুজন, আমি আর আমার চাকর ড্যানিয়েল। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। আসুন আসুন।''

(চতুর্থ পর্ব)

মি. পট্টনায়েক অমলেন্দুকে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায়। আগের বারের চেয়ে বৈঠকখানার ঘর যে অনেকই পালটে গেছে তা ভালোমতোই ঠাহর করতে পারল অমলেন্দু। তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার, ঘোর পালটেছে মি. পট্টনায়েকের চেহারারও। তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল সম্পূর্ণ উঠে গেছে, চোখ আর চোয়ালের নীচের চামড়াটা একটু বেশিই কুঁচকে ঝুলে গেছে, দু-দিকের গাল আগের চেয়ে অনেকই বসে গেছে, এমনকি কথা বলার সময় অমলেন্দু ঠাহর করল, ভদ্রলোকের সামনের দুটো দাঁতও পড়ে গেছে এবং উনি হাঁটার সময় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁটছেন। কিন্তু এতটা পরিবর্তন মাত্র এক মাসে কীভাবে?

''রাতে নিশ্চয় কিছু মুখে দেওয়া হয়নি?'' জিজ্ঞেস করলেন মি. পট্টনায়েক।

''না'', জবাব দিল অমলেন্দু।

''আমার ফ্রিজে কেক আছে। আপনি এই সোফাটায় বসুন। আমি এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসছি।''

অমলেন্দু ভদ্রলোককে কোনো বাধা দিল না। সত্যিই তার খুব খিদে পেয়েছে।

কেক খাওয়া শেষ হলে পর মি. পট্টনায়েক একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে এসে বসলেন অমলেন্দুর পাশে। সোফার সামনের টি-টেবিলে দুটো কাচের গ্লাস আগে থেকেই রাখা ছিল; তিনি একটা গ্লাস টেনে নিয়ে তাতে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে অমলেন্দুকে বললেন, ''ইদানীং আমার একটা নতুন ব্যারাম হয়েছে। রাত্তিরে তাড়াতাড়ি ঘুম আসতে চায় না। তো কী করি, রাতে কিছুক্ষণ ওই দোতলার ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে থাকি। রাতের বেলায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে

স্ট্রিটল্যাম্পের আলোয় চেনা শহরটাকে দেখার এক আলাদা অনুভূতি রয়েছে। ভাগ্যিস আজও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি যদি না আপনাকে দেখতে পেতুম তাহলে তো... হা...হা...হা...।"

"সো কাইন্ড অফ ইউ।"

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মি. পট্টনায়েক বললেন, "তা আপনি সত্যি বলছেন, আপনি আমাকে চেনেন?"

"অফ কোর্স মি. পট্টনায়েক।"

"কী জানি মশাই! আজকাল সব কথা মনে থাকতে চায় না। বয়সটা তো নেহাত কম হল না।"

"আচ্ছা, ওই মোটেলটার এরকম অবস্থা হল কীভাবে?"

"তা হবে না! ওটা যে এখন ভূতেদের আঁতুড়ঘর। স্থানীয় লোকেরা কেউ ভুলেও পা মাড়ায় না ওই মোটেল বাড়িটার দিকে।"

"ভূত?"

"আরে ছাড়ুন তো মশাই রাতবিরেতে ওসব ভূত-পিশাচের কথা! তা আপনার চলবে নাকি এক-দু পেগ? হে...হে..."

চলবে, আজ রাতে অমলেন্দুর মদ্যপানের প্রয়োজন আছে। তার সমস্ত প্ল্যান মাথার ভেতর কেমন যেন ঘেঁটে গেছে।

দশ নম্বর পেগ সাবাড় করামাত্রই মি. পট্টনায়েক প্রলাপ বকতে শুরু করলেন। বলাই বাহুল্য, অমলেন্দু সে সমস্ত কথা কানেই তুলল না।

এদিকে পাঁচ পেগ খাবার পর অমলেন্দুর মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেছে। এই এক মাসের মধ্যে আদৌ কি এভারগ্রিন মোটেলটা হন্টেড হাউসে পরিণত হয়েছে তা তলব করে দেখবে সে।

মি. পট্টনায়েক এতক্ষণে সোফাটায় সম্পূর্ণ গা এলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চোখ দুটো বন্ধ কিন্তু মুখ চলছে ক্রমশ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা দরকার। অমলেন্দু পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে। প্রায় নিঃশব্দে দরজার খিলটা খুলে সে বেরিয়ে পড়ল সেই বাড়ি থেকে।

এভারগ্রিন মোটেলটার দিকে এগোতে এগোতে অমলেন্দু ভাবতে থাকে, কালকে পামেলা গ্যাংটকে আসছে। এই মোটেলটাই একমাত্র আমাদের মাথা গোঁজার জায়গা। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; পামেলার বাবা-মা যখন ওকে বাড়িতে না পেয়ে পুলিশে খবর দেবে, তখন প্রায় সর্বত্রই ওর হুলিয়া জারি হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কি অচেনা কোনো হোটেল-মোটেলে গিয়ে ওঠা নিরাপদ হবে?

ভাঙা ফটক পেরিয়ে ঝোপঝাড়ে ভরা বাগান দিয়ে হেঁটে মোটেল বাড়িটার সদর দরজার সামনে দাঁড়াতেই অমলেন্দু দেখতে পেল দরজায় কোনো তালা লাগানো নেই। কিন্তু মি. পট্টনায়েকের বাড়িতে যাবার পূর্বে যখন অমলেন্দু প্রথমবার এই মোটেলটা দেখেছিল, ওর মনে হয়েছিল যেন সদর দরজাটায় একটা মরচে-পড়া তালা ঝুলছে। যাক গে।

সদর দরজায় টাচ করামাত্রই সেটা 'ক্যাঁচ্-চ্-চ্...' আওয়াজে আপনা থেকেই খুলে গেল। সে কী! দরজাটা কেবল ভেজানো ছিল নাকি?

পকেটের মোবাইল ফোনটা বের করে সেটার সুইচ অন করল অমলেন্দু। তারপর মোবাইলের টর্চটা অন করে দিল সে। একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল তার।

"ইজ এনিওয়ান হেয়ার? কোই হ্যায়..."

অমলেন্দু চ্যাঁচাল। কোনো প্রত্যুত্তর এল না। বরং অমলেন্দুর নিজের গলার স্বরই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল।

হাতের মোবাইলটা সামনের দিকে তাক করে এগোতে থাকে সে। কিন্তু ওই জমাট-বাঁধা অন্ধকারের কতটাই বা সরাতে পারে সেই আলো!

অভেদ্য আঁধার আর অনমনীয় নিস্তব্ধতা যেন একসঙ্গে সন্ধি ঘটিয়েছে এই মোটেল বাড়িটার অন্দরমহলে। সময়ের কোনো প্রভাবই হয়তো এখানে পড়ে না।

হঠাৎই একটা চাপা গোঙানির শব্দ নিস্তব্ধতার বুক চিরে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ অন্তর শোনা যেতে লাগল সেই শব্দ। ক্রমে সেই শব্দ আকার নিল হাসিতে। সেই হাসি তাচ্ছিল্যের হাসি। অমলেন্দু থমকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এইবার সে হাসির শব্দটাকে অনুসরণ করা শুরু করল।

দরজা পেরিয়েই লম্বা করিডোর আর তার ডাইনে-বাঁয়ে লাগোয়া সব রুম। অমলেন্দু এক-পা এক-পা করে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল বামদিকের শেষের রুমটাই। মনে হচ্ছে যেন হাসির শব্দটা এই রুম থেকেই আসছে। রুমটাই কোনো দরজা নেই। তাই অবাধেই অমলেন্দু ঢুকে পড়ল সেই রুমে। ভ্যাপসা গন্ধটা আরও ঘন হয়ে এল। সিলিং থেকে ঝুলন্ত ঝুলগুলো জড়িয়ে পড়ল তার সারা শরীরে।

হাসির শব্দটা থেমে গেছে। রুমের কোথা থেকে যেন একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। সেই রুমটাই দাঁড়িয়ে থাকার এখন আর কোনো মানেই হয় না। অমলেন্দু রুমটা থেকে বেরোনোর জন্য পিছনে ঘুরতেই পুনরায় শোনা গেল সেই হাসির শব্দ। স্পষ্ট বোঝা গেল, হাসিটা আসছে তার একদম পিছনদিক থেকে। এবার হাসিটাই তাচ্ছিল্যের পাশাপাশি বেদনারও ছোঁয়া রয়েছে। আজব এই শব্দটা কি আদৌ হাসি,

নাকি কান্না?

ভিতু বলে বদনাম অমলেন্দুর কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু এখন তবুও তার গলা শুকিয়ে এল। তার হৃৎস্পন্দনের শব্দ এখন সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে।

অমলেন্দুর একটু একটু ভয় হচ্ছে বটে, কিন্তু কৌতূহলটা হচ্ছে আরও বেশি মাত্রায়। তাই পিছনে না ঘুরে সে থাকতেই পারল না।

কিন্তু পিছনে ঘোরাটাই অমলেন্দুর কাল হল। মোবাইলের টর্চের আলোতে সে যেটা দেখল তা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করেনি সে। একটা বিশাল জোরে আর্তনাদ করে অমলেন্দু লুটিয়ে পড়ল সেই রুমেরই ময়লা মেঝেতে।

(পঞ্চম পর্ব)

মুখে জলের ছিটে পড়ায় জ্ঞান ফিরে এল অমলেন্দুর। সে দেখল যে সে খাটের ওপর শুয়ে রয়েছে আর তার সামনেই চেয়ারে বসে রয়েছেন মি. পট্টনায়েক। এবং পিছনে জলের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেক বৃদ্ধ, ইনি মি. পট্টনায়েকের চাকর ড্যানিয়েল। কোনো সন্দেহ নেই, অমলেন্দু এখন শুয়ে আছে মি. পট্টনায়েকেরই বেডরুমে। সকাল হয়ে গেছে। তবে রোদের ছিটেফোঁটাও নেই। বাইরে মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছে আর মাঝে মাঝেই আকাশ কাঁপিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

অমলেন্দু খাটের ওপরেই কোনোরকমে উঠে বসতেই মি. পট্টনায়েক খেঁকিয়ে উঠলেন।

''এই যে মশাই, আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিস্‌সু নেই নাকি? কাল রাতে পইপই করে বলে দিলাম যে ওই মোটেল বাড়িতে যাবেন না, যাবেন না, তবুও চলে গেলেন। যেই আমার একটু চোখে লেগেছে, অমনি আপনি ফুড়ুত। এবার যদি আপনার একটা কিছু ভালোমন্দ হয়ে যেত তখন? ভোরে ঘুম ভাঙার পর দেখি, আপনার ব্যাগপত্তর সব মেঝেতে রাখা আছে, কিন্তু আপনি মানুষটাই উধাও। তখনই আমার মনে সন্দেহটা জাগল। তারপর যখন আমার বাড়ির গেটটা খুলে দেখলাম মোটেলটারও মেন গেট খোলা, তখন আমি এক্কেবারে শিয়োর হয়ে গেলাম যে আপনি মশাই পাকামি মেরেছেন। এরপর কী করি, ওখানে একা যাবার তো সাহস নেই, তাই ড্যানিয়েলকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গেলাম সেখানে। আর গিয়েই দেখি, বামদিকের শেষের ঘরের মধ্যে আপনি হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তারপর দুই বুড়োই আপনাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে এলুম। সত্যি একটা কাণ্ড দেখালেন আপনি।''

কথাগুলো অমলেন্দু কানে নিল বটে, কিন্তু গায়ে নিল না। তার চিত্ত জুড়ে কেবলই রাতের ঘটনার ঘনঘটা।

হ্যাঁ, রাতে অমলেন্দু ভূত দেখেছে। তবে সেই ভূত আর কারও নয়, তার নিজেরই। কিন্তু এ অলৌকিক ঘটনার কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

মি. পট্টনায়েক বললেন, ''আমি আন্দাজ করতে পারছি আপনার অজ্ঞান হবার কারণ। ভুলটা আমারই। আপনাকে কাল রাতেই সব কথা বলে দেওয়া উচিত ছিল আমার।''

''কী কথা?'' শুকনো গলায় প্রশ্ন করে অমলেন্দু।

''ওই মোটেলের অন্ধকার অতীতের কথা।''

''ত্-ত্-তো ব্-ব্-বলুন এখন।''

''বলছি। সব বলছি। অ্যায় ড্যানিয়েল যা তো, বাবুর জন্য স্যুপ বানিয়ে নিয়ে আয় গিয়ে যা...।'' ড্যানিয়েল চলে গেল।

মি. পট্টনায়েক বলতে শুরু করলেন এভারগ্রিন মোটেলের অন্ধকার অতীতের বিবরণ।

''ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগের। এভারগ্রিন মোটেলের মালিক হিমাংশু মল্লিক আর তার স্ত্রী পামেলা মল্লিক দুজনে মিলে এই মোটেলেই একজনকে গুলি মেরে খুন করে। খুনটা হয়েছিল আজ আপনি যে রুমটায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেই রুমে। যাকে খুনটা করা হয়, তার নামটা... ঠিক মনে করতে না পারলেও এটুকু মনে করতে পারি যে তিনি ছিলেন হিমাংশুরই বিজনেস পার্টনার। মি. আর মিসেস মল্লিক ষড়যন্ত্র করেই খুনটা করেছিল। কানাঘুষোই শুনেছিলাম পামেলা মল্লিক লোকটিকে তার মিথ্যে প্রেমের জালে ফাঁসিয়েই...। ওই ব্যাবসা হাত করার উদ্দেশ্যেই আর কী। সব বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারস্যাপার। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ওই মোটেলেরই একজন মেল স্টাফ ওই খুনটা হতে দেখে ফ্যালে। তারপর সেই স্টাফ ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে দেয় তার মালিকের কুকীর্তির কথা। থানাপুলিশ সবই হয়। দুজনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। মোটেলে তালা উঠল, ক্রমে তা পরিণত হল একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে। এদিকে যার খুনটা হল, তার অতৃপ্ত আত্মা বন্দি হয়ে থেকে গেল ওই মোটেলের মধ্যে। কয়েকজন শহরবাসী আর পর্যটক একে একে দাবি করতে শুরু করল যে তারা মোটেলের মধ্যে চাক্ষুষ কোনো আত্মাকে দেখেছে। ব্যাস, ওই মোটেলটা গ্যাংটকের মোস্ট হন্টেড প্লেসের তালিকায় নিজের নাম করে নিল।''

নিজের কানকেই বিশ্বাসই করতে পারছে না অমলেন্দু।

পামেলা হিমাংশুর বউ? তারা দুজনে মিলে খুন করেছে? কার? দশ বছর ধরে তারা দুজনে জেলে বন্দি, এ কী করে সম্ভব?

অমলেন্দুর মাথায় সবকিছুই যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। গত একদিন ধরে ও যা শুনছে, যা দেখছে, কিছুই তেমন বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে, যা-ই ঘটছে, খুব দ্রুত ঘটছে।

একমনে সাঁড়াশিতে আটকানো মৌমাছির মতো মাথা নাড়তে আরম্ভ করল অমলেন্দু। এমন সময় তার চোখ গিয়ে পড়ল এমন একটা জিনিসের ওপর, তাতে তার হৃৎপিণ্ডটা একলাফে গলা অব্দি উঠে এল। জিনিসটা আর কিছুই না, একটা ক্যালেন্ডার। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাতে ছাপা সালটা হল ২০৩১, অর্থাৎ অমলেন্দুর জানা বর্তমান সালের চেয়ে দশ বছর এগিয়ে। তাহলে কি অমলেন্দু এখন ভবিষ্যতে আছে? এ প্রশ্ন মি. পট্টনায়েককে জিজ্ঞেস করা বৃথা। তবে হ্যাঁ, এ সমস্ত আজব ঘটনার ব্যাখ্যা একটা জিনিস দিলেও দিতে পারে। সেই 'ফাঁদ' নামের বইটা।

(ষষ্ঠ পর্ব)

অমলেন্দুর স্যুপ খাওয়া শেষ হলে পর মি. পট্টনায়েক তাকে বিশ্রাম করতে বলে সেই রুম থেকে চলে গেলেন। সেই ফাঁকে অমলেন্দু বইটা নিয়ে বসল। শেষের দুটো পর্ব বাদে পুরো বইটাই পড়ে ফেলল সে। এতে তার বিস্ময় বাড়ল বই কমল না। বইয়ের নায়কের সঙ্গে যা যা ঘটার বিবরণ রয়েছে ওই বইটিতে, ঠিক তা-ই তা-ই ঘটেছে অমলেন্দুরও সঙ্গে। অবৈধ প্রেম, অন্তর্ধান, ভূত এবং সর্বোপরি প্যারালাল ইউনিভার্সে যাত্রা, যেখানের সময় দশ বছর এগিয়ে, এসব, সবই হুবহু এক। ব্যাস, এতটুকুই যথেষ্ট অমলেন্দুর স্নায়ু উত্তেজিত করার জন্য। তাই শেষের দুটো পর্ব আর হল না। কে জানে আর কী কী চমক রয়েছে ওই দুটো পর্বে?

"আহা... এ ঝড়জলের দিনে কি তোমার না ফিরলেই নয়?" বললেন মি. পট্টনায়েক।

নিচু স্বরে অমলেন্দু বলল, "না, আজই আমায় ফিরতে হবে, নইলে..."

"নইলে?"

"না... না। কিছু না।"

গ্যাংটকে আসার পর অমলেন্দুর সঙ্গে যা যা ঘটে চলেছে তা প্রত্যক্ষ নজির মেলার পর আর সেখানে থাকলে চলে না। অমলেন্দু আজই ফিরে যাবে মেদিনীপুরে। এবার তার ভাগ্যে যা আছে তা-ই ঘটবে।

অমলেন্দুর ভাগ্য ভালো ছিল যে সে এ অঝোর বৃষ্টির দিনেও একেবারে মি. পট্টনায়েকের বাড়ির সামনেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। মনে হল যেন এ বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সিটা অমলেন্দুরই জন্য অপেক্ষা করছিল।

"বাগডোগরা এয়ারপোর্ট চলিয়ে জলদি।" ট্যাক্সিতে উঠে বলল অমলেন্দু।

এদিকে সকাল থেকেই পামেলাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও অমলেন্দু বারবার তাকে ফোন করে যোগাযোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে মেজাজ তার আজ সপ্তমে চড়েছে।

অমলেন্দু নিজের ফোন নিয়েই ব্যস্ত ছিল এমন সময় ড্রাইভারের কণ্ঠ শোনা গেল।

"ফিরে যাচ্ছেন বাবু? তা বেশ করছেন।"

অমলেন্দু স্তম্ভিত। সে কিছুক্ষণের জন্য নিজের সত্তাটাই যেন হারিয়ে ফেলল। এ কণ্ঠস্বর যে তার চেনা।

"অ্যায় অ্যায় কে তুমি? তোমার মুখটা দেখাও।"

"আমার মুখ দেখে কী করবেন বাবু? আপনি আপনার ভবিতব্য দেখে ফেললেন, সেটা কি কম নয় বাবু? হি...হি...হি..."

"চুপ... চুপ, একদম চুপ। বলো, তুমি আমাকে সেদিন ওই বইটা কেন দিয়েছিলে... কোন উদ্দেশ্যে?"

"নিছকই আপনার সাহায্যির জন্য, বাবু।"

"আমার সাহায্য! আমি তোমাকে একবারও বলেছি আমার সাহায্য করবার জন্য? কে হও তুমি আমার?"

"আমি আপনার কেউই নই। সেটাই তো হিতকর। যত্তসব দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা সবই আপনজনেরাই দেয়, তা-ই নয় কি!"

"তোমার নাম কী?"

"কাল্পনিক মানুষের আবার নাম! যান, যা খুশি একটা নাম ভেবে নিন দিকিনি। হি...হি...হি..."

শত বাক্যবাণ প্রয়োগ করার পরও ড্রাইভারটির না মুখ দেখা গেল আর না জানা গেল তার নাম। এদিকে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাদের ট্যাক্সিটা কখন পাহাড়ি পথ ধরেছে তা অমলেন্দু ঠাহর করেনি। পথের একপাশে ঢালু খাদ আর অন্য পাশে খাড়া পাহাড়। তবুও ট্যাক্সির স্পিডোমিটারের কাঁটা ষাট ছুঁইছুঁই। বৃষ্টিও পড়ছে অঝোরে। ব্যাপারটা বোধগম্য

হতেই অমলেন্দু ড্রাইভারটিকে সচেতন করার চেষ্টা করে।

"কী হচ্ছে কী? এই বৃষ্টির দিনে পাহাড়ি রাস্তায় কেউ এত জোরে গাড়ি চালায়? আস্তে চালাও বলছি!"

ট্যাক্সির স্পিড কমে না। ড্রাইভারও কোনো কথা বলে না; সে শুধুই খিকখিক করে হাসতে থাকে।

তবে মিনিট দশেক পর ড্রাইভার আবার তার মুখ খুলল।

"চলুন বাবু, অনেকক্ষণ কল্পনার জগতে বিচরণ হল, এবার বাস্তবে ফেরা যাক। চলুন। হি...হি...।"

এই বলেই ড্রাইভার ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিল খাদের দিকে। চোখের নিমেষেই চলন্ত ট্যাক্সিটা গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

অমলেন্দুর মুখ থেকে কোনো কথা বেরোল না, যেটা বেরোল, সেটা মৃত্যুর ঠিক পূর্বের কাতর আর্তনাদ।

"আ...আ...আ...আ...আ...।"

(সপ্তম পর্ব)

চেঁচিয়ে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে উঠে পড়ল অমলেন্দু। তার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে। তার হৃৎস্পন্দন হারও বেড়ে গেছে।

চারপাশে একবার চোখ বোলাতেই অমলেন্দু বুঝতে পারল যে সে এখন তার নিজেরই বেডরুমের বিছানার উপর শুয়ে রয়েছে। আর তার কাছেই একটা চেয়ারে বসে আছে শোয়েতা। তাহলে কি অমলেন্দু এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিল? তা-ই হবে। কারণ স্বপ্নটা ক্রমে আবছা হয়ে আসছে তার মস্তিষ্ক থেকে। অমলেন্দুর মাথাটা কেমন চিনচিন করছে, ঠিক যেন কোনো নেশার হ্যাংওভার।

সেই অবস্থাতেই অমলেন্দু ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল বিছানার ওপর। তখনই সে একটা ব্যাপার আবিষ্কার করল। তার দু-হাতের মোট দশটি আঙুলেরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটা আংটির মতো ডিভাইস; হ্যাঁ ডিভাইস, কারণ প্রতিটারই মধ্যে একটা যান্ত্রিক আলো জ্বলছে, এমনকি ওই দশটা ডিভাইসেরই পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়ে বেরিয়েছে একটা করে সরু ওয়্যার, যেগুলো গিয়ে একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা তেপায়া টেবিলে রাখা একটা মনিটরের সঙ্গে।

না, এখানেই শেষ নয়। আরও একটা গোলাকার ডিভাইস কিছুটা মুকুটের মতো পরানো রয়েছে অমলেন্দুর মাথায়। সেটা থেকেও একটা ওয়্যার বেরিয়ে গিয়ে যুক্ত হয়েছে সেই একই মনিটরের সঙ্গে। মনিটরটি থেকে ক্রমাগত একটা বিপ বিপ শব্দ নির্গত হচ্ছে আর সেটার স্ক্রিনে ফুটে উঠছে কিছু ইংরেজি লেখা। পুরো ব্যাপারটাই অমলেন্দুর কাছে ঠিক ধোঁয়াশার মতো।

অমলেন্দু বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "এ-এ-এসব কী হ্যাঁ? কী এসব?"

শোয়েতা চেয়ার ছেড়ে উঠে অমলেন্দুর শরীর থেকে সব ডিভাইস খুলতে খুলতে বলল, "তোমাকে বলেছিলাম না, আমি আর আমাদের টিম একটা গ্যাজেট আবিষ্কার করেছি, তারই একটা ট্রায়াল করেছি কাল রাতে তোমার ওপরে।"

"মানে!" অমলেন্দু মরিয়া হয়ে ওঠে।

শোয়েতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সেই অদ্ভুত দেখতে ডিভাইসগুলোকে গুছিয়ে রাখল আলমারির ভেতরে। তারপর আবার চেয়ারে বসে পড়ল। অমলেন্দু তখনও নির্বিকার হয়ে বসে থাকে বিছানায়। শোয়েতা বলতে শুরু করে, "তুমি জানো আমি একজন অনিরোলজিস্ট। মানুষের ড্রিম অর্থাৎ স্বপ্নই হল আমার গবেষণার মূল বিষয়। আমার রিসার্চ সেন্টার, মানে ইন্ডিয়ান অনিরোলজি রিসার্চ সেন্টার গত পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর একটা গ্যাজেট ইনভেন্ট করে। ওই একটু আগেই যেটা তুমি দেখলে, ওটাই। ওই গ্যাজেটটার নাম হচ্ছে গিয়ে, সোমনিয়ামোগ্রাম। বেশ ট্রিমেন্ডাস এর অ্যাকমপ্লিশমেন্ট। এই গ্যাজেটটা যে-কোনো ঘুমন্ত মানুষের ড্রিমকে ক্যাপচার করে তা ভাষার আকারে ফুটিয়ে তোলে মনিটর স্ক্রিনে।"

শোয়েতা কিছুক্ষণ থেমে পাশে রাখা বোতলের থেকে দু-ঢোঁক জল খেয়ে আবার বলতে শুরু করে, "আমাদের ঘুমের মোট চারটে স্টেজ থাকে। স্টেজ এন ওয়ান, যখন আমরা ঘুমোনোর চেষ্টা করি। স্টেজ এন টু, যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি ঠিকই, কিন্তু সামান্যতম শব্দেও ঘুম ভেঙে যায়। স্টেজ এন থ্রি, গভীর ঘুম। আর সবশেষে আসে আরইএম স্লিপ স্টেজ, মানে র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ স্টেজ; এই স্টেজেই আমরা স্বপ্ন দেখা স্টার্ট করি। গবেষণা করে জানা গেছে, আরইএম স্লিপ স্টেজ শুরু হয় আমাদের ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক নব্বই মিনিট পর। আর এই সোমনিয়ামোগ্রামও কাজ করে আরইএম স্লিপ স্টেজে। এ ছাড়াও...।"

"এসব আমাকে কেন শোনাচ্ছ?" শোয়েতার কথার মাঝে বলে ওঠে অমলেন্দু।

"শোনাচ্ছি, কারণ তোমারই আমার সব কথা বুঝতে সুবিধা হবে। কাল রাতে তুমি আদৌ স্বপ্ন দেখবে কি না—এ ব্যাপারে তো আমি শিয়োর ছিলাম না তাই কালকের তোমার

রেড ওয়াইনে আমি এলএসডি মিশিয়েছিলাম।"

"এলএসডি?"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। জানোই তো এলএসডি খাওয়ার পর মানুষের রিঅ্যাকশন কী হয়! সে হ্যালুসিনেট করতে থাকে, যতক্ষণ না তার নেশা কাটছে, ততক্ষণ সে তার উদ্ভট স্বপ্নের জগতেই নিমগ্ন থাকে। তাই তোমাকে কৃত্রিমভাবে স্বপ্ন দেখাবার অস্ত্র হিসেবে এলএসডি ছাড়া আর কিছু আমার মাথায় আসেনি।

"কাল রাতে দেখলাম, তুমি খাটে বসে কিছুক্ষণ ছটফট করলে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে, তারপর দেখলাম একটা বই নিয়ে বসলে, তবে বইটা একটি বারেরও জন্য খুলেও দেখলে না। কিন্তু ভাবটা এমন দেখাচ্ছিলে যেন তুমি বইটা কত পড়ছ। এর এক ঘণ্টা পরে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। ব্যাস, ঠিক সময় দেখে আমি আমার কাজটা করে ফেললাম।"

অমলেন্দুর গাল বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। সে কী স্বপ্ন দেখেছিল, সেটা মনে করতে না পারলেও এটা সে মনে করতে সক্ষম যে সে দেখেছিল একটা নাইটমেয়ার। তা ছাড়া বাস্তবতাই বা একটা নাইটমেয়ারের থেকে কম কীসের?

আর ওই বইটা! সেই চোখের নিমেষে গায়েব হয়ে-যাওয়া বই বিক্রেতাটা! আদৌ সে গায়েব হয়েছিল তো? এটাও তো হতে পারে, সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল বলে অমলেন্দু তাকে দেখতে পায়নি আর অমলেন্দু হয়তো তার গলার স্বরও শুনতে পায়নি। এমন তো অনেক সময়ই হয় যে একজন মানসিকভাবে বিক্ষুব্ধ মানুষ তার চোখের সামনেই ঘটে-চলা ঘটনাকে ঠাহর করতে পারে না, সে থাকে একটা ঘোরের মধ্যে; যাকে সাইকোলজির ভাষায় বলে সাইকোলজিক্যাল ডিস্ট্রেস। অর্থাৎ গত সন্ধ্যার ঘটনাটা ছিল নিছকই এক কাকতালীয় ঘটনা। হতেও তো পারে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিছানা ছেড়ে উঠল অমলেন্দু। সে দেখল, শোয়েতা তার মুখ চেপে ক্রমশ হেসে চলেছে।

"কী হল, হাসছ কেন?" জিজ্ঞেস করল অমলেন্দু একটা জলের বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে।

"আর বোলো না। যা একটা পিকিউলিয়ার স্বপ্ন দেখলে তুমি! স্বপ্নে তুমি একটা পামেলা নামের মেয়ের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে পড়ে আমাকে ছেড়ে পালিয়েছ গ্যাংটকে। এখানেই শেষ নয়, তারপর আবার তুমি গ্যাংটকে গিয়ে এভারগ্রিন নামের মোটেলে নিজেরই ভূত দেখতে পাও। তোমার এই ধারণা হয় যে তুমি প্যারালাল ইউনিভার্সে চলে গেছ। আর সব শেষে তুমি একটা খাদে পড়ে মারা গেলে। হা...হা...হা...।"

আচমকা অমলেন্দুর মুখের জল ছিটকে গিয়ে পড়ে বেডরুমের মেঝেতে। কাশি শুরু হয় তার।

আর তখনই বেজে ওঠে মরণের ডঙ্কা। অমলেন্দুর মোবাইল রিংটোন। অমলেন্দু আর শোয়েতা দুজনেরই দৃষ্টি সেইদিকেই।

মোবাইল স্ক্রিনে ফুটে-ওঠা নামটা—পামেলা My Love।







অনুধাবন

- সুমঙ্গল পণ্ডিত



এক ছিল সুন্দর দেশ, সেই দেশের নাম ছিল কনকপুর। দেশের রাজা ছিলেন অত্যন্ত ভালোমানুষ এবং প্রজাবৎসল। তাঁর রাজত্বে প্রজারা খুবই সুখে বাস করতেন। রাজার সৈন্যবলও ছিল যথেষ্ট ভালো, সুতরাং বাইরের শত্রুর থেকে ভয়ও সেরকম ছিল না। মোটমাট সুখেই কাটছিল সময়। রাজার কোনো ছেলে ছিল না, একটি মেয়ে ছিল কেবল; ভানুমতী। অপূর্ব সুন্দরী ও বিদুষী রাজকন্যা বাবাকে রাজ্য শাসনের বিষয়েও নানাভাবে সাহায্য করতেন। মেয়েকে ছাড়া রাজার সব যেন শূন্য লাগত। রাজকন্যার আরও একটি বড়ো গুণ ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে সে ছিল অত্যন্ত পারদর্শী; যে-কোনো মুমূর্ষু রুগিকেও সুস্থ করে তোলার ক্ষমতা ছিল তার।

কিন্তু তা বললে কী হবে, সংসারে বাপকে মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হয়, সে মেয়ে যতই প্রিয় হোক-না কেন। তাই রাজকন্যার বিয়ের চিন্তা রাজার মনে লেগেই থাকত। রাজকন্যা ভানুমতী বাবার মন বুঝত, তাই একদিন সে নিজেই বলল, ''বাবা, তুমি আমার বিয়ের বিষয়ে বেশি চিন্তা কোরো না। আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি সুন্দর হোন কি না হোন, ভালো মনের হতে হবে। এমন স্বামী আমি নিজেই বেছে নেব।''

রাজামশাই জানতেন যে তাঁর মেয়ে ভারী জেদি; যা ঠিক করবে তা-ই করবে। তাই তিনি বললেন, ''কিন্তু মা, তুই রাজপ্রাসাদে থেকে কোত্থেকে স্বামী খুঁজে বেড়াবি? তার থেকে আমি ঘোষণা করে দিই; তোর বিয়ের জন্য রাজকুমাররা আসুক। তাদের মধ্যে থেকে তোর পছন্দ যাকে, তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব।''

রাজকন্যা মৃদু হেসে বলল, ''কিন্তু বাবা, ওই একবার দেখে কি মানুষকে কখনও চেনা যায়? মানুষের আসল রূপ আর বাইরের রূপ বেশির ভাগ সময়েই এক হয় না। বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর বলে আমি যদি তাকেই জীবনসঙ্গী বলে পছন্দ করে পরে দেখি যে তার ভেতরের রূপ অত্যন্ত কুৎসিত ও জঘন্য? তখন তো আমার জীবনটাই বরবাদ!''

রাজামশাই আরও চিন্তায় পড়ে গেলেন। কথাটা তো ভানুমতী ঠিকই বলেছে। তাঁর এমন কিছু খারাপ অবস্থা নেই যে এখনই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ভুল পাত্র নির্বাচন করলে তো অশেষ দুর্গতি! রাজকুমারদের বিষয়ে ভেতরের খবরাখবর নেবার জন্য গুপ্তচর তিনি নিয়োগ করতেই পারেন, কিন্তু তারা কতটা বিশ্বাসযোগ্য হবে তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ থেকেই যায়। তার থেকে বরং রাজকন্যা অবিবাহিত থাকুক, সেই ভালো।

রাজার মুখ দেখে ভানুমতী বুঝল, বাবা কী ভাবছেন!

সে বলল, ''অত ভেবো না বাবা। মানুষের ভেতরের রূপ যাচাই করার পদ্ধতি আমার জানা আছে। তুমি এক কাজ করো। দেশে দেশে খবর নিয়ে সব রাজকুমারের মধ্যে তোমার মতে সেরা যারা, তাদের আমাদের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাও। তারা আসুক, এখানে ক-দিন থাকুন, আলাপ-পরিচয় হোক, তারপর আমি বুঝে নেব'খন কার মনে কী রয়েছে।''

রাজামশাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক বাবা, একটা পথ অন্তত পাওয়া গেল। নিজের মেয়ের বুদ্ধির ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস, তিনি জানতেন, তাঁর মেয়ের চোখ কখনও ভুল দেখতে পারে না। পরের দিন থেকেই গুপ্তচরের মাধ্যমে দেশে দেশে খবর নেওয়া শুরু হল আর ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হল যে রাজকন্যা ভানুমতীর জন্য উপযুক্ত রাজকুমার পাত্র খোঁজা চলছে। খবর শুনে অনেক রাজকুমারই আগ্রহ প্রকাশ করলেও গুপ্তচরদের খবরের ভিত্তিতে রাজা চারজন রাজকুমারকে শেষমেশ বাছাই করলেন। তাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজ্যে আনা হল আর রাজ অতিথিশালায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হল।

এই চার রাজকুমারের নাম ছিল সৌমক, কল্পনক, অঙ্কবত এবং ত্রিজবর। অতিথিশালায় তারা এসে জাঁকিয়ে বসল। দু-দিন কেটে গেল; কিন্তু রাজকন্যা ভানুমতীর দর্শন মিলল না।

সৌমক অস্থির হয়ে একদিন বাইরে বাগানে পায়চারি করতে করতে ঠিক করল, আর নয়, যেভাবেই হোক রাজকন্যার দর্শন পেতেই হবে। সে শুনেছিল রাজকন্যা নাকি অপূর্ব সুন্দরী; তার সেই ভুবন-ভোলানো রূপ না দেখে আর তার তর সইছিল না। তাদের দেখাশোনার জন্য যে দাসীরা ছিল, তাদের মধ্যে প্রধান যে, তাকে ডেকে পাঠাল সে। ঘোমটা টেনে দাসী এসে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাতে সৌমক বলল, ''তোমার নাম কী?''

''আজ্ঞে, দীপা'', মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল দাসী।

সৌমক নিজের গলা থেকে মুক্তোর মালা খুলে তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল,

''নাও তোমার উপহার। এর বিনিময়ে আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে? কেউ যেন জানতে না পারে।''

দীপা মালা হাতে বলল, ''বলুন কী কাজ? সাধ্যে থাকলে অবশ্যই করব।''

সৌমক বলল, ''রাজকুমারী ভানুমতী শুনেছি অপূর্ব সুন্দরী। তাকে একটিবার দেখতে মন বড়ো ব্যাকুল হয়েছে। একটু ব্যবস্থা করে দিতেই হবে তোমাকে।''

শুনে দীপা যেন আঁতকে উঠল। তার ভয় বুঝে সৌমক বলল, ''পারলে আরও পুরস্কার পাবে। ভেবে দ্যাখো।''

দীপা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল,''ঠিক আছে, আজ রাত্রি দুই প্রহরের পরে তৈরি থাকবেন। ওই সময় রাজকন্যা তাঁর ঘরে একলা থাকেন, জানালার ফাঁক দিয়ে দেখেই কিন্তু চলে আসতে হবে।''

সৌমক হেসে বলল, ''বাঃ, এই তো চাই। আমি তৈরি থাকব, তুমি এসো আজ।''

চলে গেল দীপা ধীরপায়ে....

সেইদিন রাত্রি দুই প্রহরের পর...

চারিদিক শুনশান, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি সৌমকের চোখে ঘুম নেই, রাজকন্যাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে। একটু পরে বাইরের দরজায় আওয়াজ হতেই সে দরজা খুলে দেখল দীপা মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে। নিচু স্বরে সে বলল, ''সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাবধানে আমার পেছনে পেছনে আসুন।''

''সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু কেন?''

সৌমকের প্রশ্নের উত্তরে দীপা ঠোঁটে আঙুল রেখে নিঃশব্দে ইশারা করল তার পিছুপিছু আসতে। সৌমক মন্ত্রমুগ্ধের মতন দীপার পিছুপিছু চলল...

রাজকন্যার মহলেও কোনো আলো নেই। কুপকুপে অন্ধকারে ঢেকে গেছে রাজমহল...

সৌমকের গা ছমছম করতে লাগল। এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দীপা তাকে? রাজকন্যার সৌন্দর্যের কথা ভেবে কোনোমতে মনকে শান্ত করে দীপার পিছুপিছু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল সে।

একটি ঘরের সামনে এসে দীপা ফিসফিস করে বলল, ''ওই জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে নিন, কিন্তু কোনো আওয়াজ করবেন না যেন।''

কাঁপতে কাঁপতে সৌমক জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে

দেখার প্রচেষ্টা করল। ভেতরটা প্রথমে ভালো বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকারে, শুধু হালকা একটা লণ্ঠন জ্বলছে। চোখ একটু সইতে সৌমক বুঝল, বিশাল এক পালঙ্কে এক নারীমূর্তি বসে আছে পেছন ফিরে, লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছে...

বাপ রে, সেই চুল আঁচড়ানোর কী আওয়াজ... ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে চিরুনি চলছে চুলে, যেন কত বছরের জট ছাড়ানো চলছে। নারীমূর্তিটি কেমন যেন সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে...

সৌমকের মনের ভয়টা কেমন যেন বেড়ে গেল। কিন্তু এতটা এসে রাজকন্যার মুখ না দেখেই বা সে যায় কী করে? এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সেই নারীমূর্তিটি মুখ ফেরাল আর লণ্ঠনের মৃদু আলোয় তার মুখটা দেখেই সৌমকের হৃৎপিণ্ড যেন একলাফে মুখে উঠে এল। ভয়ানক সে মুখ, কালো কুচকুচে মুখে সাদা সাদা দাঁত বেরিয়ে রয়েছে; মাড়ি বার করে কী কুৎসিতভাবে হাসছিল রাজকন্যা! গালে যেন মাংস নেই, কেমন গর্ত-গর্ত আর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল অন্ধকারে। সৌমককে দেখতে পেয়েই বোধহয় ওই হাসি! আর এখানে থাকা চলে না!

হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে পালাতে পালাতে সৌমক শুনতে পাচ্ছিল, পেছন পেছন দীপা ছুটে আসছে আর বলছে, "শুনুন রাজকুমার! ভয় পাবেন না! রাজকন্যা ভানুমতী দিনের বেলায় একদম ঠিক থাকেন; কিন্তু অনেক পুরোনো এক শাপের জন্য রাত্রিবেলায় এইরকম হয়ে যান। তবে ভয় নেই, বিয়ের পর উনি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবেন, রাজজ্যোতিষী এই কথা বলেছেন। আপনি ভয় পাবেন না অত। রাজকন্যা খুব ভালো।"

বাবা গো, আর ওই রাজকন্যাকে দেখলে এবার সে ভয়েই মরে যাবে! সৌমক তখন পালাতে পারলে বাঁচে এই অভিশপ্ত রাজমহল থেকে। কোনোরকমে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল সে। উরিবাবা, এ কাকে বিয়ে করতে এসেছে সে। এ রাজকন্যা না সাক্ষাৎ ডাইনি! বিয়ে মাথায় থাক, প্রাণ নিয়ে দেশে পালাতে পারলে বাঁচোয়া।

পরের দিন ভোর না হতেই বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে সৌমক দ্রুতবেগে পালাল।

কল্পনক সৌমকের এই পালানো লক্ষ করে অবাক হল। যা-ই হোক, সে রাজকন্যার দেখা পাওয়ার জন্য অত উতলা ছিল না, কারণ তার এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। কনকপুর দেশের অগাধ সম্পদ সম্পর্কে সে জানত। কাজেই তার মনে আশা ছিল যে রাজামশাই তাঁর জামাইকে অর্ধেক রাজত্ব নিশ্চয়ই প্রদান করবেন। সঙ্গে প্রচুর ধনসম্পদ যৌতুক হিসাবে দেবেন। রাজকন্যা যা-ই দেখতে হোক, তাতে তার কী আর এসে যায়! তার তো দরকার শুধুই ঐশ্বর্য। তাই সে রাজামশাইয়ের কত ধনরত্ন আছে, সেই বিষয়েই খবর নিতে লাগল। রাজসভায় গিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল এই দেশের অবস্থা; কারণ অর্ধেক রাজত্ব যে তারই হবে—এই বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল।

এই বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য সে কথায় কথায় রাজামশাইকে একদিন জিজ্ঞেস করেই বসল যে তিনি কী ভাবছেন রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরবর্তী পর্বের বিষয়ে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে রাজামশাই বললেন যে তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে দত্তক নিয়ে তাকেই এই রাজ্যের ভার সমর্পণ করবেন বলে ভেবে রেখেছেন। ছেলেটি মেধাবী এবং খুবই বুদ্ধিমান। আর দেশের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতও বটে। রাজকন্যার ধনরত্ন ঐশ্বর্যের তেমন লোভ নেই; রাজ্যের দায়িত্ব মন্ত্রীপুত্রকে দেওয়াতে তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বিয়ের পর জামাইকে সামান্য কিছু ধনরত্ন দিলেই চলবে।

এই খবর জেনে কল্পনক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তার যে স্বপ্ন ছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এক লহমায়। রাজত্ব ধনসম্পত্তিই যদি না পাওয়া যাবে তো কী করতে সে এখানে পড়ে থাকবে আর? অন্য কোনো দেশে গিয়ে বরং চেষ্টা করলে লাভ আছে। এই ভেবে সে-ও সেই দেশ ছেড়ে চলে গেল।

তৃতীয় রাজকুমার অঙ্কবত রাজকন্যা ভানুমতীর অদ্ভুত চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে খবর রাখত। সে রাজকন্যার ধনসম্পত্তি বা সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী ছিল না; সে চেয়েছিল রাজকন্যাকে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে তার নিজের দেশের প্রজাদের এই বিদ্যার সুবিধা দেওয়াতে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সে-ও দীপাকেই ডেকে পাঠাল আর তাকে একটি হিরা দিয়ে বলল, "আমি শুনেছি, রাজকন্যা নাকি যে-কোনো রোগের চিকিৎসা জানেন। তুমি এই খবর পুরোপুরি সত্য কি না তা বলতে পারবে? তাহলে আরও উপহার পাবে।"

দীপা মাথা নিচু করে বলল, "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। রাজকন্যা সত্যিই মৃতপ্রায় মানুষকেও বাঁচাবার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তাঁর এই ক্ষমতার পেছনে কিছু রহস্য আছে।"

"কী রহস্য?"

অঙ্কবতের প্রশ্নের উত্তরে দীপা বলল, "প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে রাজকন্যা এখান থেকে কিছু দূরের এক শ্মশানে

রাত্রিবেলা যান আর পরের দিন ভোরে ফেরেন। বহু বছর ধরে এইরকম চলছে আর রাজকন্যার এই অদ্ভুত বিদ্যার পেছনে এই অভ্যাসের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কিন্তু কেউ জানে না ঠিক কী হয়। কারণ ওই শ্মশান বড়ো ভয়ানক। দিনের বেলাতেও কেউ ভয়ে ওখানে যায় না।"

অঙ্কবত কৌতূহলী হল। শ্মশানে প্রতি অমাবস্যার রাতে রাজকন্যা কী করতে যান? সে বলল, "কাল বাদে পরশুই তো অমাবস্যা। তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে সেখানে?"

"না রাজকুমার, ধরা পড়ে গেলে আমার খুব বিপদ আছে।"

"তোমার কোনো ভয় নেই। তোমাকে যদি এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়, তবে তোমাকে আমার রাজমহলের খাস দাসী করে দেব আর প্রচুর ধনরত্ন উপহার পাবে।"

অনেক বলার পর দীপা অবশেষে রাজি হল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অঙ্কবত। অমাবস্যার রাতে সে দীপার সঙ্গে চলল সেই শ্মশানের দিকে। অনেকটা চলার পর তারা পৌঁছে গেল সেই শ্মশানে। বড়োই ভয়ংকর সেই শ্মশান; চারিদিকে মৃতদেহের শরীরের টুকরোটাকরা ছড়িয়ে রয়েছে। চারিদিক নিঃশব্দ; খালি দূরের একপ্রান্ত থেকে নারীকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভেসে আসছে। দুজনে সেইদিকেই চলল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, দাউদাউ করে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে আর তার সামনে বসে এক নারীমূর্তি।

একটু কাছে এসে গাছের আড়াল থেকে অঙ্কবত যা দেখল, তাতে তার চোখ ছানাবড়া! সেই রহস্যময় নারীমূর্তি রাজকন্যাই হবেন নির্ঘাত; তাঁর পাশে বেশ কয়েকটা মৃতদেহ এদিক-ওদিক পড়ে রয়েছে। কাক, শকুন, প্যাঁচা, সাপ আর সব থেকে ভয়ানক; একটি মানুষের মৃতদেহও রয়েছে সেখানে।

রাজকন্যার সামনে একটি পাত্রে অনেকখানি কীসের যেন কাঁচা মাংস রয়েছে আর একটি পাত্রে লাল টকটকে কী যেন একটা তরল; রক্তই হবে নির্ঘাত। মন্ত্রপাঠ করতে করতে রাজকন্যা মাঝে মাঝেই সেই মাংস নিজের মুখে দিচ্ছেন আর সেই শবেরও। রক্ত নিজে পান করছেন আর শবের মুখেও ঢেলে দিচ্ছেন মাঝেমধ্যেই।

কাণ্ডকারখানা দেখে অঙ্কবতের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। রাজকন্যা কি ডাইনিবিদ্যার সাধনা করেন নাকি? এই কি ওঁর অদ্ভুত বিদ্যার রহস্য? বিয়ে করে কি শেষে এক পিশাচিনীকে নিজের দেশে নিয়ে যাবার জন্য এখানে পড়ে রয়েছে সে?

এইসব ভাবতে ভাবতেই রাজকন্যা হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠলেন আর অঙ্কবত যে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, সেইদিকেই কী যেন নিক্ষেপ করলেন। আগুনের আভাতে অঙ্কবত সভয়ে দেখল, তার সামনে পড়ে রয়েছে রক্ত-মাখা এক নরকরোটি।

"বাবা গো, মা গো", বলে উদ্ভ্রান্তের মতন ছুট লাগাল সে; ছুটতে ছুটতে যখন সে রাজ অতিথিশালায় এসে দুম করে পড়ল, ততক্ষণে তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।

পরের দিন আর অঙ্কবতের টিকির দেখা পাওয়া গেল না; রাত থাকতেই সে পিঠটান দিয়েছে।

সৌমক গেল, কল্পনক গেল, অঙ্কবতও গেল। এখন পড়ে রয়েছে শুধুই ত্রিজবর। চার রাজকুমারের মধ্যে সব থেকে সাধারণ দেখতে তাকেই বলা যায়; রাজপোশাক ছাড়িয়ে খালি গায়ে মাঠে নামিয়ে দিলে সাধারণ চাষির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্যই থাকবে না। গায়ের রং কালো, চেহারাও খুব বলশালী কিছু নয়; রাজকুমার বলে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই। তবে তার হাসিটা ছিল বড়ো মিষ্টি; বড়ো শান্ত তার চোখ দুটি; সেই হাসি দেখে বুক ঠান্ডা হয়, মনে ভরসা আসে। অন্য রাজকুমারদের মতন সে এই রাজ্যে এসে রাজকন্যার বিষয়ে কোনো খোঁজখবরও করেনি; শুধু নিজের প্রিয় বাঁশিটি হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় লোকালয় থেকে দূরে। জঙ্গলের মধ্যে গাছের তলায় বসে বাঁশি বাজানোতেই যেন তার সুখ। মোটমাট রাজকুমারের থেকে রাখাল বালক হিসাবেই তাকে মনে হয় বেশি।

এহেন ত্রিজবর প্রথমে খেয়ালই করেনি যে সে ছাড়া আর কোনো রাজকুমার এখন আর নেই রাজ-অতিথিশালায়। দীপা এসে তাকে সংবাদ দিতে সে অবাক হয়ে বলল, "সে কী! ওঁরা সব গেলেন কোথায়? কেনই বা গেলেন?"

দীপা মুখ টিপে হেসে বলল, "কী জানি, রাজকুমাররা কী ভেবে চলে গেলেন রাতারাতি! আপনি কি রাজকন্যাকে দেখতে চান একবার?"

"রাজকন্যা!" মাথা-টাথা চুলকে ত্রিজবর বলল, "থাক-না। যখন উনি নিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন, তখনই না হয় দেখা হবে।"

দীপার সুন্দর মুখে ভাঁজ পড়ল, "সে কী রাজকুমার? রাজকন্যা কেমন দেখতে, সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে না আপনার?"

ত্রিজবর উদাস দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে বলল, "নাহ্। উনি যেমনই হোন-না কেন, কিছু আসে যায় না।"

দীপা অবাক হল। তারপর কী ভেবে বলল, "রাজামশাই

কিন্তু নিজের জামাইকে বোধহয় সেরকম কিছু যৌতুক দেবেন না। অর্ধেক রাজত্ব তো নয়ই। ওঁর উত্তরাধিকারী মন্ত্রীপুত্র হবে, এ কথা সবাই জানে।"

ত্রিজবর যেন শুনতেই পেল না। আপন মনে বলল, "ও তা-ই বুঝি? তা ভালোই তো।"

দীপা আরও আশ্চর্য হল। এই রাজকুমার কী ধাতুতে গড়া রে বাবা! সে ভেবেচিন্তে শেষ অস্ত্রটা প্রয়োগ করল, "আর আমাদের রাজকন্যা ভানুমতীর অদ্ভুত চিকিৎসাবিদ্যার বিষয়ে নিশ্চয়ই শুনেছেন। মৃত্যুর মুখ থেকেও মানুষকে উনি বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে বিয়ের পর আপনার দেশের প্রজারা খুব উপকৃত হবে।"

ত্রিজবর বড়ো বড়ো চোখ করে শুনল। তারপর বলল, "সে কী! তা কেন হবে! রাজকন্যা এখান থেকে চলে গেলে এই দেশের প্রজাদের তাহলে কী হবে? এ তো ভারী সমস্যা হবে। না না, ওঁর এই দেশ ছেড়ে যাওয়া একদম ঠিক নয়।"

এবার দীপার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। কিছুটা তীব্র সুরেই সে বলল, "তবে আপনি এখানে কী করতে এসেছেন? যাকে বিয়ে করতে এসেছেন, তাকে দেখার ইচ্ছা নেই, তার ধনসম্পত্তি চাই না, এমনকি তাকে নিজের দেশে নিয়ে যাবারও শখ নেই। তবে এখানে কী কাজ আপনার?"

ত্রিজবর রাগল না। শান্ত মুখে আলতো হেসে সে বলল, "আমার এখানে আসার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। সত্যি বলতে কী, বিয়ে করারই কোনো ইচ্ছা নেই আমার। বাবার আদেশে এখানে আসতে অনেকটাই বাধ্য হয়েছি। বাদবাকি রাজকন্যা যা ভালো বোঝেন তা-ই হবে।"

হতবাক হয়ে ফিরে গেল দীপা। এ কেমন রাজকুমার, এমন উদাসী! ঠোঁটের কোনায় আপনা থেকেই একচিলতে হাসি ফুটে উঠল তার অজান্তেই।

দু-দিন পরের কথা। দীপা বাগানে ঘুরছিল, হঠাৎ লোকজনের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে মুখে চট করে ঘোমটা টেনে চেয়ে দেখল, অনেকজন মিলে কাকে যেন বয়ে নিয়ে আসছে এদিকেই। কাছে আসতেই তার বুক কেঁপে উঠল। এ তো ত্রিজবর, সারা শরীর রক্তাক্ত অথচ রক্ত-মাখা হাতে তখনও ধরা রয়েছে প্রিয় বাঁশিটা।

লোকজনের কথা কানে এল তার—"আহা রে, ছেলেটা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, বাঘের মুখে পড়েছিল। ভাগ্যিস সেই সময় এক কাঠুরের দল ওখান দিয়ে যাচ্ছিল তাই কোনোমতে প্রাণটা বেঁচেছে। কিন্তু যেরকমভাবে আহত হয়েছে, বাঁচা মুশকিল।"

সত্যিই তা-ই। ত্রিজবরের দেহের ক্ষত অতি মারাত্মক, নাড়ির স্পন্দন ভীষণ মৃদুগতির। রাজবদ্যি চিকিৎসা শুরু করলেও পরের দিন দেখা গেল, ক্ষতস্থান পেকে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে; সারা শরীর ফুলে উঠছে কেমন। দীপা আর থাকতে পারল না, একগলা ঘোমটা টেনেই সে এসে ত্রিজবরের পাশে বসল। দিনের বেলায় না থাকলেও রাত্রিতে এসে সে গোপনে ত্রিজবরের পাশে সারারাত থেকে তার শুশ্রূষা করতে শুরু করল। এমনিভাবে কয়েকদিন যাবার পর একটু একটু করে ত্রিজবর সুস্থ হতে লাগল। ক্ষতস্থান পুরোপুরি নিরাময় না হলেও ধীরে ধীরে শরীরে বল ফিরে পেতে লাগল সে। আধো জাগরণে, আধো অচেতনের ঘোরে রাত্রির সেই অতিথিকে একটু একটু বুঝতেও পারল।

কেটে গেল আরও এক মাস। ত্রিজবর এখন অনেকটাই সুস্থ; চলাফেরাও করতে পারছে। দীপা এখন আর রাত্রিতে আসে না, দিনের বেলায় এসে খবর নিয়ে যায় শুধু। একদিন সে এসে দেখল, ত্রিজবর জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, "কী ব্যাপার, আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন নাকি?"

ত্রিজবর বসে বাক্স গোছাচ্ছিল। মুখ না তুলেই উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আর এখানে পড়ে থেকে কী লাভ?"

"লাভ নেই?"

দীপার বুক ঠেলে যেন বেরিয়ে এল একরাশ অভিমান, "হ্যাঁ তা-ও ঠিক। সুস্থ হয়ে গেছেন, এখন তো চলেই যাবেন। কিন্তু রাজকন্যাকে বিয়ের কী হল?"

"সে আর সম্ভব নয়।" ত্রিজবরের নির্লিপ্ত উত্তর।

"কেন, সম্ভব নয় কেন?" যেন ফুঁসে উঠল দীপা।

এতক্ষণে ত্রিজবর মুখ তুলে তাকাল। তার শান্ত মুখে খেলে গেল একঝলক হাসি—"কারণ আমি মন থেকে অন্য কারও হয়ে গেছি যে।"

"অন্য কারও?" দীপা ঢোঁক গিলল—"কার?"

পূর্ণদৃষ্টিতে দীপার দিকে তাকিয়ে গভীর স্বরে ত্রিজবর বলল, "তোমার।"

দীপার মুখে কোত্থেকে যেন কে একমুঠো সিঁদুর লেপে দিল।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে লজ্জায় মাথা নিচু করে সে শুনল ত্রিজবরের কথা—"হ্যাঁ দীপা, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। তুমিই রোজ রাত্রে এসে আমাকে সেবা করে বাঁচিয়েছ। তুমিই আমার জীবনদাত্রী। তাই সুস্থ হয়ে ওঠার পরেই আমি বুঝলাম, ওই কয়েক রাতেই আমি যে কখন

তোমার প্রেমে পড়ে গেছি তা নিজেও জানি না। তবে কোনো জোরাজুরি নেই, তোমার আমাকে পছন্দ না হলে নিঃসংকোচে বলে দিতে পারো।”

দীপার কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট থেকে অস্ফুটে বেরোল, “কিন্তু তা কী করে হবে? আপনি যে রাজকুমার আর আমি সামান্য দাসী। আপনার পাশে কোনো সুন্দরী রাজকন্যাই তো শোভা পায়।”

ত্রিজবর শান্ত কণ্ঠে বলল, “পুরুষের পাশে সেই নারীই শোভা পায়, যে তার খেয়াল রাখে, তাকে মন থেকে ভালোবাসে। সেই নারী দাসী কি বাঁদি, সুন্দরী কি সাধারণ দেখতে, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার রাজকন্যা নয়, তোমাকে প্রয়োজন। তুমি কী চাও, সেটা তোমার সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ-না যা-ই হোক, আমার কোনো সমস্যা নেই তাতে।”

নাহ্, দীপা আর কিছু ভাবার জায়গাতেই নেই। দুই পা শিথিল হয়ে পড়ে যাবার আগেই শক্ত হাতে তাকে ধরে ফেলল ত্রিজবর। কেটে গেল আরও কিছুক্ষণ...

সংবিৎ ফিরে পেয়ে দীপা কুণ্ঠা সহকারে বলল, “কিন্তু রাজকুমার, আমার কিছু বলার আছে।”

“বলো দীপা”, গাঢ়স্বরে বলল ত্রিজবর।

“আপনি শুনে দয়া করে আমার ওপর রাগ করবেন না। আসলে আমি আপনার কাছে অনেক কিছু গোপন করে গিয়েছি। আমার নাম দীপা নয়; আমিই রাজকন্যা ভানুমতী।”

ত্রিজবরের কপালে ভাঁজ পড়ল। দেখে দীপা শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, “আমার পুরো কথাটা শুনুন। আমি এমন কাউকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, যে আমার রূপ, আমার বাবার ধনসম্পত্তি বা আমার অলৌকিক চিকিৎসাবিদ্যার লোভে নয়, শুধু আমাকে ভালোবাসবে। সেই ভালোবাসা, সেই সততা আমি আপনার মধ্যে দেখেছি, কুমার। আপনি সৎ, নির্লোভ। আপনি সাধারণ নন, আপনিই আমার কাছে অসাধারণ পুরুষ। তাই আমি আপনাকে আমার বিদ্যার দ্বারা সুস্থ করে তুলেছি, আর মন থেকে কখন যে আপনাকে চাইতে শুরু করে দিয়েছি তা বুঝতেও পারিনি। আগের তিন রাজকুমার ছিল লোভী, তাই তাদেরকে ছলনা করে সাজানো নাটক দেখিয়ে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। থেকে গেলেন শুধু আপনি। এবার সব জানার পর কি আপনি আমায় ভালোবাসবেন? নিজের করে নেবেন?”

ত্রিজবর মুহূর্তের জন্য ভাবল। তারপর বলল, “আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। তুমি দীপা হও কি ভানুমতী; দাসী হও কি রাজকন্যা; তাতে আমার ভালোবাসা একচুলও বদলাবে না। তুমি যা করেছ, ঠিকই করেছ। প্রত্যেক নারীর এটা অধিকার থাকে তার ভালোবাসার মানুষকে খুঁজে নেওয়ার। বিয়ের পর তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি এখানেই থাকবে, সেটাও তোমার ওপরেই ছাড়লাম। আমার কাছে তুমি চিরকাল সেই দীপাই থেকে যাবে, যে আমার জীবনদান করেছিল।”

ব্যাস, তারপর আর কী। ধুমধাম করে ত্রিজবরের সঙ্গে দীপা, থুড়ি, ভানুমতীর বিয়ে হয়ে গেল। রাজামশাই তো দারুণ খুশি। বিয়ের পর রাজকন্যা নিজের স্বামীর দেশ আর নিজের দেশ দুই জায়গাতেই কিছুদিন করে থাকতে শুরু করলেন, কারণ দুই দেশই তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। গল্প শেষ....

আমার কথাটি ফুরোল
নটেগাছটি মুড়োল...





ধূসর বিভীষিকা

(মূল গল্প - গ্রেম্যাটার)
লেখক - স্টিফেন কিং
(ভাবানুবাদ - সোমা ব্যানার্জী)



জানুয়ারি মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়। সপ্তাহখানেক ধরেই আসবে আসবে করে শেষে বৃহস্পতিবার তীব্র উত্তুরে হাওয়া উপস্থিত হয়েছে, সেই সঙ্গে চলছে অবিরাম তুষারপাত। পিন ফোটানোর মতো ঠান্ডা, সেই সঙ্গে হাওয়ার অবিরাম শোঁ শোঁ আর্তনাদ। মোটামুটি বিকেলের মধ্যেই আট ইঞ্চি বরফের আস্তরণ জমে গেছে। রাস্তাঘাট একেবারে শুনশান, খাঁ খাঁ করছে। কে-ই বা বেরোবে এই আবহাওয়ায়। আমরা জনা পাঁচ-ছয় অবশ্য রোজ দিনের মতোই হেনরির নাইট আউলে একজোট হয়েছি রোজকার মতো। ব্যাংগোরের এক প্রান্তের এই জায়গাটাতে হেনরির এই ছোট্ট পাবটাই একমাত্র দোকান, যেটা একটু রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। নিতান্তই ছোটো পাব, কলেজের ছেলেছোকরা আর স্থানীয় কিছু লোকজন আসে বিয়ার বা মদ কিনতে। হেনরির অবশ্য টুকটাক এই বিক্রিতেই চলে যায়। আর আমাদের এই বুড়োদের দলটা রোজ সন্ধেয় আড্ডা দিতে এখানে জড়ো হই। শহরে কে মারা গেল, সরকারি সুযোগ-সুবিধা, দেশ-সমাজ কীভাবে দিনকে দিন গোল্লায় যাচ্ছে—এইসব নিয়ে চায়ের কাপে, থুড়ি, বিয়ারের গ্লাসে তুফান ওঠে।

হেনরি আজও যথারীতি পাবের কাউন্টারের ওপাশে রয়েছে। বিল পেলহ্যাম, বার্টি কোনোর্স, কার্ল লিটলফিল্ড আর আমি—পাবে এই চারজন আগুনের পাশে গোল করে বসে আছি। বাইরে ওহিয়োর শূন্য রাস্তা, একটা গাড়ি পর্যন্ত নেই। তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় বড়ো বড়ো বরফের টুকরো উড়ে যাচ্ছে। হেনরির আজ তিনটিমাত্র খদ্দের এসেছিল।

আমরা বসে বসে রোজকার মতো গল্পগুজব করছি। হঠাৎ পাবের দরজাটা খুলে গেল। নতুন খদ্দের এল ভেবে সকলেই দরজার দিকে তাকালাম। বাইরেটা মাতাল হাওয়া আর বরফে ধূসর হয়ে রয়েছে। দরজা ঠেলে যে ছেলেটি জুতোর বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে ঢুকল, সে নেহাতই একটি বাচ্চা ছেলে। ভালো করে নজর করতেই চিনতে পারলাম, রিচি গ্রেনাডাইনের ছেলে টিমি! ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলাম। মুখটা কী যেন এক আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে আছে, গলার কণ্ঠাটা প্রচণ্ড উদ্‌বেগে উঠছে-নামছে। চোখ দুটো অস্থির, চঞ্চল।

হেনরির দিকে তাকিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় সে বলল, ‘‘কা...কাকু, তোমাকে একবার যেতে হবে। তুমি যাও গিয়ে বিয়ার পৌঁছে দিয়ো এসো। আমি... আমি আর ওখানে... না... না, আমি আর যাব না। আমার খুব ভয় করছে!’’

‘‘দাঁড়াও, দাঁড়াও’’, হেনরি বারের অ্যাপ্রন খুলে কাউন্টারের ওপর রেখে বেরিয়ে এল—‘‘কী হয়েছে এই পাবে? রিচি খুব বেশি মাতলামি করছে নাকি?’’

ওদের কথা শুনতে শুনতেই আমার মনে হচ্ছিল, রিচিকে বহুদিন যাবৎ দেখিনি। সাধারণত দিনে একবার ও আসেই। এসে সস্তার বিয়ার কিনে নিয়ে যায়। রিচি গ্রেনাডাইন গাঁট্টাগোট্টা, ঘাড়েগর্দানে চেহারার মানুষ। বরাবরই বিয়ারের নেশা আছে, তবে সে নিয়ে কোনোদিন সমস্যার কিছু শুনিনি। ক্লিফটনে একটা কাঠচেরাই কারখানায় কাজ করত সে, সেখানে কোনো একটা দুর্ঘটনায় তার কোমরে আঘাত লাগে। কাজটা ছেড়ে দিতে হলেও কারখানা তাকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। ইদানীং খুব মোটা হয়ে গিয়েছিল রিচি। মাঝে মাঝে রিচির বদলে তার ছেলেটিও আসে হেনরির দোকানে বাবার জন্য বিয়ার নিয়ে যেতে। বেশ শান্তশিষ্ট মিষ্টি ছেলেটি।

‘‘মাতাল ঠিক না কাকু... যা হয়েছে সেটা... সেটা ভয়ংকর... উফফ!’’ কাঁপতে কাঁপতে চোখে হাত চাপা দিল রিচির ছেলে।

হেনরি বোধহয় বুঝতে পারল, কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কার্লের দিকে তাকিয়ে সে বলল, ‘‘কার্ল, তুমি একটু কাউন্টার সামলিয়ো তো দরকার হলে।’’

‘‘হ্যাঁ নিশ্চয়ই।’’

‘‘টিমি, তুমি আমার সঙ্গে একটু ভেতরের ঘরে এসো তো, কী হয়েছে খুলে বলো দেখি।’’

হেনরি রিচির ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরের স্টকরুমের দিকে গেল কথা বলবে বলে। কার্ল উঠে হেনরির ছেড়ে-যাওয়া চেয়ারে কাউন্টারে গিয়ে বসল।

ঘরে সবাই চুপচাপ। স্টকরুমের ভেতর থেকে হেনরির গলা ভেসে এল। টিমি গ্রেনাডাইন কাঁপা-কাঁপা গলায় কী যেন বলছে হেনরিকে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না এত দ্রুত কথা বলছে সে। তার পরেই ছেলেটা কেঁদে উঠল। বিল পেলহ্যাম বিচলিত হয়ে গলা ঝাড়ল একবার।

আমি ইতস্তত করে বলেই ফেললাম, ‘‘রিচিকে কিন্তু অনেকদিন দেখিনি।’’

‘‘তাতে কী!’’ বিলের গলা বেশ ঘড়ঘড়ে।

‘‘আমি রিচিকে দেখেছি... তা অনেকদিন হল বোধহয়! হ্যাঁ মনে পড়েছে, হ্যালোউইনের সময় ওকে শেষ দেখেছিলাম। আর দেখা হয়নি... ও বিয়ারের ক্রেট কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রচুর মোটা হয়ে গেছে দেখেছিলাম।’’

আমাদের কথা ফুরিয়ে আসছিল। ঘরে আবার নীরবতা নেমে আসছিল। ভেতরের স্টকরুমে তখনও কান্না-জড়ানো গলায় টিমি কথা বলছে। বাইরে বরফ আর তীব্র উত্তুরে হাওয়ার তাণ্ডব চলছে। রেডিয়োতে বারবার আবহাওয়ার খবরে বলছে, তুষারপাত আরও বাড়বে। কাল সকালের মধ্যে আরও ছয় ইঞ্চি বরফ জমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঠান্ডায় হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চাইছে। তার মধ্যেই আনমনা ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনা আমার মাথায় ঘুরছিল... এখন জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি, যা জানা যাচ্ছে, মোটামুটি অক্টোবরের পর থেকে রিচিকে কেউ দেখেনি! কিন্তু কেন!

বেশ অনেকক্ষণ স্টকরুমের ভেতর কথা বলার পর হেনরি টিমিকে নিয়ে বেরিয়ে এল। টিমি গায়ের কোটটা খুলে রেখেছিল, হেনরি সেটা পরিয়ে দিল তাকে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে টকটকে লাল করমচার মতো হয়ে গেছে। যতবার চোখে চোখ পড়ছিল, চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল সে।

‘‘আমি এক কাজ করি বুঝলে, টিমিকে আমি ওপরে আমার বউয়ের কাছে রেখে আসছি। ওর এখন কিছু খাওয়া দরকার। আর তোমরা যে যে পারবে, আমার সঙ্গে রিচির বাড়িতে চলো। টিমি বলছিল রিচির বিয়ার দরকার। টিমির হাত দিয়ে

টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।" হেনরি ফিকে হাসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু হাসি কিছুতেই ফুটল না তার। বরং কেন জানি না হেনরিকে খুব চিন্তিত, বিপন্ন দেখাচ্ছিল।

"হ্যাঁ, বেশ তো। কী বিয়ার নেব বলো, আমি নিয়ে নিচ্ছি।" বার্টি এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

"হ্যারোজ সুপ্রিম নিয়ে নাও। দ্যাখো, ওখানে কয়েকটা বক্স পড়ে আছে, ওতেই প্যাক করে নিয়ো।"

আমিও উঠলাম। হেনরির সঙ্গে আমাকে আর বার্টিকেই যেতে হবে, কারণ কার্লের এমনিতেই আর্থ্রাইটিসের সমস্যা আছে। এইরকম শীতে ওর পক্ষে হাঁটাচলা খুব কষ্টকর। আর বিলি পেলহ্যামের ডান হাতটা সম্পূর্ণ অকেজো। কাজেই ওকেও হিসেবের বাইরে রাখাই ভালো।

বার্টি হ্যারোজ সুপ্রিমের ছ-টা প্যাকেট নিয়ে এল। আমি সেগুলোকে বক্সে ভালো করে প্যাক করে নিলাম। হেনরি টিমিকে নিয়ে ওপরে তার ঘরে রাখতে চলে গেছে। খানিক পরে টিমিকে বউয়ের কাছে রেখে হেনরি নীচে নেমে এল।

"কী হয়েছে কী হেনরি? রিচি কি বাচ্চাটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? মারধর কিছু?" বিলি হেনরিকে দেখে আর উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারছিল না।

হেনরি জবাব দেওয়ার আগে একবার সিঁড়ির ওপরদিকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল, দরজা ঠিকঠাক বন্ধ আছে কি না। তারপর খুব চাপা গলায় বলল, "না ওসব কিছু না। বুঝতে পারছি না কীভাবে তোমাদের বোঝাব। তোমরা হয়তো পাগল ভাববে আমাকেই। আমি নিজেও যে পুরোটা বুঝে উঠতে পারিনি আসলে। এসো, তোমাদের একটা জিনিস দেখাই। এই দ্যাখো, এই ডলারগুলো টিমি আমাকে বিয়ারের দাম হিসেবে দিয়েছিল।" কথা বলতে বলতে চারটে ডলারের কোনা ধরে বের করে আনল। হেনরি ওইভাবে কেন ডলারগুলো ধরে বের করল ভেবে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলাম, তারপর একটু নজর করতেই বুঝলাম ওর দোষ নেই, ও যা করেছে, সেটাই স্বাভাবিক। আমিও একটু শিউরে উঠলাম দেখে। ডলারগুলোর গায়ে ছাইরঙা জেলির মতো থকথকে অথচ রোঁয়া-রোঁয়া কিছু লেগে আছে!

ডলারগুলো সাবধানে এককোনায় রেখে হেনরি বলল, "কার্ল, নজর রেখো, কেউ যেন এতে হাত পর্যন্ত না ছোঁয়ায়। ছেলেটা যা বলছে, তার কিছুটাও যদি সত্যি হয়, তবে এতে হাত দেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে!"

ডলারগুলো রেখেই হেনরি দ্রুত সিঙ্কের সামনে গিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলল। আমি উঠে কোট, মাফলার, টুপি সব পরে ফেললাম এক-এক করে। বাইরে যা অবস্থা, তাতে গাড়ি নিয়ে মনে হচ্ছে যাওয়া যাবে না। যা-ই হোক, বাড়িটা খুব একটা দূরে নয়—এটাই ভরসা। আমরা বেরোতে যাব এমন সময় বিল পেলহ্যাম পিছন থেকে বলল, "সাবধানে যেয়ো।" হেনরি দরজার পাশে রাখা একটা ট্রলির মধ্যে বিয়ারের ক্রেটটা ভরে নিল। দরজার বাইরে পা রাখতেই হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা টুপি-মাফলার ভেদ করে হাড়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছিল যেন। দরজার বাইরে বেরিয়ে একটু দাঁড়িয়ে গেলাম, বার্টি হাতের গ্লাভসগুলো গলিয়ে নিল। বার্টির মুখটা একটু শুকিয়ে আছে। এই সাংঘাতিক ঠান্ডা আর তুষারপাতের মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা জোয়ান বেরোতে চাইবে না আর আমরা তো বাহাত্তুরে বুড়োর দল। এই বয়সে এইরকম কনকনে উত্তুরে হাওয়া যেন হাড়ে কনকনানি ধরিয়ে দেয়।

অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছিলাম, হেনরির মুখে ভারী ফিকে একচিলতে রহস্যময় হাসি লেগে আছে। রাস্তায় পা দিয়ে সে বলল, "দ্যাখো, তোমাদের আমি ভয় পাওয়াতে চাই না। তাই একটা জিনিস আগে থেকেই দেখিয়ে রাখছি। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলব, রিচির ছেলে আমায় কী ভয়ংকর ঘটনার কথা বলেছে।"

কথা বলতে বলতেই হেনরি কোটের পকেট থেকে একটা পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবারের হগলেগ বের করল। আমরা যারা হেনরির কাছে নিয়মিত যাই, তারা জানি, এটা ওর কাউন্টারের নীচে রাখাই থাকে। যেহেতু ও রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখে তাই অনেক সময় ঝামেলাবাজ খদ্দের সামলানোর জন্য ওকে এটা কাউন্টারে রাখতেই হয়। হেনরি এমনিতে ঠান্ডা মাথার শক্তপোক্ত স্বভাবের মানুষ।

আগ্নেয়াস্ত্রটা আমাদের দেখিয়ে হেনরি ফের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। হাওয়ার দাপটে আমরা একটু ঝুঁকে হাঁটছি। হেনরির হাতে বিয়ারের ট্রলিটা। হাঁটতে হাঁটতেই সে বলতে শুরু করল টিমির তাকে বলা ঘটনা। হেনরির কথাগুলো তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় উড়ে-যাওয়া বরফকুচির মতোই উড়ে যাচ্ছিল। তবু তার মধ্যেই আমরা মন দিয়ে যেটুকু শোনার শুনলাম। যা শুনলাম তা শোনার পর মনে হচ্ছিল, এতটা না শুনলেই বোধহয় ভালো হত। তবে হেনরির পকেটে আগ্নেয়াস্ত্রটা রয়েছে—এটাই একটা বড়ো ভরসা আমাদের।

বাচ্চাটা হেনরিকে যা বলেছে, তাতে মনে হচ্ছে, পচে-যাওয়া বিয়ার থেকে ঘটনাটা শুরু হয়েছিল। ক্যানের মধ্যে বিয়ার পচে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে এমনটা তো প্রায়ই দেখা যায়। অনেক সময় বিচ্ছিরি গন্ধ হয়ে যায়।

আমার এক বন্ধু আমাকে বলেওছিল যে বিয়ারের ক্যানে যদি চুলের মতো সরু ফুটোও থেকে থাকে, এত সরু ফুটো, যা দিয়ে বিয়ার বাইরে লিক করবে না অথচ সেই সরু ছিদ্র দিয়ে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করতে পারে বিয়ারের ক্যানে। বিয়ারে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে।

যা-ই হোক, টিমির কথা থেকে যা জানা গেছে, সেদিন ছিল অক্টোবর মাসের এক সন্ধ্যা। টিমি নিজের ঘরে বসে স্কুলের হোমওয়ার্ক করছিল। আর রিচি সেদিন গোল্ডেন লাইট বিয়ারের ক্যান কিনে এনেছিল। সেগুলোর সদ্গতি করছিল বসে বসে।

টিমি হোমওয়ার্ক শেষ করে সবে শুতে যাবে, ঠিক তক্ষুনি রিচি বেশ জোরে বলে উঠল, "অ্যাহ্! এ কী... এ তো বিচ্ছিরি একেবারে!"

"কী হল বাবা?" টিমি জিজ্ঞাসা করল।

"আরে এই বিয়ারটা! অ্যাহ্, এত জঘন্য জিনিস জীবনে খাইনি। মুখের স্বাদটাই কেমন হয়ে গেল!"

যে জিনিসের স্বাদ খারাপ, সেটা মুখে দিয়েই আমরা আর খাই না, ফেলে দিই সাধারণত। কিন্তু রিচি সেদিন পুরো ক্যানটাই একেবারে এক চুমুকেই গলায় ঢেলে ফেলেছিল। কারণ বুঝতে গেলে একটাই কথা উঠে আসে, সেটা হল লোকটার নাম রিচি গ্রেনাডাইন। এ হল সেই লোক, যে কিনা একসময় একজনের সঙ্গে বাজি ধরে এক মিনিটের মধ্যে বাইশখানা বিয়ারের গ্লাস গলায় ঢেলে যখন বাজি জিতেছিল, তখনও এক মিনিট শেষ হতে সাত সেকেন্ড বাকি। স্থানীয় লোক হলে রিচির সঙ্গে অন্তত বিয়ারের বাজি ধরার বোকামি কেউই করত না। নেহাত বাইরের লোক বলেই বাজিটা ধরেছিল এবং পাক্কা সাতাশ সেকেন্ডের মধ্যে বাইশ গ্লাস বিয়ার উদরস্থ করে কুড়ি ডলারের বাজি জিতে বিশাল জাহাজের মতো হেলতেদুলতে রিচি বেরিয়ে গিয়েছিল। এই হল রিচি গ্রেনাডাইনের বিয়ার আসক্তি। কাজেই আমি নিশ্চিত, স্বাদ-গন্ধ বুঝে ওঠার আগেই ওই বিয়ারের পুরো ক্যানটাই ও গলায় উপুড় করে দিয়েছিল।

তবে গলায় ঢেলে ফেলার পর ওয়াক তুলেছিল রিচি... অ্যাহ্! বমি হবে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ বমি করার চেষ্টাও করেছিল সে। বমি হয়নি। খানিক পরে একটু ধাতস্থ হয়েছিল।

বাবার অবস্থা দেখে টিমি এগিয়ে এসে একবার বিয়ারের ক্যানটা ধরে দেখতে গিয়েছিল। ক্যানের ভেতর ধূসর ছত্রাকের মতো আস্তরণ পড়ে রয়েছে। দেখলেই গা শিউরে ওঠে। আর গন্ধটা! ওহ্, কী সাংঘাতিক একটা মড়া-পচা গন্ধ ক্যানের ভেতর!

ওই ঘটনার দু-দিন পর টিমি যখন স্কুল থেকে ফিরল, তখনও বাইরে দিব্যি দিনের আলো রয়েছে। টিমি দেখল, তার বাবা সব ক-টা জানালার ব্লাইন্ড নামিয়ে ঘর অন্ধকার করে টিভি দেখছে। বাবা তো কখনও এমন সময় বাড়িতে থাকে না! আজ হলটাই কী!

টিমি বলেই ফেলল, "বাবা, কী হয়েছে? তুমি ঠিক আছ?"

"এই তো টিভি দেখছি একটু। আজ বেরোতে ইচ্ছে করল না আর।"

টিমি একটু আশ্বস্ত হয়ে সিংকের কাছে গিয়ে আলোটা জ্বালাল। হাত-মুখ ধোবে। এমন সময় রিচি বেশ জোরে ধমকে উঠল, "বন্ধ করো আলোটা! এক্ষুনি বন্ধ করো বলছি!"

টিমি আলোটা বন্ধ করে দিল। বেচারা ছেলেটা একবারও জিজ্ঞাসা করল না আলো না জ্বালিয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে সে হোমওয়ার্ক করবে কী করে। টিমি জানত রিচি একটু রাগি মেজাজি ধরনের মানুষ। মেজাজ খারাপ থাকলে তাকে না-ঘাঁটানোই ভালো।

"টেবিলের ওপর টাকা রাখা আছে। যাও, বিয়ার কিনে আনো।" আঁধারে রিচির গম্ভীর গলা বাজল। টিমি যখন বিয়ার কিনে ফিরল, তখন বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। টিভি অফ। ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাচ্চাটা ভয় পেয়েছিল ঢুকেই। অন্ধকার ছমছম করছে। সেই গাঢ় অন্ধকারে এককোণে পাহাড়ের মতো অন্ধকার হয়ে বসে আছে তার বাবা!

টিমি হাতড়ে হাতড়ে বিয়ারটা টেবিলে রাখল। সে জানে, বাবা খুব ঠান্ডা বিয়ার খেতে পারে না। একটু ঘরের তাপমাত্রায় সইয়ে খায়। বিয়ারটা রেখে বাবার দিকে এগোতেই যেন তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাকে ধাক্কা দিল। উফ! কী সাংঘাতিক পচাটে গন্ধ আসছে বাবার কাছ থেকে। তার বাবা কোনোদিনই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়, সেটা টিমিও জানে। কিন্তু তা-ই বলে এটা কীসের দুর্গন্ধ! আর না এগিয়ে টিমি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে পড়তে বসল। পড়তে পড়তেই সে শুনতে পাচ্ছিল, টিভি-টা আবার অন করল রিচি। বিয়ারের ক্যান খোলার শব্দও ভেসে এল।

প্রায় সপ্তাহ দুয়েক এইভাবেই কাটছিল। টিমি সকালে স্কুলবাড়িতে যেত। বিকেলে ফিরে দেখত, তার বাবা সোফাতে টিভি-র সামনে সেই একভাবে বসে আছে। টেবিলের ওপর বিয়ার নিয়ে আসার টাকা রাখা থাকত।

ফ্ল্যাটের ভেতর মড়া-পচা গন্ধটা দিন দিন আরও তীব্র হয়ে

উঠছিল। রিচি কোনো সময় জানলা খুলত না। সবসময় আঁধার গাঢ় হয়ে থাকত। নভেম্বরের মাঝামাঝি বোধহয় তখন। সে টিমির ঘরে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে পড়াও বন্ধ করে দিল। দরজার ফাঁক দিয়ে আসা সামান্য আলোও তার সহ্য হচ্ছিল না। টিমি বেচারা স্কুল থেকে ফিরে বাবার জন্য বিয়ার এনে দিয়ে বন্ধুর বাড়িতে পড়তে যেত। ওই স্ট্রিটে টিমির এক বন্ধু থাকে।

একদিন টিমি স্কুল থেকে ফিরল বিকেল চারটেয়। শীত ঘনিয়ে আসায় আজকাল দ্রুত অন্ধকার নামে। বিকেল চারটের সময়েই ভালো অন্ধকার। ফ্ল্যাটের ভেতর অন্ধকার তো হয়েই থাকে সবসময়। হঠাৎ সেদিন রিচি বলল, ‘‘টিমি, আলোটা জ্বালো।’’

সিংকের ওপরের আলোটা জ্বালাল টিমি। বাবার দিকে চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে গেল। বাবা আপাদমস্তক একটা কম্বল জড়িয়ে রয়েছে।

‘‘টিমি দেখ!’’ রিচি কম্বলের মধ্যে থেকে কোনোমতে একটা হাত বের করে টিমির সামনে মেলে ধরেছিল। টিমি হাতটা দেখে সেই মুহূর্তে আতঙ্কে পাথর হয়ে গিয়েছিল। হেনরিকে সে বলেছে, রিচির হাতটা ঠিক মানুষের হাত ছিলই না। একটা ধূসররঙা কিছু! ছাইরঙা রোঁয়া-ওঠা জেলির মতো থলথলে পিণ্ড একটা!

ভয়, আতঙ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল টিমিকে। সে কোনোমতে ফুঁপিয়ে বলতে পেরেছিল, ‘‘বাবা! ও বাবা, কী হয়েছে তোমার! ’’

‘‘কী জানি রে, কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। তবে আমার কিন্তু কোনো ব্যথা-যন্ত্রণা নেই, বরং বেশ ভালো লাগছে জানিস।’’

‘‘বাবা! আমি বরং ডাক্তার ওয়েস্টফেলকে একবার ডেকে আনি-না বাবা?’’

কথাটা টিমি বলেছে কি বলেনি, ব্যাস! রিচির কম্বল-মোড়া পাহাড়ের মতো দেহটা রাগে দুনো হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল, ‘‘খবরদার! সাবধান করে দিচ্ছি, টিমি! বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোকে গিয়ে ধরব! তোরও এই দশা হবে তখন! এই দেখ... দেখ আমাকে!’’ বলতে বলতে রিচি কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখ থেকে কম্বলের ঢাকা সরিয়ে দিল।

কথা বলতে বলতে আমরা রিচির বাড়ির কাছাকাছি কার্ভ স্ট্রিটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ঠান্ডায় সারা শরীর জমাট বেঁধে যেতে চাইছে। ভেতরে কেমন একটা কাঁপুনি ধরছিল। সত্যিই, এই পৃথিবীতে কত কিছুই যে আমাদের অজান্তে ঘটে চলে। হেনরির মুখে যা শুনছি, সেগুলো কোনো সুস্থ মানুষ সহসা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমাদের জানার বাইরেও বহু কিছু ঘটে।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছিল, আমার এক বন্ধু ছিল। নাম জর্জ কেলসো, এই ব্যাংগোরের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কর্মী ছিল সে। জলের পাইপ, ইলেকট্রিক ইত্যাদির কাজ ছিল তার। প্রায় পনেরো বছর চাকরি করার পর রিটায়ারমেন্টের দু-বছর আগে কাজটা ছেড়ে দেয় সে। তার কাজ ছেড়ে দেওয়ার পিছনে এক অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। ফ্র্যাঙ্কি হ্যালডেম্যান বলে আমার এক পরিচিত আমাকে কেলসোর সেই গল্পটা শুনিয়েছিল। এসেক্সের একটা ম্যানহোল খুলে নীচে পাইপের কাজ করতে নেমেছিল সদা হাসিখুশি, মজা করতে ভালোবাসা জর্জ কেলসো। পনেরো মিনিট পর যে মানুষটা ম্যানহোলের ঢাকনার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, সে যেন একেবারে অন্য এক মানুষ। কেলসো বলে চেনার উপায় ছিল না। ওই পনেরো মিনিটে মানুষটা ভেঙেচুরে নুয়ে গিয়েছিল। তার চোখ দুটোতে এমন ভয় বাসা বেঁধেছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে বুঝি নরকের দরজা খুলে উঁকি দিয়ে ফেলেছে! এরপর সে মদের নেশায় ডুবে যায়। দু-বছর পরে মারা যায় কেলসো। ফ্র্যাঙ্কি নাকি একবার তার কাছে জানতে চেয়েছিল যে ওই ম্যানহোলের ভেতর কী ঘটেছিল। জর্জ তখন বেশ নড়বড়ে হয়ে গেছে, তার স্মৃতিও বোধহয় ঠিক কাজ করত না। সে ফ্র্যাঙ্কির দিকে ঘুরে বসে বলেছিল, ‘‘কখনও মাকড়সা দেখেছ? একটা বড়োসড়ো কুকুরের সাইজের মাকড়সা... রেশমের সুতোর মতো তন্তু দিয়ে বোনা বিশাল জাল... তাতে অসংখ্য মরা ছোটো পশু আটকে আছে... আর... আর তার মাঝে বসে আছে বিরা...ট... অতিকায় একটা মাকড়সা!’’

একটু চমকে গিয়েছিলাম ফ্র্যাঙ্কির কাছে এসব শুনে। আজ এতদিন পর মনে পড়ে গেল। আমরা বিশ্বাস না করতেই পারি। তবু এই জগতেই এমন কিছু কিছু ঘটে থাকে, যার সামনে দাঁড়ালে বা স্বরূপ জানলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যেতে পারে! সেসব না-জানাই ভালো!

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

‘‘রিচি যখন কম্বল সরাল, টিমি কী দেখেছিল, হেনরি?’’ বার্টি জিজ্ঞেস করল।

টিমি তখনও তার বাবার অবয়বটুকু বুঝতে পারছিল। কিন্তু সারা শরীরটা ঢেকে ফেলেছিল ধূসর থকথকে জেলির মতো

রোঁয়া-রোঁয়া জিনিসটা। রিচির জামাকাপড় ছিঁড়ে ওই জেলির মধ্যে চিটে গিয়েছিল। যেন তার জামাকাপড়, চামড়া সব ওই ধূসর জেলির মধ্যে গলে মিশে গিয়েছিল।

উফ ভগবান!

তারপরই রিচি আবার কম্বলের মধ্যে নিজেকে ঢেকে নেয় এবং গর্জন করতে থাকে লাইট বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।

"ধূসর জেলির মতো! রোঁয়া-রোঁয়া! আলো সহ্য করতে পারে না! গরম জিনিস জড়িয়ে থাকে... ঠিক যেন ফাঙ্গাস, তা-ই না!" আমি বলে ফেললাম।

"একদম!" হেনরি উত্তর দিল, "একদম ঠিক বলেছ।"

"হেনরি, তুমি পিস্তলটা হাতে বের করে রাখো..." বার্টির গলা কাঁপছিল।

"হ্যাঁ, সে তো রাখতেই হবে।"

আমরা কার্ভ স্ট্রিটের চড়াই ভেঙে উঠতে লাগলাম। রিচির বাড়িটা পাহাড়ের একেবারে মাথায়। প্রায় একশো বছর পুরোনো ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের বাড়ি। এই বাড়িটার তিনতলায় একটা ফ্ল্যাটে রিচি থাকে। বেশ খানিকটা চড়াই ভেঙে সবাই দম নিচ্ছিলাম। সেই ফাঁকেই আমি জানতে চাইলাম, এরপর টিমির কী হল।

টিমির দিনগুলো কোনোরকমে কাটছিল। নভেম্বরের প্রায় শেষ। টিমি একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখল, তার বাবা আরও এক ধাপ এগিয়ে সমস্ত জানলাতে কম্বলের আস্তরণ লাগিয়ে সেগুলো সিল করে দিয়েছে। অতি ভীষণ এক দুর্গন্ধে ভরে আছে সমস্ত ফ্ল্যাট। মাংস-পচা আর পচে-যাওয়া ফলের গন্ধ। ফলকে ইস্ট দিয়ে পচালে যেমন গন্ধ হয়, কিছুটা সেইরকম।

আরও দিনকয়েক পর থেকে রিচি টিমিকে বলল তার বিয়ার স্টোভে গরম করে তাকে দিতে। ভাবতে পারছ... ওইটুকু একটা বাচ্চা ওই ফ্ল্যাটে একা... তার একমাত্র সঙ্গী তার বাবা সম্পূর্ণ অন্য কোনো জিনিসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে... ওই বাচ্চাটা স্টোভে বিয়ার গরম করে দিচ্ছে আর শুনছে, ভুড়ভুড়ি কাটার মতো অদ্ভুত আওয়াজে বিয়ার পান করছে তার বাবার জায়গায় থাকা অদ্ভুত জিনিসটা... ভাবতে পারো!

আজ বিকেলেও তা-ই হত। কিন্তু আজ টিমি ঝড়বৃষ্টির জন্য স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছুটা আগে বাড়ি ফিরেছিল। হেনরি বলছিল, "গোটা ফ্লোরটায় কোনো আলো ছিল না। টিমির ধারণা, সে যখন বাড়ি থাকে না, তখন তার বাবা সব লাইট ভেঙে দিয়েছে. ওপরতলায় উঠেই টিমির যেন গা ছমছম করে উঠল। সে শুনতে পাচ্ছিল, ঘরের ভেতর কী যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে... খসখস... থপথপ আওয়াজ। টিমির হঠাৎ মনে হল, সে যতক্ষণ বাড়ি থাকে না, তার বাবা কী করে, সে জানে না। প্রায় এক মাসের ওপর সে বাবাকে একবারও তার বসার জায়গা ছেড়ে নড়তে দেখেনি। মানুষের তো ঘুম বা বাথরুমে যাওয়া—এটুকুও দরকার হয়। কিন্তু রিচিকে টিমি সেটুকুও উঠতে দেখেনি।

"ফ্ল্যাটের দরজার ঠিক মাঝামাঝি একটা ফাঁকা খোপ ছিল, তার ঢাকনার লকটা আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। সেই ঢাকনাটা তুলে টিমি ফ্ল্যাটের অন্দরে চোখ রাখল।"

কথা বলতে বলতে আমরা বাড়ির সামনে এসে পড়েছি। বাড়িটাকে যেন একটা অতিকায় প্রাণীর মতো দেখাচ্ছে। তিনতলার জানলাগুলোর দিকে চোখ গেল। জানালাগুলোয় যেন মিশকালো অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে।

"টিমির অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে মিনিটখানেক সময় লেগেছিল। তারপর সে দেখল, অতিকায় একটা থলথলে ধূসররঙা পিণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে। এবং সেটা কোনোমতেই মানুষ হতে পারে না। যেখানে যেখানে যাচ্ছে, মাটিতে থকথকে ভেজা জেলির মতো জিনিস লেগে থাকছে। হঠাৎ ওই পিণ্ডটার থেকে হাতের মতো কিছু একটা অংশ বেরিয়ে এল। দেওয়ালের কাঠের তাকের ঢাকা খুলে যে জিনিসটা বের করে আনল ওই হাতের মতো অংশটা, সেটা দেখে টিমি স্তব্ধ হয়ে গেল... একটা বেড়াল!" বার্টি ঠান্ডায় হাত দুটো ঘষে গরম করার চেষ্টা করছিল। আবার হেনরির গলা বাজল, "হ্যাঁ, একটা মরা বেড়াল। পচে গলে গেছে। সাদা সাদা অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে সেটার গায়ে!"

"আঃ, চুপ করো হেনরি! আর সহ্য করতে পারছি না!" বার্টি কাতরে উঠল।

"টিমি দেখেছিল, তার বাবার মতো ওই থলথলে পিণ্ডটা ওই মরা বেড়ালটা খাচ্ছে!"

আমি ঢোঁক গিললাম। মুখের ভেতরটা কেমন তেতো চ্যাটচেটে হয়ে আছে।

"ওটা দেখার পরই টিমি আর এখানে টিকতে পারেনি। পালিয়ে গিয়েছিল আমার কাছে।"

"আমি মনে হয়, ওপরে যেতে পারব না", বার্টি ফ্যাসফেসে গলায় বলল।

হেনরি মুখে কোনো কথা বলল না। তার দৃষ্টি একবার বার্টিকে, তারপর আমাকে ছুঁয়ে গেল।

"আমাদের বিয়ারটা পৌঁছোতে যেতেই হবে", আমি

বললাম।

বার্টি আর কিছু বলল না। আমরা সামনের হলঘরে ঢুকলাম। ঢুকতেই কেমন একটা গন্ধ নাকে ঝাপটা দিল।

হলঘরে খুব কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব জ্বলছে। মরা হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে। ছায়া-ছায়া অন্ধকার সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরদিকে। হেনরি সিঁড়ির ধাপে ট্রলিটা রেখে বিয়ারের প্যাকটা বের করল। আমি দোতলার সিঁড়ির লাইট জ্বালানোর জন্য সুইচ টিপলাম। জ্বলল না। টিমি ঠিকই বলেছে, লাইটগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে!

বার্টি বলল, "হেনরি, আমি বিয়ারের প্যাকটা ধরছি। তুমি পিস্তলটা হাতে নাও।"

হেনরি কথা না বাড়িয়ে বিয়ারের প্যাকেটটা বার্টির হাতে দিল। তারপর আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম। প্রথমে হেনরি, তারপর আমি, শেষে বিয়ার হাতে বার্টি। দোতলায় উঠে আসার পর গন্ধটা আরও তীব্র হল। ফল পচিয়ে ভিনিগার তৈরির কারখানায় গরমকালে যেমন ফল পচার তীব্র বিচ্ছিরি একটা গন্ধ ওঠে, সেইরকম। তবে এক্ষেত্রে শুধু ফল-পচা গন্ধ না, আরও একটা বীভৎস গন্ধ মিশে আছে। মাংস পচার গন্ধ!

ঘটনাটা শোনার পর আমার এতটা গুরুতর মনে হয়নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে এখানে।

"এর পাড়া-প্রতিবেশী এই গন্ধে টেকে কী করে! কেউ কিছু বলে না!" আমি বললাম।

প্রতিবেশী থাকলে তো বলবে! হেনরি মৃদু হাসল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম হলটা ধুলোভরা, নোংরা হয়ে আছে। তিনদিকের অন্য তিনটে ফ্ল্যাটে তালা মারা।

"এই বাড়িটার মালিক কে! সে তাড়িয়ে দেয়নি কেন এখনও রিচিকে!" রেলিং ধরে একটু দম নিতে নিতে বার্টি বলল।

"কে ওকে বার করতে যাবে!" হেনরি জিজ্ঞেস করল, "তুমি?"

বার্টি চুপ করে গেল।

হল থেকে কয়েক ধাপ খাড়া সরু সিঁড়ি উঠে রিচির ফ্ল্যাটটা। হঠাৎ আবহাওয়া খুব গরম হয়ে উঠছিল। গুমোট একটা গরম, ওইরকম বীভৎস দুর্গন্ধ আমার ভেতরটা নাড়িভুঁড়ি সমেত গুলিয়ে উঠছিল। রিচির ঘরের দরজায় চৌকো একটা ফাঁক। যেমন টিমি বলেছিল।

বার্টি হঠাৎ মৃদু আর্তনাদ করে উঠল, "দ্যাখো, আমাদের পায়ের দিকে তাকাও!"

পায়ের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হলঘরে জায়গায় জায়গায় থকথকে ধূসর সেই রোঁয়া-রোঁয়া জেলির মতো ছড়িয়ে আছে। মেঝেতে বোধহয় একসময় কার্পেট পাতা ছিল। ওই ধূসর ছত্রাক কার্পেটকে প্রায় পুরোটাই খেয়ে ফেলেছে। এক-আধ জায়গায় ছেঁড়া দু-এক টুকরো কার্পেট রয়েছে।

হেনরি রিচির দরজার দিকে এগোল, পিছনে আমরা। বার্টির কথা জানি না, তবে আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। হেনরি কিন্তু অবিচল। সে আগ্নেয়াস্ত্রটা সোজা ধরে তার বাঁট দিয়ে দরজায় নক করল।

"রিচি!' হেনরির গলা একটুও কাঁপল না, যদিও তার মুখটা অসম্ভব ফ্যাকাশে হয়ে আছে।

"আমি নাইট আউল পাবের হেনরি। তোমার জন্য বিয়ার নিয়ে এসেছি।"

প্রায় এক মিনিট চুপচাপ। কোনো উত্তর নেই। তারপর আওয়াজ এল, "টিমি কোথায়? আমার ছেলে টিমি?"

আমার মনে হল, তক্ষুনি পিছন ফিরে পালাই। গলাটা কোনো মানুষের গলা হতেই পারে না। নিচু ঘ্যাঁসঘেঁসে গলা যেন মুখে ভরতি বুদ্‌বুদ নিয়ে কথা বলছে কেউ।

"টিমি আমার দোকানে। ওখানে ও খাবার খাচ্ছে। ছেলেটা বড্ড রোগা হয়ে গেছে রিচি।"

কয়েক মুহূর্ত আবার চুপচাপ। তারপর একটা আওয়াজ এগিয়ে আসতে লাগল। কেউ যেন জল ভরতি রবারের জুতো পেতে হাঁটছে... খ্যাঁস... খ্যাঁস... খ্যাঁস... খ্যাঁস! দরজার ঠিক ওপারে এসে আওয়াজটা থামল। তারপর সেই অমানুষিক কণ্ঠ আবার শোনা গেল, "দরজাটা একটু ঠ্যালো, তারপর বিয়ারটা গলিয়ে দাও... আমি দরজা খুলতে পারব না।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও! তুমি ঠিক কী অবস্থায় আছ বলো তো রিচি!" হেনরি বলে উঠল।

"তোমার ভেবে কাজ নেই! বিয়ারগুলো দিয়ে চলে যাও এখন থেকে।" সেই রক্ত-জল-করা গলায় রিচি বলল।

"হুম! এখন আর তাহলে শুধু মরা বেড়ালে কাজ চলছে না তা-ই না রিচি!" হেনরির হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা দরজার দিকে এখন সটান তাক করা।

আমার মাথায় হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল... তার মানে হেনরি এটা জানে! টিমি তাকে বলেছে... এইজন্যেই মাংস-পচা গন্ধটা এত তীব্র এখানে! গত তিন সপ্তাহে এই শহরে গভীর রাতে দুটি অল্পবয়সি মেয়ে এবং কয়েকজন বয়স্ক স্যালভেশন আর্মির লোক গভীর রাতে নিখোঁজ হয়ে

গেছে... এই তাহলে কারণ!

"তুমি বিয়ার রেখে এখান থেকে যাবে নাকি আমি বেরিয়ে আসব!" গলাটা এখন আরও উগ্র, আরও ভয়ংকর।

"আমার মনে হয়, তুমি বেরিয়ে এসো রিচি! "

আবার খানিক চুপচাপ। তারপরেই সহসা বু...ম করে কান-ফাটানো আওয়াজ হল। দরজাটা প্রথমে বাইরের দিকে বেঁকে গেল, তারপর দড়াম করে খুলে দেওয়ালে ধাক্কা খেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সে...

জাস্ট কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত... তারপরেই আমি আর বার্টি হুড়মুড় করে তিন-চারটে সিঁড়ি টপকে নীচের দিকে নামতে লাগলাম। পালাতে হবে, যেমন করে হোক পালাতে হবে। বাইরে বরফে পা পিছলে যাচ্ছিল, তবু আমরা প্রাণপণ পালাচ্ছিলাম।

নীচের দিকে নামতে নামতেই আমরা শুনলাম, হেনরির হাতের বন্দুক তিন তিনবার গর্জে উঠল। ফাঁকা ভূতুড়ে বাড়িটায় গুলির আওয়াজের প্রতিধ্বনি হচ্ছিল।

আমরা ওই কয়েক মুহূর্তে যা দেখেছি তা যে ক-দিন বাঁচব, অভিশপ্ত দুঃস্বপ্ন হয়ে আমাদের তাড়া করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দরজা দিয়ে যে বেরিয়ে এসেছিল, তার আকৃতি কিছুটা মানুষের মতো। প্রকাণ্ড, থলথলে ধূসর জেলির পিণ্ড একটা। তার গা দিয়ে চুইয়ে নামছে ওই ধূসর তেলতেলে পদার্থ।

দেখতে ভয়ংকর তো বটেই। তবে সেটাই বীভৎসতার শেষ নয়। সব চেয়ে বীভৎস হল চোখগুলো। পুরো ছড়ানো, হিংস্র, হলদেটে চোখ! দেখলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। কারণ ওগুলো কোনো মানুষের চোখ হতেই পারে না! কোনো মানুষের আত্মার বাস ওতে সম্ভব নয়। আর চোখ তো দুটো নয়, চারটে চোখ! দু-জোড়া চোখের মাঝখান দিয়ে একটা সাদা গুটি গুটি-ওঠা দাগ, তার মাঝখান দিয়ে উঁকি মারছে গোলাপি মাংস। ঠিক যেন জিনিসটা দু-ভাগে ভাগ হয়ে রয়েছে।

এইভাবে... এইভাবে ভাগ হয়েই তো ছত্রাক নিজের বিস্তার ঘটায়! উফ ভগবান!

রাস্তায় আমি আর বার্টি একটাও কথা বলিনি। আমি জানি না বার্টির মনে কী চলছিল, তবে নিজের মনে মনে আমি একটা হিসেব করছিলাম। একটা গুণ করছিলাম। একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা, আট থেকে ষোলো, ষোলো থেকে...।

আমরা হেনরির দোকানে ফিরে আসতেই কার্ল আর বিল পেলহ্যাম একের পর এক প্রশ্ন করছিল। আমদের দুজনের মধ্যে কেউই তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। গোল হয়ে চুপ করে বসে অপেক্ষা করছি, কখন হেনরি ফিরে আসবে। আমার মনের মধ্যে তখনও সেই হিসাব চলছে। একসময় নিজেকে থামালাম... এইভাবে ও বাড়তে থাকলে তো একসময় মানবজাতিটাই শেষ হয়ে যাবে! না না, তা যে হয় না! আমরা গোল হয়ে বসে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। জানি না কে ফিরবে... হেনরি নাকি... নাকি... সে!

আমরা অপেক্ষা করতেই থাকলাম।

আমার মনের মধ্যে ছোট্ট আশার প্রদীপ জ্বলে রইল... আমি জানি, হেনরিই ঠিক ফিরবে। হেনরিকেই ফিরে আসতে হবে।







কানকাটা হোইচি

(প্রচলিত জাপানি অলৌকিক গল্প)

সংকলন - লাফকাডিও হার্ন

 অনুবাদ - ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

জাপানের হনসু দ্বীপের শেষ সরু অংশটা যেখানে কিউসু দ্বীপের প্রায় ঘাড়ে উঠে পড়েছে, মাঝখানে শুধু সরু একটা খাঁড়ি। সেইখানে আছে শিমোনশেকি বেলাভূমি, এক অভিশপ্ত উপকূল।

আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগে এই শিমোনশেকিতে এক মহাযুদ্ধ হয়েছিল। দান-নো-উরার যুদ্ধ, এই যুদ্ধকে বলা হয় হেইকে গোষ্ঠী এবং গেনজি গোষ্ঠীর মধ্যে শেষ লড়াই। এই যুদ্ধে হেইকে গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়ে যায়। নারী এবং শিশুরাও রক্ষা পায়নি। হেইকে গোষ্ঠীর নাবালক রাজা, যাকে এখন আন্তকু তেন্নো বলে স্মরণ করা হয়, তিনিও নির্মমভাবে নিহত হন। সেই থেকে সাতশো বছর ধরেই এই উপকূল বহু ভয়ংকর অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী।

এখানকার জেলেরা আপনাকে শোনাবে সেইসব কাঁকড়ার কথা, যাদের পিঠে স্পষ্ট মানুষের মুখের আদল দেখা যায়, কারণ তারা হল মৃত হেইকে যোদ্ধাদের আত্মা। আঁধার রাতে প্রায়ই জেলেরা দেখতে পেত, বেলাভূমির ওপর যেন হাজার হাজার জ্বলন্ত মশাল ছোটাছুটি করছে। এদের বলা হয় ওনি-বি বা পিশাচের আলো। আবার যখন হাওয়া উত্তাল হয়ে ওঠে, তখন গভীর সমুদ্রের দিক থেকে শোনা যেত মরণাপন্নের আর্ত চিৎকার বা যুদ্ধের গর্জন। এককালে এই হেইকে বিদেহীরা ভয়ংকর অশান্ত ছিল। উপকূলের কাছে কোনো জাহাজ এলেই তারা নানাভাবে সেই জাহাজকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করত, কোনো একা সাঁতারু জলে নামলে তার আর রক্ষা ছিল না। জলের ভেতর থেকে হেইকি পিশাচরা তার পা ধরে অতলে টেনে নিত। ভৌতিক উপদ্রবে শিমোনশেকি প্রায় পরিত্যক্ত হবার মুখে এসে গিয়েছিল।

এমন সময় এগিয়ে এলেন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি শিমোনশেকিতে আমিদাজি নামের একটা বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করলেন।

হেইকে আত্মাদের শান্তির জন্য নিয়মিত নানারকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হত সেই মঠে। চারদিকে টাঙিয়ে রাখা হত মন্ত্র-লেখা পতাকা।

এসব করেও কিন্তু হেইকে বিদেহীদের খুব একটা শান্ত করে তোলা যায়নি। অবশেষে একদিন রাজার অর্থসাহায্যে সমুদ্রের বেলাভূমিতেই এক বিশাল সমাধিস্থল তৈরি করা হল। সেখানে একটা বড়ো বেদি বানিয়ে তার ওপর হেইকে রাজা আন্তকু তেন্নোর এক জমকালো স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনা করা হল। সেই সঙ্গে যতজন হেইকে সামন্ত বীরের নাম জানা ছিল, সবার নামেই এক-একটা স্মৃতিফলক বসানো হল।

হয়তো নিয়মমতো সমাধিস্থলের অভাবই হেইকে পিশাচদের অশান্তির কারণ ছিল। তাই দেখা গেল, এরপরে ভৌতিক উপদ্রব অনেক অনেক কমে গেল, যদিও একেবারে বন্ধ হয়ে গেল না। নানা ছোটোখাটো অদ্ভুত ঘটনায় বোঝা যেত, যে তখনও হেইকে যোদ্ধাদের আত্মার পরিপূর্ণ শান্তি হয়নি।

আজ থেকে আন্দাজ দুশো-আড়াইশো বছর আগে, শিমোনশেকিতে হোইচি নামে এক অন্ধ চারণকবি ছিল। স্থানীয় ইতিহাস আর লোককথা নিয়ে সে চমৎকার গান বাঁধতে পারত, আবার সেই সঙ্গে জাপানি বীণা 'বিভা' বাজিয়ে সেই গান গেয়ে শোনাতেও পারত। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে চিনত, ভালোবাসত—কিন্তু সে খুবই অর্থকষ্টে ছিল।

একদিন, বৌদ্ধ মঠের যিনি প্রধান সন্ন্যাসী, তিনি হোইচির গানবাজনা শুনলেন। পুরো উপস্থাপনাটাই তাঁর ভারী ভালো লেগে গেল। তিনি হোইচিকে মঠে ভালোভাবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এর বিনিময়ে হোইচি মাঝে মাঝে মঠের সবাইকে তার গান শোনাত। একদিন সন্ধ্যায় পুরোহিত মঠের অন্য সন্ন্যাসীদের নিয়ে কোনো এক ধর্মীয় সভায় যোগ দিতে গেলেন। এরকম প্রায়ই হত। এইরকম অন্য সমস্ত দিনের মতোই হোইচি সন্ধ্যাবেলায় তার ঘরে বসে নতুন গান বাঁধার চেষ্টা করছিল। ভীষণ গরম, গরমে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে হোইচি বারান্দায় বসে গান প্র্যাকটিস করতে লাগল। বারান্দার পরে একটা ছোটো বাগান আর তার পরেই মঠের দরজা। একা হোইচি নিজের একাকিত্ব কাটানোর জন্য 'বিভা' বাজাচ্ছিল আর ভাবছিল, কখন পুরোহিত ফিরে আসবেন। মাঝরাত পার হয়ে গেল। ঘরে তখনও গরম। হোইচি বারান্দাতেই খানিক ঝিমিয়ে নিচ্ছিল। এমন সময় মঠের গেট খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল, তারপরই সে শুনল, নুড়ি-বিছানো পথে কেউ যেন এগিয়ে আসছে।

"বন সান (মাননীয় পুরোহিত), আপনি কি এলেন?"

কেউ উত্তর দিল না, কিন্তু পায়ের আওয়াজ আরও কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর এক গম্ভীর অভিজাত গলায় আদেশের সুরে শোনা গেল — "হোইচি।"

হোইচি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেলল, "আদেশ করুন হুজুর, আমি আসলে চোখে দেখতে পাই না। কাজেই কে আমাকে ডাকছেন, সেটা..."

"ভয় পেয়ো না", অভিজাত গলায় আশ্বাসের আভাস পাওয়া গেল, "আমার যিনি মালিক, বিরাট বড়ো একজন জমিদার, এই শিমোনশেকিতে কয়েকদিন হল আছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন আরও অনেক নামকরা লোকজন। এখানে শোরগোল ফেলতে চান না বলে সবাই নাম ভাঁড়িয়েই আছেন আপাতত। তা আজকে মালিক গিয়েছিলেন দান-নো-উরার যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে। তারপরেই কানে এল তোমার নাম। তুমি নাকি বিভা বাজিয়ে সেইসব যুদ্ধের গান গেয়ে শুনিয়ে থাকো। তাই মালিক আদেশ দিলেন তোমাকে নিয়ে আসতে। সবাই অপেক্ষা করছেন। তুমি এখনই তোমার ওই বিভা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।"

যদিও অনুরোধটা একটু বেয়াড়ারকম, কিন্তু সেই সময়ে কোনো বড়ো সামন্তপ্রভুর আদেশ হালকাভাবে নেবার কথা ভাবাই যেত না। কাজেই হোইচি তার জুতো পরে নিল, তারপর বিভা হাতে সে ওই লোকটির সঙ্গে চলতে লাগল। লোকটি তাকে খুব দক্ষভাবেই নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি চলতে বাধ্য করছিল। হোইচি যে হাতটা ধরেছিল, সেটা ছিল লোহার বর্ম-পরা হাত। এ ছাড়া অস্ত্রের ঠুনঠান আওয়াজও হচ্ছিল। হোইচির মনে হল লোকটি খুব সম্ভবত একজন প্রাসাদরক্ষক সামুরাই।

হোইচি প্রথমে ভয় পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এখন সে ভাবতে লাগল এই অজানা প্রভুটি কতটা শাঁসালো, মানে তার প্রাপ্তিযোগ কীরকম হতে পারে। ঠাটবাট দেখে যা মনে হচ্ছে ইনি নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণির একজন দাইয়ান, অর্থাৎ জাপানের মহারাজার কাছের লোক।এ সব লোক হাত ঝাড়লেই তো হোইচির কাছে পাহাড়! নিজের সৌভাগ্যের ব্যাপারে আর বেশি কিছু ভেবে ওঠার আগেই ওর পথপ্রদর্শক দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর জোর গলায় হুকুম করল, "দরজা খোল।" হোইচি একটা বিরাট বড়ো দরজা খোলার মতো শব্দ পেল।

দুজন একটা বাগানের মতো জায়গা দিয়ে খানিকটা চলার পর সেই সামুরাই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারে তার সামনে সম্ভবত একটা দরজা। সেখান থেকেই নরম গলায় সে বলল, "ভেতরে কে আছ? আমি হোইচিকে নিয়ে এসেছি।" পরক্ষণেই

হোইচি শুনতে পেল ব্যস্ত পায়ের আওয়াজ, সেই সঙ্গে দরজা খোলা, পর্দা সরানোর শব্দ, নারীকণ্ঠের মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ। কথাবার্তার ধরন থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এরা বিরাট রকমের অভিজাত, কিন্তু এ বিষয়ে আর বেশি ভাবার আগেই হোইচির হাত এক নারী হস্তের স্পর্শ লাভ করল।

মেয়েটি হাত ধরে হোইচিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপরে উঠতে সাহায্য করল। তারপর তাকে তার জুতো খুলে রাখতে হল। এরপর অস্বাভাবিক পালিশ-করা মেঝের ওপর দিয়ে মেয়েটি হোইচিকে নিয়ে চলল। কতবার যে বাঁক নিতে হল, তার আর হিসাব নেই। অবশেষে তাকে একটা দামি জাপানি মাদুর 'ততামি'র ওপরে তুলে দিয়ে বলা হল সেটার ওপরে বসে পড়তে। হোইচির মনে হল, সে একটা বিরাট হলঘরের মাঝখানে বসে আছে। চারপাশে লোকজনের অনুচ্চ অভিজাত উচ্চারণের কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তাকে এক রাজকীয় জনসম্মেলনে গান শোনাতে হবে। হোইচি নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। আশপাশের সব সম্মাননীয় লোকজনের সিল্কের পোশাকের খসখস শব্দে, তার নিজের মোটা ঘরে তৈরি পোশাকের জন্য লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল তার। এমন সময় এক অনুচ্চ নারীকণ্ঠ তাকে বলল, "হোইচি, চিন্তার কিছু নেই। আমাদের প্রভু তোমাকে আদেশ করছেন হেইকে রাজাদের ইতিহাস নিয়ে গান শোনাতে।"

"কিন্তু মাননীয়া, হেইকে রাজাদের ইতিহাস নিয়ে তো অনেক গান আছে। সব গান তো আর এই অল্প সময়ে শোনানো যাবে না!"

কিছু ফিসফিস শব্দ, তারপর আবার সেই মহিলা বললেন, "তুমি বরং দান-নো-উরা যুদ্ধের গান শোনাও।"

নার্ভাস হোইচি ক্ষীণকণ্ঠে তার গান শুরু করল। কিন্তু কয়েক মিনিটেই সে তার চারপাশের কথা ভুলে গিয়ে নিজের গানে ডুবে গেল। তার উদাত্ত গলায় ধ্বনিত হতে লাগল দান-নো-উরার নৌযুদ্ধের কথা। স্পষ্টই যেন শোনা যেতে লাগল আশপাশ দিয়ে ছুটে-যাওয়া তিরের শোঁ শোঁ শব্দ, মানুষের হিংস্র এবং আর্ত চিৎকার, অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ। শব্দ দিয়েই সে গেঁথে তুলল এক আশ্চর্য যুদ্ধের আবহাওয়া, যাতে পাওয়া গেল রক্তের গন্ধ, পড়ে-থাকা লাশের পাহাড়ের দৃশ্য।

গানের মধ্যেকার ছোটোখাটো শ্বাস নেবার সময়েই হোইচি শুনতে পাচ্ছিল তার চারদিকের লোকজনের প্রশংসার শব্দ। 'কী অসাধারণ গায়ক!' 'জীবনে এরকম শুনিনি!' 'এ তল্লাটে এরকম একজন শিল্পী? ভাবাই যায় না!" "এ তল্লাটে কী বলেন! পুরো জাপানে এমন গান কেউ গাইতে পারবে না!"

হোইচি একটা গাঢ় নিশ্বাস নিল, তার আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে। এরপর হোইচির ওপর যেন ঐশ্বরিক ক্ষমতা ভর করল। এত ভালো গান যেন সে নিজেও কখন গায়নি। অবশেষে যখন কাহিনির ক্লাইম্যাক্স উপস্থিত হল, হোইচি বর্ণনা করছিল সেই মুহূর্তের কথা, যখন হেইকে নারী এবং শিশুদেরও নৃশংসভাবে হত্যা করা হল, এমনকি রানিমার কোলে থাকা শিশু রাজাকেও পাষণ্ডরা এক কোপে কেটে ফেলল—তখন চারদিক থেকে এমন এক আশ্চর্য তীব্র কান্না এবং বিলাপের আওয়াজ শোনা গেল, যে হোইচি পর্যন্ত ভয় পেয়ে তার গান থামিয়ে ফেলল। কিন্তু আস্তে আস্তে চারপাশ স্বাভাবিক হয়ে এল। ঘরে আবার রাজকীয় নৈঃশব্দ্য ফিরে এল।

একটু সময় পরে সেই মহিলার অভিজাত গলা আবার শোনা গেল। "যদিও আমরা জানতাম, তুমি খুব ভালো চারণ গান করতে পারো, কিন্তু তা যে এত অপূর্ব হতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারিনি। আমাদের প্রভু তোমার ওপর খুব খুশি হয়েছেন, তুমি উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। কিন্তু তার আগে তাঁর আর-একটি আদেশ আছে। তুমি কাল আবার এই সময়ে এখানে এসে আমাদের গান শোনাবে এবং এরকম মোট ছয় দিন চলবে। তারপরে সম্ভবত প্রভু তাঁর জায়গায় ফিরে যাবেন আর তুমি তোমার যা প্রাপ্য তা পাবে। আর-একটা কথা, প্রভু এবং আর সবাই এখানে ছদ্মপরিচয়ে আছেন। তাই তুমি কোনো কারণেই এই ক-দিন এখানে যা হল তা কাউকে বলবে না। কেউ যেন তোমার এখানে আসার কথা জানতে না পারে। কাল আবার আজকের মতো তোমাকে নিয়ে আসা হবে। এবারে তুমি তোমার মঠে ফিরে যেতে পারো।"

কৃতজ্ঞ হোইচি বুঝতে পারল, তার কপাল খুলে গেছে। সে কাঁপা গলায় সবাইকে ধন্যবাদ জানাল। আবার সেই নারীর হাত তাকে প্রাসাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। সেখানেই তার পথপ্রদর্শক সেই সামুরাই অপেক্ষা করছিল। এরপর তার হাত ধরেই অন্ধ হোইচি যখন মঠে ফিরে এল, তখন প্রায় ভোর হতে চলেছে।

হোইচি যে সারারাত মঠের বাইরে কাটিয়ে এসেছে, সে কথাটা কিন্তু পুরোহিত জানতে পারেননি। আসলে গতকাল পুরোহিত অনেক রাত করে ফিরেছিলেন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছিলেন, হোইচি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছে। প্রায় সারাদিনই হোইচি ঘুমিয়ে কাটাল। রাত হলে আবার সেই সামুরাই এসে হোইচিকে সেই রাজকীয় সম্মেলনে হাজির করল। হোইচিও আগের দিনের মতোই তার অসাধারণ গানে সবাইকে মাতিয়ে তুলল। কিন্তু এবারে ফিরে আসার

পর হোইচি জানতে পারল, পুরোহিত জেনে গেছেন যে সে কাল রাতে মঠে ছিল না। পুরোহিত তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে অনুযোগ করলেন।

"এ কী কাণ্ড, হোইচি? আমরা সবাই কী ভয়ংকর চিন্তায় পড়েছিলাম বলো তো! একজন অন্ধ মানুষ যদি রাতে একা বেরিয়ে পড়ে, কতরকম বিপদ হতে পারে, তুমি জানো? কাউকে কিছু না বলে এভাবে বেরিয়েছিলে কেন শুনি? আর সারারাত ছিলেই বা কোথায়?"

হোইচি কিন্তু সোজা উত্তর দিল না। বলল, "ক্ষমা করবেন পুরোহিত মশাই! আসলে ব্যাপারটা খুব বেশিই ব্যক্তিগত। মাপ করবেন, এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।"

হোইচির কথা শুনে পুরোহিত যত-না আশ্চর্য হলেন, তার থেকেও বেশি তাঁর অভিমান হল। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হল যে ব্যাপারখানা খুব সুবিধার কিছু নয়। তিনি মঠের এক অনুচরকে সবসময়ে হোইচির ওপর নজর রাখতে বললেন। বিশেষ করে, রাতে যদি হোইচি কোথাও যায়, তবে সে যেন চুপচাপ পেছনে পেছনে যায়।

সেই রাতেই টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। চারদিকে কাদা এবং গহিন অন্ধকার। মাঝরাতের কাছাকাছি সময়ে অনুচর দেখতে পেল, হোইচি একা একা অন্ধকারে মঠ থেকে বার হচ্ছে। চটপট লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে সে হোইচিকে অনুসরণ করতে গেল। কিন্তু হোইচি ভীষণ তাড়াতাড়ি চলছিল। অনুচর মঠ থেকে বের হবার আগেই হোইচিকে আর দেখা যাচ্ছে না। একজন অন্ধ মানুষ এত তাড়াতাড়ি চলছে কী করে, তা-ই বা কে জানে!

যে যে বাড়িতে হোইচির আলাপ-পরিচয় আছে, অনুচর সব ক-টা বাড়িই ঘুরে দেখল। কিন্তু কেউ কিচ্ছু বলতে পারল না। এদিকে রাত বাড়ছে, অনুচর বেলাভূমির রাস্তায় মঠে ফিরে আসছিল। হঠাৎ তার কানে এক 'বিভা' বাজানোর আওয়াজ। কোথা থেকে আসছে, খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল, আওয়াজটা আসছে সেই রাজকীয় সমাধিক্ষেত্র থেকে।

এত রাতে একা সমাধিক্ষেত্রে ঢোকার সাহস কারোই থাকে না। অনুচর পড়ি-মরি করে মঠে গিয়ে খবর দিল, সমাধিক্ষেত্র থেকে হোইচির বিভার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুরোহিত এবারে পবিত্র ঘণ্টা, নিশান ইত্যাদি নিয়ে, সঙ্গে আরও লোকজন নিয়ে সমাধিক্ষেত্রে ঢুকে পড়লেন। যা দেখলেন, তাতে তাঁরও গায়ে কাঁটা দিল।

অন্ধকারে, টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে, একা হোইচি, হেইকে রাজা আন্তকু তেন্নোর সমাধির সেই বিশাল বেদির ওপর বসে বিভা বাজিয়ে সপ্তম সুরে দান-নো-উরা যুদ্ধের গান শোনাচ্ছে। সেই বিশাল সমাধিস্থলের এখানে-ওখানে ধকধক করে জ্বলে উঠছে সেই পৈশাচিক আলো ওনি-বি। এক জায়গায় এতগুলো ওনি-বি কেউ দেখেছে বলে জানা যায় না। পুরোহিত বারবার চিৎকার করে বললেন, "সাবধান হোইচি! তুমি পিশাচের মায়ায় পড়েছ!" কিন্তু হোইচির ভ্রূক্ষেপ নেই।

বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ করে পুরোহিত তাঁর লোকলশকর নিয়ে বেদির ওপরে উঠে হোইচিকে ধরে আনতে গেলেন। কিন্তু পিশাচগ্রস্ত হোইচির গায়ে তখন মত্ত হাতির বল। পুরোহিত তার কানের কাছে বারবার পবিত্র ঘণ্টার আওয়াজ করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে হোইচির দাপাদাপি কমে এল। এবারে সব অনুচর মিলে হোইচিকে তুলে মঠে নিয়ে আসা সম্ভব হল।

সকাল হল। ততক্ষণে পিশাচের প্রভাব ছেড়ে হোইচি নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। পুরোহিত, কাল রাতে তাকে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল, সে কী করছিল—এসব তাকে আস্তে আস্তে খুলে বললেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, "তুমি কি বুঝতে পেরেছ হোইচি, কী ভয়ানক বিপদের মধ্যে তুমি আছ? যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তো সব কথা আমাদের খুলে বলো।" ভ্যাবাচ্যাকা হোইচি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল, যে সে যা ভেবেছিল, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। সে আমতা আমতা করে সবই খুলে বলল। বারবার বলল, "ওরা আমাকে কাউকে কিছু জানাতে বারণ করেছিল। আর তিন দিন পরেই আমি পুরস্কারের বিরাট অর্থ পেয়ে যেতাম।"

এত দুঃখের মধ্যেও পুরোহিত হেসে ফেললেন—হায় রে মানুষের লোভ! বললেন, "পুরস্কার? ছয় দিনের দিন তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল এক ভয়ংকর মৃত্যু। ওরা তোমায় টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তা-ই দিয়ে এক পৈশাচিক ভোজসভা বসাত। সত্যি বলতে কী, এখনও আমি ভেবে পাচ্ছি না তোমাকে কীভাবে বাঁচাব? কারণ তিন দিন ওদের কথামতো চলার পর, তোমার ওপর ওদের প্রভাব খুবই প্রবল। আজ রাতে যখন ওরা তোমাকে নিয়ে যাবে, আমি কিছুই করতে পারব না। বরং ধারেকাছে থাকলে আমাদেরও চরম ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"

অন্ধ হোইচি এবারে বুঝতে পারল, কোন সাপের গর্তে হাত দিয়েছে। সে ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। পুরোহিত ওকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলেন না। মঠের লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরোনো পুঁথি খুলে পড়তে লাগলেন, খোঁজ করতে লাগলেন এমন বিপদের কোনো বিধান আছে কি না। দুপুর গড়িয়ে

যখন বিকেল নামল, তখন গম্ভীর মুখে তিনি হোইচির কাছে ফিরে এলেন।

হোইচি কাঁদো কাঁদো স্বরে প্রশ্ন করল, "প্রভু, আমার কী হবে?"

"একটা উপায় পেয়েছি। কিন্তু সেটা ভয়ানক শক্ত! সবটাই নির্ভর করছে তোমার মনের জোরের উপর।"

"আমি পারব! আমাকে পারতেই হবে। যা বলবেন তা-ই করব। শুধু আমাকে ওদের হাত থেকে বাঁচান প্রভু।"

পুরোহিত তাঁর লিপিকার তাসিজিকে আদেশ দিলেন হোইচির সারা গায়ে এক পবিত্র মন্ত্র লিখে দিতে। এমনকি হোইচির মাথা কামিয়ে মাথার ওপর, পায়ের তলায়, সর্বত্র এই মন্ত্রটি লিখে রাখা চাই।

মন্ত্র লেখা হল। পুরোহিত হোইচিকে বললেন, "এবারে সব নির্ভর করছে তোমার মুখ বন্ধ করে রাখার ক্ষমতার ওপর। আজ রাতে ওরা যখন তোমাকে ডাকতে আসবে, কোনো কারণেই তুমি টুঁ শব্দটি করবে না। ওরা তোমাকে বারবার ডাকবে, বিকট আওয়াজ করে তোমায় চমকে দিতে চাইবে, এমনকি চেনা লোকের গলাতেও তোমাকে ডাকাডাকি করতে পারে। কিন্তু তুমি কিছুতেই কোনো সাড়া দেবে না। ঠিক যেন তুমি ধ্যান করছ। তুমি যদি শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারো, একমাত্র তাহলেই তোমার প্রাণ বাঁচবে, নতুবা নয়। এবারে আমরা সবাই মঠ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব। কারণ তোমাকে না পেলে, ওদের রাগ এসে আমাদের ওপর পড়বে, অথচ এখানে থেকেও আমরা তোমার কোনো সাহায্য করতে পারব না।"

সমস্ত মঠ ফাঁকা হয়ে গেলে হোইচি মঠের বারান্দায় ধ্যানের ভঙ্গিতে বসল। তার 'বিভা'-টা সামনে পড়ে রইল। সমস্ত মন এক করে হোইচি জপ করতে লাগল, "কোনো শব্দ নয়, শব্দ করেছ কী মরেছ, হে বুদ্ধ, আমায় রক্ষা করো।" চারিদিকে ক্রমে রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসতে লাগল।

এইভাবে কতক্ষণ কাটল কে জানে। হোইচি বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত করে জপ করেই চলেছে, এমন সময় গেট খোলার শব্দ হল। নুড়ি-বিছানো পথে ভারী জুতোর মচমচ আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপরেই সেই সামুরাইয়ের ভারী গলায় শোনা গেল ডাক, "হোইচি।"

হোইচি নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। তার খালি ভয় হচ্ছিল যে তার হৃৎপিণ্ডের টিপটিপ আওয়াজ না শোনা যায়।

সামুরাই বারান্দায় উঠে এল। তার গলায় বিস্ময়ের সুর। সে আবার ডাকল, "হোইচি?" কোনো উত্তর না পেয়ে এবারে সে যেন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কোথায় তুমি? হোইচি!" হোইচি প্রবল উৎকণ্ঠায় সজোরে নিজের মুখ চেপে ধরে বসে রইল।

সামুরাই এবারে যেন চিন্তিত হল। বলল, "বিভাটা তো এখানেই পড়ে রয়েছে, কিন্তু হোইচি...", হঠাৎ সে চমকে উঠে বলল, "পিশাচ রাজার দোহাই, এটা কি? শুধু দুটো কান? হোইচির কানই নিশ্চয়। সে দুটোই অবশিষ্ট আছে দেখছি। মুখ না থাকলে আর জবাব কোথা থেকে আসবে?"

চিন্তিতভাবে বারান্দায় একবার পায়চারি করে সামুরাই বলল, "প্রভু হোইচিকে আনতে আদেশ করেছেন। তা হুকুম তামিল করার চিহ্ন হিসাবে কান দুটোই নিয়ে যাই।"

হঠাৎ হোইচি নিজের কানের ওপর লোহার মতো শক্ত কিছু অনুভব করল। তারপরেই দুই কানে অসহ্য যন্ত্রণা! হোইচির ঠোঁটের ওপর দাঁত কেটে বসল, কিন্তু তা-ও সে টুঁ শব্দ করল না। তার কাঁধের ওপর টপটপ করে গরম রক্তের ধারা বয়ে যেতে লাগল। হোইচি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ভোর হতে-না হতেই সমস্ত অনুচর নিয়ে পুরোহিত মঠে ফিরে এলেন। দেখলেন, বারান্দায় রক্তের স্রোতের মধ্যে হোইচি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার কান দুটো গোড়া থেকে কাটা!

পড়ি-মরি করে অনুচররা বৈদ্যের সন্ধানে ছুটল। বৈদ্য এসে আগে কানে পট্টি বেঁধে রক্ত বন্ধ করলেন। তারপর নানা প্রক্রিয়ায় হোইচির জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

হোইচির কাছে সব শুনে পুরোহিত নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলেন, "সব, সব আমার দোষ! আমি ওই হতভাগা লিপিকর তাসিজিকে বিশ্বাস না করে যদি নিজে একবার দেখে নিতাম, তাহলে তোমার আর এই দুর্গতি হত না। মূর্খটা তোমার কানের ওপরে মন্ত্র লিখতে ভুলে গিয়েছিল। আর তাই তোমার সমস্ত শরীর মন্ত্রের প্রভাবে ওদের কাছে অদৃশ্য হলেও, কান দুটো ওরা ঠিকই দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। আমি যদি একটু সাবধান হতাম..."

পুরোহিতের এই আপশোশ তাঁর সারাজীবনেও যায়নি। কিন্তু এই ঘটনার পর হোইচি বিখ্যাত হয়ে গেল। সারা জাপান থেকে লোক আসত কাঞ্চনমূল্যে তার গান আর গল্প শুনতে। কিছুদিনের মধ্যেই অন্ধ হোইচিও বিরাট বড়োলোক হয়ে গেল। যদিও তার নামটা ঈষৎ বদলে হয়ে গিয়েছিল 'মিনি নাশি হোইচি' অর্থাৎ 'কানকাটা হোইচি'।





যুদ্ধক্ষেত্রের অতৃপ্ত আত্মা

অলকানন্দা চ্যাটার্জি



মৃত্যু হলেই লোকে ভূত হয় না। পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে, যখন মৃত্যু আচম্বিতে আসে, কম বয়সে রোগভোগ ছাড়াই, তখন তাদের আত্মার মুক্তি হয় না, অর্থাৎ তাঁরা প্রেতরূপে আমাদের আশপাশে থেকে যান। অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সব থেকে বেশি হয় যুদ্ধে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেতাত্মার দর্শন পাওয়া বিরল ঘটনা তো নয়ই, বরং বেশ সহজলভ্য। শুরু করি নিজের দেশ দিয়ে।

১৯৬৮ সালের ভারত-চিন যুদ্ধে প্রাণ দেন সেনাবাহিনীর জওয়ান হরভজন সিং। তিনি পূর্ব সিকিম-চিন সীমান্তে নাথু-লা পাস এলাকায় পোস্টেড ছিলেন। রাউন্ডে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান তিনি। অনেক খোঁজার পরও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তিন দিন পরে তাঁর দলের এক সদস্য স্বপ্ন দেখেন যে হরভজন একটি বরফে ঢাকা ফাটলে পড়ে গেছেন। সেই স্বপ্নের সূত্র ধরে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে বার করা হয়।

মৃত্যুর পরেও তাঁর আত্মা ডিউটি ভুলতে পারেনি। এমনিতে নাথু-লা একটি সেন্সেটিভ জোন, চিন থেকে প্রায়শই ছোটোখাটো হামলা করা হয়ে থাকে, হরভজন সিং সময়মতো দেশের সৈনিকদের সতর্ক করে দেন। তাঁদের স্বপ্নে বলে দেন যে, হামলা হতে পারে। এখনও নাথু-লা পাসে ভারত-চিন বৈঠক হলে ওঁর জন্য একটি চেয়ার রেখে দেওয়া হয়। ওখানে পোস্টেড জওয়ানরা রোজ তাঁর ইউনিফর্ম আর জুতো পালিশ করে তৈরি রাখেন আর সকালবেলা সেই জামা-জুতো নোংরা আর অগোছালো হয়ে থাকে। রোজ রাতে তাঁর বিছানা গুছিয়ে দেওয়া হয়, আর সকালে সেই বিছানা দেখলে মনে হয় যে কেউ শুয়েছিল।

জওয়ানরা ক্যাপটেন হরভজন সিং-এর থেকে এত উপকার পেয়েছে যে তাঁর নামে একটা মন্দির বানানো হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তাঁর অ্যাকাউন্টে মাইনে জমা দেওয়া হত। কিছুকাল আগে তাঁকে, মানে তাঁর আত্মাকে রিটায়ার করানো হয়েছে।

একবার যখন চিনের কথা উঠেই পড়ল, তখন চিন নিয়েই চলুক।

চিনের পুবদিকে জিয়াংসি প্রদেশে আছে পোয়ং লেক, এই লেকের একটা অংশ অভিশপ্ত নাম কিনেছে।

১৯৬০ থেকে ১৯৮০ সাল, এই কুড়ি বছরে অন্তত দুশো জাহাজ বা বোট এই জলে হারিয়ে গেছে। এর নাম 'চিনের বারমুডা ট্রায়াঙ্গল'। এর আগেও যখনই কোনো জলযান পোয়ং লেকের লাওয়ে মন্দিরের আশপাশের জলে গেছে, তখনই তারা আশ্চর্যজনকভাবে হারিয়ে গেছে। তাদের কোনো ধ্বংসাবশেষ লেকের জলে ভাসতে দেখা যায়নি বা ঢেউয়ে ভেসে আসেনি। চিনদেশীয় লোকেরা মনে করেন, লেকের নীচে থাকা কিছু অতৃপ্ত আত্মাই এদের উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। কিন্তু লেকের জলে এত অতৃপ্ত আত্মা এল কোথা থেকে? এর পিছনে আছে এক নৌযুদ্ধের গল্প।

৩০ অগাস্ট থেকে ৪ অক্টোবর ১৩৬৩ সালে বিশাল আয়তনের এই লেকে এক ধুন্ধুমার নৌযুদ্ধ হয়।

রেড টারবান রেবেলিয়নদের এই ঝামেলায় জু য়ুয়ানজাং আর চেন ইউলিয়াং ছিলেন দুই দলের নেতা। য়ুয়ান বংশের পতনের পরে মিং বংশের অভ্যুত্থান এই যুদ্ধের হাত ধরেই শুরু হয়।

হান যোদ্ধাদের এক দলের সঙ্গে মিং বংশের এই সংঘাতে মিং বংশের রাজা জিতে যান।

হান যোদ্ধাদের জাহাজগুলো ছিল কাঠের তৈরি গাবদাগোবদা টাওয়ার শিপ, আর মিং জাহাজগুলো হত ছোটো আর সরু, ফলে তারা হত অতি বেশি স্পিডওয়ালা। এই ছোটো জাহাজগুলো বড়ো জাহাজের কাছে গিয়ে তাদের ওপর আগুনের গোলা ছুড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল।

জাহাজে থাকা একগাদা সৈনিক তাদের কাঠের জাহাজসুদ্ধু আগুনে পুড়ে মরে গিয়েছিল। তাদের অতৃপ্ত আত্মা তাই জলের ওপর কিছু নৌকো বা জাহাজ দেখলেই টেনে নেয়। যে ডুবুরিরা খোঁজ করতে জলের তলায় যায়, তারা হয় ফেরে না, না হয় পাগল হয়ে ফেরে, মানে রহস্যের সুরাহা কিছু হয় না।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তো? বাকিটা শুনলে আর হবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি জাহাজ 'কোবে মারু' যাচ্ছিল এই পোয়ং লেকের জলে, জাহাজে ছিল চিন থেকে লুঠ-করা জিনিসপত্র।

জিনিসপত্র মানে সোজা কথায় ধনরত্ন। নিন্দুকরা বলে থাকে, সঙ্গে লুঠ-করা নারীরাও ছিল। লাওয়ে টেম্পল এলাকা হল পোয়ং লেক থেকে ইয়াংসি নদীতে যাওয়ার একমাত্র পথ।

জাহাজটি এই লাওয়ে টেম্পল এলাকায় এসে ডুবে যায় বা হারিয়ে যায়।

জাপান তৎক্ষণাৎ সাতজনের ডুবুরিদল পাঠায়, তাদের মধ্যে মাত্র একজন ফিরে আসে, অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়, কিছুতেই বলতে পারে না বাকিরা কোথায় বা তাদের কী হয়েছে। দামি জিনিসপত্রগুলো হল আসলে চিনের, তাই উনিশশো ছেচল্লিশ সালে তারা এই সম্পত্তি খুঁজতে ডুবুরি পাঠায়। এবারে চিনদেশ আমেরিকা থেকে একজন পেশাদার ডুবুরি নিয়ে আসে, তাঁর নাম এডওয়ার্ড বার্‌। তিনি নিজের টিম নিয়ে জলে নামেন এবং এক মাস অনুসন্ধান করার পরেও তাঁরা কিছুই খুঁজে পাননি। এরপর একদিন জলে নামার পর সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে তাঁর দলের কেউ ফিরে আসেন না, এডওয়ার্ড নিজে ছাড়া।

তীব্র শক পেয়ে তাঁর কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে গিয়েছিল তাই তাঁর কাছ থেকে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে তিনি এই বিষয়ে মুখ খোলেন। তাঁর কথা অনুযায়ী, জলের ভেতরে একটা চোখধাঁধানো আলো দেখা যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক কান-ফাটানো তীক্ষ্ণ জোর আওয়াজ হয়। জলের মধ্যে একটা ঘূর্ণি তৈরি হল, তাতে তাঁর সঙ্গীরা তলিয়ে গিয়েছিল, উনি নিজেও আধা অজ্ঞান অবস্থায় সেই ঘূর্ণিতে তলিয়ে যাচ্ছিলেন, কোনো ডুবো পাথরে ধাক্কা লেগে তাঁর জ্ঞান ফেরে আর তিনি সেই পাথরটিকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে সেই ঘূর্ণিতে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচান।

এরপর অনেকবার অনেক জাহাজ এই জলে হারিয়ে গেছে, তাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি, আর এখন তো লোকে সার্চ-পার্টি পাঠাতেও ভয় পায়। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নিয়ে পণ্ডিতরা অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন, যেমন পৃথিবীর নীচে ম্যাগনেটিক ফোর্স লোহার তৈরি জাহাজ টেনে নিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক সেইরকমভাবেই পোয়ং লেকের বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন যে, লেকের নীচের বালির স্তরের স্থান পরিবর্তন চোরা ঘূর্ণি তৈরি করতে পারে, আর

সেই ঘূর্ণিতে জাহাজডুবি হতেও পারে। কিন্তু কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেন না যে অত জাহাজের অবশেষ গেল কোথায়, তাই চিনের মানুষ এটাকে সেই পুরোনো দিনের অভিশাপ বলেই মেনে নিয়েছে।

এইরকম ঘটনা পড়লে নিজের ভেতরের যুক্তিবাদী মনটা অনেক কিছু যুক্তিতক্কের ঝুলি খুলে বসে। সে আশায় পুরো জল ঢেলে দেয় একটি তথ্য। পোয়ং লেকের অভিশপ্ত অংশটা মাত্র তিরিশ ফুটটাক গভীর। মানে তিনতলা বাড়ির থেকে কম। ফলে এখানে চোরাবালি বা আন্ডার কারেন্ট জাতীয় যুক্তি খাটছে না। অবশেষগুলো কোথায়? এর উত্তর নেই। ট্রেনিং-নেওয়া ডুবুরিদের কী হল? উত্তর নেই। ফলে অলৌকিকত্বের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আমেরিকা নামক দেশের যুদ্ধ করবার জন্য খ্যাতি আছে, বা কুখ্যাতি! অন্য দেশে গিয়ে তারা হামেশাই বোমাবাজি করে আসে।

আঠেরোশো ছত্রিশ সালের জুলাই মাসে আমেরিকায় হল গৃহযুদ্ধ, বা সিভিল ওয়ার। এই গৃহযুদ্ধে উত্তর আমেরিকা, মানে ইউনিয়ন আর দক্ষিণ আমেরিকার কনফেডারেটসদের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ লাগে, তাতে দুই দলেরই প্রচুর লোকজন মারা যান। জুলাইয়ের এক থেকে তিন তারিখের মধ্যে পেনসিলভানিয়া প্রদেশের গেটিসবার্গ শহরের পাশের মাঠে-ময়দানে হয় এক রক্তক্ষয়ী লড়াই।

মারা যান আঠেরো হাজার লোক। এত লোক অল্প বয়সে অসময়ে মারা যাবেন, তাঁদের সৎকার না হয়ে গণকবর দেওয়া হবে আর যেদিন গণকবরও দেওয়া যায়নি, সেদিন আশপাশের পাহাড়ের ফাটলের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে আর সেই জায়গায় অতৃপ্ত আত্মা দেখা যাবে না তা কি হয়! গেটিসবার্গের পাশে মাঠেঘাটে ছায়া-ছায়া মূর্তি দেখা যায় যখন-তখন। আর সরকারও তার ফায়দা তুলতে দেরি করেনি, তাই গেটিসবার্গকে ট্যুরিস্ট স্পট বানিয়ে দিয়ে জনগণকে ভূত দেখার সুবর্ণসুযোগ করে দেওয়া হল। মূল শহরে ঢোকার আগে, রাস্তার দু-পাশে পুরোনো কামান-টামান সাজিয়ে রাখা আছে, দেখলেই মনে হয়, এক্ষুনি পুরোনো দিনের পোশাক-পরা লোকজন এসে যুদ্ধ শুরু করে দেবে। হয়ও তা-ই, যাঁরা গাড়িতে করে বেড়াতে যাচ্ছেন, তাঁরা অনেক সময় দেখেছেন, সিভিল ওয়ারের পোশাক-পরা লোকজন হাঁটাচলা করছে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে, আর যাত্রীরা মনে করেছেন যে ট্যুরিস্টদের আমোদ দেওয়ার জন্য যুদ্ধের পুনরভিনয় করা হচ্ছে, ফোটো তুলবেন ভেবে গাড়ি থামিয়ে নেমে দেখেন সব ভোঁ-ভাঁ! আবার একজন ট্যুরিস্টকে নাকি এরকম একজন ভূত-সৈনিক দুটো কার্ট্রিজ উপহার দিয়েছিল, লোকটি পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সেটা সিভিল ওয়ারের সময়ের কার্ট্রিজ। তবে ঘটনাটা সত্যি না গল্প তা নিয়ে আমার সংশয় আছে।

বারবারা এ নোয়ে নামে একজন মহিলা, ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকে লিখেছেন যে, তিনি ব্যালাডরি ইন হোটেলে গিয়েছিলেন গেটিসবার্গের ভূতের সত্যতা যাচাই করতে। মাঝরাতে তিনি ঘোড়ার পা ঠোকার বা নাক ঝাড়ার শব্দ পেয়েছেন, আহত সৈনিকদের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ওই হোটেল বা ইনটি গৃহযুদ্ধের কালে সৈনিকদের হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার হত।

প্রতি বছর বহু ট্যুরিস্ট গেটিসবার্গ যান ভৌতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে।

ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার লিস্টে গেটিসবার্গ একদম ওপরের সারিতে বসে আছে।

গেটিসবার্গ যেমন পুরোনো দিনের কায়দাকানুন বজায় রেখে জায়গাটাকে ট্যুরিস্ট স্পট বানিয়ে রেখেছে, ঠিক তেমনই ফ্রান্সের নর্মান্ডিতেও সেই বিখ্যাত ওমাহা বিচের আশপাশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দেওয়া আছে।

৬ জুন, উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল, আমেরিকা আর কানাডার মিলিত সৈন্যদলকে জার্মানির অধীনে থাকা ফ্রান্সের নর্মান্ডির ওমাহা বিচের নিকটবর্তী জলে নামিয়ে দেওয়া হল, এই অভিযানের কোড নেম ছিল 'অপারেশন নেপচুন'। বিচের অনতিদূরে ছিল পাথুরে টিলা, আর তার ফাঁকে ফাঁকে ছিল জার্মান বাংকার, পাথরের খাঁজে খাঁজে বসে ছিল জার্মান সৈন্য। আর হাঁটুজল ভেঙে যে আমেরিকান ছেলেছোকরারা আসছিল, তাদের বেশির ভাগেরই কোনো আর্মি ট্রেনিংই ছিল না। তারা সেই বিচে উঠে আসতে-না আসতে জার্মান দল তাদের ঝাঁজরা বানিয়ে দিল।

এই বর্ণনা আর টেনে লম্বা করার দরকার নেই, যাঁরা 'সেভিং প্রাইভেট রায়ান' দেখেছেন, তাঁরা সব্বাই জানেন। ১১৬শ রেজিমেন্টের প্রধান টমাস ভ্যালেন্সের লেখাটি হুবহু সিনেমার মিনিট কুড়ির প্রথম দৃশ্যটির সমর্থন করে।

মৃত আর অর্ধমৃত ছেলের দল সমুদ্রের পাড়ে পড়ে রইল, আর ঢেউ এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এরপরে আবার আমেরিকান ট্রুপ এসে জার্মানদের মেরে-ধরে নর্মান্ডি দখল

করে। জার্মান মৃত প্রায় ন-হাজার, আর সম্মিলিত দলের দশ হাজার সৈনিক প্রাণ দেয়। ওমাহা আর উটাহ এই দুটি বিচে স্মৃতিস্তম্ভ, বা পুরোনো বাংকার ইত্যাদি দেখতে প্রচুর বিদেশি ট্যুরিস্ট ভিড় করেন।

এই ট্যুরিস্টদের মধ্যে অনেকে দেখেছেন আশপাশের পাহাড়ের গুহা বা ফাটল, যেগুলো তখন জার্মান বাংকার ছিল, তার পাশে ইউনিফর্ম পরিহিত সোলজার রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকান সোলজাররা গুলির ভারী বাক্স হাতে নিয়ে নিচু হয়ে দৌড়োচ্ছে। খুব আশ্চর্য না? মারা পড়ার সত্তর-পঁচাত্তর বছর পরেও তারা সেই একই ডিউটি করে চলেছে। বিশ্বাস না হয়, নর্মান্ডি ভ্রমণের সাইট চেক করুন, প্রচুর লোকে প্রশ্ন করে, "ভূত কি সত্যিই আছে? গেলে দেখা যাবে?"

প্রায় একই রকম গল্পকথা চালু আছে জাপানের ইয়ো জিমা দ্বীপের নামে। জাপানের সাড়ে সাতশো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ইয়ো জিমা দ্বীপে আমেরিকা জাহাজে করে সৈন্য পাঠায়, জাপানি সৈন্যরা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে ছিল, মোটামুটি সবাই মারা পড়ে অথবা জাপানি সনাতন প্রথায় আত্মহত্যা করে। সেখানেও মাঝরাতে ভূত-সৈন্যরা দরজায় টোকা দেয়, যদিও এক কিলোমিটার মাত্র চওড়া এই দ্বীপটিতে সাধারণ বাসিন্দা নেই, শুধু আর্মি ক্যাম্প আছে।

কোনো দেশে যখন বড়োসড়ো যুদ্ধ লাগে, তখন প্রথমটা সৈনিকরা যুদ্ধে যায়, তারপর তাদের সংখ্যা কমে এলে অল্পবয়সি তরুণদের নাম লিখিয়ে তাদের সামান্য ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'ট্রেঞ্চের ভূত' খুব কমন ছিল। ট্রেঞ্চ হল সেই লম্বা লম্বা খোঁড়া গর্ত, যাতে তারা সারা দিনরাত লুকিয়ে থাকত। 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' বইয়ে ট্রেঞ্চ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে সকল সৈন্য ট্রেঞ্চে লুকিয়ে ছিল, তারা হামেশাই মৃত সৈন্যদের ফিসফাস, তাদের আর্তনাদ শুনতে পেত। কোনো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক লোক মারা যাওয়ার জন্য বড়ো গর্ত করে গণকবর দিয়ে দিতে হত, আর সৎকার না হলে তাদের আত্মা যে শান্তিতে থাকতে পারে না—এ কথা তো সবাই জানে!

মনস্তত্ত্ববিদরা ট্রেঞ্চের ভূতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা বলেন তা হল—আঠেরো-উনিশ বছর বয়স্ক ছেলেরা, যারা বাড়িতে শান্তশিষ্ট জীবন কাটাত, একদিন হঠাৎ জোর করে তাদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আমরা যুদ্ধ জিনিসটাকে যত বীভৎস ভাবি, আসলে যুদ্ধ তার থেকে অনেক অনেকগুণ বেশি বীভৎস, চারদিকে মৃতদেহ, রক্ত, আহতের চিৎকার, পচনের গন্ধ দেখে আর শুনে, সারাদিন রোদের মধ্যে বসে থেকে থেকে, খালি পেটে তাদের শরীর রিটায়ার করত, আর মন হত বিকল, কেউ কেউ তো একটানা তিন-চার দিন ঘুমোনোর সুযোগ পেত না তাই তারা আতঙ্কতাড়িত হয়ে আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় ভূত দেখত।

এরোপ্লেন আবিষ্কার হয়েছে উনিশশো তিন সালে, আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এরোপ্লেন ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে, তার মানে বারো-তেরো বছরে যন্ত্রটির ভালোই উন্নতি হয়েছিল। এইরকম একখানা ফাইটার প্লেন নিয়ে বেরিয়েছিলেন পাইলট লেফটেন্যান্ট ডেসমন্ড আর্থার। জাতে আইরিশ এই বৈমানিক স্কোয়াড্রন টু-তে রয়াল এয়ার কর্পস ছিলেন, তাঁর প্লেন ভেঙে পড়ে স্কটল্যান্ডে। ১৯১৬ সালে অ্যাক্সিডেন্টের অফিসিয়াল রিপোর্ট বেরোয়, যাতে তাঁর নিজেরই দোষ ছিল বলা হয়।

এরপর থেকে আরএএস মন্টরোজ এয়ারফিল্ডে আর্থারের ভূতকে প্রায়শই দেখা যেত। স্কোয়াড্রন টু-র অফিসার'স মেসে অনেকেই এঁকে দেখেছেন, ভয় পেয়ে গার্ডরা বদলির আবেদন করেছে, কিন্তু ইনি শুধুমাত্র দেখা দেওয়া ছাড়া কারও ক্ষতি করেননি। লোকে ওর নাম দেয় 'আইরিশ অ্যাপারিশন' বা 'মন্টরোজ গোস্ট'। ব্রিটিশ ফ্লায়িং ম্যাগাজিন 'দি এরোপ্লেন'-এর সম্পাদক সি জি গ্রে একে ডেসমন্ড আর্থারের ভূত বলে মেনে নেন আর তিনি মনে করতেন যে আর্থারের আত্মা তাঁর মৃত্যু-অনুসন্ধানের ফলাফল নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার মানে ওঁর আত্মা সুবিচার চাইছিল হয়তো। শেষকালে ১৯১৯ সালের আরেকটা অনুসন্ধান রিপোর্ট জানায়, ডেসমন্ড আর্থারের দোষ ছিল না, প্লেনটার ডানায় কিছু সমস্যা ছিল।

এরপর ১৯৪০ সালে, এক হ্যারিকেন পাইলট একটি 'হেইস্কেল বম্বার' খুঁজতে গিয়ে একটা অলৌকিক বাইপ্লেন দেখতে পান। এর দু-বছর পরে মন্টরোজ এয়ারফিল্ডে একটি ফাইটার প্লেন টেক অফ করার পরেই ক্র্যাশ করে। প্রথমটা সবাই মিলে একজন শত্রুভাবাপন্ন মেকানিককে দায়ী করলেও পরে অনেকে স্বীকার করে যে তারা প্লেনটার পাশে একজন আবছায়া মূর্তিকে ফ্লায়িং স্যুট আর গগলস পরে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেয়েছে।

১৯৪৯ সালে মন্টরোজ যখন ট্রেনিং স্টেশনের মর্যাদা পায়, তখন নতুন পাইলটদের আর্থারের ভূত সম্বন্ধে সাবধান

করে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে স্যার পিটার ম্যাসফিল্ড যখন তাঁর চিপমাঙ্ক বম্বার চালাচ্ছিলেন, তখন তিনি একটা সত্তর হর্সপাওয়ারের বি.ই.টু বাইপ্লেন ক্র্যাশ হতে দেখে চটপট ল্যান্ড করেন আর কী হয়েছে, সাহায্য লাগবে কি না দেখতে যান, কিন্তু তখন সেখানে কিচ্ছু দেখতে পাননি, কিচ্ছু না মানে প্লেনের ধ্বংসাবশেষও নেই। ধরে নেওয়া হয় যে ওই প্লেন ডেসমন্ড আর্থারের আত্মার। এই ঘটনাগুলোর মাঝেমধ্যে আরও অনেকে মেঘের মধ্যে, কুয়াশার মধ্যে ওই আদ্যিকালের প্লেন উড়তে দেখেছেন।

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, ৫ জানুয়ারি, ১০৬৬ সালে ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর অপুত্রক অবস্থায় মারা যান, কিন্তু মরার আগে কোনো উত্তরাধিকারীর নাম বলে যাননি, ফলে ইংল্যান্ডের রাজা কে হবে তা-ই নিয়ে এক ঘোরতর ঝামেলা উপস্থিত হল।

হ্যারল্ড গডউইনসন তখন দাবি করেন যে রাজা মারা যাওয়ার আগে তাঁকে ইংল্যান্ডের 'দেখাশোনা'র ভার দিয়ে গেছেন। তাই ঠিক পরের দিন ছ-তারিখেই তিনি রাজা হয়ে বসেন।

এতে নর্মান্ডির ডিউক উইলিয়াম দ্য সেকেন্ড, এডওয়ার্ডের তুতো ভাই মহা অসন্তুষ্ট হন। তিনি তৎকালীন পোপের শরণাপন্ন হন, আর পোপের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন অভিজাত লোকজনের সমর্থন পেয়ে যান। তাঁরা সবাই মিলে সাতশো জাহাজ জুটিয়ে নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে বসেন। এদিকে গডউইনসনের ভাই টসটিগ শরণ নেন ভাইকিং রাজা হারডরাডার। আর তাঁরা দুই নেতা নরওয়ে থেকে জলপথে ধেয়ে আসেন ইংল্যান্ডের দিকে। এদিকে গডউইনসনের আর্মি উত্তরদিকে যাত্রা করে এই দুজনকে শায়েস্তা করার জন্য, আর স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের কাছে পঁচিশে সেপ্টেম্বর দুজনকেই নিহত করা হয়।

এদিকে ডিউক দ্বিতীয় উইলিয়াম কি চুপ করে বসে থাকবেন? কখনোই না, তিনি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আটাশে সেপ্টেম্বর পেভেনসি প্রদেশে পৌঁছোলেন সিংহাসনের দাবি নিয়ে।

এদিকে গডউইনসনের দলের লোকেরা অলরেডি যুদ্ধ করে ক্লান্ত, তাদের সৈন্যসংখ্যা তখন সাত হাজারে নেমে এসেছে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি এক ভয়ানক যুদ্ধে হ্যারল্ড গডউইনসন মারা যান, ডিউক উইলিয়ামের তির তাঁর চোখে বেঁধে।

যুদ্ধ জেতা শেষ। আর ডিউক উইলিয়াম পোপের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত এই জায়গায় বানিয়ে দেন এক 'অ্যাবে'।

ছয় হাজার লোকের প্রাণ নিয়ে যে অ্যাবে তৈরি হয়েছে, তাতে ভূত থাকবে, থাকবেই।

সন্ধ্যা হওয়ার পর ওখানে কেউ থাকে না, তবে বহু লোকে ওখানে সেই একাদশ শতাব্দীর পোশাক-পরা রাজা হ্যারল্ডের ভূত ঘুরতে দেখেছে, চোখে তির-বেঁধা অবস্থায় হাঁটাচলা করছে। যেখানে হ্যারল্ডের মৃতদেহ পড়েছিল, ঠিক সেখানে অ্যাবের অলটার বানানো হয়। কখনও-সখনও সেই অলটারটি রক্তে ভিজে লাল হয়ে ওঠে। অ্যাবের পাশে সুন্দর ঘাসে ঢাকা মাঠ আছে, সেই মাঠের সবুজ ঘাস মাঝেমধ্যে লাল রক্তে ভিজে উঠতে দেখা যায়।

কয়েকটি খবর কাগজ, যার মধ্যে গার্ডিয়ান নিউজপেপারও আছে—সাংবাদিকরা অনুসন্ধানে বেরোন, তাঁদের কাছে ভূত-ডিটেক্ট সরঞ্জাম ছিল, তাঁরাও রাতে নানারকম উলটো-পালটা আওয়াজ পেয়েছেন, বেল বেজেছে অথচ কেউ নেই, এইরকম সব দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন। ব্যাট্‌ল অ্যাবি একটা পিকনিক স্পট, দিনের বেলায় খুব সুন্দর। কিন্তু রাতে এক মূর্তিমান বিভীষিকা। এখানেও ঠিক গেটিসবার্গের মতো ভূত দেখে লোকে ভেবেছে, ট্যুরিস্টদের আমোদ দেওয়ার জন্য মিছিমিছি ভূত সাজিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু পরে জানতে পেরেছে যে এরকম কোনো প্রোগ্রাম রাখা হয়ইনি। ভাবলে আশ্চর্য লাগছে, মৃত্যুর এক হাজার বছর পরেও সেই চোখে তির বিঁধে মরা মানুষের ছায়াদেহ একইভাবে ঘুরছে।

১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উত্তর ফ্রান্সের সোম্ম নদীর আশপাশে জার্মানি আর ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের মধ্যে অনেকবার লড়াই হয়েছিল। জার্মানির সঙ্গে ইংল্যান্ডের একটা খণ্ডযুদ্ধের সাক্ষী হল ম্যামেৎস উড জঙ্গল।

সোম্ম নদীর কাছাকাছি ইংল্যান্ডের ৩৮ ওয়েলস ডিভিশন আর জার্মানির সৈন্যদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়।

৩৮ ওয়েলস ডিভিশনের ছেলেরা ছিল একেবারে তরুণ, তারা মাত্র সাত মাস আগে ট্রেনিং থেকে বেরিয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। অপর পক্ষে জার্মানরা ছিল পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ সোলজার। ওয়েলসরা ধীরে ধীরে পিছু হটতে হটতে ম্যামেৎস উড জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ার দরুন জার্মান মেশিনগান আর কাজে

দেয়নি। তখন তারা বেয়নেট হাতে যুদ্ধ শুরু করে, কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। ব্যাট্‌ল অফ সোম্ম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম বেশি মৃত্যুর সাক্ষী। মাত্র পাঁচ দিনের লড়াইয়ে প্রায় চার হাজার ওয়েলস সৈনিক মারা যায়।

ম্যামেৎস উড জঙ্গলে এখনও সেই যুদ্ধের মর্টারের শেল, ভাঙা বন্দুক-বেয়নেট, এমনকি মিলিটারি বুট পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। এক মাইল লম্বা আর এক মাইল গভীর জঙ্গলটি লোকে এড়িয়ে চলে। সেখানে একটি অগভীর ট্রেঞ্চ দেখতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত নির্জন এই অঞ্চলে গিয়ে অনেকেই ফিসফিসানি কথা শুনতে পেয়েছে। দিনদুপুরেও লোকে ওই জঙ্গলে ঢোকে না। আর কেউ ভুল করে গেলেও ভয় পেয়ে ফিরে আসে।

ইংল্যান্ডের প্রথম সিভিল ওয়ার হয়েছিল ওয়্যারউইকশায়ারে, ২৩ অক্টোবর ১৬৪২ সালে ব্যাট্‌ল অফ এজহিল এন্ড কিনেটন। এই যুদ্ধে রয়ালিস্টদের নেতা ছিলেন প্রথম চার্লস আর প্রিন্স রুপার্ট। আর পার্লামেন্টারিয়ানদের পক্ষে প্রধান ছিলেন লর্ড ফিয়েল্ডিং, আর্ল অফ এসেক্স। কিনেটন ময়দানে এই যুদ্ধে দু-পক্ষের মিলিয়ে প্রায় তিরিশ হাজার সৈন্য মারা যায় বা গুরুতর আহত হয়। যুযুধান দুই পক্ষে কোনো প্রধানের মৃত্যু হল না তাই যুদ্ধ ড্র হল বলে ধরে নেওয়া যায়, বা রাজার রাজত্ব বজায় থাকল বলে প্রথম চার্লসকেই বিজয়ী বলা যায়।

যুদ্ধ শেষ করে পার্লামেন্টারিয়ানরা ফিরে গেলেন ওয়্যারউইকে, আর রাজার দল লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিলেন, আর মাঠের মধ্যে রেখে গেলেন মৃত আর আহত সৈন্যদের। তাদের কারও হাত-পা কাটা গেছে, কারও শরীরের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে, তাদের জন্য খাদ্য, টাকা, ডাক্তার বা থাকার মতো ঘর—কিচ্ছুর ব্যবস্থা না করে এঁরা যে যার কেটে পড়লেন। আর তাঁদের অধীন সৈন্যরা মাঠের ভেতর পচে-গলে মরল আর যারা বেঁচে গেল, তারা আশপাশের গ্রামবাসীদের দয়ায় খেতে পেয়েছিল।

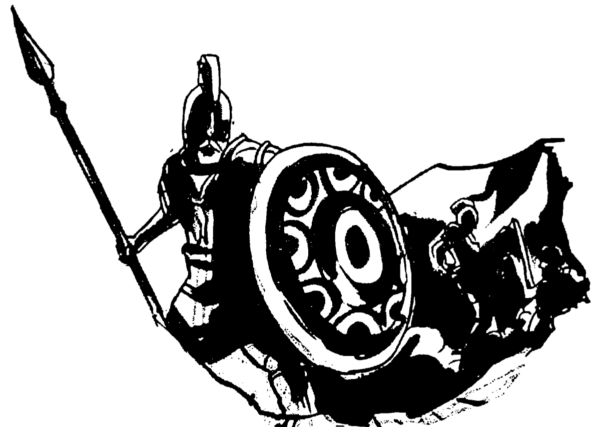
এই কিনেটনের মাঠ হল ইংল্যান্ডের সব থেকে ভয়াবহ যুদ্ধের মাঠ। ঘোড়ার শব্দ, মানুষের আর্তনাদ, অস্ত্রের ঝনঝনানি এখনও শোনা যায়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধকে ঠিক যুদ্ধ বলা চলে না। এটা হল আক্রমণ আর অত্যাচারের মিশেল। অগুনতি বম্বার আর ফাইটার প্লেন আকাশ থেকে এসে জনবসতির ওপর অ্যাটাক করে সব ধ্বংস করে দিল। মারা যাওয়ার বহুদিন পরেও লোকে তাদের নিকট আত্মীয়স্বজনকে রাস্তায় দেখেছে, স্বামী-ছেলেমেয়ের ভূত দেখেছে স্ত্রী, বাচ্চারা দেখেছে মা-কে, বন্ধু দেখেছে বন্ধুকে। তবে ভিয়েতনাম যুদ্ধে শুধু সৈনিকরা মারা যাননি, প্রচুর নিরপরাধ গরিব দেশবাসীও মারা গিয়েছিল। তাদের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়, যেন সুযোগ পেলে তারা আবার ফিরে আসতে চায়, কথা বলতে চায় আপনজনের সঙ্গে।

যুদ্ধে যে-ই হারুক আর জিতুক, ক্ষয়ক্ষতি হয় সাধারণ সৈন্যদের, তাই হয়তো তারা মাঝে মাঝে আমাদের দেখা দিয়ে তাদের অবস্থা মনে করিয়ে দিয়ে যায়। ভাবলে অবাক লাগে, দুঃখও হয়, প্রাণ দিয়েও দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে পারেনি এরা! বারে বারে ঘুরেফিরে এসে স্মৃতি উসকে দিয়ে যায়। কিছুটা সুরক্ষার দাবি করে, না সুবিচার দাবি করে তা তারাই একমাত্র বলতে পারবে। চার্লি চ্যাপলিন বলেছেন, 'মঁসিয়ে ভের্দ্যু' সিনেমায় যদ্দূর মনে হয়—কেউ যদি একটা লোক মারে, সে হয় খুনি। কেউ যদি হাজার লোক মারে, তাকে বলে বীর।

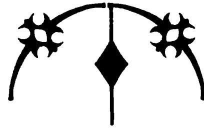
হয়তো নিজেকে বীর প্রমাণ করার নেশাতে কালে কালে এত এত যুদ্ধ বাধানো হয়েছে, আর লোকেরা নিজেকে বীর ভাবতে ভাবতেই যুদ্ধক্ষেত্রে মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও কতদিন পরে তাদের অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাবে, কে জানে।





বিভাগ: অণুগল্প





রক্ত

নিলয় দে



ব্যাপারটা প্রথম ঘটেছিল বছর তিনেক আগে। সেদিন আমার প্রথম শুটিং ছিল। একটা ছোটখাটো ব্যানারের হয়ে সিনেমা করছি। আমাদের বাড়ির একটা রেওয়াজ ছিল, না খেয়ে কেউ বাড়ির বাইরে যেতে পারতো না। আমার স্ত্রী সুজাতা স্বভাবতই তাড়াহুড়ো করে রান্না করছিল। সবজি কাটার সময় ছুরিতে আঙুল কেটে রক্তে মাখামাখি। মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জীবনের প্রথম শুটিং আর এরকম একটা অশুভ ব্যাপার ঘটল!

তবে শুটিং খুব ভালো হয়েছিল। পরিচালক ভীষণ প্রশাংসা করলেন আমার। দ্বিতীয়বার ব্যাপারটা ঘটেছিল যেদিন আমার সেই সিনেমা রিলিজ হয়। সুজাতা আর আমি দু-জনেই তৈরি হচ্ছিলাম সিনেমার প্রিমিয়ারে যাবার জন্য। হঠাৎ বাথরুম থেকে আর্তনাদের আওয়াজ শুনে গিয়ে দেখি সুজাতা পায়ের আঙুল ধরে যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে আর রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আঙুলটা থেকে। কোনো বালতিতে ঠোকা খেয়েছে বোধহয়। দেখেই মাথাটা গরম হয়ে গেল। জীবনের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে এরকম রক্তারক্তি! বিগড়ানো মেজাজ নিয়ে একাই প্রিমিয়ারে চলে গেলাম।

সিনেমাটা সুপার ডুপার হিট হয়েছিল। দীর্ঘ বহু বছর বোধহয় একজন নতুন আগত কোনো হিরোর সিনেমা এত হিট হয়েছিল। চারিদিকে আমার নাম হয়ে গেল। রাতারাতি সুপারস্টার হয়ে গেলাম।

এরপর পরপর আরো দুটো সিনেমা বেরোল আমার, দুটোই বড় ব্যানারের অথচ সিনেমা পুরোপুরি ফ্লপ হল। চতুর্থ সিনেমা বছর খানেক আগে। সেদিনও সিনেমার প্রিমিয়ারে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। যে শার্টটাকে পয়া মনে করতাম পরতে গিয়ে দেখি তার একটা বোতাম ছেঁড়া। সুজাতা তড়িঘড়ি বোতাম লাগাতে গিয়ে ছুঁচের খোঁচা খেল, সামান্য রক্ত বেরিয়ে এল আঙুল থেকে। আমার জীবনের স্পেশাল দিনগুলোতেই ওর এরকম রক্তপাত হয় কেন? মনে মনে একটু বিরক্তই হলাম। যাইহোক সিনেমাটা মোটামুটি চলেছিল, না হিট না ফ্লপ। একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবছি কিসের খামতি রয়ে যাচ্ছে? বড় ব্যানারের হয়ে কাজ করছি, ভালো অভিনয় করছি তবু সিনেমা সুপার হিট হচ্ছে না কেন? আর তখনই মাথায় সেই ভয়ঙ্কর ভাবনাটা আছড়ে পড়ল। যেদিনই আমি সুজাতার রক্ত দেখে গেছি সেদিনই আমার ভালো গেছে। ওর রক্তপাত আমার জন্য পয়া। যত বেশি রক্ত তত ভালো হয়েছে আমার। ভাবনাটা মাথায় আসতেই বদ বুদ্ধি খেলে গেল আমার। কয়েকদিন পর আমার আবার একটা সিনেমা রিলিজ হচ্ছে। ব্যাপারটা পরখ করে দেখতেই হবে।

সিনেমা রিলিজের দিন চাতক পাখির মত ওঁৎ পেতে থাকলাম সুজাতার রক্তপাতের জন্য কিন্তু এমন কোনো ঘটনা ঘটল না যাতে ওর রক্তপাত হয়। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে, কিছু একটা করতেই হবে। আমাকে ওর রক্ত দেখে বেরোতেই হবে। সেদিন মহালয়া ছিল, বাড়ির দুজন কাজের লোকই সেদিন আসেনি। আমি একটা ছুরি নিয়ে ধীর পায়ে রান্নাঘরে গেলাম। সুজাতা রান্না করছে। পিছন থেকে হামলে পড়লাম ওর উপর। প্ল্যান ছিল ওর হাতের তালুতে ছুরি চালিয়ে রক্ত দেখে বেরোব। কিন্তু সে কী করে বুঝতে পেরে গেল যেন, আমার হাতটা চেপে ধরল। ধস্তাধস্তি হতে লাগল আমাদের দুজনের মধ্যে আর তখনই ছুরিতে ওর হাতের নার্ভ কেটে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। অদ্ভুত একটা আনন্দ হল আমার। ও হাতটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়তে লাগল। আমি ওর রক্ত দেখে বেরিয়ে গেলাম প্রিমিয়ারে।

সবাই খুব প্রশংসা করল আমার সিনেমার। বোধহয় এটাও সুপারহিট হবে। বাম্পার ওপেনিং। খুব খোস মেজাজে রাতে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। রান্নাঘরের মেঝেতে সুজাতা লুটিয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পুরো রান্নাঘর। কী করবো ভেবে উঠতে পারলাম না। সুজাতা মারা গেছে, ওর রক্ত দেখে তো আর বেরোতে পারবো না কোনদিন। তাহলে কী হবে এবার? তারপরই প্ল্যানটা মাথায় এল। একটা নিডিল আর সিরিঞ্জ নিয়ে ওর শরীর থেকে রক্ত টেনে নিলাম। সেটা একটা বোতলে ভরে রাখলাম। তারপর লাশটাকে বাড়ির পিছনের বাগানে মাটিতে পুঁতে দিলাম। রটিয়ে দিলাম সুজাতা বাপের বাড়ি গেছে। আমি জানতাম ওর চোদ্দ কুলে কেউ নেই, কেউ ওর খোঁজ করবে না।

এরপর থেকে যখনি কোনো কাজে বের হতাম বোতল খুলে ওর রক্ত দেখে বেরোতাম। ওর রক্ত দেখা কোনোদিন বিফলে যায়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা অঘটন ঘটে গেল। বোতলটা খুলে ওর রক্ত দেখতে যাবো এমন সময় হাত পিছলে বোতলটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। রক্ত ছিটকে পড়ল মাটিতে। আমি মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। হায় একি সর্বনাশ হল আমার! কী করবো এবার, কী করবো এবার ভাবতে ভাবতে মনে এল আচ্ছা সুজাতার রক্তই একমাত্র আমার পয়া সেটা তো নাও হতে পারে। হয়তো কারো একটা রক্ত দেখে কাজে বেরোলেই হবে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। কাঁচের বোতলের একটা ভাঙা টুকরো তুলে নিয়ে নিজের হাতের উপর চালিয়ে দিলাম। গরম রক্ত বেরিয়ে এল। আমি শুটিংয়ে বেরিয়ে গেলাম। আমার ভাবনাটা বোধহয় ভুল নয়, আজকের শুটিং খুব ভালো হল। সবাই খুব প্রশাংসা করল।

আজ সিনেমাটা রিলিজ করবে। রেডি হয়ে বেরোবার আগে ছুরিটা হাতে নিলাম। হাতের তালুতে ছুরিটা চালাতে যাবো এমন সময় কে যেন আমার হাতটা শক্ত করে ধরল। কিন্তু কই, কেউ তো নেই কোথাও। ছুরি ধরা হাতটার উপর যেন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেটা অন্য কেউ শক্ত করে ধরে পরিচালনা করছে। ছুরিটাকে উপরে তুলে জোরে এক কোপ বসলাম আমার অন্য হাতের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে কব্জির কাছ থেকে হাতটা দুভাগ হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লো। আমার সারা শরীর অবশ হয়ে এলো, চোখ বুজে আসছে। চোখে অন্ধকার নেমে আসার আগে আবছা দেখলাম সুজাতা রক্তে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে।



পাহারাদার

প্রিয়া চক্রবর্তী



মুখটা কাছে নিয়ে দেখলাম আবার । নিঃশ্বাস পড়লো কি...? নড়ে উঠল না গলার কাছটা...? তবে কী...

চমকে উঠলাম সেই বিশ্রী পাখীর ডাকে!

ও, ওই যে... এবার আমি নিশ্চিত! মুখটা একবার ফাঁক হয়েই বন্ধ হয়ে গেল...!

আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানি না! এতক্ষণ ভিজে থাকায় শরীরে কাঁপুনি ধরছে দমকা হাওয়ায়। শেষ বিকেলের আলো-আঁধারিতে জমাট বাঁধছে ভয়...!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা মৃতদেহ আগলে বসে আছি...! কেনো আছি...? কোন বিশ্বাস মনে গেঁথে গেলে উপড়ে ফেলা কঠিন।

বাবার মুখে শরৎ বাবুর লালু গল্পটা শুনে, চোখ ভিজে উঠতো... মৃতদেহের প্রতি লালুর সম্মান আর দায়িত্ব দেখে। তাই আজ চোখের সামনে লাশটা দেখে ভয় পেলেও ফেলে পালিয়ে যেতে পারিনি।

আর, আর কতক্ষণ...? কেউ কি আজ আর আসবে না এদিকে...! আর একটু চেপে বসেছে অন্ধকার... জলে ভিজে ফুলে উঠছে ফ্যাকাশে লাশটা।

এখন বৃষ্টির সঙ্গী হয়েছে প্রবল ঝড়! এক জায়গায় স্থির থাকা অসম্ভব... লাশটাকে জড়িয়ে ধরলাম বাধ্য হয়ে।

একটা লিকলিকে সাপ পালাবার পথ না পেয়ে ঢুকে গেলো দেহটার কানে। ভয়েতে আমর হাত-পা সেঁধিয়েছে পেটের ভেতর। ব্যাপারটা দেখেও কিছুই করতে পারলাম না!

মায়ের বারণ যদি শুনতাম... বেরোনোর আগেও বলেছিল...

"দুপুর বেলা একা একা টোটো করবি না বাবু... ওই লালদীঘির দিকে ভুলেও পা বাড়াবি না...!"

মায়ের কথা মনে পড়ে খুব কান্না পেল...

পুজোর ছুটিতে গ্রামে মামার বাড়ি বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকতে কী কারো ভালো লাগে...? পাখি দেখা আর তাদের ডাক নকল করা আমার বরাবরের শখ। শহরে সেই সুযোগ কোথায়? এখানে এলে পাখি দেখেই দিব্যি সময় কাটে...

হুশ হুশ যাঃ... একটা কুকুর মুখ বাড়িয়ে গন্ধ শুঁকছে। ওর চোখ দুটো লোভে জ্বলজ্বল করে উঠলো যেন...! অন্ধকারে ভালো বুঝতে পারলাম না... ক্ষুধার্থ শ্বাপদটা লাশটায় দাঁত বসানোর উপক্রম করছে...! এবার কী করবো আমি...? আমার যে কুকুরে খুব ভয়...!

আচমকা একটু দূরে বাজ পড়ে জ্বলতে শুরু করল একটা গাছের মাথা... ভয়ে পেয়ে পালালো কুকুরটা... বুকে জল এল আমার।

চেনা পাখির ডাক ছাপিয়ে একটা অচেনা পাখির ডাক শুনতে শুনতে চলে এসেছিলাম এই লাল দীঘির পাড়ে। তার পরেই...

ওই আবার ডাকছে পাখিটা, এই রাতের বেলাতেও... পাখিটা কি আবার কোন বিপদ ডেকে আনছে আমার জন্য...!

ঝোপের পিছনে কে ওটা ...! চরণ কাকা না...? নিশ্চই কোথায় চুরি করে গা ঢাকা দিয়েছে...! মৃতদেহে চকচক করছে সোনার হার, আংটি। আমি কি বাঁচাতে পারবো সেসব চরণ কাকার নজর থেকে...? এদিকে এসে পড়লেই তো...

কিসের শব্দ...? অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে একসাথে...! পুলিশ...!

পিছনে ওটা কে দাঁড়িয়ে...? বাবা...! বাবার কান্না দেখে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে আমার।

নাহ্... আমি আত্মহত্যা করিনি বাবা...!

খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম পাখিটাকে জলে পড়ে থাকতে । হাটু জলে নেমে পাখিটা তুলতে যেতেই একটা শ্যাওলা মাখা হাত টেনে নিল আমায়... কী ভয়ঙ্কর মণিহীন পাতাহীন চোখ দুটো। বীভৎস কালচে সবুজ চেহারাটার দুর্গন্ধে দম আটকে এল... সবুজ চুলগুলো শোষকের মত রক্ত চুষে নিচ্ছিল, আমার ছটফটানিতে টকটকে লাল দাঁতে হাসছিল পিশাচটা ।

অনেক চেষ্টাতেও বাঁচাতে পারিনি নিজেকে।

প্রথমে কিছুক্ষণ জলের তলায় তারপর জলের ওপরে আমার দেহটা আগলে রেখেছি, ফেলে পালাইনি...!

সবার অলক্ষ্যে ঝুপ করে ডুব দিলাম। যেতে হবে নতুন ঠিকানায়... জলের তলায়, নরকের কাছে... আবার কারো পথ ভোলানোর অপেক্ষায়...



দেইয়াম

বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়



অদ্ভুত একটা কারণের জন্য যখন পুরুষ পিজির মালিক আমাকে তিনতলার শেষ ঘরটা ভাড়া দিতে রাজি হলেন না, তখন না হেসে থাকতে পারলাম না। তাঁর মতে ঘরটায় নাকি দেইয়াম বাসা বেঁধে আছে।

ভাবছেন, দেইয়াম কী? অন্ধ্র প্রদেশের লোকজন বিশ্বাস করে যে দেইয়াম এক অপশক্তি, যারা মানুষকে ধীরে ধীরে নিজের কব্জায় এনে তাকে শয়তান বানায়।

আমি পিজির মালিককে বোঝালাম যে এমন ঘন জনবসতিপূর্ণ স্থানে প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্র পরিপূর্ণ পুরুষ পিজিতে ওসব আত্মা-টাত্মা থাকতে আসবে না। ওসব ওঁর মনের কল্পনা। ভদ্রলোক আমার কথায় বেশ রেগে গেলেন। বললেন, "এর আগে দেইয়ামের আতঙ্কের জন্য বহু ছাত্র মাঝরাতে ওই ঘর থেকে আর্তনাদ করতে করতে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এসেছে,

কেউ কেউ অজ্ঞান অবস্থায় তিনতলার সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছে। অজানা কোনও অপশক্তি তাদের কাউকে প্রাণেও মারতে চেয়েছে বলে জনশ্রুতি। এবং ঘটনা হল যে কেউই ওই ঘরে একদিনের বেশি থাকতে পারেনি বা চায়নি।"

পিজি মালিকের কথা শুনে মনে হল যে ভদ্রলোক স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প দিচ্ছেন। তাঁর মতলব অন্য। হয়তো সিঙ্গেল রুম চাইছি বলে টাকাটা একটু বেশি চান। সরাসরি কথাটা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন। সেটা আন্দাজ করে আমি আন্দাজে ঢিল মারলাম। বললাম, "আমায় আপনি ওই রুমে থাকতে দিলে দেড়গুণ ভাড়া বেশি দিতে রাজি আছি। এবার বলুন।"

টাকার কথায় চিঁড়ে ভিজল। ভদ্রলোক রাজি হলেন। যদিও পরিষ্কার বলে দিলেন যে ভালো-মন্দ কিছু হয়ে গেলে তাঁর দায় নেই। মালিককে এক মাসের টাকা অ্যাডভান্স করে ঘরের চাবি হাতে পেলাম।

তিনতলার ঘরের বাসিন্দারা অদ্ভুত রকম চুপচাপ। এতটাই নিঃশব্দে তারা বাস করে যে ঘরগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনে হল যে পুরো ফ্লোরে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীটি নেই। যাইহোক, আমি চাবি ঘুরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম।"

ঘরে ঢুকতেই একঝলক ঠান্ডা বাতাস আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অথচ জানলাগুলো তো সব বন্ধ! আমি জানলাগুলো খুলে দিলাম। সাথে সাথে একটা ধুলোর ঝড় যেন বাইরে মিলিয়ে গেল। ব্যাপারটা অদ্ভুত। কিন্তু বিশেষ গা করলাম না।

আমার খুব ক্লান্ত লাগছিল। নিজের মালপত্রগুলো দেওয়ালের কাছে রেখে আমি শুয়ে পড়লাম। গভীর রাতে একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের খোলা জানলা দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে এসেছে মায়াময় জ্যোৎস্না। কিন্তু সেই অপার্থিব জ্যোৎস্নার স্পর্শ পেয়ে গোটা ঘরটা যেন কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের দেওয়ালে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে যেন অন্ধকারের কোনও দানব!

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে চোখ কচলালাম। না, চোখের ভুল নয়। পুরো দেওয়াল জুড়ে যেন কিছু চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। চলতে চলতে অন্ধকারের বিন্দুগুলো একটা আরেকটার সাথে জুড়ে যাচ্ছে। আমি দেখছি, বিন্দুগুলো জমাট বেঁধে বেঁধে দেওয়ালে এক ভয়াল অবয়ব ফুটে উঠছে। সেই অবয়বের শরীর যেন কালো আলকাতরার মতো আঠালো কিছু দিয়ে তৈরী। নারকীয় এক অতিকায় সাপের মতো সে আমায় কেন্দ্র করে গোটা দেওয়াল জুড়ে পাক খাচ্ছে। আমি যেন তার শিকার!

তীব্র গা ছমছমে অনুভূতির ধাক্কায় আমার বুকে হাতুড়ি পেটা হতে লাগল। আমি নড়তে-চড়তে, এমনকী চিৎকার করতেও ভুলে গেছি। এরই মাঝে বিস্ফারিত চোখে খেয়াল করলাম যে সেই নরকের সাপের অবয়বে মাথা ও মুখ জাতীয় কিছু গজিয়ে উঠছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে এক চাপা হিসহিসে গর্জন। ক্রমে আমাকে অবাক করে সম্পূর্ণ অবয়বটি দেওয়াল থেকে আমার খাটের ওপর নেমে এল। আমার মুখের কাছে নিয়ে এল তার মুখ। আমি আবিষ্কার করলাম যে তার মুখের ভেতর ছুরির ফলার মতো অজস্র দাঁতের সারি ঝলসে উঠছে। জ্ঞান হারানোর আগে আমার মনে হয়েছিল সেই মুখের আদলের সাথে যেন কোথায় গিয়ে পিজির মালিকের মুখের ভীষণ মিল! তিনিই আসলে... দেইয়াম!



হস্তান্তর

দেবদূত দে



একটা বিকট পচা গন্ধে ঘুমটা ভেঙে গেল। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার সাথে সাথে মাথাটাও পরিস্কার হয়ে এল। মনে পড়ল কেন এবং কি করতে আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি এত বিপদ স্বত্বে ও!

* * * * * * * *

আর পারা যাচ্ছে না! আগে যে কোন তালা তা যত বড়ই হোক, খুলতে আমার মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগত না।

মাস দুয়েক ধরে যে কি হল! ডাক্তার ও কিছু সমাধান বলতে পারল না। ওষুধ খেয়ে হাত কাঁপাটা কমলেও, দু-তিন পর যে কে সেই।

এর মাঝে বেশ কয়েক বার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। হাত কেঁপে তালায় ঝনঝন শব্দ হতেই আশপাশের বাড়ির লোক জেগে গিয়ে একটা যাচ্ছেতাই অবস্থা। রঘু বলছিল, দূরে শিমুলতলীর জঙ্গলে না কি কোন এক তান্ত্রিক আছে যে এরকম রোগ সারাতে পারে। রঘুর একটা পা ও না কি এরকম কাঁপত, ঐ তান্ত্রিকই ঠিক করে দিয়েছিল। আমার চুরির মাল রঘুই পাচার করে। ওর নেটওয়ার্ক হেব্বি স্ট্রং!

দুদিন ধরে জঙ্গলে হন্যে হয়ে সেই তান্ত্রিকের ডেরা খুঁজে যাচ্ছি। খিদের চোটে মাথাটা ঘুরে নিচে পড়ে গেলাম আর এখন জ্ঞান ফিরল!

* * * * * * * *

আধো অন্ধকারে গুহার ভিতর কিছু দেখাও যায় না। দূর থেকে বাবার কথা ভেসে এল,

"তোর হাত ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখিস কিছুই বিনামূল্যে হয় না! হাতের খিদে মেটালে তোর পেটের খিদেও মিটে যাবে।" আমি বলে উঠলাম, "আমি সবরকম দাম দিতে প্রস্তুত!" বাবা বললেন, "বেশ।" সাথে সাথে দুহাতে শুরু হল অসহ্য যন্ত্রণা!!

* * * * * * * *

সেদিন ব্যাথায় জ্ঞান হারানোর পর চোখ খুলে দেখি আমি আমার ঘরে। কিভাবে এলাম জানা নেই।

তারপর থেকে এই হাত আর কাঁপেনি। তবে এ হাতের খিদে বড় ভয়ঙ্কর। রোজ তার একটা করে গলা চাই! না পেলে আমার টাই টিপে ধরে! রাস্তার ধারে আজকাল ঘাপটি মেরে বসে থাকি! যাকে বেকায়দায় পাই তার গলাটাই টিপে ধরি! দিনে ঘুমাই আর রাতে জাগি! মানুষ না পেলে জন্তু জানোয়ার যা পাওয়া যায় তারই গলা টিপে ধরি। নইলে এ হাতজোড়া আর আমায় বাঁচতে দেবে না। এর মাঝে জঙ্গলে আবার খুঁজেছি বাবার ডেরা। পাইনি কিছুতেই। দম আটকে আসছে! হাতটার খাবার সময় হল।

* * * * * * * *

"কি ব্যাপার। সাতসকালে ফোন?"

"স্যার। আপনি একবার আসুন স্যার। গতকালের কেসটার রিপোর্ট এসেছে। রক্তক্ষরণে মরেনি!

"মানে?"

"লোকটা নিজেকেই নিজে গলা টিপে মেরেছে! গলার আঙুলের দাগটা ওর নিজেরই!"

"মানে!" হতভম্ব হয়ে ফোন রেখে দিলেন বড়বাবু।

লোকটা নিজেকে গলা টিপে কি করে মারতে পারে! লোকটার হাত দুটোই খুঁজে পাওয়া যায় নি। কনুই থেকে কাটা। দূরে কোথাও...

"তুই হাত ফিরে পাবি! তবে একটু কাঁপতে পারে। আর হাতের খিদে মেটাতে পারবি তো?"

"পারব বাবা।"

"বেশ। তবে আয়..."



অঙ্কের মাস্টার

অংশুলা ব্যানার্জী



গিন্নীর হাসিমুখ দেখেই অমিয়বাবু বুঝেছিলেন যে বাড়িটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। বদলির চাকরি তাঁর। প্রায়ই বাসা বদল করতে হয়। এই নিয়ে গিন্নীর মুখ ভার হয়ে থাকে। কোথাও গুছিয়ে বসতে না বসতেই বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে চলো নতুন বাড়ি। বাড়ি খোঁজো, ছেলের ইস্কুল বদলাও কত ঝক্কি। এই বাড়িটা বেশ কম ভাড়াতেই পেয়েছেন অমিয় বাবু। বাড়ির পেছনে একটা আমগাছ আছে। বাড়ির মালিক অন্য রাজ্যে থাকেন। বছরে দুবার আসেন কয়েক দিনের জন্য। এবার ছেলেটা কে স্কুলে ভর্তি করাতে পারলেই হয়। অঙ্কে বড্ড কাঁচা ছেলেটা। তার ওপর একটুও প্র্যাকটিশও করতে চায় না। মেরে, বকে বুঝিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন অমিয়বাবু। তিনি নিজেও হিসেবে কাঁচা। এইতো সেদিনও হিসেবে গণ্ডগোলের জন্য এক অফিস লোকের সামনে বড়বাবু যা নয় তাই বললেন। নাঃ ছেলেটার জন্য একজন ভালো অঙ্কের মাস্টার খুঁজতেই হবে।

আজ ছেলেকে নবচন্দ্র স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে এলেন অমিয়। ছাত্ররা মন দিয়ে পড়ছে, মাস্টারেরা কেউ ঢুলছেন না ক্লাসে, দেখে বেশ শান্তি পেলেন অমিয়বাবু। তিনি হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে গেলেন। রাশভারি মানুষটি কে তাঁর ব্যাপারে সব জানিয়ে বললেন, "মাস্টার মশাই একজন অঙ্কের মাস্টার বড় দরকার। ছেলেটা বড্ড কাঁচা অঙ্কে"। হেডমাস্টার একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বেশ আজ যাবেন একজন। তবে উনি বড় কড়া ধাতের কিন্তু"।

সন্ধ্যায় সত্যিই একজন এলেন। একটু বয়স্ক ব্যক্তি। ছেলেকে অঙ্ক করাবেন। বললেন, তিনি পড়ানোর সময় কেউ যেন ধারে কাছে না থাকে, ওঁকে চা জলখাবার দেওয়ারও দরকার নেই। সেদিন রাতে অমিয়বাবু দেখলেন ছেলে খেয়ে দেয়ে উঠেই অঙ্ক করতে বসেছে। দেখে আনন্দে ছেলেকে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গিয়েই সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। অমিয় বড়ই অবাক হয়ে গেলেন। "একি অনাসৃষ্টি কাণ্ড। মাছভাজাগুলো আবার উধাও" গিন্নীর চিৎকারে রান্নাঘরে পড়িমরি করে ছুটে এলেন অমিয়বাবু। কাটা বড় রুই এনেছিলেন আজ। গিন্নী ভেজে রেখে একটু ঘরে এসেছিলেন। ফের রান্নাঘরে গিয়ে দেখেন সব হাওয়া। কদিন ধরেই এই উৎপাত চলছে। অমিয় বলেন, "কোনো বেটা বদমাস বেড়াল করছে। ধরতে হবে"।

ওদিকে আজ ছেলের ক্লাসটেস্টের রেজাল্ট বেরিয়েছে। অঙ্কে ফুলমার্ক্স্। অমিয় অবাক। ছেলে এখন সারাদিন অঙ্ক করে। তাকে জোর করেও খেলতে পাঠানো যায় না। আজ বিকেলেই বাড়ির মালিক এসেছেন। গিন্নী তাঁকে রাতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন। খেতে খেতে এটা ওটা কথার পর ছেলের পড়াশোনার কথা ওঠে। অমিয় বাবু গদগদ স্বরে অঙ্কের মাস্টারের কথা বলেন। বাড়িওয়ালা ধরা গলায় বলেন, "আমার বাবাও ছিলেন অঙ্কের মাস্টার। কি তাঁর দাপট ছিলো। স্কুলে তাঁর কথাই শেষ কথা"। অমিয় বাবুর ছেলেটা আবার হঠাৎ করেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে।

রাতে অমিয় আমগাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় ঠিক ওঁর পেছনে কেউ বলে ওঠে, "কিঁ মঁশাই অঁঙ্ক কঁরবেন নাঁকি? আঁপনিও তোঁ অঁঙ্কে বঁড্ড কাঁচা"। অমিয় চমকে ঘুরে তাকান। একি এযে অঙ্কের মাস্টারমশাই। হাতে একটা মাছ ভাজা। এটাই তো গিন্নী রেখে দিয়েছিলো ছেলের জন্য। সামনের মূর্তিটি বলে, "আঁপনার ছেঁলেটা বঁড্ড বঁজ্জাত। ঘাঁড় মঁটকানোর ভঁয় দেঁখিয়ে অঁঙ্ক কঁরাই। আঁম গাঁছ থেঁকে তাঁকিয়ে থাঁকি ওঁর দিঁকে। খিঁখিঁ। স্কুঁলটার অঁতো ভাঁলো রেঁজাল্ট কিঁ এঁমনি এঁমনি। কেঁউ নাঁ পঁড়লেই রাঁতে গিঁয়ে ভঁয় দেঁখাই। মাঁস্টারগুলোও আঁমার ভঁয়ে থাঁকে। আঁসুন দেঁখি আঁপনাকেও অঁঙ্কটা ভাঁলো কঁরে শিঁখিয়ে দিঁই"। আঁ আঁ শব্দ করে ধুপ করে অজ্ঞান হয়ে যান অমিয়বাবু। ওদিকে বাড়িওয়ালা নিজের ঘরে তখন শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন অমিয়বাবুকে বলা হল না, যে বাবা গলায় কই মাছের কাঁটা আটকে মারা গিয়েছিলেন। মাছ খেতে বড্ড ভালোবাসতেন মানুষটা।



গল্প নাকি সত্যি

মধুরিমা কুমার



বর্ধমান স্টেশনে বসে আছি। ঝড় জলের জন্য দুটো ট্রেন ক্যানসেল হয়েছে, পরের ট্রেন রাত ন-টায়। ঘড়িতে এখন সবে সাড়ে সাতটা। নিঝুম স্টেশনে আমার মতোই জনাকয়েক হতভাগা যাত্রী বসে আছে। এই দুর্যোগের দিনে যে কী মরতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। একরাশ বিরক্তি নিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করলাম। পাশে এসে বসল মধ্যবয়স্ক একজন ব্যক্তি। সারা মুখময় কাঁচাপাকা দীর্ঘ দিনের না কাটা দাড়ি। রুগ্ন শরীরে ময়লা ঢিলেজামা। কেমন একটা তেলচিটে গন্ধ নাকে এসে লাগল। আমি একটু সরে বসলাম। ভদ্রলোক বারকয়েক আমার দিকে তাকিয়ে খুক্ খুক্ করে কাশলেন। আমি উনার দিকে তাকাতেই মৃদু হেসে বললেন, ''আজ্ঞে আপনি 'ভূত সারথি' পত্রিকার সম্পাদক অখিলেশ সেন তো? আমি স্নেহময় পাকরাশী। এই একটু লেখালেখি করি। স্যার আমার একটা বই...''

আমি মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ''আমার ট্রেনের টাইম আর হয়ে এসেছে এখুনি হয়তো ঘোষণা হবে। আমি এ সময় আনমনা থাকলে কোন প্লাটফর্মে ট্রেন দেবে শুনতে পাবো না।'' কথাটা শেষ করেই মুখটা ফিরিয়ে নিলাম। আপনার কথা শোনার ইচ্ছা বা সময় কোন-টাই আমার এইমুহূর্তে নেই এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলা আরকি। আর কথা মানেই তো একটা বই ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিন কিংবা যোগাযোগ করিয়ে দিন বড় প্রকাশকের সঙ্গে। যাইহোক ওষুধ ভালোই কাজ করল। লোকটা আর কোনো কথা না বলে আমার হাতে একখানা বই গুঁজে দিয়ে খুব ধীর ম্রিয়মান গলায় বললেন, ''স্যার আমার এক বন্ধু রাতের পর রাত জেগে এই বইটা লিখেছে আর তার সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে এটি ছাপিয়েছে। আপনি দয়া করে একটু পড়বেন...। আপনার সঙ্গে শীঘ্রই আমার বন্ধুর সাক্ষাৎ হবে তখন তাকে বলবেন বইটা কেমন লাগল!'' মনে মনে ভাবলাম ভিক্ষা চাওয়ার নতুন কৌশল বটে। শুধু হাত পাততে লজ্জা লাগে তাই এই বই দেখিয়ে টাকা চাওয়া। আমি বইটা দেখতে দেখতেই বললাম, ''হ্যাঁ তা সরাসরি বলুন না কত টাকা লাগবে?'' কোনো উত্তর না পেয়ে মুখ তুলতেই দেখি লোকটা এরইমধ্যে কোথায় চলে গেছে।

ট্রেনে উঠেই বইটা পড়তে শুরু করলাম। বইয়ের প্রত্যেকটা গল্পই সত্য ঘটনা অবলম্বনে এবং গায়ে কাঁটা দেবার মতো ভৌতিক কাহিনি। বইটা পড়তে পড়তে ওনার সম্বন্ধে নিচুস্তরের চিন্তাভাবনা করার জন্য কিছুটা অনুশোচনাও হল। সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মধ্যে লেখালেখিও করি কিন্তু এত নিখুঁত এত জীবন্ত বর্ণনা খুব কমই পড়েছি। ভেবে অবাক হলাম বাংলার কোণে কোণে কত সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে থাকে শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে সেগুলি সঠিক ভাবে বিকশিত হতে পারে না। একরাশ মুগ্ধতা আর বিস্ময় নিয়ে খুঁজতে লাগলাম লেখক পরিচিতি।

লেখক - স্নেহময় পাকরাশী (জন্ম ১৯৬৫ - মৃত্যু ২০২০)

লেখাটা দেখেই আমি চমকে উঠলাম। তার মানে কিছুক্ষণ আগেই যে আমার সাথে কথা বলল, আমার পাশে বসে ছিল, সেই জলজ্যান্ত মানুষটা নাকি একবছর আগেই...! ভৌতিক গল্পে বানিয়ে বানিয়ে লেখা ভয়ের ঘটনাগুলো এই মহূর্তে সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে যেন ঘটতে শুরু করেছে। লক্ষ্য করলাম ট্রেন-টাও হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এদিকে বাইরে এতটাই ঘুটঘুটে অন্ধকার যে বোঝার উপায় নেই কোন্ স্টেশন। যে কামরাটায় বসে আছি সেটাও এখন একেবারে ফাঁকা। কামরার লাইটগুলোও বারকয়েক দপদপ করে নিভে যেতেই মুহূর্তে চারিদিকে যেন নিকশ অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা গ্রাস করল। সেইসঙ্গে অনুভব হতে লাগল কামরার উষ্ণতাও যেন অস্বাভাবিকভাবে হিমাঙ্কের নিচে নামতে শুরু করেছে। ঠিক এমন সময় কেমন একটা খুক খুক কাশির আওয়াজ খুব কাছেই শুনতে পেলাম আর সেই সঙ্গে একটা সোঁদা তেলচিটে গন্ধ নাকে এল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বেশ অনুভব করতে পারছি আমি ছাড়াও আরেকজনের উপস্থিতি। ভয়ে হাত-পা কেমন অবশ হয়ে আসছে। নিশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছি। বার বার মনে পড়ছে ভদ্রলোকের বলা শেষ কথাটা, ''আপনার সঙ্গে শীঘ্রই আমার বন্ধুর সাক্ষাৎ হবে তখন তাকে বলবেন বইটা কেমন লাগল...!''



অয়েল পেইন্টিং

আকাশ দত্ত



ঘুমটা প্রতিবার এই একভাবে ভেঙে যায় কিগানের। ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ জানলা দিয়ে বাইরের আকাশটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবে যে হালকা একটা গুমোট ভাব রয়েছে সেটা ঠাহর করা যায় অনায়াসেই। ঘুম থেকে উঠতেই কিছুক্ষণ একভাবে বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে বসে থেকে কিগানের খেয়াল হল সেই একই জিনিসটা আবার শুরু হয়েছে। পাশের ঘর থেকে হালকা হলেও কানে ভেসে আসছে একটা খিলখিলি করে হাসির শব্দ। হাসির শব্দটা একটা মেয়ের।

বিছানা থেকে নেমে ধীর পায়ে কিগান এসে পৌঁছলো পাশের ঘরটায়। এই ঘরের দরজাটা সবসময় বন্ধ রাখা হয়। নানান জিনিসে ভর্তি এই ঘরটা স্টোর রুম হিসেবেই ব্যাবহার হয়। এই ঘরের ভেতরেই আওয়াজটা আসছে জানে কিগান, একটু আগেও হাসির শব্দটা ভেসে আসছিল এখান থেকেই। দরজাটা খুলে সুইচবোর্ড হাতড়ে আলোটা জ্বালাতেই শব্দটা আচমকা মিলিয়ে গেল। কিগান থমথমে মুখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ঘরের মাঝখানে রাখা একটা অয়েল পেইন্টিংয়ের দিকে। সেই ছবিতে একটা মেয়ে যেন মনে হচ্ছে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকেই। ছবিটা বড্ড জীবন্ত!

কিগান জানতো না একটা অয়েল পেইন্টিং ওর জীবনটা এইভাবে বদলে দিতে পারে। ছবিটা প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেছিল ওর তাই কিউরিও শপ থেকে কিনে এনেছিল ও অনেক কম দামে। ছোটবেলা থেকে পেইন্টিং ভালোবাসে কিগান, তাই ভেবেছিল এই ছবিটা রাখবে নিজের কালেকশনে। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু সমস্যাটা হল ছবিটা বাড়িতে আনবার পর থেকেই। প্রথম রাত্রিতেই বুঝতে পারল ওর ভুলটা। ছবিটা জীবন্ত হয়ে ওঠে রাত্রিবেলা। প্রতি রাত্রে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে এসে পৌঁছনো মাত্রই ঘুমটা ভেঙে যায় ওর। এরপর সেই হাসির শব্দটা অনুসরণ করে পৌঁছে যায় ও এই ছবিটার কাছে। তারপরেই আচমকাই থেমে যায় সেই হাসির শব্দ, শুধু জীবন্ত হয়ে থাকে ছবিটা।

একটা ছবি থেকে কী করে হাসার শব্দ আসা সম্ভব সেটা অনেক ভেবেও উত্তর পায়নি ও। কিছুদিন বাদে ছবিটা নিজের ঘরের থেকে সরিয়ে নিয়ে ও রেখে দেয় স্টোর রুমে কিন্তু তাতেও সমস্যার কোনো সমাধান হয় না । হাসির শব্দটা আর পেইন্টিংটা ধীরে ধীরে ওকে মানসিক অসুস্থ করে তোলে।

অনেকবার এই চিন্তাও মাথায় এসেছিল ওর এই ছবিটাকে ও কোথাও একটা ফেলে দিয়ে আসবে বা কাউকে দিয়ে দেবে কিন্তু চেয়েও যেন সেটা করতে পারে না ও। একটা অদৃশ্য কোনো শক্তি ওকে বাঁধা দেয় সেটা করার থেকে তবে কি সেই শক্তি চেয়েও বুঝে উঠতে পারে না কিগান!

ধীরে ধীরে এইভাবে একই ঘটনা ঘটতে থাকায় জীবনযাপন করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল কিগানের। যে কোনো প্রকারে এই পেইন্টিংটার থেকে ওর মুক্তি দরকার কিন্তু সেটা আসবে কি উপায় জানা নেই!

নাহ, শেষমেশ ছবিটাকে নষ্ট করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো কিগান। একমাত্র হয়তো তাতেই রয়েছে ওর মুক্তির উপায়। যেমন ভাবনা সেই মতো একদিন রাত্রে প্রস্তুত হয়ে ধীরে ধীরে কিগান ঢুকলো স্টোর রুমে। এরপর আলোটা জ্বালিয়ে ছবিটার দিকে তাকাতেই সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল ওর। ওর চোখের সামনে সেই ছবিটায় মেয়েটা আর নেই, তার বদলে অয়েল পেইন্টিংটায় জ্বলজ্বল করছে ওর নিজের প্রতিচ্ছবি। এ কি করে সম্ভব!

একটা হিমস্রোত বয়ে গেল ওর সারা শরীর দিয়ে । হঠাৎ আর কিছু ভেবে ওঠার আগেই আলোটা দপদপ করে উঠল ঘরের। সেই হাসির শব্দটা ভেসে এল কিগানের কানে!



মঞ্জুর

প্রতীক চক্রবর্ত্তী



অন্ধকারটা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। বটগাছের ঠিক পাশ থেকে এলোমেলো সিঁড়ি ভেঙে গঙ্গার দিকে নেমে আসছে সমীরণ। ঘন শ্যাওলার মতো এক টুকরো মেঘ এসে ঢেকে ফেলেছে চাঁদটাকে। বটের ঝুরির ফাঁক দিয়ে আসা ল্যাম্পপোস্টের ছেঁড়া আলোয় সমীরণের ভাবলেশহীন মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে ধপ করে বসে পড়ল ও।

বাগবাজার ঘাটে বড্ড ভিড়ভাট্টা। আজ ওর একটু একা থাকা প্রয়োজন। তাই বাগবাজার ঘাট থেকে কিছুটা এগিয়ে এই নির্জন ঘাটটায় আসা। যদিও বাড়িতেও ও সম্পূর্ণ একা। জীবনের একমাত্র সম্বল মা-কে একবছর আগেই হারিয়েছে অতিমারীর কোপে। এবার শেষ অবলম্বনটাও বোধহয় হারিয়ে যাবে ওর থেকে। তনিমার বাড়িতে নিত্যদিনের অশান্তি ওদের সম্পর্ক নিয়ে। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এম.এ করার সময় ওর চোখে অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু আজ এই লকডাউনের কালো ধোঁয়া ওর স্বপ্নের আলো পুরো গিলে নিয়েছে। পাশ করার পর থেকেই স্কুলে চাকরির কোনও নিয়োগ হয়নি। তাও ও দূর্বল হয়নি কখনও। ছোটখাটো অনুষ্ঠান, টুকটাক টিউশনের সাথে ও চালিয়ে গেছে কঠোর অনুশীলন। অভাবের সংসার হলেও ওই টেনেটুনে চালিয়ে গেছেন মা। কোনও অনুযোগ করেননি কখনও। আর তনিমা, সেও ওর প্রাণশক্তির আর এক অফুরান উৎস। দু-একটা ভালো কাজের খবর আসছিল, ঠিক তখনই এল লকডাউন্। একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় চলে গেল মা। অনেকটা সামলে উঠছিল ও তনিমার হাত ধরে। একটা গানের স্কুল থেকে ডাকও পেয়েছিল গান শেখানোর জন্য। তনিমাও বাড়িতে লড়াইয়ের একটা জায়গা পেয়েছিল। কিন্তু সব শেষ করে দিল দ্বিতীয় লকডাউনের একটা ছোট্ট ঘোষণা। গানের স্কুলে বসেই শুনল ও খবরটা। ডিরেক্টর বললেন, "বুঝলেন সমীরণবাবু, পরশু থেকেই তো লকডাউন্ শুরু হচ্ছে। স্কুল তো বন্ধ রাখতেই হবে। আপনিও ক-টা দিন ছুটি কাটান। একেই ছাত্র-ছাত্রী কম, লকডাউনের পরে কতজন আবার আসবে তার নেই ঠিক। আপাতত কিছুদিন বন্ধ থাক, তারপর আপনাকে যোগাযোগ করে নেব।"

চোখে যেন অন্ধকার দেখল ও। এবার! সবকিছু যেন মিথ্যে মনে হচ্ছে আজ। কাল রাতে তনিমা কান্নাভেজা গলায় বলেছে, "আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও সোম। আমি রোজকার এই অশান্তি আর নিতে পারছি না। তুমি যেটুকু রোজগার করছ, তা দিয়ে দুটো পেট ঠিক চলে যাবে। এখানে থাকলে আমি আর বাঁচব না।"

আর মাথার ঠিক রাখতে পারে না সমীরণ। তনিমাকেও কোন অন্ধকারের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও? উফ্ এজন্যই কোভিড তাকে নিল না! হে ভগবান মুক্তি দাও! এই জীবনে নিঃশ্বাসটাও বিষ মনে হচ্ছে। মৃত্যুকেই বড় আপন লাগছে আজ। চোখ বন্ধ করেই দরাজ গলায় সমীরণ গেয়ে ওঠে,

'ফুলের বাহার নাইকো যাহার,
ফসল যাহার ফলল না,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো
সাঁঝের আলো জ্বললো না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন শেষের শেষ খেয়ায়।'

দলা পাকানো কান্না এসে শেষ লাইনটা আর গাইতে দিল না ওকে। হঠাৎ নদীতে একটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ও চমকে উঠে সামনে তাকাল। এর মধ্যে কখন একটা নৌকা এসে দাঁড়িয়েছে পাড়ের কাছে। "কি বাবু যাবেন নাকি? একটু ঘুরিয়ে আনবো!" একটা ফ্যাঁসফ্যাসে আওয়াজ ভেসে এল নৌকা থেকে। সমীরণ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না না। আমি কোথাও যাবো না গো। তুমি যাও।" যদিও ওর আজ সত্যিই একটু নদীর বুকে ভাসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পকেট তো গড়ের মাঠ। আজ যেটুকু

আছে কাল তাও থাকবে না।

"টাকার চিন্তা করবেন না বাবু। আমার আজকের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আপনি বসে আছেন তাই বললাম। খুশি হয়ে যা দেবেন, তাতেই হবে। আসুন।" আবার সেই শীতল কণ্ঠস্বর। পকেটে হাত দিয়ে দেখল সমীরণ, দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট তখনও অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। আর কিছু না ভেবে নৌকায় উঠে পড়ল ও। ঘাট ছেড়ে নৌকা এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ একরাশ নিস্তব্ধতা। তারপর সমীরণ জিজ্ঞাসা করল, "এই ঘাটে তো কেউ থাকে না। তুমি হঠাৎ এখানে এলে?"

"আপনি ডাকলেন যে!", অপ্রত্যাশিত উত্তরে চমকে উঠল ও।

"আমি! কখন ডাকলাম।"

"ডেকেছেন। অবশ্য সবার ডাকে সাড়া দিই না। তবে ওপার থেকে কখন কার ডাক মঞ্জুর হয়ে যায় কে বলতে পারে!" এবার ভয় পেয়ে যায় সমীরণ। এরকম শীতল আওয়াজ কখনো শোনেনি ও। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল ঘাট, আলো কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। অকূল দরিয়ার সত্যিই কোন কূল নেই। এ কোন পথে ভেসে চলেছে ও! হঠাৎ খুব শীত করতে লাগল ওর।

"এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়! শিগগিরই পাড়ে ফেরাও।", চিৎকার করে বলল ও।

"এপথে এলে আর তো ফেরা যায় না! খালি হাতে ফেরার উপায় যে আমার নেই!"

আর কিছু না ভেবে মাঝ নদীতেই ঝাঁপ দিতে গেল সমীরণ। কিন্তু একটা হাত ওর হাতের কব্জিটা শক্ত করে ধরে ফেলল। একটা মানুষের হাত কীভাবে এত ঠান্ডা হতে পারে! আর এত শক্ত, যেন মাংসের লেশমাত্র নেই। একবার ভয়ে ভয়ে ঘুরে তাকাল ও। মেঘ সরে যাওয়া চাঁদের আলোয় ও শুধু দুটো মণিবিহীন অথচ উজ্জ্বল চোখ দেখতে পেল।

ধড়ফড় করে উঠে বসল সমীরণ। ওহ! গঙ্গার ঠান্ডা হাওয়ায় কখন চোখ লেগে গেছিল। নাঃ এবার ওঠা যাক। উফ্ বাঁ হাতের কব্জিটায় এত ব্যথা কী করে হল! হঠাৎ কানের পাশে একটা চেনা অথচ শীতল আওয়াজ যেন বাতাসে বয়ে গেল, "আবেদন মঞ্জুর হলে আর তো ফেরার উপায় নেই বাবু!"

এবার আর কিছু না ভেবে দৌড় লাগাল সমীরণ। না না! ফিরতে ওকে হবেই। ওকে বাঁচতে হবে, অনেক কিছু করা বাকি। ঘাট থেকে উঠেই বড় রাস্তার দিকে প্রাণপণে ছুটে চলল ও। হঠাৎ একটা জোরালো আলো আর বিকট কান ফাটানো আওয়াজ। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

জ্ঞান যখন ফিরল ও রাস্তার এক ধারে পড়ে আছে। হঠাৎ একটা কালো অ্যাম্বাসেডর ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। কেমন যেন এক অমোঘ আকর্ষণ ওকে বাধ্য করল গাড়িটাতে উঠে পড়তে। বিনা বাক্য ব্যয় এই গাড়ি চলতে শুরু করল। সমীরণের হতভম্ব ভাব কাটেনি এখনও। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে ও দেখল কোনও এক অজানা রাস্তায় ওকে নিয়ে ছুটে চলেছে গাড়িটা। এ অঞ্চলের অলিগলি ওর চেনা। কিন্তু এই রাস্তায় ও কখনও আসেনি।

"দাঁড়াও। এ কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ? এখুনি গাড়ি দাঁড় করাও বলছি!" একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা থেমে গেল। ড্রাইভার আস্তে আস্তে মুখ ঘোরালো। সেই চোখ! সেই মণিবিহীন শীতল চাউনি! উফ্! ভয়ে অস্বস্তিতে নিজের চোখ বন্ধ করে নিল সমীরণ। আবার সেই ঠান্ডা গলা, "দরখাস্ত করার আগে ভাবনা-চিন্তা করতে হয়। একবার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেলে ভয় পাওয়া বৃথা। এবার নেমে পড়ুন।" তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সমীরণ। এ কোন্ জায়গা! ঠান্ডায় কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। কেমন জমাট বাঁধা অন্ধকার, অথচ পরিষ্কার সব দেখতে পাচ্ছে ও। পথে অনেক লোক, কিন্তু সবাই কেমন নির্লিপ্ত, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"এ কোথায় নামালেন আমাকে! আমি বাড়ি যেতে চাই!", কাতরভাবে বলে উঠল সমীরণ।

"আপনার তো কোনো বাড়ি নেই! আপনার না আছে ঘর, না আছে পাড়। এখন এখানেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না ওপার থেকে ডাক আসে। এপার থেকে ওপারে যাওয়ার রাস্তা এত সরল নয়।", এটুকু বলেই সমীরণকে ফেলে গাড়িটা হুশ করে কিছুটা এগিয়েই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ওদিকে বাগবাজার মোড় পুলিশে ছয়লাপ। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে যাওয়া একটা দেহ থেকে ওঁরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন কোনও পরিচয়পত্র।



ওরা

অহিন রায়



জানি না আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবো, তবে নিশ্চিতরূপে জানি যে আমাদের সবাইকেই মরতে হবে। সব্বাইকেই। ওরা কাউকে ছাড়বে না।

ধাতব বিশালাকার ঘরটাতে বন্দি হয়ে রয়েছি। আমার মতোই আরও অনেক কিশোরী বসে রয়েছে ঘরটাতে। আশেপাশের সকলেই অপরিচিত, কিন্তু সকলেরই চোখেমুখে স্পষ্ট উদ্বেগ এবং আতঙ্কটা অত্যন্ত পরিচিত।

পালাবার কোনো পথই নেই। ওরা আমাদের তুলনায় শক্তি আর বুদ্ধিতে বহুগুন এগিয়ে। আর হিংস্রতায় ওদের জুড়ি মেলা ভার। মায়ের মুখে শুনেছিলাম যে আগে নাকি এরকমটা ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ওদের সাময়িক মোকাবিলা করতে পারলেও সে যুদ্ধ ছিল ক্ষণিকের। সময়ের সাথে সাথে ওরা হয়ে উঠেছে হিংস্র থেকে হিংস্রতর থেকে হিংস্রতম।

আগে খুব কষ্ট হতো আপন কাউকে ওদের কারণে হারালে। কিন্তু যেদিন মাকে ওদের হাতে ছিন্নভিন্ন হতে দেখলাম, হারানোর ভয়টাও যেন কোথায় হারিয়ে গেল। এখন আর রাগ কষ্ট কিচ্ছু হয় না, সব শয়ে গেছে।

ভেবেছিলাম নিজের বেলাতেও কোনোরকম কষ্ট হবে না, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে স্বার্থপরতার দাঁড়িপাল্লায় আমরা সকলেই সমান ভারী।

'ঠং'- শব্দে দরজাটা খুলে গেল, আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল ওদের কেউ। তার প্রচণ্ড চিৎকার আমাদেরকে যেন অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মৃত্যুর আরও কাছে পৌঁছে দিলো। কয়েক মুহূর্তে সেই চিৎকার বদলে গেল কানফাটা আর্তনাদে। এরই সাথে আমাদের কানে ভেসে এল ওদের ভয়ঙ্কর গর্জন। রক্তহিম করা সেই তীব্র কর্কশ শব্দে ক্রমশ আমরা হারাতে শুরু করেছি আমাদের চেতনা।

আবার একটা - 'ঠং'- শব্দ হওয়ার পরক্ষনেই আমার শরীরটা হঠাৎ যেন আগের চেয়ে অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইলো না কি হতে চলেছে। আমার ডানহাতটা খামচে ধরেছে ওদের একজন। প্রাণপণ চিৎকার করছি আমি। এ চিৎকার গলা থেকে নয়, বেরোচ্ছে আমার প্রাণ থেকে। কিন্তু এও মনে হচ্ছে যেন চারিদিকে সব শান্ত। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, চারিদিকটা যেন গাঢ় শব্দশোষি তরলে ডুবে আছে।

বাইরেটা কিলবিল করছে ওদের ভিড়ে। রক্তপিপাসু জ্বলজ্বলে দানবিক চোখের লোলুপ চাহনি। হাত তুলে হুঙ্কার দিচ্ছে। এমনই পৈশাচিক ক্ষুধা যেন গিলে ফেলবে অনন্ত সময়কালকেও।

শেষমেশ শেষ সময়টার একেবারে মুখোমুখি আমি। শরীর অবসন্ন। সংকট দেখে আগেভাগেই কেটে পড়তে শুরু করেছে আমার মতোই স্বার্থপর আমার ইন্দ্রিয়গুলি।

"কত করে?"

"দুশো দাদা। কত দেবো?"

"আ... পাঁচশো দিয়ে দাও। ছোট ছোট পিস করে দেবে, চিলি চিকেন হবে।"

"আচ্ছা দাদা। এ ছোট্টু একটা বের কর।"

আরেকটি প্রাণীকে বের করে আনা হল। তারও মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে সেই এক "কক্-কক্" প্রাণভিক্ষা।



হন্টেড

সৌমেন ঠাকুর



গাড়ি থেকে নামতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল অরিন্দমের। কি ব্যাপার! গাড়ি চালিয়ে সে কি তবে ভুল করে অন্য কোথাও চলে এসেছে! কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব! ঐতো চৌরাস্তার মোড়ে ঘোড়ার পিঠে বসা নেতাজীর মূর্তি, রাস্তার ওপাশে নেতাজী মার্কেট... একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে নেয় সে।

গত পাঁচবছর ধরে প্রতিদিন নিজেই গাড়ি চালিয়ে এই ''সরোজিনী মেমোরিয়াল হাসপাতালে'' আসা যাওয়া করছে অরিন্দম। সে এই হাসপাতালের নামকরা কার্ডিওলজিস্ট। অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালের বদলে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার মতো ভুল সে করতেই পারে না!

কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে সামনে এসব কি? সকালে ডিউটি শেষে যে ঝা চকচকে হাসপাতাল থেকে সে বাড়ি গিয়েছিল তা একবেলার মধ্যে এরকম ধ্বংসস্তূপে পরিনতহল কীভাবে? এ যে অবিশ্বাস্য! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনা অরিন্দম।

দু-চোখ মুছে আরেকবার সামনে তাকায় সে...

নাহ! সেই একই দৃশ্য। আলো ঝলমলে হাসপাতালের জায়গায় বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে এক ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপ। হাসপাতাল করিডোরে যেখানে সারি সারি গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকতো সেখানে এলমেলো ভাবে গজিয়ে উঠেছে কিছু অবাঞ্ছিত আগাছা।

''কে আপনি? এখানে কেন এসেছেন?''

পিছন ফিরে তাকায় অরিন্দম। সন্ধ্যের ঘোলাটে অন্ধকারে সে দেখে সিকিউরিটি গার্ডের পোশাক পরে একজন লোক দাঁড়িয়ে; তার ঠিক পিছনে। লোকটা যে কখন এসেছে তা অরিন্দম টের পায়নি। ওকে হাসপাতাল চত্বরে কোনোদিন দেখেছে বলেও সে মনে করতে পারল না।

''কে আপনি?'' লোকটা আবার প্রশ্ন করে।

''আমি ডক্টর বোস! কার্ডিওলজিস্ট।'' অরিন্দম সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। লোকটা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অরিন্দম তাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে একরাশ কৌতূহল, উদ্বেগ আর একটা অজানা আশঙ্কা বুকে নিয়ে হাসপাতাল ভবনের দিকে এগিয়ে যায়।

ধুলো মাখা কাঁচের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই অরিন্দম কিছুটা হকচকিয়ে যায়। বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর সে ভেবেছিল হয়তো ভেতরে আরো বিভৎস, আরো ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার সাক্ষী সে হতে চলেছে কিন্তু এখন প্রতিদিনের সেই পরিচিতি দৃশ্যটা দেখে কিছুটা স্বস্তি পায়।

''গুড ইভিনিং স্যার! গতকালের সার্জারির পর প্রতীভাদেবী এখন ভালো আছেন। দুপুরে স্যুপ খেয়েছেন! আপনি কি ওনাকে এখন দেখতে যাবেন? আর হ্যাঁ আরেকটা কথা, মিস্টার আগরওয়ালার ছেলে আপনার সাথে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওনাকে তো কালকেই ছেড়ে দেওয়া হবে।'' লিলি একটানা কথাগুলো বলে যায়।

''হুঁ, আগে মিস্টার আগরওয়ালার ছেলের সাথে কথা বলি...'' লিলি নিঃশব্দে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

টেবিলে রাখা জলের গ্লাস থেকে কিছুটা জল খায় অরিন্দম। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। তবে কি পুরোটাই হ্যালুসিনেশন? এছাড়া আর কিইবা হতে পারে? কিন্তু...

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। শব্দের উৎস অনুসরণ করে দ্রুত কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে চারপাশে হুড়োহুড়ি... আর্তনাদ... গুলির শব্দ! পুরো বিষয়টা বুঝে ওঠার আগেই একটা গুলি এসে লাগে অরিন্দমের বুকে। এই তীব্র যন্ত্রণার সাথে সে অনুভব করে উষ্ণ রক্তে তার শরীর ভিজে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে দু-চোখে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসতে লাগে।

চোখের সামনে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসার আগে অরিন্দম দেখতে পায় তার চারপাশের লোকজন, আর্তনাদ, গুলির শব্দ সব মিলিয়ে যাচ্ছে... সে তার চেনা হাসপাতালের বদলে এখন একটা অন্ধকার দুর্গন্ধে ভরা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সে আরও দেখে বাইরের সেই সিকিউরিটি গার্ড লোকটা তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছে, "আপনাকে না ভেতরে আসতে বারণ করলাম। জায়গাটা হন্টেড! দু-বছর আগে শহরে টেররিস্ট অ্যাটাকের সময় ওরা এই হসপিটালটাকেও অ্যাটাক করেছিল। ডাক্তার-পেসেন্ট সবাই মারা গিয়েছিল সেদিন। তারপর থেকেই... সেসব কথা কিছুই কি জানেন না নাকি?... এই যে শুনছেন... শুনছেন আমার কথা...।"



ক্যানভাস

পল্লব বসু



(১)

বেয়ারার বেলের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখে এসে লাগল রোদের ঝাপটা। বড্ড দেরি হয়ে গেছে ঘুম ভাঙতে। দরজা খুলে দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। কানছা এখানকার পুরানো বেয়ারা। বছর দুয়েক আগে যখন বন্ধুদের সাথে এখানে এসেছিলাম, তখনও ও ছিল। ব্রাশ করতে করতে ডিশ ভাঙার শব্দ পেলাম।

ঘরে এসে দেখি, প্রায় অর্ধরাত্রি ধরে আঁকা ছবিটার দিকে কানছা বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে, সামনে চায়ের পটটা ভেঙে চুরমার। আমাকে দেখে সসব্যস্তে ভাঙা টুকরো কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগল। চা গড়িয়ে টেবিলের তলায় যাচ্ছে, দুইবার চোখ কচলালাম আমি, টকটকে লাল রক্তের রঙের চা, দার্জিলিং এর কোন চা'পাতার এইরকম লিকার হয়?

কানছা কে কথাটা বলতে ও আরও অবাক হয়ে আমাকে দেখতে দেখতে দ্রুত মেঝের চা মুছতে লাগল, "কী বলছেন বাবু, গাঢ় সোনালি রঙে আপনি লাল পাচ্ছেন কোথায়?"

(২)

গতকাল রাত্রে বহু চেষ্টা করেও ক্যানভাসে সুষমার মুখটা আনতে পারিনি। কেবল মনে হচ্ছিল নিজের হাতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণই আমার নেই, ব্রাশ তার নিজের খেয়ালে আঁচড় কাটছে। এমনকি চোখের মণি বহু রং বুলিয়েও কালো হল না, নীলচে ধূসর হয়ে থাকল। মাথায় একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিল, চেপে বসে থাকতে থাকতে মনে হল, এই চোখদুটো আমি আগেও দেখেছি।

এই পোর্ট্রেট জঙ্গলে ফেলে যেতে হবে, নচেৎ সুষমা দেখলে ভুল বুঝবে। ক্যানভাস বগলে নিয়ে জঙ্গলের পথে পা বাড়ালাম। রিসোর্টের এই রুমটায় ক্রমাগত মনে হয় কিছু একটা আছে। কেউ যেন কেবলই নজর রেখে চলেছে। বাইরে থাকলে কিছু না, কিন্তু ঘরে ঢুকলেই শরীর ভারী হয়ে আসে।

(৩)

আঁকার জন্য জঙ্গল আমার প্রিয় বিষয়। তাই মাঝে মধ্যেই এইরকম জায়গায় চলে আসি। দ্বিতীয় ছবিটা শেষ করতে সন্ধ্যা নেমে এল। ক্যানভাস সরঞ্জাম গুছিয়ে উঠেছি, জান্তব আওয়াজটা ঠিক পিছন থেকে এল। মাথা ঘোরাতেই একটা শীতল স্রোত

নামল শিরদাঁড়ায়। এত কাছ থেকে ভালুক তাও চিড়িয়াখানার ঘেরাটোপের বাইরে, এই প্রথমবার দেখলাম। ওর হাতে একটা মোটা গাছের ডাল, আমার একদম কাছে চলে এসেছে। আতঙ্কে চোখ প্রায় বুজে এসেছে, উপর থেকে অনেকটা তরল কিছু আমার আর ভালুকটার মাথায় গায়ে পড়ল এসে। চুলের থেকে চিটচিটে জিনিসটা হাতে নিয়ে মোবাইলের আলো ফেললাম, লাল রং আর আঁশটে গন্ধে হঠাৎ ভারী হয়ে এল শরীর। ভালুকটা উপরের দিকে কয়েকবার চেয়ে একটা বিকট আওয়াজ করে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

(৪)

"আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, আপনার শরীরে রক্তের কোন চিহ্ন নেই", থানার অফিসার আমায় প্রায় পাগল ঠাউরে মন্তব্য করলেন।

"এইরকম অদ্ভুত জিনিসই ঘটছে আমার সঙ্গে। রিসোর্টের ওই ঘরটায় কিছু আছে আমি নিশ্চিত। আমি চিত্রশিল্পী, রঙের তারতম্য কখনও চোখ এড়ায় না। রুম ৩ এর পশ্চিমের দেয়ালের একটা আয়তাকার অংশের রং বাকি অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নতুন, পুরো মিশ খায়নি। মাপ ঝোঁক আমার ভুল হয় না, বাকি দেওয়ালগুলোর ডেপথ পাঁচ ইঞ্চির হলেও ওই দেয়ালটা চওড়ায় অন্যগুলোর চেয়ে বেশি। তাছাড়া কি অসম্ভব ঠান্ডা ওই আয়তাকার জায়গাটা... ক্যানভাসের এই মেয়েটাকে চেনেন আপনারা কেউ? ", জঙ্গলে ক্যানভাসটা ফেলতে গিয়েও আর ফেলে আসা হয়নি আমার ভাগ্যিস।

পরিশিষ্ট

ধর্ষণ, খুন, তারপর নিরুদ্দেশ, আসলে সংগীতাকে রাতারাতি রুম ৩ এর দেয়ালে গেঁথে সিমেন্ট করে রং করে দেওয়া হল। আগেরবার রিসোর্টে এসে এক দুইবার আমি অর্থাৎ সমীর ওকে দেখেছিলাম, তাই বড্ড চেনা লেগেছিল ছবির নীলচে চোখদুটো। রিসোর্টের মালিকের ছেলের কাণ্ড ধামাচাপা পড়ে যায়, নিরুদ্দেশের ফাইল পুনরায় ধুলো ঝেড়ে বার করা হয় না..., যদি, ভালুকের ছদ্মবেশে কানছা আমায় খুন-টা করতে পারত...



জবানবন্দি

অনিরুদ্ধ দে



উত্তরবঙ্গের কোন এক অখ্যাত জায়গায় গভীর জঙ্গলের ভিতর নদীর ধারের এই বাংলোটিই এখন আমার আস্তানা। এক সন্ধ্যেবেলা বাংলোর বারান্দায় অলসভাবে বসে আছি। ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যায় সামনে কুয়াশার চাদরে মোড়া অমাবস্যার জঙ্গল না জানি কোন এক অব্যক্ত রহস্য নিজের বুকে জড়িয়ে রেখেছে সযত্নে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সুস্পষ্টভাবে কানে আসছে নদীর জলের আওয়াজ, বাংলোর অনতিদূরেই এক সুগভীর খাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা তীব্র খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর তীক্ষ্ম শব্দ সেই অমাবস্যার রাতে নিস্তব্ধ বনভূমির ভয়াবহ পরিবেশের রহস্যময়তা যেন বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল।

সেই বিকেল থেকেই বাংলোর কারেন্ট অফ। এই গভীর অরণ্যসংকুল এলাকায় লোডশেডিংটা অবশ্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সন্ধ্যের চায়ের পর্ব সেরে বারান্দার আরামকেদারায় শালমুড়ি দিয়ে একটা রহস্য গল্পের বই হাতে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছি আমি, সামনের টেবিলটায় টিমটিম করে জ্বলছে একটা কেরোসিন ল্যাম্প।

পড়তে পড়তে না জানি কতক্ষণ কেটে গেছে, এমনসময় হঠাৎ করে সামনের জঙ্গলের শুকনো পাতায় কারোর পায়ের অস্পষ্ট, ক্ষীণ খসখস শব্দ। কেউ সন্তর্পনে যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে এদিকে। কিন্তু রঘু তো রাতের খাবার রান্না করে দিয়ে অনেকক্ষণ আগেই বাড়ি ফিরে গেছে। তাহলে এই অসময়ে কার পায়ের শব্দ, কে এইভাবে এগিয়ে আসছে এদিকে?

"কে, কে আছে ওখানে?" সভয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

"কিরে, এখনও বুঝতে পারলি না কে আমি? এভাবে কে এসে দাঁড়ায় তোর দরজার সামনে?"

"ওঃ তুই, তাই বল। আমিও তোরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। মন বলছিল, তুই আমার খোঁজে এখানে ঠিক আসবি।"

অনেক কষ্ট করে তোর এই ঠিকানার খোঁজ পেতে হয়েছে। প্রথমেই গিয়েছিলাম তোর স্যাঙ্গাৎ পল্টনের কাছে। কিন্তু তুই তো তাকেও ফাঁকি দিয়েছিস। অবশেষে তোর গুরু জনিদাকেই বাগে এনে তোর ঠিকানার খোঁজ পেলাম।

"আয় বোস এখানে", সামনের চেয়ারটার দিকে ইশারা করি আমি।

"বেশ তো বাগিয়েছিস এই লুকিয়ে থাকার আস্তানা। তবে তোর কি মনে হয় সন্দীপন, এভাবে আত্মগোপন করে থেকে তুই কী শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবি?"

"নাঃ, এই কয়েকদিনে আমি খুব ভালোভাবেই বুঝেছি যে আমার নিস্তার নেই, মৃত্যু আমাকে ঠিক খুঁজে নেবেই।"

"কেন এসব করতে গেলি তুই? বহাল তবিয়তেই তো ছিলি, কোনোকিছুরই তো অভাব ছিল না তোর। তাহলে শেষপর্যন্ত এটা করার কি দরকার ছিল?"

"জানতে চাস, তুই জানতে চাস আমার এসব করার কারণ? চোখের সামনে একজনের কাছে নিজেকে বারবার হারতে দেখে কেমন লাগে, সেটা জানিস তুই?"

"কি বলছিস এসব কথা? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোর?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলছি", এক অসহায় রাগে চিৎকার করে উঠি আমি। "সেই কোন ছোটবেলায় স্কুলের পরীক্ষার থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওই একটা মানুষের কাছে আমাকে বারংবার পরাস্ত হতে হয়েছে। এমনকি কলেজ জীবনে আমার পছন্দের মেয়েটিকেও বিয়ের পিঁড়িতে ওই মানুষটার স্ত্রী হিসেবে দেখতে হয়েছে আমাকে।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে সামনের টেবিলে রাখা বোতলটা থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে ধীরে ধীরে আবার শুরু করি আমার কথা।

"এরপরও ভাগ্যের পরিহাসে আমরা দুজনেই একই সংস্থার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে কাজে বহাল হলাম। কিন্তু এখানেও আমি ক্রমাগত পিছোতেই থাকলাম ওর থেকে। একই সময় একই পদে দুজনে বহাল হলেও একসময় আমার থেকে অনেক উঁচু পদে বহাল হয় সে। এই সময়েই আমার জীবনে দেবদূতের মতো আসে জনিদা। বিভিন্ন সময় নানান অছিলায় শ্রমিক আন্দোলনের ফিকিরে মালিকপক্ষের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতানোর এই পরিকল্পনায় জনিদাকে সাহায্য করে করে ধীরে ধীরে দিন ফিরছিল আমারও। কিন্তু এবারেও দিব্যেন্দুকে ফাঁকি দিতে পারলাম না আমি। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা সে জেনে ফেলায় দিশেহারা হয়ে পড়ি আমি। শেষে জনিদার পরিকল্পনায় রাতের আঁধারে এক অন্ধকার গলিতে আমি আর পল্টন মিলে শেষ করি আমার চিরশত্রুকে।"

"তাহলে পথের কাঁটা সরে যাওয়া সত্ত্বেও আজ তোর এই অবস্থা কেন? কেন সবকিছু ছেড়ে এইরকম পান্ডববর্জিত এলাকায় পড়ে আছিস এইভাবে?"

"কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, দিব্যেন্দু আমাকে ছেড়ে যায়নি। আমি অনুভব করেছি যে সবসময় আমার উপর নজর রেখে চলেছে একজোড়া অদৃশ্য চোখ। যে কোনো মুহূর্তেই মহাকালের খাঁড়ার মতো আমার উপর নেমে আসতে পারে সেই চরম শাস্তি। সেই কারণেই সবকিছু ছেড়েছুড়ে জনিদার ঠিক করে দেওয়া এই গোপন ডেরায় এসে উঠেছিলাম নিজেকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু হায়, এতকিছু করেও শেষরক্ষা করতে পারলাম না আমি।"

"তাহলে চল এবার, জনিদা আর পল্টন তোর জন্য নিচে অপেক্ষা করছে।"

একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে নদীখাতের দিকে এগিয়ে চলে দুই বন্ধু, সন্দীপন ও দিব্যেন্দু।



প্রতিশোধ

সহেলি হাজরা



সকাল থেকে রাত্রি অবধি মুখার্জি বাড়িতে আজ শুধুই খুশির আমেজ। মঞ্জরী আর রোহিতের পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনের এই বিশেষ দিনে কোনো আনন্দের ত্রুটি রাখতে চায় না পরিবারের কেউই। এত বছরের অপেক্ষা শেষে আজ তাদের ঘরে ছোট্ট গোপালের আবির্ভাব হয়েছে। নার্সিংহোম থেকে ছুটি পাওয়ার পর বাড়িতে এসে নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে একমুহূর্তের জন্যও চোখছাড়া করতে ইচ্ছে করছেনা মঞ্জরীর। প্রত্যুষের ছোটো ছোটো নরম আঙুলগুলোকে স্পর্শ করে তার মাতৃ-মন আবেগে, আনন্দে কেঁপে উঠল।

রাত এগারোটা বাজে। পিঠে আলতো চাপড় মেরে ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর পর নিজেও ধীরে ধীরে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে লাগল মঞ্জরী। রোহিতের আজ আসতে দেরি হবে একটু। সারাদিনের ধকল শেষের ক্লান্তিতে চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে সবে, ঠিক এমন সময় একটা হালকা পায়ের শব্দে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকাল মঞ্জরী। ঘরের আবছা আলো আঁধারিতে সে আতঙ্কিত হয়ে দেখল একটা অস্পষ্ট বাচ্চার মতো দেখতে ছায়ামূর্তি টলোমলো পায়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে ক্রমশ। বড়ো বীভৎস সেই ছায়ামূর্তি! তার দুচোখে মণির বদলে, একরাশ কালো ধোঁয়া যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। রক্তাক্ত মুখে শিশুর নিষ্পাপ হাসির পরিবর্তে একটা হিংস্র কুটিল বাঁকা হাসি! ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করতে গেল মঞ্জরী, কিন্তু কোনো লাভ হলনা। শিশুর সেই ভয়ানক মূর্তি ধীরে ধীরে মঞ্জরীর পা বেয়ে মাকড়সার মতো কিলবিল করতে করতে উপরের দিকে উঠতে লাগল। গলার কাছে অবধি পৌঁছে সে দাঁতহীন মুখে হাসতে হাসতে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে চেপে বসল সেখানে। প্রবল চাপে মঞ্জরীর দম বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ। কালো জমাট বাঁধা চোখের ভেতর এক প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল ধক্ করে। নিজের কঠোর শীতল হাতের স্পর্শ মঞ্জরীর মুখের উপর বুলিয়ে সেই ছায়ামূর্তি তার কানের সামনে ফিসফিস করে বলল, "আমাকেও ভাইয়ের মতো আদর করবে না মা?"

জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পরার আগের মুহূর্তে মঞ্জরীর চোখের সামনে ভেসে উঠল বছর ছয়েক আগের এক গোপন, কালো অতীতের কথা। অল্প বয়সের কিছু সীমাহীন উদ্দামতার শেষে যখন অবিবাহিত অবস্থায় নিজের গর্ভাবস্থার কথা জানতে পেরেছিল মঞ্জরী, তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল তার। তখনের প্রেমিক তথা সেই সন্তানের বাবা ময়ূখের সাথে বিচ্ছেদের পর বিত্তশালী মুখার্জি পরিবারের একমাত্র ছেলে রোহিতের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে সেই মুহূর্তে। কিন্তু শারীরিক জটিলতার কারণে গর্ভপাতেরও কোনো সুযোগ ছিল না। ময়ূখের এই সন্তানের স্বীকৃতিদানে আপত্তি না থাকলেও, আপত্তি করেছিল মঞ্জরী স্বয়ং। লোকলজ্জার ভয়ে, শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে কয়েকমাসের জন্য নিজেকে সবার থেকে লুকিয়ে বহুদূরে আশ্রয় নিয়েছিল সে এবং মাসখানেকের ব্যবধানেই একটা ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় মঞ্জরী। আর জন্মের পরই সমস্ত পথের কাঁটা দূর করতে নিজের হাতে নিজের সন্তানকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল সে। কেউ জানতে পারেনি সেই হতভাগ্যের কথা। পাঁচ বছর ধরে মাটির তলায় কেবল আজকের দিনের জন্যই বোধহয় অপেক্ষা করছিল তার সদ্যোজাত সন্তানের মৃত আত্মা।

হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মঞ্জরীর শীতল দেহটা বিছানায় স্থির হয়ে পড়ে রইল। অতীতের পাপের বোঝায় জর্জরিত তার মৃত চোখদুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত অবস্থায় উপরের দিকে চেয়ে রইল। পাশে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত শিশুর দিকে মায়াময় চোখে তাকিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল কালচে ছায়ামূর্তিটা। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত সে কিছুতেই সন্তানসুখ পেতে দেয়নি এক নিষ্ঠুর খুনীকে...



সংস্কার

সঙ্গিতা আইচ

মিস্টার সুরেশ আইয়ার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সিনিয়র অফিসার হিসাবে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্যালেসে এসেছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে হিস্টোরিক প্রিজারভেশনের জন্য পাঠানো হয়েছে। ২২০ ফুট উঁচু ইতালিয়ান এবং গ্রিক স্থাপত্যের গড়া প্যালেসের দিকে তাকিয়ে তার চোখে নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল। আর কিছু সময়ের অপেক্ষা। তারপরই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে মিশে যাবে এই প্যালেস। চেকিং ছাড়াই আইয়ার সংশ্লিষ্ট অফিসারদের একটি ছোট টিম নিয়ে ঢুকে পড়লেন প্যালেসে। প্রথম ধাপ পেরোনো গেল। এখন শুধু ভালো করে সার্ভে করার বাহানায় টিম থেকে একটু দূরে সরে আসতে হবে তাঁকে। একটু ফাঁকা জায়গা পেলেই বড় বোতামের মতো দেখতে দূরনিয়ন্ত্রিত বস্তুটা কোথাও রেখে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের অফিসার, তার এই পরিচয়টাই সবাই জানে। কেউ জানে না ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিস্ট গ্রুপ আল হামাদ-এর সঙ্গে তার যোগসাজশের কথা। সমস্ত চেকিং পেরিয়ে তিনি ছাড়া আর কারোর পক্ষে অসম্ভব এই মেশিন ভিতরে আনা। সাধে কি তার সুইসব্যাংক একাউন্টে কুড়ি বিলিয়ন ডলার জমা করেছে ওরা এই কাজের বিনিময়ে?

সার্ভে করার বাহানায় বেশ খানিকক্ষণ এদিক সেদিক ঘোরার পর সহজে চোখে পড়বে না এমন একটা নিরিবিলি জায়গায় মেশিনটা রেখে পিছন ঘুরতে যাবেন, এমন সময়ে কানের পাশে একরাশ হিমেল হাওয়ার সঙ্গে হাড় হিম করা গলায় কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল, ''মী–র–জা–ফ–র। তুমি সেই একই আছো। দুই শতাব্দীর বেশি অতিক্রান্ত। কিন্তু তুমি একফোঁটাও বদলাওনি। আগের দুই জন্মেও তুমি শুধুই অন্যের বিশ্বাসকে খুন করে গেছো। আর এই জন্মে আবার এসেছো মাতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে? যুগ পাল্টায়, সময়, দেহ এমনকি ধর্মও পাল্টে যায়। কিন্তু সংস্কার? সংস্কার পাল্টানো মনে হয় সবথেকে কঠিন। কোনো অতলান্ত অন্ধকার জগৎ থেকে ভয়ংকর নিষ্ঠুর চাপা হাসির সাথে ভেসে এল কথাগুলো। হাসির শব্দে আইয়ারের শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। সে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে অন্তত একজন মানুষের সন্ধান করল। লাভ নেই মীরজাফর। আমি এখন কাউকে আসতে দেবো না এখানে। অনেক হিসাব বাকি আছে তোমার সঙ্গে। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা না করলে সেদিন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজরা কিছুতেই আমার সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারতো না। আর এতটাও সহজ হতো না তাদের বাংলা এবং ভারতবর্ষ দখল। ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখিত হত তোমার বিশ্বাসঘাতকতা না থাকলে। এত করেও কি থামলে? রাতের অন্ধকারে আমাকে বন্দি বানিয়ে নিয়ে এলে। প্রাণভিক্ষা করে সেদিন তোমার সামনে ঠকঠক করে কেঁপেছিলাম। করেছিলে সেদিন একটু দয়া? নির্মমভাবে দুটি তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করলে আমাকে। আমার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শরীরটা হাতির পিঠে চাপিয়ে আমারই রাজধানীর অলিতে-গলিতে ঘোরালে।" বরফ ঠান্ডা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

''কিন্তু নবাব আমি না। মীরান, আমার বড় ছেলে মীরান সেদিন আপনাকে ঐরকম নির্মমভাবে মেরেছিল।", ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে আইয়ার।

''হ্যাঁ সামনে মীরান, কিন্তু পেছনে তুমিই ছিলে। সেদিন আমি পারিনি বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে। কিন্তু আজ পারব। রক্ষা করবো এই প্যালেসকে। হয়তো এই দিনটার জন্যই সর্বশক্তিমান এখনো আমাকে এখানে রেখে দিয়েছেন। আজ তোমাকে এই তসবির এর মধ্যে কয়েদ করে রাখবো কয়েক হাজার বছরের জন্য। যতদিন না এই তসবির ধ্বংস হয় বন্দি থাকবে।" রাগে যেন কাঁপছে সেই কণ্ঠস্বর।

একি! ছবি থেকে একটি বিশাল আকৃতির রাজকীয় হাত বেরিয়ে খামচে ধরল আইয়ারে পুরো শরীর।

না–আ–আ–আ... গলা চিরে চিৎকার করতে চাইল আইয়ার। কোনও শব্দ বেরলো না। ছবির মধ্যে মিলিয়ে যেতে যেতে আইয়ার দেখল কোন মন্ত্রবলে তার রাখা মেশিনটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল।



শাস্তি

সম্বিতা



বাইরে খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় রবিনসন আর পিটার দুজনে ভিজতে ভিজতে মিস্টার জনের দোকানে এল। রবিনসন বলল, ''মিস্টার জন আমরা মৃতদেহটাকে নিয়ে গোরস্থানে যাব। তোমার থেকে সবাই এ গ্রামে কফিন কেনে তাই তোমাকেই বলছি। তুমি কফিনের ব্যবস্থা কর। আর যদি পার মৃতদেহটাকে কফিনে শুইয়ে দিও।''

পিটার বলল, ''বাইরে খুব ঠান্ডা আর বৃষ্টি। আমরা একটু পাশের কফির দোকানে যাচ্ছি।'' এই বলে এক বৃদ্ধর লাশ তারা নামিয়ে রাখল মাটিতে।

জন বলল, ''এটা কার লাশ?''

পিটার উত্তর দিল, ''আর্থারের। ব্যাঙ্কে কাজ করত লোকটা। সেখানে টাকা পয়সা নিয়ে কী একটা ঘোটালা করেছিল। ব্যাঙ্ক থেকে ওকে বার করে দিয়েছিল। তারপর কোথাও কাজ পায়নি। বউও সুইসাইড করেছিল। একাকিত্বে ভুগছিল লোকটা। সকালে পেপার দিতে গিয়ে দেখি দরজা খুলছে না। দরজা ভেঙে দেখি মরে পরে আছে। এক দিকে ভালোই হয়েছে। এত সব যন্ত্রনা নিয়ে আর কদিন বাঁচবে? কেউ নেই সৎকার করার। আমি পাদরি অ্যাডামসকে জানিয়েছি। তিনি আসছেন।''

জন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ছেলে দুটো বের হয়ে গেল ওর দোকান থেকে। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জন ওর পকেট থেকে ছোটো একটা বোতল বার করে তার ঢাকনা খুলে ঢক ঢক করে একটা পানীয় তার গলায় ঢালল। আর্থার নামটা খুব চেনা মনে হচ্ছে। প্রায় দশ বছর আগের কথা, জন একটা ব্যাঙ্কে কাজ করত। সেই সময় তাকে জুয়ার নেশায় পেয়ে বসেছিল। চারিদিকে ধার দেনা হয়ে খুব বাজে অবস্থায় পরেছিল সে। পাওনাদাররা তাগাদা করে করে হয়রান। তখন সে এক রাতে সুযোগ বুঝে ব্যাঙ্কের সি সি টিভি অফ করে চুরি করে কিছু ক্যাশ সরিয়ে ফেলে। ক্যাশ কাউন্টার যে ছেলেটি কাজ করত। দোষ গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। তাকে ব্যাঙ্ক থেকে বার করে দেওয়া হল। জন বেঁচে গেল সে যাত্রায়। তারপর অবশ্য তাকে ব্যাঙ্ক ছাড়তে হয়েছিল অন্য এক কারণে। যখন সে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে কোনো কাজ পেল না, তখন এই কফিন বানানোর কাজ করতে লাগল। সে ঝুকে পড়ে মৃতদেহটাকে দেখতে লাগল। আর দেখতেই সে চিনে ফেলল। তার মনে পড়ে গেল। এই সেই লোক যে ক্যাশ কাউন্টারে কাজ করত। লোকটা ম্যানেজারের পা ধরে খুব কেঁদেছিল সেদিন। বাইরে এবার খুব জোরে বাজ পড়ল কোথাও। তার চোখে যেন ঘোর লেগে। মৃতদেহের মুখ থেকে বের হয়ে আসছে কিছু শব্দ, ''মৃত্যুর পর আমি অনেক কিছু জেনেছি। যা মৃত্যুর আগে জানতে পারিনি। আজ তোর শাস্তি হবে। তুই আজ মরবি। আর আমি বাঁচব। মাটির তলায় কফিনের মধ্যে তুই থাকবি। আর আমি বাইরে ঘুরবো।'' একটা বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল চারিদিক। জন ভাবল আজ পেটে একটু বেশিই পড়েছে মনে হচ্ছে। সে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আর মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে শুয়ে পড়ল মাটিতে। সে বলতে লাগল, ''এটা কখনো হবে না, এটা হতে পারে না।'' তার চোখ লেগে এল। খুব ক্লান্ত লাগছে। সে এখন কাঠের বাক্সে বন্দি। সে অনেক চেষ্টা করছে বাক্সটা খোলার কিন্তু তার শরীর অসার হয়ে গেছে। তার হাত পা কাজ করছে না। সে প্রাণপণ বলে চলেছে আমাকে বার কর এখান থেকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে বাঁচাও। কিন্তু সেই শব্দ কেউ শুনতে পারছে না। পিটার আর রবিনসন কফিন-টা তুলে নিল। রবিনসন বলল, ''থ্যাঙ্ক ইউ জন। কিন্তু কফিনের মধ্যে যিনি শুয়ে আছেন তার কানে স্পষ্ট এল এক অচেনা কণ্ঠস্বর। যিনি বলছেন, ''পিটার, রবিনসন আবার এসো।'' কিন্তু এ গলার স্বর জনের নয়।



সেই রাতে

দেবাশিস ভট্টাচার্য্য



চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ, না ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, না রাতচরা পাখিদের শব্দ। গাছের পাতা থেকে শিশিরের খসে পড়ার শব্দও দেবকুমার শুনতে পাচ্ছে। এই গভীর রাতে কী করে জঙ্গলের এই গভীর অংশে সে এসে পড়ল বুঝতে পারছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হল তার দেখতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। আকাশে হালকা হলুদ রঙের সরু একফালি চাঁদ রয়েছে, তারাও গুটিকতক আছে, কিন্তু তাদের ক্ষমতা নেই একটুও আলো এই গভীর জঙ্গলে ফেলে তাকে পথ দেখানোর।

দুখিয়ার রান্না করা প্রচণ্ড ঝাল আর আগুন গরম মুর্গীর ঝোল-ভাত খেয়ে, অনেকখানি রাম গেলার পর, যখন বেশ টলটলে আমেজটা এসেছিল, তখনই শুয়ে পড়েছিল আর প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আচমকা বুকে প্রচণ্ড চাপ লাগায় ঘুম চটকে গেল, কিন্তু চোখ খুলতে পারল না, পরিষ্কার বুঝতে পারল বুকের ওপর কেউ বসে আছে, শুধু বসেই নেই সে তার গলাও টিপে ধরেছে। বজ্রকঠিন হাতে গলা টিপে ধরায় প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। দেবকুমার একফোঁটা অক্সিজেনের জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে, মুখ ফাঁক হয়ে জিভ বেরিয়ে এসেছে। তবু না পারে নড়তে না পারে চোখ খুলতে। বুকের ওপর ওটা সোমশুভ্র নাকি! তা তো অসম্ভব! নিশ্চিতভাবেই দুঃস্বপ্ন, চোখ খুললেই দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে আর সে সহজ হতে পারবে, কিন্তু কিছুতেই সে চোখ খুলতে পারল না, গভীর ঘুমে যেন আবার তলিয়ে গেল।

ঘুম ভাঙ্গতেই দেখল, সে এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হল, কেননা সজ্ঞানে সে এই জায়গায় আর কিছুতেই আসত না। ঘুমের মধ্যে হাঁটার রোগ নেই, তবু কীভাবে এসে পড়ল! হঠাৎই গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল, একটা অজানা অদৃশ্য প্রবল টানে এগিয়ে যেতে থাকল সেই দিকে, যেদিকে সে মোটেই যেতে চায় না।

সোমশুভ্রকে নিয়ে অফিসের কাজে এই নিরিবিলি জনপদে সে এসেছিল। সোমশুভ্র এই প্রথম এলেও, সে এর আগে বহুবার এসেছে। এবারে গোটা পরিকল্পনাটা ছকাই ছিল। প্রথম তিনদিন সকাল ছ-টা থেকে সন্ধে ছ-টা সে প্ল্যান্টে থাকবে আর সন্ধে ছ-টা থেকে সকাল ছ-টা অবধি সোমশুভ্র। পরের তিনদিন ঠিক উল্টো। সোমকে সে বলেই রেখেছিল ঘণ্টাখানেক দেরি করে সাতটা সাড়ে সাতটায় এলেই হবে। সেই মতো সোম প্ল্যান্টে এসেছিল সাতটা নাগাদ। তখন চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সোম তাকে কিছুটা এগিয়ে দিতে এসেছিল। কথায় ভুলিয়ে গভীর জঙ্গলের এদিকটায় নিয়ে এসে কাজ সেরে সোমের লাশটা জলার ধারে পুঁতে দিয়েছিল। আর উপায়ই বা কী ছিল! চৈতালীর সাথে তার সম্পর্কের কথা ও কোনভাবে জেনে গিয়েছিল, চৈতালীকে সোম সাফ জানিয়ে দিয়েছিল কোনভাবেই ও ডিভোর্স দেবে না উল্টে চাকরিক্ষেত্রে দেবকুমারের বারোটা বাজিয়ে দেবে। চৈতালীকে ছাড়া দেবকুমারের এখন জীবন বৃথা, অগত্যা...।

কীসের অমোঘ টানে জলার ধারে চলে এসেছে দেবকুমার। সামনে ওটা কী জমাট একটা অন্ধকার যেন মানুষের অবয়ব ধরে হালকা দুলছে। অবয়বটা আরো স্পষ্ট হয়েছে, কোন সন্দেহ নেই এ সোমশুভ্র। ভূতে বা ভগবানে অবিশ্বাসী দেবকুমার আচমকাই শীতে কাঁপতে লাগল। সোম হেসে ওঠায় অবাক হল দেবকুমার।

"আয় আমরা দুই বন্ধু এখানেই থেকে যাই"।

সোমের কথায় প্রবল ভয় পেলেও মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে কোম্পানির গেস্ট হাউসের দিকে দৌড় দিল দেবকুমার। পেছনে তাড়া করতে থাকে সোমশুভ্রর অট্টহাসি।

গেস্ট হাউসের বন্ধ দরজার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তেই, অবাক হয়ে দেখল সে ভেতরে চলে এসেছে। এসব নিয়ে ভাবার অবস্থা নেই, নিজের ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে দেখল বিছানায় নিজের নিথর দেহটা পড়ে আছে, জিভটা মুখের বাইরে বেরিয়ে এসেছে, বিস্ফারিত চোখদুটো কোটর থেকে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। কানে তখনো ভেসে আসছে সোমশুভ্রর হাসি।



চক্রব্যূহ

দীপান্বিতা গোস্বামী মিশ্র



নিশীথকে ফোন করে ঠিক এখানেই ডেকেছি, এই ব্রিজটা আমাদের সম্পর্কের বহু স্মৃতি বহন করে চলেছে। ঘড়িটা কোথায় পড়েছে কে জানে! নিশীথ আসবে, আসবেই। ওই দূরে হ্যাঁ ওইতো বটগাছের পাশে বাইকটা দাঁড় করাল। ব্রিজের এদিকটা অন্ধকার, ও মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে আসছে। আমি মৃদু হাসিটা বজায় রাখলাম।

"তুই এখানে কেন ডাকলি? আর যেটা বললি ফোনে, সত্যি? ঠিক বলছিস তো? ওই তোর পাশে কেরে? এই দেখ আমাকে ফাঁসাবি না, আমি কিন্তু ছেড়ে দেব না, বলে দিলাম।"

"মিথ্যে বলে ডাকব ভাবলি? আমাকে তুই নিজের মতো ভাবিস? আর কই কে? নেশাটা কিসের, মদের? টাকার? নাকি মালার?"

"নাহঃ তুমি ধোয়া তুলসি।আচ্ছা বাদদে, কই দেখা?"

আমি সুটকেস খুললাম, নিশীথের মুখে লোভ চকচক করে উঠল। পুরো পাঁচ? শালা তোকে দেখে কেউ বুঝবে না, মুখটা এমন করে রাখিস। অনুপমদার জন্য দুঃখ হয়, কিন্তু কি করা যাবে, এই টাকা আমাদের ভাগ্যে ছিল। তা, ফিফটি ফিফটি কিন্তু! আচ্ছা বাই, তুই আসলেই বখরা হবে, ওকে!"

নিশীথ চলে যাচ্ছে, আমার একবার মনে হল শালাকে পুঁতে ফেলি নদীর চড়ে, কেউ টের পাবে না। বেঈমান, তারপর ভাবলাম ওর কী দোষ, মালার দোষ নেই? ভাগ্যের নেই? নিশীথ ভাবছে আমি ফেরার আগে ও মালাকে নিয়ে ফেরার হবে। কিন্তু যা হবার আমিতো জানিই, নিশীথ এবারে মরবে, মালাই মারবে, মালাও মরবে, প্রভাত মারবে। যেমন আমি অনুপমদাকে!

অনুপমদা আমাদের দাদার মতো, একাই থাকেন, আমাদের ডাকেন আড্ডা হয়। বিরাট বড়োলোকের ছেলে, বিয়ে করেনি, ওই রাস্তায় ল্যাঙটা ছেলেপুলে পড়ায়, ওদের নিয়েই থাকে। কাল রাতে ফোনে ডেকেছিলো আমাকে, বলল "এই পাঁচলক্ষ সহিসপুরে পৌঁছে দিতে হবে, একজন অসুস্থ, অপারেশন হবে। যাবি?"

টাকাপয়সার বিষয় চিরকাল আমাকে বিশ্বাস করে অনুপমদা, অনেকবার করেছে আগেও। কিন্তু আজ আমি নড়ে উঠলাম। আমার কাজকর্ম বন্ধ এখন, মালা দিবারাত্রি গালিগালাজ করছে, নিশীথ এখন আমার সামনেই সোহাগ করে আমারই বৌকে, মালাকে কাল কুকার কিনে দিয়েছে। আমি মালাকে ছাড়বো না কিছুতেই।

একদিন প্রতিবাদ করতেই মালা বলল, "খেতে দিতে পারে না, মুরোদ নেই তোমার আবার আগলে ভোগ করার...।" কানে গরম সীসা যেন ঢেলে দিল, নষ্ট মেয়েমানুষ। কিন্তু ওই ওকে আগলাতেই কাল অনুপম দাকে নিয়ে সহিসপুর যাবার এই রাস্তা ধরলাম, অনুপমদা সামান্য প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস তো করে। বাইক হাঁটিয়ে নিতে হয় ব্রিজের উপর পথে ধাক্কা দিলাম, এই ব্রিজের উপর থেকেই। নীচে পড়তে পড়তে অনুপমদার সেই অবাক হওয়া মুখে ক্রোধ জেগে উঠল। উঠুক, আমি টাকার ব্যাগটা নিয়ে বাইকে উঠতেই দেখি সামনে অনুপমদা, "ও টাকা তুই হজম করতে পারবি না, ওটাকা কেউ হজম করতে পারবে না, লোকটার চিকিৎসা হল না, মরে যাবে ও।"

আমি বাইক নিয়ে ওই বটগাছে মারলাম, অন্ধকারে পাড় ভেঙে নদীতে পড়লাম।এখন নিশীথ যাবে মালার কাছে, বিয়ে করবে ওকে স্বপ্ন! কিন্তু মালা ওকে খুন করবে প্রভাতের জন্য, ও প্রভাতের সাথে পালাবে, প্রভাত মালাকেও.... চলবে, বুঝলেন চলবে। অনুপম দা বলল, "ওটাকা কেউ ভোগ করতে পারবেনা, চল।"



ক্ষণজন্মা

সুরঞ্জনা মুখোপাধ্যায়



তখন আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে। পিসির বাড়ি এসেছি, ভাবলাম অনেকদিন যাওয়া হয়নি, ঘুরে আসি। আমার কর্তা ছুটি পাননি, অতএব আমাকে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিয়েছেন। পিসির বাড়িতে আপাতত পিসিমা একাই থাকেন। সঙ্গে সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে মঙ্গলা। আমার চার পিসতুতো দিদির বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন হল। পিসেমশাইও গত হয়েছেন বেশ কিছু বছর আগে।

গরমের দুপুর। অন্যান্য দিনের মতোই রান্না খাওয়ার পাঠ চুকিয়ে বেশ ভাত ঘুম দিলাম তিনজনে। আমার যখন ঘুম ভাঙল তখনও পিসিমা আর মঙ্গলা ঘুমোচ্ছে। ভাবলাম যাই, ছাদ থেকে কাপড় জামাগুলো নিয়ে আসি। ছাদ থেকে গোয়াল ঘরের দিকটায় কি একটা চোখে পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভালো করে তাকিয়ে দেখি একটা বাচ্চা ছেলে, আট দশ বছর হবে, আদুর গা, পরনে ময়লা একটা প্যান্ট, গোয়াল ঘরের সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলবশত নীচে নেমে এসে কোনরকমে জামাকাপড়গুলো বিছানায় রেখেই দরজা খুলে দৌড়ে গেলাম, "কে রে তুই? কী চাই এখানে?"

"বড় খিদা লাগছে। দুটো ভাত দ্যাও না গো দিদি।"

ছেলেটার মুখটা দেখে বড্ড মায়া লাগল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘরে চলে গেলাম। দুপুরে আমরা তিনজন খাবার পরও বেশ কিছুটা ভাত তখনও হাঁড়িতে ছিল। কলাপাতায় কিছুটা ভাত-তরকারি মুড়ে ওকে দিতেই ও খুশি মনে চলে গেল।

পিসিমা ঘুম থেকে ওঠার পর সবটাই খুলে বললাম। লক্ষ্য করলাম, শুনতে শুনতে পিসিমার মুখের অভিব্যক্তিতে ভয় আতঙ্ক প্রকট হয়ে উঠছিল। সবটা শোনার পর পিসিমা আঁতকে উঠলেন।

"তুই কী করলি রে বুড়ি? তুই যে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলি। ও তারক, বছর খানেক আগে সাপের কামড়ে মারা গেছে। এ গ্রামে প্রত্যেক ন-বছর অন্তর একটা করে বাচ্চা সাপের কামড়ে মরে। তারপর তারা কোনো না কোনো বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে চায়। যে বউয়ের কাছেই যায়, তার পরদিন তার মৃত্যু অবধারিত। তার ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে থাকে গ্রামের কোথাও না কোথাও। আমার আগেই তোকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। তুই আবার তাকে ভাত দিয়েও দিলি। এবার কী হবে!", পিসিমা চোখ বন্ধ করে ঠাকুর নাম জপতে লাগলেন।

সেদিন মাঝরাতে কী একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। বুকের ওপর কেউ যেন চেপে বসেছে, অথচ শরীর অসাড়, উঠে বসব কি, চোখও খুলতে পারছি না। আচমকা চুলে একটা তীব্র টান। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরদিন চোখ খুলে দেখলাম আমি শুয়ে আছি গ্রামের শিব মন্দিরের চাতালে। কি করে এখানে এলাম, মনে পড়ছে না। উঠে বসে এদিক ওদিক তাকাতে দেখলাম মাথার কাছে বসে আছেন গায়ে নামাবলি জড়ানো উপবীতধারি এক সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক। আন্দাজ করলাম, মন্দিরের পুরোহিত।

বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, "আজ তারকের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছ মা। এ গ্রামে বহু বছর আগে এক মহিলাকে ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়। তারপর থেকে তার অতৃপ্ত আত্মা প্রত্যেক ন-বছর অন্তর এসে একজন করে সধবা মহিলাকে নিয়ে যায়। তারক মহাদেবের বরপ্রাপ্ত। নয় বছরের বেশী বাঁচে না, তারপর আবার জন্ম নেয়। সে যে কটা বছর বেঁচে থাকে, এ গ্রামে কোনো অনিষ্ট হয় না। তবে মৃত্যুর পরও কিন্তু সে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। যে সধবার বিপদ, তার স্পর্শ করা অন্ন তারককে দিলেই তার বিপদ কেটে যায়। তবে তার হাতের অন্ন না পেলে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব না। তাই সে বিপদগ্রস্ত সধবার কাছে গিয়ে ভাত চায়। কিন্তু তাকে যে কেউ বিশ্বাস করে না, ভয় পায়। তার ফলে অকালেই প্রাণ হারায়।

তুমি দিয়েছ, তাই রক্ষা পেয়েছ। তোমার বিপদ সম্পূর্ণ কেটে গেছে মা।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হায় রে! পিসিমা অর্ধসত্য জেনে খামোখাই ভয় পাচ্ছিলেন।



ভিক্ষা

তুষার চট্টোপাধ্যায়



এই জায়গাটায় সদ্য এসেছি। আধা শহর বলা যেতে পারে। পঞ্চায়েত এলাকা। কর্মসূত্রে এখানে ঘর ভাড়া নিতে হয়েছে।

আজ গুমোট গরম। আকাশে ঘন কালো মেঘ। অভ্যাসবশত সন্ধ্যাবেলা ঘুরতে গিয়েছি। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসে দাঁড়িয়ে আছি নদীর ঘাটে। মেঘে প্রায় ঢেকে যাওয়া চাঁদের আবছা আলোয় দেখি একজন শীর্ণকায় মাঝবয়সী লোক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। খালি গা। প্যান্টটাও ছেঁড়া।

"আমাকে কিছু খেতে দেবে বাবু। দু-দিন কিছু খাইনি।", ওর করুণ আর্তিতে প্যান্টের পকেট থেকে একটা দশ টাকার কয়েন বার করে ওকে দিতে গেলাম। টাকাটা না নিয়ে আমাকে বলল রুটি কিনে দিতে। ইশারায় দূরের ওই লোকটাকে দেখালো ট্রলিভ্যান চালিয়ে যাচ্ছে। মনটা কেমন করে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "রুটি পাওয়া যাবে?"

লোকটি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়তেই চারটি রুটি আর তরকারি নিলাম। ট্রলিভ্যানটা চালিয়ে চলে যেতে যেতে আমাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে যান। রাতের অন্ধকারে এখানে থাকবেন না। জায়গাটা মোটেও ভালো না।"

রুটি-তরকারি আমার হাত থেকে নিয়ে খেতে খেতে লোকটি বলে, "বাবু আপনি তো এখানে নতুন। আপনি খুব ভালো মানুষ। তাই আপনাকে বলছি এখানে কেউ ভিক্ষা চাইলে একদম দেবেন না।"

"আমিতো তোমাকে দিলাম।", আমার কথায় লোকটি মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে, "অমন কথা বলো না বাবু। আমি খেতে চেয়েছি, ভিক্ষাতো চাইনি। এখানে ভিক্ষা দেওয়ার মতো একটা জিনিসই তো সকলের কাছে আছে। এই নদীর ধারে এক বুড়ি ঘুরে বেড়ায় কৌটো হাতে। কোন নির্জন জায়গায় অন্ধকারে কাউকে পেলে এগিয়ে যায় তার কাছে। কৌটো বাজিয়ে ভিক্ষা চায়।" আমি বললাম, "গরিব মানুষ। ভিক্ষাতো চাইতেই পারে।" সে আবার চুপ করতে বলে, "অমন অলুক্ষণে কথা বলো না বাবু। ভিক্ষা নেওয়ার মতো একটা জিনিসই তো ওর আছে। প্রাণ। যে রাজি হবে তার প্রাণটা ও নিয়ে নেবে।"

মাঝে মাঝে সারা আকাশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে আলোর ঝলকানি আর মেঘের গর্জন। প্রকৃতির এই রূপ আমাকে চুম্বকের মতো আটকে রেখেছে এখানে। ফিরে যেতে চাইছি কিন্তু পারছি কই।

নদীতে কারা সব সাঁতার কাটছে। কিন্তু নদী থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে কেন? লোকটিকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, "যারা বুড়িকে ভিক্ষা দিয়েছে তারা রাতে সাঁতার কেটে বেড়ায় এই নদীতে। মুক্তি নেই ওদের।" বড় আজগুবি কথা। গল্পটা ভালোই লাগে।

হঠাৎ এক বুড়ি এসে হাজির। লোকটিকে খেতে দেখে জিজ্ঞেস করে, "কে কিনে দিলরে তোকে?" লোকটি মাথা নিচু করে একমনে খেয়ে যায়। "তুই খুব হাড় বজ্জাত। পাছে আমি ভিক্ষা চাই তাই চুপ করে আছিস। তুই তো হাড় কেপ্পন। তাই তোর কাছে কখনো ভিক্ষা চাইনি।" বুড়িটা চিবিয়ে চিবিয়ে ওকে কথাগুলো বলতে থাকে। লাঠিতে ভর দিয়ে আমার দিকে তাকায়, "বুঝেছি তুমি দিয়েছো ওকে খেতে। খুব ভালো মানুষ তুমি। আমাকে তুমি ফেরাবে না তো বাবা?" হাতের কৌটোটা আমার মুখের সামনে তুলে ধরে বাজাতে থাকে, "আমাকে ভিক্ষা দাও না বাবা।" আমি পকেটে হাত দিতেই বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসতে থাকে, "কথা দে আমায় ভিক্ষা দিবি।" দশ টাকার কয়েন বার করে ওর কৌটোর মধ্যে দিতে যাই। টাকা না নিয়ে বুড়িটা কৌটো নিয়ে আমার বুকের সামনে বাজাতে থাকে, "দে তোর প্রাণটা।"

বুড়িটার গলার স্বর আমার হাত-পা কাঁপিয়ে দেয়। পিছন ফিরে ছুটে পালাতে যাই। ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। বিদ্যুতের চমকানি আর আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে মাথায় এক্ষুনি বাজ পড়বে।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে আমি ছুটছি। আর আমার পিছনে একটা লম্বা হাত এগিয়ে আসছে কৌটো বাজাতে বাজাতে, "আমায় ভিক্ষা দে, আমায় ভিক্ষা দে...।"



সোনাগাঁর ডাক

তনিমা সিংহ রায় মৌলিক



"না না মেরো না, ছেড়ে দাও, ওর কোনো অপরাধ নেই... বাবা তুমি তো এত অবুঝ নও, আমার অপরাধ এর শাস্তি অন্য কে দিও না, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।" অন্যদিকে এক গ্রাম্য সৌম্যদর্শন যুবকের ওপর কিছু লেঠেল মিলে অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে... এক অসহায় বন্দী নারীর আর্ত অনুরোধ কেউ শুনছে না। বেশ কয়েক দিন ধরে এই অদ্ভুত স্বপ্নটা দেখছে মহুয়া আর একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এই স্বপ্নটার রেশ নিয়ে তার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারপর সারাদিন ধরেই মাথায় কাজ করে চলেছে স্বপ্নটা। নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেও কিছুতেই মন থেকে স্বপ্নের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো মুছে ফেলতে পারছে না মহুয়া। এখন জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ, ঠান্ডা বেশ ভালোই আছে। তাও ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙে যায় ঐ স্বপ্নটার জন্য। কলকাতায় অভিজাত এলাকায় একাই থাকে মহুয়া, সুন্দর করে সাজানো ফ্ল্যাটে তার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বিয়ে এখনও করেনি সে, তবে নিজের মনের মানুষ ঠিক করা আছে তার, নাম নিখিল। বড় যৌথ পরিবার মহুয়ার, বাবা কাকারা মিলিয়ে অনেক জন একসাথে থাকে দেশের বাড়ি বাঁকুড়াতে।

বড় একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে মহুয়া সেখানেই নিখিল এর সাথে আলাপ তারপর প্রেম। বাড়িতে সবাই এই খবর জানেও। কারোর কোনো আপত্তি নেই বরং সবাই খুশি মনে ওদের সম্পর্কটা মেনে নিয়েছে। বেশ ভালোই কাটছিল দিনগুলো কিন্তু বাধ সাধল এই স্বপ্ন, প্রায় রোজই মহুয়া দেখে এই স্বপ্নটা, এরপরেই সেই যুবতী নারীকে দেখে সুন্দর জংলা কাজের সবুজ রঙের বেনারসী পরে, সোনার গয়নায় মানানসই ভাবে সেজে কোনো এক অট্টালিকায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে, কানের কাছে কে যেন বলে ফিসফিসিয়ে আয়-আয়, আর কত দিন অপেক্ষায় থাকবো। তারপরেই ঘুম ভেঙে যায় মহুয়ার।

প্রথমে তেমন আমল না দিলেও এখন গুরুত্ব দিচ্ছে সে এই স্বপ্ন কে। মনের মধ্যে হাজার হাজার প্রশ্ন আসছে তার। নিখিল এর সাথে আলোচনা করে মহুয়া ঠিক করে যে বাড়িতে সবার সাথে এই স্বপ্নের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতেই হবে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। সেই মতো অফিসে ছুটি নিয়ে তারা দু-জন বাঁকুড়া যায়। অনেক দিন পর বাড়িতে ফিরে মন ভালো হয়ে যায় মহুয়ার, সাথে নিখিলেরও আদর আপ্যায়ন ভালোই জোটে। প্রথম দুই দিন তারা সবাই কে নিয়ে খুব মজা করে হেসে খেলে কাটায়, কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু তৃতীয় দিন মহুয়া রাতে একা নিজের ঘরে শুয়ে ছিল আর সেই রাতেই আবার সেই স্বপ্ন আবার সেই কাতর আহ্বান। পরদিন সকালে তার খুড়তুতো বোন তাকে ডেকে নিয়ে আসে বৈঠকখানায়। মহুয়া দেখে সবাই সেখানে উপস্থিত, সে বোঝে যে এটাই উপযুক্ত সময় স্বপ্নের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে তার বড়জেঠু বলে ওঠে কালরাতে সে কাতরাচ্ছিল কেন? সোমা মানে মহুয়ার খুড়তুতো বোন রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় তার কাতরানো আর অদ্ভুত গোঙানির আওয়াজ পেয়েছে, সে দরজা বন্ধ থাকায় ভিতরে যেতে পারেনি তাই সকালে সবাই কে জানিয়েছে। মহুয়া বলার জন্য তৈরি ছিল, এবারে একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে সমস্ত কথা খুলে বলে সবাইকে। সব শুনে মহুয়ার ঠাকুমা, বড়জেঠু আর বড়পিসির কপালে ভাঁজ পড়ে যায়। সেটা চোখ এড়ায় না মহুয়ার। বাকিরাও চিন্তায় পড়ে যায়, কিন্তু ঐ তিনজনের মুখশ্রী যেন কোনো অন্য ইঙ্গিত দিলো মহুয়াকে।

সকালের জলখাবারের পর্ব শেষে সে ঠাকুমা বড়জেঠু আর বড়পিসিকে ধরে বসলো রহস্য সমাধানের জন্য। তারা প্রথমে একটু দোটানায় থাকলেও পরে মহুয়াকে সব খুলে বলে। কারণ এই সমস্যা নয়তো কখনো মিটবে না। ঘটনা হল, মহুয়াদের আদিনিবাস বাংলাদেশের সোনারগাঁওতে ছিল সে প্রায় কয়েক পুরুষ আগের কথা। সেখানকার জমিদার ছিলেন মহুয়ার পূর্ব পুরুষেরা। তাদের সুশাসন এর জন্য তারা সকলের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। সেই বংশের জমিদার কন্যা পদ্মা ছিল অতীব সুন্দরী এবং গুনবতী নারী। গ্রামের সবাই তাকে যেমন মান্য করতো তেমনই ভালোবাসতো। এহেন পদ্মা ভালোবেসে ফেলে গ্রামের এক যুবককে, তারা ছিল দরিদ্র। কিন্তু ঐ যুবক অর্থাৎ মোহন রূপে গুনে বিদ্যা বুদ্ধিতে কোনো অংশেই পদ্মার থেকে কম ছিল না। কিন্তু দারিদ্র্য ছিল তার একমাত্র অপরাধ তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের এই প্রেম কেউ মেনে নেয় না। কিন্তু

জমিদার প্রতাপ চোধুরী বুঝেছিলেন যে কন্যাকে এইভাবে নিরস্ত করা যাবে না, তিনি তার নায়েবের সাথে পরামর্শ করে লেঠেল সর্দারকে লেঠেল বাহিনী সহ পাঠালেন তাকে হত্যা করতে।

বুদ্ধিমতী পদ্মা সব বুঝতে পেরেছিল, সে জানতো নায়েবের ছেলের সাথে তার বিয়ে দেওয়ার জন্য নায়েব অনেক দিন ধরে চেষ্টায় আছে, পিতার কানে বিষ ঢালার এই সুন্দর সুযোগ নায়েব কখনো ছাড়বে না। মনে মনে পদ্মাও তৈরি হয়ে নিলো। সে মৃত্যু বরণ করে জমিদার বাড়িতেই। এই পর্যন্ত বলে চুপ করে যান মহুয়ার ঠাকুমা। অধীর আগ্রহে মহুয়া পরের কাহিনি জানতে চাইলে তিনি বলেন এরপর কোনো অজ্ঞাত কারণে সমস্ত পরিবার এপার বাংলায় চলে আসে। এই পর্যন্ত শুনে মহুয়ার খিদে মেটে না, সে ঠিক করে বাড়ির সবাইকে রাজি করিয়ে তারা কয়েকজন মিলে বাংলাদেশে সোনারগাঁওতে যাবে। নিজেদের পূর্ব পুরুষেরা এককালে যেখানে সম্ভ্রম নিয়ে রাজত্ব করে এসেছিল, সেই জায়গা, নিজেদের ভিটেমাটি দর্শন ও হবে, সাথে ঐ অদ্ভুত স্বপ্নের রহস্য উদঘাটন ও করা যাবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ, বিকালেই মহুয়া আর নিখিল নিজেরা পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়ে বাড়িতে জানায়। এতে খুব একটা আপত্তি কেউই করে না, বরং মহুয়ার বড়জেঠু আর বড়পিসিও তাদের সাথে যেতে রাজি হয়। যথাসময়ে তারা বাংলাদেশে পৌঁছে যায়, সবারই মনের মধ্যে এক অদ্ভুত আনন্দ উত্তেজনা আর দোলাচল কাজ করছে। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সোনারগাঁও যাওয়ার গাড়ি ঠিক করে মহুয়ারা যাত্রা শুরু করে ভগবানের নাম নিয়ে। সোনারগাঁওতে অনেক খুঁজে ঠাকুমার এক পরিচিত লোকের বাড়িতে যোগাযোগ করা হয়েছিল বাংলাদেশ আসার আগেই, তিনি মহুয়াদের ভিটেমাটির খোঁজ নিয়ে জানিয়েছেন যে ঐ জমিদার বাড়ি এখন ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়ে আছে। লোকে সেটাকে ভুতের বাড়ি বলে। বেশ কিছু বছর আগে এক ধনী ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়িটি সংস্কার করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয়নি, কুলি মজুররা নাকি সেখানে অশরিরী উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়েছে।

মহুয়াদের আপাত গন্তব্য ঠাকুমার পরিচিত সেই লোকের বাড়িতে, তার নাম পরাশর। তিনি ও তার পুরো পরিবার মহুয়াদের খুব আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করল। প্রতিবেশী দেশের অতিথি বলে কথা। দিনের বেলা বিশ্রাম নিয়ে সবাই সন্ধ্যায় জমায়েত হল বারান্দায়। মহুয়ার বড়জেঠু পরাশর বাবুকে সব কিছুই খুলে বলেন। তারা যে ঐ জমিদার বাড়ি দেখতে যেতে চায় সে কথা ও বলেন। সব শুনে পরাশরবাবু বলেন যে পুরো ব্যাপারটা লোকাল পুলিশ কে না জানিয়ে করা যাবে না, আর সেটা ঠিকও হবে না। কারণ প্রাণ সংশয়ের একটা ভয় থেকে যাচ্ছে। তখন মহুয়া বলে যে আসার সময় তাদের প্রত্যেকের জন্য মা রক্ষাকালীর মন্ত্রপূত তাবিজ ঠাকুমা সাথে দিয়ে দিয়েছে, স্নান করে শুদ্ধ শরীরে ও চিত্তে ঐ তাবিজ ধারন করতে হবে। পরাশরবাবুও আশ্বাস দেন যে তিনি এক সাধুবাবাকে সাথে নেবেন যিনি মহেশ্বরের সাধক এবং ত্রিকালজ্ঞ। তখন সবাই পুরো প্ল্যান সাজিয়ে ফেলে। আগামী কাল দুপুরে তারা ঐ জমিদার বাড়ি গিয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে আসবে, সেদিন রাতেই তারা ঐ বাড়িতে রাত কাটাবে, নয়তো এই রহস্য উদঘাটন সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট দিনে সবাই ঐ ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়ি গিয়ে পৌঁছায়। সবাই মা কালীর রক্ষাকবচ ধারণ করে আছে নিজের নিজের শরীরে। মহুয়ার যেন হঠাৎই সব কিছু প্রচণ্ড চেনা চেনা লাগছে বলে মনে হয়, সে সবাই কে অবাক করে বলে উঠলো আমার ঘরটা কোথায়? সেটা তো ওপর মহলে ছিল। শোনামাত্র মহুয়ার বড়জেঠু বলে ওঠেন কিসব বলছিস তুই? এখানে তোর ঘর কি করে থাকবে? সঙ্গে থাকা সাধুবাবার মহুয়ার জেঠুকে ইশারা করে চুপ করতে বলেন। তারপর মহুয়াকে বললেন চলো প্রথমে তোমার ঘরেই যাওয়া যাক, পরে বাকি অট্টালিকা ঘুরে দেখা যাবে। সবাই বুঝতে পারলো যে সাধুবাবা কিছু আঁচ করেছেন তাই সবাই একমতো হয়ে মহুয়ার সাথে ওপরে চললো। কপালগুনে ঐ ভগ্নপ্রায় বাড়িতে ওপরে ওঠার সিঁড়িটি মোটামুটি অক্ষত ছিল, সাবধানে সবাই ওপরে এসে দেখলো মহুয়া একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে রয়েছে আর প্রায় ভেঙে পড়া এক লম্বা ঝুলবারান্দা ধরে সোজা হেঁটে চলেছে, যার শেষপ্রান্তে রয়েছে একটি তালাবন্ধ ঘর। সবাই মহুয়াকে অনুসরণ করে সেখানে এসে দেখলো যে এই ঘরটি এখনও মোটামুটি রয়েছে দাঁড়িয়ে, যদিও বাইরের দেওয়ালে সময়ের ছাপ স্পষ্ট, নোনা ধরে পলেস্তরা খসে পড়ে ইটের কঙ্কাল বেড়িয়ে পড়েছে। তবে তালাটা মজবুত সেটা হাতে ধরতেই বোঝে তারা। অনেক চেষ্টা করেও সেই তালা ভাঙা যায়না। মহুয়া হঠাৎ বলে চাবিটাই তো আনিসনি তোরা, খুলবি কি করে তালা। মহুয়ার হাবভাব এর এহেন পরিবর্তনে সবাই অবাক হওয়ার সাথে সাথে চিন্তায় পড়ে যায়, কিন্তু এটাও বোঝে যে এক্ষুনি এই সমস্যা মিটাতে গেলে বড় ভুল হয়ে যাবে। সুতরাং অপেক্ষাই শ্রেয়। সাধুবাবা মহুয়াকে জিজ্ঞেস করেন যে চাবি কোথায় আছে। মহুয়া বলে

এই ঘরের ঠিক নীচেই যে ঘর আছে সেই ঘরের মধ্যে রয়েছে একটি গোপন কুলুঙ্গি, সেখানেই আছে চাবি। নিখিল আর বড়জেঠু গেল চাবি নিয়ে আসতে, তারা দুজনেই মহুয়ার এই পরিবর্তনে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত কিন্তু এই রহস্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কিছুই করার নেই কারোর। নীচের ঘরে এসে দু-জন দুই দেওয়ালের দিকে চলে গিয়ে ঐ কুলুঙ্গি খুঁজতে শুরু করে, কিন্তু কোনো দেওয়ালের মধ্যেই সেই কুলুঙ্গির কোনো হদিস পাওয়া যায় না। তবে কি তারা ভুল শুনেছে? না! আবার খোঁজা শুরু করল তারা। ওদিকে যত সময় যাচ্ছে মহুয়া যেন পাগলের মতো অধীর হয়ে উঠছে। তার গলার স্বর ও পাল্টে গেছে, ঘরটায় ঢোকার জন্য সে ছটফট করে চলেছে। সাধুবাবা সবার গাত্রবন্ধন করে দিলেন মহুয়াকে বাদ দিয়ে। কারণ মহুয়া কে দিয়েই সব কার্য উদ্ধার করতে হবে। যদিও এতে মহুয়ার প্রাণের ভয় থেকে যাচ্ছে তাও এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে। অবশেষে নিখিলরা চাবিটি পেল, যে ঘরের কথা মহুয়া বলেছিল সেই ঘরের দেয়ালে একটা ফাঁকা চৌকো খোপ দেখে দুজনের সন্দেহ হয়। ঐ খোপে হাত দিয়ে একটু চাপ দিতেই তারা বোঝে এটি চুন সুড়কির ইত্যাদির তৈরি নয়, তখন সর্ব শক্তি দিয়ে নিখিল ঐ খোপে চাপ দিলে খোপটি পিছনে ঘুরে গিয়ে সামনে আসে একটি ছোটো বাক্স। সেটা খুলতেই বেড়িয়ে আসে সেই চাবি।

চাবি নিয়ে ওপরে আসতেই তাদেরও গাত্রবন্ধন করে দিলেন সাধুবাবা। চাবিটি দেখে মহুয়া অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো, বলল আজ আর কেউ ধরে রাখতে পারবে না আমায়। মহুয়ার এহেন পাগলের মতো অবস্থা দেখে সবাই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সাধুবাবা আশ্বাস দেন যে তিনি মহুয়াকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবেন শুধু সবাই সাবধানে এইটুকু সময় চলুক, মহুয়াকেও চোখে চোখে রাখতে হবে। অতঃপর ঘরের মধ্যে তালা খুলে প্রবেশ করা হল। দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর মুখ না দেখা ঘরে আজ সূর্যের আলো পরলো। ধুলোবালি, মাকড়সার জাল প্রভৃতিতে ছেয়ে আছে ঘরটি। সবাই অবাক হয়ে ঘরের সব আসবাবপত্র দেখায় মন দিলো সব জঞ্জাল পরিস্কার করে। কালের নিয়মে বেশীরভাগই ক্ষয়ের পথ ধরেছে তাও এরমধ্যেই জানান দিচ্ছে ভালোমতোই, এক কালে কতো জৌলুশ তাদের ছিলো। নিখিল, বড়জেঠু, পিসি, পরাশর বাবু প্রত্যেকে বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। আর মহুয়া! যে এতক্ষণ পাগলের মতো ঘরের ভেতরে ঢুকতে চাইছিল, সে ঘরের ভেতরে পা দেওয়া মাত্রই অঝোরে কাঁদছে। যেন কতকাল পর হারানিধি তার সর্বস্ব পেয়েছে। ঘরের যাবতীয় জিনিস মহুয়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে আর কাঁদছে। হঠাৎ সে এসে থামে বড় একটা আয়নার সামনে, এখানে এসে তার কান্না থেমে যায়। কি একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে ঐ আয়নার দিকে। সবাই তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, নিখিল মহুয়াকে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনী দিতেই মহুয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলে এই আয়নার সামনেও আমি পিছনেও আমি। খোলো এই আয়না, এর মাঝেই লুকিয়ে আছে আমাদের মুক্তি। পরাশর বাবু ইশারা করে সবাইকে বলেন যে মহুয়া এখন তা বলছে করছে তা সে নিজের বশে থেকে করছে না সুতরাং তার নির্দেশ মেনেই চলতে হবে তাতে সবার মঙ্গল। নিখিল আর পরাশরবাবু মিলে আয়নাটা নামাতেই আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে সবাই। আয়নার পিছনে একটি কঙ্কাল, পরনে বেনারসী শাড়ি সোনার গয়না তা এখন মলিন হয়ে গেছে। নিখিল বুঝলো ইনিই সেই জমিদার কন্যা পদ্মা যে মহুয়া কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে এতদূর নিয়ে এসেছে। পরাশরবাবু পুলিশ কে সাথে সাথে খবর দেন, লোকাল পুলিশ তৈরি ছিল না। তারা তৎক্ষণাৎ রওনা দিল। ওদিকে মহুয়াকে তখন সামলাতে পারছে না কেউ। সে একভাবে বলে চলেছে এই বাড়ির উত্তর পশ্চিমে এক বকুল গাছের নিচে আমার মোহন ঘুমিয়ে আছে, তাকে উদ্ধার করো, তাকে মুক্তি দাও। তখন সাধুবাবার নির্দেশে মহুয়াকে নিয়ে সবাই ঐ বকুল গাছের খোঁজে চলল। সত্যিই বাড়ির উত্তর পশ্চিমে একটি বকুলের গাছ পাওয়া গেল, কিন্তু সমস্যা হল মাটি খোড়ার কিছুই নেই। ওদিকে মহুয়াকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সে মাটির ওপরে প্রায় শুয়ে পড়ে কাঁদছে আর বলছে শুনছো আজ আমরা একসাথে মুক্ত হবো, আর পারবে না কেউ আমাদের আলাদা করতে, কেউ পারবে না আমাদের এক হওয়া আটকাতে। ইতিমধ্যে পুলিশও চলে আসে। গ্রামের অনেক মানুষও জড়ো হয় সেখানে কারণ পুলিশের গাড়ি দেখে সবারই মনে কৌতুহল হয় কি ব্যাপার তা জানতে। পুলিশের সাহায্যে মাটি খোড়া হল এবং সেখানে আরো একটি কঙ্কাল আবিষ্কার হল। কঙ্কালটির খুলিতে ফাটার দাগ স্পষ্ট।

সবারই উত্তেজনা তখন চরমে পৌঁছে গেছে। তাই কেউ লক্ষ্য করেনি যে সোমা, মহুয়ার খুড়তুতো বোন ঐ ওপরের ঘরে আবার কখন ছুটে চলে গেছে। পুলিশের হাতে কঙ্কাল দুটি সঁপে দিয়ে মহুয়ার বড়জেঠু তাদেরকে অনুরোধ করলেন, যেন খবরের কাগজে কিছু প্রকাশ না হয়। আর বাকি সব কথা বুঝিয়ে বলার জন্য তিনি পরাশরবাবুর অনুমতি নিয়ে ইন্সপেক্টরকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। পুলিশের গাড়ি চলে যাওয়ার পর সবাই মহুয়ার দিকে খেয়াল করল, দেখলো সে ঐ উঠোনের

মাটিতে প্রস্তরবৎ বসে আছে। পরনের বেশবাস অবিন্যস্ত হয়ে গেছে এই মানসিক ধাক্কায়, নিখিল তাকে ধরে তুলতে যেতেই সাধুবাবা বাধা দেয়। তিনি মহুয়ার দিকে কিছু মন্ত্র পড়া সর্ষে আর হলুদের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। এটা করা মাত্রই মহুয়া অস্বাভাবিক ভাবে চিৎকার করে ওঠে, সর্বাঙ্গ যেন তার জ্বলে উঠেছে। সাধুবাবা সবাই কে নিষেধাজ্ঞা দেন যে, ''যাই হোক কেউ এই মুহূর্তে মহুয়ার কাছে যাবে না, আবেগ কে সবাই যেন নিয়ন্ত্রণে রাখে।" এবার তিনি মহুয়ার দিকে ফিরে বলেন মা আপনি সেই পদ্মা মা তা আমি বুঝেছি কিন্তু এই মেয়েটির ওপর আপনি কেন ভর করলেন তা বুঝিনি, আপনি কি চান সেটা যদি খুলে বলেন তাহলে আমরাই আপনার সাহায্য করবো। তখন মহুয়ারূপী পদ্মা কিছুটা শান্ত হল, করুন স্বরে বলে উঠলো নিরূপায় হয়ে মহুয়ার ওপর ভর করেছি আমি নয়তো আমাদের মুক্তি সম্ভব ছিলনা। মহুয়ার জন্ম তিথি নক্ষত্র আমার সাথে মিলেছে বলেই ওকে আমি স্বপ্নাদেশ দিতে পেরেছি। এবার আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে, তোমাদের প্রত্যেকের ওপর আমি খুশি হয়েছি তাই তোমাদের কোনো অনিষ্ট আমি করবো না। একটা শেষ অনুরোধ শুধু করবো আমার আর মোহনের আত্মার শান্তি কামনা করে তোমরা পিন্ড দান করো কোনো পুণ্য স্থানে তাহলেই আমরা চিরমুক্তি লাভ করবো। ইতিমধ্যে সোমাও চলে এসেছে হাতে কিছু জিনিস নিয়ে। মহুয়ার শরীর থেকে যখন পদ্মার আত্মা বেড়িয়ে যায় তখন ঐ বকুল গাছ সশব্দে ভেঙে যায়। এতসব কাণ্ড কারখানার মাঝে কেউ খেয়াল করেনি যে বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পরাশরবাবু সবাইকে নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। মহুয়ার ওপর যে ঝড় বয়ে গেছে তার ধকল সে সামলাতে পারেনি, তাকে বিশ্রাম নিতে দিয়ে বাকিরা বসার ঘরে জড়ো হয়। সোমা তখন দেখায় সে কি অমূল্য সম্পদ পেয়েছে। ঐ ঘরে সে বহু চেষ্টা করে একটি ডায়েরি, একটি ফটোগ্রাফ, আর পদ্মার স্মৃতি বিজড়িত কিছু জিনিস পেয়েছে সেগুলো নিয়ে সে নিজের দেশে ফিরবে। ফটোগ্রাফটি দেখে সবাই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, হুবহু মহুয়ার মুখ অর্থাৎ পদ্মা দেখতে একদমই মহুয়ার মতো। বাকিটা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তখন। আর ডায়েরি তো আছেই সমস্ত কথা জানার জন্য। পরেরদিন সকালে ঐ সাধুবাবার কাছে গেল, মহুয়া বাদে কারণ সে পুরো ব্যাপারটা নিখিল এর কাছে শুনে পদ্মার জন্য খুব কষ্ট পেয়েছে। তাছাড়া তার শরীর ও এখোনো ঠিক হয়নি। সাধুবাবা এক জাগ্রত কালীমন্দিরে সাধনা করেন, সেখানেই পদ্মা ও মোহনের আত্মার শান্তি কামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে তাদের নামে পাশের নদীতে পিন্ড দান করলেন মহুয়ার বড়জেঠু। আর একদিন পর তারা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসবেন, মহুয়া নিখিলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, পরাশরবাবুদের আগাম নিমন্ত্রণ করে রাখলেন, আবারও বাংলাদেশ আসতে হবে। পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটির শেষ ব্যবস্থা করতে। তবে তিনি খুশি মনে শেষমেষ তাদের বংশের এই ফাঁড়া কাটল।



নিয়মভাঙা নিয়ম

সোমালি সরকার



প্রতিটি ভালোবাসার আলাদা একটা গন্ধ থাকে। আজ ক্রমশ জোড়ালো হচ্ছিলো গন্ধটা। রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টের আলোটা কিছুটা ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে যেটুকু চোখ যাচ্ছে তাও যেন ধীরে ধীরে কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে। আমি তার মধ্যেই হেঁটে চলেছি করিডোর ধরে। কানে আসছে ভায়োলিনের আওয়াজটা । রোজ নিয়ম করে সুরটা বেজে উঠতো চিলেকোঠার ঘর থেকে ''আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা..."

আজও একই ভাবে বেজে চলেছে গানটা। আর বিদ্যুতের ঝলকানির মতোই কেঁপে উঠছে হৃৎযন্ত্রটা। একটা এলমেলো সুরের আকর্ষণে এগিয়ে চলেছি আমি।

আধখানা চাঁদ মেঘে ঢাকছে ক্রমশ। আর সেই চলমান মেঘের সাথে পা মিলিয়ে চলেছি আমি। পশ্চিমের আকাশে গোধূলির

শেষ রঙ ছড়িয়ে যখন নেমে আসে অন্ধকার ঠিক তখনই নিয়ম করে বেজে ওঠে সুরটা।

আমি ভুলে যাই শহরের কোলাহল। কানে বেজে ওঠে দেহাতি গানের সুর, পলাশের রঙ মাখিয়ে অনুভবের পশরা সাজিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় জানলার কাছে। কখনো বা মলিন বিছানায় এলিয়ে দিই শরীর। একটা শান্তির ঘুম। দীর্ঘমেয়াদি অপেক্ষার প্রেমকে প্রশ্রয় দেয়। অপার নিস্তব্ধতায় নিংড়েনি সবটুকু সুখ।

এক মাস আগেই এবাড়িতে এসেছিলো ছেলেটা। সবার আড়ালে আমি শুধু দেখেছিলাম চোখ দুটো। মায়াময় গভীর দুটো চোখ। গুমোট বাড়িটার চার দেওয়ালে বসন্তের রঙ গাঢ় হয়ে উঠেছিলো নিমেষে। আমার মনে হয়েছিল আবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমি। একটা শূন্যতা ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছিলো ওর পায়ের স্পর্শে।

চিলে কোঠার ঘরটা বরাদ্দ হয়েছিলো ওর জন্য। আর সবার মতোই ওর সাথে চলছিলাম আমি। মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম গলার স্বর। বুঝতে চাইছিলাম চোখের ভাষা। ঠোঁটের কোনায় ফুটে ওঠা হাসিটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় ওর মুখোমুখি বসেছিলাম দীর্ঘ সময়।

পরিচয় দিয়েছিল নিজেকে নীল বলে। মাঝে মাঝে উদাস হয়ে আকাশ দেখতো নীল। আমিও তাকিয়ে থাকতাম ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে। অনুভব করতাম একটা মুক্তির হাতছানি।

সত্যি! আকাশের ওই রঙটার মতোই নীলাভ আভরণে গোটা বাড়িটায় ছড়িয়ে দিয়েছিল ভালোবাসা। অনেকবার চেষ্টা করেছি ছুঁয়ে দেখার। বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। কোনো অদৃশ্য হাতিয়ার পবিত্র করেছিলো ওকে।

বলা হয়নি ভালোবাসি। চিলে কোঠার জানলার ধারে চুপিচুপি এলিয়ে দিয়েছি খোলা চুল। বারবার ওকে ছুঁয়ে গেছে অতি সন্তর্পনে। হ্যাঁ এটাই প্রেম। নিবিড় একটা সম্পর্কের সমীকরণ।

আমি পেরেছি ভালোবাসাকে লালন করতে। ওর কথায় ওর গানে বারবার হারিয়ে যেতে। এখন আমি ওর ঘরেই থাকি। কখনো বইয়ের ভাঁজে কখনো ভায়োলনের সুরে কখনো বা ওর ঘুমন্ত ঠোঁটে। মাঝে মাঝে মনে হয় নীল সবটা বোঝে। নতুবা কেন ছুঁয়ে দেখে বিছানাটা। জানলার পাল্লা দুটো সন্ধ্যা নামলেই খুলে। আনমনে বলে অনুভূতির কথাগুলো।

সেদিন যখন বৃষ্টি পড়ছিলো অঝোরে তখন বৃষ্টি ছুঁয়ে বলছিল, "তোমার স্পর্শ আছে শীতলতায়, আছে বিদ্যুতের চমকে, আছে সন্ধ্যার এই গাঢ় অন্ধকারে, তোমার স্পর্শ আছে প্রতিটি শব্দে, সুরে, অদৃশ্য অনুভূতি দিয়ে তোমাকে সাজিয়ে তুলেছি আমি, বুকের বাঁদিকে চলমান যন্ত্রটা শুধু তোমার ছোঁয়াতেই প্রাণ পেয়েছে।"

আমি অবাক হয়ে ওর বলে যাওয়া অনুভূতিগুলো মিলিয়ে নিতাম নিজের অনুভূতির সাথে। মনে হতো সবটা পেয়ে শূন্যতাকে জয় করেছি আমি। আমি ভীষণ খুশি হতাম। সারা ছাদময় ছড়িয়ে যেত জুঁই ফুলের গন্ধ। লাজুক নয়ন ঢেকে নিতাম অবগুন্ঠনে। রাত আর দিনগুলো এভাবেই কাটছিলো অপেক্ষায়।

একদিন একটা ঝড় উঠল বাড়িটা ঘিরে। হাওয়ার বেগে বাগানের গাছগুলো থেকে একটা একটা করে ভাঙছিলো পাখির বাসাগুলো। আমি ছুটে গিয়েছিলাম ওর ঘরের দিকে। বড্ড ভয় করছিলো আমার। চুপিসারে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানলার পাশে। জানলা দিয়ে ওকে দেখতে গিয়ে দেখলাম চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে নীল। বুঝলাম আমার ভালোবাসা শুধু আমার নিজের। ও বোঝেনা আমার উপস্থিতি। আমার হৃৎস্পন্দন।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর সেই বৃষ্টিতে ভিজে উঠছে আমার মন, আমার সাজানো ঘর ভেঙে ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। আমি টুকরোগুলো বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। তখনই বাজ পড়ল দূরের গাছটাতে। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনলাম। চলে যাচ্ছে নীল। আমার সবটুকু শূন্য করে চলে যাচ্ছে।

ঘরটা শূন্যতাই ভরে উঠছে ধীরে ধীরে। ওর গায়ের গন্ধটুকু শুধু ছড়িয়ে আছে ঘরময়।

আজ বহুদিন হয়ে গেল অপেক্ষায় আছি আমি। এখনো বিশ্বাস করি একদিন ঠিক ফিরে আসবে। পরিপূর্ণ হয়ে উঠবো আবার। আলো আর শব্দের সিঁড়ি বেয়ে মিশে যাবো নীলাভ আকাশে। এই বদ্ধ বাড়িটা থেকে সেদিনই হবে আমার মুক্তি।

ঘরটা রোজ গুছিয়ে রাখি যত্নে। মাঝে মাঝে গুনগুন করে উঠি আপন মনে, "আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা।"



লাশের ঠিকানা

দেবাশিস বিশ্বাস



এ এক সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবী! চারদিকে শুধুই শুকনো বালি আর রুক্ষ টিলা, যত্রতত্র! না আছে সবুজ, না আছে নীল! একটা বিষণ্ণতায় ভরা আবছা অন্ধকার সদা বিরাজমান এই অঞ্চলে! না, এখানে আকাশ লাল করে সূর্য ওঠে না! দিন রাত সবই এক এখানে!

আর প্রাণ? না নেই। এ হল প্রাণহীনের জগৎ। সময়ও শ্বাস নিতে ভয় পায় এখানে! বালি, পাথর, থমকে থাকা হাওয়া বা ধূসর আবছা অন্ধকার, প্রাণহীন সকলেই রোজকারের প্রতীক্ষায়, কখন তিনি আসবেন! ওই তো, বলতে বলতেই তার পায়ের আওয়াজ। চকিতেই সজাগ সারা চরাচর। ভারী বুট দুটো মাটিতে ঘষে ঘষে চলার এক অত্যন্ত কলুষিত শব্দ, কানে আসলেই যা মাথায় পিন ফোটানো ব্যথা উদ্রেক করে! আজও বোঝা গেল না মানুষটি জীবিত না মৃত! সারা শরীর পরিপাটি করা পোশাকে ঢাকা হলেও মুখমন্ডলটি অন্ধকারাচ্ছন্ন! মানুষটি রোজ আসেন এখানে, কোন অজানা উদ্দেশ্যে কেউ জানে না তা। মানুষটির পিঠে আজও তিনটি লাশ বাঁধা, আগের দিনের মতোই! না তো, তিনটি নয়, আরো দুটি লাশের সংযোজন হয়েছে! পাঁচটি লাশ পিঠে বেঁধে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি! সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভয়ের রেশ এতটাই তীব্র যে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ পড়ার আগেই বালির রাশি নিজে থেকেই দুপাশে পালিয়ে যাচ্ছে সরসর আওয়াজ করে!

"লাশগুলোর আজ ঠিকানা লাগাতেই হবে, যে করে হোক!" এই একই বাক্য মুখস্ত বিদ্যার মতো বিরামহীন আউড়ে চলেছেন সেই রহস্যময় লাশবাহক! এই চরাচরের প্রাণহীন সকলেই জানেন কিছু সময় ধরে তাদের সহ্য করতে হবে এই ভয়ানক দৃশ্য! একসময় ফিরেও যাবেন লাশবাহক, ঠিক যে পথে এসেছেন সেই পথ ধরেই। সকলে এও জানে যে লাশগুলোর গতি আজও হবে না। লাশের মায়ায় বাঁধা পড়েছে মানুষটি, তা না হলে এই চরাচরের যেকোনো একটি স্থানে লাশগুলোকে মাটিচাপা দেওয়া এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। ওই যে, ফিরে চললেন রহস্যময় মানুষটি, লাশের বোঝা সাথে করেই! বালি, পাথর আবার তাদের নিজেদের স্থানে ফেরত এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে। শুরু হয় পরবর্তী আগমনের প্রতীক্ষা। আগমনও ঘটে, বারবার। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, বারবার। সব কিছুই একই থাকে, বাড়তে থাকে শুধু লাশের সংখ্যা! লাশের ভারে মানুষটির আজ পিঠটান করারও উপায় নেই। এ দৃশ্য দেখা সত্যি যন্ত্রণাদায়ক, প্রাণহীনের শরীরেও করুণার সঞ্চার ঘটে এই দৃশ্যের প্রভাবে।

সময় কোথা দিয়ে বেরিয়ে যায়...

প্রাণহীন বালি আর পাথরের টুকরোগুলো আজ একেবারেই চমকে গিয়েছে! এত বছরের একই দৃশ্যের বদল দেখে অভিভূত তারা! তাদের চেনা সেই লাশবাহকের এ কোন রূপ আজ! পিঠে লাশের বোঝা উধাও, আজ বোঝার ভূমিকায় স্বয়ং তিনিই! আজ আর তার মুখমন্ডল অন্ধকারের কবলে নেই, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মানুষটি মৃত। তাঁর লাশকে বয়ে এগিয়ে চলেছে সেই সমস্ত লাশের দল যারা এতদিন এই মানুষটির পিঠে চেপে এই চরাচর ঘুরে আবার ফিরে যেত! লাশগুলোর ফ্যাকাশে মুখ দৃষ্টিগোচর হতেই আরও বিস্ময়! এরা সকলেই তো ওই মৃত মানুষটির লাশ! কি করে সম্ভব? একটি মানুষের এতগুলো মৃতদেহ! একজন মানুষ কতবার মরতে পারেন? ঠিক তখনই বালি আর পাথরের টুকরোদের এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভেসে আসে একদল মাতাল হাওয়া।

"শুরুটা হয়েছিল পরিবারের চাপে নিজের প্রেমিকাকে প্রত্যাখ্যান করে। একসাথে দুটি লাশ পড়েছিল সেদিন। ভালোবাসা আর বিশ্বাসের। তারপর একদিন সেই বাসের ভিড়ে, নিজের বোনের বয়সী মেয়েটির লাঞ্ছনা মুখ বুজে দেখার সময়, লাশ পড়েছিল সাহসের। তারপর সেই বৃষ্টির রাত মনে নেই? গর্ভবতী স্ত্রীকে বাড়িতে ফেলে এক নিষিদ্ধ কোঠায় নিশিযাপন, মৃত্যু হয়েছিল সংযম আর ভরসার। ঘুষ দিয়ে নিজের পদোন্নতির দিনই খুন হল শিক্ষা ও সততা। লাশের সংখ্যা আরেকটি বাড়ল যেদিন নিজের মাতৃদেবির নামটি বৃদ্ধাশ্রমের খাতায় নথিভুক্ত করে এলেন, নির্মমভাবে খুন হল মনুষ্যত্ব! লাশের সংখ্যা

এভাবেই বেড়ে চলে ক্রমশঃ। কিন্তু সেই সব লাশের ঠিকানা লাগানো সম্ভব হয় না কোনোদিনই।”

জলের মতোই পরিষ্কার সব এখন। এতদিনের সেই লাশবাহকের মৃতদেহ নিজেই আজ ঠিকানার অভাবে দিশেহারা! যাঁদের তিনি জীবনের বিভিন্ন সময় নিজের হাতেই খুন করেছিলেন, তাঁদেরই কাঁধে সওয়ার হয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে হয় তাঁকে। আর নির্বাক হয়ে রঙ্গ দেখতে থাকে প্রাণহীন বালি ও পাথরের টুকরোরা, করুণার তরঙ্গকে দূরে সরিয়ে রেখে।।



শেষযাত্রা

কালের কুহক



প্রতিদিনই এই সময় ঝুল বারান্দার আরাম কেদারায় গা এলিয়ে পাহাড়ের খাঁজে সূর্যাস্ত দেখেন চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ মানুষটি। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সামনের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া পাইনের বন পেরিয়ে তারপর যে পাহাড়ের প্রাচীর, তারই ফাঁক ফোঁকর দিয়ে যখন দিনের প্রহর শেষের রকমারি রঙের খেলায় আকাশ মেতে ওঠে, বৃদ্ধের দৃষ্টিও এক নিমেষে হারিয়ে যায় জীবনের ফেলে আসা প্রহরগুলির আঁকে বাঁকে।

আজ বাতাসের গতি ঠিক রোজকার মতোন না, বরং বিপরীত! সূর্য অস্ত গেছে কিছুক্ষণ হল। বৃদ্ধ এখনও ব্যালকনিতে বসা, চাকর তামাং বাজার থেকে ফিরলে তবেই তিনি উঠতে পারবেন তার কাঁধে ভর দিয়ে। এরই মধ্যে কখন যেন একটি অশরীরী মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধের ঠিক পিছনে! হাবভাব দেখেই বোঝা যায় তিনি পরলোকের অধিবাসী! কিছুক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বৃদ্ধকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে তারপর বৃদ্ধের সামনে এসে দেখা দিলেন তিনি! আঁতকে উঠে বুকে হাত দিতেই যাবেন বৃদ্ধ, তখনই মুখ খুললেন অশরীরী, ‘‘না, হৃদস্পন্দন বন্ধ হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। চলো, এই অবসরে একটু ঘুরে আসা যাক উল্টোপথে।”

বৃদ্ধকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তাঁর শরীর থেকে সমস্ত চেতনার একটা অবয়ব টেনে বের করে কোনো এক অজানার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন অশরীরী! আরামকেদারায় অচৈতন্য পড়ে রইলো বৃদ্ধের শরীর, ঘুমের ঘোরে!

বৃদ্ধের চেতনাকে সাথে নিয়ে অশরীরী হাজির হলেন একটি সুদৃশ্য বাসভবনে! গভীর রাত সেখানে। গৃহকর্তা আজই নিজের কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে হালকা মনে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অশরীরীর ডাকে সেই ঘুমের মধ্যে থেকেই উঠে বসলেন গৃহকর্তার চেতনা সমষ্টি! গভীর রাতের অন্ধকারে মিশে আবার শুরু হল যাত্রা, এবার তিনজনে মিলে!

পরবর্তী গন্তব্য একটি দুই কামরার নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর। বাড়ির ছেলে গভীর উৎকণ্ঠায়, নিজের ঘরে দোর এঁটে বসে আছে! চাকরির পরীক্ষার ফলাফল আজই আসার কথা। বন্ধ দরজা যদিও তিন অশরীরীকে বাধা দিতে পারল না। তিনজনে মিলে কিছুক্ষণের জন্য সেই যুবকের চেতনাকেও দলে টেনে নিলেন। বিছানায় ঘুমিয়ে থাকলো যুবকের শরীর।

অনেকখানি পথ অতিক্রান্ত। এই জায়গাটি একটি স্কুল চত্বর। দশম শ্রেণীর ক্লাস ঘরে শেষ দিকের একটা বেঞ্চে একটি ছাত্র আনমনা হয়ে চেয়ে আছে জানলার বাইরে আকাশের দিকে। মাস্টার মশাইয়ের কোনো কথাই তার কানে আসছে না। আসবে কি করে? সেই চার অশরীরী একটু আগেই যে ওই ছাত্রের কৈশোরের চেতনা আর বোধকে নিজেদের সাথে টেনে নিয়ে নিজেদের পরবর্তী গন্তব্যের পথে!

পর পর চলেছেন পাঁচজন। একদম সামনে সেই পরলোকের অশরীরী, ঠিক পিছনে সেই অশীতিপর বৃদ্ধের ঝাপসা চেতনা, তাঁর পিছনে অবসরপ্রাপ্ত গৃহকর্তার হালকা চেতনা, তারও পিছনে একটা ভালো চাকরির পাওয়ার লক্ষ্যে অশান্ত যুবকের চেতনা সমষ্টি, আর একদম পিছনে স্কুলের আনমনা ছাত্রটি!

ধীরে ধীরে সকলে এসে উপস্থিত হলেন একটি হাসপাতালের শিশুভবনে! লগ্ন উপস্থিত! সব কিছু ভুলে পাঁচজনের দৃষ্টি এখন শুধুই একটি সদ্যজাত শিশুর দিকে! শিশুটিও যেন একঝলক দৃষ্টি বিনিময় করল সেই পাঁচজনের সঙ্গে! আর তার পরেই সেই প্রথম কান্না! সেটা অশরীরী দেখে ভয় পেয়ে কিনা জানা গেল না!

উল্টোদিকের যাত্রা এখানেই সমাপ্ত। ঘণ্টা খানেক অতিবাহিত। নিজের ফেলা আসা গোটা জীবন, বার্ধক্য থেকে জন্মলগ্ন, শেষবারের মতো চাক্ষুষ করে নিজের সময়ে ফিরে এসেছেন বৃদ্ধ। পাশেই দাঁড়িয়ে সেই অশরীরী, শেষবারের মতো বললেন "এবার সময় হয়ে এল তোমার। পরলোকের এপারে দাঁড়িয়ে আছি তোমার সাথে মিলিত হব বলে... আমিই যে তোমার ভবিষ্যৎ... যাত্রা শুভ হোক।"

সাথে সাথেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইহলোকের পালা সাঙ্গ করলেন বৃদ্ধ। সম্পন্ন হল শেষযাত্রা। পাহাড়ের ঠান্ডা বাতাস আবার তার স্বাভাবিক পথে বইতে শুরু করেছে ততক্ষণে।



মেকআপ

নিবেদিতা বিশ্বাস



অনেকক্ষণ থেকে লোকটা ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে মোনার। যদিও এই ভাবে তাকিয়ে থাকা লোক দেখার অভ্যেস আছে তার, তবু আজ যেন একটু বেশিই বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।

আসলে করোনার জন্য গতবছর থেকে তার দৈনন্দিন রুটিনটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আগে দিনভর কতরকম মানুষের সান্নিধ্যে আসতো সে, কিন্তু যবে থেকে লকডাউন হয়েছে, একলা থাকতেই বেশি ভালো লাগে।

হবে নাই বা কেনো? সেই কবে থেকে লোকের তাকে নিয়ে যত মাথাব্যথা। সে কুমারী না বিবাহিতা, এমন সাদামাটা হবার কারণ কি, তাকে দেখতে এমন কেন, আরো কত কি...

তার থেকে এই ভালো। একলা সময়ে সে নিজের মনে গান গায়, কবে থেকে আছে বাড়িটায়, অথচ কিছুই চিনতো না; এখন বিশাল বাড়ির সবটা ঘুরে ঘুরে দেখে, কিছুই ভালো না লাগলে টেনে ঘুম দেয়। একটানা বসে থেকে কোমরে যে সমস্যাটা হয়েছিল, কমাস ভোরে হাল্কা যোগব্যায়াম করে এখন সেটাও ঠিকঠাক।

আশে পাশে তার মতো আরো অনেকের সাথে আগে আলাপ থাকলেও সময়ের অভাবে সেভাবে গল্প হতো না। লকডাউনে অঢেল সময়, সবার সাথে গল্প করতে করতে কত কি শিখেছে সে। তার এই সাদামাটা সাজগোজহীন চেহারা দেখে হেলেনই তো বুদ্ধিটা দিল। মেয়েটা খুব ভালো। সৌন্দর্য তো আছেই, তার সাথে বেশ ব্যক্তিত্বময়ী। সবাই পাগল ওর জন্য। ওর কাছেই তো মোনার মেকআপের হাতেখড়ি। এখন বেশ পরিপাটি করে সেজে আয়নায় নিজেকে দেখতে ভারী ভালো লাগে মোনার।

আরে...মেকআপ! এইবার পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার হয়েছে। সর্বনাশ করে বসে আছে সে...

গত সপ্তাহে করোনার আতঙ্ক প্রায় শেষের পথে দেখে লকডাউন তুলে সব স্বাভাবিক করা হয়েছে। কিন্তু বেখেয়ালী মোনা সকালে ঘুম থেকে উঠে রোজকার অভ্যাস মতো ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে ঠোঁট রাঙিয়েছিল ডিপ মেরুন লিপস্টিকে, আর কাজল পেন্সিল দিয়ে এঁকেছিল এক জোড়া ঘন বাদামি ভুরু। সেই আঁকা ভুরু যে এই গোল বাঁধাবে তা কী আর মনেছিল?

লোকটা বেশ খানিকক্ষণ চোখ মুখ কুঁচকে দেখার পর না জানি কি ভাবতে ভাবতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই, মোনা

দৌড় লাগাল মেকআপ তুলতে। সেই সময় যদি একটিবার লোকটা পিছন ফিরে তাকাতো, তাহলে দেখতে পেতো মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখা ইতালীয় চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত 'দ্য মোনালিসা' চিত্রে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সামনে রাখা চেয়ারটা এখন বিলকুল ফাঁকা।



মায়া

অর্পিতা চ্যাটার্জী



টুকুন আজকাল আর আগের মতো সব সময় মাক দেখতে পায় না। শুধুমাত্র বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা নামার পর মাঝে মধ্যে মাকে দেখতে পায়। তারপর যখন নিকষ রাত্রি নিস্তব্ধতার মালা গাঁথে তখন বাবাকে এড়িয়ে চুপিচুপি টুকুন মায়ের কোলের কাছে চলে যায়। মায়ের গায়ের গন্ধে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে তার।

কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল ক্লাস থ্রি-তে পড়া টুকুনের ছোট্ট মাথায় এত কিছু ঢোকে না। সেদিন ওরা তিনজন সিনেমা দেখে ফিরছিল আইসক্রিম খেতে খেতে। হঠাৎ কোথা থেকে সেই বিরাট লরিটা প্রচণ্ড গতিতে টলতে টলতে ওদের দিকেই এগিয়ে এল, টুকুনের শুধু মনে আছে ওর মা রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে গেল। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না। জ্ঞান ফেরার পর থেকেই দেখছে বাবা ওকে আগলে রাখছে সব সময়। যখনই মায়ের কাছে যেতে চেয়েছে, বাবা বলেছে, ''আজ থেকে টুকুন তুমি শুধু আমার কাছেই থাকবে, আমাকেই তোমার সব কথা বলবে। দিনরাত মায়ের কাছে যাবার বায়না আমি আর নিতে পারছি না। যদি তুমি এইরকম পাগলামো করতে থাকো তাহলে আমি বাধ্য হবো এ বাড়ি ছেড়ে তোমাকে নিয়ে চলে যেতে।"

টুকুন আজকেও দেখল ওর মা-কে! ঠিক একইভাবে টেবিলের কোনটা ধরে উদাসী চোখে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে, একদৃষ্টিতে। না, কোন দেখার ভুল হয়নি টুকুনের, ওই তো আবার, আবার ওর মায়ের চোখ গড়িয়ে জল নেমে এল... মাকে কাঁদতে দেখলে টুকুনের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে, টুকুন কতবার ওর বাবাকে বলেছে একটিবার মায়ের কাছে যাও, একটু মাকে হামি খেয়ে দাও, চকলেট এনে দাও কিন্তু টুকুনের বাবা টুকুনের কথা কিছুতেই শোনে না। কিছু বললেই বলে, ''সম্ভব না, আমরা যে এখন আলাদা হয়ে গেছি সোনা, তোমার মা আমাদের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে।"

বাবাকে খুব ভয় করে টুকুন, তবুও মা-কে কাঁদতে দেখলে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না, ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে টুকুন দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে! ছোট ছোট নরম আঙুলগুলো দিয়ে মায়ের চোখ মুছিয়ে গালে হামি খায়, ''কাঁদছো কেন মা? এই তো আমি!"

সুচরিতা মানে টুকুনের মায়ের সারা শরীরে একটা ঠান্ডা হাওয়া খেলা করতে থাকে, কেমন একটা নরম আবেগে চোখ ঠেলে নোনা জলের স্রোত নামতে চায় বুক ভাসিয়ে...

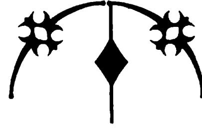
''কোথায় গেলে... কেন গেলে আমায় একা করে... কেন গেলে তোমরা..." আকুল কণ্ঠে কেঁদে ওঠেন সুচরিতা..

তার চোখের সামনের দেওয়ালে টাঙানো টুকুন আর টুকুন এর বাবার ছবিতে দেওয়া রজনীগন্ধার মালাটা একটু দুলে উঠল যেন...!



বিভাগ: সত্য ঘটনা অবলম্বনে





ত্রিকালদর্শী

সুমনা মুখার্জী



আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। বুদ্ধি দিয়ে যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না।

চোখের সামনে ঘটলে মন মেনে নিলেও, মস্তিষ্ক মানতে নারাজ। বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উৎপত্তি হয় তর্কের। না। আমি কোনো তর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু একটি নির্ভেজাল সত্যঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

***ঘটনাটি ঘটেছিল মুর্শিদাবাদের কোনো এক রেলস্টেশনে। সময়টা ছিল ১৯৬০ কি ৭০ এর দশক।

আমার দাদাশ্বশুর মুর্শিদাবাদ থানার ওসি ছিলেন। সেইসময় উনি রানিনগর থানায় পোস্টেড ছিলেন। নাতিনাতনিরা ওনাকে ভাইয়া বলে ডাকে। নিজের চাকুরী জীবনে ভাইয়া এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যার কোনো ব্যাখ্যা আজও দেওয়া যায় না। তবে যে ঘটনাটি ভাইয়াকে খুব বিচলিত করেছিল, সেই ঘটনাটিই আজ বলবো আমার লেখনীর মাধ্যমে।

আগেও বলেছি ভাইয়া ওসি ছিলেন। যেখানেই যেতেন পুলিশের জিপে করেই যেতেন। একদিন ভাইয়াকে রানিনগর থেকে মুর্শিদাবাদেরই কোন জায়গায় যেতে হয়েছিল। সেদিন কোনো কারণবশত জিপটি ছিল না। হয়তো খারাপ হয়েছিল বা অন্যকোনো কাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অগত্যা ভাইয়া দু-জন কনস্টেবলকে নিয়ে রেলস্টেশনের দিকে রওনা দেন। ট্রেন মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। তাঁরা বসার জায়গাও পেয়ে যান। বাঁদিকে ভাইয়ারা বসেছিলেন। ট্রেনের মুখ যেদিকে, সেদিক থেকে বাঁদিক। কিছু পরে একটি পরিবার ওঠে। স্বামী স্ত্রী আর দুই ছেলে। ছেলেদুটি বেশ বড়। তারা ডানদিকের বসার জায়গায় ভাগাভাগি করে বসে। তাদের উল্টোদিকে যাঁরা ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন গেরুয়াবসনধারী সাধক গোছের আর সাথে তাঁরই কিছু শিষ্য রয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করে।

বেশ কিছুক্ষণ পর স্ত্রীলোকটি একটু উশখুশ করতে শুরু করেন। একটা চাপা গুঞ্জনও তৈরি হচ্ছে। ভাইয়া একবার ওদিকে

তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন কিন্তু সামনে অন্য যাত্রী দাঁড়িয়ে থাকায় কিছু দেখতে পাননি। এদিকে ভদ্রমহিলার অস্বস্তি ক্রমশই বাড়ছে। যার রেশ ওনার স্বামীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। বেশ অসন্তুষ্ট হচ্ছেন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ছেলেদুটিও বুঝতে পারছে মা কেন বিরক্তি বোধ করছে। অতঃপর থাকতে না পেরে একজন বেশ চড়া গলায় বলল, ''এই যে কাকা কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?'' অপরদিকে বসা সাধক ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলা কথাগুলো। কিন্তু উনি নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। এবার স্ত্রীলোকটি অধৈর্য্য হয়ে ডান হাতের তর্জনী তুলে ''দেখুন আপনার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে আপনি সন্নিসি। এমন কাজ কি আপনাকে শোভা দেয়?'' এবারের লক্ষ্যও সেই সাধক। মহিলাকে উত্তেজিত হতে দেখে সামনে দাঁড়ানো অন্যান্য যাত্রীরাও ক্ষেপে ওঠে। ''সাধুবেশী ভন্ড ব্যাটা'', ''মহিলা দেখেছে না''; ইত্যাদি নানা প্রকার কুরুচিকর মন্তব্য করতে থাকে। ওনার শিষ্যরাও তখন ক্ষেপে ওঠে। বেশভালোই বচসা শুরু হয়ে যায়। ভাইয়া এসব দেখে নিজের জায়গা থেকে উঠে, ভিড় ঠেলে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, পুলিশের পোশাক দেখে সকলেই চুপ করে যায়। গম্ভীর গলায় ভাইয়া প্রশ্ন করেন, ''কি হয়েছে? কিসের এত চেঁচামেচি এখানে।''

''সেটা এনাকেই জিজ্ঞেস করুন স্যার।'' ভদ্রলোকের ছেলেটি বলল বিরক্তি ভরে সেই সাধকব্যক্তির দিকে তাকিয়ে। আসলে হয়েছিল কি ওই সাধকমানুষটি বারবারই ওই ছেলেদুটির মায়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন। প্রথমদিকে মহিলাটি আমল দেননি কিন্তু পরে ভীষণ বিরক্তিবোধ করছিলেন। তার পরিবারও লক্ষ্য করে ব্যাপারটা। সেই থেকে বচসার শুরু।

ভাইয়া দেখলেন মহিলাটির বয়স বেশি নয়। ফর্সা, সুশ্রী, কপালে একটি লাল টিপ রয়েছে। ভাইয়া তখন সকলকে শান্ত করে ওই সাধক ভদ্রলোকটিকে উঠিয়ে নিজে যেখানে বসেছিলেন সেখানে নিয়ে গিয়ে বসান। ভদ্রলোকটি একটু যেন অস্থির। ভাইয়া তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন ওনার এমন আচরণের কারণ কি? ভদ্রলোক প্রথমটা চুপ করে রইলেন,তারপর ধীরে ধীরে উনি বললেন, ''আমি কোনো মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে ওনার দিকে তাকাই নি। কিন্তু যতবারই ওঁর দিকে আমার চোখ পড়েছে, ততবারই আমি দেখেছি ওঁর সিঁথি এবং কপাল পুরো সাদা, বারবার একই দেখছি। ভাইয়া শুনে একবার ভদ্রমহিলাকে দেখে নেন। সধবা মহিলা, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে লাল টিপ, তাহলে ইনি কি বলছেন। এসব ভাবতে ভাবতেই গন্তব্য এসে পড়ায় ভাইয়া ও দুই কনস্টেবল নেমে পড়েন আর ওই পরিবারটি এবং ওই ভদ্রলোকটিও নামেন। ভাইয়ারা নেমে একটু দাঁড়িয়েছিলেন ভিড়টা কমলে যাবেন। হঠাৎই ওভারব্রিজের সিঁড়ি থেকে বেশ শোরগোল শোনা যায়। ভাইয়ারা সেদিকে যান, সামনে কিছু মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে, তাদের সরিয়ে ভাইয়া যা দেখলেন তাতে একমুহূর্তের জন্য অমন ডাকসাইটে ওসিও চমকে উঠেছিলেন। ভাইয়া দেখলেন ট্রেনের সহযাত্রী সেই পরিবারটি, ভদ্রলোকটি সিঁড়ির একপাশে পড়ে আছেন। ওনার স্ত্রী বারবার ওনাকে ডাকছেন। নাকের কাছে আঙুল দিলে বোঝা গেল... ওনার শরীরে প্রাণ নেই। প্রত্যক্ষদর্শী একজন বলল ভদ্রলোক ঠিকঠাক উঠে আসছিলেন, হঠাৎই একটি কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যান আর টাল সামলাতে না পেরে মাথাটা গিয়ে লাগে লোহার রেলিঙে। তখনি সব শেষ।

ভাইয়া কি বলবেন ভেবে পাননি। শুধু বারবার ওই সাধকমানুষটির বলা কথাগুলো মনে পড়ছিল। স্টেশনচত্বরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিলেন কিন্তু তাঁকে আর দেখা যায়নি...।



মায়ার টানে

তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়



এই গল্পটি আমি অল্পবয়সে শুনেছিলাম এক বয়স্কা আত্মীয়ার মুখে। সম্পর্কে দিদা হতেন। চল্লিশের দশকের কথা, তাঁর

স্বামী ভালো সরকারি চাকরি করতেন এবং সেই কারণে তাঁরা সপরিবারে বিহারের বিভিন্ন শহরে থেকেছেন। তখনকার দিনের ব্যাপার, বড়ো কোয়ার্টার পেতেন তাঁরা, অনেক চাকর-দাসী থাকতো।

দিদার অনেকগুলি সন্তানছিল, তারা বড়ো হয়েছে, ছোটো ছেলে দেবুর বয়স সাত-আট তখন। ওকে বিশেষভাবে দেখাশুনো করতো বদরী বলে একটি বিহারী লোক। ভারী বিশ্বাসী মানুষ, অনেকদিন আছে পরিবারটির সঙ্গে। মাঝে মাঝে দেহাত থেকে ঘুরে আসতো, সেখানে বৌ-ছেলে ছিল ওর। কর্মঠ, হাসিখুশি, বাঁকা বাংলা বলে, বাঁ পায়ে একটা গোদের কারণে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। দেবু ওকে বদ্দু বলে ডাকতো।

সে সময় ওঁরা বিহারের একটি মাঝারি শহরে আছেন । ইলেকট্রিক নেই, তবে তাতে ওঁরা অভ্যস্ত ছিলেন । এ সময় এক দেশোয়ালি লোক খবর আনলো, বদ্দুর গাঁয়ে যাওয়া প্রয়োজন, ক্ষেতি-জমিটমি নিয়ে কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে, শিগগীরিই ফিরে আসার আশ্বাস দিয়ে পুঁটলি টিনের বাক্স গুছিয়ে নিয়ে বদ্দু চলে গেল। যাবার আগে দেবুর মুখভার দেখে বলে গেল, ''হামি জলদি লৌটকে আসবো দেবু ভৈয়া।''

ক-দিন কাটলো। একদিন সন্ধ্যেবেলা দিদা, তাঁর ছোট-জা আর বিধবা ননদ যাঁরা ওঁদের সঙ্গেই থাকতেন—হাতের কাজ সেরে ভেতর বারান্দায় বসে গল্প করছেন। দেবু ওর দাদা-দিদিদের বড্ড বিরক্ত করে বলে ও একটা আলাদা ঘরে মেঝেতে মাদুরের ওপর বই-খাতা ছড়িয়ে পড়াশোনা করে। তা হঠাৎ দেখা গেল দেবু বই-টই নিয়ে মায়েদের কাছে চলে এসেছে।

— ''কী হল রে? এখেনে কেন ?'' ৯৭৪৯৪৭২৩৭৯

— ''ন্-না। এমনি।''

ওঁরা কিছু বললেন না তখন, কিন্তু দেবু ওরকম করতেই থাকলো। রাত্রে একটা ঘরে ও আর এক দাদা দুটো খাটে শুতো, মাঝরাতে দাদাকে তুলে বলল, ''তুমি এদিকের খাটে এসো।'' দাদা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলল, ''ধ্যেৎ, ঘুমো গিয়ে।'' দেবু বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে গিয়ে অন্যঘরে মা-বাবার কাছে গিয়ে শুলো। জিজ্ঞেস করলে বলল, ''আমার দিকে জানলা। ভয় করছিল।''

পরের দিন কিছুতেই বলল না কিসের ভয়। গুম হয়ে গেল। এটা একটু অদ্ভুত কারণ দেবুর বকবক করা স্বভাব। দিনের বেলা উঠোন পেরিয়ে বাথরুমে যাবার ব্যবস্থা, দেবু কিছুতেই যেতে রাজি নয়। একদম একা থাকতে চায় না। রাত্রে ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠে। এবার সবাই উদ্বিগ্নহল, ঝি-চাকরেরা বলল, ''মাইজি, নজর লেগেছে, জরুর কেউ তুক-তাক করেছে'', দিদা অস্থির হয়ে বললেন, ''বদরী সেই গেছে তো গেছেই, এরা দেহাত গেলে আর ফিরতেই চায় না, এলে বাঁচি, দেবুটাকে সামলে রাখতে পারবে।''

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা দেবু আবার মা-পিসির কোল ঘেঁষে বসেছে। দিদা উত্ত্যক্ত হয়ে বললেন, ''চল তো আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি।'' গিয়ে ছেলের সঙ্গে মাদুরে বসে বললেন,

''কই বই খোল দিকি, খালি ফাঁকির মতলব।'' দেবু খাতা খুলল, তারপরেই অন্যদিকে চেয়ে কেমন কাঠ হয়ে গেল, মা-কে আঁকড়ে ধরে। আর দিদা দেখলেন, দরজার পর্দার নিচে দুটো পা দেখা যাচ্ছে, বাঁ পায়ে গোদ। একটু পরে মিলিয়ে গেল। এবার দেবু কান্নাকাটি জুড়ে দিল। বদ্দু নাকি ওর পর্দার আড়ালে আর জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘুম ভাঙলে দেবু দেখে খাটের পাশে উবু হয়ে বসে আছে, আলসের ওপর থেকে তাকায়। বাথরুমের বন্ধ দরজার বাইরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে দাঁড়ায়। ওর চোখগুলো কেমন সাদা এখন।

সবাই বিমূঢ় হয়ে গেল। তার পরদিনই সেই দেশোয়ালি লোক এসে হাঁউমাউ করে জানালো, বদ্দু দেশে যাবার দুতিনদিন পরেই কী জ্বরে মারা গেছে।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন হয়েছিল, তারপর ওঁরা বদলি হয়ে চলে যান। বদ্দু আর আসেনি।



পূর্বাভাস

শ্রুতি চ্যাটার্জি

এই ঘটনা আমার অত্যন্ত নিকটজনের মুখে শোনা। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। তাঁর জবানীতেই বরং বলি—

"কলেজ জীবনে আমার খুব শখ ছিল জ্যোতিষচর্চার। শখ নয়, একরকম নেশাই বলা চলে। নিজে প্রচুর বইপত্র পড়তাম, তাছাড়া একজনের কাছে বেশ মন দিয়েই শিখছিলাম বিদ্যেটা, বলতে নেই, খুব সামান্য হলেও ব্যুৎপত্তি জন্মাচ্ছিল। তবে শখটাকে পেশাদারি কাজে লাগানোর কথা কোনদিনই ভাবিনি।

কলেজ শেষে চাকরিতে ঢুকলাম, স্বাভাবিকভাবেই জ্যোতিষচর্চাসহ অনেক শখেই লাগাম পরাতে হল সময়াভাবে। ইচ্ছে ছিল কখনও ভবিষ্যতে আবার চর্চা শুরু করব নতুন করে, কিন্তু একটা ঘটনায় বাধ্য হলাম সে সংকল্প চিরতরে ত্যাগ করতে!

অফিসের একটা কাজে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি। কাজ মিটিয়ে ফেরার দিন হাতে কয়েকঘণ্টা সময় থাকায় দেখা করতে গেলাম কলেজের এক বন্ধু অজয়ের সঙ্গে। অজয় তখন শিলিগুড়িতে পোস্টেড, আর ওর অফিস আমার গেস্টহাউসের কাছেই। অজয় আমাকে দেখে খুব খুশি। হাতে সময় কম, তবু দুই বন্ধুতে বেশ জমিয়ে আড্ডা হল। 'ঘোষালদা' বলে ওর এক বয়স্ক কলিগের সঙ্গে আলাপ হল, অজয় বলল, "তোর একসময় খুব হাত-টাত দেখার ঝোঁক ছিল না? আমাদের ঘোষালদার শুনেছি হাত দেখতে লাগে না, মুখের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন! তবে বলেন না সহজে, অন্তত আমি কোনদিন শুনিনি!"

ভদ্রলোক বয়সে আমাদের চেয়ে অন্তত আট-দশ বছরের বড়, নেহাতই সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। তিনি দেখলাম খুবই বিব্রতভাবে বিষয়টা এড়িয়ে গেলেন। এমনকি আমাদের চাপাচাপিতেও কিছু বলতে রাজি হলেন না। বুঝলাম ওঁর ক্ষমতা সম্পর্কে যে মিথটা কোনভাবে তৈরি হয়েছে, তা এখন ওঁর নিজেরই অস্বস্তির কারণ! মনে মনে হেসে আবার অজয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

ওই অফিসেরই একটি অল্পবয়সী ছেলে বেশ কিছুক্ষণ থেকে আমাদের কথা শুনছিল। হঠাৎ শুনি সে ঘোষালদাকে ধরেছে, তার ভবিষ্যতটা একটু দেখে দিতে হবে। সামনে একটা বড় কাজে হাত দেবে সে, সাফল্যের সম্ভাবনা কতখানি জানতে চায়! ঘোষালদা আদৌ তার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না, মুখ নামিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলছেন, "যা তো এখন, কাল আসিস। কাল বিকেলের দিকে এলে বলে দেব, এখন যা!"

ছেলেটা দৃশ্যতই অসন্তুষ্ট মুখে বেরিয়ে গেল। আমার একটু মায়াই হল, বললাম, "কিছু একটা বলে দিতেন ঘোষালদা! বেচারার মন-টা খারাপ হল!"

ঘোষালদা আস্তে আস্তে মুখ তুললেন। সেই রক্তশূন্য, বিবর্ণ মুখ আজও আমার চোখে ভাসে! খুব মৃদুকণ্ঠে বললেন, "কাকে কি বলতাম? ওর আর চব্বিশঘণ্টা আয়ু!"

আমি প্রায় ছিটকে গেছি, অজয় উত্তেজিতভাবে বলছে, "তার মানে? এসব কি যা-তা বলছেন?"

ঘোষালদা উঠে দাঁড়ালেন, কান্নার মতো একটু হেসে বললেন, "আমি যে পূর্বাভাস পাই! মানুষের মুখের দিকে চাইলেই... জানি না কেন এই ক্ষমতা... কারও আদেশ নাকি অভিশাপ... আমার কথা মিথ্যে হলে সবচেয়ে খুশি আমি হবো... কালকের কথা বললাম। যদি কাল অবধি ও থাকে...।"

কথা অসমাপ্ত রেখেই মাতালের মতো টলোমলো পায়ে দরজার দিকে এগোলেন ঘোষালদা।

জ্যোতিষচর্চা করার আর কখনো সাহস হয়নি। চর্চায় এ জিনিস হয় না, যে পারে সে এমনিই পারে, তবু ভবিষ্যৎ আগাম জানতে পারার ইচ্ছে হয়নি আর কখনো।

হ্যাঁ, শিলিগুড়ি ছাড়ার দু-দিনের মধ্যে খবর পেয়েছিলাম, রাজীব, অফিসের সেই ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। ঠিক চব্বিশঘণ্টার তফাতে।"



গন্ধ

শাশ্বতী মুন্সী



যেই সময়ের কথা বলছি তখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। সালটা ২০০১, মার্চের মাঝামাঝি শেষ হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা। তার দিন তিনেক পরে কাছের এক প্রিয়জনকে হারিয়েছিলাম। সন্তানসম ভালো বাসতেন আমায়। সম্পর্কে যিনি আমার খুড়তুতো কাকিমা (বাবার মেজোকাকার একমাত্র পুত্রবধূ) হন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মা ভীষণ শোকাহত হয়েছিল। কেননা, জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো জায়ের সম্পর্কের উর্দ্ধে মা আর কাকিমা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।

দশ দিনের দিন ঘাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেজদাদুর বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় সন্ধ্যেবেলা কয়েকজন আত্মীয় এসেছেন। মেজদাদু-মেজঠাম্মা, বাবা, মা খুড়তুতো কাকা (দাদুর ছেলে) সেখানে রয়েছেন। এদিকে আমার দুই খুড়তুতো দিদির (কাকিমার মেয়েরা) মনমরা ভাব খানিক কাটাতে দোতলার লবিতে বসে সিনেমা দেখছিলাম টিভিতে। কিছুক্ষণ পরে দাদু ডাকতে ওরা বলল, ''তুই একা থাকবি...?" বললাম, ''তোমরা যাও, সিনেমাটার লাস্ট সিন্ চলছে, হয়ে গেলে নিচে যাবো।" দোতলায় তখন আর কেউ ছিল না মনযোগ সম্পূর্ণ টিভির দিকে। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে কড়াইতে খুন্তি নাড়ার আওয়াজ কানে এল। প্রথমে পাত্তা দিইনি কিন্তু পরমুহূর্তে মেঝেতে খুন্তি পড়ার ঝনঝন শব্দে রীতিমতো চমকে যাই! একটু যে ভয় করেনি তাও নয়। তবে এক অদম্য কৌতূহলের বশে খাট থেকে নেমে পড়ি। লবি থেকে সোজা তাকালে শেষপ্রান্তে রান্নাঘর। কয়েক পা এগিয়ে রান্নাঘরের কাছে এসে উঁকি দিতে দেখি, গ্যাস ওভেনের ওপর কড়া বসানো নেই, মেঝে পুরো ফাঁকা।

মেজদাদু বলতেন, আমাদের কাছের কোনো আপনজন মারা যাওয়ার পরে কখনো সখনো তারা দেখা দেয়। তাই হয়তো কাকিমার অশরীরী আত্মা সেদিন ওই শব্দের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছিল।

আমার বরাবরের অভ্যাস বিকেলে ছাদের ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে বসে বই পড়া। আমাদের বাড়ির ছাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোন আর মেজদাদুর বাড়ির ছাদের উত্তর-পূর্ব কোন একেবারে মুখোমুখি। আগে ছাদের ঠাকুরঘরে সন্ধ্যে দেখাতে উঠলে প্রায়দিন দেখা হতো কাকিমার সাথে। একটু কথা বলে টবের তুলসি গাছের গোড়ায় ধূপকাঠি গুঁজে সারাবাড়ি সন্ধ্যে দিতে চলে যেত।

নতুন ক্লাসের বই নিয়ে মে মাসের এক বিকেলে সিঁড়িতে বসে পড়ছি। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ছাদের ওই কোনায়। পড়ায় মন বসাতে ছাদের দিকে পিঠ করে সিঁড়ির চাতালে বই রেখে পড়তে লাগলাম। দিনের আলো কমে আসতে খেয়াল হল সন্ধ্যে নেমেছে। আচমকা গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল! অজানা এক আকর্ষণে পেছন ঘুরতে দেখি,ঠাকুরঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাকিমা। পরনে লাল পাড় সাদা পাটের শাড়ি, একহাতে গঙ্গাজলের ঘটি অন্যহাতে জ্বলন্ত ধূপের কাঠি। মুখে স্মিত হাসি। ঘনায়মান সন্ধ্যার আলোতেও কাকিমার পরিচিত মূর্তিটি যেন স্পষ্ট প্রতিভাত। তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি থেকে নেমে ছাদের শেষপ্রান্তে ছুটতেই পলকে মিলিয়ে গেল। তবু ওই কোনায় পৌঁছে একটুক্ষণ দাঁড়ালাম। আর দেখা পাইনি তবে খুব চেনা একটা ধূপের গন্ধ পেয়েছিলাম, যা ওদের ঠাকুরঘরে ব্যবহার হতো।

নাহ... ভয় পায়নি বরং মৃত্যুর পরেও স্বজনকে এক ঝলক দেখতে পাওয়ার আনন্দই বেশি হয়েছিল। দুদ্দাড় করে একতলায় নেমে বইটা পড়ার টেবিলে রেখে ছুট্টে গেছিলাম মেজদাদুর বাড়ি। সটান ছাদে উঠে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে যেতেই নাকে এল সেই ধূপের গন্ধ। আর লাল সিমেন্টের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পড়ে আছে ধূপের ছাই। আমার দেখা দৃশ্যের সত্যতা বুঝেছিলাম টবের মাটিতে গোঁজা কোনো ধূপকাঠি জ্বলতে না দেখে।

খুশি মনে দোতলায় নামতে দেখলাম, মেজঠাম্মা সন্ধ্যে দেবার জন্য ছাদের সিঁড়িতে উঠছে...

সূক্ষ্ম শরীরে মেয়েদের একবারও দেখা না দিয়ে কাকিমা শুধু আমায় কেন দেখা দিয়েছিল, তা আজও বুঝিনি।



দিদার গোপাল

শুচিস্মিতা চক্রবর্তী



আমার দিদিমার বরাবরের অভ্যাস ছিল ঘুম থেকে উঠেই মুখ-হাত ধুয়ে ঘরের গোপালকে খিচুড়ি রেঁধে দেওয়া। দিদা উঠত অনেক ভোরে। বাড়ির সবাই তখন ঘুমাতো। অন্ধকার থাকতেই দিদার ঠাকুরঘর পরিস্কার করাও হয়ে যেত। সবাই যখন ঘুম থেকে উঠত, দিদার গোপালের ততক্ষণে জলখাবার থুড়ি খিচুড়ি খাওয়া সাঙ্গ। দাদু ঠাট্টা করে প্রায়ই বলত , ''তুমি তো তোমার পুঁচকে গোপালকে ভালো করে ঘুমোতেই দাও না। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠিয়ে হালুয়া নয়, পলুয়া নয় শেষে কিনা শুধু ডালে চালে খিচুড়ি খাওয়াও; গোপালের গোঁসা হবে কিন্তু...''

ছদ্মরাগে দিদা মুখ বেঁকিয়ে দাদুকে বলত, ''আমার গোপালকে নিয়ে একদম ঠাট্টা করবে না, বলে দিলাম। বেলায় তো সকলেই খেতে দেয়। অতটুকু প্রাণ, ওর ঘুম থেকে উঠে খিদে পায়, তাইতো আমি সক্কাল সক্কাল খেতে দিই...''

এরপর দাদু আর দিদাকে ঘাঁটাত না। দিদা ঘরের কাজ করে, স্নান সেরে, রেঁধে বেড়ে বেলা বারোটায় আবার গোপালকে সাতপদে খেতে দিত। সারাদিন গোপালকে নিয়ে দিব্যি সময় কেটে যেত।

একদিন হঠাৎ গেরুয়া বসন পরা কোনো এক সাধুবাবা দাদুর বাড়ি এলেন। দিদা ভক্তি ভরে সাধুবাবাকে কিছু ফলমূল, আতপ ও সামান্য দক্ষিণা প্রদান করতে সাধু যারপরনাই খুশি হয়ে অনেক আশির্বাদ করে চলে গেলেন। এরপর সেই সাধুবাবা প্রায়শই আসতেন এবং দিদার সাথে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় নানান আলোচনা করতেন। কথায় কথায় উনি দিদার ভোরবেলা উঠেই গোপালকে খিচুড়ি দেওয়ার কথা জানতে পেরে বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বললেন, ''মা, শাস্ত্রমতে ভগবানকে শুদ্ধ হয়ে ভোগ দিতে হয়। তুমি সকালে বাসি জামাকাপড় না ছেড়েই এই যে গোপালকে খেতে দিচ্ছ, এতে তো গোপাল রুষ্ট হচ্ছেন।''

ওনার কথাগুলো শোনার পর থেকে দিদার নিজের মনে খুবই অপরাধবোধ কাজ করতে শুরু করে। ঠিকই তো, গোপাল তো ভগবান। তাকে মোটেই বাসি কাপড়ে খেতে দেওয়া উচিৎ হচ্ছে না।

তারপর থেকে দিদা ভোরে উঠে শুধু বাসি জামাকাপড় ছাড়াই নয় একদম স্নান সেরে তবেই খিচুড়ি দিতে শুরু করে। এর ঠিক দিন দুয়েক পর থেকেই রাতে দিদার স্বপ্নে ছোট্ট একটি শিশু আসে আর বলে, ''তুমি আমায় আর ভোরে খেতে দাও না কেন? কত বেলা হয়ে যায়। আমার যে ভীষণ খিদে পায়...''

প্রথম এক-দুদিন দিদা নিছক স্বপ্ন ভেবে অতটা আমল দেয়নি। কিন্তু একদিন বাগানে ফুল তোলার সময় অত ভোরে হঠাৎ করে ছোট্ট একটি দেবশিশু না জানি কোথা থেকে এসে দিদার আঁচল টেনে বলে, ''তোমায় কত করে বললাম, আমার সকাল সকাল খিদে পায়। সাধুবাবার কথা ছাড়ো তো, আমায় বাসি কাপড়েই খেতে দেবে বুঝলে...'' বলেই সেই শিশু দৌড়ে কোথাও মিলিয়ে যায়।

ফুলের সাজি উলটিয়ে দিদা সেদিন অজ্ঞান হয়ে ওখানেই পড়ে যায়। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর আর একটুও দেরি না করে দিদা সেই বাসি কাপড়েই গোপালকে খিচুড়ি রেঁধে ভোগ দেয়।

দিদার জীবদ্দশায় আর এর অন্যথা হয়নি কিন্তু দিদা মারা যাওয়ার পর অত ভোরে কেউই আর গোপালকে খিচুড়ি রেঁধে দিতে সক্ষম হয়নি। কিছুদিন পর সেই পুঁচকে পিতলের গোপাল হঠাৎ করে হারিয়েও যায়। দাদু বলেছিল, ''গোপাল খিদের চোটে গোঁসা করে চলে গেছে।'' সেই মূর্তি কিন্তু আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।।



ভূত-ভুতুম পূজাবার্ষিকী ১৪২৮ * বিভা পাবলিকেশন * সেপ্টেম্বরর ২০২১ * মূল্য : ২৫৫/-